৫টি
রহস্য উপন্যাস

সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

● প্রকাশক ঃ
সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

● প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীবলরাম প্রকাশনী
১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

● প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)

● মুদ্রক ঃ
ওরিয়েন্ট প্রেস, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

লেখকের অন্যান্য বই

দ্বিতীয় দার
জীবন এক কাহিনি
বেনারসে প্রেমের শেষে
ভাট
সোনার খাঁচায় রইল না
সাপ নিয়ে খেলা
ভালোবাসা পাখির বাসা
বাড়ি
অবৈধ
প্রেতশিলা
খুনী কোনজন
খতম
পাপ-পুণ্য
টাকা চাই টাকা
একান্ত গোপন
নাচনহাটির জনসাহেব
ডেইজি
দিন ফুরিয়ে রাত্রি
চক্রবাক
বিজনেস উওম্যান
মালিনী
ওপার কলকাতা
ধন মন যৌবন
ফিরে দেখা
স্বপ্নের বাড়ি
সামনের জীবন পিছনের জীবন
শ্রেষ্ঠ গল্প

কিশোর গ্রন্থ

চন্দ্রবর্মার গুপ্তধন
কালভৈরব
রহস্য যখন গভীর
নিখোঁজ রতন
পাহাড়ে আলো জ্বলে এবং আরো চার
ভূতের সঙ্গে দেখা
ফালাকাটা বাংলোর রাত্রি

সূচিপত্র

......Reading detective stories in bed. I find this delightful at home and even more delightful when I am away from home, a lost man. The fuss of the day is done with; you are snugly installed in bed, in a little lighted place of your own; and now to make the mind as cosy as the body. But why detective stories? Because what we want, or at least what I want late at night; you can please yourself,—is a tale that is in its own way a fine picture of life but yet has an entertaining puzzle element in it.

J. B. PRIESLEY

কোণারকে কুয়াশা

একদা গোয়েন্দা বিভাগের দুঁদে
ডেপুটি কমিশনার অতিবিক্রম মজুমদার
অবসর নেওয়ার পর এসেছেন কোণারকে।
উদ্দেশ্যটা অভিনব। তাঁর জামাই ইংলন্ড
থেকে একটা কোর্স করে সেখান থেকেই
এক নামী বিলিতি কোম্পানির চাকরি নিয়ে
ভারতে ফিরেছে। মেয়ে এবং তার স্বামীর
কোণারকে সাক্ষাৎ হোক এটাই ছিল তাঁর
অভিপ্রায়। কিন্তু ভুবনেশ্বর এবং কোণারকে
অনেক পুরনো পাপীর সঙ্গে
দেখা হল অতিবিক্রম মজুমদারের। তারপর
একদিন শেষ রাত্তিরে কোণারক মন্দিরের
কাছে ঘন কুয়াশার মধ্যে শাদা পোশাক পরা
অপসৃয়মাণ এক অবয়ব দেখেছিল
চৌকিদার। সেইসঙ্গে গুলি। জামাই
শংকরের লাশটা পাওয়া গেল ভোরে।
কে এই খুনি? জেলখাটা সুন্দর সিং?
প্রশান্ত? গঞ্জালেশ? অ্যান্ডারসন?
জয়সোয়াল? কিম্বা—। কোণারকের কুয়াশা
সরিয়ে সেই রহস্যের উদ্ঘাটন হল
কেমন করে?



এক

ভুবনেশ্বরে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখন অন্ধকার ময়লা জলের মত পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ হতে চলেছে। প্ল্যাটফর্মে পা দেবার আগেই অতিবিক্রম মজুমদার ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বিদিশা, জিনিসপত্রগুলো সব ঠিক নামল কি না একবার ভাল করে দেখে নিস। গাড়ি কিন্তু এখানে মোটে পাঁচ মিনিট দাঁড়ায়।'

অবশ্য ওঠা-নামার পক্ষে পাঁচ মিনিট যথেষ্ট। কিন্তু অতিবিক্রম মজুমদার ব্যস্ত মানুষ। চিরকাল এই স্বভাব। জন্ম থেকেই বিদিশা তাই দেখে আসছে। সুতরাং বাবার কথার কোনো প্রতিবাদ না করে সে বাধ্য মেয়ের মত বাক্স-বিছানার ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিল, 'সব ঠিক আছে বাবা।'

অতিবিক্রম মজুমদার দ্রুত হাতে কোটের সব ক'টি বোতাম বন্ধ করলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হলেও শেষ রাত্তিরে এখানে রীতিমত ঠাণ্ডা। কলকাতায় অবশ্য একটুও শীত ছিল না। কিন্তু ভুবনেশ্বরে যে ঠাণ্ডা পড়বে, সেটা তিনি আগেই আন্দাজ করেছিলেন। বিশেষ করে শেষ রাত্তিরে। ভাগ্যিস ট্রেনে এই ওভারকোটখানা সঙ্গে ছিল। নইলে প্ল্যাটফর্মে নেমেই তাঁকে হি-হি করে কাঁপতে হত। মেয়ের দিকে তাকিয়ে অতিবিক্রম সাবধানী গলায় বললেন, 'বিদিশা, চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নে। কী রকম শীত। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেলে এই বিদেশ বিভুঁয়ে মিছিমিছি রোগে ভুগতে হবে।'

বিদিশা কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আর কোনো কথা তার মুখে এল না। যা অস্থির ছটফটে মানুষ। নইলে চাদরটা তার গায়েই ছিল। টেনেটুনে আর একটু জড়িয়ে নিল কেবল। তাছাড়া শেষ রাত্তির বলে বাতাসটা সামান্য কনকনে লাগে ঠিক; কিন্তু হি-হি করে কাঁপবার মত শীত নয়। আসলে বাবার বয়স হচ্ছে। অল্প শীতেই কাতর। নইলে এই সামান্য ঠাণ্ডাকে বিদিশার বয়সী কোনো মেয়ে তোয়াক্কা করে নাকি?

প্ল্যাটফর্মের ওপর কুয়াশার একটা পাতলা আস্তরণ। এখনও তেমন ঘন হয়নি। ওপরের বাতাসে ভাসছে। হয়তো ভোরের দিকে মাটির বুকে ঘন কুয়াশা নামবে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে অতিবিক্রম জায়গাটাকে তাঁর মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ভুবনেশ্বরে তিনি অন্তত তিনবার এসেছেন। স্টেশনের বাইরে খানিকটা পথ গেলেই চমৎকার একটা হোটেল আছে। অতিবিক্রম সকন্যা এবার সেখানেই উঠবেন। আজকের দিনটা ভুবনেশ্বরেই থাকবার ইচ্ছে তাঁর। একটু বিশ্রাম নিয়ে একবার শহরটা টহল দিতে বেরোবেন। দুপুরে কিম্বা বিকেলের দিকে লিঙ্গরাজের মন্দির দর্শন করবেন। তারপর দিন ফুরিয়ে রাত। আবার সকাল হলেই মেয়েকে নিয়ে তাঁর গন্তব্যস্থল কোণারকের পথে রওনা হবার ইচ্ছে।

কুলির মাথায় লাগেজ চাপিয়ে অতিবিক্রম তার পিছনে স্টেশনের বাইরে এলেন। এখন একটা ট্যাক্সি করে হোটেলে গিয়ে উঠলেই হয়। দিন সাতেক আগে কলকাতা থেকে তিনি চিঠি লিখেছেন। হোটেলে তাঁর জন্য যেন একটা ডবল-বেড রুম খালি থাকে। ভুবনেশ্বরে অপ্সরা হোটেলের মালিক চন্দনরাম জয়সোয়াল তাঁর চেনা। বছর চার-পাঁচ আগে এক কুখ্যাত দাগী আসামীর খোঁজে এখানে

তাঁকে আসতে হয়েছিল। জয়সোয়ালের সঙ্গে তখন থেকেই আলাপ-পরিচয়।

গাড়িতে ওঠার আগে বিদিশা বলল, 'বাবা, কাল সকালেই তো আমরা কোণারকে যাচ্ছি? না, এখানেই আরো একটা দিন থাকবে?'

'তোর কী ইচ্ছে?' মেয়ের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে অতিবিক্রম মুচকি হাসলেন। বললেন, 'কাল হল গিয়ে বুধবার। কোণারকে পৌছতে বেলা দশটা হবে। মাঝখানে বেস্পতি, শুক্কুর আর শনি তিনটে দিন। শঙ্কর আসবে সেই রবিবারে বিকেল নাগাদ, বুঝলি?'

শঙ্করের কথা উঠতেই বিদিশা একটু লজ্জা পেল। বাবা যেন কী রকম। বুড়োবয়সে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় নাকি? নইলে এমনি মুচকি হেসে মেয়ের কাছে কেউ জামাইয়ের কথা বলে? তাছাড়া আরো একটা প্রশ্ন। তারা কোণারকে যাচ্ছে বুঝি শুধু সেই মানুষটার জন্যে? বিদিশার নিজের কি কোনো ইচ্ছে নেই? এই শহর কলকাতার প্রায় বন্দীদশা থেকে মুক্তি নিয়ে বহুদূরে কোথাও গিয়ে দু'দিনের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে মন চায় না?

তবু কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবার ওই মানুষটার জন্যেই তাদের কোণারকে আসা! আসলে সমস্ত প্ল্যানটাই তার বাবা অতিবিক্রম মজুমদারের এক বিচিত্র খেয়াল। নইলে দিল্লি থেকে শঙ্কর সোজা তাদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতেই আসতে পারত। এবং সেটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। আজ তার মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় তাই হত। তারপর সেই পুরনো কলকাতায়। পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে সূর্য ঢলে পড়লে শহরটা যেন রূপবতী তরুণী হয়ে ওঠে। আর সন্ধের পর ঝলমলে নিওন বাতির বিচিত্র সজ্জায় প্রসাধন করা এক আশ্চর্য সুন্দরী নায়িকা। সেই কলকাতার চৌরঙ্গী আর ময়দান। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁ কিম্বা লেকের ধারে বসে কয়েকটি মোহময় অপরাহ্ণ আর ভাল লাগা অন্ধকার ঢিলে আলসেমিতে কাটিয়ে দিয়ে শঙ্করের সঙ্গে সে আবার একসঙ্গে দিল্লি ফিরে যেতে পারত।

কিন্তু অতিবিক্রম মজুমদার কেন যে জামাইয়ের জন্য এমন বিচিত্র অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন, তার কারণ একমাত্র তিনিই জানেন। হয়তো এটাই তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল। বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে সাদা-মাঠা ছন্দ-মিল গড়া সাধারণ আদর-আপ্যায়নে তাঁর মন সায় দেয়নি। হঠাৎ কোণারকে যাওয়ার আইডিয়াটা মাথায় এসে গেল। হ্যাঁ, সেটাই চমৎকার হবে। কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর। তারপর সেখান থেকে কোণারকে গিয়ে তাঁরা শঙ্করের জন্য অপেক্ষা করবেন। মেয়েকে প্রায় না জানিয়েই অতিবিক্রম দিল্লিতে খবর পাঠালেন। সোমবার রাত্তিরের ট্রেনেই তাঁরা ভুবনেশ্বর রওনা হবেন। সেখানে দু-একদিন থেকে কোণারক। এই সপ্তাহটা একটু গুছিয়ে নিয়ে শঙ্কর যেন রবিবার দুপুরের ফ্লাইটেই রওনা হয়। বেলা চারটে নাগাদ প্লেন ল্যান্ড করবে। তারপর ভুবনেশ্বর থেকে কোণারকে পৌছতে নিশ্চয় সওয়া ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না।

জামাইকে চিঠি পাঠিয়ে অতিবিক্রম মেয়ের কাছে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। শুনে বিদিশা অবাক। শঙ্কর তাহলে ভুবনেশ্বরে আসছে? সেখান থেকে কোণারকে? আশ্চর্য! বাবার মাথায় এমন অদ্ভুত সব খেয়াল চাপে। তল্পিতল্পা বেঁধে তাদের এখন কোণারকে ছুটতে হবে?

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অতিবিক্রম বোধ হয় কৃতকর্মের ভাল-মন্দ বিচারে সন্দিহান হলেন। ঈষৎ বিব্রত মুখ করে বললেন, 'কাজটা ঠিক হল না, তাই না রে? শঙ্কর না আবার কিছু ভেবে বসে। আর পাঁচজনে শুনলে নিশ্চয় হাসবে।' দু-এক সেকেন্ড কী যেন চিন্তা করলেন অতিবিক্রম। ফের ম্লান হেসে বললেন, 'তোর মা বেঁচে থাকলে কিন্তু খুব রাগ করত। বলত, জামাইকে আবার কেউ হোটেলে নেমতন্ন করে? তোমার যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড।'

বিদিশা চুপ করে শুনছিল। মায়ের কথা বলবার সময় তার বাবার গলাটা কেমন নরম, ক্লান্ত লাগে। চোখ দুটি ঠিক ছলছলে নয়, অদ্ভুত নিঃসঙ্গ আর বিষাদক্লিষ্ট দেখায়। তার বিয়ের ঠিক

বছরখানেক পরেই মা হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে ভুগে আর এক ভুবনে চলে গেলেন। বাড়িতে তখন শুধু সে আর বাবা। দাদা তার বিয়ের আগেই সস্ত্রীক আমেরিকা গিয়েছিল। সেখানেই বসবাস করবে বলে সব ঠিক করে ফেলেছে। আর দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও অনেকদিন দাদা আসেনি। প্রায় মাস দুই পরে যখন বাড়িতে এল, তখন সংসারটা আবার শান্ত—শোকের ছায়া গুটিয়ে গতানুগতিক জীবনযাত্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।

শঙ্কর দেশে ফিরল বছর তিনেক পরে। বিয়ের ঠিক চার মাস বাদেই সে ইংল্যান্ডে রওনা হল। অবশ্য সেরকম গোছের একটা কথাবার্তা আগেই শোনা গিয়েছিল। বিয়ের সময় এখানেই ডায়মন্ডহারবার রোডে একটা বিলিতি কোম্পানির অফিসে শঙ্কর কস্টিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। কিন্তু বিলিতি ডিগ্রি না থাকলে, এদেশে চটপট উন্নতি হয় না। শঙ্কর তাই ইংল্যান্ডে যাবে বলে বহুদিন থেকেই ভাবছিল। বিয়ের পর অতিবিক্রম মজুমদার জামাইকে আরো উৎসাহিত করলেন। তারপর যোগাযোগ আর চেষ্টা। অতিবিক্রম নিজেও অবশ্য চুপ করে বসে থাকেননি। তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং জানাশুনো মহলে রীতিমত তদ্বির আরম্ভ করে দিলেন। শঙ্কর এতদিন যা পারেনি, শ্বশুরের চেষ্টায় এবার তা ফলপ্রসূ হল। বিয়ের মাস চারেক পরেই ম্যানেজমেন্ট এবং আরো কিছু পড়ার জন্য সে বিদেশ যাত্রা করল।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, শঙ্করের বাদাদুরি আছে। অতিবিক্রম মজুমদার মেয়ের কাছে সে কথা বারবার বলেছেন। এই তিন বছরে শুধু ম্যানেজমেন্টের সার্টিফিকেট নয়, কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের মত কঠিন পরীক্ষাতেও শঙ্কর পাশ করেছে। কিন্তু তাই বলে শুধু পাশের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে শঙ্কর দেশে ফিরেছে নাকি? তেমন কাঁচা ছেলেই নয়। বিলেত থেকেই মোটা মাইনের একটা চাকরি বাগিয়ে, তবে সে দেশে রওনা হয়েছে। ফরিদাবাদেই কী যেন কোম্পানিতে কাজ। ফরেন কোলাবোরেশন। শুরুতেই প্রায় তিন হাজারি মনসবদার। তাছাড়া আরো অনেক পার্‌কুইজিটস। ফ্রি কোয়ার্টার্স, গাড়ি, বাই-ইয়ারলি ফরেন ট্যুর। এটা ওটা অনেক সুযোগ-সুবিধে। চিঠিতে শঙ্কর সব কথা লিখেছিল। শুনে অতিবিক্রম আনন্দে অস্থির। শুধু ছোটছেলের মত হাততালি দিতে আর ছুটোছুটি করতে বাকি রেখেছেন। মেয়েকে বললেন, 'হ্যাঁ, ছেলেটার বাহাদুরি আছে। আমার হিরে চিনতে ভুল হয়নি। তুই দেখে নিস বিদিশা, ভবিষ্যতে ও আরো অনেক উন্নতি করবে।' তারপর কথার মধ্যেই হঠাৎ মুখখানা মলিন করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালেন, 'আজ তোর মা বেঁচে থাকলে খু-উ-ব খুশি হত, বুঝলি?'

তা ঠিক। শঙ্কর এই বয়সেই এমন উন্নতি করেছে জানলে মা নিশ্চয় আনন্দ করতেন। তার বিয়ের সময় শঙ্করের চাকরিটা হেজিপেজি ছিল। কোম্পানিটা জাতে কুলীন—খাঁটি বিলিতি কনসার্ন। মর্যাদার দিক থেকে এই পর্যন্ত। কিন্তু শঙ্করের পোস্টটা অফিসারের নয়। মাইনেটা সাকুল্যে চোদ্দশ' টাকার মত হলেও সে একজন কস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা খুব একটা রঙিন ছিল না। তাছাড়া বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল বলা চলে কি? বাগবাজার স্ট্রিটে পৈতৃক দোতলা বাড়ি। সেই পুরোনো আমলের ঘরদোর। তিন ভাই—ভাগাভাগি করলে ওপরে নিচে মিলিয়ে বড়জোর আড়াইখানা ঘর দখলে আসবে। হবু-জামাইয়ের বিত্ত-বৃত্তান্ত শুনে সুনয়নী একটুও খুশি হননি। কন্যাপক্ষের তুলনায় পাত্রপক্ষকে বেশ নিষ্প্রভ, লণ্ঠনের আলোর মত টিমটিমে লাগছে। আর অতিবিক্রম মজুমদারের তখন মহাবিক্রমের দিন। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। পৌষ মাসের ধানী গেরস্তর অবস্থা। বালিগঞ্জ প্লেসে সদ্যসমাপ্ত হাল ফ্যাশানের বাড়ি। নিজের ফিয়াট গাড়ি ছাড়াও ওয়্যারলেস ফিট-করা সরকারি জিপ। দরজায় মোতায়েন ভারী বুট পরা পুলিশ। এবং পিছনে রিভলবারধারী প্লেন ড্রেস দেহরক্ষী সদাসর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করছে। লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অতিবিক্রম মজুমদারের অঙ্গুলি

হেলনীতে তখন এই কলকাতা শহরের কত লোক উঠত আর বসত। আর সেই মানুষের কিনা এমনি রং জৌলুসহীন আটপৌরে জামাই? তাছাড়া তাঁর মেয়েও ফেলনা নয়। রূপে লক্ষ্মী কিম্বা গুণে সরস্বতী না হলেও বিদিশাকে মোটামুটি সুন্দরী গুণবতী বলা যায়। মরালীর মত দীঘল গ্রীবা। গায়ের রং অবশ্য চাঁপা ফুলের বর্ণ নয়। তবু মেয়ে ফর্সা বৈকি। তাছাড়া বিদিশার মুখের ডৌলটি ভারি সুন্দর। অল্প হাসলেই ঈষৎ উঁচু শুভ্র দন্তপংক্তি ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

তবু একরকম তাড়াহুড়ো করেই বিয়েটা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন অতিবিক্রম মজুমদার। সুনয়নীও তাই চেয়েছেন। ভালয় ভালয় শুভকাজ সমাধা হোক। নইলে কখন কী যে ঘটে কেউ বলতে পারে নাকি? মনের মধ্যে ভয় ভাবনা কিছু কম ছিল না। প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল মেয়েই না সম্পূর্ণ বেঁকে বসে। কিন্তু ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বিদিশা তেমন ছেলেমানুষি করেনি। বরং অতিবিক্রম মজুমদার নিজেই একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন। বিয়ের আগে মেয়েকে আর একটি দিনের জন্যও ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যেতে দেননি। কেনাকাটা করবার প্রয়োজন হলে বিদিশা বাইরে যেত গাড়িতে করে। গোপনে একজন বিশ্বস্ত ওয়াচারকে তিনি আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। মেয়ের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে। কিন্তু না। একটি দিনও অনভিপ্রেত কোন সংবাদ পাননি।

শুধু বিয়ের কথাবার্তা চলার সময় বিদিশা ক'দিন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বড়জোর দিন দশেক। তারপর ধীরে ধীরে বরফ গলতে শুরু করল। ক্রমে সবই সহজ হয়ে এল। সুনয়নী নিজেও মেয়েকে কত বুঝিয়েছেন। ও হল কম বয়সের নেশা। দু'দিনের জন্যই ভাল। চিরকালের করতে গেলেই মস্ত ভুল। নেশা কেটে গেলেই সব ফাঁকা মনে হবে। মায়ের কথা বোধ হয় মেয়ের মনে ধরল। বিয়ের দিন পনেরো আগে বিদিশা সেজেগুজে আবার তাঁর সঙ্গে বেরোল। পছন্দ করে শাড়ি কিনল। গয়নার দোকানে ডিজাইনের বই দেখে চুড়ি, হার, বালা আরো সব অলঙ্কারের অর্ডার দিয়ে এল। তাঁর কাছে থেকে কয়েকখানা কার্ড চেয়ে নিয়ে চার-পাঁচজন বন্ধুকে বিয়ের তারিখে নেমতন্ন জানাতে গেল। সঙ্গে অবশ্য গাড়ি এবং লোক দিতে সুনয়নী ভুল করেননি। তবু বিয়ের পর বর-কনে গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত সুনয়নীর ভয় যায়নি। হঠাৎ একটা কিছু ঘটলে কেলেঙ্কারির আর বাকি থাকবে না। এমনিতেই আত্মীয়মহলে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই ব্যাপারটা জানে। ভদ্রতার খাতিরে সামনাসামনি কেউ কিছু বলতে চায় না। তবে আড়ালে ফিসফাস করে। সুনয়নী সেটা বুঝতে পারেন। এদিকে বিয়ের দিন গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত আবার এক নতুন দুশ্চিন্তা এসে জুটল। সুনয়নী মনে মনে তখন শুধু ভগবানকে ডেকেছেন। ভরসা বলতে তিনি, আর সেপাইশান্ত্রি ও লোকবল।

তবু মেয়ের বিয়ে সেদিন নির্বিঘ্নেই দিতে পেরেছিলেন অতিবিক্রম মজুমদার। শুধু সকালবেলার সেই ঝামেলা—না ঠিক ঝামেলা নয়। বরং ঈশান কোণের কালো মেঘের মত একটা দুর্ভাবনা বলা যেতে পারে। ব্যাপারটা এমনিতে সাধারণ। পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড়-কর্তার জীবনে এমন ব্যাপার আকছার ঘটতে পারে। মেয়ের বিয়ের দিন সকালবেলায় তাঁর শোবার ঘরের পার্সোন্যাল টেলিফোনটা হঠাৎ সশব্দে একটানা বেজে উঠল। অতিবিক্রম প্রথমে ভেবেছিলেন, কোন ওপরওয়ালা কিম্বা খোদ মিনিস্টারের তলব। জরুরি খবর—নিশ্চয় এখনই জানা প্রয়োজন। অথবা হয়তো কোন নিকটাত্মীয় কিম্বা তাঁর ভাবী জামাতার বাড়ি থেকেই টেলিফোন করছে। সম্ভবত এই সংবাদ না দিলেই নয়।

রিসিভারটা কানের কাছে এনে অতিবিক্রম তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যালো।'

অপরপ্রান্ত থেকে কে যেন চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'আপ মজুমদার সাব?'

'ইয়েস।' অতিবিক্রম আরো সংক্ষিপ্ত হতে চাইলেন। বললেন, 'কী প্রয়োজন?'

'মুঝে ইয়াদ হ্যায় সাব?' টেলিফোনের তারে কণ্ঠস্বর যেন একটু পরিচিত শোনাল। কিন্তু লোকটাকে ঠিক চিনতে পারলেন না।

'আপ কোন হ্যায়?' অতিবিক্রম মজুমদার স্পষ্ট জানতে চাইলেন।

'হামি সুন্দর সিং।' টেলিফোনের তারে পরিষ্কার জবাব ভেসে এল।

মুহূর্তের মধ্যে অতিবিক্রম আরো গম্ভীর হলেন। ভ্রূ কোঁচকাল। চিবুকটা শক্ত, দৃঢ় হয়ে এল। সুন্দর সিং? মানে, সেই কুখ্যাত দাগী আসামী? বেশ কয়েকটি ডাকাতির নায়ক। একটা হিরে চুরির কেসে পুলিশ তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত অতিবিক্রম মজুমদার ভুবনেশ্বর থেকে দশ মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলেন।

টেলিফোনে সুন্দর সিং বলল, 'পরশু রোজ হামার জেলসে ছুট্টি মিলল মজুমদার সাব।'

অতিবিক্রম সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করলেন, 'তুম হামসে মিলনে চাহতে হো?'

'আপসে?' সুন্দর সিং হা-হা করে হেসে উঠল। ফেব বলল, 'মিলেঙ্গে। কোই রোজ জরুর মিলেঙ্গে মজুমদার সাব। আচ্ছা—'

টেলিফোনটা বোধ হয় সে ছেড়ে দিল। অতিবিক্রম আর কোনো সাড়া পেলেন না। মনটা এক অজানা অস্বস্তিতে ভারী হয়ে উঠল। সকালেই বিশ্বস্ত এক সহকর্মীকে ডেকে সুন্দর সিংহের ব্যাপারটা তিনি খুলে বললেন। গোপনে নির্দেশ পাঠানো হল। সম্ভব হলে লোকটাকে আবার গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু আশ্চর্য! অতিবিক্রম তার কোনো খোঁজই পেলেন না।

বিকেলের হলদে রোদ্দুরের মত সুন্দর সিং যেন কলকাতা শহর থেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল।

দুই

অত ভোরে অপ্সরা হোটেলে কেউ ওঠেনি। দরজায় কোলাপসিবল গেটের পিছনে একটা বেঞ্চিতে নাইট-গার্ড গোছের একজন লোক শুয়েছিল। শেষ রাত্তিরে পথঘাট ফাঁকা। ট্যাক্সিটা প্রায় ঝড়ের গতিতে এসে সজোরে ব্রেক কষে হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়াল। হেড লাইটের আলোর ঝলকানিতে লোকটা নড়েচড়ে উঠল। ফের হর্ন বাজাতেই ধড়মড় করে বেঞ্চির ওপরে উঠে বসল।

অতিবিক্রম মজুমদার ট্যাক্সি থেকে নেমে কোলাপসিবল গেটের কাছে গিয়ে বললেন, 'মিস্টার জয়সোয়াল কাঁহা?'

'জী, সাব তো অন্দরমে। আপ কো কামরা চাহিয়ে?'

অতিবিক্রম একটা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'আমাদের রিজার্ভেশান আছে। তুমি ম্যানেজারকে খবর দাও।'

লোকটা চোখ কচলাতে কচলাতে দ্রুতপায়ে কোথায় যেন চলে গেল। মিনিট তিন-চার পরেই হোটেলের আর একজন কর্মচারী এসে কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপ মজুমদার সাব?'

অতিবিক্রম কোনো জবাব না দিয়ে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে দিলেন।

লোকটা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'কাম ইন স্যার। উই হ্যাভ কেপ্ট ইয়োর রুম রেডি ফর ইউজ।'

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে অতিবিক্রম অপ্সরা হোটেলে ঢুকলেন। পিছনে বিদিশা। মালপত্রগুলো এই নাইট-গার্ড লোকটা নামিয়ে রেখেছে। হয়তো এখুনি কিংবা একটু পরেই তাঁর কামরায় পৌঁছে

দেবে। দোতলায় ঘর। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হোটেলের সেই কর্মচারী লোকটা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কামরাখানি দেখিয়ে দিল।

ভাল ঘর। দক্ষিণে বড় জানালা। পুব-দিকের দরজা খুলতেই সুন্দর ব্যালকনি। ঘরের মধ্যে দুটি খাট। সবুজ রঙের পর্দা জানালা-দরজায়। মেঝেতে কার্পেট। বসবার চেয়ার—টেবিল। পশ্চিম দিকে ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম। নিখুঁত না হলেও চলনসই। তাছাড়া মোটে দুটো দিন। হুস করে কেটে যাবে। অতিবিক্রম মেয়েকে বললেন, 'জিনিসপত্রগুলো একটু রেখে বরং শুয়ে পড়। অন্তত একঘণ্টা দিব্যি রেস্ট নিতে পারবি।'

বিদিশার এখন আর ঘুমোতে ইচ্ছে নেই। ভোর তো হয়ে এল। একটু আগেই কাক ডাকছিল। তবে একবার বাথরুম গিয়ে মুখ হাতে জল দিতে হবে। সমস্ত রাত্রির ট্রেন-জার্নি। কলকাতায় গাড়ি ছাড়বার সময় বেশ গরম লাগছিল। পিঠে, গায়ে জবজবে ঘাম। সকালে ভাল করে স্নান না কারা পর্যন্ত শরীরটা ঘিনঘিন করবে।

অতিবিক্রম কোটটা খুলে মেয়ের হাতে দিয়ে সটান শুয়ে পড়লেন। একটু শীত শীত লাগছে। পায়ের কাছে একটা পাতলা কম্বল ছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা গায়ের ওপর টেনে নিলেন। তারপর চোখ দুটি বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিদিশা নিঃশব্দে দরজার কাছে গেল। অতিবিক্রম ঘুমোচ্ছেন। দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে সে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাইরে বেশ শীত। বলা যায় না, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ করতে পারে। বিদিশা তাই চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল। মুখের কিছু অংশ এবং কান দুটিতে ঢাকা দিল। কুহকিনী মায়ার মত সমস্ত শহরটাকে এখন বরফ রঙের কুয়াশা জড়িয়ে আছে। বিশ হাত দূরের জিনিসও ভাল করে নজর হয় না। যত ভোর হচ্ছে, কুয়াশা আরো গাঢ় হয়ে মাটির বুকে নামছে।

বিদিশার হঠাৎ শঙ্করের কথা মনে হল। তার স্বামী শঙ্কর দত্ত। প্রায় তিন বছর পরে শঙ্কর আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আচ্ছা, বিয়ের পর শঙ্করের সঙ্গে বিদিশার সম্পর্কটা কেমন ছিল? অবশ্য মাত্র চার মাস সময়। বলা বাহুল্য নারী-পুরুষের যা প্রাথমিক এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক হয় মাঝে মাঝে সেটার অনিবার্য পুনরাবৃত্তি ঘটত। শঙ্করের আচরণ এবং প্রতিদিনের ব্যবহারের মধ্যে কোথায় যেন একটা সীমারেখা ছিল। সেই সীমারেখা পেরিয়ে শঙ্কর কোনোদিন তার সান্নিধ্যে আসেনি, হয়তো আসতে চায় নি। কচ্ছপের খোলের মত একটা কঠিন বস্তুর আড়ালে যেন তার মনটাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। আবার বিদিশাকে সে কোনোদিন উপেক্ষাও করেনি।

শঙ্করের সঙ্গে শেষ দেখা দমদমে এয়ারপোর্টে। বিমানবন্দরে ওকে সী-অফ করতে অনেকে গিয়েছিল। শঙ্করের দু-তিনজন বন্ধু, ভাই-বৌদি, তার বাবা-মা,—আরো কিছু আত্মীয়-স্বজন। প্লেনে ওঠার আগে শঙ্কর হঠাৎ তার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। এত লোকজনের মধ্যে মানুষটার এই আকস্মিক দুর্বলতার জন্য এমন লজ্জা করছিল বিদিশার। কিন্তু পরে তার মনে হল, ব্যাপারটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সম্ভবত তাই এই নিয়ে কেউ কৌতূহল প্রকাশ করেনি। অনেকে বোধহয় ইচ্ছে করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। শুধু তার মেজ-জা আড়চোখে এক পলক দেখে নিয়ে মুখ টিপে হাসল।

সকাল থেকেই বিদিশার মনটা ভালো ছিল না। এই তিন-চার মাসের মধ্যে শঙ্করের তার সঙ্গে মতের অমিল কিংবা কথা কাটাকাটি একটি দিনের জন্যও হয়নি। আসলে বিদিশার কেমন যেন মনে হত শঙ্কর ঠিক সম্পূর্ণভাবে তার কাছে ধরা দেয়নি। কোথায় যেন একটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা,—আর সেই কথাটা মনে হলেই বিদিশা কেমন গম্ভীর হয়ে যেত। মা দেখে ভাবতেন জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের বোধহয় মান-অভিমানের পালা চলছে। মুচকি হেসে বলতেন,

—'স্বামী-স্ত্রীতে অমন হয়, বুঝলি? দুটো কাঁসার বাটি নাড়াচাড়া করলেও ঠোকাঠুকি লাগে। আর এ তো জলজ্যান্ত দুটো মেয়ে-পুরুষ।' হয়তো তাই! সম্পর্ক যেমনই হোক, শঙ্কর যেদিন ইংল্যান্ডে গেল সেদিন সকাল থেকেই বিদিশার মনটা ভারী হয়ে উঠল। আর সন্ধ্যাবেলায় বাবার ফিয়াট গাড়িতে শঙ্করের পাশে বসে সে যখন এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল, তখন তার দৃষ্টি বর্ষার ভিজে মাটির মত নরম হয়ে এল। চোখের ওপর জলের একটা পাতলা আস্তরণ অনেকক্ষণ ভেসে বেড়াল।

তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শঙ্কর ফিসফিস করে বলল, 'মন খারাপ করে থেকো না, বুঝলে?'

বিদিশা চুপ করে রইল!

শঙ্কর আবার বলল,—'কই, তাহলে হাসো।'

বিদিশা সলজ্জভাবে হাসবার চেষ্টা করল।

ইতিমধ্যে প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। আরো অনেক যাত্রীর সঙ্গে শঙ্কর ধীরে ধীরে বিমানের দিকে এগোল। একটা অতিকায় বিহঙ্গের মত প্লেনটা ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় শঙ্কর বারবার হাত নাড়ছিল।

লন্ডন থেকে শঙ্কর তাকে খুব বেশি চিঠি লিখত না। প্রথমদিকে ফি-মাসে একখানা, তারপর ধীরে ধীরে তার সংখ্যা হ্রাস পেল। বিদিশা অবশ্য চিঠি পেলেই উত্তর দিত। এক সপ্তাহের বেশি কখনও দেরি করত না। মাঝে মাঝে মা, তারপর বাবাও খোঁজ নিতেন। শঙ্করের চিঠিপত্র নিয়মিত আসছে কি না? একটু দেরি হলে বলতেন,—'ছেলেটা পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত বোধহয়, তাই চিঠি লেখার ফুরসত পায় না।'

শঙ্করের চিঠি পড়ে কোনোদিন বিদিশার মন ভরেনি। আহা! বউকে আবার কেউ অমনি চিঠি লেখে নাকি? একমেটে প্রতিমার মত সাদামাঠা চিঠি। তার মধ্যে না আছে একটু রস, না আছে দুটো ভালবাসার কথা। শুধু তার কাজের ফিরিস্তি। কেমন পড়াশুনো করছে, কবে পরীক্ষা, বিলেতের কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পরীক্ষার কোর্সটা বেশ কঠিন, ইত্যাদি। গোটা চিঠির মধ্যে কোথাও লেখা নেই যে পড়াশুনোর ফাঁকে বিদিশার মুখখানা তার হঠাৎ মনে পড়ে। এবং তখন বুকের ভিতরটা বেশ ভারী লাগে, মন কেমন করে। উচ্ছ্বাস, আবেগ কিম্বা উৎকণ্ঠা দূরে থাক—তার বিহনে বউ যে বিরহিনী হয়ে আছে, এমন মিষ্টি দুর্ভাবনার কথা শঙ্করের চিঠিতে সে একছত্রও পড়েনি। মা একদিন জোর করে একটা চিঠি দেখেছিলেন। ঠাট্টা করে নাকি বাবাকে বলেছিলেন, —'জামাইয়ের চিঠিতে শুধু পড়াশুনোর কথা। আদর্শ ছেলে। বউকে কী দুটো সোহাগের ভাষাও লিখতে নেই?'

'তার মানে?' বাবা ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। ফের গম্ভীর মুখে বললেন,—'বুঝেছি। আসলে তোমরা মেয়েরা বড্ড ভাবপ্রবণ। পুরুষমানুষের কি এত চঞ্চল হলে চলে? শঙ্করকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তার জন্যে পরিশ্রম, সাধনা চাই। বউকে ওইসব ছিঁচকাদুনি চিঠি লেখার অবসর কই তার? ওসব পরে হবে।'

শঙ্করের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় কিন্তু খুব মধুর হয়নি। বরং কিছুটা অস্বস্তির। ফুলশয্যার রাত। প্রায় একটা বাজে। জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বিদিশা। একটু পরেই জুতোর শব্দ তুলে শঙ্কর ওপরে উঠে এল। বারান্দায় তার জা এবং আরো তিন-চারজন মেয়ে দাঁড়িয়ে। শঙ্করকে দেখে তারা ফিসফিস করে কী কথা কইল। কে একজন খিলখিল করে হেসে উঠল। তার পর সকলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। দরজাটা আলতোভাবে ভেজিয়ে দিয়ে শঙ্কর চুপ করে বিছানায় বসে রইল। ঘরের ভিতর হাল্কা সবুজ রঙের আলো। সেই আলোর বন্যায় সমস্ত ঘরটা চমৎকার লাগছিল। বিদিশার গলায় মোটা গোড়ের মালা। অঙ্গে সুবর্ণের দ্যুতি। তার

মেজ-জা খুব যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে তাকে সাজিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে শঙ্কর তার পাশে এসে দাঁড়াল। পূর্ণিমা তিথি। আকাশে চাঁদের আলো। বিদিশা চুপ করে ভাবছিল, শঙ্কর কেমন করে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করবে। তার এক পিসতুতো বোনের বর ফুলশয্যার রাত্তিরে প্রথমে কোন কথা বলেনি। কয়েক সেকেন্ড স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। আচ্ছা শঙ্করও যদি তাই করে? কথাটা মনে হতেই বিদিশা হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু শঙ্কর তেমন কিছুই করল না। বিদিশা মুখ তুলতেই সে একনজর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শুধোল,—'তোমাকে একটা কথা বলব?'

—'বলো।' ব্রীড়াবনতা নববধূর মত বিদিশা মৃদু হাসল।

শঙ্কর একটু ইতস্তত কবে বলল,—'তুমি নিজেকে সুখী মনে করছ তো?'

প্রশ্নটা হয়তো সাধারণ। নিছক ঘরোয়া বলা যায়। ফুলশয্যার রাতে নববধূকে এমন কথা যে কোন স্বামী বলতে পারে।

কিন্তু প্রশ্নটা সোজাসুজি হলেও যেন ঠিক স্পষ্ট নয়। অন্তত বিদিশা তাই ভাবল। অতলে কোথায় যেন একটা হেঁয়ালি লুকিয়ে আছে। বিদিশা ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের হেসে বলল,—'হঠাৎ এ প্রশ্ন মনে এল কেন?'

শঙ্কর নিজেকে একটু সহজ করবার চেষ্টা করে বলল,—'এমনিই ধরে নিতে পার।'

বিদিশা ঈষৎ রহস্য করে হাসল। বলল,—'তোমার কী মনে হয়? আমি সুখী নই?'

এর উত্তরে শঙ্কর আর কোনো কথা বলল না। মুগ্ধদৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে পলক তাকিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

বিয়ের পর মাত্র চারমাস। তারপরই শঙ্কর ইংল্যান্ডে চলে গেল। এই ক-মাসের ভিতর ওই প্রশ্নটা সে আর একদিনও করেনি। বিদিশা কিন্তু কথাটা ভুলতে পারেনি। গলায় বিঁধে থাকা একটা ছোট্ট মাছের কাঁটার মত ওই প্রশ্নটা তাকে কেবলি অস্বস্তি দিয়েছে। ফুলশয্যার রাত্তিরে প্রথম সম্ভাষণেই নববধূকে অমন একটা প্রশ্ন কেন সে করতে গেল? তবে কি শঙ্করের মনে কোনো সন্দেহ আছে? তার ধারণা এই বিয়েতে বিদিশা সুখী হয়নি? কিন্তু পাত্র হিসাবে শঙ্কর তো নিতান্ত ফেলনা নয়। দেখতে সুপুরুষ। আর বর্তমান একটু সাধারণ হলেও তার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইশারা রয়েছে। এমন ছেলেকে স্বামীরূপে পেতে অনেক মেয়েই কামনা করবে। তাহলে বিদিশা বিয়েতে সুখী কিংবা সুখী নয়, এই প্রশ্ন কেন শঙ্করের মস্তিষ্কে রেখাপাত করল? তবে কি য়ুনিভার্সিটিতে প্রশান্তর সঙ্গে তার পরিচয় এবং ভালবাসার ঘটনাটা শঙ্কর সবই জানে? বিদিশা কতদিন ভেবেছে, কথাটা সে নিজেই একবার তুলবে। কিন্তু পরে কী ভেবে আর এগোয়নি। কী লাভ? শেষ পর্যন্ত যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে।

দরজায় কে যেন মৃদু টোকা দিচ্ছে। ঝুলবারান্দা ছেড়ে বিদিশা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। বাবার কাঁচা ঘুম এখুনি ভেঙে যেতে পারে। তবে অন্য কেউ নয়—উর্দি-পরা একটা হোটেল বয়। বিদিশাকে দেখে সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'চা আনব মেমসাব?'

অতিবিক্রম ঘুমে অচেতন। ট্রেনে কিছুতেই তাঁর নিদ্রা হয় না। তার মানে এখনও অন্তত ঘণ্টাখানেক—সাড়ে ছ'টার আগে জেগে উঠবেন বলে মনে হয় না। তাও বিদিশাকে হয়তো ডাকাডাকি করতে হবে। কিন্তু তার নিজের এক কাপ চা হলে শরীরটা একটু ঝরঝরে লাগে। হোটেল-বয়' এর মুখের দিকে তাকিয়ে বিদিশা বলল, 'শুধু এক কাপ চা নিয়ে এস।' এক মুহূর্ত থেমে সে ফের নির্দেশ দিল, 'সাহেবের জন্য ব্রেকফাস্ট এক ঘণ্টা পরে দিও, কেমন?'

ছেলেটি হেসে মাথা নুইয়ে চা আনতে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে বিদিশা ফের ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াল। কুয়াশা আরো গাঢ় হয়েছে। রাস্তাঘাট,

ঘরবাড়ি সাদা চাদরের মত মোটা আবরণের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু ভোরের আলো এখনও ভালো করে ফোটেনি। বিদিশা চারপাশে তাকিয়ে কুয়াশার চাদর জড়ানো শহরটাকে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হতেই সে পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হল। তার বাবা অতিবিক্রম মজুমদার কখন বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে কোটটা গায়ে দেওয়া, বোতাম আঁটা সব হয়েছে। অতিবিক্রম কোনো কথা না বলে একটা ব্যাগ হাতে তুলে নিলেন। দূর থেকে বিদিশার মনে হল বাবার চোখ দুটি খোলা হলেও ঠিক যেন ঘুম কাটেনি। সেই অবস্থায় অতিবিক্রম ব্যাগটা হাতে নিয়ে দিব্যি হেঁটে গেলেন—দরজা খুলে বাইরে করিডোরে। বিদিশা অবাক,—তাকে একটি কথাও না বলে বাবা অমন নিঃশব্দে কোথায় যাচ্ছেন; একটু আগেই তো মানুষটা গাঢ় নিদ্রায় প্রায় অচেতন ছিল। কী যেন একটা সন্দেহ হতে বিদিশা প্রায় এক দৌড়ে অতিবিক্রম মজুমদারকে পাশ কাটিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে বাবার পথ আগলে দাঁড়াল। হাতের ব্যাগটা এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'বাবা! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

আচমকা ঘুম ভাঙলে মানুষ যেমন চমকে উঠে, পরিবেশটা চিনতে না পেরে নির্বোধের মত তাকায়, অতিবিক্রমকে অনেকটা তেমনি মনে হল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন,—'কিরে, ভোর হয়ে গেল নাকি?'

—'ভোর?' বিদিশা পরিহাস করে বলল,—'তাই বুঝি মর্নিং ওয়াকে বেরোচ্ছিলে?'

'মর্নিং ওয়াকে?' অতিবিক্রম যেন শৈশবের কোন বিস্মৃত ঘটনার কথা মনে করবার চেষ্টা করে বললেন,—'কই না তো?'

কী ভেবে বিদিশা বলল,—'ঘরে চলো। একটু আগে বেড-টি দেবে কি না জানতে বেয়ারা এসেছিল। তোমার ঘুম ভেঙে গেছে বুঝতে পারলে আমি ওকে এক-পাট চায়ের অর্ডার দিতাম।'

সকাল আটটা নাগাদ হোটেলের মালিক চন্দনরাম জয়সোয়াল দেখা করতে এল। বছর পঞ্চাশ বয়স। মাথার চুল কাঁচা আর পাকায় মেশা। মুখখানি ঈষৎ গোল। গায়ের রঙ এককালে ফর্সা ছিল। এখন উড়িষ্যার রোদে-জলে তামাটে বর্ণ হয়েছে। পরনে বকের পালকের মত সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। কপালে জয়টিকার মত মস্ত ফোঁটা।

জয়সোয়াল ঘরে ঢুকেই একগাল হেসে নমস্কার করে বলল, 'রাম রাম মজুমদার সাব।'

অতিবিক্রম মৃদু হেসে বললেন, 'আরে, আসুন আসুন চন্দনরামজি।'

জয়সোয়াল ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবেই ফের প্রশ্ন করল, 'কুছ তকলিফ হয়নি তো?'

'না, না। তকলিফ কীসের? এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটু আগে উঠে চা আর ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি।'

জয়সোয়াল বলল, 'বহুৎ রোজ বাদে উড়িষ্যায় এলেন। ভুবনেশ্বরে অন্তত এক উইক থাকুন।'

'এক উইক? মানে সাতদিন?' অতিবিক্রম ঘোর নাস্তিকের মত মাথা নাড়লেন। বললেন, 'তা হয় না। আমার জামাই আসছে সামনের রবিবারে। এখান থেকেই সে কোণারকে চলে যাবে। তাই ঠিক আছে। সুতরাং তার আগেই আমাদের পৌঁছনো দরকার। সব ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। আর জামাই হল গৃহস্থের সবচেয়ে আদরের অতিথি। তাই কাল কিংবা পরশু সকালেই কোণারকে রওনা হচ্ছি।'

জয়সোয়াল হেসে বলল, 'বেশ, তাহলে ফিরবার সময় এখানে আরো দু'দিন থেকে যাবেন। আপনার দামাদের সঙ্গে ভী পরিচয় হোবে।'

'দেখা যাক। যদি সময় হয়, তাহলে আপত্তি নেই।' অতিবিক্রম সায় দিলেন।

বেয়ারা আর এক প্রস্থ চা দিয়ে গেল। অতিবিক্রম সিগারেট ধরিয়ে চন্দনরাম জয়সোয়ালের

সঙ্গে গল্পে জমে গেলেন। নিজের কথাই বলছিলেন। গত বছর তিনি পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। রিটায়ার করার বছর দেড়েক আগে ডি. আই. জি'র পোস্টে প্রমোশন পান। কিন্তু স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে কাজেকর্মে আর তেমন মন ছিল না।

এখন চাকরি-বাকরি ছেড়ে আর কিছুই করছেন না। বই-টই পড়েন কিংবা এদিক-সেদিক একটু বেড়িয়ে আসেন। নইলে মেয়ের সঙ্গে গল্পগুজব। এমনি করেই তাঁর দিন কাটছে। তবে মেয়ে আর ক'টা দিন কাছে থাকবে? বিলেত থেকে শঙ্কর ফিরে এল। হি ইজ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট বয়। ম্যানেজমেন্ট আর কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ দুটোই পাশ করেছে। এখন ফরিদাবাদে একটা বড় কনসার্নের বিজনেস একজিকিউটিভ। বিদিশাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। তাই জামাইকে তিনি সোজা কোণারকে আসতে লিখেছেন। তারপর সেখান থেকে ওরা দিল্লি চলে যাবে।

জয়সোয়াল শুনে বলল, 'তা মেয়ে চলে গেলে আপনি তো খুব একলা হয়ে পড়বেন মজুমদার সাব।'

'তা একটু হবো।' অতিবিক্রম ম্লান হাসলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবার তো একাই থাকতে হবে। ছেলে আর বউ আবার কোনদিন এদেশে এসে বসবাস করবে বলে মনে হয় না। বালিগঞ্জে বাড়িটা এখন আমি যক্ষের মত একলাই পাহারা দেব।'

জয়সোয়াল হাসল। বলল, 'তাহলে আপনিও দিল্লি চলে যান। মেয়ে-জামাইয়ের কাছে গিয়ে থাকুন। মন ভাল থাকবে, আনন্দ পাবেন।'

'দূর! তাই কখনও হয়?' অতিবিক্রম যেন একটা আজগুবি কল্পনাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন। পরে বললেন, 'বালিগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও নড়ছিনে। সময় ফুরিয়ে এলে ওখানেই দু'চোখ বুজব। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দিল্লি যাব বৈকি। ছুটি পেলে শঙ্কর আর বিদিশাও আসবে। এমনি করেই বাকি দিনগুলি কেটে যাবে জয়সোয়াল।'

পুরোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে পুরাতন দিনের কথাই বেশি আলোচনা হয়। অতিবিক্রম মজুমদারও স্মৃতিচারণার ঢঙে কথা বলছিলেন। বিগত দশ বছরের ভুবনেশ্বরে তিনি অন্তত বার তিনেক এসেছেন। প্রতিবারই অবশ্য অপরাধ এবং তদন্তের সূত্রে। প্রথমবার এসে উঠেছিলেন ভুবনেশ্বর সার্কিট হাউসে। তাঁর সঙ্গে তিনজন ইন্সপেক্টর আর চারজন পুলিশের লোক। তারা এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছড়িয়ে রইল। দ্বিতীয়বার এই শহরে মাত্র একটা রাত্তির কাটিয়ে গেছেন। সামান্য কাজ ছিল। তাই বেশি সময় লাগেনি। তৃতীয়বার তিনি অবশ্য স্বনামে এবং পুলিশের বেশে আসেননি। উজাগর সিং নাম এক পাঞ্জাবির ছদ্মবেশে অপ্সরা হোটেলে এসে উঠেছিলেন। চন্দনরাম জয়সোয়ালকে শুরুতে তিনি নিজের সত্য পরিচয় দেননি। পোশাক আর আচার-ব্যবহার সব মিলিয়ে এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ যে কেউ কণামাত্র সন্দেহ করতে পারেনি। তাছাড়া ভুবনেশ্বর নতুন গড়ে উঠছে। রুজি-রোজগারের ধান্দায় আর নানা কাজে কত লোক সেখানে যাচ্ছে, আসছে। অপ্সরা হোটেলে আরো দুজন পুলিশ অফিসারও ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিল। একজন গুজরাতি মার্চেন্ট, অপরজন এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে। গভীর রাত্তিরে তাঁরা তিনজন মিলিত হতেন। শলাপরামর্শ চলত। শেষ পর্যন্ত অতিবিক্রম মজুমদার ব্যর্থ হননি। ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর সিংকে তিনি গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলেন। অতি গোপনীয় একটা সংবাদের সূত্র ধরে অগ্রসর হতেই কাজ হয়েছিল। পার্ক স্ট্রিটের এক জুয়েলারির দোকান থেকে হিরে চুরির একটা কেসে পুলিশ সুন্দর সিংকে সমস্ত দেশে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। অন্তত তিন-চার লাখ টাকা দামের একটা হিরে। ঘটনার দিন রাত্তিরে সে কলকাতাতেই ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া দোকানের রোলিং শাটার ভেঙে এমন নিখুঁত বার্গলারির হাত সুন্দর সিং ছাড়া আর কজনের আছে? উড়িষ্যায় গ্রেপ্তারের পর আদালতে

মামলা উঠল। সাক্ষ্য প্রমাণের কিছু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তির উপর বিচারক যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। সুন্দর সিংহের ডিফেন্স ধোপে টিকল না। শেষ পর্যন্ত বিচারে তার সাজা হল। তিন বছর জেল।

জয়সোয়াল বল্ল, 'সে একদিন গিয়েছে মজুমদার সাব। আপনি কিন্তু খুব রিস্ক নিয়ে ফেলেছিলেন। বাগে পেলে সুন্দর সিং আপনাকে ছাড়ত না। রিভলবারের গুলিতেই খতম করে দিত।'

অতিবিক্রম মজুমদার হাসলেন। বললেন, 'ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছিল। তাছাড়া মৃত্যু একবারই জীবনে আসে। সেদিন কেউ তাকে রুখতে পারে না।'

জয়সোয়াল কৌতূহলী দৃষ্টিতে শুধোল, 'সুন্দর সিংহের খবর এখন রাখেন মজুমদার সাব?'

'না।' অতিবিক্রম মাথা নাড়লেন। 'তবে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে জানি। বিদিশার বিয়ের দিন সকালে হঠাৎ টেলিফোন করেছিল। ব্যস, এই পর্যন্ত তারপর আর কোন খবর পাইনি। তাছাড়া আমিও তো পুলিশের চাকরিতে নেই। চোর-ডাকু খবর কোথায় পাব?'

জয়সোয়াল বলল, 'সুন্দর সিং কিন্তু কয়েকবার এখানে এসেছে।'

—'তাই নাকি? এই অপ্সরা হোটেলে?' অতিবিক্রম সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। বললেন,—'শেষ কতদিন আগে এসেছিল?'

—'তা প্রায় মাসখানেক হবে।' জয়সোয়ালকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাল। বলল,—'দু-রাত্তির ছিল। কাঁহা কাঁহা সব জায়গায় ঘুরত, ফিরত। ফের সকালেই চলে গেল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ডাকু-বদমাশ লোক। না বলতেও সাহস হয় না। আবার হোটেলে থাকলে ভয়ে বুক কাঁপে। কী ফ্যাসাদ বলুন তো?'

অতিবিক্রম একটু চিন্তা করে শুধোলেন,—'কিন্তু সুন্দর সিং আর চুরি ডাকাতি করেছে বলে শুনিনি।'

জয়সোয়াল উত্তর দিল,—'ওসব কথা আপনারা ভাল জানেন মজুমদার সাব। তবে আমাকে বলেছে এখন ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করে।' ফের চোখ টিপে সে বলল,—'বাজারে কিন্তু অন্যরকম খবর পাই।'

—'কী খবর?' অতিবিক্রম কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন।

জয়সোয়াল ফিসফিস করে বলল,—'সব ঝুট বাত। তলে তলে শালা স্মাগলিংয়ের কারবার চালাচ্ছে।'

অতিবিক্রম মৃদু হাসলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে জয়সোয়াল ফের চাপা গলায় বলল,—'জগদীশ্বর পাণিগ্রহী মারা গেছে শুনেছেন?'

—'জগদীশ্বর মারা গেছে?' অতিবিক্রম জিজ্ঞাসু হলেন। 'কতদিন আগে?'

তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে জয়সোয়াল ফিসফিস করে কী সব সংবাদ জানাল।

শুনে অতিবিক্রম রীতিমত গম্ভীর হলেন। মনে হল উড়িষ্যায় না এলেই ভালো করতেন। কাজটা বোধহয় বুদ্ধিমানের মত হয়নি।

বিদিশা জামাকাপড় পরে সেজেগুজে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল,—'বাবা, আমি একটু বেড়িয়ে আসি। তোমরা গল্প করো।'

অতিবিক্রম বললেন, 'কোথায় যাবি? এখানে তো পথঘাট তুই কিছুই চিনিস নে।'

—'আহা! নাই বা চিনলাম।' বিদিশা যেন আবদার করল। বলল—'আমি তো আর কচি খুকি নই যে রাস্তায় বেরিয়ে হারিয়ে যাব।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অতিবিক্রম নরম হলেন। বিয়ের পর বিদিশা ঠিক ওর মায়ের মত দেখতে হয়েছে। অবিকল সুনয়নী। ওর বয়সে স্ত্রীকে ঠিক এমনি দেখতে লাগত। অতিবিক্রমের মনে হল অনেকদিন আগেকার এক বিস্মৃত অতীতের ছবি দেখছেন তিনি।

পরনে একটা টিয়া পাখি রঙের শাড়ি। কপালে টিপ। মুখে ঈষৎ প্রসাধন। ভ্যানিটি ব্যাগটা একবার। শূন্যে দুলিয়ে সে মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিন

ভুবনেশ্বরে রাজপথ প্রশস্ত।

নতুন রাজধানী। বেশ সাজানো গোছানোর শহর। সবে গড়ে উঠছে, এখনও নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। কলকাতার মত ঘিঞ্জি বস্তি বিরল। আবার পার্ক স্ট্রিট, ব্র্যাবোর্ন রোডের মত দু'পাশে সার বেঁধে বহুতল সৌধশ্রেণিও দাঁড়িয়ে নেই। তবু অনেক ঘরবাড়ি পথের ধারে। মাঝখানে বেশ ফাঁকা জায়গা। রিকশায় করে যেতে যেতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নবনির্মিত সুরম্য ভবনটি বিদিশার চোখে পড়ল।

এখনও তেমন বেলা হয় নি। ঘড়িতে সওয়া ন'টা বাজে। তাই অফিসযাত্রীদের সংখ্যা বেশ কম। অবশ্য যাদের কর্মস্থল একটু দূরে, তারা বেরিয়েছে। কেই সাইকেলে আরোহী, কেউ বা বাসে। কারো অফিসটাইম সাড়ে ন'টা থেকে শুরু। তারাও যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এখানে বেশ ঠাণ্ডা। রোদ নিরুত্তাপ, খোলস-খসা সাপের মত নির্জীব। রিকশায় বসে চোখে-মুখে হাওয়া লাগছিল। শীতের হাওয়া, চামড়া ফাটবে। বিদিশা ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে একটা নরম ক্রিম বের করে গালে এবং ঠোঁটের ওপর ঘষে নিল। সাইকেল রিকশটি নতুন। চালকটিরও বয়স কম। প্যাডল করে বেশ দ্রুতগতিতে সে রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় মিনিট পনেরো পরে রিক্সা এসে একটা সুসজ্জিত বাজারের সামনে দাঁড়াল।

দোকানপাট সবে খুলেছে। এখনও দু'একজনের দরজায় তালা। খরিদ্দারের আনাগোনা শুরু হয়েছে, তবে ভিড় নেই। হেজিপেজি নয়, দেখেশুনে বিদিশার মনে হল, এটা কোন সম্ভ্রান্ত মার্কেট। বেশ কিছু ট্যুরিস্ট—তাদের মধ্যে ভারতের নানা রাজ্যের মানুষ আছে। সোনালি চুলের সাহেব-মেমও দোকানে ঘুরছে। কারো কাঁধে ক্যামেরা। কেউ দিব্যি ঝাড়া হাত-পা, এদিকে সেদিকে লক্ষ্য করতে করতে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে বিদিশা বাজারে প্রবেশ করল। শহরের এটা কোন সুপারমার্কেট কিনা, তাই বা কে জানে? হরেকরকম দোকান—মেয়েদের শাড়ি, ছেলেদের শার্ট-পান্ট, ছিটকাপড়। সূক্ষ্ম ফিলিগ্রি কাজ করা রুপোর অলঙ্কার। আরো কত সামগ্রী। উড়িষ্যার শিঙের কাজের নানা বিচিত্র বস্তু। বেড়াতে বেড়াতে বিদিশা একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকল। মনপসন্দ কটকী শাড়ি পেলে সে হয়তো কিনতে পারে। মাঝে মাঝে তার কটকী শাড়ি কেনার ইচ্ছে হয়। ভুবনেশ্বরে যখন এসেছে, তখন সেই বাসনাটুকু অপূর্ণ থাকবে কেন?

তার পাশে দাঁড়িয়ে একজোড়া সাহেব-মেমও শাড়ি দেখছিল। কোনো দেশের মানুষ ওরা কে জানে? আমেরিকান অথবা ইংরেজও হতে পারে। সাহেবের বয়স বছর ত্রিশের মধ্যে, ভদ্রমহিলার আরো কম। গায়ে আকাশী নীল রঙের ওভারকোট। হাঁটু পর্যন্ত মোজা, পায়ে হাই-হিল জুতো। একটা সবুজ রঙের শাড়ির ওপর ঝুঁকে পড়ে মেমসাহেব মনোযোগসহকারে ডিজাইন দেখছিলেন। বিদিশা একবার ভাবল, শাড়ি নিয়ে ওরা কী করবে? হয়তো কোনো ভারতীয় বন্ধুকে

প্রেজেন্ট করতে পারে। কিংবা মেমসাহেব বোধ হয় নিজেই বিলিতি পোশাক ছেড়ে এবার শাড়ি পরতে শিখবে।

বিদিশার হঠাৎ মনে হল সে যখন শাড়ির দোকানে ঢুকল, তখন উল্টোদিকের একটা ভ্যারাইটি শপের সামনে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। লোকটির চেহারা ঠিক সাধারণ নয়। একটু অদ্ভুত বলা যায়। মাথায় ঈষৎ পিঙ্গল কেশ প্রায় ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। কপালের বাঁ দিকে একটা ছোট পেয়ারার সাইজের টিউমার। পরনে কাউবয় প্যান্ট আর ঊর্ধ্বাঙ্গে স্কিন, জ্যাকেট। পায়ে ছুঁচালো জুতো। বয়স চল্লিশের মত। রোদপোড়া তামাটে বর্ণ। মনে হয়, বোম্বাই অথবা পশ্চিম ভারতের লোক। মুখে একটা সিগারেট চেপে ধরে সে ভ্যারাইটি শপের নানা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছে। আবার মাঝে মাঝে শাড়ির দোকানের ওই বিদেশি দম্পতির দিকে লক্ষ্য রাখছে। বিদিশা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল। লোকটি তেমনি দাঁড়িয়ে। তার বোধ হয় ভ্যারাইটি শপের কেনাকাটা শেষ। তবু সে চলে যায়নি। তেমনি মুখে সিগারেট চেপে ধরে একদৃষ্টিতে ওই সাহেব মেমের দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর। তবু বিদিশা ভাবল হয়তো কোনো কারণ থাকবে। এখনও হতে পারে, এটা সাধারণ কৌতূহল। সাহেব-মেম দোকানে শাড়ি কিনছে, লোকটা দাঁড়িয়ে তাই লক্ষ্য করছে। কিংবা হয়তো ওই সাহেবের সঙ্গে লোকটির বিশেষ কোনো দরকার আছে। দোকান থেকে বিদেশি দম্পতি বেরিয়ে এলেই সে প্রয়োজনীয় কথা বলবে। বিদিশার একটা কাপড় পছন্দ হয়েছিল। ময়ূরকণ্ঠী রঙের ভারি সুন্দর শাড়ি। তবু মেয়েদের মন। ইচ্ছে করছিল আরো দু'পাঁচখানা একটু নেড়েচেড়ে দেখবে। তারপর কিনলেই হয়। কিন্তু দোকানের সামনে মানুষটা ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে। ওর মনে অন্য কোনো মতলব আছে কি না, তাই বা কে বলতে পারে? সে দাম মিটিয়ে শাড়ির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। লোকটা তেমনি সাহেব-মেমকে লক্ষ্য করছে। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে চোখ নামিয়ে ফের অন্য দিকে তাকাল। বিদিশা একটুও বিলম্ব না করে শাড়ির প্যাকেট হাতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল।

বাজার থেকে বেরিয়ে বিদিশা আবার রিকশা নেবে ভাবল। এখন অপ্সরা হোটেলে ফিরে গেলেই হয়। বাজারের মধ্যে এমনি একা ঘুরে বেড়াতে তার একটুও ভাল লাগছে না। কেমন অস্বস্তি, মনে হয় অনেকেই যেন তাকে লক্ষ্য করছে। অথচ সূক্ষ্ম ফিলিগ্রির কাজ করা রুপোর অলঙ্কারের দোকানে একবার যেতে তার ভারি ইচ্ছে করছিল। তা এখন থাক। বরং বিকেলবেলা বাবার সঙ্গে এসে কেনাকাটা সারলেই হবে।

রাজপথের ওপর শীতের উজ্জ্বল অথচ নরম রৌদ্র ছড়িয়ে। রিকশা স্ট্যান্ডটা সামান্য দূরে। একটু হেঁটে যেতে হয়। মাঝে মাঝে বাস, প্রাইভেট কার এবং মোটর সাইকেল পাশ দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। পথঘাট বেশ ফাঁকা। তাই সব গাড়ি দ্রুতগতিতে চলে।

রিকশাস্ট্যান্ডে এসে বিদিশা বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য! ভুবনেশ্বরে এ কার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে যাকে সে এখন দেখতে পাচ্ছে, সেই মানুষটাই তো? না ঠিক তারই মত দেখতে অন্য কেউ? ভাল করে একবার তাকিয়ে বিদিশা নিঃসংশয় হল। কী অদ্ভুত কাণ্ড! অথচ গতকাল রাত্তিরে ট্রেনে আসবার সময় বিদিশা কী স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে, ভুবনেশ্বরে সকালবেলাতেই প্রশান্তর সঙ্গে তার দেখা হবে? সেই প্রশান্ত। ভারি মিষ্টি চেহারা। বড় বড় স্বপ্নালু চোখ। একমাথা কালো চুল। কানের পাশ দিয়ে নেমে আসা অবিন্যস্ত কেশ বাঁ হাতের করতলের সাহায্যে সে পিছনে ঠেলে দিত।

সিক্সথ ইয়ারের মাঝামাঝি প্রশান্তর সঙ্গে তার হঠাৎ একদিন আলাপ হল।

আশুতোষ বিল্ডিংয়ের করিডোরে বিদিশা হেঁটে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে জয়তীর সঙ্গে দেখা।

তার বন্ধু জয়তী চ্যাটার্জি। ইতিহাসের ছাত্রী। সে আর প্রশান্ত সম্ভবত পড়াশুনোর আলোচনা করছিল। তাকে দেখে জয়তী একগাল হেসে বলল, 'এই, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

বিদিশা কাছে যেতেই ভদ্রতা করে সে পরিচয় করিয়ে দিল, 'হি ইজ প্রশান্ত বসু। সাবজেক্ট হিস্ট্রি। দারুণ ভাল ছেলে। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস। এবার এম. এ. তেও প্রথম শ্রেণি সিওর।'

বিদিশা মিষ্টি হেসে বলল, 'নিশ্চয়। আমি অ্যাডভান্স কনগ্র্যাচুলেশনস্ জানাচ্ছি।'

প্রশান্ত লজ্জিত মুখে প্রতিবাদ করল, 'কী যে বলেন। রেজাল্টের কথা কখনও বলা যায়?'

জয়তী বলল, 'থাক মশায়। আপনাকে আর বিনয়ের অবতার সাজতে হবে না। ক্লাসশুদ্ধ সবাই জানে, প্রশান্ত বসু এবার ফার্স্ট ক্লাস কেন, এম-তে ফার্স্টও হতে পারে।'

দিন সাতেক পরে ইউনিভার্সিটি পোস্ট অফিসের সামনে প্রশান্তর সঙ্গে তার আবার দেখা হল। ঘড়িতে তিনটে বাজে। আশ্বিনের আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে। তাই পথের ওপর ঘন ছায়া।

চোখাচোখি হতেই প্রশান্ত বলল, 'কোথায়?'

বিদিশা উত্তর দিল, 'আজ আর ক্লাস নেই। তাই বাড়ি যাচ্ছি।

'কোনদিকে থাকেন আপনি?' প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল।

'সাউথে। মানে বালিগঞ্জে—সুরেন ঠাকুর রোডে।' বিদিশা অবশেষে প্রাঞ্জল হল।

'আমিও সাউথে যাব। চলুন, তাহলে একসঙ্গে যাই।' প্রশান্ত অনায়াসে বলল।

অন্য কেউ হলে বিদিশা নিশ্চয় কিছু ভাবত। মনে হত ছেলেটা ভীষণ গায়ে পড়া। কবে একদিন মাত্র একটুখানি আলাপ। সেই সূত্রে আজ একসঙ্গে বালিগঞ্জে যেতে চায়। কে জানে, পথের মধ্যে হয়তো বলবে, চলুন আপনার বাড়িটা দেখে আসি। কিন্তু প্রশান্তর কথা বলার ভঙ্গিটা এত সহজ ও সরল যে তেমন একটা সন্দেহ মুহূর্তের জন্য বিদিশার মনে রেখাপাত করল না।

গল্প করতে করতে দুজনে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত হাঁটল। ক্রসিংয়ের পাশেই বাসস্টপ। একটা দোতলা বাস এসে দাঁড়াতেই ওরা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেল। সামনের দিকে একটা খালি আসন ছিল। কয়েক পা এগিয়ে পাশাপাশি সেখানেই বসল।

বিদিশা ইংরেজি নিয়ে পড়ছে শুনে প্রশান্ত বলল, 'জানেন, লিটারেচার আমার খুব ভাল লাগে।'

'তাহলে লিটারেচার নিয়ে এম.এ পড়লেন না কেন?' বিদিশা প্রশ্ন করল।

প্রশান্ত কী উত্তর দেবে তাই বোধ হয় চিন্তা করল। পরে হেসে বলল, 'আসলে কী জানেন? ইতিহাসও খুব প্রিয় সাবজেক্ট।'

বিদিশা বলল, 'বালিগঞ্জে আপনি কোথায় যাবেন?'

'সুইন হো স্ট্রিটে। এক বন্ধুর কাছে।'

'বন্ধু?'

'বন্ধু মানে, আমাদের গ্রামের ছেলে।' প্রশান্ত হাসল।

'গ্রামের ছেলে?' বিদিশা কৌতূহলী চোখে তাকাল। শুধোল, 'আপনার গ্রাম কোথায়?'

'এখান থেকে অনেক দূরে। বীরভূম জেলার রামপুরহাট সাবডিভিশনে।' প্রশান্ত একমুহূর্ত থামল। ফের বলল, 'নলহাটি স্টেশনে নেমে যেতে হয়। পাক্কা ছ'মাইল রাস্তা। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কিন্তু খুব কষ্ট।'

বিদিশা বলল, 'তাহলে এখানে আপনি কোথায় থাকেন? হোস্টেলে?'

'না, না।' প্রশান্ত মাথা নাড়ল। বলল, 'আমি এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকি। সিঁথির মোড়ের কাছে। সে জায়গাটাও খুব সুবিধের নয়। রাত্তিরে মশা আর ইঁদুরের ভীষণ উপদ্রব।'

'ওমা! তাহলে আপনার পড়াশুনো হবে কেমন করে? ফাইন্যাল পরীক্ষার তো বেশি দেরি নেই।'

'উপায় কী বলুন? ওরই মধ্যে করে নিতে হবে।' মৃদু হেসে সে আবার বলল, 'এখন আর তেমন অসুবিধে মনে হয় না। ইঁদুরের সঙ্গে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিয়েছি। কিন্তু মশার কামড় মাঝে মাঝে বড় অসহ্য লাগে। তখন মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ি।'

খুব খোলামেলা আর নিঃসঙ্কোচ কথাবার্তা। এতটুকু গোপন করবার চেষ্টা নেই। অথচ সহপাঠিনীর কাছে নিজের দীনতা কেউ এত সহজে প্রকাশ করে না। বিদিশার একটু আশ্চর্য লাগল। প্রশান্তর মুখের দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে রইল।

জীবনে সেই প্রথম তার মনের অদৃশ্য তারে একজন অনাত্মীয় যুবকের জন্য ব্যথার বেহাগ বেজে উঠল।

সুইন হো স্ট্রিটে নেমে যাওয়ার আগে প্রশান্ত হঠাৎ বলল,—'আপনি তো খুব মডার্ন, মানে আধুনিকা। তাই না?'

বিদিশা মুচকি হাসল। 'আমাকে বুঝি সে রকম মনে হয়?'

মৃদু হেসে প্রশান্ত যেন উত্তরটা এড়িয়ে তার নিজের বক্তব্যে পৌঁছে গেল। বলল,—'আপনি আধুনিকা হলেও আপনার নামটা কিন্তু বেশ প্রাচীন।'

—'কী রকম?' বিদিশা ঠোঁট টিপে সুন্দর ভ্রূ ভঙ্গি করল।

প্রশান্ত বলল,—'কয়েক 'শ বছর আগে মালবদেশে বিদিশা নামে এক সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। তার সুরম্য সৌধশ্রেণি, প্রশস্ত রাজপথ, পথ পার্শ্বে বৃক্ষরাজি, সুবেশ নাগরিক এবং সুন্দরী নগর-নন্দিনীদের কলহাস্য রাজধানীকে প্রাণবন্ত এবং চঞ্চল করে রাখত। এখন অবশ্য সেই অতীত গৌরবের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মহাকালের রথের চাকায় আরো অনেক প্রাচীন নগরীর মত বিদিশাও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

উত্তরে বিদিশা যেন কী বলতে চাইল। কিন্তু বাসের গতি শ্লথ, স্টপেজ এসে পড়তেই প্রশান্ত তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

নগরী বিদিশা মহাকালের বীথিপথের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হলেও কলকাতায় বিদিশার জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

ধীরে ধীরে প্রশান্তর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। মাইকে ভেসে যাওয়া একটি মিষ্টি গানের সুরের মত তাদের পরিচয় বহুদূর ছড়িয়ে গেল। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস পেরিয়ে, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের সিঁড়ি বেয়ে নেমে তারা বহুদূরে গঙ্গাতীরে ম্যান-অফ-ওয়ার জেটিতে দীর্ঘ সময় বসে রইল। সেদিন প্রশান্ত একটা ছেলেমানুষি কাণ্ড করল। কাছেই একজন লোক যুঁইফুলের মালা বেচছিল। একটা মালা কিনে প্রায় খেলাচ্ছলেই সেটি বিদিশার গলায় পরিয়ে দিল।

সরোষে বিদিশা বলল,—'এটা কী হ'ল? চারপাশে লোক তাকিয়ে দেখছে না?'

'—দেখলেই বা।' প্রশান্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল। ফের হেসে বলল,—'হয়তো একটু মজা পাবে, তাই না?'

সংবাদটা আর চাপা ছিল না। এমন মিষ্টি রোমান্সের খবর কখনও গোপন থাকে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মহলে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। ইংরেজির ছাত্রী বিদিশা মজুমদার ইতিহাসের ছাত্র প্রশান্ত বসুকে বাকদান করেছে। এদের ভালবাসা গভীর, রক্তের মত গাঢ়। এম.এ. পরীক্ষা শেষ হলেই দুজনে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করবে। ক্লাসের বাইরে সর্বত্রই ওদের নিয়ে গালগল্প আর সরস আলোচনা। তার বন্ধু জয়তী একদিন দেখা হতেই বলল, 'কী সাংঘাতিক মেয়ে তুই বিদিশা! তলে তলে এত? অন্তত আমাকে একদিন গল্প করতে পারতিস। আফটার অল প্রশান্তর সঙ্গে আমিই তোকে প্রথম ইনট্রোডিউস করে দিয়েছিলাম।'

তবু ইউনিভার্সিটির খবর বালিগঞ্জে তার মা-বাবার কানে পৌঁছয়নি। নইলে হয়তো অতিবিক্রম

মজুমদার অনেকদিন আগেই এর বিহিত করতে চেষ্টা করতেন। লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার। কলকাতার অপরাধ জগতের নানা সংবাদ গোপন সূত্র থেকে তাঁর টেবিলে নিঃশব্দে চলে আসে। কিন্তু আশ্চর্য! মেয়ের এই অনুরাগকাহিনীর বিন্দুবিসর্গও তিনি টের পাননি। ব্যাপারটা যখন প্রথম জানতে পারলেন, তার অনেক আগেই বিদিশা এবং প্রশান্তর মন দেওয়া-নেওয়ার পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে।

তাও সংবাদটা প্রথমে অতিবিক্রম পাননি। পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনয়নী দেবী। গড়িয়াহাটাতে বাজার করতে গিয়ে বিদিশার এক বন্ধুর মায়ের সঙ্গে দেখা। সেই ভদ্রমহিলা একথা সেকথার পর হঠাৎ যেন গল্পচ্ছলে খবরটা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। শেষে আবার পরিহাস করে বললেন, 'আপনার মেয়ের ভাগ্য ভাল দিদি। শুনেছি, ছেলেটি রত্ন।'

রাগে সুনয়নীর গা জ্বলছিল। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করেননি। কেনাকাটা শেষ হতেই গাড়িতে চেপে সোজা বাড়ি ফিরে এলেন। বিদিশা তার নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে কী একটা পত্রিকার পাতা উল্টোছিল। সুনয়নী তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, রত্নটি কে?'

'রত্ন?' বিদিশা ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

'ন্যাকামি রাখ।' সুনয়নী এবার ধমকে উঠলেন। বললেন, 'ইউনিভার্সিটিতে যে ছেলেটির সঙ্গে তোর ভাব, যার সঙ্গে তুই ঘোরাফেরা করিস—আমি তার কথা জানতে চাইছি।'

বিদিশা সলজ্জ হাসল। 'তুমি প্রশান্তর কথা জিজ্ঞাসা করছ মা?' একটু থেমে সে আবার বলল, 'ওর কথা কার কাছ থেকে শুনলে?'

সুনয়নী আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'পাড়া-পড়শীর মুখ থেকে মা। নইলে তোমার পিরিতের কাহিনি আমরা জানব কেমন করে?'

বিদিশা চুপ করে রইল। কোনো উত্তর দিল না।

সুনয়নী নীরস গলায় প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেটির নাম কী?'

মায়ের দিকে না তাকিয়েই বিদিশা উত্তর দিল, 'ওর নাম প্রশান্ত—প্রশান্ত বসু।'

'এখানে কোথায় বাড়ি?'

বিদিশা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এখানে বাড়ি নয়। ওদের বাড়ি গ্রামে। শুনেছি, নলহাটি স্টেশনে নেমে যেতে হয়। ছ' মাইল রাস্তা...'

'গ্রামে বাড়ি? ইস্টিশান থেকে ছ' মাইল দূর? ও বাবা!' সুনয়নী যেন হতাশ বোধ করলেন। ফের মেয়েকে শুধোলেন, 'তাহলে এখানে থাকে কোথায়? হোস্টেলে?'

'না। ওর এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। সিঁথির মোড়ের কাছে।'

'বুঝেছি।' সুনয়নী মুখ কুঁচকে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বললেন, 'এই ছেলের সঙ্গে তোর ভাব-ভালবাসা? একে তুই বিয়ে করবি ভেবেছিস?'

বিদিশা ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল, 'বিয়ে করলে দোষ কী?'

মেয়ে বড় হয়েছে। অনর্থক রাগারাগি করে লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত যদি বিয়ে করব বলে গোঁ ধরে বসে? আজকালকার মেয়েদের বিশ্বাস আছে? তাই সুনয়নী নরম গলায় বললেন, 'দোষ-গুণের কথা তুই বুঝবি কেমন করে? তোর কী এখন মাথার ঠিক আছে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে মায়ের মমতা ঝরে পড়ল। ফের হেসে বললেন, 'আচ্ছা, ওর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবি? কখনও একটা রাত্তির গ্রামে কাটিয়েছিস?'

বিদিশা কিছু বলবার আগেই সুনয়নী তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। বললেন, 'ভেবে চিন্তে কাজ করিস মা। নইলে সমস্ত জীবন একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পুরুষমানুষের কথা ছেড়ে দে। কিন্তু মেয়েদের কাছে বিয়ে একটা ছেলেখেলা নয়। আর প্রেম-ভালবাসা যাই

বল, ওসব অল্প বয়সের নেশা। দু'দিনের জন্য ভাল। চিরদিনের করতে গেলেই যন্ত্রণা। তাছাড়া এই বিয়েতে তোর বাবা কোনোদিন রাজি হবেন না।'

'কেন রাজি হবে না?' বিদিশা উকিলের মত যুক্তিজাল রচনা করল। 'প্রশান্ত ভাল ছেলে। এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস সিওর। তোমরা যা চাও, মানে লাইফে সে নিশ্চয় এসট্যাবলিশড্ হবে। তাহলে?' ঈষৎ অনুনয় করে সে আবার বলল,—'তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই বাবা বোধ হয় আপত্তি করবেন না।'

কিন্তু সুনয়নী স্বামীকে ঠিক বুঝেছিলেন। মেয়ের এই প্রেমকাহিনি শুনে অতিবিক্রম মজুমদার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ক্রুদ্ধভাবে স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার ধিঙ্গি মেয়ের এই কীর্তি নাকি? এতদিন সেটা টের পাওনি? কী নজর রাখো তুমি মেয়ের ওপর?'

সুনয়নী রাগ করে জবাব দিলেন, 'আমি কি গোয়েন্দা পুলিশ যে সারাক্ষণ তোমার মেয়ের দিকে নজর রাখব? তাছাড়া কলেজে গিয়ে মেয়ে কোথায় কার সঙ্গে বেড়াবে, তা আমি কেমন করে জানব?'

অতিবিক্রম পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। বিদিশার আর ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সিক্সথ্ ইয়ারের ক্লাস মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। পরীক্ষা সামনে। এখন ঘরে বসে পড়াশুনো করলেই ভাল রেজাল্ট হবে।'

এ বাড়িতে তার বাবা যা বললেন, তাই শেষ কথা। এর নড়চড় নেই। তবু বিদিশা একবার মাকে বলল, 'কিন্তু লাইব্রেরিতে আমার কিছু নোট করা দরকার ছিল।'

শুনে অতিবিক্রম গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, 'খুব প্রয়োজন মনে করলে এক-আধদিন যেতে পার। কিন্তু ট্রাম-বাসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। গাড়িতে করে যাবে। রাস্তায় ড্রাইভার তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। লাইব্রেরির কাজ শেষ হলে আবার গাড়িতে করে ফিরে আসবে।'

হুট করে বেরোনো বন্ধ। প্রশান্তর সঙ্গে অন্তত এক সপ্তাহ দেখা হয়নি। তাই লাইব্রেরি যাওয়ার দিন তিনেক আগে বুদ্ধি করে সে একটা চিঠি দিল। প্রশান্তর ঠিকানায়। লিখল, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আগামী শুক্রবার সেন্ট্রাল লাইব্রেরি হলে দেখা কোরো। বেলা একটা নাগাদ নিশ্চয়ই আমাকে পাবে। খুব জরুরি দরকার, বুঝলে?'

কিন্তু কোথায় প্রশান্ত? সেন্ট্রাল লাইব্রেরি হলে বেলা চারটে পর্যন্ত বিদিশা চুপ করে বসে রইল। সামনে খোলা বইয়ের পাতা সে অন্যমনস্কের মত উল্টে যাচ্ছিল। একটি বর্ণও পড়েনি। একটা লাইনও নোট করেনি। প্রতিমুহূর্তেই আশা করছিল, এখনি প্রশান্ত হলঘরে ঢুকে পিছন থেকে তার নাম ধরে ডাকবে।

খুব চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরে গেল বিদিশা। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত। তাহলে প্রশান্ত কি তার চিঠি পায়নি? কিংবা চিঠি পেয়ে বিদিশার সঙ্গে সে দেখা করতে আসে নি! কিন্তু তাই কখনও হয়? এমন একটা সম্ভাবনাকে সে কিছুতেই আমল দিল না।

পরদিন দুপুরবেলায় সে খুব সন্তর্পণে জয়তীকে ফোন করল। আনন্দ পালিত রোডে জয়তীদের বাড়ি। পাশের ঘরে মা শুয়ে আছে। প্রশান্তর নাম ধরে জোরে কথাবার্তা বললে মা হয়তো উঠে আসতে পারে।

আর ফোন পেয়েই জয়তী বলল, 'কি রে, হঠাৎ ইউনিভার্সিটিতে আসা বন্ধ করে দিলি কেন? বাড়িতে খুব পড়ছিস বুঝি?'

বিদিশা বলল, 'ক্লাস তো প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন শুধু লাইব্রেরিতে যাই। এই তো গতকাল গিয়েছিলাম।'

জয়তী বলল, 'আমাদের ক্লাসও এই সপ্তাহেই শেষ। আর তিন মাস বাদেই পরীক্ষা। আমার

এমন ভয় করছে জানিস?'

বিদিশা মৃদুস্বরে শুধোল, 'হ্যাঁরে, প্রশান্তর খবর কী?'

উত্তরে টেলিফোনের তারে জয়তীর উচ্ছল হাসির রেশ ভেসে এল। বলল, 'তার খবর কী আমি রাখব? আচ্ছা মেয়ে তুই বিদিশা। প্রশান্তর সংবাদ এই কলকাতা শহরে তোর চেয়ে কে বেশি জানবে?'

অন্যসময়ে হলে এই পরিহাসটুকু বিদিশা নিশ্চয় উপভোগ করত। বরং খোঁচা দিয়ে বলত, 'কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে তুই একটু জেলাস।' কিন্তু এখন তার মনের আকাশে ঝড়ের মেঘ। ঈষৎ দুর্বল গলায় সে বলল, 'না, মানে আমি তো কয়েকদিন আর ক্লাসে যাই নি—তাই।'

জয়তী বলল, 'প্রশান্তও আজ চার-পাঁচদিন হল ক্লাসে আসছে না। তা আমি ভাবলাম, দুজনে বোধ হয় যুক্তি করে একই সঙ্গে ডুব দিয়ে পরীক্ষার প্রিপারেশান শুরু করেছিস।'

বিদিশা হঠাৎ বলল, 'প্রশান্তর একটা খোঁজ-খবর নিতে পারবি।'

'প্রশান্তর খোঁজ-খবর?' জয়তী যেন বিস্ময় প্রকাশ করল। 'কী ব্যাপার বল তো?'

'না, মানে তেমন কিছু নয়। এমনি—'

জয়তী একটু চিন্তা করে বলল, 'তা বোধ হয় পারব। ইকনমিকসের দেবাশিস দত্ত আমার বন্ধু। স্কটিশে একসঙ্গে বি-এ পড়েছি। যতদূর জানি, প্রশান্ত ওদের পাড়াতেই থাকে। দেবাশিস নিশ্চয় ওর খবর এনে দিতে পারবে।'

'তাহলে পরশু দুপুরবেলা আমাকে একটা টেলিফোন করবি। মানে, যদি প্রশান্তর খবর পাস, কেমন?'

জয়তী বলল, 'টেলিফোন করবার দরকার কী? তার চেয়ে পরশু দিন তুই ইউনিভার্সিটিতে চলে আয় না। কফি হাউসে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া হবে। আর প্রশান্ত যদি আসে, তার সঙ্গেও তোর দেখা হবে।'

বিদিশা একমুহূর্ত চিন্তা করল। প্রশান্তর সঙ্গে তার এবার একটা আলোচনা হওয়া দরকার আর সেজন্য তাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে। কিন্তু জানতে পারলে মা যদি আপত্তি করে? অনেকক্ষণ পরে বিদিশা বলল, 'বেশ, তাই হবে। মানে, আমি চেষ্টা করব যেতে, কেমন?'

সেদিন জয়তীর সঙ্গে দেখা করবে বলেই বাড়ি থেকে বেরোল বিদিশা। সুনয়নী যথেষ্ট আপত্তি করলেন। মেয়েকে ভয় দেখালেন। একবার কানে গেলে তোর বাবা কিন্তু কুরুক্ষেত্তর করবে। জানিস তো কী রকম রাগীমানুষ। শেষপর্যন্ত আমাকেই দশটা কথা শুনতে হবে।'

কিন্তু বিদিশা তাঁর কথায় ক্ষান্ত হয়নি। সে বলল, 'আমি তো জয়তীর কাছে যাচ্ছি। তোমার অবিশ্বাস হয়, সঙ্গে একজন লোক দিতে পার। বাবা আমাকে শুধু ইউনিভার্সিটিতে যেতে বারণ করেছেন।'

তবু সেদিন বোধ হয় মার কথা শুনলেই ভাল করত বিদিশা। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে যা খবর পেল, তা বোধ হয় সে কল্পনাও করতে পারেনি। প্রশান্ত নাকি কলকাতাতেই নেই।

'তাহলে সে গেছে কোথায়? কবে ফিরবে?' বিদিশা উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল।

জয়তী ভ্রূ কোঁচকাল। বলল, 'শুনলাম, প্রশান্ত নাকি কলকাতা থেকে চলে গেছে।'

'কলকাতা থেকে চলে গেছে? তাই কখনও হতে পারে? ইম্পসিবল।' বিদিশা প্রায় বিতর্কের সূচনা করল।

'কী জানি।' জয়তী বলল, 'বরং তুই একবার দেবাশিসের কাছে চল। সব কথা তার মুখ থেকেই শুনবি।'

দেবাশিস সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। প্রশান্ত তার বইপত্তর, বাক্স-বিছানা, সব কিছু নিয়ে সিঁথির সেই বাড়ি থেকে চলে গেছে। কোথায় গেল, তার আত্মীয় ভদ্রলোকও তা সঠিক

বলতে পারেননি। গ্রামের বাড়িতেও যেতে পারে, কিম্বা অন্য কোনখানে। যার তার অভিরুচি, মন-মর্জি।

সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত। কেমন রহস্য মনে হল বিদিশার। নইলে প্রশান্ত হঠাৎ এভাবে আত্মগোপন করল কেন? নিশ্চয় তার কারণ আছে। কলকাতা শহর থেকে কর্পূরের মত সে অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল। কী হেতু?

শেষ পর্যন্ত এম-এ পরীক্ষা বিদিশার দেওয়া হয়নি। এগজামিনেশনের মাসখানেক আগেই অতিবিক্রম মেয়ের বিয়ের দিন স্থির করলেন। সুনয়নী শুধু একবার আপত্তি জানিয়েছিলেন, 'সামনেই পরীক্ষা। তারপরেই না হয় দিন ঠিক করতে।'

অতিবিক্রম গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, 'এর চেয়ে আগে আর বিয়ের তারিখ নেই। নইলে এই ক'টা দিনও আমি শুভকাজের জন্য দেরি করতাম না।'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুনয়নী আর কথা বলতে সাহস পাননি।

প্রশান্তর সঙ্গে একটি দিনও দেখা হল না। নেপথ্যে কোথায় যেন কী একটা ঘটে গেল। অথচ বিদিশা কোনোদিন ভাবতে পারেনি, প্রশান্ত এমন নিঃশব্দে প্রায় কাপুরুষের মত কলকাতা থেকে পালিয়ে যাবে। আশ্চর্য মানুষ! বিদিশার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে যাবার সাহসটুকু পর্যন্ত তার হ'ল না। ধীরে ধীরে প্রশান্তর কথা সে ভুলেই যাচ্ছিল।

বিয়ের মাস ছয় বাদে জয়তীর সঙ্গে হঠাৎ একদিন এসপ্ল্যানেডে দেখা। শঙ্কর তখন ইংলন্ডে রওনা হয়ে গেছে। পুরানো বন্ধুকে দেখে জয়তী একগাল হেসে বলল,—'কিরে, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটা আর দিলি না?'

—'কেমন করে দিতাম বল?' বিদিশা যেন দুঃখ করল। বলল—'পড়াশুনো করতে কী সময় পেলাম? দেখি যদি সামনের বছর প্রিপারেশন করে দিতে পারি।'

অনেকদিন পরে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ। মেয়েদের মন কথা সরিৎসাগরকেও হার মানায়। কত কাহিনি সেখানে জমা আছে। কথায় কথায় ইউনিভার্সিটির গল্প ফের শুরু হল।

জয়তী হঠাৎ বলল,—'হ্যাঁরে, প্রশান্তর খবর জানিস?'

নামটা শুনেই বিদিশা প্রায় চমকে উঠল। সাগরবেলায় একটা মস্ত ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়লে যেমন গর্জন হয়, তার মনের মধ্যে কোথায় যেন তেমনি একটা কলরোল শুরু হল।

জয়তী বলল,—'প্রশান্ত কিন্তু রেজাল্ট খারাপ করেনি। ঠিক ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আমি যা বলেছিলাম।'

বিদিশা অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করল,—'সে এখন আছে কোথায়? জানিস?'

—'বোধহয় লখনউতে। আমাদের ক্লাসের জয়দীপ বলছিল, সেখানেই কলেজে লেকচারার হয়েছে।' জয়তী হাসল।

চার

সেই প্রশান্ত।

ঠিক তেমনি। বড় বড় স্বপ্নালু চোখ। একমাথা কালো চুল। বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় এখনও সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। ভুবনেশ্বরে এই শীতল সকালে সত্যিই বিদিশার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। হয়তো ভাবছে, এ কি স্বপ্ন, না মায়া!

মুচকি হেসে বিদিশা বলল, 'কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে, এখনও চিনতে পারোনি?'

'চিনতে পারলেও বিশ্বাস করা শক্ত, তাই না?' দু-চার পা এগিয়ে প্রশান্ত তার নিকটবর্তী হল। বলল, 'জানো, একটু আগেও মনে হচ্ছিল, হয়তো তুমি নও। যাকে দেখছি, সে ঠিক তোমার মতই দেখতে আর একজন। এমনও তো হয়, মানে হতে পারে।'

বিদিশা নিজেও কম আশ্চর্য হয়নি। অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রশান্তর সঙ্গে এখানে দেখা হবে, এমন একটা ঘটনা বোধ হয় সে কল্পনাও করতে পারত না। মৃদু হেসে বলল, 'এখন তো বিশ্বাস হল?' একটু থেমে ফের জিজ্ঞাসা করল,—'তারপর, তুমি এখানে কেন? বেড়াতে?'

প্রশান্ত মাথা নাড়ল। 'না, না। আমি ট্যুরিস্ট নই। ভুবনেশ্বরে কাজে এসেছি।'

—'কাজে?'

—হ্যাঁ, তা প্রায় দিন পনেরো হবে। উড়িষ্যার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোণারক থেকে পরশুদিন ভুবনেশ্বরে এসেছিলাম কাল সকালেই আবার কোণারকে ফিরে যাব।'

কোণারকের নাম শুনেই বিদিশার মুখ উজ্জ্বল হল। বলল,—'আমরা তো সেখানেই যাচ্ছি।'

—'তাই নাকি?' প্রশান্ত হাসল। বলল,—'উড়িষ্যায় বেড়াতে এসে কোণারকে অবশ্য যাবে। এমন কারুকার্যময় বিচিত্র স্থাপত্য ভারতবর্ষে খুব কমই আছে।'

কোণারক নিয়ে প্রশান্ত বোধহয় আরো কিছু বলত। কিন্তু হঠাৎ কী মনে হতে তার দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'একটু আগে বলছিলে তোমরা কোণারকে যাচ্ছ। তোমরা মানে সঙ্গে আর কে?'

বিদিশার বোধহয় একটু মজা করবার ইচ্ছে হল। মুচকি হেসে বলল,—'কেন? আমার সঙ্গে যার থাকবার কথা মনে করো তিনিই আছেন।'

প্রশান্ত একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল,—'তুমি কী মিস্টার দত্ত মানে শঙ্করবাবু কথা বলছ? কিন্তু—'

মুহূর্তে বিদিশার ভ্রূকুঞ্চিত হল। মিস্টার দত্ত মানে শঙ্কর দত্ত। তার হাজব্যান্ডের নাম। কিন্তু প্রশান্ত ওই নামটা জানল কেমন করে? তার যখন বিয়ে হয় প্রশান্ত তখন কলকাতাতেই ছিল না পরিণয়কালে পুরানো প্রেমিককে অনেকে কার্ড পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করে কিন্তু বিদিশা তা করে নি। তাহলে?

ব্যাপারটা সে তলিয়ে চিন্তা করল। তার স্বামীর নামটা প্রশান্ত হয়তো অন্য কারো কাছ থেকে জেনেছে। এম. এ. পরীক্ষা দিতে সে কলকাতাতেই এসেছিল। তখন জয়তী এবং আরো অনেকের সঙ্গে নিশ্চয় কথাবার্তা হয়েছে। তার বিয়েতে শুধু জয়তী নয়, বেশ কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল। হয়তো তারাই কেউ শঙ্করের নাম-ধাম, পরিচয়-বৃত্তান্ত প্রশান্তর কাছে ফলাও করে গল্প করে থাকবে।

কিন্তু প্রশান্ত কী যেন আকাশ-পাতাল ভাবছে। অপাঙ্গে তাই লক্ষ্য করে বিদিশা হেসে বলল, —'তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম। মিস্টার দত্ত এখন দিল্লিতে।'

—'দিল্লিতে? তাহলে তুমি এখানে কেমন করে এলে?'

বিদিশা প্রায় কটাক্ষ করে বলল,—'সে অনেক কথা। শুনলে তুমি নিশ্চয় হাসবে।'

—'কী রকম?'

বিদিশা বলল,—'আমাদের বিয়ের চারমাস পরেই উনি ইংলন্ডে পড়তে গেলেন।'

—'কী পড়তে?' প্রশান্ত মৃদু হাসল।

বিদিশা উত্তর দিল,—'ম্যানেজমেন্ট আর কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি। কিন্তু শুধু ও দুটো নয়, ওখানে থাকতে উনি কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের মত কঠিন পরীক্ষাতেও পাশ করেছেন।'

প্রশান্ত ভ্রূ কুঁচকে শুধোল,—'মিস্টার দত্ত কতদিন হল ফিরেছেন?'

'এই তো লাস্ট উইকে। এখনও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি।' বিদিশা সলজ্জ হাসল। বলল, 'লন্ডন

থেকেই উনি চাকরি নিয়ে এসেছেন। ফরিদাবাদে একটা কোম্পানিতে সিনিয়র এগজিকিউটিভ। ফরেন কোলাবোরেশন। চাকরিতে জয়েন করে এই উইক-এন্ডের কয়েকদিন ছুটি নিয়ে উনি আসছেন!'

'তাই নাকি? দেন ইট ইজ এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ।'

বিদিশা বলল, 'কলকাতাতেই আসবার কথা। কিন্তু বাবার খেয়াল। জামাইকে লিখে দিলেন, কোণারকে চলে এস। ওখানে তোমাকে রিসিভ করব। আচ্ছা বলো, একথা শুনলে লোকে হাসবে না?'

প্রশান্তর হঠাৎ ভাবান্তর হল। ঈষৎ চিন্তিত মুখে সে বলল, 'তোমার বাবা, মানে মিস্টার মজুমদার এখন কোথায়?'

'কোথায় আবার? এখানে, মানে ভুবনেশ্বরেই আছেন। আজ ভোরের এক্সপ্রেসেই আমরা নামলাম।'

'তাই নাকি? উঠেছ কোথায়?'

'অপ্সরা হোটেলে।' বিদিশা চোখ নাচিয়ে বলল, 'সকালবেলায় বাবা হোটেলের মালিক মিস্টার জয়সোয়ালের সঙ্গে গল্পে জমে গেছেন। সেই ফাঁকে আমি বেরিয়ে পড়লাম।'

'খুব ভাল করেছ। নইলে তোমার সঙ্গে দেখা হত? কী বলো?' প্রশান্ত শুধোল।

—'তা ঠিক।' বলেই বিদিশা কেমন অদ্ভুত হাসল। প্রশান্ত হঠাৎ প্রস্তাব করল,—'এই, লিঙ্গরাজের মন্দির দেখতে যাবে? বেশি দূরে নয়, কাছেই।'

বিদিশা চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাল। আশ্চর্য! এই লোকটাকেই সে একদিন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বিদিশার মনে হল, প্রশান্ত যেন একটুও বদলায়নি! সেই ইউনির্ভাসিটিতে পড়বার সময় ক্লাস থেকে পালিয়ে ঠিক এমনি হঠাৎ কোথাও যেতে চাইত। কোনোদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, কোনোদিন গঙ্গার ধারে,—একদিন দুপুরবেলায় দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকো ভাড়া করে বেলুড় মঠে বেড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর? একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা শহর থেকে কর্পূরের মত কোথায় মিলিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বিদিশার সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন মনে করেনি। আর এতদিন পরে ভুবনেশ্বরে মুখোমুখি হতেই কেমন নির্লজ্জের মত মিষ্টি সুরে তাকে লিঙ্গরাজের মন্দিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু তারপর কতদিন কেটে গেছে। পৃথিবীতে কত কী ঘটে গেল। বিদিশার ঘন কালো চুলের সিঁথিতে একজন পুরুষমানুষ টকটকে লাল সিঁদুর পরিয়ে দিল। জলজ্যান্ত সেই চিহ্নটা প্রশান্ত তো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে। তাহলে?

ধীরে ধীরে সে বলল, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব?'

প্রশ্ন? প্রশান্ত কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। কপালে রেখা পড়ল। প্রশ্নটা যেমন হোক, তার উত্তরটা যে আরো কঠিন, বিদিশার চোখের দিকে তাকিয়েই প্রশান্ত সেটা আন্দাজ করতে পারল। ঈষৎ হেসে বলল, 'প্রশ্নটা এখন থাক না, বিদিশা। পরে না হয় শুনব।'

তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদিশা বলল, 'তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ?"

'না।' প্রশান্ত ম্লান হাসল। বলল, 'এড়িয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'তাহলে?'

প্রশান্ত বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আসলে কী জানো? মনের মধ্যে এত কথা জমে আছে, তার কোনটা ফেলে কোনটা বলি তাই এখন ভেবে পাচ্ছি না।' একটু থেমে বিদিশার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, প্রশ্ন কী আমারও দু-একটা থাকতে পারে না বিদিশা?'

'না পারে না।' বিদিশা প্রায় প্রতিবাদ জানাল।

'কেন?'

'কারণ প্রশ্ন করবার অধিকার তোমার নেই।' বিদিশা যেন কথাটা ছুড়ে মারল। ফের ঈষৎ বাঁকা হেসে বলল, 'আসলে তুমি ভীরু প্রশান্ত। এতটুকু সাহস বলতে নেই। তাই অমন নিঃশব্দে সেদিন কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করো নি।'

'আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম?'

'তাছাড়া আবার কী?' বিদিশা যেন ব্যঙ্গ করল। 'হঠাৎ কলকাতা থেকে কোথায় চলে গেলে এই খবরটা পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধব কাউকে জানাওনি। পাছে আমি আবার খোঁজ পেয়ে যাই।'

প্রশান্ত ম্লান হেসে বলল, 'আমি কী অবস্থায় চলে গিয়েছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই তা জানো না। যাওয়ার আগে কারো সঙ্গে দেখা করবার সময়ও ছিল না। তবু তোমাদের বাড়ির ঠিকানায় আমি দুবার ফোন করেছিলাম। কিন্তু টেলিফোন ধরে যিনি কথা বললেন, তার সেই এক উত্তর। বিদিশা বাড়িতে নেই। কলকাতার বাইরে গেছে।'

'কলকাতার বাইরে? কী বলছ তুমি?' বিদিশা বিস্ময়ে চোখ দুটি আরো বড় করল। বলল, 'আমি তখন বাড়ির বাইরেই পা দিতাম না।'

প্রশান্ত আরো জানাল, 'কলকাতা ছেড়ে চলে আসার দিন চার-পাঁচ পরেই তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। দিন পনেরো বাদে আবার চিঠি দিলাম। তারও জবাব এল না।'

শুনে বিদিশার মুখ-চোখের চেহারা পাল্টে পেল। নরম গলায় সে বলল, 'বিশ্বাস করো প্রশান্ত, তোমার কোনো চিঠি আসে নি। বরং দিন কয়েক পরে সেই সিঁথির ঠিকানায় তোমাকে চিঠি পাঠালাম। লিখলাম, অতি অবশ্য লাইব্রেরিতে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবে। সেদিন মা কত বারণ করেছিলেন যেতে। কিন্তু তাঁর কোন কথা আমি শুনিনি।' ঢোক গিলে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বিদিশা ফের বলল, 'জানো, আশায় বুক বেঁধে সেদিন লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। শুধু তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব বলে। কিন্তু কার দেখা পাব? তুমি তখন কলকাতাতেই নেই। শেষ পর্যন্ত জয়তী আমাকে দেবাশিসবাবুর কাছে নিয়ে গেল। উনি সিঁথির ঠিকানায় নিজে খোঁজ করেছেন। বললেন, তুমি নাকি বইপত্তর, বাক্স-বিছানা সব কিছু নিয়ে কোনখানে চলে গেছ। আর আশ্চর্য মানুষ তোমার আত্মীয়টি। এতদিন পরে তুমি হঠাৎ কোথায় চলে গেলে সেই খবরটুকুও তিনি রাখেননি।'

প্রশান্ত গম্ভীর মুখে বলল,—'ঠিকানা আমি ইচ্ছে করেই দিইনি। কারণ আমার ঠিকানা জানলেও তিনি নিশ্চয় সেটা তোমাদের কাছে বলতেন না।'

—'আশ্চর্য!' বিদিশা অবাক হল।

প্রশান্ত হঠাৎ শুধোল,—'তোমার বাবা বোধহয় রিটায়ার করেছেন?'

—হ্যাঁ, এই তো গত বছর। কিন্তু তুমি সে কথা কেমন করে জানলে?'

—'এমনি, মানে আন্দাজে বলতে পার।' প্রশান্ত হাসল। বলল,—'জানো বিদিশা, এম. এ. পাশের পর তোমার বাবা আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।'

—'তার মানে?'

—'কেন, কথাটা তোমার বিশ্বাস হয় না?'

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। আমি ভাবছি বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হল কবে?

—'সে অনেক কথা।' প্রশান্ত একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে বোধহয় একটু হাল্কা হবার চেষ্টা করে বলল,—'কিন্তু উনি আমাকে সত্যি দেখা করতে বলেছিলেন।'

—'তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করোনি কেন?'

প্রশান্ত উত্তর দিল,—'তখন আর দেখা করবার মত কোনো কারণ ছিল না বলে।'

বিদিশা হঠাৎ শুধোল,—'এখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

—'হ্যাঁ। ভাবছি একবার দেখা করব।' প্রশান্ত ধীরে ধীরে বলল।

—'এতদিন পরে দেখা করবার মত নিশ্চয় কোন কারণ হয়নি।' বিদিশা যেন পরিহাস করল। ফের চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'তাহলে?'

প্রশান্ত বলল, 'কারণ কিছু নেই। আমি শুধু তাঁকে একটা প্রশ্ন করতাম।

—'প্রশ্ন?'

'হ্যাঁ।' প্রশান্ত দৃঢ় গলায় জবাব দিল,—'আমি জিজ্ঞাসা করতাম লালবাজারে নিজের চেম্বারে বসে মিছিমিছি উনি কেন ছলনা করেছিলেন?'

—'ছলনা?' বিদিশা অস্ফুটে উচ্চারণ করল।

—'ঠিক তাই।' প্রশান্ত গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করতে লাগল। পরে কেমন চাপা গলায় বলল,—'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল বিদিশা।'

—'অনেক কথা?' বিদিশা চোখ তুলে তাকাল।

'হ্যাঁ। এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে তা বলা যাবে না। তার জন্য সময় চাই।' এক পলক তার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা, তোমরা কোণারকে যাবে কবে?'

বিদিশা একটু ভেবে বলল,—'বোধহয় কালই। কিম্বা পরশু মানে বেস্পতিবার নিশ্চয়।'

—'দিল্লী থেকে মিস্টার রায় কবে আসছেন?' প্রশান্ত জানতে চাইল।

—'রবিবার বিকেলে।' বিদিশা হেসে উত্তর দিল। বলল,—'তাব সঙ্গেও তুমি দেখা করতে চাও নাকি?'

প্রশান্তর চোখের তারায় রহস্যের ছায়া ভেসে উঠল। তির্যক চোখে বিদিশার দিকে তাকিয়ে সে মৃদুস্বরে বলল,—'যদি বলি তোমার স্বামী মানে শঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার দেখা করবার প্রয়োজন আছে।'

—'ঠাট্টা রাখো। তার সঙ্গে তোমার দেখা করবার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?' ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত বিদিশা সুমিষ্টগলায় হেসে উঠল। ফের সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে প্রশান্তকে লক্ষ্য করে বলল, —'মনে হচ্ছে তুমি যেন একটা মতলব আঁটছ।'

প্রশান্ত তেমনি রহস্যভরা চোখে তাকাল। প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না দিয়ে সে শুধু বলল, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে বিদিশা। একটু আগে তাই বলেছি না?'

'হ্যাঁ, তাই তো বললে।' বিদিশা সায় দিল।

'তাহলে চল এখন, লিঙ্গরাজের মন্দির দেখে আসবে।' প্রশান্ত জোর করল।

'মন্দির?' হাতঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে বিদিশা বলল, 'প্রায় দশটা বাজে। ফিরতে আবার দেরি হবে না তো? তাহলে বাবা কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত হবেন?'

প্রশান্ত উত্তর দিল, 'খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে লিঙ্গরাজের মন্দির দেখতে পুরো একটি বেলা লাগে। কিন্তু আমরা ওখানে এক ঘণ্টার বেশি থাকবে না।'

'তার মধ্যে দেখা হয়ে যাবে?'

'মোটামুটি হবে।' প্রশান্ত আশ্বাস দিল।

একটা ঝকঝকে নতুন রিকশাতে প্রশান্তর পাশে সে উঠে বসল। দিব্যি নরম রোদ্দুর আর শীতের হাওয়া। বিদিশার বেশ ভাল লাগছিল। কোণারকে সেই রবিবার বিকেলে শঙ্কর আসবে। তার আগে এই ক'টা দিন তাকে প্রায় মুখ বুজে একলা কাটাতে হত। এখন ভুবনেশ্বরে প্রশান্তর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে সেই সমস্যার কিছুটা নিরসন হয়েছে। প্রশান্তও বোধহয় কাল কোণারক

যাবে। শঙ্কর এসে পৌঁছবার আগে এই কয়েকটা দিন প্রশান্তর সঙ্গে যদি সে একটু মেলামেশা করে, তাহলে সেটা কী খুব গর্হিত কিংবা দোষের হবে? নিজের মনকেই যেন প্রশ্নটা করল বিদিশা। কিন্তু আশ্চর্য! ব্যাপারটা বিন্দুমাত্র আপত্তিকর বলে তার মনে হ'ল না। তাছাড়া ভুবনেশ্বরে বা কোণারকে কে-ই বা তাদের চেনে? অবশ্য তার বাবা কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারবেন না। অতিবিক্রম মজুমদার হয়তো ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখবেন। কিন্তু প্রশান্তর কথা বাবাকে জানাবার কী প্রয়োজন? ভুবনেশ্বরে সকালবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হয়েছিল, এই খবরটা সে নিশ্চয় তার বাবাকে বলতে যাবে না। আর কোণারকে প্রশান্তর সঙ্গে সে খুব গোপনে দেখা করবে। কিন্তু অতিবিক্রম মজুমদার পুলিশের লোক। মেয়ের এই লুকোচুরি খেলা যদি টের পান। কিন্তু বিদিশা তাতে ভয় পেল না। মেয়েদের ছলনার কাছে স্বয়ং দেবতা অসহায়, পুলিশ তো ছার।

রিকশা থেকে নেমে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'লিঙ্গরাজের মন্দির আগে দেখেছ নাকি?'

'অনেক দিন আগে।' বিদিশা চোখ তুলে মন্দিরের দিকে তাকাল। বলল, 'ভাল মনেও নেই। এখন যেন আবার নতুন দেখছি।'

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিল প্রশান্ত। বিদিশাকে সঙ্গে নিয়ে সে মন্দিরের চত্বরে পা দিল। বলল, 'লিঙ্গরাজ মন্দিরের এই কম্পাউন্ডটা দৈর্ঘ্যে পাঁচশ' কুড়ি ফুটের মত আর প্রস্থে চারশত পঁয়ষট্টি ফুট হবে। দেয়াল, চত্বর সব ল্যাটেরাইট পাথরের।'

চূড়ার দিকে তাকিয়ে বিদিশা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'ইস! মন্দিরটা কত উঁচু।'

ঈষৎ হেসে প্রশান্ত উত্তর দিল, 'একশ আশি ফুট। একটা দশ-বারোতলা বাড়ির সমান।'

দুজনে একবার মন্দির প্রদক্ষিণ করল।

প্রশান্ত বলল, 'লিঙ্গরাজের মন্দির প্রায় হাজার বছর আগে উড়িষ্যার সোমবংশী রাজাদের সময়ে তৈরি হয়।' দক্ষ গাইডের মত এই আশ্চর্য স্থাপত্যশৈলীর ব্যাখ্যা করে সে আবার বলল, 'এই যে বিরাট পাথরগুলি দিয়ে মন্দির তৈরি হয়েছে, এগুলো কিন্তু সিমেন্ট কিংবা অন্য কোনো মশলা দিয়ে যুক্ত নয়। শুধু আলগা ভাবে একটির ওপর আর একটি বসানো। অবশ্য মাথা-ভারী যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ওপরের দিকে কয়েকটি শূন্য প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এই বিরাট এবং ভারী পাথরগুলিকে এত উঁচুতে তোলা কেমন করে সম্ভব হল?'

বিদিশা মনোযোগী ছাত্রীর মত শুনছিল। অনেক ভেবেও এই প্রশ্নের উত্তর সে পেল না।

প্রশান্ত বলল, 'সেকালে ভারী জিনিস তোলার ক্রেন কিম্বা অন্য কোনো যান্ত্রিক উপায় জানা ছিল না। ডক্টর পানিগ্রাহীর মতে খণ্ডগিরি-উদয়গিরি থেকে এই মন্দির পর্যন্ত প্রায় দু'মাইল দীর্ঘ একটি আনত তল তৈরি করা হয়। এবং তার ওপর দিয়ে এই বিশাল পাথরগুলিকে মন্দিরের যে কোনো উচ্চতা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।'

শুধু স্থাপত্য নয়। প্রশান্ত তাকে আরো অনেক কিছু বোঝাল, দেখাল। এক অলস কন্যার শিথিল বসনে কোনো রসিক বানর টান দিয়েছে। ফলে তার গতিশীল নিতম্বের কিছু অংশ নগ্ন—যা ভাস্কর্যের এক অনবদ্য সৌন্দর্যকে প্রকাশিত করেছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিদিশা প্রায় চমকে উঠল। বলল, 'এগারোটা কখন বেজে গেছে। এবার আমাকে যেতে হবে। আর দেরি করলে বাবা নিশ্চয় খুব ব্যস্ত হবেন।'

লিঙ্গরাজের মন্দিরের চত্বর থেকে বেরোবার মুখেই বিদিশা আবার সেই বিদেশি দম্পতিকে দেখতে গেল। বেলা হয়েছে বলে সেই আকাশী নীল রঙের ওভারকোটটা এখন মেমসাহেবের হাতে। হাঁটু পর্যন্ত মোজা। পায়ের হাইহিল জুতো। কিন্তু আশ্চর্য! খানিকটা দূরে অদ্ভুত-দর্শন লোকটাও রয়েছে। তার পরনে কাউ-বয় প্যান্ট আর ঊর্ধ্বাঙ্গে স্কিন-জ্যাকেট। লোকটা কি তাহলে

ওই বিদেশি দম্পতিকে অনুসরণ করছে? কিন্তু কেন? আবার এমনও অসম্ভব নয় যে ওই বিদেশি দম্পতির মত সেও এই ভারত-বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী দেখতে এসেছে। প্রশান্তর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিদিশা বলল, 'ওই লোকটাকে লক্ষ্য করো।'

'কোন লোকটা?' প্রশান্ত আশেপাশে চারদিকে তাকাল।

বিদিশা চাপা গলায় বলল, 'আরে, ওই যে লোকটা। কপালের বাঁ দিকে একটা ছোট টিউমার আছে। আর চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি।'

একটু চেষ্টা করে প্রশান্ত এবার তাকে চিহ্নিত করে বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ ওকে লক্ষ্য করতে বললে কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে, লোকটার কোনো মতলব আছে।'

'মতলব?'

'হ্যাঁ। কিছুক্ষণ আগে মার্কেটের ভেতরে দেখলাম, এই লোকটা একপাশে দাঁড়িয়ে ওই সাহেব-মেমের ওপর নজর রাখছিল। এখন আবার ওদের ফলো করছে।'

প্রশান্ত মুচকি হেসে বলল, 'তুমি দেখছি, পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠছ। ইচ্ছে করলে পুলিশ সার্ভিসে ঢুকতে পার। তোমার বাবার চেয়েও বেশি উন্নতি করবে।'

'ঠাট্টা করছ?' বিদিশা সরোষে তাকাল। বলল, 'লোকটাকে কিন্তু আমার সন্দেহজনক মনে হয়?'

'আচ্ছা, দাঁড়াও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে আসছি। তাহলেই ওর পরিচয় জানা যাবে।' প্রশান্ত এগোল।

বিদিশা পিছন থেকে ডাকল, 'এই, যাওয়ার দরকার নেই।'

কিন্তু প্রশান্ত তার বারণ শুনল না। একটু এগিয়ে সে লোকটার সঙ্গে এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলল। উত্তরে লোকটাও কী যেন বলল। প্রশান্ত এবার ওর সঙ্গে ইংরেজিতে দু-চারটে বাক্য বিনিময় করল। লোকটা চলে যেতে সে আবার স্বস্থানে ফিরে এল।

বিদিশা চোখ তুলে শুধোল, 'কী ব্যাপার? লোকটা কে?'

'এমনি ট্যুরিস্ট।' প্রশান্ত হেসে উত্তর দিল, 'সন্দেহের কোনো কারণ নেই।'

বিদিশা ঈষৎ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। 'তাহলে সকাল থেকে কেন ওই বিদেশিদের পিছনে ঘুরছে?' সে প্রশ্ন করল।

'ওটা তোমার ভুল। আসলে দু-পক্ষই বেড়াতে এসেছে। তাই ভুবনেশ্বরে নানা জায়গায় ওদের একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছ।'

—'অসম্ভব। তোমার যুক্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।' বিদিশা সরব প্রতিবাদ জানাল। বলল,—'আমি সকাল থেকেই লোকটাকে লক্ষ্য করছি। ছায়ার মতো ওই বিদেশি দম্পতিকে অনুসরণ করছে। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগছে আমার কাছে। মনে হচ্ছে লোকটার নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে।'

প্রশান্ত বলল,—'কী জানি। আমার তো ওকে ট্যুরিস্ট বলেই মনে হ'ল।'

বিদিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ওই লোকটার সঙ্গে তুমি কী ভাষায় কথা বলছিলে?'

'গোয়ানীজ।' প্রশান্ত জবাব দিল, 'ওকে দেখে আমার মনে হল, লোকটা গোয়া কিম্বা পশ্চিম উপকূলের অধিবাসী। তাই ঠিক। ও পানজিম থেকে এসেছে।'

বিদিশা বলল, 'তুমি গোয়ানীজ শিখলে কবে?'

'শিখলাম কোথায়?' প্রশান্ত হাসল। বলল, 'মাসখানেক পানজিমে ছিলাম। তাই দু'চারটে কথা জানি!'

রিকশাতে উঠে প্রশান্ত শুধোল, 'তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হচ্ছে? বিকেলে?'

'না।' বিদিশা মাথা নাড়ল। তাকে সতর্ক করে বলল, 'বিকেলে তো বাবার সঙ্গে বেরোতে হবে। তখন যেন ধারে-কাছে তোমাকে না দেখতে পাই। বুঝলে?'

প্রশান্ত হেসে বলল, 'কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে আমি যে দেখা করতে চাই।'

বিদিশাকে একটু সিরিয়াস দেখাল। বলল, 'দেখা করবার সত্যি কোনো প্রয়োজন আছে?'

'তা হয়তো নেই।' প্রশান্ত উত্তর দিল।

'তাহলে এখন দেখা না করা ভাল।' বিদিশা মন্তব্য করল। বলল,—"সময়ে যখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারনি, তখন আর কেন। মিছিমিছি বাবা হয়তো আবার কিছু সন্দেহ করবেন।'

প্রশান্ত বলল, 'কাল সকালেই আমি বোধ হয় কোণারকে যাচ্ছি। তোমরা কবে আসছ? পরশুদিন নিশ্চয়?'

'পরশু কেন? হয়তো কালও যেতে পারি।' বিদিশা একগাল হাসল। বলল, 'সবটাই বাবার মর্জি। ভুবনেশ্বরে ভাল না লাগলে বলবেন, চল কোণারকে যাই।'

'কোণারকে তোমরা কোথায় উঠবে ঠিক করেছ?'

'সান-টেম্পল হোটেলে। সেখানেই চিঠি লেখা হয়েছে।'

'ওটা বোধ হয় থ্রি-স্টার হোটেল। আমি রয়েছি আর এক সস্তা জায়গায়।' মুচকি হেসে প্রশান্ত ফের বলল, 'অবশ্য তোমার বিলেতফেরত স্বামীর পক্ষে সান-টেম্পলই উপযুক্ত।'

বিদিশা কিন্তু এই খোঁচাটুকু গায়ে মাখল না। সে মৃদু হেসে শুধোল, 'তোমার হোটেলের কী নাম?'

'নরসিংহ লজ।' প্রশান্ত ধীরে ধীরে বলল।

'সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা করব?'

'না। তার প্রয়োজন নেই। বরং আমি একটা নিরিবিলি জায়গার সন্ধান জানি। সকালবেলায় ওখানেই তুমি চলে এস।'

'জায়গাটা কোথায়?'

প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তা করে বলল, 'সান-টেম্পল হোটেলের পিছনে একটা রাস্তা সোজা পশ্চিম মুখে গেছে। তুমি বোধ হয় জানো না, একসময় সমুদ্র কোণারকের কাছেই ছিল। কালক্রমে তা দূরে সরে যায়। তাই এখানে পথের দু'পাশে প্রচুর বালি। ওই পথ ধরে মিনিট দশ হাঁটলেই তুমি বাঁ দিকে একটা ছোট বাড়ি দেখতে পাবে। ওই বাড়িটা আমার এক বন্ধুর। খালি পড়ে আছে। ওখানেই আমি সকালবেলায় অপেক্ষা করব, কেমন?'

অপ্সরা হোটেলের কাছাকাছি এসে প্রশান্ত রিকশা থেকে নেমে গেল। অন্য একটা রিকশাতে উঠে বলল,—'তাহলে চলি। কোণারকে আবার দেখা হচ্ছে। বাই—'

দূরে অপসৃয়মান প্রশান্তর রিকশাটাকে বিদিশা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। হঠাৎ তার মনে হ'ল প্রশান্ত যেন তাকে কী জানাতে চেয়েছিল। লিঙ্গরাজের মন্দিরে যাবার কিছুক্ষণ আগেই তো সে বলল,—'বিদিশার সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। কিন্তু কই? প্রশান্ত তো তেমন কিছু প্রকাশ করেনি। তাহলে?'

অন্য একটা কথা মনে পড়তেই বিদিশা চিন্তিত হল। প্রশান্ত বলছিল শঙ্করের সঙ্গে তার দেখা করবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রয়োজনটা কিসের? তবে কী এতদিন পরে তার স্বামীকে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা সে বিস্তারিত জানতে চায়? একদা প্রশান্ত তার পত্নীর প্রণয়ী ছিল। অতিবিক্রম মজুমদার আপত্তি না করলে আজ বিদিশা তার বউ হতে পারত। কিন্তু তারপর? স্ত্রীর এই ভালবাসার কাহিনি এবং প্রশান্তর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা শুনে শঙ্কর যদি বেঁকে বসে? কোণারক থেকে একাই

দিল্লি ফিরে যেতে চায়? তখন তার বাবা অতিবিক্রম মজুমদার কী বলবেন? শেষ পর্যন্ত যদি একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারীতে গড়ায়? তাহলে?

ঘরে ঢুকতেই অতিবিক্রম অপ্রসন্ন মুখে বললেন,—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি? আমি ভেবে মরি' কৈফিয়ত দিতে বিদিশা একটু চিন্তা করে বলল—'জানো বাবা, আমার এক ক্লাস-ফ্রেন্ডের সঙ্গে হঠাৎ লিঙ্গরাজের মন্দিরে দেখা। দুজনে গল্প করতে গিয়েই তো দেরি হয়ে গেল।'

অতিবিক্রম ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তোর ক্লাস-ফ্রেন্ড? কী নাম তার?'

বিদিশা অম্লান বদনে উত্তর দিল, 'ওর নাম প্রণতি—প্রণতি বসু। তুমি ওকে চিনবে না।"

পাঁচ

কোণারকে সেই নির্জন বাড়িতে প্রশান্ত অপেক্ষা করছিল। একটু ইতস্তত করে বিদিশা ভেতরে ঢুকল। দেখল, একটা ছোট চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে প্রশান্ত গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছে। ঘরটা ছোট, আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই। শুধু একটা টেবিল আর খান দুই-তিন চেয়ার। তাও এদিকে-সেদিকে ছড়ানো।

তাকে দেখে প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। অভ্যর্থনার ঢঙে বলল, 'এস বিদিশা। তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।' একটু থেমে সে ফের বলল, 'গতকালও এমনি বসেছিলাম।'

বিদিশা হাসল। বলল, 'বেস্পতিবার, মানে গতকালে বিকেলবেলায় আমরা এসে পৌঁছেছি। তাই সকালে আসব কেমন করে?'

একটা চেয়ার টেনে এনে প্রশান্ত তাকে বসতে দিল। বলল, 'তোমার বাবার তাহলে ভুবনেশ্বর ভাল লেগেছে?'

'বোধ হয় তাই। আসলে ভুবনেশ্বরে বাবার অনেক পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারা কিছুতেই বাবাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে রাজি নয়। অপ্সরা হোটেলের মালিক চন্দনরাম জয়সোয়াল তো বাবাকে পুরো এক সপ্তাহ থাকতে বলছিল।'

প্রশান্ত বলল, 'তোমার বাবা বুঝি ভুবনেশ্বরে কিছুদিন ছিলেন?'

'না, না। ভুবনেশ্বরে থাকতে যাবেন কেন?' বিদিশা জবাব দিল। বলল, 'পুলিশের কাজে বাবাকে অনেকবার এখানে আসতে হয়েছিল। একবার উদয়গিরি-খণ্ডগিরি থেকে মাইল পাঁচেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তিনি একজন বড় স্মাগলারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। লোকটা নাকি বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ ধরনের।'

প্রশান্ত বলল,—'এসব গল্প তোমার বাবার মুখ থেকেই শুনেছ বোধহয়?'

—'পাগল! চোর-ডাকাতদের গল্প বাবা কোনদিন বাড়িতে করতেন না।' সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করে বিদিশা ফের হেসে বলল—'সেই স্মাগলার লোকটার নাম সুন্দর সিং। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের এক জুয়েলার্সের দোকান থেকে একটা দামী হিরে-পাথর চুরি যায়। এই লোকটাই নাকি সেই হিরে চুরির হিরো।'

প্রশান্ত হেসে বলল, 'এই হিরোর গল্প তাহলে কার কাছ থেকে শুনলে?'

'কেন, হোটেলের মালিক চন্দনরাম জয়সোয়ালের মুখ থেকে। ওই লোকটার খোঁজে বাবা এবং আরো কয়েকজন পুলিশ-অফিসার ছদ্মবেশে ভুবনেশ্বরে এসেছিলেন। সেবার সকলে মিলে উঠেছিলেন এই অপ্সরা হোটেলে।'

প্রশান্ত শুধোল, কোণারকের সূর্যমন্দির দেখলে নাকি?'

'দেখব কখন?' বিদিশা তাকেই পাল্টা প্রশ্ন করল। 'বললাম না, গতকাল বিকেলে এখানে এসেছি। বাবা অবশ্য একবার বলেছিলেন, চল সূর্যমন্দির দেখে আসি। তারপর নিজেই আবার বললেন, না, শঙ্কর আসুক। তখন সকলে মিলে বেশ ভাল করে দেখা যাবে।'

প্রশান্ত বলল, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কোণারকের সূর্যমন্দির আমি দেখাতে পারতাম। কিন্তু এটা ছোট জায়গা। কোথায় দুজনকে কেউ একসঙ্গে দেখে তোমার বাবার কান ভারী করবে।'

'তা করতেই পারে। আর তাহলে তো রক্ষা নেই। বাবা নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখবেন।'

প্রশান্ত বলল, 'কোণারকের সূর্যমন্দিরের একটা ছোটখাটো ইতিহাস শুনবে? কোণার্ক শব্দের অর্থ কৌণিক সূর্য। দিবসে অর্কদেব এখানে একটি কোণ থেকে প্রথম দেখা দেন। সূর্যদেবতার নামে উৎসর্গীকৃত এই মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গঙ্গবংশীয় নৃপতি নরসিংহদেব নির্মাণ করান। জনশ্রুতি যে প্রায় বারোশত স্থপতি দীর্ঘ বারো বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মন্দিরের সমাপ্তি টেনে আনে। পরবর্তী সময়ে সম্ভবত এটি পরিত্যক্ত হয়। সমুদ্রপথে যেতে যেতে পর্তুগীজরা একদা এই মন্দির দেখতে পেয়েছিল। তারা এর নাম দিল ব্ল্যাক প্যাগোডা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহাকালের নির্মম নিষ্পেষণে কোণারকের মূল মন্দিরটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে।'

বিদিশা হেসে বলল, 'তোমার রিসার্চের কাজের মধ্যে কোণারকের মন্দিরও আছে নাকি?'

প্রশান্ত জবাব দিল, শুধু কোণারকের সূর্যমন্দির নয়। উড়িষ্যার প্রাচীন দেবদেউলের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমি তৈরি করছি। পুরাতত্ত্ব বিভাগের নির্দেশে উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র এখন এই কাজ চলছে।'

বিদিশা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—'ইতিহাস এখন থাক। বরং বর্তমান নিয়ে দু একটা প্রশ্ন তোমাকে করব।'

'বেশ। কী প্রশ্ন?'

'ভুবনেশ্বরে প্রথম যখন দেখা হয়, তুমি একটা কথা বলেছিলে।' বিদিশা এই মুহূর্ত থামল।

প্রশান্ত ভ্রূ কুঁচকে বাকিটুকু শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

বিদিশা ফের বলল, 'তুমি বলেছিলে, আমার সঙ্গে তোমার নাকি অনেক কথা আছে। কী কথা জানতে পারি?'

প্রশান্ত কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন?'

'প্রথম প্রশ্নের জবাব না পেলে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে একটু অসুবিধে হতে পারে।' বিদিশা জানাল।

'তাহলে তোমাকে বলি যে, সেই কথা আলোচনা করবার এখনও সময় হয়নি। সামান্য একটু দেরি আছে।'

বিদিশা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে?'

'প্রশ্ন না শুনলে কেমন করে তা বলব।'

অধরোষ্ঠ মৃদু দংশন করে বিদিশা ঈষৎ গম্ভীরমুখে বলল,—'শঙ্করের সঙ্গে তোমার দেখা করবার সত্যি কোনো প্রয়োজন আছে?'

প্রশান্ত হাসল। বলল,—'তুমি কী ভাবছ? প্রয়োজন নেই?'

—'বারে! আমি তা কেমন করে বলব?' বিদিশা উত্তর দিল। ফের যেন প্রশান্তকে ঈষৎ খোঁচা দিয়ে বলল,—'আমার প্রশ্নের জবাব তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

প্রশান্ত আগের মতই হেসে বলল,—'মনে হয় শঙ্করবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করি সেটা তুমি চাও না।'

—'কোন মেয়েই তা চাইতে পারে না।' বিদিশা পরিষ্কার উত্তর দিল। ফের বলল,—'পুরুষেরা এত উদার হৃদয় নয়। বিয়ের আগে স্ত্রী একটি ছেলেকে ভালবাসত, এবং সেই ছেলেটির সঙ্গে এখনও তার সম্পর্ক আছে এমন একটা ব্যাপার কোন স্বামী সুনজরে দেখবে না।'

প্রশান্ত একটু চিন্তা করে বলল,—'তোমার কী মনে হয় শঙ্করবাবু তাঁর স্ত্রীর কুমারী জীবনের এই গোপনে প্রেমের ব্যাপারটা আদৌ জানেন না?'

—'আমার তাই ধারণা।' বিদিশা তার অভিমত শোনাল। ফের বলল,—'জানলে শঙ্কর নিশ্চয় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করত।'

প্রশান্ত হাসল। বলল,—'পুরুষমানুষকে তুমি খুব সরল মনে করো, তাই না বিদিশা? মাঝে মাঝে তারা কিন্তু মেয়েদের থেকেও অনেক ভাল ছলনা করতে পারে।'

—'তুমি কী বলতে চাও?' বিদিশা চোখ তুলে তাকাল।

প্রশান্ত বলল,—'আমার বিশ্বাস বিয়ের আগে তুমি যে একটি ছেলের সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়েছিলে শঙ্করবাবু সেকথা জানেন।'

—'কেমন করে? কে তাকে সে কথা বলেছে?' এক পলক মুখের দিকে তাকিয়ে বিদিশা ফের শুধোল,—'তুমি?'

—'যেই বলুক, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু উনি কী রকম মানুষ দেখ, তোমার কাছে এই কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা সব বেমালুম চেপে গিয়েছেন।'

বিদিশা ভ্রূ কোঁচকাল। বলল,—এই নিয়ে কচকচি করবার কোনো অর্থ হয় না ভেবেই বোধহয় শঙ্কর আর সে-প্রসঙ্গ তোলেনি। তাছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিয়ের আগে অমন একটু-আধটু প্রেম করে থাকে। তাই নিয়ে কেউ কুরুক্ষেত্রও করে না, আর তার জন্য মহাভারতও অশুদ্ধ হয় না।'

প্রশান্ত ধীরে ধীরে বলল,—'তোমার স্বামী মানে শঙ্করবাবু কিন্তু তা মনে করেন না।'

—'তার মানে?' বিদিশা ভ্রূ কুঁচকে বলল,—'আমার সম্বন্ধে শঙ্কর কী ভাবে, কী চিন্তা করে সে কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

প্রশান্ত বলল,—'ইংলন্ডে না পড়তে গেলে এই ব্যাপারে তার মতামত হয়তো অনেক আগেই তুমি জানতে পারতে।'

—'কী বলছ প্রশান্ত?' বিদিশা অবাক হয়ে বলল,—'এতদিন পরে শঙ্কর কি এই নিয়ে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায়?'

প্রশান্ত মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'ঠিক বোঝাপড়া নয়। আমার ধারণা শঙ্করবাবু হয়তো তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।'

'জিজ্ঞাসা করবে?' বিদিশা ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলল,—'আমি বুঝতে পারছি শঙ্করের নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।'

প্রশান্ত ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে ডাকল, 'বিদিশা।'

—'কী বলছ?' বিদিশা আড়চোখে তাকাল।

প্রশান্ত এবার তার মুখোমুখি হল। চোখে চোখ রেখে গাঢ়স্বরে বলল, 'একটা কথা বিশ্বাস করবে?'

'কী কথা!'

প্রশান্ত বলল, 'তোমাকে কোনোদিন ভুলতে পারিনি।'

'কী বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি। বিশ্বাস করো বিদিশা, তোমাকে আজও ভালবাসি।'

'প্রশান্ত!'

'হ্যাঁ। মনে আছে বিদিশা, একদিন দুপুরবেলায় ক্লাস পালিয়ে গঙ্গার বুকে আমরা কতক্ষণ নৌকো করে বেড়িয়ে এসেছিলাম?'

'কিন্তু মাঝখানে যে কয়েকটা বছর পেরিয়ে গেল। তুমি তাকিয়ে দেখছ না আমার সিঁথিতে সিঁদুর। আমি আর একজনের বউ—সেই মানুষটা এখানে আসবে বলেই বাবার সঙ্গে কোণারকে এসেছি।' বিদিশা চোখ তুলে তাকাল।

প্রশান্ত দ্বিধা না করে দু-হাত বাড়িয়ে তার মুখখানি তুলে ধরল। তারপর যেন আদর করে বলল, 'তোমার ওই সিঁথিতে যদি আমি নতুন করে সিঁদুর পরিয়ে দিই? তাহলে—'

'কিন্তু তাই কি সম্ভব? তা কখনও হতে পারে?'

বিদিশা ভয়ার্ত বিহঙ্গীর মত থরথর করে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে অস্ফুটে বলল, 'সেই লোকটা।'

প্রশান্ত নিজেও কম অবাক হয়নি। বিদিশার এই আকস্মিক ভাবান্তর তাকে বিচলিত করল। কোন লোকটা? বিদিশা কার কথা বলছে?

পরক্ষণেই পিছন ফিরে ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অবশ্য লোকটাকে সে দেখতে পেল। হ্যাঁ, সেই বটে। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল। পরনে কাউ-বয় প্যান্ট। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। কপালের বাঁ দিকে একটা ছোট টিউমার। লোকটাকে রীতিমত অভদ্র বলা যায়। জানালার শিক ধরে অসভ্যের মত এতক্ষণ তাদের প্রেমালাপ লক্ষ্য করছিল। এখন চোখাচোখি হতে ফের নির্লজ্জের মত হাসছে।

প্রশান্ত ইচ্ছে করল এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ওই লোকটার গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করে। কিন্তু নানা দিক চিন্তা করে সে নিজেকে সংযত করল। প্রথমত, লোকটা তার চেয়ে বলশালী বলেই মনে হয়। গালে একটি চড় কষিয়ে দিলে অন্য গালটি সে বাড়িয়ে দেবে, এমন কথা চিন্তা করা যায় না। বরং একটা হাতাহাতি, মারামারি হওয়া অনিবার্য। এবং সেই দ্বৈরথ সমর যে কতদূর গড়াবে তা বলা কঠিন। হয়তো শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার থানা-পুলিশও অকুস্থলে হাজির হবে। তারপর বিদিশার সঙ্গে তার সম্পর্কের ইতিহাস খুঁজতে পুলিশ হয়তো হাজাব রকম প্রশ্ন শুরু করবে। ব্যাপারটা অতিবিক্রম মজুমদার অর্থাৎ বিদিশার বাবার কানে পৌঁছলে তো কথা নেই। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

লোকটা কিন্তু আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। পিছন ফিরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

বিদিশা বলল, 'আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। আচ্ছা, লোকটা হোটেলে গিয়ে বাবাকে সব কথা বলে দেবে না তো?'

প্রশান্ত চিন্তিত মুখে শুধোল, 'লোকটা কোথায় উঠেছে জানো?'

'কী করে জানব? কোণারকে ওকে তো আমি এই প্রথম দেখলাম। ভুবনেশ্বর থেকে ও কবে এখানে এল, তাও জানি না।'

প্রশান্ত বলল, 'আচ্ছা, সেই সাহেব-মেমকে কী এখানে দেখতে পেলে?'

'হ্যাঁ।' বিদিশা ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। বলল, 'তারা বোধহয় ট্যুরিস্ট বাংলোতে উঠেছে।

'ওরা কখন এল?'

'মনে হয় কাল সন্ধের পর এখানে এসেছে' বিদিশা একটু ভেবে বলল, 'আজ সকালে দেখলাম, সাহেবের হাতে ক্যামেরা। দুজনে বোধহয় কোণারকের মন্দির দেখতে গেল।'

প্রশান্ত বলল, 'তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। লোকটার সঙ্গে আজই আমি একটা বোঝাপড়া করব। ওকে স্পষ্ট বলব, আমাদের ব্যাপারে যেন মাথা না ঘামায়। মনে হয়, তাতেই কাজ হবে।'

বিদিশা বলল, 'রবিবার বিকেলে শঙ্কর এখানে পৌঁছবে। তবে তার আগেই কিন্তু যা হয় কোরো। নইলে শঙ্কর যদি এসব কথা জানতে পারে।'

প্রশান্ত মুচকি হেসে বলল, 'কলঙ্কের ভয় তোমাদের মানে মেয়েদের বড্ড বেশি, তাই না?'

'হয়তো তাই। কিন্তু ভয়ের কারণটা যে কত ভয়াবহ তার মর্ম তুমি পুরুষমানুষ কেমন করে বুঝবে?'

প্রশান্ত হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'ফের আমাদের কখন দেখা হবে?'

বিদিশা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। মৃদুস্বরে বলল, 'এখানে, মানে এই ঘরে কিন্তু আসতে পারব না। ওই লোকটা সব জেনে গেছে। দিনের বেলায় এদিকে আসতে দেখলে ও নিশ্চয় আমাকে ফলো করবে।'

প্রশান্ত খুব চিন্তা করে বলল, 'আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে বুঝলে?

'কী ফন্দি?'

প্রশান্ত তেমনি চিন্তিত মুখে বলল, 'এটা করতে পারলে আর কোনো ভাবনাই থাকবে না।'

বিদিশা শুধোল, 'কিন্তু কী করতে হবে, আগে তাই বলো।'

প্রশান্ত মুখ নামিয়ে খুব চাপা গলায় তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল।

বিদিশা সভয়ে এক পা পিছিয়ে এসে বলল, 'না, না। আমার খুব ভয় করবে! আমি তা পারব না।'

'ভয় কিসের?' প্রশান্ত তাকে সাহস দিল। 'তুমি কী এখনও ছেলেমানুষ আছ নাকি?'

বিদিশা তবু বলল, 'এমনি লুকোচুরি খেলতে আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না। শঙ্কর তো রবিবার আসবে। কিন্তু তার আগে বাবা যদি তোমার কথা জানতে পারেন, তাহলে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারি হবে।'

প্রশান্ত অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, 'আমার মনে হয় বড়জোর সোমবার। তারপর এই লুকোচুরি খেলার আর প্রয়োজন হবে না।'

'তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?'

'না, কিছু নয়।' প্রশান্ত প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য শুধোল, 'তোমার বাবা কি কিছু সন্দেহ করছেন?'

'তা কেমন করে বলব? তবে পুলিশের লোক। মনুষ্যচবিত্র ভাল বোঝেন। একবার মুখের দিকে তাকালেই মনের কথা টের পান। তাই তো আমার ভয় হয়।' একটু থেমে বিদিশা ফের বলল, 'জানো, বাবাকে সেদিন ডাহা মিথ্যে কথা বলেছি।'

'মিথ্যে কথা?

'হ্যাঁ। ভুবনেশ্বরে তোমার সঙ্গে যেদিন সকালবেলায় দেখা হল, সেদিন হোটেলে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল না? তাই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ ছিলি কোথায়? আমি ভেবে মরি। অনেক চিন্তা করে বললাম, লিঙ্গরাজ্যের মন্দিরে আমার এক ক্লাস-ফ্রেন্ডের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বাবা। ওর সঙ্গে গল্প করতেই যা দেরি—'

'মাই গড।' প্রশান্ত প্রায় চমকে উঠল। বলল, 'তারপর? উনি সেই ক্লাস-ফ্রেন্ডের নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন না?'

'নিশ্চয় চেয়েছিলেন। পুলিশের লোক সর্বদা খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে।'

'তুমি কী নাম বললে?'

'ভয় নেই। তোমার নাম একবারও উচ্চারণ করিনি।' বিদিশা উত্তর দিল।

—'তাহলে?'

—'কেন? আমি বললাম, তার নাম প্রণতি বসু। তুমি তাকে চিনবে না।' বিদিশা খিলখিল

করে হেসে উঠল।

প্রশান্ত বলল,—'চমৎকার। তুমি দারুণ বুদ্ধিমতী।' তারপর এগিয়ে এসে অতর্কিতে বিদিশার গাল দুটো টিপে সে আদর করল।

—'অসভ্য।' বিদিশা চোখ পাকিয়ে দৃষ্টিতে কপট উষ্মা ফুটিয়ে তুলল। বলল,—'পরস্ত্রীর দিকে অমন লোভীর মত হাত বাড়াতে আছে?' ফের মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, একটা কথা সত্যি বলবে?'

—'কী?' প্রশান্ত কৌতূহলী চোখে তাকাল।

বিদিশা সলজ্জকণ্ঠে বলল,—'আমাদের সব কথা শঙ্কর জানে?'

চোখ তুলে কী যেন ভেবে প্রশান্ত হাসল। তারপর কেমন রহস্য করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'বিশ্বাস না হলে রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করো। শঙ্করবাবু আসছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই তোমার সন্দেহের নিরসন হবে।' কথা শেষ করেই প্রশান্ত এবার জোরে হাসল।

বিকেল নয়, রবিবার সকাল দশটার আগেই শঙ্কর এসে পৌঁছল। বিদিশা একটু আশ্চর্য হয়েছিল। কিন্তু অতিবিক্রম মজুমদার নিজেও কম অবাক হননি। জামাইকে অভ্যর্থনা করে তিনি বললেন, 'আরে এসো, এসো। এই কিছুক্ষণ আগেও ঘরে বসে তোমার কথা ভাবছিলাম।' ফের কৌতূহল প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সকালেই হঠাৎ কেমন করে এলে?'

শঙ্কর বলল, 'ভোরবেলায় একটা ফ্লাইট ছিল। আমি আগে জানতাম না। খোঁজ নিতে গিয়ে টিকিট পেয়ে গেলাম। তাই আর দেরি না করে চলে এসেছি।'

'বেশ করেছ।' অতিবিক্রম জামাইকে সমর্থন করলেন। বললেন, 'এখন জামা-কাপড় পাল্টে মুখ-হাত ধুয়ে নাও বাবা। আমি বেয়ারাকে চা আর খাবার দিতে বলছি। আচ্ছা, বিদিশা কোথায় গেল? অবাক কাণ্ড? এ মেয়েকে নিয়ে দেখছি আমার মহা জ্বালা।' বলেই মেয়ের খোঁজে বোধ হয় তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন।

পিছন থেকে শঙ্কর বলল, 'আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ও এখানেই আছে কোথাও। এখুনি এসে পড়বে।'

মেয়ে-জামাইয়ের জন্য অতিবিক্রম আর একটা ডবল বেড রুম ঠিক করে রেখেছিলেন। সেই ঘরটা সামান্য একটু দূরে। ইচ্ছে করেই পাশাপাশি রুম তিনি বুক করেননি। প্রায় তিন বছর বাদে শঙ্কর দেশে ফিরল। দীর্ঘকাল পরে স্বামী-স্ত্রীতে দেখা। সমস্ত রাত্তির দুজনে হয়তো বকবক করে কাটিয়ে দেবে। কত হাসি-ঠাট্টা, সোহাগ-ভালবাসা, বিলেতের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর মুখরোচক কাহিনী। পাশের ঘরে বুড়ো শ্বশুর জেগে থাকতে পারেন মনে হলে ওরা স্বভাবতই একটু সঙ্কোচ বোধ করবে।

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে শঙ্করের সুটকেশটা তিনি সেই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে বিদিশাও এসে গিয়েছিল। অতিবিক্রম বললেন, 'যা সুটকেশ খুলে শঙ্করের জামা-কাপড় যা দরকার, তা বের করে দিয়ে আয়। ও মুখ হাত ধুয়ে একটু জিরিয়ে নিক। তারপর দুজনে বসে ওর কাছ থেকে বিলেতের গল্প শুনব।'

ঘরে ঢুকে শঙ্কর নিজেই তার সুটকেশ খুলতে গেল। পিছন থেকে বিদিশা বলল, 'কী ব্যাপার, তোমার দেখছি তর সইছে না। এত তাড়া কীসের?'

'ঠিক তাড়া নয়।' শঙ্কর চোখ তুলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'আসলে এটা হল অভ্যেস। বিলেতে এই তিন বছর সব কাজ নিজেকেই করতে হত কিনা, তাই—'

বিদিশা একটা চেয়ারে বসে স্বামীকে লক্ষ্য করছিল। শঙ্কর সুটকেশ থেকে তার জামা-কাপড়

বের করল। সেগুলি নিয়ে একটু আড়ালে চলে গেল। তারপর পোশাক বদলে ফের সামনে এল। একগাল হেসে বলল, 'তারপর, তোমার খবর বলো। এই তিন বছর বেশ ভাল ছিলে তো?'

ঘাড় ফিরিয়ে বিদিশা অন্য দিকে তাকাল। কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অভিমান মিশিয়ে বলল,—'যেমন হোক ছিলাম। কিন্তু বিদেশ থেকে তুমি তার খোঁজখবর রাখনি। কটা চিঠি লিখেছিলে আমাকে বলতে পার।'

এটা স্ত্রীর রাগের কথা শঙ্কর বুঝতে পারল। ইংলন্ডে থাকতে বিদিশাকে চিঠিপত্র বেশি লেখা হয়নি। বলাবাহুল্য স্ত্রী এখন সেটাই অভিযোগ করছে।

শঙ্কর বলল, 'প্রথম দিকে তবু চিঠিপত্র লিখেছি! কিন্তু শেষের দিকে বুঝলে কিনা, এক মুহূর্তও সময় ছিল না।'

'আহা! সে কী চিঠি।' বিদিশা চোখ ঘুরিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করল। বলল, 'বেঁচে থাকতে মা বলতেন, জামাইয়ের চিঠিগুলো এমন সাদামাঠা কেন রে? কোথাও এতটুকু সোহাগ-ভালবাসার কথা নেই।'

বউকে শঙ্কর বোঝাতে চেষ্টা করল,—'আসলে কী জানো, বিলেত দেশটা ঠিক আমাদের মত নয়। ওখানে কাজে ফাঁকি চলে না। আর লেখাপড়ায় তো নয়ই। আমাকে কাজও করতে হত। আবার তার সঙ্গে পড়াশুনো। এক একদিন এমন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছে যে বিছানায় শুয়ে আর চোখ মেলে তাকাতে পারিনি।

বিদিশা ভাবছিল শঙ্কর এবার নিশ্চয় সুটকেশ খুলে একটা সুন্দর উপহাব বের করবে। যা সে বিদেশ থেকে শুধু তার জন্যেই এনেছে। প্রিয়জনের কথা মনে করে লোকে তো এমন অনেক কিছু নিয়ে আসে। আর স্ত্রী তো শুধুমাত্র প্রিয় নয়—সে হল প্রিয়তমা। কিন্তু আশ্চর্য! শঙ্কর এখনও চুপচাপ। তার ভাবগতিক দেখে মনেই হয় না যে সুটকেশ থেকে সে কোনো উপহার বের করবে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে শঙ্কর এখানে কিছুই আনেনি। বিদিশার জন্য ইংলন্ড থেকে সে যা এনেছে, তা এখন ফরিদাবাদে—তার কোয়ার্টাসে রয়েছে।

বিদিশার দিকে তাকিয়ে শঙ্কর মৃদু হাসল। বলল, 'তোমাকে কিন্তু আগের থেকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে।'

'সুন্দর না ছাই।' ঠোঁট বাঁকিয়ে মুহূর্তের জন্য বিদিশা মুখখানা বিকৃত করল। ফের বলল, 'তখন অনেক পাতলা ছিলাম তাই না? এই তিন বছরে বেশ মোটা হয়ে গেছি!'

'না, মোটা নয়। বরং তোমার স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে। এবং তার প্রয়োজনও আছে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আমাদের দেশে বাঙালি মেয়েরা স্বাস্থ্যের দিকে কদাচিৎ নজর দেয়। শুধু রং মেখে আর রংচঙে শাড়ি পরে নিজেকে সুন্দরী প্রতিপন্ন করতে চায়।'

বিদিশা কোনো মন্তব্য করল না। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার খুব আশ্চর্য লাগছিল। এই ভদ্রলোকের সে বিবাহিতা। আজ তিন বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে এক নিভৃত কক্ষে মানুষটার দেখা হয়েছে। এই মাত্র সে বলছিল বিদিশা নাকি স্বাস্থ্যবতী...আগের চেয়ে তাকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। তবু সে নিরুত্তাপ, স্থির এবং নিস্পৃহ। বিদিশার হঠাৎ মনে হল শঙ্করের বদলে যদি প্রশান্ত তার স্বামী হত। তাহলে কি দৃশ্যটা একটু অন্যরকম হত না? এই তো পরশু দিন সকালে একলা পেয়ে প্রশান্ত তার গাল টিপে আদর করল। আর সুদীর্ঘ তিন বছর পরে নিভৃতে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর প্রথম সান্নিধ্যে কোনো লোক যে এমন কাঠের পুতুলের মত নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে, অন্য কেউ নিশ্চয় তা বিশ্বাস করবে না। অথচ মানুষটাকে সে যত সহজ মনে করে, আসলে তা নয়। বিয়ের আগে স্ত্রীর সঙ্গে যে আর একজনের গভীর ভালবাসা হয়েছিল শঙ্কর সে খবর রাখে। তবু কেমন নিপাট ভালোমানুষটির মত তার দিকে তাকিয়ে আছে।

যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না আশ্চর্য চাপা মানুষ। ওর মনের গভীরে আরো কত গোপন কথা লুকিয়ে আছে কে জানে? সেদিন প্রশান্ত বলছিল শঙ্কর হয়তো তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে। কী সে জানতে চাইবে? বিয়ের আগে একজন সহপাঠীকে প্রশান্ত ভালবাসত কিনা? সে কথার জবাব তার তৈরি করা আছে। বিদিশা বলবে প্রশান্তকে সে ভালবাসত। তাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিল। হঠাৎ কেমন যেন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, তাই। নইলে—। তাছাড়া সে অস্বীকার করতে পারবে না যে প্রশান্তর সঙ্গে তার এখনও বন্ধুত্ব আছে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে বলেই স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ তার বন্ধু হতে পারে না এমন একটা থিয়োরিকে সে নিছক পৌরাণিক অনুশাসন বলে মনে করে।

কিন্তু আশ্চর্য! শঙ্করকে বোঝার উপায় নেই। কী নিপুণ অভিনেতা। ওর চোখমুখ দেখে বিদিশার একটুও মনে হয় না যে প্রশান্তর সঙ্গে তার গোপন ভালবাসার কথা সে বিন্দু-বিসর্গও জানে।

ট্রেতে সাজিয়ে চা আর খাবার নিয়ে হোটেলের বয় ঘরে ঢুকতেই বিদিশা উঠে দাঁড়াল। তার বসতে আর ইচ্ছে করছিল না। শঙ্করকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'বাবাকে বরং ডেকে আনি। তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য উনি খুব ব্যস্ত। শুধু আমি এ ঘরে রয়েছি বলেই আসতে পারছেন না।'

ছয়

অতিবিক্রম মিনিট দশ পরে ঘরে এলেন।

শঙ্করের তখন খাওয়া শেষ। বেয়ারা এসে চায়ের কাপ আর প্লেটগুলি তুলে নিচ্ছে। চেয়ারে বসে অতিবিক্রম বললেন, 'তোমার সঙ্গে তাহলে দুটো কথাবার্তা হোক। ইংলন্ডে কেমন ছিলে বলো?'

'মোটামুটি ভালই। তবে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। লেখাপড়া আর চাকরি দুই দিক সামলাতে যাকে বলে হিমশিম খেয়ে গেছি। একটু আগে আপনার মেয়েকে সেকথা বলছিলাম।'

অতিবিক্রম বললেন, 'কষ্ট না করলে কেউ জীবনে কৃতকার্য হতে পারে না।' ফের মৃদু হেসে জামাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেবেলায় সেই কবিতাটা পড়েছিলে?

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কী মহীতে?'

শঙ্কর হেসে বলল, 'সে কথা ঠিক। তবে ইংলন্ডে থাকতে হলে পরিশ্রম না করে উপায় নেই। ও দেশে কাজের অর্থই হার্ড লেবার আর ছুটি মানেই পরিপূর্ণ বিশ্রাম। এর মাঝামাঝি কোনো কথা ইংরেজদের অভিধানে লেখা হয়নি।'

অতিবিক্রম বললেন, 'এই তিন বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছ বলেই তো ফরিদাবাদে অতবড় চাকরিটা পেলে। ইংলন্ডে না গেলে এতদিন কলকাতায় ওই কস্ট অ্যাসিস্টান্টের চাকরিতেই তোমাকে পড়ে থাকতে হত।'

'আজ্ঞে, সে কথা একশবার।' শঙ্কর সবিনয়ে জানাল। বলল 'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি চেষ্টা না করলে আমার নিশ্চয় ইংলন্ডে যাওয়া হত না।"

শঙ্করের কথায় অতিবিক্রম খুশি হলেন। জামাতা ছেলের মত, তবু সে পরের সন্তান। তার মুখে কৃতজ্ঞতার ভাষা আশা করা মূর্খামি। বিশেষ করে তাঁর নিজের ছেলের আচরণই যখন যথেষ্ট লজ্জার। ওই ছেলেকেই তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। ছেলে এখন বিদেশে বউকে নিয়ে সংসার পেতেছে। বুড়ো বাপকে বছরে এক-আধটা চিঠি লেখে।

সম্পর্ক এই পর্যন্ত।

জামাতাকে উদ্দেশ করে অতিবিক্রম বললেন, 'তুমি যে এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করে বড় একটা চাকরি নিয়ে দেশে ফিরেছ, এই আমার গর্ব বাবা। বিয়ের সময় তোমার শাশুড়িকে আমি বলেছিলাম, এ ছেলে একদিন উন্নতি করবেই। আজ সে বেঁচে থাকলে কী খুশি যে হত, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

শঙ্কর কোনো কথা বলল না। শুধু সলজ্জ একটু হাসল।

অতিবিক্রম বললেন, 'তারপর, তোমার চাকরির খবর কী? জয়েন করলে কবে? নতুন কাজ ভাল লাগছে তো?'

শঙ্কর চোখ তুলে বলল, 'যেদিন দিল্লিতে এলাম, তার পরের দিনই ফরিদাবাদে জয়েন করেছি। বিলেতে কোম্পানির সেই রকম ইনস্ট্রাকশন ছিল। আর এটা একটা বড় কনসার্ন...খুব সিসটেমেটিক্ কাজকর্ম। মনে হয়, আমার তেমন অসুবিধে হবে না।'

অতিবিক্রম বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। সামান্য অসুবিধে থাকলেও ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে।' কী ভেবে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমার ছুটি ক'দিন?'

'সব মিলিয়ে পাঁচ দিন।'

'মাত্র পাঁচ দিন?' অতিবিক্রমকে ঈষৎ চিন্তিত মনে হল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তার মধ্যে অন্তত একটা দিন কলকাতাতেই থাকতে চাই। প্রায় তিন বছর পরে দেশে ফিরে এলাম। আত্মীয়-স্বজন কারো সঙ্গেই তো দেখা করা হয়নি।'

অতিবিক্রম সায় দিয়ে বললেন, 'আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবে। তবে একটা দিনে তোমার কুলোবে না। অন্তত দুটো দিন তোমাকে কলকাতাতেই থাকতে হবে। তাহলে এখানে থেকে পরশু দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার বিকেলেই আমরা রওনা হবো।' কী যেন চিন্তা করে অতিবিক্রম ফের বললেন, 'আচ্ছা, শেষ চিঠিটায় তুমি একটা কথা লিখেছিলে মনে আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে—' শঙ্কর যেন কী বলবে তাই ভাবতে লাগল।

অতিবিক্রম বললেন,—'তুমি লিখেছিলে আমার সঙ্গে তোমার নাকি কিছু দরকারি কথা আছে, তা সে আলোচনা কখন করতে চাও?'

শঙ্করকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল। বলল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে আমিও তাই ভাবছিলাম।' এক মুহূর্ত থেকে সে ফের প্রস্তাব করল,—'আজ রাত্তিরে আপনার সময় হবে?'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়। কেন সময় হবে না?' অতিবিক্রম হঠাৎ যেন কী চিন্তা শুরু করলেন। শুধোলেন, —'কী বিষয়ে আলোচনা করবে?'

শঙ্কর মাথা নিচু করে ভাবছিল। অনেকক্ষণ পরে বলল,—'এমনি কয়েকটা কথা। রাত্তিরেই আপনাকে জানাব।' প্রশ্নটা যেন সে এড়িয়ে যেতে চাইল।

অতিবিক্রম উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি এখন বিশ্রাম কর। বিকেলে বরং বিদিশাকে নিয়ে এক চক্কর বেড়িয়ে এস।' দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে ফের তিনি পিছন ফিরে তাকালেন। জামাইকে উদ্দেশ করে বললেন,—'কোণারকে আগে কখনও এসেছিলে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা প্রায় দশ বছর আগে। তখন এই থ্রি-স্টার হোটেল তৈরি হয়নি।'

—'তাহলে সূর্যমন্দির তুমি দেখেছ।' অতিবিক্রম মৃদু হাসলেন। ফের বললেন,—'তবু এই স্থাপত্য বারবার দেখতে ইচ্ছে করে। মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর কতদিন টিকে থাকবে, তাই বা কে জানে?

সন্ধের মুখে বিদিশাকে ফিরতে দেখে অতিবিক্রম শুধোলেন,—'কি করে, তুই একা কেন? শঙ্কর কই?'

—'ও একটু পরে ফিরবে বাবা।'

—'তার মানে? গেল কোথায়?'

—'কী জানি। সূর্যমন্দির থেকে বেরিয়ে আমাকে বলল ওর চেনা-জানা কারা যেন এখানে এসেছে। একবার তাদের সঙ্গে দেখা করে ফিরবে।'

—'এখানে ওর চেনা-জানা আবার কাকে পেল? তিন বছর ধরে তো শঙ্কর এদেশেই ছিল না।' অতিবিক্রম চিন্তিত হলেন। ফের মেয়েকে শুধোলেন,—'হ্যাঁরে, তারা বিদেশি লোক নয় তো?'

—'কী জানি। তা আমি বলতে পারব না। তবে বিদেশি লোক হতে পারে। কোণারকে তো এখন ফরেন ট্যুরিস্টের বেশ ভিড়।'

অতিবিক্রম ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন,—'তুই জিজ্ঞাসা করলে পারতিস। বিদেশ বিভূঁই জায়গা। স্বামী কোথায় কার সঙ্গে দেখা করতে গেল, স্ত্রীর নিশ্চয় সে খবর নেওয়া উচিত।'

বিদিশা মুখ তুলে বলল,—'তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? চেনা জানা লোক তাদের সঙ্গে দেখা করে সন্ধের একটু পরই ফিরবে। এত ভাবনাচিন্তার কী আছে?'

অতিবিক্রম বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হাতে একটা শক্তপোক্ত ছোট লাঠি। ভুবনেশ্বরে পথের ধারে একজন লোক বেচছিল। পছন্দ হতেই একটা কিনে নিলেন। লাঠিটা অল্প নাচাতে নাচাতে অতিবিক্রম এগিয়ে চললেন। কী যেন চিন্তা করছিলেন তিনি। কার কথা যেন ভাবছিলেন। খানিকটা এগিয়ে আবার তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। কোট-প্যান্ট আর রঙচঙে টাই পরা এক ভদ্রলোক সামনে যেন পথ আগলে রয়েছে। অতিবিক্রম এক নজর তাকিয়ে রীতিমত বিস্মিত হলেন। অনেকদিন পরে দেখা। তবু সন্ধ্যার এই ঝাপসা আলোকে মানুষটাকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল এক সময় তাঁর অধীনে কাজ করেছিল। আশ্চর্য! অবসর নেওয়ার পর পুরানো সহকর্মীদের সঙ্গে পথেঘাটে হঠাৎ দেখা হলে মনটা কী বিচিত্র আনন্দে ভরে ওঠে।

জোড়হাত করে রাজীব তাকে নমস্কার জানাল। বলল,—'স্যার, আপনি হঠাৎ কোণারকে?'

অতিবিক্রমের তখনও ঠিক বিস্ময় কাটেনি। হেসে বললেন,—'আরে মশায়, আমি এসেছি মেয়েকে নিয়ে দু দিনের জন্য বেড়াতে। দিল্লি থেকে জামাতা বাবাজীবনও এসেছেন। কিন্তু মিঃ সান্যাল, আপনি হঠাৎ কোণারকে কেন? নিশ্চয় বেড়াতে নয়?'

ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে রাজীব তাকে নীরব হতে ইঙ্গিত করল। ফিসফিস করে বলল,—'আমি এখানে মিঃ সান্যাল পরিচয় নিয়ে আসিনি। মাই নেম ইজ শুভ্রাংশু গুপ্ত, ফিল্ম প্রডিউসার। একটা ছবির আউটডোর শুটিং নেবার আগে লোকেশনটা একবার সরেজমিন পরীক্ষা করতে এসেছি।

—'তাই নাকি?' অতিবিক্রম মুচকি হাসলেন। ঈষৎ চাপা গলায় শুধোলেন,—'উঠেছেন কোথায়?'

—'ইলেকট্রিকসিটি বোর্ডের ইন্সপেকশন বাংলোতে। চমৎকার ব্যবস্থা। বেসরকারি লোকেরাও ওখানে উঠতে পারে।'

পাশ দিয়ে কে যেন হেঁটে যাচ্ছিল। আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রাজীব বেশ উচ্চকণ্ঠে বলল,—'ভালো লোকেশন খুঁজে বের করা এক সমস্যা মশায়। অথচ আমার এই বইটার অনেকখানি কোণারকের পটভূমিকায়।'

'আপনার বইটার সাবজেক্ট কী?' অতিবিক্রম কপট কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

রাজীব বেশ গম্ভীর চালে উত্তর দিল,—'ইট ইজ এ ফ্যাসিনেটিং ক্রাইম স্টোরি। বিন্ধ্যাচল থেকে কিছু দূরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় প্রাচীন দুর্গামন্দির। সেখান থেকে আটশত বছরের পুরাতন

দেবীর অষ্টভুজা মূর্তি চুরি গেছে। সেই মূর্তিটার পিছনে ধাওয়া করেছে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা আর কুখ্যাত স্মাগলারের দল। শেষ পর্যন্ত কোণারকে সেই অষ্টভুজা মূর্তি কেমন করে উদ্ধার হল ছবিতে তাই দেখানো হবে।'

—'আই সী।' অতিবিক্রম ফের হাসলেন। বললেন,—'দেন ইট মাস্ট বি অ্যান অ্যাকশন-প্যাকড্ ড্রামা।'

—'অফ কোর্স। নইলে ক্রাইম স্টোরি অ্যাপিল করবে কেন বলুন?'

সেই লোকটা বেশি কিছু দূরে চলে যাওয়ার পর অতিবিক্রম মন্তব্য করলেন,—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কী গল্প করা যাবে? বরং কাল সকালে আসুন মিঃ সান্যাল।' ফের কেমন রহস্য করে বললেন, —'আপনার ফিল্মের স্টোরিটা ঘরে বসে ভালো করে শোনা যাবে।'

রাজীব বলল,—'ও সিওর। কিন্তু আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন স্যার?'

—'সান-টেম্পল হোটেল।' অতিবিক্রম প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

—'ও কে স্যার। কাল সকালেই তাহলে দেখা হবে।'

রাজীব স্যানাল দৃষ্টির আড়াল হতেই অতিবিক্রম ফের হেঁটে চললেন। অভ্যাসমত হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগলেন। সেই কথাটা কেবলি তার মনে হচ্ছিল, আজ রাত্তিরে শঙ্কর কিছু আলোচনা করতে চায়। কিন্তু কী বিষয়? আর সেই আলোচনা এত জরুরী যে দেশে ফেরার আগে বিলেত থেকে চিঠিতে তার প্রস্তাবনা করতে হবে?

অন্ধকার ঘনাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। একটু আগে গৃহস্থের বাড়ি থেকে শঙ্খধ্বনি শোনা গেছে। গগনে অনেকগুলি তারা জ্বলজ্বল করছে। ফেব্রুয়ারি মাস। কোণারকের আকাশ নির্মেঘ, ধূলিহীন। দেদীপ্যমান নক্ষত্ররাজিকে তাই এত উজ্জ্বল মনে হয়।

ফেরার পথে বৃক্ষসংলগ্ন নির্জন একটা জায়গা একজন অদ্ভুত দর্শন লোক তাঁকে নমস্কার জানিয়ে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়াল। অতিবিক্রম চিন্তিত হলেন। কী মতলব লোকটার? চোর ছিনতাইবাজ নয়তো? কোন কথা বলার আগেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটা পরিষ্কার ইংরাজীতে প্রশ্ন করল,—'আর ইউ মিঃ মজুমদার?'

—'হ্যাঁ।' অতিবিক্রম গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন। শুধোলেন, 'কী দরকার আপনার?'

লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

শুনে অতিবিক্রম প্রায় চমকে উঠলেন। বললেন,—'ইমপসিবল, আমি একথা বিশ্বাস করি না।'

লোকটা দাঁত বের করে নির্লজ্জের মত হাসল। তারপর মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে আরো কী সব যেন বলল।

অতিবিক্রমকে এবার ঈষৎ উত্তেজিত দেখাল। লোকটার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি ওকে চিনলে কেমন করে?'

মুখ না তুলেই সে পরিষ্কার জবাব দিল,—'আই নো হিম।'

অগত্যা অতিবিক্রমকে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তা করতে হল। অদ্ভুত দর্শন সেই লোকটার সঙ্গে তিনি আরো কয়েকটি কথা বললেন। এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের চেহারাটা যেন বদলে গেল। কপালে রেখা, ভ্রূ কুঁচকে অতিবিক্রম গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হলেন; এখন তাঁর কী কর্তব্য বোধহয় সে বিষয়ে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ওই লোকটা যে সত্যি কথা বলছে তারই বা প্রমাণ কী? হয়তো ভুল করে অন্য কাউকে দেখে থাকবে। কিন্তু লোকটা যে তাঁর নাম-ধাম আদ্যোপান্ত ইতিহাস বলে গেল। তাহলে? আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, তাঁর নাড়ি-নক্ষত্র, পরিচয়-বৃত্তান্ত সমস্ত কিছু সংগ্রহ করেই সে এখানে অপেক্ষা করছিল। আসলে ওই লোকটার মনে কোনো গোপন দুরভিসন্ধি রয়েছে।

শ্লথগতিতে তিনি বাকি পথটুকু হেঁটে এলেন। ভারী কোনো বস্তুর মত চিন্তার ভারেও যে মানুষ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে, অতিবিক্রমকে দেখে তাই মনে হল। হোটেলে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করবার আগে বিদিশাকে একবার ডেকে পাঠিয়ে শঙ্করের খোঁজ নিলেন। না, সে এখনও ফেরেনি। অতিবিক্রম এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। শঙ্কর এত দেরি করছে কেন? আজ রাত্তিরেই কী সব কথা যেন সে আলোচনা করতে চায়। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অতিবিক্রম তাঁর মোটা সিগারেট ধরিয়ে আগামী দিনের কর্মসূচি মনে মনে ছকে নেবার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, কোণারকে আর একটি দিনও অপেক্ষা করবার কোনো অর্থ হয় না।

হঠাৎ কপাটে একটা শব্দ হতেই অতিবিক্রম উৎকর্ণ হলেন। নিশ্চয় কেউ দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু কে আসবে এখন? বিদিশা? না, সে এভাবে দরজায় করাঘাত করে না। তাহলে শঙ্কর? কিম্বা হোটেলের কোন কর্মচারী? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই অতিবিক্রম দরজাটা খুলে প্রায় চমকে উঠলেন। এক একটা সময় বোধহয় এমনি হয়। চিন্তা আর চমক পিঠোপিঠি ভাইবোনের মত হাত ধরাধরি করে কাছে আসে।

আগন্তুক প্রায় ছ-ফুট লম্বা। নাসিকার নীচে প্রজাপতির মত পাখনা মেলা স্বল্প গোঁফ। পরনে একটা খয়েরী প্যান্ট। গায়ে নেভি ব্লু রঙের শার্টের উপর হলুদ সোয়েটার। মাথায় ফেল্ট ক্যাপ। পায়ে এক জোড়া পুরু রবার সোলের জুতো। দ্রুত হেঁটে গেলেও কোন শব্দ হবে না। অতিবিক্রম তাকে চিনতে পারলেন। তির্যক চোখে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন,—'সুন্দর সিং! তুম?'

আগন্তুক ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল। নিজের হাতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঈষৎ মাথা নুইয়ে তাকে নমস্কার জানিয়ে বলল,—'আপনার সঙ্গে ভেট করতে এলাম মজুমদার সাব।'

অপাঙ্গে আপাদমস্তক ওকে নিরীক্ষণ করে অতিবিক্রম জিজ্ঞাসা করলেন,—'আমার ঠিকানা পেলে কোথায়?'

—'কেঁও সাব? সুন্দর সিং ঈষৎ হেসে যেন তাকেই পাল্টা প্রশ্ন করল। বলল,—'ভুবনেশ্বরে জয়সোয়ালজির সঙ্গে বাতচিত হল। উসি কা পাশ খবর মিলল কী আপ কোণারকে সানটেম্পল হোটেলমে রহিয়েছেন।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অতিবিক্রম একমুহূর্ত ভাবলেন। কী মতলব সুন্দর সিংহের? শুধু তাঁর সঙ্গে ভেট করবে বলেই ভুবনেশ্বর থেকে কোণারকে এসেছে? তাই কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে? বিশেষ করে অতিবিক্রমের সঙ্গে যখন তার কোনো হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল না। বরং একটা হিরে চুরির কেসে প্রায় অসাধ্য সাধন করে উড়িষ্যার নির্জন অরণ্যে অতিবিক্রম তাকে গ্রেপ্তার করেন। তাহলে কি ওর মগজে কোন দুরভিসন্ধি আছে?

একদা কলকাতা পুলিশের জবরদস্ত ডেপুটি কমিশনার অতিবিক্রম মজুমদারের বুকের ভিতরটা অজানা সংশয়ে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। তাহলে কি এতদিন পরে খোঁজ পেয়ে সুন্দর সিং বদলা নিতে কোণারকে এসেছে? এমন ঘটনা বিরল হলেও পুলিশের নথিপত্রে আছে। একবার এক আসামী বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটতে গেল। কয়েদীজীবন থেকে মুক্তিলাভ করে সে খুঁজে বের করল তার বিচারককে। ভদ্রলোক তখন অবসর নিয়ে এক মফঃস্বল শহরে দিন যাপন করছেন। একদিন রাত্রে লোকটি সেই বিচারককে হত্যা করতে গিয়ে ফের ধরা পড়ল। তারপর সে যথারীতি ফিরে এলো অভিযুক্ত আসামীর কাঠগড়ায়। বিচারের জন্য—।

হঠাৎ অপ্সরা হোটেলের মালিক চন্দনরাম জয়সোয়ালের কাছে শোনা সেই ঘটনার কথা মনে হল তার। চন্দনরাম বলেছিল, সুন্দর সিং জেল থেকে খালাস পেয়ে ভুবনেশ্বরে ফিরে আসাব

এক মাসের মধ্যেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে। জগদীশ্বর পাণিগ্রাহী হঠাৎ মারা যায়। কেউ তাকে খুন করে নি। তবু মৃত্যু ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। কেমন সন্দেহজনক বলে সকলের মনে হয়েছে। ভুবনেশ্বরে জগদীশ ছিল পুলিশের ইনফর্মার। উদয়গিরি-খণ্ডগিরি পাহাড়ের পিছনে ঘন জঙ্গলে সুন্দর সিংহের গোপন আস্তানার খোঁজ ওই লোকটাই তাকে এনে দিয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—জগদীশ্বর পাণিগ্রাহী যে তাকে এই গোপন ডেরার খোঁজ দিয়েছিল, এই কথাটা তিনি কাউকে বলেননি। রিপোর্টেও লেখেননি।

তবু—

পরনে একটা ঢিলে-ঢালা স্লিপিং সুট। বাঁ হাতটার সাহায্যে অতিবিক্রম তাঁর রিভলবারটা স্পর্শ করবার চেষ্টা করলেন। না, ঠিক আছে। বিকেলবেলায় ওটা সঙ্গে নিয়েই তিনি বেরিয়েছিলেন। হোটেলের ঘরে রেখে যেতে সাহস পাননি। তাছাড়া দীর্ঘকাল পুলিশের চাকরিতে ছিলেন। তখন থেকেই অভ্যেস,—রিভলবারটা সর্বদাই কাছে থাকে। এমন কী রাত্তিরবেলা নিজের বাড়িতে ওটা সন্তর্পণে বালিশের নীচে রেখে তিনি নিদ্রা যান। আর এ তো বিদেশ—মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যদি প্রয়োজন হয়।

রিভলবারটা স্পর্শ করে অতিবিক্রম যেন সাহস পেলেন। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, —'কোণারকে কখন এসেছ? সকালে?'

—'না, না।' সুন্দর সিং মাথা নেড়ে বলল, 'কোণারকে এলাম এই তো ঘণ্টা দুই-তিন আগে।'

অতিবিক্রম তেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, —'এখানে কদিন থাকবে?'

—'কদিন আবার? হয়তো কালই চলে যেতে পারি। কোণারকে কতবার এসেছি। তবু হোটেলে সামান রেখে মন্দিরে একবার চক্কর দিয়ে এলাম। তারপর সন্ধে হতেই ভাবলাম, যাই আপনার সঙ্গে ভেট করে আসি।'

অতিবিক্রম ওর মুখের উপর নজর বুলিয়ে কী জিজ্ঞাসা করবেন ভাবছিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে শুধোলেন,—'এখন কী করছ?'

প্রশ্নের গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরে সুন্দর সিং মুচকি হাসল। বলল, —'সাচবাত শুনবেন? বিশোয়াস করবেন তো?'

অতিবিক্রম মুখের উপর থেকে সন্দেহের ছায়াটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে বললেন, —'মিছিমিছি তোমাকে অবিশ্বাস করতে যাব কেন? ভুল বুঝতে পেরে কত লোক নিজেকে শুধরে নেয়। আর বিপথে পা বাড়ায় না।'

সুন্দর সিং হাসিমুখে বলল,—'আমি এখন ট্রান্সপোর্টের কারবার করছি মজুমদার সাব।'—

'ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা?' অতিবিক্রম ফের যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন,—'তুমি ট্রাক কিনেছ নাকি?'

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। অতিবিক্রম এবার বিছানার উপরেই বসলেন। সুন্দর সিংকে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। মৃদু হেসে সে বলল,—'না, না, ট্রাক কিনব কেমন করে? অত টাকা কোথায় বলুন?'

—'শুনেছি টাকা আজকাল কিস্তিতে দেওয়া চলে। ব্যাঙ্কেও লোন পাওয়া যায়।'

সুন্দর সিং হতাশার সুরে বলল,—'আমি জেলখাটা আসামী। ব্যাঙ্ক আউর মহাজন যার কথাই বলুন,—এতনা রুপিয়া কোই লোন দেবে না।'

—'তাহলে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা চলে কেমন করে?'

সুন্দর সিং বলল,—'কেন চলবে না? আমি ট্রাক ভাড়া নিই মজুমদার সাব। তারপর মাল বোঝাই করে সব জায়গায় ডেলিভারি দিয়ে আসি।'

—'তুমি নিজেই ট্রাক চালাও?'

—'দরকার হলে চালাতে হয়। কিন্তু আমার দুজন লোক আছে। ওরা ফুল-ট্রাক লোড নিয়ে কলকাতা—বোম্বাই-মাদ্রাজ,—যেখানে প্রয়োজন সেখানেই মাল পৌঁছে দিচ্ছে।'

অতিবিক্রম এবার ওর মতলবটা জানতে মনস্থ করলেন। একজন জেলখাটা আসামীর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করে লাভ নেই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলেন,—'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ কেন? কোনো প্রয়োজন আছে?'

প্রশ্নটা শুনে সুন্দর সিং কিন্তু আর আগের মত হাসল না। ধীরে ধীরে তার মুখের চেহারাটা বদলে গিয়ে কেমন এক ধরনের ক্রূর নির্দয়তা ফুটে উঠল। অতিবিক্রমের সেটা নজর এড়াল না। আবার সেই নিষ্ঠুর ভাবটা মিলিয়ে যেতেই মেঘলা দিনের আচমকা ঘন ছায়া পড়ার মত তার মুখখানা মলিন নিষ্প্রভ দেখাল।

সুন্দর সিং ধীরে ধীরে বলল,—'আপনাকে একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল মজুমদার সাব।'

—'কী কথা?' অতিবিক্রমের কণ্ঠস্বর এবার যেন সামান্য দুর্বল শোনাল। তার হঠাৎ মনে হল জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সুন্দর সিং কলকাতায় তাঁকে টেলিফোন করে কী যেন বলতে চেয়েছিল। তার সঙ্গে একদিন ভেট করবে বলেছিল। কিন্তু পরে আর দেখা করেনি।

কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুন্দর সিং পরিষ্কার বলল,—'হিরে-চুরির কেসে আপনি অন্যায়ভাবে আমাকে আসামী করেছিলেন।'

—'তার মানে?' অতিবিক্রম মুহূর্তের জন্য একবার কেঁপে উঠলেন। লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়। আজ পুলিশের চাকরিতে থাকলে এই ঔদ্ধত্য কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত ক্ষমতাহীন। তাছাড়া এই কোণারকে তিনি প্রায় একাকী। অবশ্য সি. আই, ডি ইন্সপেক্টর রাজীব স্যানাল আছেন। বিপদে পড়লে রাজীবের সাহায্য তিনি চাইতে পারেন।

অপাঙ্গে ওকে একবার লক্ষ্য করে অতিবিক্রম শুধু বললেন,—'কেসে তোমাকে আসামী করেছিলাম ঠিক। কিন্তু বিচারে তোমার সাজা হয়েছিল সুন্দর সিং।'

শাস্তির কথা শুনে সুন্দর সিং কেমন তাচ্ছিল্য করে হাসল। সম্পূর্ণ নিরুত্তেজিত গলায় বলল, —'সাজা হয়েছিল জরুর। শালা পরামানন্দ তেওয়ারীকে আপনি রাজসাক্ষী করেছিলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ব্যাটা গড়গড় করে সরকারি উকিলের শেখানো বুলি আউড়ে গেল। তাই মামলায় আমার বিরুদ্ধে তেমন জোরালো প্রমাণ না থাকলেও সাজা হতে অসুবিধে হয়নি।'

অতিবিক্রম গম্ভীর মুখে বললেন,—'ওসব পুরানো কথা। এখন আর আলোচনা করে লাভ নেই।'

সুন্দর সিং তবু বলল,—'পার্ক স্ট্রিটে সন্তলাল রতিরাম জহুরীর দোকান থেকে যে হিরেটা চুরি গিয়েছিল পুলিশ কিন্তু তার সন্ধান পায়নি।'

—'পাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তোমরা আগেই সেই দামী পাথরটা পাচার করে দিয়েছিলে।'

সুন্দর সিং বলল,—'শালা পরামানন্দ মহা ধড়িবাজ। স্মাগলিংয়ের যে দলে ও কাজ করত, তার চাঁইদের কারো নাম ফাঁস করেনি। যাতে দলটা না ডিগবাজি খায়। পার্ক স্ট্রিটের সন্তলাল রতিরাম জহুরীর দোকানে রোলিং শাটার ভেঙে ওরা গ্যাস মেসিনের সাহায্যে লোহার আলমারির চাদর কেটে ফেলবে সে খবর আমি জানতাম। কলকাতায় রোলিং শাটার ভাঙতে ইব্রাহিম ওস্তাদ। সেদিন রাত্তিরে দলে সে ছিল। কিন্তু পরামানন্দ তার নাম বলেনি।'

অতিবিক্রম পরিহাস করে বললেন,—'যদি সবই জানতে তাহলে পুলিশকে একটা টেলিফোন করলেই হত। তাতে সাজার বদলে হয়তো তোমাকে একটা রিওয়ার্ড দিতে পারতাম।'

—'পুলিশকে খবর দেব? রিওয়ার্ডের জন্য?' সুন্দর সিং ঘৃণায় মুখ কুঁচকে জবাব দিল। বলল,

—'আমি ডাকু, স্মাগলার হতে পারি মজুমদার সাব। লেকিন পুলিশের ইনফর্মার নই।'

অতিবিক্রম রাগ করে বললেন,—'তোমার ডিফেন্স যা বলেছিল আদালত তা বিশ্বাস করেনি। আসলে পার্ক স্ট্রিটে সন্তলাল রতিরামের দোকানে বৃষ্টিভেজা শেষ রাত্তিরে যে অপারেশন হয়েছিল সেটা তোমার উপস্থিতিতে এবং নির্দেশে। পরামানন্দ তেওয়ারী তার স্টেটমেন্টে সব কথা ডিটেলসে কবুল করেছে। আদালতের রেকর্ডে তা আছে।'

সাপের মত হিস হিস করে উঠল সুন্দর সিং। দাঁতে দাঁত চিপে বলল,—'শালা পরামানন্দকে ওর দলের লোকেরাই খতম করে দিয়েছিল। সেটা আমার সাজা হওয়ার তিন মাস পরের ঘটনা। খড়্গপুর আর নারায়ণগঞ্জ স্টেশনের মাঝখানে রেললাইনের ধারে পুলিশ ওর ডেড-বডিটা আবিষ্কার করে। অবশ্য এই নিয়ম। পুলিশের কাছে যে একবার মুখ খোলে দলের লোক তাকে আর কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।'

অতিবিক্রমের ইচ্ছে হল কথাটা ওকে জিজ্ঞাসা করবেন। হিরেচুরির অপারেশনে যদি সুন্দর সিংহের কোনো হাত ছিল না, তাহলে পরমানন্দ তাকে এমন করে ফাঁসিয়ে দিল কেন? তার কারণ কী? কিন্তু লোকটাকে আর আমল দেওয়া ঠিক হবে না ভেবে অতিবিক্রম কোনো মন্তব্য করলেন না। শুধু বললেন, —'রাত্তির অনেক হল। যাও হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম কর। যা হবার তা ঘটে গেছে। আর এখন তো তুমি ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করছ। পুরানো দিনের কথা ভেবে লাভ নেই।'

—'আপনি তাই বলবেন। কিন্তু আমার যে ক্ষতি হল।' সুন্দর সিং আরো কিছু যেন বলতে গিয়ে থামল।

—'ক্ষতি?' অতিবিক্রম ওর মুখের দিকে তাকালেন।

সে কোনো উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত কেমন চুপ করে রইল। তারপর নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে হঠাৎ বলল,—'আপনার লেড়কি আর জামাইকে দেখলাম। দুজনে কোণারকের মন্দির দেখছে।'

অতিবিক্রমের সামান্য ভাবান্তর হল। বাঁকাভাবে তার দিকে তাকিয়ে শুধোলেন,—'ওদের তুমি চিনলে কেমন করে?'

—'কেয়া বাত!' সুন্দর সিং শব্দ করে হেসে উঠল। বলল,—'আপনার লেড়কিকে আমি চিনতে পারব না মজুমদার সাব। সে তো ঠিক আপনার মাফিক দেখতে আছে।' কথা শেষ হতেই তার দৃষ্টি কেমন রহস্যজনক মনে হল। ঘর থেকে সুন্দর সিং নিষ্ক্রান্ত হবার পরই অতিবিক্রম আরো ভাবনায় পড়লেন। লোকটা কী যেন ক্ষতির কথা বলছিল? কী ক্ষতি? আচ্ছা, কোণারকের সূর্যমন্দিরে অত লোকের মাঝখানে বিদিশা আর শঙ্করকে সে ঠিক লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কেন? আজ বিকেল থেকে পরপর কয়েকটি ঘটনা অতিবিক্রমকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করেছে। শঙ্কর সকালবেলায় এসে না পৌঁছলে হয়তো তিনি একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে চাইতেন। যে কথাটা তাঁর কানে এসেছে সেটা একবার যাচাই করে দেখতেন। কিন্তু জামাতা সশীরের হাজির,—তাই ছোটখাটো ঘটনাকে তিনি আর ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করতে চান না। সত্যি বলতে অপ্রত্যাশিতভাবে সকাল দশটার আগেই শঙ্কর এসে উপস্থিত হতে তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এখানে মানে কোণারকে আর একটি দিনও থাকবার ইচ্ছে নেই তাঁর। আগে ভেবেছিলেন কোণারক থেকে মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে নানা দ্রষ্টব্য স্থানে বেড়িয়ে আসবেন। কিন্তু ঘটনা দ্রুত এমন মোড় নিচ্ছে যে, উড়িষ্যায় আরো দু-এক দিন থাকা তিনি আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না। সুবিধের কথা এই যে শঙ্কর নিজেই তাড়াতাড়ি কলকাতা ফেরার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং এখানে আর অনর্থক বিলম্ব করবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া কোণারকে রাজীব সান্যাল এসে পৌঁছতেই তিনি

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে খুব শিগগির একটা রহস্যের কিনারা হতে চলেছে। এবং এই রহস্যের জাল ছিন্ন করতে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে একটা অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে যেতে পারে।

শেষ রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। এখানকার বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ। কলকাতার মত ধোঁয়ায় ভরা অথবা ধূলিকীর্ণ নয়। আকাশে নক্ষত্ররাজি দীপাবলীর আলোকমালার মত দেদীপ্যমান।

বোধ হয় কৃষ্ণা চর্তুদশী। একটা পেঁচা কর্কশ শব্দে চিৎকার করে নৈশ গগনে কোথায় উড়ে গেল। ধীরে ধীরে কোন অতিকায় অশরীরী আত্মার মত পৃথিবীর বুকে গাঢ় কুয়াশা ঘনিয়ে এল। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দ নৈশ যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গের সৃষ্টি করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন কার অস্ফুট আর্তনাদ। শীতের রাত্তিরে যারা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল তারা কেউ কেউ পাশ ফিরে শুয়ে আবার নিদ্রিত হল। অনেকেরই ঘুম ভাঙল না।

ভোরবেলায় কপাটে ব্যস্ত করাঘাত শুনে অতিবিক্রম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা কী ভাল করে বোঝার আগেই তিনি হতচকিত, চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর দরজার সামনে সান-টেম্পল হোটেলের তিন-চারজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে ব্যথিত, বিষণ্ণ দৃষ্টি।

উদ্বেগভরা কণ্ঠে অতিবিক্রম প্রশ্ন করলেন, 'এই, কী হয়েছে? কী হয়েছে বলবে তোমরা?'

চারজন বেয়ারা কয়েক মুহূর্ত একে অন্যজনের মুখের দিকে তাকাল। কথাটা কে বলবে তাই বোধহয় ওরা নিজেদের মধ্যে স্থির করতে নিতে চাইল।

হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে অতিবিক্রম অবাক হলেন। ঘুমভাঙা চোখে বিদিশা ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এসে বলল,—'বাবা, ওকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এই ভোরবেলায় কোথায় গেল বলতে পার?'

চারজন বেয়ারা এক মুহূর্ত শুধু চুপ করে রইল। তারপর একজন সখেদে সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনাল।

শুনে বিদিশা ডুকরে কেঁদে উঠল। অতিবিক্রম হতবাক। নিষ্পলক, যেন ধীরে ধীরে জমাট শক্ত তুষার শিলায় পরিণত হচ্ছেন তিনি। একি নিদারুণ বার্তা।

শঙ্কর নেই। কোণারকের সূর্যমন্দিরের পিছনে তাঁর মৃতদেহটা ওরা এইমাত্র দেখতে পেযেই ছুটে আসছে।

জামাটা কোনমতে মাথায় গলিয়ে অতিবিক্রম সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামছিলেন। ছোট জায়গা। খবরটা ইতিমধ্যেই শঙ্খধ্বনির মত সর্বত্র চাউর হয়ে গেছে। যারা দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে তারা কেউ কেউ শয্যাত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে। নীচে নেমেই অতিবিক্রম দেখলেন সান টেম্পল হোটেলের মালিক অরুণ কুমার কেডিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অতিবিক্রমকে দেখে কেডিয়া কাছে এসে বলল,—'আমি খুবই দুঃখিত স্যার। এই দুঃসময়ে আপনাকে কী বলে সান্ত্বনা জানাব।'

অতিবিক্রম নীরব, কোন উত্তর দিলেন না।

কেডিয়া ফের বলল,—'একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বাইরে অপেক্ষায় আছেন।'

—'ভদ্রলোক?' অতিবিক্রম শুকনো মুখে তাকালেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে লোকটি ততক্ষণে সামনে এসে গেছে। চোখাচোখি হতেই অতিবিক্রম অস্ফুটে বললেন—'মিস্টার সান্যাল, আপনি?'

লোকটি মৃদুস্বরে বলল, —'খবরটা জানতে পেরেই চলে এলাম স্যার। কোণারকে এসে এমন একটা অভাবনীয় ঘটনা শুনতে হবে গতকাল রাত্তিরেও তা ভাবতে পারিনি।'

অতিবিক্রম বললেন,—'এর জন্য আমি দায়ী মিঃ সান্যাল। নইলে শঙ্করের তো কলকাতাতেই

আসবার কথা ছিল। আমার হঠাৎ কী খেয়াল চাপল তাই ওকে দিল্লি থেকে এখানে আসতে চিঠি লিখেছিলাম।'

রাজীব বলল,—'এসব আলোচনা এখন থাক স্যার। এই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর রহস্য আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সুতরাং তদন্ত শুরু করবার আগে আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত হবে না।

অতিবিক্রম ইতস্তত করে বললেন,—'কিন্তু আপনি তো এখানে শুভ্রাংশু গুপ্ত। একজন ফিল্ম প্রডিউসার। বইয়ের লোকেশন খুঁজতে এসেছেন। হঠাৎ একটা খুনের কেসের তদন্ত শুরু করলে আপনার ফিল্ম প্রোডাকশনের গল্পটা কেউ বোধহয় আর বিশ্বাস করবে না। তারজন্য আপনার এখানে আসবার আসল উদ্দেশ্যটা শেষপর্যন্ত না মাটি হয়।'

রাজীব বলল,—'আমি একটি রোমহর্ষক ক্রাইম স্টোরির লোকেশন খুঁজতে এসেছি। সুতরাং কোনো খুনের ঘটনায় আমার কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া উড়িষ্যার পুলিশ যথারীতি তদন্ত শুরু করবে। আমি তাদের সঙ্গে থাকব। অতএব সন্দেহ করবার মতো খুব বেশি অবকাশ থাকবে না।

অতিবিক্রম মৃদুস্বরে বললেন,—'আপনাকে দেখে ভরসা পাচ্ছি মিঃ সান্যাল। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আপনার মতো কৃতী অফিসার খুব কমই আছেন। কত দুরূহ কেসে আপনি হত্যাকারীকে ঠিক খুঁজে বের করেছেন। আমরা সিনিয়র অফিসাররা সেজন্য গর্ব অনুভব করেছি।'

রাজীব চুপ করে শুনছিল। তার হঠাৎ সেই কথাটা মনে হল। 'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।' ট্রেনে সুব্রত তাকে বলেছিল, —'দেখুন মিথ্যে ফিল্ম প্রোডিউসারকে তার বইয়ের লোকেশন খোঁজা ছেড়ে আবার খুনের কেসের ইনভেস্টিগেশন না শুরু করতে হয়।' উপায় নেই। অদৃষ্টে এই লিখন। নইলে শেষ পর্যন্ত কোণারকে এসে একটা আনন্যাচারাল ডেথ কেসের তদন্ত তাকে ঘাড় পেতে নিতে হচ্ছে।

অতিবিক্রমের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'ভুবনেশ্বরে পুলিশ হেড কোয়ার্টাসে খবর পাঠাতে বলেছি। মনে হয় এতক্ষণ সেখান থেকে কিছু ইনভেস্টিগেটিং বলেছি। মনে হয় এতক্ষণ সেখান থেকে কিছু ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আর কনস্টেবল রওনা হয়ে গেছে।'

'কনস্টেবল?' অতিবিক্রম হতাশ ভঙ্গিতে বললেন,—'তদন্তে তারা কী সাহায্য করবে?'

রাজীব উত্তর দিল, 'তদন্তের জন্য নয় স্যার। আসলে আমাদের কিছু লোকজন প্রয়োজন। কোণারক থেকে এখন অনেকেই চলে যেতে চাইবে। সন্দেহভাজন মনে হলে কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য আমরা ডিটেন করব। এইসব কারণে পুলিশ কনস্টেবলের সাহায্য দরকার হবে।'

ভুবনেশ্বর থেকে কোণারক প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। অন্তত ঘণ্টা দেড় সময় পৌঁছতে লাগে। সকাল সাতটার আগে পুলিশ আসতে পারবে বলে মনে হয় না। অবশ্য ন'টার আগে কোনো বাস নেই। কিন্তু প্রাইভেট কার আছে। সিজন টাইম বলে কোণারকে জনকয়েক পুলিশ পোস্টেড ছিল। সুব্রতকে তাই সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে যদি কেউ কোণারক-ভুবনেশ্বর রোডের ওপর কিছুক্ষণ নজর রাখতে পারে।

ধরণীর বুকে কুয়াশাও তখনও ভাসছে। তবে এখন অনেক পাতলা—বিশ-পঁচিশ হাত দূরের মানুষকেও দিব্যি নজর হয়। শেষ রাত্তিরে এবং আরো ভোরের দিকে হয়তো কুয়াশা ঘন হয়ে নেমেছিল। আবার রোদ উঠলেই সব কোথায় মিলিয়ে যাবে।

দুজনে যখন অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছল, তখন সেখানে বেশ ভিড়। বিদিশা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু অতিবিক্রম মেয়েকে আনেন নি। ডেড-বডিটা তো এরপর হোটেলেই নিয়ে

আসতে হবে। তাছাড়া গতকালও যে বেঁচেছিল, তার সঙ্গে কথা বলেছে, সেই শঙ্কর তো আর নেই। এখন শুধু একটা প্রাণহীন অবয়ব। ওই নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে মেয়ের মনের কোন দুঃখটা ঘুচবে?

একজন কনস্টেবল মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছে। আর প্রায় বৃত্তের আকারে কিছু কৌতূহলী জনসাধারণ নানা কোণ থেকে তাই লক্ষ্য করে হাজার রকম মন্তব্য করছে। রাজীব কাছে গিয়ে কী বলতেই সেই কনস্টেবলটি ভিড়ের দিকে প্রায় তাড়া করে ছুটে গেল। হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে কর্কশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে তার মাতৃভাষায় কিছু বলতেই নিমিষে ভিড় পাতলা হয়ে এল। লোকজন সব ঘটনাস্থল ছেড়ে এদিকে সেদিকে যেতে শুরু করল।

শঙ্করের মৃতদেহটা মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পরনে ট্রাউজার্স, পায়ে একটি চটি। অন্য চটিটা খানিকটা দূরে। গায়ে চেক শার্ট। বাঁ হাতটা সামনে ছড়ানো। কব্জিতে ঘড়ি। রাজীব একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল, কাচটা ভাঙা। কাঁটা দুটো তিনটে বেজে আটত্রিশ মিনিটে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পকেট থেকে নোটবই বের করে রাজীব সময়টা লিখে রাখল।

জামাতাকে ওই অবস্থায় দেখে অতিবিক্রম দুই হাত মুখ ঢাকলেন। তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। রাজীব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—'এভাবে ভেঙে পড়লে কেমন করে তদন্ত হবে স্যার? এই কেসে আপনার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাব, তাই কিন্তু আশা করে আছি।'

অতিবিক্রম ভিজে গলায় বললেন,—'শঙ্করের এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী মিঃ সান্যাল। দিল্লি থেকে ওকে আমি কোণারকে আসতে বলেছিলাম। সেই চিঠি না লিখলে ওর আজ এই পরিণতি হত না।'

'শঙ্করবাবুর এই নিয়তি স্যার।' জ্ঞানী দার্শনিকের মত রাজীব মন্তব্য করল। কী ভেবে ফের বলল,—'চিঠি লেখার কথা বলছেন? ওটা নিমিত্তমাত্র। তাছাড়া মৃত্যু যখন আসে, তখন তাকে কেউ রোধ করতে পারে না।'

খানিকটা দূরে অতিবিক্রম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাজপড়া তালগাছের মত। বিষাদগ্রস্ত মলিন দৃষ্টি। রাজীব তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, '—এটা সুইসাইড কি না তা একবার যাচাই করে নেওয়া ভালো।'

অতিবিক্রম নিরাসক্ত স্বরে উত্তর দিলেন,—'তা যাচাই করতে পারো। কিন্তু আমি ভাবছিলাম শঙ্কর হঠাৎ সুইসাইড করতে যাবে কেন? কী দুঃখ ছিল তার? পৃথিবীতে কী পায়নি সে?'

অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের মত রাজীব মৃতদেহের দিকে তাকিয়েছিল। ধীরে ধীরে সে বলল, —'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। গুলির ক্ষতচিহ্নটা লক্ষ্য করছি। মনে হয় ইট ওয়াজ এ শট্ ফ্রম সাম অটোমেটিক ওয়েপন্। তবু ডারমাল নাইট্রেট টেস্ট করা উচিত। সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।'

অতিবিক্রম আর কিছু বললেন না।

সমস্ত জায়গাটা যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল রাজীব।

সামনে-পিছনে, কাছাকাছি—তারপর কিছুটা দূর পর্যন্ত।

অতিবিক্রম বিষণ্ণ মুখে বসে।

রাজীব বলল, 'সুব্রত আসুক, প্যারাফিন এনে নাইট্রেট টেস্ট করবার ব্যবস্থা সেই করবে!'

শঙ্করের পিঠের ঠিক বাঁ দিকে ক্ষতচিহ্ন। গুলিটা বিঁধে আছে অথবা বেরিয়ে গেছে, তা দেহের একদিকে লক্ষ্য করে বোঝা শক্ত। রাজীব ইচ্ছে করেই মৃতদেহকে আর টানাটানি করল না। আগে ক্যামেরাম্যান এসে ছবি-টবি নিক। কী অবস্থায় মৃতদেহকে প্রথম দেখা গেছে, তার একটা রেকর্ড থাকা দরকার।

গুলির দাগটা ভাল করে পরীক্ষা করল রাজীব। ক্ষতের কাছে দেহের মাংস ভেতরে ঢুকে গেছে। ফোটা বেলফুলের মত বাইরে ছড়িয়ে যায় নি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই পথেই গুলিটা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। যদি বেরিয়ে গিয়েও থাকে, তাহলে সেই নির্গমন দ্বার শরীরের সামনের দিকে কোথাও সৃষ্টি হয়েছে।

হঠাৎ নিহতের বাঁ দিকের পকেটের দিকে তাকিয়ে রাজীব সন্দিগ্ধ হল। একটা সাদা কাগজের মত কী যেন বস্তু উঁকি দিচ্ছে। ওটা কি? রাজীব মৃতদেহের পাশে বসে প্রায় নিপুণ পকেটমারের মত দুই আঙুলের কৌশলে সেটি বের করে আনল। একটি ছোট স্লিপের মত কাগজ। কিন্তু তার উপর চোখ বুলোতেই রাজীবের মুখখানা হঠাৎ চোখে-পড়া একটা বিশেষ খবরের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার মতো অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল।

দূর থেকে অতিবিক্রম জিজ্ঞাসা করলেন,—'কী ব্যাপার মিঃ সান্যাল? শঙ্কর সুইসাইড করেছে বলে সন্দেহ হয় আপনার?'

—'আজ্ঞে না। সে রকম কোন ভাবনা-চিন্তা করবার মতো প্রমাণ এখনও পাইনি।' পকেটের কাগজটার কথা সে ইচ্ছে করেই বেমালুম চেপে গেল।

ইতিমধ্যেই সুব্রত এসে হাজির। পর্যবেক্ষণরত রাজীবকে দেখে সে বলল,—'অত মনোযোগ দিয়ে কী লক্ষ্য করছেন রাজীবদা?'

রাজীব মুখ তুলে বলল,—'তুমি একটু চারপাশে ভালো করে খুঁজে দেখো তো, যদি কোনো রিভলবার অথবা অন্যকিছু কাছাকাছি পড়ে থাকে।'

'রিভলবার?' সুব্রত যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'রিভলবার এখানে আসবে কোথা থেকে?'

রাজীব তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল,—'ধর শঙ্করবাবু যদি সুইসাইড করে থাকেন। তাহলে তাঁর রিভলবারটা এখানে মানে আশে-পাশে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে কেউ সেটা চক্ষুদান না করে থাকে।'

সুব্রত নাস্তিকের মত সন্দেহ প্রকাশ করল, 'আমার তো কেসটা সুইসাইড বলে মনে হচ্ছে না।'

শুধু মনে হলে তো চলবে না। সুইসাইড না হলে কেসটা হোমিসাইড, এটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তাই প্রথমে ভাল করে রিভলবারটার খোঁজ করো। তারপর শঙ্করবাবুর ডান হাতে প্যারাফিন মাখিয়ে পরে সেই প্যারাফিন ইমপ্রেশনের সঙ্গে ডাইফেনিলামিন দিয়ে নাইট্রেট পাও কিনা টেস্ট করে দেখো।'

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সুব্রত বলল, 'উঁহু। রিভলবারের কোনো হদিশ নেই।'

ইঙ্গিতে সুব্রতকে কাছে ডাকল রাজীব। ক্ষতচিহ্নের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এটা দেখে তোমার কী মনে হয়?'

নীরবে খানিকক্ষণ তা লক্ষ্য করে সুব্রত মাথা নেড়ে তার অক্ষমতা জানাল।

রাজীব বলল, 'ক্ষতচিহ্নটা প্রায় গোলাকার। এর থেকে প্রমাণ হয় যে গুলিটা ঠিক লম্বভাবে শঙ্করবাবুর পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করেছে। তাছাড়া ক্ষতচিহ্নের প্রান্তে এবং চারপাশে কালো পোড়া দাগ অথবা দেহের ত্বক ঝলসানোর কোনো চিহ্ন নেই। এর থেকে অনুমান করা যায় যে হত্যাকারী মোটামুটি দূর থেকেই নিশানা করে গুলি ছুঁড়েছিল। এবং সম্ভবত এই গুলি দেহের কোনো অতি প্রয়োজনীয় অংশকে সম্পূর্ণ অকেজো করে। ফলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়।'

এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল রাজীব। সুব্রত বোধ হয় তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল! কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই সে বলল, 'অবশ্য কনট্যাক্ট শটেও ক্ষতচিহ্নের প্রান্তে কালো পোড়া দাগ কিম্বা দেহের চামড়া ঝলসানোর চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে গুলির প্রবেশ

পথ বেশ বড়সড় দেখাবে এবং তা গোলাকার না হওয়াই সম্ভব। তাছাড়া শরীরের কোনো অংশের সঙ্গে পিস্তল অথবা রিভলবারের নল ঠেকিয়ে গুলি করলে, দেহের চামড়ায় নলের গোল দাগ খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয়।'

সুব্রত বলল, 'এই ক্ষতচিহ্ন পরীক্ষা করে শঙ্করবাবুর হত্যাকারী সম্বন্ধে আপনার কিছু অনুমান হয়?'

'তা হয় বৈকি।' রাজীব চিন্তা করে বলল, 'আমি আন্দাজ করছি, শঙ্করবাবুর হত্যাকারী বেশ লম্বা। উচ্চতায় তার চেয়ে কিছু বড়, অন্তত তিন চার ইঞ্চি বেশি।'

সুব্রত বলল, 'রিভলবার খুঁজতে গিয়ে আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি রাজীবদা।'

'কী জিনিস, দেখি?'

'তেমন কিছু নয়। মানে একটা বোতাম।'

ক্রীম রঙের সেই বোতামটা হাতে নিয়ে রাজীব সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। পরে বলল, 'বোতামটা একটু বড় সাইজের, তাই না সুব্রত?'

কথাটার সঠিক অর্থ কী, বুঝতে না পেরে সুব্রত চুপ করে রইল।

রাজীব ফের জিজ্ঞাসা করল, 'বোতামটা তুমি কোথায় পেলে?'

সুব্রত একটু চিন্তা করে জায়গাটা তাকে দেখিয়ে দিল।

মৃতদেহের অবস্থান থেকে সেই জায়গাটা কতদূর, রাজীব ফিতে বের করে তা মাপল। পকেট থেকে নোটবুক নিয়ে সে দূরত্বটুকু লিখে রাখল।

ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বর থেকে এক গাড়ি পুলিশ এসে হাজির। অন্তত জন তিন-চার অফিসার, দশ-বারো জন কনস্টেবল।

তাদের সঙ্গে পরিচয়-পর্ব শেষ হতেই রাজীব বলল, 'ডেড বডির দু' একটা ছবি তুলতে হবে। মৃতদেহটা যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেই ছবি। তাছাড়া গুলির দাগের একটা স্ন্যাপ নিলেও ভাল হয়। তারপর ওটা অটোপ্সির জন্য পাঠিয়ে দিন। আর সুব্রত একটা ডারমাল নাইট্রেট টেস্টের ব্যবস্থা করবে। তার জন্য ওর একটু সাহায্য দরকার।'

উড়িষ্যার সিনিয়র পুলিশ অফিসারটি ভাল লোক। ভদ্র, মার্জিত ব্যবহার। মৃদু হেসে তিনি সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফের বললেন, 'আর কিছু?'

রাজীব বলল—'অন্য একটা কাজও করতে হবে। কোণারক ছেড়ে সন্দেহভাজন কোনো লোককে যেতে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে কিছুক্ষণ ডিটেন করবেন।'

অতিবিক্রম চুপ করে বসেছিলেন। ভগ্ন মন, ব্যথিত হৃদয়। দৃষ্টি উদাস, শূন্য।

উড়িষ্যার সিনিয়র পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল রাজীব। একদা লালবাজারে ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা ছিলেন জেনে সে রীতিমত খাতির করল। এই মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যের কথায় দুঃখপ্রকাশ করে বলল,—'আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি শোকে অত মুষড়ে পড়বেন না। বরং শক্ত করে বুক বাঁধুন।

অতিবিক্রম কোনো জবাব দিলেন না। তেমনি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

উড়িষ্যার সেই পুলিশ অফিসারটি নিজেই বলল,—'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তাছাড়া মিঃ গুপ্ত রয়েছেন। মনে হয় ওঁরা সাহায্য পেলে এই মৃত্যু রহস্যের একটা কিনারা হবে।'

অতিবিক্রম মৃদুস্বরে বললেন,—'মিঃ গুপ্তের আইডেনটিটিটা কি জেনেছেন?'

চাপা কণ্ঠে সে উত্তর দিল,—বিলক্ষণ। তবে আমরা এখানে ওঁকে গোয়েন্দা কাহিনির প্রোডিউসার মিঃ শুভ্রাংশু গুপ্ত বলেই পরিচয় দেব। যাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কোনো অন্তরায় না হয়। খুনের কেসের প্রতি ভদ্রলোকের একটা স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা আছে,—পাঁচজনকে এই পর্যন্ত বলতে পারি।'

রাজীব কাছে গিয়ে বলল,—'চলুন স্যার, আপনার মেয়ের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। স্বীকার করতেই হবে পুরুষমানুষের স্ত্রী হল সব চেয়ে ঘনিষ্ঠজন। তদন্তের কাজে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক সাহায্য আশা করতে পারি।'

সাত

দরজা খুলে বিদিশা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

সদ্য পতিহারা, শোকার্ত রমণী। এখনই তার কাছ থেকে স্বাভাবিক শিষ্টাচার আশা করা সঙ্গত নয়।

মেয়ের ওই উদভ্রান্ত দিশাহারা ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে অতিবিক্রম যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—'এই ভদ্রলোকের নাম মিঃ শুভ্রাংশু গুপ্ত। উনি একটা ক্রাইম স্টোরি নিয়ে বই করবেন। তারই লোকেশন খুঁজতে কোণারকে এসেছেন। শঙ্করের এই আকস্মিক মৃত্যুতে ভদ্রলোক খুবই দুঃখিত। ডেড-বডিটা যেখানে পাওয়া গেছে আমার সঙ্গে উনি সেখানে গিয়েছিলেন। ওঁর ধারণা গতকাল রাত্রি সাড়ে তিনটে নাগাদ শঙ্করকে কেউ পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেছে। এই কেসটা নিয়ে উনি নানারকম চিন্তাভাবনা করছেন। আর সেই প্রয়োজনে তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান।'

বিদিশার মুখের উপর এক পলক নজর বুলিয়ে নিল রাজীব। চোখ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত। দৃষ্টিতে শোকের চেয়ে এখন ভাবনা বেশি। মনে হল তদন্তের কথা শুনে সে গভীরভাবে কী চিন্তা করছে।

রাজীব হাত তুলে নমস্কার করে বলল, —'বিদিশা দেবী, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। আশা করি সম্ভব হলে তার সঠিক উত্তর দেবেন।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তৃতীয়জনের উপস্থিতি হয়তো কাম্য নয়। তাই ভেবে অতিবিক্রম নিজেই বললেন,—'আমি সাত নম্বর ঘরে আছি। আপনার কথা শেষ হলে ওখানেই আসুন মিঃ গুপ্ত।'

একটা চেয়ারের ওপর ভালো করে বসল রাজীব। তার হাতে ছোট একটা পেন্সিল এবং নোটবুক। চোখ তুলে এক পলক বিদিশার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'শুনলেন তো, গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা নয়। বরং এক ধরনের নেশা বলতে পারেন। ক্রাইম-স্টোরি নিয়ে বই করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমার সত্যি গোয়েন্দা হতে খুব সাধ হয়।'

বিদিশা অপাঙ্গে একবার তাকাল। কোন কথা বলল না।

রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'আপনাদের বিয়ে কতদিন হয়েছিল?'

একটু চিন্তা করে বিদিশা উত্তর দিল, 'সাড়ে তিন বছর হবে।'

'আচ্ছা, শংকরবাবু বিদেশে কতদিন ছিলেন?'

'তিন বছরের সামান্য কিছু বেশি। আমাদের বিয়ের ঠিক চার মাস পরেই ও ইংলন্ডে পড়তে গেল।'

'শুনেছি, ইংলন্ড থেকে ভাল চাকরি নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন।'

'হ্যাঁ। ফরিদাবাদে একটা বড় কোম্পানিতে সিনিয়র এগজিকিউটিভ হিসেবে শঙ্কর জয়েন করে।'

'হঠাৎ আপনারা কোণারকে এলেন কেন বলুন তো? শঙ্কর বাবুকেই বা এখানে আসতে লেখা হল কেন?'

বিদিশা শূন্য চোখে তাকাল। বলল, 'ওটা আমার বাবার খেয়াল। কথা ছিল, এখানে কয়েকদিন থেকে ওর সঙ্গেই আমি, ফরিদাবাদে যাব।'

'সেকথা আপনাকে শঙ্করবাবু চিঠিতে লিখেছিলেন তো?'

মুহূর্তের জন্য বিদিশাকে সামান্য চঞ্চল দেখাল। বলল, 'না, মানে ঠিক আমাকে লেখে নি। ইন্ডিয়াতে ফিরে ও বাবাকেই চিঠি দিয়েছিল।'

'তাহলে ইংলন্ড থেকে ফিরে আসবার আগে উনি নিশ্চয় তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনাকে পত্র দিয়েছিলেন?'

বিদিশা ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ চিন্তা করে বলল, 'দেখুন, বিদেশে থাকতে লেখাপড়া আর চাকরি—দুই নিয়ে ওকে খুব ব্যস্ত থাকতে হত। তাই আমাকে চিঠিপত্র লেখার একটুও ফুরসৎ পেত না। প্রথম দিকে তবু কিছু চিঠিপত্র লিখত, কিন্তু শেষ দিকে আর বোধ হয় সময় পায়নি।'

রাজীব এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ফের জিজ্ঞাসা করল,—'শঙ্করবাবু শেষ কবে চিঠি লিখেছিলেন?'

প্রশ্নটা বিদিশাকে ঈষৎ বিব্রত করল। তবু সহজ হবার চেষ্টা করে সে বলল,—'ঠিক তারিখটা মনে নেই। তবে ওঁর পরীক্ষা শুরু হতে তখনও তিন-চার মাস বাকি।'

—'তাহলে সেটা প্রায় পাঁচ-ছ মাস আগের কথা।'

বিদিশা কিছু না ভেবেই বলল, 'তা হতে পারে।'

রাজীব তার নোটবুকে কয়েকটা কথা লিখে নিল। বলল,—'আচ্ছা, গতকাল সারাদিন শংকরবাবুর সঙ্গে নিশ্চয় আপনার অনেক কথাবার্তা হয়েছে?'

বিদিশা মুখ নিচু করে কী যেন ভাবছিল।

রাজীব বলল, 'প্রায় তিন বছর পরে দেখা। এতদিন বাদে আপনজনদের কাছে পেয়ে শঙ্করবাবু নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছিলেন, তাই না?'

বিদিশা চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'এ প্রশ্নটা কেন করছেন জানতে পারি?'

'না মানে, ধরুন এমনিই।' রাজীব হাসল। বলল, 'আর খুশি হওয়ার কথা। তিন বছর পরে স্ত্রী কিংবা ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে এলে মানুষের মনে একটু আনন্দ হবেই।'

'তাই অবশ্য হয়।' বিদিশা স্বীকার করল। পরে যেন স্বামীর অদ্ভুত স্বভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, 'কিন্তু কী জানেন, শঙ্কর একটু অন্য ধরনের মানুষ ছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের উল্লাসের কথা চট করে বোঝা যেত না।'

'আশ্চর্য!' রাজীব বেশ অবাক হয়ে বলল, 'আপনি সহধর্মিনী হয়েও স্বামীর মনের কথা টের পেতেন না?'

বিদিশা সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর পরিষ্কার জবাব দিল, 'না।'

তার হাতের পেন্সিলের উল্টোদিকটা নোটবুকের মলাটের উপর রেখে অন্তত তিন-চার বার টোকা দিল রাজীব। বলল, 'আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব বিদিশা দেবী?'

'হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।'

'আচ্ছা, গতকাল শঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার কোনো সিরিয়াস আলোচনা হয়েছিল?'

'সিরিয়াস আলোচনা বলতে আপনি কী মিন করছেন?'

বিদিশা পাল্টা প্রশ্ন করল।

রাজীব কী উত্তর দেবে বোধহয় তাই চিন্তা করতে লাগল।

বিদিশা নিজেই বলল, 'গতকাল শঙ্কর এসে পৌঁছল সকাল দশটার পর। বাবার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা সেরে আমার সঙ্গেও খানিকক্ষণ গল্প করল। এখানকার সব খবর-টবর নিচ্ছিল। বিকেল-বেলায় দুজনে কোণারকের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। এই সূর্য মন্দিরের ইতিহাস আর স্থাপত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।'

বাধা দিয়ে রাজীব বলল, 'ওসব কথা নয়। আমি জানতে চাইছি আপনাদের কোন পার্সোন্যাল ম্যাটার মানে ব্যক্তিগত বিষয়, যা নিয়ে দুজনের ভুল বোঝাবুঝি, মন কষাকষি কিম্বা কলহ হয়েছিল?'

এত দুঃখেও বিদিশা ম্লান হাসল। বলল, 'কলহ-বিবাদ করা তার স্বভাব ছিল না। ও কথা মুখে আনলেও অন্যায় হবে।'

রাজীব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা গতকাল রাত্তিরে আপনারা কখন ঘুমোতে গেলেন?'

বিদিশা একটু চিন্তা করে বলল,—'তখন বোধহয় সাড়ে দশটা হবে। গতকাল সাড়ে নটা নাগাদ আমরা ডিনার সেরে ফিরে এলাম। তারপর শঙ্কর গেল বাবার সঙ্গে কী যেন কথাবার্তা বলতে।

ঠোঁট কামড়ে রাজীব বলল,—'গতকাল রাত্তিরে ডিনারের পর শঙ্করবাবু আপনার বাবা মানে মিঃ মজুমদারের ঘরে গিয়েছিলেন?'

বিদিশা বলল,—'হ্যাঁ, ও ফিরে এলো তা প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।'

—'শঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ কথা কী হয়েছিল বলবেন?'

—'তেমন কিছু নয়।' বিদিশা সোজাসুজি উত্তর দিল। বলল,—'বাবার ঘর থেকে ও ফিরে এলো বেশ গম্ভীর মুখে। মনে হল কী যেন ভাবছে। আমি আর কোনো প্রশ্ন করিনি। স্লিপিং সুটটা পরে নিয়ে আমাকে বলল, বড় ক্লান্ত লাগছে। মনে হয় বালিশে মাথা রাখলেই ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি বরং আলোটা নিভিয়ে দাও।'

মাথার চুলে হাত রেখে রাজীব কয়েক সেকেন্ড ভাবল। পরে জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা, কোণারকে কোন লোক গতকাল শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

'সম্ভবত না।' বিদিশা জবাব দিল। বলল,—'তবে কাল সন্ধেবেলায় শঙ্কর একা কোথাও গিয়েছিল। হয়তো কারো সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে সে কথা বলেনি।'

নোটবুকটা বন্ধ করে রাজীব আবার প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, শঙ্করবাবু কেন খুন হলেন, এর কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন?'

কয়েক মুহূর্ত পরে বিদিশা উত্তর দিল,—'না'।

—'আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

—ঠিক সন্দেহ নয়।

—'তবে?' রাজীব উৎসুক চোখে তাকাল।

বিদিশা বলল,—'এখানে একজন অদ্ভুত ধরনের লোককে আমি দেখেছি। তার পরনে একটা কাউ-বয় প্যান্ট, গায়ে স্কিন জ্যাকেট। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল। কপালের বাঁ দিকে ছোট টিউমার'। চিবুকের কাছে সামান্য দাড়ি। লোকটা ভুবনেশ্বরে এক বিদেশি দম্পতিকে ফলো করছিল। সেই দম্পতি এখন কোণারকেই আছেন। গতকাল বিকেলেও আমি তাঁদের ট্যুরিস্ট লজের দিকে যেতে লক্ষ্য করেছি।'

রাজীব বলল,—'আমার মনে হয় লোকটার সম্বন্ধে আপনার আরো কিছু বলবার আছে।'

—'হ্যাঁ। গতকাল বিকেলে আমরা দুজনে সূর্যমন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। ওই লোকটার সঙ্গে তখনও আমার দেখা হল। কী আশ্চর্য, লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিল।'

—'হাসছিল?' রাজীব পাল্টা প্রশ্ন করল,—'লোকটা আপনাদের কাউকে চিনত নাকি?'

—'না মানে চিনবে কেমন করে?' জবাব দিতে গিয়ে বিদিশা থতমত খেল।

—'আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব বিদিশা দেবী।' রাজীব ইচ্ছে করেই খানিকটা ভনিতা করল। বলল,—'তবে এটাই আমার শেষ প্রশ্ন।'

মনোযোগী ছাত্রীর মত বিদিশা তাকে লক্ষ্য করছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে

রাজীব প্রশ্নটা এবার ছুঁড়ে মারল,—'আপনি প্রশান্ত নামে কাউকে চেনেন?'

প্রশান্ত! মুহূর্তে বিদিশার মুখখানা রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে দেখাল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। খুব দ্রুত মুখ-চোখের স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে এনে বিদিশা জিজ্ঞাসা করল—'প্রশান্তর নাম আপনি কার কাছে শুনলেন? নিশ্চয় বাবা বলেছেন?'

রাজীব আশ্চর্য হল। দৈহিক সামর্থ্যে নারী পুরুষের চেয়ে হীন। কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা তার কোন অংশে কম নয়। প্রশান্তকে নিয়ে মস্ত একটা জট পাকিয়ে আছে জেনেও বিদিশা কেমন অনায়াসে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে কথা বলছে।

ভ্রূ কুঁচকে রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'নামটা যেমন করেই হোক জেনেছি। কিন্তু প্রশান্তর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?'

—'তা অনেকদিন হবে।' বিদিশা যেন গল্পচ্ছলে বলে গেল।

'প্রশান্ত আমার সহপাঠী। ইউনির্ভাসিটিতে একই ইয়ারে আমরা পডতাম। প্রশান্তর হিস্ট্রি আর আমার ইংলিশ ছিল।'

'তারপর অনেকদিন বোধহয় আপনার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, ঠিক তো?'

বিদিশা আড়চোখে তাকাল। মনে হল যে আরো সাবধানী হতে চেষ্টা করছে।

রাজীব প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, প্রশান্ত এখন কোথায় আছে জানেন?'

—'বারে! আমি তা কেমন করে জানব?' বিদিশা অম্লানবদনে মিথ্যাভাষণ করল।

—'তার সঙ্গে কোণারকে আপনার দেখা হয়নি?'

বিদিশার চমকে উঠবার কথা। ক্রাইম স্টোরির এই প্রোডিউসার এ খবর সংগ্রহ করল কেমন করে? তবু অনমনীয় কণ্ঠে সে বলল,—'প্রশান্তর সঙ্গে কোণারকে আমার দেখা হয়েছে এ তথ্য আপনি পেলেন কোথায়? নিশ্চয় বাবা আপনাকে বলেননি?'

রাজীব হাসল। বলল,—'এটা কিন্তু আপনি ঠিক ধরেছেন। প্রশান্তর সম্বন্ধে মিঃ মজুমদার আমাকে একটি কথাও বলেননি।'

—'তাহলে তার বিষয়ে আপনার এত কৌতূহল কীসের?' বিদিশার বিরক্তির সঙ্গে কথা কইল।

রাজীব বলল,—'তার কারণ প্রশান্ত আপনার পূর্বপ্রণয়ী। ইউনিভার্সিটিতে আপনারা পরস্পরকে ভালবাসতেন। একটু থেমে সে ফের মন্তব্য করল,—'সম্ভবত সেই প্রেমের রঙ এখনও ফিকে হয়নি।'

'এবার কিন্তু আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মিঃ গুপ্ত।' বিদিশা তাকে সাবধান করে জানাল, —'আপনার কোনো প্রশ্নের জবাব এরপর হয়তো না দিতে পারি।'

রাজীব কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হাসল। বলল,—'অন্তত আর একটি প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে।'

—'কী প্রশ্ন? যদি তার উত্তর আমি না দিই?' বেয়াড়া ঘোড়ার মত বিদিশা ঘাড় শক্ত করে রইল।

—'প্রশ্নটা না শুনেই অমন উত্তেজিত হবেন না বিদিশা দেবী।' রাজীব মুচকি হাসল। ফের বলল,—'আচ্ছা, পরশু এবং গতকাল শেষ রাত্তিরে আপনি সূর্যমন্দিরের পেছনে প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

বিদিশা গালে হাত রেখে কী যেন ভাবল। তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি কী বলতে চান মিঃ গুপ্ত?'

—'যা বলতে চাই, তা বুঝতে আপনার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।' রাজীব বাঁকা হাসল।

পরে বলল—'আপনার স্বামী কেমন করে খুন হলেন আমি মোটামুটি তা অনুমান করতে পারছি। গতকাল শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে নির্ধারিত স্থানে আপনি প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শঙ্করবাবু তখন জেগে, কিংবা ঠিক সেই সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। সন্দেহ হলে উনি নিঃশব্দে স্ত্রীকে অনুসরণ করেন। তারপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রশান্ত আর আপনাকে এক সঙ্গে লক্ষ্য করে নিজেকে সামলাতে পারেননি। সম্ভবত আপনাদের মধ্যে একটা বচসা কিংবা কথা কাটাকাটি হয়। তখনই প্রশান্ত তাঁকে গুলি করে। শঙ্করবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, ঘন কুয়াশার আড়ালে আপনারা দুজনে সেখান থেকে পালিয়ে যান।'

বিদিশা মন দিয়ে শুনছিল। রাজীবের কথা শেষ হলে, বলল,—'মিঃ গুপ্ত, আপনি ক্রাইম স্টোরি নিয়ে ফিল্ম করছেন, তাই না? এই ধরনের আজগুবি কল্পনা আপনার মত ফিল্ম প্রোডিউসারের অলস মস্তিষ্কেই তৈরি হতে পারে।'

রাজীব বেশ শক্ত গলায় বলল,—'গতকাল শেষ রাত্তিরে সূর্য মন্দিরের পিছনে প্রশান্তর সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাননি?'

বিদিশা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিল,—'বলেছি তো, এ সমস্ত আপনার অলস মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা।'

পকেট থেকে একটা কাগজের মত কী যেন বের করল রাজীব। বলল,—'এটা দেখছেন?'

—'কী ওটা?' বিদিশা শুধোল।'

—'একটা চিঠি।' রাজীব ভ্রূ কোঁচকাল।

—'চিঠি?' বিদিশা খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কার চিঠি?'

—'নিশ্চয় আপনার। কারণ এটা আপনাকে লেখা হয়েছে।'

—'আমার নামে চিঠি? কিন্তু আপনি তা পেলেন কেমন করে?'

—'শঙ্করবাবুর প্যান্টের পকেটে।' রাজীব বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কইল।

হাত বাড়িয়ে সেটা নিল বিদিশা। বোধহয় এক নিশ্বাসে চিঠির অক্ষরগুলি সে পড়ে ফেলল। রাজীব ভাবছিল, আর নয়। বিদিশা এবার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। গতকাল শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে ঘন কুয়াশার আড়ালে যে হত্যা-নাটকের যবনিকা পড়ল এবার ধীরে ধীরে তা উন্মোচিত হবে। কিন্তু আশ্চর্য! চিঠিটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বিদিশা কেমন অদ্ভুত হাসল।

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে রাজীব বলল,—'কী, গতকাল শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে যে আপনি গিয়েছিলেন এখন তা অস্বীকার করতে পারবেন?'

আশ্চর্য! বিদিশা অনেকক্ষণ কোন জবাব দিল না। তারপর রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বলল,—'আপনি বোধহয় একটা কনফেসন চান, তাই না মিঃ গুপ্ত?'

'একজাক্টলি'। রাজীবকে যথেষ্ট উৎফুল্ল দেখাল।

'বেশ। তাহলে শুনে রাখুন আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। গতরাত্রে ডিনারের পর সান-টেম্পল হোটেলের এই বারো নম্বর ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি।'

রাজীব অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে রইল। ব্যাপারটা ঈষৎ জটিল এবং ঘন কুয়াশার মত রহস্যাবৃত লাগছে। চিঠিখানায় ফের একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে মাথার চুলে হাত রাখল। তার হাতে এমন অকাট্য প্রমাণ থাকতে সাজানো সাক্ষীর মত বিদিশা বেমালুম মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু কেন? শুধু প্রশান্তকে বাঁচাতে? বিদিশা বুঝতে পারছে না, একটা সূত্র যখন পাওয়া গেছে তখন রহস্যের জাল আর কতক্ষণ টিকবে?

আট

ঘর থেকে বেরিয়ে রাজীব দেখল, হোটেলের লাউঞ্জে সুব্রত অপেক্ষা করছে। তার দৃষ্টি চঞ্চল। মনে হল গুরুতর কিছু বলতে চায়। তাকে দেখে প্রায় ফিসফিস করে বলল, —'রাজীবদা, খবর আছে।'

—'খবর?'

—'হ্যাঁ। ডেঞ্জারাস নিউজ, মানে জবর খবর।'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে শুধোল, 'কী ব্যাপার? নাইট্রেট টেস্ট পজিটিভ হল নাকি?'

'না।' সুব্রত মাথা নাড়ল। বলল,—'ডারম্যাল নাইট্রেট টেস্ট নেগেটিভ হয়েছে। তার অর্থ এটা সুইসাইড নয়, মার্ডার।'

রাজীব চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল,—'তুমি আর কিছু বলবে?'

—'হ্যাঁ?' মানে একটা ক্লু পাওয়া গেছে।'

—'ক্লু?' রাজীব আশ্চর্য হল।

সুব্রত বলল,—'গতকাল শেষ রাত্তিরে গুলির শব্দে সান-টেম্পল হোটেলের একজন বেয়ারার ঘুম ভেঙে যায়। সূর্যমন্দিরের কাছে লোকটা তার বাড়িতে শুয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে একটা সাদা পোশাক-পরা মূর্তি দেখতে পেয়েছে। কুয়াশার মধ্যে মূর্তিটা হেঁটে যাচ্ছিল। একটু পরেই গাঢ় কুয়াশার মধ্যে সেটা মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পায়নি।'

রাজীব সহাস্যে বলল,—'তোমার কী মনে হয় সুব্রত?' ব্যাপারটা ভৌতিক?'

—'না, মানে ভৌতিক নয়। কিন্তু এখানকার লোকেরা বলে কোণারকের একসময় পর্তুগিজ জলদস্যুদের আনাগোনা ছিল। মূল সূর্যমন্দিরের শীর্ষে একটা ভারী চুম্বক থাকত।'

বাধা দিয়ে রাজীব বলল,—'আমি তা জানি। সমুদ্রপথে যেতে যেতে জাহাজের কম্পাসের কাঁটা চুম্বকের আকর্ষণে এই দিকে ঘুরে যেত। আর এইভাবেই পরিত্যক্ত কোণারকের সূর্যমন্দির একদিন আবিষ্কৃত হয়। তারপর সেই বিরাট চুম্বকটা পর্তুগিজরাই নিয়ে যায়। তবে এটা একটা উপকাহিনি গোছের। এর পিছনে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই।'

সুব্রত বলল,—'লোকে সন্দেহ করছে গতকাল রাত্তিরে শঙ্করবাবু নিশির ডাক শুনে ঘোরের মধ্যে সূর্যমন্দিরের দিকে চলে গিয়েছিলেন।'

—'ঘোরের মধ্যে, মানে ঘুমন্ত অবস্থায়? তাই না সুব্রত?'

—'হ্যাঁ, মানে ঘুমের ঘোরে।'

—'অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে আমরা বলি Somnambulism বা স্বপ্নাটন্ রোগ। যখন ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ চলাফেরা করে, হেঁটে বেড়ায়। এমন কী স্বাভাবিক মানুষের মত কাজও করে। পরে কিন্তু জেগে উঠে এই সব ঘটনা তাদের বিন্দুমাত্র স্মরণ থাকে না।'

সুব্রত ফিসফিস করে বলল,—'এখানকার লোকে কিন্তু ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে মনে করছে না। তাদের ধারণা এটা একটা ভূতুড়ে কাণ্ড।'

সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজীব শুধু হাসল। জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা, ডেড-বডিটা অটোপসির জন্য পাঠানো হয়েছে?'

—'এইমাত্র একজন পুলিশ অফিসার ডেড-বডি নিয়ে ভুবনেশ্বর রওনা হয়ে গেলেন।' সুব্রত উত্তর দিল। ফের বলল,—'কিন্তু রাজীবদা, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি নতুন কিছু পাবেন আশা করছেন?'

—'নতুন কিছু না হলেও, একটা খবর আশা করছি। আমার ধারণা গুলিটা এখনও শঙ্করবাবুর

দেহে আটকে আছে। সেটা পাওয়া গেলে হত্যাকারী কী ধরনের ফায়ার-আর্মস ব্যবহার করেছিল তা সঠিক জানা যাবে।' মুচকি হেসে রাজীব ফের মন্তব্য করল,—'গুলিটা পর্তুগিজ আমলের কিনা তাও নিশ্চয় ধরা পড়বে।'

সাত নম্বর ঘরে অতিবিক্রম মজুমদার বিছানায় শুয়েছিলেন।

ভণিতা না করে রাজীব স্পষ্ট বলল, 'এক্সকিউজ মি স্যার। একটা কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি। বিয়ের আগে বিদিশা দেবীর কোন লং অ্যাফেয়ার হয়েছিল?'

অন্য সময় কোন অধস্তন কর্মচারীর মুখে এই ধরনের কথা শুনলে অতিবিক্রম নিশ্চয় তা বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু এখন তিনি অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মুখ নিচু করে শুধু বললেন, —'এ খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন? বিদিশা বলেছে নাকি?'

—'আজ্ঞে না।' রাজীব মাথা নেড়ে জবাব দিল। বলল—'বিদিশা দেবী এসব কথা কিছুই জানান নি।'

—'তাহলে?' অতিবিক্রম ফের প্রশ্ন করলেন,—'বিয়ের আগে বিদিশার একটা লভ্ অ্যাফেয়ার হয়েছিল এমন সন্দেহ আপনার হল কেন?'

তাঁর বক্তব্য নিছক অনুমান নয় বরং পিছনে যে একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র আছে তাই প্রতিষ্ঠা করতে রাজীব এবার পরিষ্কার বলে ফেলল,—'প্রশান্ত নামের কোন ছেলেকে আপনি চেনেন?'

প্রশান্ত! অতিবিক্রম অস্ফুটে নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন ঈষৎ চমকে উঠলেন। আগের মতই বললেন,—'প্রশান্তর কথা তুমি কেমন করে জানলে? বিদিশা তোমাকে কিছুই বলেনি?'

—আজ্ঞে, প্রশান্তর সম্বন্ধে দু-একটি কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন, ইউনিভার্সিটিতে ছেলেটি তাঁর সঙ্গে একই ইয়ারে পড়ত। ইতিহাসের ছাত্র। এর বেশি একটি কথাও উনি ভাঙলেন না।'

অতিবিক্রম গম্ভীর মুখে বললেন,—'তাহলে প্রশান্তর সঙ্গে ইতিমধ্যে তুমি দেখা করেছ।'

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন চিন্তা করে রাজীব মন্তব্য করল,—'প্রশান্ত যে এখন কোণারকে আছে এ সংবাদ সম্ভবত আপনার অজানা নয় স্যার।'

—'ইয়েস। প্রশান্ত এখন কোণারকেই আছে। দ্যাট স্কাউন্ড্রেল।' মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করে অতিবিক্রম যেন স্বগতোক্তি করলেন। বললেন,—'তুমি ওই চেয়ারটায় বসো। বিদিশা গোপন করলেও প্রশান্তর সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, সবই তোমাকে বলব। হয়তো তোমার তদন্তের কাছে এটা সাহায্য করবে।'

বিছানার উপর গা এলিয়ে শুয়েছিলেন অতিবিক্রম। বিমর্ষ, ম্রিয়মান,—আহত দৃষ্টি। রাজীবকে লক্ষ্য করে বললেন,—প্রশান্ত বসু ইতিহাসের ভালো ছাত্র। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পায় এবং পরে এম.এ.তেও সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল বলে শুনেছি। কলকাতায় এম. এ. পড়বার সময় বিদিশা। তার প্রতি অনুরক্ত হয়। মাঝে মাঝে দুপুরবেলায় দুজনে ক্লাস পালিয়ে কলকাতায় এখানে সেখানে বেড়াত। পরস্পরের প্রতি এই অনুরাগ ক্রমে গভীর প্রেমে পর্যবসিত হল। ব্যাপারটা আমি যখন জানতে পারলাম, তখন দুজনে বিয়ে করবে বলে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু প্রশান্ত তখনও ছাত্র—তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাছাড়া ওদের বাড়ি বীরভূম জেলায় এক অখ্যাত গ্রামে। নিতান্ত সাধারণ অবস্থা—হোস্টেলে থেকে পড়ার সামর্থ্য নেই। তাই এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ছেলে পড়ানোর বিনিময়ে কলকাতায় থাকা খাওয়ার একটা উপায় করে নিয়েছিল।'

রাজীব বলল, 'আপনি তাহলে মেয়ের অমতে জোর করেই শঙ্করবাবুর সঙ্গে এই বিয়ে দিয়েছিলেন?'

'তা হয়তো বলতে পার।' অতিবিক্রম জবাব দিলেন। ফের বললেন, 'প্রশান্তর সঙ্গে বিদিশার

বিয়েতে আমাদের কারো মত ছিল না। তখন আমি ডেপুটি কমিশনার। লালবাজারে আমার চেম্বারে প্রশান্তকে একদিন ডেকে পাঠালাম। নানা কথার পর তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, আমার মেয়ের সঙ্গে একভাবে মেলামেশার ফল কিন্তু খুবই খারাপ হতে পারে। অবশ্য আমার রক্তচক্ষু দেখে সে খুব ভয় পেয়েছিল তা নয়। উল্টে আমাকে জবাব দিল, আপনার মেয়েকেই তো আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করতে পারেন। অন্যায়ভাবে আমাকে এখানে ডেকে মিছিমিছি ধমকাচ্ছেন।...শেষ পর্যন্ত ওকে বুঝিয়ে বললাম, সামনে এম.এ. পরীক্ষা। এখন মাথা গরম না করে বরং পড়াশুনোতে মন দাও। অবশ্য তুমি যদি তেমন ভাল রেজাল্ট করতে পার, তাহলে বরং তোমাদের বিয়ের কথা ভেবে দেখতে হবে।'

রাজীব মুচকি হেসে বলল, 'তারপর?'

অতিবিক্রম বললেন, 'শাসানিতে যে কাজ হয়নি, মিষ্টি কথায় সেই ফল পেলাম। প্রশান্ত বলল, এম-এ'তে যদি আমি ফার্স্ট ক্লাস পাই, তাহলে আপনি বিদিশার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হবেন?....ওর কথার কী জবাব দেব তাই ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, বেশ, তাই হবে। কিন্তু তার আগে আমার একটা শর্ত আছে।...কী শর্ত? সে জানতে চাইল। প্রশান্তকে বললাম, এম-এ পরীক্ষার ফল বেরোবার আগে তুমি কোনোদিন বিদিশার সঙ্গে দেখা করতে পাবে না। শুধু তাই নয়, তিন দিনের মধ্যে তোমাকে কলকাতা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। এবং তোমার সেই নতুন ঠিকানা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কারো কাছে জানাতে পারবে না।'

'তারপর?' রাজীব জিজ্ঞাসু হল।

অতিবিক্রম বললেন, 'আমার শর্তে সে রাজি হল। বলল, বেশ, আপনার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু এম.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার পরেই দিনই আমি আবার আসছি' তখন কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণের কথা যেন স্মবণ থাকে।'

অতিবিক্রম গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। বললেন, 'আজ মনে হচ্ছে, কাজটা ভাল করিনি। তখন ক্ষমতার গর্বে যে কোন বাধা-বিপত্তিকেই তুচ্ছ মনে করতাম। তাই প্রশান্ত কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার পরই আমি বিদিশার বিয়ে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। মাসখানেকের মধ্যেই শঙ্করকে খুঁজে বের করলাম। অধ্যবসায়ী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক। বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল না হলেও, ভবিষ্যতে উন্নতি করবে। সুনয়নীর সঙ্গে শুধু একবার মাত্র কথা বলে আমি বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললাম। ভয় ছিল শুধু বিদিশাকে নিয়ে। কিন্তু প্রেম-ভালবাসা ব্যাপারটা দুজনের সান্নিধ্যেই গাঢ় থাকে। একজন দূরে সরে গেলেই অন্যজনের কাছে তা আবার ফিকে হয়ে আসে। দিনে দিনে বিদিশার বিরুদ্ধভাব নমনীয় হল। সুনয়নী মেয়েকে বোঝাল। একদিন শুভক্ষণে কন্যা সম্প্রদান করে আমিও নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম।'

রাজীব শুধোল, 'বিদিশার আপনি বিয়ে দিচ্ছেন, সে খবর প্রশান্ত জানতে পারেনি?'

'হ্যাঁ, পেরেছিল। কিন্তু তার আগে বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা আরো যা কিছু অনুষ্ঠান, সব নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে। তারপর বিয়ের দিন দশবারো বাদে লালবাজারে প্রশান্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি খুব শক্ত হয়ে তাকালাম। সে কিছু বলবার আগেই তাকে জানিয়ে দিলাম, ভাল ঘরে—উপযুক্ত পাত্রে বিদিশার বিয়ে হয়েছে। তার সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যদি এরপরও বিদিশার জীবনে অশান্তির সৃষ্টি কর, তাহলে আইনের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হবে। প্রশান্ত মুখ কুঁচকে আমার দিকে একবার তাকিয়ে, বোধ হয় ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে মারল। তারপর গটগট করে দরজা ডিঙিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কোনোদিন তাকে বিদিশার ছায়া মাড়াতেও দেখিনি। বিশ্বাস করুন মিস্টার স্যানাল, এতদিন প্রশান্তর কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে

গিয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল সন্ধেবেলায় একটা লোক আমাকে হঠাৎ প্রশান্তর খবর দিল।

রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'সেই লোকটা কে? সে হঠাৎ প্রশান্তর খবর দিতে এল কেন?'

অতিবিক্রম ঈষৎ চিন্তা করে বললেন,—'কেন এল তার জবাব আমি হয়তো দিতে পারব না। এমনও হতে পারে লোকটার সঙ্গে প্রশান্তর একটা গণ্ডগোল আছে। তাই সুযোগ পেয়ে তাকে হেয় করবার চান্স সে নিয়েছে। আবার এও অসম্ভব নয় যে ঘটনাটি আমাকে জানিয়ে সে কেবল সাবধান করে দিতে চেয়েছিল।'

রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'লোকটা কেমন দেখতে বলুন তো? তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

অতিবিক্রম বললেন,—'লোকটা অদ্ভুত দেখতে। তার পরনে একটা কাউ-বয় প্যান্ট, গায়ে স্কিন জ্যাকেট। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল। চিবুকের কাছে সামান্য দাড়ি। কপালের বাঁ দিকে একটা ছোট টিউমার। জিজ্ঞাসা করতে বলল, —তার নাম গঞ্জালেশ। গোয়াতে পানজিমে বাড়ি।'

—'এখানে এসেছে কেন?'

—'কেন এসেছে তা বলা কঠিন। আর সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। তবে কথার মধ্যেই সে বলল, আই অ্যাম এ ট্যুরিস্ট। কোণারকের ফেমাস সান টেম্পল দেখতে এসেছি। আবার মন্দিরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল,—ইট ইজ ইনডিড অ্যান ওয়ান্ডারফুল পিস অফ আর্ট।'

রাজীব শুধোল,—'আপনার সঙ্গে সে কোথায় দেখা করতে এসেছিল? ওই হোটেলে?'

—'না, না।' অতিবিক্রম মাথা নেড়ে জানালেন। 'হোটেলে সে আসেনি। রাস্তার মধ্যে দেখা হতে হঠাৎ যেন আমার দিকে এগিয়ে এলো। ইংরেজিতেই বলল,—নমস্কার সাহেব। ভাল আছেন? আমি খুব অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। লোকটা অন্য কাউকে ভেবে ভুল করেনি তো? কিন্তু না। আমার সমস্ত সংশয় নিমেষে দূর করে সে পরিষ্কার বলল,—'আপনি মিঃ মজুমদার, কলকাতা থেকে এসেছেন। তাই না? খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করে বেশ গম্ভীর গলায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আমাকে চিনলে কেমন করে? এর আগে তোমাকে দেখেছি বলে তো কই মনে পড়ে না। কিন্তু লোকটা আমার গাম্ভীর্যের মুখোশটাকে এতটুকু সমীহ করল না। অনেকটা মেয়েদের মত ফিক করে হেসে বলল,—আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

রাজীব গালে হাত রেখে কী যেন চিন্তা করছিল। কথার মাঝখানে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, —'লোকটা আপনার নাম ঠিকানা সব কিছু গোপনে সংগ্রহ করেছে জেনে মনে কোনো সন্দেহ হয়নি?'

—'সন্দেহ হয়েছিল বৈকি।' অতিবিক্রম স্বীকার করলেন। ফের বললেন,—'কিন্তু ব্যাপার কী জানেন মিঃ সান্যাল? তখন সন্দেহের চেয়ে কৌতূহলটাই বেশি। লোকটা অসঙ্কোচে কাছে এসে নমস্কার করে কুশল জানতে চাইল। আমার নাম-ধাম দিব্যি আউড়ে গেল। শেষে ফিক করে হেসে তার কী জরুরী কথা আছে তাই বলবার জন্য অনুমতি চাইল।'

বিছানার ওপর উঠে বসলেন অতিবিক্রম। তাঁকে সামান্য উত্তেজিত লাগছিল। বললেন,—'কিন্তু ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম মিঃ সান্যাল। প্রশান্ত? তাই কি সম্ভব? অথচ আশ্চর্য! লোকটা শুধু আমার নাম-ধাম নয়। প্রশান্ত আর বিদিশার সম্পর্কের কথা নির্ভুল বলতে পারল। তাহলে কোণারকে বিদিশার সঙ্গে সে আবার প্রেম করছে? অথচ শঙ্কর আজই দিল্লি থেকে এসে পৌঁছল। এই সংবাদ কণামাত্র তার কানে গেলে স্ত্রীর প্রতি কী দারুণ অবিশ্বাস আর সন্দেহ মনে সৃষ্টি হতে পারে?'

এক মুহূর্ত থেকে অতিবিক্রম আবার শুরু করলেন,—'জানেন মিঃ সান্যাল? সেই মুহূর্তে আমার

মাথায় রক্ত উঠে গেল। মনে হল শয়তানটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আসি। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে নিজেকে সংযত করলাম। আজই দিল্লি থেকে শঙ্কর এসে পৌঁছেছে। এই ছোট জায়গায় যাই ঘটুক, তা চাউর হতে একটুও সময় লাগবে না। মিছিমিছি একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি। তার চেয়ে শঙ্কর বরং তাড়াতাড়ি বিদিশাকে নিয়ে দিল্লি ফিরে যাক। তারপর এই শয়তানটার সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব।'

রাজীব শুধোল,—'লোকটা আপনাকে কী বলেছিল? প্রশান্ত আর বিদিশা দেবী দুজনে গোপনে দেখা করে?'

—'ঠিক তাই।' অতিবিক্রম সায় দিলেন। বললেন,—'ভুবনেশ্বরে প্রথম বিদিশার সঙ্গে প্রশান্তর দেখা হয়। দুজনে রিকশা চেপে লিঙ্গরাজের মন্দিরে যায়। তারপর কোণারকে এসে সূর্যমন্দির থেকে খানিকটা দূরে একটা নির্জন বাড়িতে উভয়ে মিলিত হয়েছিল। এই লোকটাই সেখানে একটু আপত্তিজনক অবস্থায় দুজনকে দেখতে পায়।'

—'এত সব খবর ও আপনাকে অযাচিতভাবে দিয়ে গেল?'

—'অযাচিতভাবে তো বটেই। সত্যি বলতে ওকে আমি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি। বরং প্রথম দিকে ব্যাপারটা যে আমি বিশ্বাস করছি না, তাও বলেছিলাম।'

—'তারপর?'

অতিবিক্রম বললেন,—'তারপর লোকটা আমাকে একটা সাংঘাতিক সংবাদ দিল। পরশু দিন শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে একটা গোপন জায়গায় ওরা দুজনে দেখা করেছিল।'

—'শেষরাত্তিরে দুজনে দেখা করেছিল?' রাজীব এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল।

—'হ্যাঁ, মানে গঞ্জালেশ তো আমাকে সেই কথা বলল।'

রাজীব হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'ওই লোকটা নিশ্চয় দুজনকে চাক্ষুষ দেখেছে?'

—'নিশ্চয় দেখেছে। নইলে সে কথা বলবে কেমন করে?'

—'আচ্ছা, শেষরাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে ওই লোকটা কেন গিয়েছিল বলতে পারেন?'

অতিবিক্রম মাথা নাড়লেন,—'এই প্রশ্নটা নিশ্চয় আমার করা উচিত ছিল। কিন্তু কী জানেন মিঃ সান্যাল? তখন রাগে আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। কোণারকে এসে একটা উটকো লোকের মুখে মেয়ের গোপন অভিসারের কাহিনি আমাকে শুনতে হল? আর বিদিশা যে এত নির্বোধ তা কোনদিন বুঝতে পারিনি। আগুন নিয়ে খেলা করলে শুধু কি হাত পুড়বে? মুখেও যে চুনকালি পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।'

রাজীব বলল,—'সূর্যমন্দিরের পিছনে সেই গোপন জায়গাটা কোথায় আপনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন?'

—'তা খানিকটা পেরেছিলাম।' অতিবিক্রম এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। ফের বললেন, —'গতকাল রাত আটটা নাগাদ নিজেই একবার ওদিকে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা শঙ্কর যেখানে খুন হয়েছে জায়গাটা তার কাছেই হবে।'

রাজীবকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল।

অতিবিক্রম আগের কথার জের টেনে বললেন,—'শঙ্কর এসে পৌঁছেছে ভেবে আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। স্বামী কাছে থাকতে বিদিশা নিশ্চয় আর বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাবে না। অথচ কী আশ্চর্য দেখুন। তখন আমি ঘুণাক্ষরে ভাবিনি যে বিদিশা আর প্রশান্তর গোপন সম্পর্কের কথা শঙ্কর পূর্বেই জানে।'

রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করে শুধোল,—'বলেন কী? দুজনের প্রেম-ভালবাসার কথা শঙ্করবাবু জানতেন?'

—হ্যাঁ।' অতিবিক্রম পরিষ্কার উত্তর দিলেন। বললেন,—'কাল রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর শঙ্কর আমার ঘরে এল। বিলেত থেকে আসবার আগে তার শেষ চিঠিতে সে একটা অদ্ভুত কথা লিখেছিল।'

—'কথাটা কী?'

—'আমার সঙ্গে তার একটা গোপনীয় আলোচনা আছে।'

—'গোপনীয় আলোচনা?' রাজীব অস্ফুটে বলল।

অতিবিক্রম বললেন—হ্যাঁ। ঘরে ঢুকে শঙ্কর আমাকে পরিষ্কার জানাল, বিয়ের আগে বিদিশা আর একটি ছেলেকে গভীরভাবে ভালবাসত। তাহলে কথাটা আমি কেন গোপন কবেছিলাম?' ওরা দুজনে বিয়ে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে বাধা দিয়েছি, সে বিয়ে হতে দিইনি। অথচ সেই ছেলেটি এবং বিদিশা এখনও পরস্পরকে ভালবাসে। এই কোণারকেই উভয়ে গোপনে মিলিত হচ্ছে। শুনে আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, এ খবর তোমাকে কে দিল? সে হাসল। বলল, যেই দিক, কথাটা তো মিথ্যে নয়। তাই আজ রাত্তিরেই বিদিশাকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করব। প্রশান্ত মানে সেই ছেলেটিকে সে কি আজও ভালবাসে? যদি ভালবাসে, তাহলে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো আমি ওদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যবধানের প্রাচীর তৈরি করতে চাইনে। বরং এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হোক। তারপর ডিভোর্স মঞ্জুর হলে সেই ছেলের সঙ্গেই আপনি নিশ্চিন্তে বিদিশার ফের বিয়ে দিতে পারবেন। আমার ধারণা আপনার মেয়ে তাতে সুখী হবে। শুনে আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, প্রশান্ত ইজ এ স্কাউন্ড্রেল। বিদিশা মস্ত ভুল করছে। তুমি বরং আর একটা দিন অপেক্ষা করো শঙ্কর। কালই আমি এর নিশ্চয় বিহিত করব। প্রশান্তর সঙ্গে আবার একটা বোঝাপড়া করার সময় ঘনিয়ে এসেছে।' এক মুহূর্ত থামলেন অতিবিক্রম। ফের জিভটা সচল করে নিয়ে বললেন,—'আমার কথায় শঙ্কর একটু নরম হল। কী যেন ভেবে সে মুখ নিচু করে বলল,—বেশ, আজ রাত্তিরে আপনি সব দিক চিন্তা করে দেখবেন। পরে আপনার সঙ্গে আবার কথা বলব।'

কয়েক সেকেন্ড অতিবিক্রমের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে রাজীব হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, আপনার কাকে হত্যাকারী বলে মনে হয়? প্রশান্তকে কী সন্দেহ করছেন?'

—'হ্যাঁ, প্রশান্তকে আমি খুনী বলে মনে করি।'

—'তার কারণ?'

—'কারণ শঙ্কর তার প্রেমিকার স্বামী। তাকে পৃথিবী থেকে সবিয়ে দিতে পারলেই বিদিশাকে আয়ত্ত করা সহজ হবে।'

—'আর কাউকে আপনার সন্দেহ হয়? ধরুন গঞ্জালেশও তো শঙ্করবাবুকে হত্যা করতে পারে।'

—'কেন? শঙ্করের সঙ্গে গঞ্জালেশের তো কোনো শত্রুতা ছিল না।'

—'শঙ্করবাবুর সঙ্গে শত্রুতা না থাকলেও প্রশান্তর সঙ্গে হয়তো তা থাকতে পারে। আর প্রশান্তকে ফাঁসিয়ে দেবার এমন সহজ উপায় আর কী আছে? প্রশান্ত যে গোপনে বিদিশা দেবীর সঙ্গে দেখা করত, সে খবর তো আগেই আপনার কানে গঞ্জালেশ পৌঁছে দিয়ে গেছে।'

অতিবিক্রম অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ফের বললেন,—'সন্দেহের কথা উঠল তখন একটা ঘটনা আপনাকে বলব মনে করছি।'

'কী ঘটনা? শঙ্করবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সেই ঘটনার কোন যোগসূত্র আছে বলে আপনি মনে করেন?' রাজীব জিজ্ঞাসু হল।

অতিবিক্রম বললেন,—এই প্রশ্নের এখনই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তদন্তেই তা প্রমাণিত হবে। তবে ঘটনাটি আপনাকে জানাচ্ছি। কাল সন্ধেবেলায় আর একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা

করতে এসেছিল।'

—কী নাম ওর?'

—'সুন্দর সিং। ওর কেসটা হয়তো আপনার মনে থাকতে পারে। পার্কস্ট্রিটে সন্তলাল রতিরাম জহুরীর দোকান থেকে একটা দামি হিরে চুরি গিয়েছিল। গভীর রাতে রোলিং শাটার ভেঙে গ্যাস মেশিনের সাহায্যে আলমারির চাদর কেটে হিরেটা হাতিয়ে নিয়ে ওরা সরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ওই গ্যাংটার তিন-চারজন লোক ধরা পড়ল। তার মধ্যে পরমানন্দ তেওয়ারীকে আমরা পরে অ্যাপ্রুভার করেছিলাম। আদালতে পরমানন্দ সব কনফেস করল। এই হিরে চুরির সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, সুন্দর সিং তাদের একজন। লোকটার নিখুঁত প্ল্যান আর চমৎকার অপারেশান। বলতে গেলে কাজে ভুলচুক ছিল না। শুধু সন্তলাল রতিরামের দোকানে হিরে চুরি করতে এসে সে ফেঁসে গেল। কলকাতা পুলিশ এই সুন্দর সিংকে তখন তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ভুবনেশ্বর থেকে কয়েক মাইল দূরে উদয়গিরি খণ্ডগিরির কাছে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে আমি একে অ্যারেস্ট করতে পেরেছিলাম।'

রাজীব একটু ভেবে বলল,—'হ্যাঁ কেসটা আমার মনে পড়ছে। ট্রায়ালে সুন্দর সিংহের জেল হয়েছিল। কিন্তু সে হঠাৎ আপনার খবর পেল কোথা থেকে?'

'ভুবনেশ্বরে যে হোটেলে আমি ছিলাম তার মালিক চন্দনরাম জয়সোয়াল আমার কথা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে গল্প করেছিল। তার কাছ থেকেই ঠিকানা সংগ্রহ করে সুন্দর সিং কোণারকে চলে আসে।'

—'আশ্চর্য! শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে?'

—'হ্যাঁ। কাল রাত্তিরে সে তাই বলল!'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল—'গতকাল সুন্দর সিংহের সঙ্গে আপনার কোনো বচসা হয়েছিল?'

—'বচসা?' অতিবিক্রম ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করে শুধোলেন,—'হঠাৎ এ কথা কেন আপনার মনে এলো মিঃ সান্যাল?'

—'না, মানে ধরুণ একসময় তো আপনি তাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন।'

অতিবিক্রম ম্লান হেসে বললেন,—'অপরাধীকে খুঁজে বের করা তো পুলিশের কাজ। বিচারে এমন কতজনের সাজা হয়। পুলিশ নিমিত্তমাত্র।'

—'সে কথা ঠিক।' রাজীব স্বীকার করল।

অতিবিক্রম বললেন,—'তবে সুন্দর সিং দুঃখ করছিল। তিন বছর জেলের কয়েদী থাকার সময় তার নাকি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে।'

'ক্ষতি?' রাজীব কপালে হাত রেখে কী যেন চিন্তা করল। ফের বলল,—'সুন্দর সিং আপনার জামাইকে চেনে?'

—'হ্যাঁ। গতকাল বিকেলে শঙ্কর আর বিদিশা সূর্যমন্দির দেখতে গিয়েছিল। বিদিশাকে দেখেই আমার মেয়ে বলে সে অনুমান করে। ফলে শঙ্করকে চিহ্নিত করতে তার অসুবিধে হয়নি।'

রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'সুন্দর সিং এখন কী করে আপনি জানতে চেয়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ। বলল, সে নাকি ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করছে। আবার ভুবনেশ্বরের জয়সোয়াল বলছিল, ওসব ঝুট বাত। গোপনে সুন্দর সিং এখনও তার স্মাগলিং-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

—'সুন্দর সিংকে আপনার হত্যাকারী বলে সন্দেহ হয়?' কথাটা ফস করে রাজীবের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

অতিবিক্রম সামান্য কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন। নীচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে কী ভাবলেন। ফের ধীরে ধীরে বললেন,—'সন্দেহ নেই এমন কথাও উচ্চারণ করতে পারব না।

আসলে কী জানেন মিঃ সান্যাল? লোকটা সাংঘাতিক। হি ইজ এ ডেঞ্জারাস পারসন। ভুবনেশ্বরে জয়সোয়াল একটা ঘটনা বলেছিল। লোকে সন্দেহ করে ওটা সুন্দর সিংহের কুকীর্তি। সমস্ত ব্যাপারটা শুনলে আপনি হয়তো শিউরে উঠবেন।'

ওর কথা শুনে রাজীব রীতিমত কৌতূহলী হল।

অতিবিক্রম বললেন,—'অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভুবনেশ্বরে সুন্দর সিংকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছিলাম। সেই হিরে চুরির ইনভেস্টিগেশন আমার তত্ত্বাবধানে চলছিল। হঠাৎ একটা সোর্স থেকে খবর এল সুন্দর সিং এখন ভুবনেশ্বরের আশে-পাশে রয়েছে। ছদ্মবেশে আমরা তিনজন পুলিশ অফিসার ভুবনেশ্বরে গেলাম। খুব সঙ্গোপনে ওখানকার সি. আই. ডি'র সাহায্যে একটা সোর্স তৈরি করলাম। লোকটার নাম জগদীশ্বর পাণিগ্রহি। বেশ চালক-চতুর ছোকরা দিন কয়েকের মধ্যেই জগদীশ্বর খবর আনল উদয়গিরি-খণ্ডগিরির কাছে একটা জঙ্গলের ভিতরে সুন্দর সিং তার গোপন আস্তানায় লুকিয়ে আছে। পরের দিন খুব ভোরে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সঙ্গে লোকজন বেশি ছিল না। তাদের সকলকে খানিকটা দূরে অপেক্ষা করতে বলে আমি প্রায় চোরের মত পা টিপে টিপে আচমকা সুন্দর সিংহের সামনে গিয়ে তার বুকের উপর পিস্তল তুলে ধরলাম। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল বলে সে বাধা দিতে পারেনি। নইলে হয়তো পালাতে চেষ্টা করত। কিন্তু তখন পালাতে যাওয়ার অর্থ মৃত্যু। তাই আর সে পথে পা বাড়ায়নি।'

রাজীব শুধোল,—'ভুবনেশ্বর জগদীশ্বর পাণিগ্রাহী পুলিশের ইনফর্মারের কাজ করত?'

—'ঠিক তাই। কিন্তু লোকটা এমন অদ্ভুতভাবে মারা গেল যে সেই রহস্যের কিনারা উড়িষ্যার পুলিশ আজও করতে পারেনি।'

রাজীব প্রশ্ন করল,—'লোকটা কি খুন হয়েছিল?'

—'খুন কি না তাও কেউ সঠিক বলতে পারবে না। আসলে এমন অদ্ভুত রহস্যময় মৃত্যু কদাচিৎ ঘটে।'

রাজীব আগের মতই জিজ্ঞাসা করল,—'তাহলে লোকটা কি আত্মহত্যা করেছিল বলে মনে হয়?

—'তাও বলা যাবে না।' অতিবিক্রম মাথা নেড়ে জানালেন। গলাটা পরিষ্কার করে বললেন, —'তাহলে ঘটনা শুনুন মিঃ স্যানাল। একদিন রাত্তিরে জগদীশ্বর পাণিগ্রাহী বাড়ি ফেরে নি। সকলেই খুব চিন্তায় ছিল। থানায় খবর পৌঁছতেও দেরি হয়নি। সম্ভবপর সব জায়গাতেই পুলিশ তার খোঁজ করল। কিন্তু জগদীশ্বর বেপাত্তা। ভুবনেশ্বরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাকে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত একটা দেহাতী মেয়ে ভুবনেশ্বর থেকে কয়েক মাইল দূরে উদয়গিরি—খণ্ডগিরির কাছে সেই জঙ্গলের ধারে চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তার উপর জগদীশ্বর পাণিগ্রাহীকে আবিষ্কার করল।'

রাজীব অসহিষ্ণুর মত শুধোল,—'কিন্তু লোকটা মারা গেল কেমন করে?'

'—গাড়ি চাপা পড়ে।' অতিবিক্রম গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন। ফের বললেন,—'পুলিশ গিয়ে দেখতে পেল একটা হেভি ভেহিকল ওর শরীরটার উপর দিয়ে সোজা চলে গেছে। ডেড-বডি পোস্টমর্টেম করে জানা গেল রাত বারোটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। কিন্তু অত রাত্তিরে জগদীশ্বর পাণিগ্রাহী কেন উদয়গিরি-খণ্ডগিরির জঙ্গলের কাছে গিয়েছিল তা কেউ বলতে পারেনি।'

রাজীব শুধু জিজ্ঞাসা করল,—ব্যাপারটা যখন ঘটে, সুন্দর সিং তখন জেলে না সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল?'

অতিবিক্রম মৃদু হেসে বললেন,—'রহস্য তো সেখানেই। জগদীশ্বর পাণিগ্রাহী যেদিন মারা যায় তার ঠিক একমাস আগে সুন্দর সিং জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল।'

রাজীব বলল,—'এই আনন্যাচারাল ডেথ কেসে সুন্দর সিংকে আসামী করা যেত না?'

'বোধহয় না।' অতিবিক্রম মাথা নেড়ে জানালেন,—'কারণ হি হ্যাড এ কাস্ট-আয়রন অ্যালিবাই। ঘটনার রাত্তিরে সুন্দর সিং উড়িষ্যাতেই ছিল না। অন্ধ্রে ভিজিয়ানাগ্রামের কাছে একটা হোটেলে সে রাত কাটিয়েছিল।'

রাজীব কিছু বলবার আগেই অতিবিক্রম উঠে দাঁড়ালেন। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে তাকে উদ্দেশ করে বললেন,—'তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এখুনি আসছি।'

হঠাৎ বিছানার এক কোণে বড় মাথার বালিশটার দিকে নজর পড়তেই রাজীব ঈষৎ চঞ্চল হল। সতর্কে বালিশের নিচ থেকে একটা বস্তু বের করে সে পর্যবেক্ষণ করল। আশ্চর্য! কয়েক সেকেন্ড কী চিন্তা করে রাজীব উঠে দাঁড়াল। সমস্ত ঘরটায় বিড়ালের মত লঘু পায়ে ঘুরে বেড়াল। টেবিলের কাগজপত্রগুলির ওপর তাড়াতাড়ি নজর বুলিয়ে নিল। তারপর ঘরের বাক্স-বিছানা এবং ব্যবহার করা জামা-কাপড়গুলি পর্যন্ত একবার নিরীক্ষণ করল। শেষে অতিবিক্রম বাথরুম থেকে বেরোবার আগেই তার কাজ সমাপ্ত করে সে নিপাট ভালোমানুষটির মত চুপচাপ বসে রইল।

নয়

ক্রাইম স্টোরির প্রডিউসার শুনে প্রশান্ত তাকে প্রায় আমল দিতে চাইল না। বলল, 'খুনের কেস নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কীসের? আপনি তো মশায় গোয়েন্দা নন।'

রাজীব বিনীতভাবে বলল,—'পুলিশের গোয়েন্দা নই বলে সখের গোয়েন্দা কী হতে পারি না? তাছাড়া উড়িষ্যা পুলিশের যে অফিসারটি এসেছেন, তাঁর অনুমতি নিয়েই তো আমি এই তদন্তে হাত দিয়েছি। যদি বলেন সেই পুলিশ অফিসারকে এখুনি ডেকে আনছি।'

পুলিশের নাম শুনেই প্রশান্ত কেমন যেন মিইয়ে গেল। এতক্ষণ তড়পাচ্ছিল। কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। খুন খারাপির কেসে মিছিমিছি পুলিশকে টানাটানি করে লাভ কী? খাল কেটে কুমির ডাকতে আছে? তার চেয়ে সখের গোয়েন্দা ঢের ভাল। একটু আমতা আমতা করে প্রশান্ত বলল,—'মিছিমিছি সেই অফিসারটিকে আবার ডাকবেন কেন? তার চেয়ে আপনি কী জিজ্ঞাসা করছিলেন বরং তাই বলুন।'

কোনরকম ভনিতা না করেই রাজীব শুরু করল,—'বিদিশা দেবীর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?'

প্রশ্নের প্রথম তিরটা যে বুকে এসে বাজবে প্রশান্ত অতটা বুঝতে পারে নি। তবু সহজ স্বাভাবিক গলায় সে উত্তর দিতে চেষ্টা করল,—'অনেকদিন, মানে সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় থেকে।'

—'তখন আপনারা দুজনে বিয়ে করবেন বলে স্থির করেছিলেন?'

বিয়ে? এরপর জবাব দিতে গেলে নিশ্চয় সাবধান হতে হয়। প্রশান্ত ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে বলল, —'এ কথা আপনি কার কাছ থেকে জানলেন? নিশ্চয় বিদিশার বাবা মনে মিঃ মজুমদার বলেছেন?'

'যিনিই বলুন।' রাজীব গম্ভীর মুখে তাকাল। 'কথাটা ঠিক কি না তাই জানতে চাই।'

—'হ্যাঁ।' প্রশান্ত নীরস উত্তর দিল।

রাজীব হাতের পেন্সিলটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলল,—'মিঃ মজুমদার আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু অভিযোগ করেছেন। আমি সে কথায় পরে আসছি।'

প্রশান্ত চুপ। সে কোনো মন্তব্য করল না।

রাজীব ফের বলল,—'উড়িষ্যাতে দেখা হওয়ার পর বিদিশা দেবীর সঙ্গে আপনি নতুন করে

প্রেম শুরু করেছিলেন, ঠিক কি না বলুন?'

প্রশান্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল,—'আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কয়েক মুহূর্ত পরে সে কিছুটা উত্তেজিতভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসল,—'বিদিশার সঙ্গে আমি প্রেম শুরু করেছি, এটা আপনি প্রমাণ করতে পারেন?'

—'বোধহয় পারি।' রাজীব শান্তকণ্ঠে জবাব দিল।

প্রশান্ত ঢোক গিলে বলল,—'অসম্ভব। বিদিশা কখনও আপনাকে সে কথা বলেনি।'

—'নিশ্চয়। উনি কেন তা আমাকে বলতে যাবেন?' রাজীব মৃদু হাসল। তারপর হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শক্ত হয়ে এলো। বলল,—'আমি আরো একটা জিনিস প্রমাণ করতে পারি। গতকাল শেষ রাত্তিরে শঙ্কর দত্ত যেখানে খুন হলেন, আপনি তার কাছেই হাজির ছিলেন প্রশান্তবাবু।'

'কী যে বলেন।' প্রশান্ত যেন তাচ্ছিল্য করে ঈষৎ হাসল। বলল,—'তাই কখনও সম্ভব? শেষ রাত্তিরে ঘন কুয়াশার মধ্যে আমি কেমন করে যাব?'

—'গতকাল শেষ রাত্তিরে খুব ঘন কুয়াশা পড়েছিল, তাই না প্রশান্তবাবু?' রাজীব ফের হাসল।

—হ্যাঁ, মানে মাটির কাছাকাছি বাতাস সে কারণেই হোক শীতল হয়ে পড়বার জন্যে এখানে শেষ রাত্তিরে বেশ ঘন কুয়াশা হচ্ছে।'

রাজীব হঠাৎ পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বলল,—'আপনি যে শেষ রাত্তিরে ঘটনাস্থলে কাছেই ছিলেন এটাই তার প্রমাণ প্রশান্তবাবু।'

চিঠিতে লেখা—

বিদিশা,

তোমার জন্য সূর্যমন্দিরের পিছনে সেইখানে অপেক্ষা করব। কাল রাত্তিরে যেমন এসেছিলে আজকেও তেমনি এস। শেষ রাত্তিরে ঘন কুয়াশা, কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। মনে হয়, আমাদেব এতদিন প্রতীক্ষার এইবার অবসান ঘটবে।

ইতি—
প্রশান্ত

চিঠিখানা দেখেই প্রশান্তর মুখখানা রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে দেখাল। বোধহয় ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মৃত্যুবাণ দেখে রক্ষ-সেনাপতির মুখের অবস্থা এমনি হয়েছিল। ঈষৎ কাঁপা গলায় প্রশান্ত বলল,—'ওই চিঠিখানা আপনি কোথায় পেলেন?'

রাজীব মুচকি হেসে বলল,—'আপনি যা সন্দেহ করছেন তা নয়। এ চিঠি বিদিশা দেবী আমার হাতে তুলে দেননি।'

—'তাহলে?'

রাজীব গম্ভীরমুখে বলল,—'চিঠিটা পেয়েছি মৃত শঙ্কর দত্তর পকেটে।'

ডুবন্ত মানুষ জলের নিচে তলিয়ে যাওয়ার আগে খড় কুটোকে ধরে বাঁচতে চায়। প্রশান্তও তেমনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বলল,—'বেশ, ধরে নিন গতকাল রাত্তিরে আমি ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিলাম। তার থেকে নিশ্চয় এই প্রমাণ হয় না যে শঙ্কর দত্তকে আমি হত্যা করেছি।'

রাজীব মুচকি হাসল। বলল,—'শঙ্কর দত্তকে আপনি খুন করেছেন এমন কথা কিন্তু এখনও বলিনি।' এক সেকেন্ড থেমে সে ফের মন্তব্য করল,—'তবে মৃতের প্যান্টের পকেটে এই চিঠি পাওয়ার পর একটা কথা নিশ্চয় প্রমাণ হয়। শেষ রাত্তিরে স্ত্রীকে বিছানায় না দেখতে পেয়ে ব্যভিচারিণীকে নৈশ অভিসারে হাতেনাতে ধরবার জন্য শঙ্কর দত্ত সূর্যমন্দিরের দিকে গিয়েছিলেন। এবং সেখানে আপনার সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তারপর কোন এক উত্তেজিত মুহূর্তে আপনি পিস্তলের গুলিতে তাকে হত্যা করেন।'

—'না-না, বিশ্বাস করুন। শঙ্কর দত্তকে আমি খুন করিনি। মানে সত্যি তার কোনো প্রয়োজন

ছিল না।'

রাজীব সন্দিহান বায়সের মত বক্র দৃষ্টিতে তাকাল। শুধোল,—'কেন প্রয়োজন ছিল না? শঙ্কর দত্ত বেঁচে থাকতে আপনি কোনোদিন বিদিশাকে পেতেন না। পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলবার জন্য এছাড়া আর কী উপায় ছিল?'

প্রশান্ত চোখ দুটি ওপরে তুলে কী যেন চিন্তা করল। বলল,—'তদন্তের সময় এসব কথা হয়তো আপনার গালগল্প বলে মনে হবে। হয়তো বা আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না।'

রাজীব নরম গলায় বলল,—'আমি বিশ্বাস করব না তাই বা আগে থাকতে কেন ধরে নিচ্ছেন? আর শেষ পর্যন্ত আমি যা-ই মনে করি, তার জন্য আপনি যা বলতে চান, তা মনের মধ্যে চেপে রাখবেন?'

ওর কথার সুরে প্রশান্তর জড়তা কাটল। জিভটা ঠোঁটের উপর বুলিয়ে একটা ঢোক গিলে নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে সে মুখ খুলল, শুরু থেকেই বলি। ওদের বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে শঙ্করবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। পরিষ্কার জানালাম—ব্যাপারটা ভাগ্যের পরিহাস। নইলে আপনি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, সেই মেয়েটি আমার বাগদত্তা। তার সম্পূর্ণ অমতে একরকম জোর করেই আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি ভদ্র, সহানুভূতিশীল। নিশ্চয় দুটি হৃদয়ের গভীর ভালবাসার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইহজীবনে তাদের বিচ্ছেদের কারণ হবেন না।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল প্রশান্ত। বলল,—সেই আমার একটা মস্ত ভুল হয়েছিল মিঃ গুপ্ত। সেদিন চিঠি না লিখে যদি একবার কলকাতা চলে যেতাম, তাহলে হয়তো আপনার সামনে বসে এই জবাবদিহি করবার কোনো প্রয়োজন হত না।'

—'কেন?' রাজীব জিজ্ঞাসা করল।

প্রশান্ত বলল,—'চিঠিটা সময় মতো পৌঁছলে শঙ্করবাবু বোধহয় টোপর মাথায় দিয়ে বর সেজে বিয়ে করতে যেতেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। যেদিন চিঠিটা পেলেন, সেদিন বাড়িতে উৎসব। বউ-ভাতের অনুষ্ঠান আর ফুলশয্যা।'

রাজীব হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা মিঃ মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে শঙ্করবাবুর যে বিয়ের ঠিক হয়েছে এ খবর আপনি পেলেন কোথায়? বিদিশা দেবী নিশ্চয় আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন?'

প্রশান্ত মাথা নাড়ল। বলল,—'বিদিশার পক্ষে চিঠি লেখা সম্ভব ছিল না। কারণ আমার ঠিকানা তাকে জানাতে নিষেধ ছিল।'

—'কার নিষেধ?' রাজীব জিজ্ঞাসু হল।

ঈষৎ হেসে প্রশান্ত বলল,—'মিঃ মজুমদারের কাছে হঠাৎ একটা প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলাম। এম.এ পরীক্ষার ফল বেরোবার আগে বিদিশার সঙ্গে আর দেখা করব না। শুধু এই নয়, তিন দিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। এবং আমার সেই নতুন ঠিকানা কলকাতার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কারো কাছে জানাতে পারব না। তখন আমার একমাত্র চিন্তা এম. এ. তে ফার্স্ট ক্লাস পেতে হবে। মিঃ মজুমদার বলেছিলেন ফার্স্ট ক্লাস পেলে বিদিশার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে তাঁর আপত্তি থাকবে না।'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে শুধোল,—'তাহলে এই পরিণয়-সংবাদ আপনাকে কে পাঠাল?'

প্রশান্ত বলল,—'আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঠিকানাটা শুধু সে জানত। হঠাৎ একদিন বিকেলে কলকাতা থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে একটা অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে বসে ওর চিঠি পেলাম। বিদিশার বিয়ে। কার কাছ থেকে একটা নেমতন্ন পত্র জোগাড় করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছে,—হয়তো দুঃখ পাবি। কিন্তু এসব চিন্তা এখন মন থেকে ঝেড়ে ফ্যাল। ভালো করে পরীক্ষা দিলে বরং

আখেরে কাজ হবে।'

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে প্রশান্ত কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের বলল,—'কয়েকদিন পরেই শঙ্করবাবুর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। কলকাতায় আমাকে দেখা করতে লিখেছেন। আমার মুখে সব কথা শুনে উনি খুব লজ্জা পেলেন। বললেন—'ব্যাপারটা আগে জানলে তিনি কখনও বিবাহে রাজি হতেন না। এই বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, আমরা যদি এখনও পরস্পরকে ভালবাসি তাহলে ডিভোর্সের আর্জি পেশ করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। মাসখানেক পরে আমি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন ইংলন্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাকে বললেন, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। ইংলন্ড থেকে ফিরে এসেই তিনি একটা সিদ্ধান্ত নেবেন। অবশ্য ততদিন পর্যন্ত আমাদের অনুরাগ যদি না ফিকে হয়ে আসে। আমার মনে আছে তিনি আরো বলেছিলেন আইনমতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আগে স্বামী-স্ত্রীর কিছুদিন আলাদা থাকা প্রয়োজন হয়। ইংলন্ড থেকে ফিরে আসবার পর সেই সময়টুকু নিশ্চয় অতিবাহিত হবে।'

রাজীব জিজ্ঞাসা করল—'বিয়ের ঠিক হয়েছে শুনে মিঃ মজুমদারের সঙ্গে আপনি দেখা করেন নি? এম. এ. তে ফার্স্ট ক্লাস পেলে তিনি তো আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন।'

ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করে প্রশান্ত মন্তব্য করল,—'শয়তানের ছলচাতুরির কোনোদিন অভাব হয় না।' এক মুহূর্ত থেমে সে ফের বলল,—'হ্যাঁ, আমি একদিন সেই মিথ্যুক ভণ্ড ব্যক্তিটির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে দেখে উনি অপ্রস্তুত হবেন। লজ্জা পাবেন। কিন্তু না ভদ্রলোক নিতান্ত বেহায়া। উল্টে আমাকে শাসিয়ে বললেন, বিদিশার জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইলে আমার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হবে। ওই নির্লজ্জ মানুষের সঙ্গে আর একটি কথা বলতেও সেদিন আমার রুচি হয়নি মিঃ গুপ্ত। তাই চেম্বার ছেড়ে সোজা বেরিয়ে এলাম।'

রাজীব প্রশ্ন করল--'শঙ্করবাবুর সঙ্গে এই আলোচনার কথা বিদিশা দেবী জানেন?'

—'না'। প্রশান্ত নেতিবাচক উত্তর দিল। বলল,—'শঙ্করবাবু তাঁর মনোভাবের কথা বিদিশাকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন।'

—'তাহলে আপনার এই বক্তব্যের সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই?'

—'আছে।' প্রশান্ত প্রায় সদর্পে জবাব দিল। বলল,—'ইংলন্ডে থাকতে শঙ্করবাবু আমাকে চিঠি লিখেছেন। সেই পত্রের মধ্যে এই আলোচনার উল্লেখ পাবেন।'

রাজীব বলল,—'শেষ চিঠিতে শঙ্করবাবু আপনাকে কী লিখেছিলেন? দেশে ফিরেই ডিভোর্সের কাগজে তিনি সই করবেন।'

—'না। সে কথা তিনি লেখেননি।'

—'তাহলে?'

প্রশান্ত বলল,—'শঙ্করবাবু লিখেছিলেন দেশে ফিরে এই বিষয়ে বিদিশার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর দেরি হবে না।'

—'আই সী' রাজীব ঠোঁট কামড়ে কী যেন চিন্তা করছিল। তারপর অতর্কিতে হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আচ্ছা, কোণারকে শঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

—'দেখা? ইয়ে না মানে', প্রশান্ত ঢোক গিলে বলল। 'দেখা হওয়ার তো কথা নয়। কারণ আমি কোণারকে আছি একথা তাঁর জানা ছিল না।

—'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব প্রশান্তবাবু?' রাজীব ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, —'আমি এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি। সম্ভবত

কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে শঙ্করবাবু খুন হয়েছেন। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে হত্যাকারী খুব নিকট থেকেই গুলি করছিল।'

প্রশান্ত একটু ভেবে বলল,—'সে কথা চট করে বলা যায় না। যদি সেলফ্-লোডিং অথবা অটোমেটিক পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়ে থাকে, তাহলে বিশ-পঁচিশ গজ দূর থেকেও তাক করে হত্যাকারী সফল হতে পারে।'

রাজীব এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল,—'আচ্ছা, কী ধরনের পিস্তল ব্যবহার করা হয়েছিল বলে মনে হয়?'

কিছু বলতে গিয়ে প্রশান্ত আবার থেমে গেল। এক পলক রাজীবের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে খুব সতর্কভাবে উত্তর দিল,—'তা আমি কেমন করে জানব?'

রাজীব হাসল। বলল,—গতকাল শেষ রাত্তিরে আপনি তো সূর্যমন্দিরের পিছনে অপেক্ষা করছিলেন প্রশান্তবাবু, তাই না?

—'হ্যাঁ।' প্রশান্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

রাজীব মুচকি হেসে শুধোল,—'যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি ঠিকসময়ে এসেছিলেন তো?'

প্রশান্ত গম্ভীরমুখে উত্তর দিল,—'হয়তো বিশ্বাস করবেন না। তবে গতকাল রাত্তিরে বিদিশা আসেনি।'

আশ্চর্য! রাজীব যেন খুব অবাক হয়ে গেল। বলল,—'অথচ আপনি তাকে চিঠি পাঠিয়ে আসতে লিখেছিলেন।'

কয়েক মুহূর্ত পরে রাজীব ফের শুধোল,—'গতকাল শেষ রাত্তিরে গুলির শব্দ শুনে আপনি কী করলেন?'

প্রশান্ত বলল,—'হঠাৎ এই তীক্ষ্ণ শব্দটা শুনে আমি প্রথমে চমকে উঠি। ঠিক সেই সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তনাদ। আমি বোধহয় ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যেতাম। কিন্তু গাঢ় কুয়াশার মধ্যে আবছা একটি মূর্তিকে হঠাৎ লক্ষ্য করে আমি খুব ভয় পেলাম।'

—'মূর্তিটাকে আপনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন? না ওটা চোখের ভুল,—যাকে আমরা বলি hallucination.'।

'Hallucination হবে কেন?' প্রশান্ত এক মুহূর্ত থেমে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। বলল, —'অবশ্য মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাকে দেখেছি। তারপরই সেটা ঘন কুয়াশার আড়ালে আবার মিলিয়ে গেল।'

রাজীব প্রশ্ন করল,—মূর্তিটাকে ঠিক মানুষের মত দেখতে?'

—'অবিকল। মানুষের মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তার মুখ-চোখ কিছুই দেখতে পাইনি। কারণ সে পিছন ফিরে হাঁটছিল। একটা সাদা ঢিলেঢালা পোশাক তার পরনে। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত তার হাঁটবার ধরনটা। মনে হল একটা দম দেওয়া কলের পুতুলের মত সে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে যাচ্ছে।'

কিছুক্ষণের জন্য রাজীবকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাল। তারপর সে প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, আপনি গঞ্জালেশ নামে কাউকে চেনেন?'

—'হ্যাঁ, চিনি।' প্রশান্তকে যেন সামান্য উত্তেজিত মনে হল। সে বলল,—'চিনি মানে লোকটাকে প্রথম ভুবনেশ্বরে দেখি। তারপর এখানেও সে এসেছে। গোয়ার লোক,—ওর বাড়ি পানজিমে। পরিচয় হলে বলবে সে একজন ট্যুরিস্ট। ভারতের পূর্ব উপকূলে বেড়াতে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওটা ডাহা মিথ্যে। ওর নিশ্চয় কোনো বদ মতলব আছে।'

রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'বদ মতলব আছে এমন ধারণা আপনার হল কেন?'

প্রশান্ত বলল,—'ভুবনেশ্বর থেকেই ও একজন বিদেশি দম্পতিকে ফলো করছে। এখানেও তাদের হোটেলের সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্য করেছি।'

—'সেই ফরেন ট্যুরিস্টদের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে প্রশান্তবাবু?'

—'না।'

—'আচ্ছা, গঞ্জালেশ কেন ওদের অনুসরণ করছে বলে মনে হয়।'

একটু চিন্তা করে প্রশান্ত উত্তর দিল,—'তা ঠিক বলতে পারব না।'

রাজীব শুধোল,—'গঞ্জালেশের সম্বন্ধে আপনি আর কিছু জানেন?'

একটু ইতস্তত করে প্রশান্ত উত্তর দিল,—'গতকাল অনেক রাত্তিরে গঞ্জালেশকে আমি ট্যুরিস্ট লজের দিকে যেতে দেখেছিলাম।'

—'সেই বিদেশি দম্পতি তো ট্যুরিস্ট লজে উঠেছেন, তাই না?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কেমন করে?'

রাজীব মৃদু হাসল। শুধোল,—'তখন কত রাত্তির?'

—'প্রায় দেড়টা।'

—'আই সী।' রাজীব কী যেন ভাবল। পরে বলল,—'তা অত রাত্তিরে আপনি জেগেছিলেন? ঘুমোননি?'

—'না। মনে ভয় ছিল যদি শেষ রাত্তিরে ঘুম না ভাঙে। তাহলে সূর্যমন্দিরের পিছনে বিদিশার সঙ্গে কথা হবে কেমন করে?'

—'আর একটা কথা।' অভ্যেসমত মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে রাজীব জিজ্ঞাসা করল, —'গঞ্জালেশের সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে আপনার কোন কথা কাটাকাটি বা বচসা হয়েছিল?'

প্রশান্ত শুধোল,—'তদন্তের ব্যাপারে এই প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে?'

—'আছে।' রাজীব গম্ভীরমুখে তাকাল। বলল,—'অবশ্য উত্তর দেওয়া বা না দেওয়া সেটা আপনার ইচ্ছে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রশান্ত বলল,—'আপনি ঠিকই ধরেছেন। গতকাল সকালে গঞ্জালেশের সঙ্গে আমার একটা বিশ্রী ঝগড়া হয়েছিল।'

—'ঝগড়ার কারণ জানতে পারি?'

—'লোকটা ভালো নয়। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে আসে।'

—'অর্থাৎ বিদিশা দেবীর সঙ্গে আপনার এই গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সে জানে, তাই না?'

প্রশান্ত চুপ করে রইল। কোনো উত্তর দিল না।

রাজীব বলল,—'গঞ্জালেশের গতিবিধি যে সন্দেহজনক, সে কথা নিশ্চয় তাকে বলেছিলেন?'

—'হ্যাঁ।' প্রশান্ত স্বীকার করল। বলল,—'আমি আরো বলেছি যে তেমন বুঝলে তার সম্বন্ধে পুলিশকে ইনফর্ম করতে দেরি করব না।'

রাজীব গম্ভীর মুখে বলল,—'বেশ, আপনার সব কথা শুনলাম। কিন্তু আপনি এবার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন প্রশান্তবাবু।'

—'বলুন।'

—'শঙ্করবাবুর হত্যাকারী তাহলে কে? আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

প্রশান্তকে হঠাৎ কেমন নার্ভাস দেখাল। একটু আমতা আমতা করে সে বলল,—'মানে, আমি তা কেমন করে জানব? আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করবার কোনো অর্থ হয়?'

—'মিস্টার মজুমদার কিন্তু আপনাকে সন্দেহ করছেন প্রশান্তবাবু। তাঁর ধারণা শঙ্কর দত্তকে আপনি শেষ রাত্তিরে গুলি করে হত্যা করেছেন।'

প্রশান্ত মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করে বলল,—'মিস্টার মজুমদার তাই বলেছেন বুঝি? কিন্তু উনি তো নিজেই আমাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিলেন।'

—'মিস্টার মজুমদার আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন? কবে সেকথা বললেন?' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করে শুধোল'—'তার কারণ কী?'

—'কারণ আমি বলতে পারব না। কিন্তু দুবার উনি আমাকে গুলি করে খতম করতে চেয়েছেন?'

—'দুবার?'

—'হ্যাঁ, প্রথমবার লালবাজারে তাঁর চেম্বারে বসে। চোখ লাল করে উনি বললেন, ফের যদি বিদিশার সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা কর, দেন আই উইল স্যুট ইউ ডাউন।'

—'আর দ্বিতীয়বার?'

—'দ্বিতীয়বার মানে গতকাল রাত্তিরে।'

—'বলেন কী? গতকাল রাত্তিরে মিঃ মজুমদারের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল? সেটা কোথায়?'

—'বলছি। তখন প্রায় এগারোটা হবে। ঘরের দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে কপাট খুলে আমি অবাক। আর কেউ নয়, বিদিশার বাবা অতিবিক্রম মজুমদার স্বয়ং দাঁড়িয়ে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে শুধু বললেন,—তোমাকে লাস্ট চান্স দিচ্ছি। সাবধান, যদি বিদিশার জীবনে অশান্তি আর দুঃখ সৃষ্টি করতে চেষ্টা কর, দেন আই উইল স্যুট ইউ ডাউন।'

—'তারপর?' রাজীব বাকিটুকু শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

প্রশান্ত বলল,—'তারপর আর কোনো কথা হয়নি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে গটগট করে হেঁটে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

রাজীব উঠে দাঁড়াল। প্রশান্ত হঠাৎ বলল,—'আপনাকে একটা কথা জানাব?'

—'হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।'

প্রশান্ত মৃদুস্বরে বলল,—'বিদিশার সঙ্গে একবার দেখা হয় না?'

—'পাগল হয়েছেন?' রাজীব তার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলল,—'মিস্টার মজুমদার আপনার উপর দারুণ খাপ্পা হয়ে আছেন। অমন কাজটি করবেন না।'

প্রশান্ত নির্বাক। সে আর কোন কথা বলল না।

রাজীব মুচকি হেসে মন্তব্য করল,—'আপনি দেখছি বিদিশা দেবীকে দারুণ ভালবাসেন। ফের বলল,—'সত্যি তার সঙ্গে দেখা হওয়া খুব প্রয়োজন?'

—'প্রয়োজন মানে, না থাক।' প্রশান্ত হঠাৎ যেন চুপ করে গেল।

দশ

গঞ্জালেশ বেয়াড়া ঘোড়ার মত ঘাড় শক্ত করে বলল, —'না, না মশায়। আপনি ফালতু লোক। ফিল্ম কোম্পানির কী কাজ নিয়ে এসেছেন বলছেন। আপনাকে এসব কথার জবাব দিতে যাব কেন?'

রাজীব মৃদু হেসে বলল,—'পুলিশের লোক নই বলেই তোমার আপত্তি? বেশ, তাহলে ইন্সপেক্টর সাহেবকে ডাকছি। আমার কথামত তিনি সব জিজ্ঞাসা করবেন।'

গঞ্জালেশ রাগের সঙ্গে বলল,—'মিছিমিছি ঝুটঝামেলা করছেন। আপনি যা ভাবছেন তা নয় মশায়। শঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা ছিল না। শুধু শুধু গুলি চালাব কেন?'

রাজীব বলল,—'আচ্ছা, পানজিম ছেড়ে তুমি এতদূরে কেন এলে?'

—'দূর কোথায়?' গঞ্জালেশ হাসল। বলল,—'আদমী এখন পানছির মত তামাম ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে ফিরছে। আর আমি তো শুধু উড়িষ্যাতে বেড়াতে এসেছি।'

—'হ্যাঁ, কেন এসেছ তাই জানতে চাই। কী মতলব তোমার?'

—'মতলব কিছু নেই।' গঞ্জালেশ ঘাড় বাঁকিয়ে জবাব দিল। বলল,—'উড়িষ্যায় বেড়াতে এলাম। আমি একজন ট্যুরিস্ট।'

—'মিছে কথা।' রাজীব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল,—'কোণারকের সূর্যমন্দিরের দেখবার জন্য তুমি ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তে চলে এসেছ? তাই আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?'

—'অবিশ্বাস করবার কী আছে মশায়?' গঞ্জালেশ এক মুহূর্ত না চিন্তা করে উত্তর দিল। বলল, —'সান টেম্পল দেখতে কত দূর দেশ থেকে লোক আসছে। এখানে ফরেন ট্যুরিস্ট আপনার চোখে পড়েনি?'

ফরেন ট্যুরিস্টের কথায় রাজীব ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। শুধোল,—'আচ্ছা, মিঃ অ্যান্ড মিসেস স্যান্ডারসনকে তুমি চেন?'

গঞ্জালেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল,—'আপনি হাসালেন মশায়। আমি গোয়াতে থাকি। এই সব সাহেব-মেমদের চিনব কেমন করে?'

রাজীব বুঝতে পারল লোকটা পাকা শয়তান। ওকে বাগে আনা অত সহজ নয়। গম্ভীরমুখে সে তবু বলল,—'তাহলে ভুবনেশ্বর থেকে মিঃ অ্যান্ড মিসেস স্যান্ডারসনকে তুমি ফলো করে আসছ কেন?'

—'আমি কাউকে ফলো করছি না। আই অ্যাম এ ট্যুরিস্ট।' গঞ্জালেশ সগর্বে উত্তর দিল। ফের শুধোল,—'এই খবরটা আপনাকে দিল কে?'

রাজীব বলল,—'প্রশান্তবাবু। তিনি স্বচক্ষে তাই দেখেছেন।'

গঞ্জালেশ হা-হা করে হেসে উঠল। বলল,—'ছোকরার দেখছি ভারি রাগ আমার উপর। তা রাগ তো হবেই।'

—'রাগ কেন?' রাজীব জিজ্ঞাসা করল।

—'কেন নয় বলুন? ছোকরা শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে লুকিয়ে প্রেম করছিল। আমি তাই দেখে মেয়েটার বাবা মিঃ মজুমদারকে কাল সব কথা জানিয়ে দিয়েছি।'

—'শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে তুমি ওদের দেখতে পেয়েছিলে?

গঞ্জালেশ মুচকি হেসে উত্তর দিল,—'স্বচক্ষে।'

—'তুমি সেখানে কেন গিয়েছিলে? শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে তোমার নিশ্চয় কোনো দরকার ছিল না?'

গঞ্জালেশ আমতা আমর্তা করে বলল,—'না, দরকার মানে তেমন কিছু নয়।'

—'তাহলে?'

গঞ্জালেশ একটু ভেবে বলল,—'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে পাতলা কুয়াশা। কী খেয়াল হতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর পায়ে পায়ে কখন সূর্যমন্দিরের কাছে পৌঁছে গেছি। এক সময় মনে হ'ল নিকটেই কোথাও বেশ চাপা গলায় মেয়ে-পুরুষ কথা বলছে। একটু এগিয়ে আমার ছোট্ট পেন্সিল টর্চের আলোটা একধারে ফেলতেই দুজনকে দেখতে পেলাম।'

—'তুমি ওদের লক্ষ্য করেছ, ওরা কী তা টের পেয়েছিল?'

—'মনে হয় না। কারণ দুজনে কথা বলতে এমন মত্ত ছিল যে কেউ পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও ওরা তা বুঝতে পারত না।'

রাজীব হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, মিঃ অ্যান্ড মিসেস স্যান্ডারসন কোথায় উঠেছেন জানো?'

—'বোধহয় ট্যুরিস্ট লজে।'

রাজীব হাসল। বলল,—'একথা তুমি জানলে কেমন করে?'

গঞ্জালেশ একটু চমকে উঠে বলল,—'জানি মানে আন্দাজে বলছি। গতকাল একবার ট্যুরিস্ট লজে গিয়েছিলাম। দেখলাম সাহেব-মেম দুজনে হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। আপনি যাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন বোধহয় তাঁরাই হবেন।'

ভ্রূ কুঁচকে রাজীব শুধোল—'কিন্তু ট্যুরিস্ট লজে কেন গিয়েছিলে? সেখানে কী প্রয়োজন ছিল?'

গঞ্জালেশ হেসে জবাব দিল,—'গিয়েছিলাম অ্যাকোমোডেশনের খোঁজে। আমার হোটেলটা তেমন ভালো নয়। তাই ট্যুরিস্ট লজে খোঁজ নিচ্ছিলাম, যদি কোন খালি ঘর পাওয়া যায়।'

—'ওরা কি বলল? অ্যাকোমোডেশন দেবে?'

—'হ্যাঁ। আজ বিকেলেই একটা ঘর খালি হওয়ার কথা। সন্ধের আগেই আমি সেখানে শিফট্ করব।'

—'আই সী।' রাজীব চিবুকে তর্জনী চেপে ধরে কী যেন ভাবল। তারপর বেশ শক্ত গলায় প্রশ্ন করল,—'গতকাল রাত্তির এগারোটার পর তুমি কোথায় ছিলে গঞ্জালেশ?'

—'কেন? কৃষ্ণা হোটেলে,—যেখানে আমি উঠেছি।'

—'না।' রাজীব সরাসরি তার বক্তব্যকে নাকচ করে দিল। বলল,—'সাড়ে এগারোটা নাগাদ তুমি হোটেল থেকে বেরিয়েছিলে। তারপর সমস্ত রাত্রি আর ফিরে আসনি।'

—'সে কথা কে বলল আপনাকে?'

রাজীব বাঁকা হেসে উত্তর দিল,—'হোটেলের মালিক শ্রীধর পট্টনায়ক মহাশয়। তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি নিজে কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়েছিলেন। ভোরবেলায় হোটেলের চাকর সেই তালা খুলেছে।'

গঞ্জালেশ যেন হঠাৎ মিইয়ে গেল। বেশ নরম গলায় বলল,—'আমার একটা কাজ ছিল রাত্তিরে। মানে, বিশেষ প্রয়োজন বলেই।' সে দাঁত বের করে হাসবার চেষ্টা করল।

—'রাত দুপুরে তোমার কী কাজ ছিল তা নিশ্চয় বলা চলে না।' রাজীব ব্যঙ্গ করল।

গঞ্জালেশ চুপ। তার মুখে কথা নেই।

রাজীব তাকে শাসানি দিল,—'কোণারক থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করো না গঞ্জালেশ। তাহলেই কিন্তু পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। কথাটা মনে রেখো।

এগারো

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই সুন্দর সিংকে পাওয়া গেল। হোটেলে নিজের ঘরে সে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় পৌনে ছ-ফুট লম্বা। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। এক হাতে লোহার বালা। শিকারী মার্জারের মত একজোড়া গোঁফ। কিন্তু চোখের তারায় যেন চাপা কৌতুক। দেখা হতে দু-হাত তুলে নমস্কার করে পরিষ্কার হিন্দিতে বলল,—'আইয়ে প্রডিউসার সাব। বাতাইয়ে কেয়া পুছনে মাংতা।'

রাজীব এক নজর তার মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'আমি যে ফিল্ম-প্রডিউসার তুমি তা জানলে কেমন করে?'

সুন্দর সিং হাসল। ভাবটা এই, শুধু আমি কেন একথা কোণারক সুদ্ধ সকলেই জানে। মুখে বলল,—'ই সি বাত তো সব কোই কো মালুম হো গিয়া। একজন ফিল্ম-প্রডিউসার মার্ডার কেসে পুলিশের সঙ্গে ইনভেস্টিগেশন করছেন।'

রাজীব ওর চোখের তারায় কী যেন খুঁজছিল।

সুন্দর সিং ফের বলল,—'হামাকে ছুট্টি দিয়ে দিন প্রডিউসার সাব। ভুবনেশ্বরে অনেক কাজ বাকি আছে।'

রাজীব চিন্তিতমুখে বলল,—'দিতে পারি। কিন্তু একটি শর্তে।'

—'কী শর্ত বলুন?'

—'আমি যা প্রশ্ন করব তার চটপট উত্তর দিতে হবে।'

—'জরুর।'

—'কোনো কথা গোপন করবার চেষ্টা করবে না।'

—'বিলকুল নেহি।' ফের হেসে বলল,—'ইয়ে কোই সিক্রেট বাত আছে বাবুজি? ঝুটমুট কেনো ছিপাতে যাব?'

রাজীব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—'কোণারকে কেন এসেছিলে?'

সুন্দর সিং ঈষৎ হাসল। বলল,—'হামি জানতাম। এই কথা আপনি পুছবেন।'

—'তাহলে জবাব দাও।'

আড়চোখে তাকিয়ে সুন্দর সিং বলল,—'সাচ বাত শুনবেন?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

সুন্দর সিং অনুত্তেজিত গলায় বলল,—'মজুমদার সাহেবের সঙ্গে ভেট করতে।'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে ওর মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'মজুমদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার কোনো প্রয়োজন ছিল?'

—'না মানে ঠিক প্রয়োজন নয়।' সুন্দর সিং পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিল।

—'তাহলে?'

একটু ইতস্তত করে সে বলল,—'মজুমদার সাহেবকে একঠো কথা বলবার দরকার ছিল।'

—'কী কথা জানতে পারি?'

সুন্দর সিং কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। পরে বলল,—'ও একঠো মামুলি বাত। আপনি শুনে কী করবেন?'

রাজীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—'মজুমদার সাহেবকে একটা মামুলি কথা বলবার জন্যে তুমি ভুবনেশ্বর থেকে কোণারকে এসেছিলে?'

সুন্দর সিং একটু চিন্তা করে বলল,—'কথাটা আপনি শুনতে চান?'

—'নিশ্চয়। তাছাড়া আমার সব প্রশ্নের তুমি চটপট উত্তর দেবে, কোন কথা গোপন করবে না, একটু আগে তাই স্বীকার করেছ।'

সুন্দর সিং বলল,—'মজুমদার সাহেব একটা হিরে চুরির কেসে হামাকে ঝুটমুট আসামী করেছিলেন। তার জন্য কোর্টে তিন বছর সাজা হয়ে গেল।'

—'হিরে চুরির কেস?' রাজীব ঈষৎ চিন্তা করে বলল,—'পার্ক স্ট্রিটে সন্তরাম রতিলাল জুয়েলার্সের দোকানে রোলিং শাটার ভেঙে যে হিরেটা চুরি হয়েছিল?'

সুন্দর সিং প্রশংসার সুরে বলল,—'বাবুজী, আপনি তো ফিল্ম প্রডিউসার। লেকিন ক্রাইম-ওয়ার্ল্ডের অনেক খবর ভি রাখেন দেখছি।'

রাজীব গম্ভীরমুখে শুধোল,—'মজুমদার সাহেবকে তুমি কী কথা বলতে এসেছিলে?'

—'ওহি বাত।' সুন্দর সিং স্পষ্ট জবাব দিল। 'জিজ্ঞাসা করলাম ঝুটমুট কেনো হামাকে হিরে চুরির কেসে ফাঁসিয়ে দিলেন?'

মজুমদারের সপক্ষে রাজীব বলল,—'তোমার বিরুদ্ধে নিশ্চয় সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল। নইলে কোর্টে সাজা হল কেমন করে?'

সুন্দর সিং ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বলল,—'সাজা হল পরমানন্দের জন্যে। শালা এক নম্বরের শয়তান। আমার উপর রাগ ছিল। তাই মওকা পেয়ে পুরোপুরি বদলা নিয়েছে।'

রাজীব হঠাৎ নরম গলায় বলল,—'কেসে তোমার তিন বছর জেল হয়েছিল, তাই না সুন্দর সিং?'

—'হ্যাঁ বাবুজি।' সে উত্তর দিল।

—'এর জন্য মিঃ মজুমদারই দায়ী,—তুমি নিশ্চয় তাই মনে করো?'

সুন্দর সিং চুপ করে রইল। কোনো উত্তর দিল না।

রাজীব আগের মতই নরম গলায় বলল,—'এই তিন বছরে তোমার হয়তো অনেক ক্ষতি হয়েছে, কী বলো?'

সুন্দর সিং এবার মুখ তুলে তাকাল। বলল,—'মজুমদার সাহেবকে ওহি কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। লেকিন উনি বললেন,—যা হবার তা ঘটে গেছে। পুরানো দিনের কথা ভেবে কুছ লাভ নেই।'

রাজীব সমব্যথী বন্ধুর মত জানাল,—'কিন্তু তোমার যা ক্ষতি হয়েছিল তা নিশ্চয় আমাকে বলতে পার।'

উত্তাপে কঠিন বস্তু গলে, সহানুভূতিতে হৃদয়। সুন্দর সিং কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর মাটির দিকে তাকিয়েই সে ধীরে ধীরে বলল,—'হামার একঠো লেড়কী ছিল বাবুজী। বহুত খুবসুরৎ। ষোলো-সতেরো বরষ উমর। বেঁচে থাকলে মজুমদার সাহেবের লেড়কীর মত শাদী হত। লেকিন হামি যখন জেল খাটছি, তখন ওর বুখার হল। কী বিমারি কোই বুঝল না। তিন দিনের জ্বরে মেয়েটা খতম হয়ে গেল। হামার আপসোস রইল কী বাবুজী, বাপ হয়ে হামি ওর জন্যে কুছু করতে পারলাম না।'

মুহূর্তে রাজীবের মুখের চেহারা আর কণ্ঠস্বর পালটে গেল। সে ভারী গলায় প্রশ্ন করল,—'মিঃ মজুমদার একথা জানেন?'

—'না।' সুন্দর সিং মাথা নাড়ল।

রাজীব সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তাহলে একটা মতলব নিয়েই তুমি কোণারকে এসেছিলে?'

—'মতলব?' সুন্দর সিং জেদী ঘোড়ার মত ঘাড় শক্ত করে রইল।

—'নিশ্চয় মতলব। আর সেটা বুঝতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। মিঃ মজুমদার তোমাকে হিরে-চুরির কেসে আসামী করেছিলেন। তার জন্যে কোর্টে তোমার তিন বছর সাজা হল। অথচ তুমি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করো। ওদিকে জেল খাটবার সময় তোমার ষোলো-সতেরো বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটা তিন দিনের জ্বরে ভুগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। তোমার আপসোস রইল যে বাপ হয়ে তার জন্যে কিছুই করতে পারনি। তাই সেই শোক আর জ্বালা বুকে নিয়ে তুমি কোণারকে এসেছিলে। তারপর একটা জলজ্যান্ত মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে মিঃ মজুমদারের অন্যায়ের বদলা নিতে দ্বিধা করোনি।'

আশ্চর্য! এমন একটা জঘন্য অভিযোগ শুনেও সুন্দর সিং প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠল না। অনেকক্ষণ পরে শুধু বলল,—'আপনি দেখছি মজুমদার সাহেবের মত ঝুটমুট হামাকে কেসের

আসামী বানাতে চাইছেন।'

জোরালো টর্চলাইটের বাতির মত তার মুখের উপর এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে রাজীব প্রায় হুকুম করল,—'পিস্তলটা দাও সুন্দর সিং।'

—'পিস্তল?' সুন্দর সিং যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'পিস্তল হামি কোথায় পাব বলুন?'

রাজীব খলনায়কের মত বাঁকা হাসল। বলল,—'যদি এমনি না দাও, তাহলে বডি-সার্চ করতে আমরা বাধ্য হবো। আর পিস্তল যদি তোমার কাছে না পাই তাহলে অগত্যা জিনিসপত্র, বাক্স-ব্যাগ সব আমাদের খুলে দেখতে হবে।'

রাজীবের পিছনে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল। ঘাড় ফিরিয়ে চোখের সামান্য ইঙ্গিত করতেই তারা উভয়ে সুন্দর সিংহের নিকটবর্তী হল।

আগুয়ান পুলিশপুঙ্গবদ্বয়কে দেখে সুন্দর সিং বোধহয় তার মত বদলাল। বিছানার নীচে থেকে পিস্তলটা বের করে দিতে সে আর দ্বিধা করল না। শুধু বলল,—'লেকিন ইন্সপেক্টরসাব হামার চীজ্ ফিরতি মিলবে তো?'

পিস্তলটা হাতে নিয়ে রাজীব কয়েকটা সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে দেখল। তারপর সুন্দর সিংহের মুখের ওপর এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সুন্দর সিং।'

—'হাঁ জরুর।'

—'আচ্ছা, বিশ-পঁচিশ গজ দূর থেকে এইম্ করলে এই পিস্তলের গুলিতে লোক মারা পড়বে?'

একটুও চিন্তা না করে সুন্দর সিং উত্তর দিল,—হাঁ। মারা পড়তে পারে। লেকিন কোই ভাইট্যাল অরগ্যানমে হিট করনা চাহিয়ে।'

রাজীব হঠাৎ বলল,—'আজ রাত্তিরে তোমাকে কোণারকেই থাকতে হবে মিঃ সিং।'

—'থাকতে হোবে?' সুন্দর সিং এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, —লেকিন প্রডিউসার সাব, কাল সকালেই ছুট্টি মিলবে তো?'

—'কাল সকালের কথা কাল হবে।' রাজীব আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে তার বক্তব্য সম্পূর্ণ করল।

বারো

মাইকেল স্যান্ডারসন দীর্ঘকায়, মিষ্টভাষী। পিঙ্গলকেশ, নীলাভ স্নিগ্ধ দৃষ্টি। তাকে রীতিমত অভ্যর্থনা করে ঘরের ভিতরে বসাল। ফিল্ম প্রডিউসার শুনে কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল,—'এই কেসটা নিয়েই আবার একটা ছবি করবেন নাকি?'

ফিল্মের প্রসঙ্গ এড়িয়ে রাজীব তাকে জিজ্ঞাসা করল,—'ইন্ডিয়াতে কতদিন এসেছেন?'

—'বেশিদিন নয়।' স্যান্ডারসন কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল,—'ওনলি এ মান্থ।'

—'আরো কিছুদিন নিশ্চয় থাকবেন?'

—'না।' স্যান্ডারসন মাথা নেড়ে দিল। বলল,—'পরশু ভুবনেশ্বর ফিরে যাচ্ছি। সেখান থেকে দিল্লি। নেকসট্ উইকেই দেশে চলে যাব।'

মৃদু হেসে রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'ইন্ডিয়াতে সম্ভবত এই প্রথম এলেন?'

—'একজাক্টলি।' স্যান্ডারসন মুচকি হাসল।

—'কেমন লাগল এই দেশ?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'ওয়ান্ডারফুল।' মাইকেল স্যান্ডারসন প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলল,—'ইন্ডিয়া অতি প্রাচীন দেশ। এর মত সুমহান ঐতিহ্য, পুরাতন সভ্যতা, শিল্প সংস্কৃতির বিস্ময়কর প্রকাশ বহু দেশেই দুর্লভ। আমি সযত্নে মনের ভিতর এই দেশের একটা সুন্দর ছবি এঁকে নিয়ে যাচ্ছি।'

রাজীব গর্বের সঙ্গে জানাল,—'আপনি ঠিকই বলেছেন। দেশটা সভ্যতায় প্রাচীন এবং ঐতিহ্যে সুমহান।'

স্যান্ডারসন এবার জিজ্ঞাসা করল,—'বলুন মিঃ গুপ্ত, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?'

ইংরেজ ভদ্রলোকটির দিকে রাজীব একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এনি অবজেকশান?'

স্যান্ডারসন হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা গ্রহণ করে জবাব দিল, 'ও নো, উইথ প্লেজার।'

লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরানো শেষ করে রাজীব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, মিঃ শঙ্কর দত্তকে আপনি চিনতেন?'

স্যান্ডারসনের মুখের উপর ছোট্ট একটা চিন্তার ছায়া পড়ল। বলল, 'ইয়েস, আই ন্যু হিম।'

'কোথায় আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?'

'লন্ডনে।' সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে স্যান্ডারসন বলল, 'যে শপে উনি কাজ করতেন, সেটা সম্পর্কে আমার এক আঙ্কলের।'

'আই সী।' রাজীব সামান্য ভেবে বলল, 'আচ্ছা, আপনার আঙ্কলের ওই বিজনেসটা কী ধরনের জানতে পারি?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়।' স্যান্ডারসন উত্তর দিতে একটু দ্বিধা করল না। বলল, 'ইট ইজ এ বিগ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।'

'ডিপার্টমেন্টাল স্টোর!' রাজীব এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। ফের রসিকতা করে বলল, 'অর্থাৎ যেখানে এক ঈশ্বরকে ছাড়া আর সমস্ত কিছু চাইলেই পাওয়া যায়।'

মন্তব্য শুনে স্যান্ডারসন খুশি হল। বলল, 'একজাক্টলি তাই। ধরুন, মাথা ধরা সারানোর একটা ছোট্ট ট্যাবলেট চাই। ওখানে তা পাবেন। আবার দুহাজার বছর আগেকার প্রাচীন এক বুদ্ধমূর্তির মডেল খোঁজ করছেন? ওখানে আপনি হয়তো পেয়ে যাবেন।'

'বুদ্ধমূর্তি?' রাজীব অস্ফুটে বলল। 'তার মানে আপনার আঙ্কলের ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মধ্যে একটা ছোটখাটো কিউরিও শপ আছে।'

স্যান্ডারসন একটু আশ্চর্য হল। বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। কিউরিও শপ নিশ্চয়ই আছে।' ফের হেসে জানাল, 'তাই তো আপনাকে বলছিলাম আঙ্কলের ওই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কী যে পাওয়া যায় না, তা ঈশ্বরেরও অজ্ঞাত। একমাত্র আঙ্কল নিজেই সেটা বলতে পারবেন।

রাজীব বোধহয় ফের প্রসঙ্গে আসতে চাইল। শুধোল, আচ্ছা, মিঃ দত্তের সঙ্গে আপনার বেশ আলাপ-পরিচয় মানে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, আলাপ-পরিচয় নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তেমন ডিপ ইনটিম্যাসি আমাদের মধ্যে হয়নি। তবে আঙ্কলের শপে গেলে মিঃ দত্তের সঙ্গে কথাবার্তা হত। ওর কাছে ইন্ডিয়ার গল্প শুনতাম। এ লট অফ স্টোরিজ অ্যাবাউট অ্যানসেন্ট সিটিজ অ্যান্ড এম্পায়ারস্। এখানে আসবার আগে উনি আমাকে হিসটরিক্যাল প্লেসগুলোর মোটামুটি একটা ইটিনেরারি করে দিয়েছিলেন।'

কী ভেবে রাজীব জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, লন্ডনে আপনার কোনো বিজনেস আছে মিঃ স্যান্ডারসন?'

'অফ কোর্স।' স্যান্ডারসন স্বীকার করল। বলল, 'তবে ঠিক আমার বিজনেস ওটাকে বলা চলে না। আসলে সব কটা বিজনেসই আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস। নিজেদের সুবিধেমত এক একটা ব্রাঞ্চ আমরা আলাদাভাবে দেখাশুনো করি।'

'তার মানে লন্ডনে আপনাদের একাধিক বিজনেস আছে?'

'নট একজাক্টলি।' স্যান্ডারসন বিষয়টি প্রাঞ্জল করল। 'দেশে আমাদের চারটি প্রতিষ্ঠান আছে। একটি লন্ডনে, আর একটি শেফিল্ডে। অন্য দুটি বার্মিংহাম আর কার্ডিফে।'

—'কী ধরনের বিজনেস একটু বলবেন। যদি আপত্তি না থাকে।'

—'না, না। আপত্তি কীসের?' স্যান্ডারসন মৃদু হাসল। বলল, 'কার্ডিফে আমাদের বিজনেসটা ছোট। আমার বড় ভাই ওটা দেখাশুনো করেন। উই সেল গার্মেন্টস দেয়ার। আর শেফিল্ডে আমাদের একটা হসপিট্যাল ইকুইপমেন্টসের দোকান আছে। একজন ভদ্রলোক ওখানে ম্যানেজার। বাবা মাঝে-মধ্যে যান, কাজকর্ম দেখেন। এ ছাড়া বার্মিংহামে উই রান এ হোটেল। অ্যান্ড দ্যাট গিভস আস গুড প্রফিট।'

'বাট হোয়াট অ্যাবাউট লন্ডন?' ওখানে কিসের শপ?' রাজীব কৌতূহলী চোখে তাকাল।

স্যান্ডারসন সামান্য চিন্তা করে বলল, 'উই হ্যাভ এ কিউরিও শপ ইন লন্ডন। এতদিন বাবাই দেখাশুনো করে এসেছেন। ইদানীং আমি ওখানে বসছি।'

—'আই সী।' রাজীব সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করল। ফের কী যেন ভেবে বলল, 'আচ্ছা মিঃ স্যান্ডারসন, ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্বন্ধে আপনি কিছু পড়াশুনো করেছেন, তাই না?'

—'স্ট্রেঞ্জ!' স্যান্ডারসন একটু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি কেমন করে তা জানলেন?'

—'ওটা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়।' রাজীব মুচকি হাসল। তারপর টেবিলের উপর থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে বলল, 'আর্ট অ্যান্ড লাইফ নামের এই কাগজটা কলকাতা থেকে বের হয়। এতে ওরিয়েন্টাল আর্টের উপর একাধিক প্রবন্ধ থাকে।' সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে রাজীব ফের জানাল, 'কাল রাত্তিরে কিম্বা আজ সকালে পড়া ফেলে উঠবার সময় যে পাতাটা মুড়ে রেখে গিয়েছিলেন, সেটা গান্ধার শিল্প এবং প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের উপর একটি নিবন্ধ, তাই না?'

'চমৎকার।' স্যান্ডারসন তারিফ করে বলল, 'ইউ হ্যাভ এ নাইস অবজার্ভেশান পাওয়ার মিঃ গুপ্ত।'

হঠাৎ রাজীবকে ঈষৎ গম্ভীর দেখাল। কী যেন চিন্তা করে সে প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, এখানে মানে কোণারকে এসে মিঃ দত্তের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ, হয়েছিল।' স্যান্ডারসন যেন দুঃখ করে জবাব দিল। ফের বলল,—'অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আওয়ার লাস্ট মিটিং। সত্যি কথা বলতে আই বিকেম রিয়েলি সারপ্রাইজড্। ইন্ডিয়াতে ফিরে সাত দিনের মধ্যে মিঃ দত্ত কোণারকে এসে পৌছবেন, আমি তা চিন্তা করতে পারিনি।'

'শঙ্কর দত্তর সঙ্গে আপনার দেখা হল কোথায়? কোণারকের সূর্যমন্দিরে?'

'না।' স্যান্ডারসন মাথা নাড়ল। বলল, 'মিঃ দত্তর সঙ্গে আমার বাইরে কোথাও দেখা হয়নি। হি কেম হিয়ার টু সী মি।

'এখানে মানে এই ট্যুরিস্ট লজে দেখা হয়েছিল? রাজীব সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। বলল, 'কিন্তু আপনি যে এই হোটেলে আছেন, উনি সেটা কেমন করে জানলেন?'

স্যান্ডারসন বলল,—'গতকাল বিকেলে উনি সূর্যমন্দিরে আমাকে দেখতে পান। বাট হি ডিড নট মিট মি দেয়ার। বোধহয় ওর সঙ্গে তখন অন্য কেউ ছিল। তারপর কিছুটা আন্দাজ করে ট্যুরিস্ট লজে এসে আমার খোঁজ করেছিলেন।'

'তখন কী সন্ধে হয়েছিল?'

'অফ কোর্স। ইট ওয়াজ নিয়ারলি সেভেন।'

'মিঃ দত্তর সঙ্গে আপনার কী নিয়ে কথাবার্তা হয়?'

'নাথিং ইন পার্টিকুলার। এমনি কিছুক্ষণ গল্পগুজব। ওকে বললাম, আমরা শিগগির ইংলন্ড চলে যাচ্ছি। দিল্লিতে পৌঁছে সময় পেলে ফের ওর সঙ্গে দেখা করব।'

'ইন্ডিয়াতে ফিরে মিঃ দত্ত কেন সাত দিনের মধ্যে কোণারকে এলেন সে কথা তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন?'

'ও ইয়েস।' স্যান্ডারসন উত্তর দিল। 'উনি বললেন, উড়িষ্যায় ওর নিকট আত্মীয়স্বজনেরা বেড়াতে এসেছেন। তাই ওকেও এখানে আসতে হয়েছে।'

'আত্মীয় স্বজন?' রাজীব মাথার চুলে হাত বুলিয়ে কী যেন ভাবতে চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড পরে জিজ্ঞাসা করল,—'গতকাল শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের কাছে শঙ্কর দত্ত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান, এ সংবাদ আপনি কখন পান?'

'সকালবেলায়। ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজারের মুখ থেকেই খরবটা জানতে পারি।' স্যান্ডারসন সহানুভূতির সুরে বলল,—'পুওর চ্যাপ। সামবডি মাস্ট হ্যাভ কিল্‌ড হিম।'

'বাট হোয়াট ওয়াজ দি মোটিভ ফর দি মার্ডার? আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন মিঃ স্যান্ডারসন?'

একটি জটিল মানসাঙ্কের উত্তর ভেবে ভেবে মেধাবী ছাত্র যেমন একসময় হতাশ হয়, স্যান্ডারসনের মুখভাব ঠিক তেমনি পরিবর্তিত হল। অনেকক্ষণ পরে সে শুধু মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'না।'

রাজীব বলল, 'আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব মিঃ স্যান্ডরসন?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'লন্ডনে মানে প্রবাসে থাকার সময় মিঃ দত্তর প্রাইভেট লাইফ কেমন ছিল?'

'তার মানে?'

'মানে, হি ওয়াজ লিভিং এলোন ফর লং থি ইয়ার্স। স্বাভাবিক কারণে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ব্যক্তিজীবনে অনেক কিছু ঘটতে পারে।' এক মুহূর্ত থেকে রাজীব ফের শুধলো,—'আচ্ছা, ওর পার্সোন্যাল লাইফ সম্বন্ধে আপনি কোন খবর রাখতেন?'

'সামান্য।' স্যান্ডারসন ধীরে ধীরে উত্তর দিল। তারপর হঠাৎ কী মনে হতে বলে উঠল, 'একটা কথা বোধহয় আপনাকে জানাতে পারি।'

'কী কথা?' রাজীব জিজ্ঞাসু হল।

স্যান্ডারসন সঙ্কোচের সঙ্গে বলল,—'কেন জানি না মিঃ দত্ত এই কথাটা আমাকে গোপন রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। এখন বুঝতে পারছি তার একটা বিশেষ কারণ ছিল।'

—'কারণ যাই হোক, কথাটা আপনি খুলে বলুন। মিঃ দত্তর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে আপনার এই ইনফর্মেশন হয়তো একটা যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াবে।'

স্যান্ডারসন মৃদু গলায় বলল, 'খবরটা নিতান্ত পার্সোন্যাল। তবু আপনি যখন তা জানতে চেয়েছেন তখন আমি আর গোপন রাখব না।'

ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। তারপর যা বলতে চায়, অল্পকথায় রাজীবকে সেটি জানিয়ে দিল।

শুনে রাজীব বেশ অবাক হল। প্রশ্ন করল, —'আর ইউ সিওর? অর্থাৎ খবরটা সত্যি?'

—'সত্যি মানে? ইট ইজ অ্যাজ সার্টেন অ্যাজ টু-মরো'জ সানরাইজ।'

রাজীব বলল,—'কিন্তু শঙ্কর দত্ত ওয়াজ ম্যারেড। তার স্ত্রী বিদিশা দত্ত এখন কোণারকেই আছেন। এখান থেকে দুজনের কলকাতা ফেরার কথা ছিল। কয়েকটা দিন সেখানে কাটিয়ে আবার

প্লেনে দিল্লি চলে যেতেন।'

—'ইয়েস, আই নো দ্যাট। আজ সকালবেলা ম্যানেজারের কাছ থেকে খবর জেনেছি।' স্যান্ডারসন চুপ করল।

রাজীব বলল,—'অথচ মিঃ দত্ত আপনাকে বলেছিলেন যে কোণারকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তিনি দেখা করতে এসেছেন। স্ত্রীর কথা নিশ্চয় বলেন নি?'

—'না।' স্যান্ডারসন মাথা নাড়ল। ফের কেমন বিষণ্ণ হেসে বলল,—'ইউ সী, আই কান্ট রিকনশাইল ইট। কিন্তু আপনাকে যা বলেছি, তাও সত্যি।'

জিজ্ঞাসাবাদ প্রায় শেষ। তবু ওঠার আগে রাজীব হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, গতকাল রাত্রে আপনি কখন ঘুমোতে গেলেন?'

—'কেন বলুন তো?' স্যান্ডারসন শুধলো। ফের বলল,—'তা প্রায় বারোটার পর।'

—'সমস্ত রাত্তির কি এক ঘুমে কেটেছে?'

—'না, মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেছে।' রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে স্যান্ডারসন উত্তর দিচ্ছিল। 'আমার এমন হয়। মাথায় একটা চিন্তা ঢুকলেই বুঝলেন,—'

—'চিন্তা?' রাজীব ভ্রূ কোঁচকাল। 'চিন্তা কীসের?'

—'না, মানে কত রকম ভাবনা তো আছে। ধরুন মাসখানেক হল ইংলন্ড থেকে চলে এসেছি। এবার ফেরা দরকার। লন্ডনে কিউরিও শপটা আমি দেখাশুনো করতাম।' কী মনে হতে সে আবার বলল,—'জানেন, শেষ রাত্তিরে বেশ কিছুক্ষণ জানালা ধরে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম।'

—'তাহলে শেষ রাত্তিরে আপনার আর ঘুম হয়নি, তাই না?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?'

রাজীব গম্ভীরমুখে বলল,—'আচ্ছা, ঠিক এই সময়ে মানে শেষ রাত্তিরে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা আপনার চোখে পড়েছিল?'

স্যান্ডারসন প্রশ্ন করল,—'ডু ইউ মিন সাম আনন্যাচারাল ইনসিডেন্ট?'

—'ও নো। আমি যা বলতে চাই তাকে আনন্যাচারাল না বলে বরং অলৌকিক বা সুপারন্যাচাল বলা ঠিক হবে।'

'সুপারন্যাচারাল?' সান্ডারসন অস্ফুটে উচ্চার করল।

রাজীব আগের মতই গম্ভীরমুখে বলল,—'গতকাল শেষ রাত্তিরে সম্ভবত গুলির শব্দে সানটেম্পল হোটেলের একজন বেয়ারার ঘুম ভেঙে যায়। সূর্যমন্দিরের কাছেই লোকটা তার বাড়িতে শুয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে একটা শাদা পোশাক পরা মূর্তি দেখতে পায়। কুয়াশার মধ্যে মূর্তিটা হেঁটে যাচ্ছিল। একটা শাদা ঢিলে-ঢালা পোশাক তার পরনে। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত নাকি তার হাঁটবার ভঙ্গিটা। অনেকটা দম দেওয়া কলের পুতুলের মত। এখানকার লোকে বলছে সেটা একটা প্রেতাত্মা।'

'প্রেতাত্মা।' স্বগতোক্তির মত কথাটা উচ্চারণ করেই স্যান্ডারসন ফের অস্ফুটে বলল, 'হ্যাঁ, তা হতে পারে।'

রাজীব এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ধারণা গতকাল রাত্তিরে আপনি এই রকম কিছু একটা দেখে থাকবেন।'

'অ্যাঁ?' স্যান্ডারসন যেন মুহূর্তের জন্য চমকে উঠে ফের নিজেকে সামলে নিল। বলল,'হ্যাঁ, গতকাল শেষ রাত্তিরে ট্যুরিস্ট লজের পিছনে আমিও একটা ছায়ামূর্তির মত কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। ঘন কুয়াশায় সেটা তাড়াতাড়ি ঢাকা পড়ে গেল, তাই ভালো করে নজর হয়নি।'

রাজীব দ্রুত প্রশ্ন করল, 'মূর্তিটার পরনে ঢিলেঢালা পোশাক? কলের পুতুলের মত তার হাঁটবার

ভঙ্গি, তাই না?'

'উঁহু।' স্যান্ডারসন মাথা নাড়ল। পরে যেন মনে করবার চেষ্টা করে বলল, 'আমার ধারণা লোকটা বেশ লম্বা। পরনে টাইট পোশাক, সে স্ট্যাচুর মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল।'

রাজীব শুধলো, 'শেষ রাত্তিরে মূর্তিটা কেন ওখানে অমনভাবে দাঁড়িয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?'

স্যান্ডারসন চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না।

রাজীব জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে মিঃ স্যান্ডারসন। এখানে কি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন?'

'না, না। আমি তা ভাবছি না। স্যান্ডারসন ঈষৎ হেসে নিজেকে প্রফুল্ল প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করল।

তেরো

বিকেল নাগাদ সুব্রত এসে বলল,—'রাজীবদা, অটোপসি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, গুলিটা শঙ্করবাবু হার্টের পাশে বিঁধে ছিল। ভদ্রলোক বোধহয় প্রচণ্ড শকেই মারা যান। অথবা অত্যধিক হেমারেজ-ব্লাড-ভেসেল ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে।'

বিছানায় শুয়ে রাজীব বিশ্রাম নিচ্ছিল। সুব্রতর কথা শুনে উঠে বসল। বলল,—'গুলিটা কোথায়? কী ধরনের ফায়ার-আর্মস ব্যবহার হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য আছে? ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট তাঁর রিপোর্টে কী বলছেন?'

সুব্রতর হাত থেকে রিপোর্টটা ঠিক চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নিল রাজীব। এক নজর চোখ বুলিয়ে বলল,—'৩৮ বোর ওয়েপন, তাই না?' স্বগতোক্তির ধরনের ফের মন্তব্য করল,—'সম্ভবত ওটি একটি রিভলবার। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে সুব্রত।'

—'তাহলে হত্যাকারী কে? আপনি কাকে সন্দেহ করছেন রাজীবদা?' সুব্রত চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করল।

নীচের ঠোঁটটা ঈষৎ দংশন করে রাজীব পাল্টা প্রশ্ন করল,—'তুমি কাকে সন্দেহ করো?'

—'আমি?' সুব্রত কী জবাব দেবে তাই ঠিক করতে না পেরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

একটা স্লিপের মত কাগজ ছিঁড়ে দিয়ে তাতে খসখস করে কয়েকটা নাম লিখল রাজীব। বলল,—'এটা ভালো করে দেখে নাও। তারপর বেশ ভেবেচিন্তে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা কর।'

স্লিপ কাগজটার ওপর বার দুই-তিন চোখ বুলিয়ে নিল সুব্রত। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে সে পৌঁছতে পারল না। শিরোনামে প্রশান্ত। তারপর সুন্দর সিং। তৃতীয় স্থানে গঞ্জালেশ। চতুর্থে মাইকেল স্যান্ডারসন এবং সবশেষে বিদিশার নামটা দেখে সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

রাজীব জিজ্ঞাসা করল—'তুমি আর কাউকে সাসপেক্ট বলে মনে করো?'

—'না'। সুব্রত মাথা নাড়ল।

রাজীব বলল,—'তাহলে এবার মোটিভের কথায় আসা যাক। ধরো এই খুনের নায়ক প্রশান্ত দত্ত। সেক্ষেত্রে মোটিভ ফর মার্ডার বুঝতে নিশ্চয় বেশি ভাবতে হয় না।'

—'ও সিওর।' সুব্রত তাকে একবাক্যে সমর্থন জানাল। বলল,—'রাজীবদা, ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট লাইফে প্রশান্ত এই মেয়েটিকে ভালোবাসত। তখন সে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

কিন্তু অতিবিক্রম মজুমদার কৌশলে প্রশান্তকে দূরে সরিয়ে মেয়ের বিয়ে শঙ্করের সঙ্গে নির্বিঘ্নে দিয়েছিলেন। তারপর উড়িষ্যায় এসে হঠাৎ দুজনের আবার দেখা হল। ঘটনার রাত্রে সূর্য মন্দিরের পিছনে প্রশান্ত তার প্রণয়িনীর জন্য অপেক্ষা করছিল। সম্ভবত গণ্ডগোলটা সেখানেই চরমে ওঠে। বিদিশাকে লাভ করতে হলে এই পৃথিবী থেকে শঙ্কর দত্তকে সরানো প্রয়োজন। এটা বুঝতে পেরেই এমন জঘন্য অপরাধ করতে প্রশান্তর দ্বিধা হয়নি।'

—'বেশ, মানলাম তোমার কথা সত্যি। রাজীব ডিফেন্সের উকিলের মত সওয়াল করল। তারপর গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করে অভিমত দিল,—'কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রশান্ত যে একটা কথা বলেছিল।'

—'কী কথা?' সুব্রত তাকাল।

—'বিদিশার বিয়ের পর তার স্বামীর সঙ্গে ওর একাধিকবার দেখা হয়েছে। প্রশান্তর মুখ থেকে সব কথা শুনে শঙ্কর স্বীকার করে যে ব্যাপারটা আগে জানলে এই বিয়েতে সে কখনও রাজি হত না। শঙ্কর আরো বলেছিল, ইতিমধ্যে দুজনের প্রেম-অনুরাগ যদি না ফিকে হয়ে আসে, তাহলে ইংলন্ড থেকে ফিরে আদালতে ডিভোর্সের আর্জি পেশ করতে তার কোনো আপত্তি নেই।'

সুব্রত হেসে বলল,—'প্রশান্তর এই বানানো গল্পটা আপনি বিশ্বাস করেছেন?

—'আগে করিনি। কারণ এই ধরনের ত্রিভুজ প্রেমের বিয়োগান্তক পরিণতি হলে তার সমাধান খুঁজে পাওয়া একটা দ্বিঘাত সমীকরণের সরলীকরণের মত সহজ ব্যাপার। অপরাধী বাকি দুজনের একজন না হয়ে পারে না।'

—'তাহলে? আপনি মিছিমিছি প্রশান্তকে বেনিফিট অফ ডাউট দিতে চাইছেন।'

—'মিছিমিছি নয় সুব্রত।' রাজীব চিন্তিত মুখে বলল—'তদন্ত করতে গিয়ে প্রশান্তর বক্তব্যের সমর্থনে আমি প্রায় অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছি।'

—অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ!' সুব্রত অস্ফুটে বলল।

—হ্যাঁ। আমার মনে হয় বেঁচে থাকলে শঙ্কর দত্ত নিজেই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে বেশি দেরি করত না।'

সুব্রত বলল,—'আশ্চর্য! অথচ মিঃ মজুমদারের স্থির বিশ্বাস প্রশান্ত তার জামাতাকে হত্যা করেছে।'

রাজীব অভ্যেসমত তার মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে ফের শুরু করল,—'আমার লিস্টের দ্বিতীয় ব্যক্তি সুন্দর সিং। লোকটা কুখ্যাত স্মাগলার। নির্মম, নিষ্ঠুর। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পুলিশের ইনফর্মার জগদীশ্বর পাণিগ্রাহীকে সে এমন আটঘাট বেঁধে কৌশলে খতম করে যে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাকে অভিযুক্ত করবার মত এতটুকু মালমশলা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। অতিবিক্রম মজুমদারের বিরুদ্ধে তার মনে তীব্র অসন্তোষ ছিল। সুন্দর সিংহের বক্তব্য পার্ক স্ট্রিটের সন্তলাল রতিরাম জহুরীর দোকান থেকে যে হিরেটা চুরি যায়, সেই ঘটনায় তার কোন ভূমিকা ছিল না। মিঃ মজুমদার স্রেফ সন্দেহের বশে আদালতে একটা মিথ্যে মামলা সাজিয়ে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। তিন বছর জেল খাটার সময় তার ষোলো-সতেরো বছরের ফুটফুটে মেয়েটা অসুখে ভুগে একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তাই সুন্দর সিংহের মনে মিঃ মজুমদারের উপর প্রতিশোধ নেবার সুপ্ত বাসনা থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

সুব্রত বলল,—'নিশ্চয়। আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

রাজীব ঈষৎ চিন্তা করে বলল,—'এ ছাড়া সুন্দর সিংয়ের হঠাৎ কোণারকে আসবার আর কী কারণ থাকতে পারে?'

—'সুন্দর সিংকে এ প্রশ্নটা আপনি করেছিলেন?'

—'অবশ্য। কিন্তু সে বলল, তার কোনো বদ মতলব ছিল না। মিঃ মজুমদারকে সে শুধু

বলতে চেয়েছিল যে তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে তিন বছর জেল খাটিয়ে তিনি তার অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন।'

শুনে সুব্রত হা-হা করে হেসে উঠল। বলল,—'লোকটা পাকা শয়তান রাজীবদা। যে রাত্তিরে এই সমস্ত কথা বলবার জন্য সে মিঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে, তারই অল্প কয়েক ঘণ্টা পরে সূর্যমন্দিরের কাছে শঙ্কর দত্ত খুন হয়। নির্দ্বিধায় বলা যায় সুন্দর সিং তার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে বেশি দেরি করেনি।'

রাজীব কোনো মন্তব্য করবার আগেই সুব্রত ফের বলল,—'সুন্দর সিংকে এখনই আমাদের অ্যারেস্ট করা উচিত। দাগী আসামী, বেগতিক দেখলেই কর্পূরের মত কোথায় মিলিয়ে যাবে।'

রাজীব চিন্তিতমুখে বলল,—'কিন্তু খুনের মোটিভ যতই স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য মনে হোক, তবু সুন্দর সিংয়ের স্বপক্ষেও যে একটা পাল্টা যুক্তি এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

—'কী সেই যুক্তি? তাতে সুন্দর সিং যে নিরপরাধ তা প্রমাণ হয়?'

—'নিশ্চয় হয়।' রাজীব সায় দিল। ফের বলল,—'এবং সেই একই কারণে বোধহয় গঞ্জালেশকেও এই খুনের কেসে অভিযুক্ত করা উচিত হবে না।'

—'কিন্তু গঞ্জালেশকেও তো আপনি একজন সাসপেক্ট বলে মনে করেন রাজীবদা?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

রাজীব বলল,—'অফ কোর্স। গঞ্জালেশ গোয়ার লোক। পানজিমে বাড়ি। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল ছেড়ে সে পূর্ব উপকূলে এসে হাজির হয়েছে। উড়িষ্যায় আসবার উদ্দেশ্য? না, সে একজন ট্যুরিস্ট। গঞ্জালেশ বলছিল, আদমী এখন পনছির মত তামাম ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে ফিরছে। তাই তার পক্ষে কোণারকের সূর্যমন্দির দেখতে আসা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র।'

—'তাহলে?' সুব্রত জিজ্ঞাসু হ'ল।

রাজীব বলল,—'গঞ্জালেশকে সাসপেক্ট মনে করবার প্রথম কারণ তার গতিবিধি সন্দেহজনক। ভুবনেশ্বর কিংবা হয়তো আরো আগে থেকেই স্যান্ডারসন দম্পতিকে সে অনুসরণ করে আসছে। তার এই ফলো করার অভিসন্ধি প্রথমে বিদিশা, তারপর প্রশান্তর নজরে পড়ে। আবার প্রশান্ত যে গোপনে বিদিশার সঙ্গে মিলিত হয়, এই সংবাদ গঞ্জালেশ ছাড়া আর কেউ জানত না। ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা আগে শেষ রাত্তিরে প্রশান্ত এবং বিদিশাকে সূর্য মন্দিরের পিছনে সে আবিষ্কার করেছিল। পরে এই গোপন অভিসারের কথা সম্ভবত আক্রোশের বশেই মিঃ মজুমদারকে জানিয়ে আসে। কিন্তু শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে গঞ্জালেশ নিজে কেন গিয়েছিল, তার কোনো সদুত্তর সে দিতে পারেনি। এছাড়াও সন্দেহ করবার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আরো একটা কারণ আছে।'

—'কী সেটা?' সুব্রত কৌতূহলী চোখে তাকাল।

রাজীব ধীরে ধীরে বলল—'গঞ্জালেশ যেখানে আছে, সেই কৃষ্ণা হোটেলের মালিক শ্রীধর পট্টনায়ক মশায় একটা সংবাদ দিয়েছেন। ঘটনার রাত্তিরে প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ গঞ্জালেশ হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। আরো কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজে কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়েছিলেন। ভোরবেলা হোটেলের চাকর সেই তালা খুলে দেয়।' এক মুহূর্ত থেমে রাজীব মন্তব্য করল—'সমস্ত রাত্তির গঞ্জালেশ কোথায় ছিল, তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

সুব্রত ব্যস্তভাবে বলল,—'তাহলে এই সন্দেহজনক লোকটিকে অ্যারেস্ট করতে আমরা দেরি করছি কেন? আমার মনে হয় ওকে উড়িষ্যা পুলিশের হাতে তুলে দিলেই এই খুনের ঘটনায় তার লিপ্ত থাকার একটা কনফেশন আদায় করা সহজ হবে।'

—'গঞ্জালেশকে অ্যারেস্ট করলে হয়তো কোণারকে একটা সাড়া পড়ে যেত। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হত না।'

—'তার কারণ?'

রাজীবকে বেশ চিন্তিত দেখাল। মৃদু হেসে সে বলল,—'কৃষ্ণা হোটেলে গঞ্জালেশের ঘরে উড়িষ্যার একজন পুলিশ অফিসার গোপনে তল্লাশি করে। তার সুটকেস আর ট্যুরিস্ট ব্যাগের মধ্যে যে আগ্নেয়াস্ত্রটি পাওয়া গেছে সেটি রিভলবার নয়।'

—'তবে কী সেটা?'

—'ইট ইজ এ ·32 বোর অটোমেটিক পিস্তল।'

রাজীব টেবিলের ওপর একটা টোকা মেরে বলল—'ব্যালিস্টিক রিপোর্টটার জন্যই আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। তুমি বল, এরপর গঞ্জালেশের মুখ থেকে একটা কনফেসন আদায়ের চেষ্টা অকারণ জবরদস্তি ছাড়া আর কী হতে পারে?'

সুব্রত নিরুত্তর। মনে হল ব্যাপারটা তলিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে সে এখন আর খেই পাচ্ছে না।

রাজীব বলল,—'তোমার হয়তো মনে থাকতে পারে। শঙ্কর দত্তর মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার চারপাশের জায়গাটা তোমাকে ভালো করে খুঁজে দেখতে বলেছিলাম।'

—'হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন শঙ্করবাবু যদি সুইসাইড করে থাকেন তাহলে তার রিভলবারটা ঘটনাস্থলের ধারে কাছেই পাওয়া যাবে।'

রাজীব বাঁকা হেসে বলল,—'রিভলবার খোঁজা আসলে মুখ্য নয়, গৌণ। আমি চেয়েছিলাম রিভলবার খুঁজতে গিয়ে যদি গুলির খোলটা তোমার নজরে পড়ে।'

সুব্রত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল,—'গুলির খোল!'

—'একজাক্টলি। অটোমেটিক পিস্তলের সঙ্গে রিভলবারের পার্থক্য এখানেই। অটোমেটিক পিস্তল ফায়ার করলে গুলির খোলটা আপনি ঠিকরে গিয়ে বাইরে পড়ে। আর রিভলবার চালালে গুলির খোলটা বন্দুকের মতই খোপের ভিতরে আটকে থাকে। ঘটনাস্থলে আমরা কেউ গুলির খোলটা খুঁজে পাই নি। তখন আমার সন্দেহ হয়, ইট ওয়াজ এ শট্ ফ্রম এ রিভলবার অ্যাট্ এ শর্ট্ ডিসট্যান্স। অবশ্য তুমি বলতে পার ফায়ারিং এর পর আততায়ী যদি কার্তুজের খোলটা খুঁজে নিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু শেষ রাত্তিরে ওই ঘন কুয়াশার মধ্যে ঝোপঝাপের ভিতর থেকে টোটার ওই ক্ষুদ্র অংশটুকু আবিষ্কার করা খড়ের গাদায় ছুঁচ পাওয়ার মত অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া একটা মানুষকে হত্যা করার পর দুর্বৃত্ত স্বাভাবিক কারণেই সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়তে চাইবে।'

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল,—'সুন্দর সিংহের যে ফায়ার-আর্মসটা পুলিশের কাছে জমা আছে সেটাও নিশ্চয় রিভলবার নয়?'

—'না। ওটা একটা ছোট আমেরিকান পিস্তল।' রাজীব মৃদুগলায় বলল,—·24 বোর।'

কয়েক সেকেন্ড দুজনেই নির্বাক। ফের রাজীব শুরু করল,—'আমার লিস্টের চতুর্থ নাম মাইকেল স্যান্ডারসন। আপাত দৃষ্টিতে স্যান্ডারসনকে সন্দেহ করবার মত তেমন কোনো কারণ নেই। সে বিদেশি। উড়িষ্যার কোণারকে সানটেম্পল দেখতে এসেছে। কিন্তু মৃত শঙ্কর দত্তর সঙ্গে তার পূর্বে বন্ধুত্ব ছিল। তবে কোণারকে দুজনের সাক্ষাৎকার নিছক আকস্মিক। অন্তত বিকেলবেলা সূর্যমন্দিরে যাওয়ার মুহূর্তেও শঙ্কর দত্ত জানত না যে স্যান্ডারসনের সঙ্গে একটু পরেই তার দেখা হতে পারে। কিন্তু স্যান্ডারসনকে দেখতে পেলেও শঙ্কর দত্ত সূর্যমন্দিরে এই ইংরেজ দম্পতির সঙ্গে কথা বলে নি। ঘটনার রাত্তিরে সন্ধের পর সে ট্যুরিস্ট লজে এসেছিল বিদেশি বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হতে। স্যান্ডারসন জানিয়েছে সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর শঙ্কর দত্ত ফিরে যায়। সে

বলে যে উড়িষ্যায় তার নিকট আত্মীয়-স্বজনেরা বেড়াতে এসেছেন। তাই তাকেও এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল তার স্ত্রী অর্থাৎ বিদিশা দেবী যে কলকাতা থেকে কোণারকে এসেছেন, এই কথাটা সে বেমালুম চেপে গিয়েছিল।'

সুব্রত প্রশ্ন করল,—'কিন্তু এর সঙ্গে শঙ্কর দত্তর খুন হওয়ার কী সম্পর্ক?'

—'না, সম্পর্ক হয়তো নেই। তবে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক।' রাজীব মন্তব্য করল। ফের বলল,—'অবশ্য একটা ঘটনায় স্যান্ডারসনের সম্বন্ধে আমার মনে রীতিমত খটকা রয়ে গেছে।'

—'কী সেটা?' সুব্রত শুধোল।

রাজীব বলল,—'গঞ্জালেশ এই বিদেশি দম্পতিকে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে। তার পিছনে নিশ্চয় একটা গভীর রহস্য আছে। আমার মনে হল স্যান্ডারসন একটু অস্বস্তি এবং হয়তো নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক স্যান্ডারসন এই অভাব অনুভব করতে চায় না। অথচ এই বিদেশি অতিথির মুখের ওপর যে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া ভাসছে, তা আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।'

—'কিন্তু মাইকেল স্যান্ডারসন শঙ্কর দত্তকে হত্যা করবে কেন? হোয়াট ওয়াজ দি মোটিভ?' সুব্রত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

—'মোটিভের ব্যাপারটা আমার অনুমান।' রাজীব অনুত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল। ফের বলল, —'আচ্ছা সুব্রত, গঞ্জালেশ যে কারণে এই ইংরেজ দম্পতিকে অনুসরণ করছে তার মূলে নিশ্চয় একটা গোপনীয় ব্যাপার আছে। এমনও তো অসম্ভব নয় যে স্যান্ডারসনের সেই গোপন কথা একমাত্র শঙ্কর দত্ত জানতে পেরেছিল। এবং ওই কারণেই তাকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয়।'

সুব্রত আর এক ধাপ এগিয়ে বলল,—'আপনি কী মনে করেন মাইকেল স্যান্ডারসনের ঘরে তল্লাসি করলেই ·38 বোর রিভলবার পাওয়া যাবে?'

—'তা কেমন করে বলি?' রাজীব সিনিকের মত দুর্বোধ্য হাসল। ফের বলল,—বিশেষ অনুমতি না পেলে কোন বিদেশি ট্যুরিস্টের কাছেই ফায়ার-আর্মস থাকার কথা নয়। তবে আইনের অনুশাসন আক্ষরিক অর্থে কজন মানে?'

সুব্রত বলল,—'মাইকেল স্যান্ডারসনকেই যদি আপনি খুনী বলে সন্দেহ করেন, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করতে আমরা দেরি করছি কেন?'

রাজীব পরিষ্কার জবাব দিল,—'তার কারণ সমস্ত ব্যাপারটা শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে আছে। স্যান্ডারসনের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।' এক মুহূর্ত থামল রাজীব। গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করে বলল,—'ছিপে বড় মাছ খেলে শুধু টানলেই চলে না। অনেকসময় হুইলের সুতো ছাড়তে হয়। যতক্ষণ মাছটার না দম ফুরোয়। তবে আমার ধারণা ব্যাপারটার ফয়সালা হতে বেশি দেরি হবে না। আর স্যান্ডারসন যে বিষয় গোপন রাখার চেষ্টা করছে, তা হয়তো আজ রাত্তিরেই পুলিশের কাছে ফাঁস হতে পারে।'

সুব্রত বলল,—'আপনার তালিকার শেষ নাম শ্রীমতী বিদিশা দত্ত। আমি কিন্তু ভেবে পাই না কী হেতু বিদিশা দেবীকে আপনি খুনী বলে সন্দেহ করছেন?'

—'কেন? অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই।' রাজীব মৃদু হাসল। বলল,—'শঙ্কর দত্ত বেঁচে থাকলে বিদিশা দেবীর সঙ্গে তার পূর্ব-প্রণয়ীর মিলনের পথ নিশ্চয় কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠত।'

সুব্রত নিরুত্তর। কোনো জবাব দিল না।

রাজীব বলল,—'স্বামী গত হলে মেয়েদের কাছে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ সবই বদলে যায়। তবু মেয়েমানুষ কখন তার সেই স্বামীকেই খুন করে বলতে পার?'

হেঁয়ালীর মত প্রশ্ন। সুব্রত কী জবাব দেবে তাই আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

রাজীব মন্তব্য করল,—'শুনেছি স্বামীকে সতীনের হাতে তুলে দেওয়ার আগে মেয়েমানুষ বরং তার পাতে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে।'

—'সতীন?' সুব্রত খুব অবাক হয়ে বলল,—'এখানে কই তেমন কোনো ঘটনার কথা তো জানা যায় নি।'

রাজীব একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল। পরে বলল,—'চলো, বিদিশা দেবীর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

চোদ্দো

অস্তসূর্যের আলোয় বিদিশা একটা চেয়ারে চুপ করে বসেছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মনের উপর দিয়ে বোধহয় একটা সাইক্লোন বয়ে গেছে। তার শুকনো মুখ, কপালের রেখা, ভিজে চোখ এবং বিপর্যস্ত চেহারা সেই ঝড়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রাজীব নমস্কার করে বলল,—'আপনার ভাসুর ও জাকে খবর দেবার জন্য ভুবনেশ্বর থেকে রেডিওগ্রাম পাঠানো হয়েছে। খুব সম্ভব কাল সকালেই তাঁরা এসে পড়বেন। ইচ্ছে করলে ভুবনেশ্বরে দাহ শেষ করে রাত্তিরেই আবার সকলে কলকাতা ফিরে যেতে পারেন।'

বিদিশা চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না।

রাজীব খুব নরম গলায় বলল,—'তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে আর কয়েকটা প্রশ্ন না করলেই নয়।'

বিদিশা চোখ তুলে তাকাল।

রাজীব ফৌজদারী উকিলের মত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল,—'কলেজে পড়বার সময় রাইফেল শুটিং ক্লাবের আপনি মেম্বার ছিলেন?'

বিদিশা ভ্রূ কোঁচকাল। 'হঠাৎ এ প্রশ্ন?' ফের শুধোল,—'আপনি সেকথা জানলেন কেমন করে?'

রাজীব মৃদু হেসে বলল,—'কথাটা যেন শুনেছিলাম। বোধহয় আপনার বাবা একদিন লালবাজারে গল্প করেছিলেন।'

বিদিশা বিরসমুখে জানাল,—'হ্যাঁ। বাবাই আমাকে মেম্বারশিপ করে দিয়েছিলেন। ক্লাবে আমি শুটিং প্র্যাকটিস করেছি। একবার কম্পিটিশনে থার্ড প্রাইজও পেয়েছিলাম।'

—'ভেরি গুড।' রাজীব তাকে প্রায় বাহবা দিল। বলল,—'নিশ্চয় রিভলবার শুটিঙেও আপনার বেশ দক্ষতা ছিল?'

—'না।' কটু ঝাঁঝালো ওষুধের মত বিদিশার কণ্ঠে তিক্ততা ফুটে উঠল। অসীম বিরক্তির সঙ্গে সে প্রশ্ন করল,—'আপনি কী বলতে চান? শেষ রাত্তিরে শঙ্করকে আমি হত্যা করেছি?'

—'নট এক্‌জাক্টলি। মানে আমি সে কথা বলি কেমন করে?' রাজীব যেন কৌশলে এক পা পিছিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। মুচকি হেসে ফের শুধোল,—'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি?'

বিদিশা অসহিষ্ণুর মত জবাব দিল,—'অনেক প্রশ্ন তো করেছেন। শুধু শুধু এটা আর বাদ থাকবে কেন? বলে ফেলুন—'

রাজীব জিজ্ঞাসা করল,—'আপনার মৃত স্বামী অর্থাৎ শঙ্করবাবুর সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্ক ছিল?'

—'সম্পর্ক?' এত দুঃখেও বিদিশা ম্লান হাসল। বলল,—'আপনি ঠিক কী জানতে চান?'

রাজীব পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করল,—'শঙ্করবাবু অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসতেন?'

—'বিশ্বাস করুন, এর উত্তর আমার জানা নেই।' এক মুহূর্ত থেমে বিদিশা ফের জানাল, —'তবে একটা কথা হয়তো বলতে পারি।'

—'কী কথা?'

—'এক ধরনের পুরুষ আছে যারা শুধু নিজেদের ভালবাসে।' বিদিশা ধীরে ধীরে বলল। 'আমার মনে হয় শঙ্কর সেই জাতের। কোনো মেয়েকে সে ভালবাসতে পারে বলে আমার মনে হয় না।'

সান-টেম্পল হোটেল থেকে বেরিয়ে সুব্রত প্রশ্ন করল,—'রাজীবদা, তাহলে হত্যাকারী কে? শেষ পর্যন্ত আপনি কী সিদ্ধান্তে এলেন?'

প্রায় স্বগতোক্তির মত রাজীব বলল,—'এটা একটা অদ্ভুত মার্ডার। আমার সার্ভিস লাইফে এমন কেস একটাও পাইনি।'

সুব্রত মন্তব্য করল,—'রিভলবারে নিশানা ঠিক রেখে গুলি করা কঠিন কাজ। বিশেষত কিছুটা দূর থেকে। অনেকদিন প্র্যাকটিশ না থাকলে তা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে, তাই না?'

রাজীব কোনো জবাব দিল না। সুব্রত যা বলতে চায় মাথার চুলে হাত রেখে বোধহয় সে তাই চিন্তা করছিল।

সুব্রত প্রশ্ন করল,—'অতঃ কিম্?'

রাজীব তেমনি চিন্তিত মুখে উত্তর দিল,—'চলো, একবার প্রশান্তর কাছে যাই।'

নরসিংহ লজে প্রশান্ত বিছানায় শুয়েছিল। একটা পুরানো খবরের কাগজের পাতায় মুখ গুঁজে সে ঠিক মরুভূমির উটপাখির মত আত্মগোপনের চেষ্টা করছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে রাজীব গম্ভীর গলায় যেন আদেশ করল,—'প্রশান্তবাবু, উঠে বসুন।'

হঠাৎ রাজীবকে অমনি রণং দেহি ভঙ্গিমায় সামনে দেখে প্রশান্ত বেশ হকচকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল,—'কী ব্যাপার? আপনি আবার এলেন?'

—'না এসে উপায় ছিল না। শঙ্কর দত্তর খুনী যে এখনও ধরা পড়েনি।' রাজীবের দৃষ্টিতে গভীর রহস্য ফুটে উঠল। মৃদু হেসে সে ফের বলল,—'উড়িষ্যার পুলিশ তো হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রশান্ত রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বলল,—'কিন্তু বিশ্বাস করুন, শঙ্কর দত্তকে আমি খুন করি নি। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি—'

রাজীব মুচকি হাসল। শুধোল,—'এত নার্ভাস হয়ে পড়ছেন কেন? শঙ্কর দত্তকে আপনি হত্যা করেছেন এমন কথা কিন্তু এখনও বলিনি।'

প্রশান্ত নিরুত্তর। সে বোকার মত রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েক সেকেন্ড পরে রাজীব প্রশ্ন করল,—'গতকাল শেষ রাত্তিরে গুলির শব্দ হওয়ার পর ঘন কুয়াশার মধ্যে আপনি কি যেন দেখেছিলেন?'

—'হ্যাঁ, একটা সাদা পোশাক-পরা মূর্তি। কুয়াশার মধ্যে সেটা হেঁটে যাচ্ছিল।'

—'মূর্তিটাকে দেখে কী আপনার প্রেতাত্মা বলে সন্দেহ হয়েছিল?'

প্রেতাত্মা? মনে হল প্রশান্ত ভূত বিশ্বাস করে না। সে বলল,—'তা জানি না। তবে তাকে আমি পেছন থেকে লক্ষ্য করেছি। ঠিক দম-দেওয়া খেলনা পুতুলের মত কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে হাঁটছিল। মাত্র চার-পাঁচ সেকেন্ড। তারপরই ঘন কুয়াশার মধ্যে মূর্তিটা আমার দৃষ্টির আড়াল হ'ল।'

হঠাৎ পকেট থেকে তার রিভলবারটা বের করে সামনে উঁচিয়ে ধরল রাজীব। তারপর সংঘগামী কোনো বৌদ্ধ শ্রমণের মত ধীর গতিতে হাঁটতে লাগল। অবশেষে পিছন ফিরে তাকিয়ে যেন চাপা উল্লাসে সে চেঁচিয়ে উঠল। বলল,—'সাদা পোশাক-পরা সেই ভৌতিক মূর্তিটা গাঢ় কুয়াশার মধ্যে ঠিক এমনিভাবে হাঁটছিল, তাই না প্রশান্তবাবু?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কেমন করে তা জানলেন? সেই মূর্তিটাকে দেখেছেন নাকি?'

—'না।' রাজীব মাথা নাড়ল। 'কিন্তু মনে হয় তাকে দেখতে পাব। শেষ রাত্তিরে গাঢ় কুয়াশার মধ্যে সে আবার হেঁটে বেড়াবে।'

সুব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর প্রশান্ত মৃদু কণ্ঠে বলল,—'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

—'কী কথা?' রাজীব জিজ্ঞাসা করল। 'বিদিশা দেবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চান, এই তো?'

—'মিঃ গুপ্ত।' প্রশান্ত দুঃখের সঙ্গে বলল,—'বিদিশা কি আমাকে ভুল বুঝল?'

—'বেশ তো।' রাজীব পরামর্শ দিল। 'তাকে বরং একটা চিঠি দিন। ইচ্ছে করলে আজ শেষ রাত্তিরে আপনার সঙ্গে সূর্যমন্দিরের পিছনে সাক্ষাৎ করতে লিখতে পারেন।' এক মুহূর্ত থেমে মুচকি হেসে ফের বলল, '—ভয় নেই। চিঠি মারা যাবে না। যথাস্থানে পৌঁছে দেব।'

অতিবিক্রম দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কলকাতায় খবর পাঠানো হয়েছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' রাজীব মাথা হেলিয়ে বলল। 'সম্ভবত শঙ্করবাবুর দাদা-বৌদি কাল ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁছবেন। আপনার মেয়েকেও সে কথা জানিয়ে এলাম।'

—'প্রশান্তর খবর কী?' অতিবিক্রম ভ্রূ কুঁচকে রইলেন। বললেন,—'তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছে?'

—'এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। অবশ্য আমি ইচ্ছে করেই প্রশান্তকে ফ্রি থাকতে দিলাম। এই কেসে তাকে একজন সাসপেক্ট বলে মনে করি, এমন চিন্তা যেন তার মাথায় না ঢোকে।'

—'ভাল করেছেন। সাসপেক্ট এতে সতর্ক হয়ে যায়। ইনভেস্টিগেশন ফেল করে।' অতিবিক্রম মন্তব্য করলেন। ফের কী যেন ভেবে নিয়ে সোজাসুজি শুধোলেন,—'প্রশান্তকে কী মনে হল আপনার?' এ ডেঞ্জারাস ইয়ংম্যান, তাই না?'

রাজীব বেশ গম্ভীর মুখে জবাব দিল,—'প্রশান্তবাবু গভীর জলের মাছ। ওকে জল থেকে ডাঙায় তুলে আনা কঠিন কাজ। তাই আমি খুব সতর্কভাবে অগ্রসর হচ্ছি। যেন আমি ওর শত্রু নই। বরং একজন বন্ধু,—এই ধারণাটা ওর মনের মধ্যে বদ্ধমূল করতে চাই।'

—'তাতে কী লাভ?'

—'হয়তো তাহলে প্রশান্ত কথাবার্তায় সহজ হবে। এবং তার থেকেই হত্যা রহস্যের কোনো ক্লু পাওয়া যেতে পারে।'

অতিবিক্রম হঠাৎ বলে উঠলেন,—'আমি নিশ্চিত যে শঙ্করকে ওই খুন করেছে।'

রাজীব মৃদু হেসে বলল,—'প্রশান্ত কী বলে জানেন? ছেলেবেলায় এয়ার-গান ছাড়া জীবনে সে কোনো গান কিম্বা পিস্তল স্পর্শ করেনি।'

—'হি-ইজ এ লায়ার।' অতিবিক্রম প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন,—'আপনি পুলিশের লোক হয়ে ওর এই স্টেটমেন্ট বিশ্বাস করলেন?'

—'না-না। বিশ্বাস করব কেন? প্রশান্ত বলছিল, আমি তাই বন্ধুর মত ওর কথায় সায় দিলাম।'

অতিবিক্রম তেমনি উত্তেজিতভাবে বললেন,—হি ইজ এ স্কাউন্ড্রেল। ওর জন্যেই বিদিশার আজ অকাল বৈধব্য। আমি ওকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। কোনোদিন না,—নেভার।'

কাছে গিয়ে রাজীব গলা নামিয়ে বলল,—'আমি একটা খবর পেয়েছি স্যার।'

—'কী খবর?'

—'সূর্য মন্দিরের পিছনে প্রশান্ত নাকি আজ শেষ রাত্তিরে বিদিশা দেবীর সঙ্গে দেখা করবে।'

—'হোয়াট ডু ইউ সে?' অতিবিক্রম উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলেন।

—রাজীব বলল,—'এই দেখুন স্যার। বিদিশা দেবীকে লেখা প্রশান্তর চিঠি। শেষ রাত্তিরে সূর্যমন্দিরের পিছনে তাকে দেখা করতে বলেছে।'

চিঠিটার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে অতিবিক্রম প্রায় বিড়বিড় করে বললেন,—'প্রশান্তকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। বিদিশার সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করলে তার ফল খারাপ হবে,—আই উইল স্যুট হিম ডাউন। কিন্তু আমার ওয়ার্নিং সে গ্রাহ্য করেনি।'

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। বাইরে থেকে বিদিশা দেবীর ঘরের দরজায় আজ রাত্তিরে লক করা থাকবে। ভোরের আলো ফোটার আগে কিছুতেই উনি বাইরে যেতে পারবেন না।'

তবু অতিবিক্রম অশান্ত,—কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না। দু-একবার ঘরের মধ্যে পায়চারী করে হঠাৎ অন্যমনস্কের মত বাথরুমে চলে গেলেন। রাজীব বোধহয় সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বাথরুমের দরজা বন্ধ হতেই সে নিঃশব্দে তার কাজ সেরে ভালোমানুষ সেজে চুপ করে বসে রইল।

পনেরো

রাত প্রায় দুটো।

ঘুম থেকে সুব্রতকে ডেকে তুলল রাজীব। বলল,—'এখুনি তৈরি হয়ে নাও। আমাদের একটু বেরুতে হবে।'

ঘুম-ভাঙা চোখে সুব্রত বলল,—'এত রাত্তিরে কোথায় রাজীবদা?'

কোন কথা না বলে রাজীব শুধু নিঃশব্দে আর একবার তার মুখের দিকে তাকাল।

এইটুকুই যথেষ্ট সুব্রত মিনিট দুই-তিনের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিল। দুজনে লঘু পায়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। নিঃস্তব্ধ রাত। কোণারক সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। ক্রমে কুয়াশা ঘন হচ্ছে। কোথায় একদল শৃগাল সমস্বরে চিৎকার করে প্রহর ঘোষণা করল।

সূর্যমন্দিরের কাছেই একটা পাথরের আড়ালে রাজীব নিঃশব্দে বসে পড়ল। পাশে সুব্রত। ফিসফিস্ করে সে বলল,—'রাজীবদা, ওই জায়গাটা দেখুন। আজ সকালে শঙ্করবাবুর ডেড-বডিটা ওখানেই পড়েছিল।'

উত্তরে কিছু না বলে রাজীব ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে তাকে চুপ করতে বলল।

প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। কাছেই কোন হোটেলের বড় ঘড়িতে টং-টং করে তিনটে বাজল। সুব্রত উসখুস করছিল। রাজীব নির্বাক। তাহলে কী তার হিসাবে ভুল হ'ল? সাদা পোশাক-পরা সেই ভৌতিক মূর্তিটা কী গাঢ় কুয়াশার ভেতর থেকে আজ দেখা দেবে না?

অদ্ভুত কাণ্ড। ঠিক তখুনি শুকনো পাতায় মচমচ ধ্বনি উঠল। হ্যাঁ, কেউ যেন এগিয়ে আসছে। এই নিশুতি রাত্তিরে সামান্য একটা পাতা ঝরলেও তার খসখসানি কানে আসে। আর এ তো

একটা প্রেতাত্মার আবির্ভাব। এবং আশ্চর্য, কুয়াশার আড়াল থেকে ধীরে ধীরে সেই অদ্ভুত অবয়ব ভেসে উঠল।

সুব্রত ফিসফিস করে শুধোল,—'রাজীবদা, হু ইজ হি?'

ঢিলাঢালা সাদা শ্লিপিং স্যুট পরনে। লম্বা মূর্তি। হাতে উঁচানো পিস্তল। কিন্তু আশ্চর্য! চোখ দুটি নিমীলিত,—বন্ধ। আরো কয়েক পা এগিয়ে ট্রিগারে সে চাপ দিল। খট করে একটা শব্দ হল শুধু। রিভলবারের খোপে গুলি ছিল না, তাই। তারপর ঠিক তেমনি ঘুমন্ত অবস্থায় পিছন ফিরে সে হাঁটতে হাঁটতে ঘন কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সুব্রত বলল,—'রাজীবদা, হি ইজ দি মার্ডারার। ওকে এখুনি গ্রেপ্তার করা উচিত।'

—'না।' রাজীব বাধা দিল। বলল,—'ঘুমের ঘোরে ওই মানুষটা কী করেছে, কাল সকালে তাই ওর স্মরণ থাকবে না। মেডিক্যাল সায়েন্স একেই বলে স্বপ্নাটন রোগ বা somnambulism। এতদিন মনের কোণে যে আক্রোশ পুষে রেখেছিল, স্বপ্নের ঘোরে ও তাই চরিতার্থ করেছে।

ভোরের দিকে হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে রাজীবের ফের ঘুম ভেঙে গেল। গোলমালে সুব্রত জেগে উঠে বলল,—'গণ্ডগোলটা মনে হয় ট্যুরিস্ট লজের দিক থেকে আসছে।'

অগত্যা জামা-কাপড় বদলে নিয়ে বেরুতে হল। চারপাশে কুয়াশা। বিশ হাত দূরেও ভালো নজর হয় না। সামান্য ভোরের আলো ফুটেছে। তাতেই যতটুকু দেখা যায়। কাছাকাছি যেতেই একজন কনস্টেবল খবর দিল,—'রাত্তিরবেলা ট্যুরিস্ট লজের এক বোর্ডারের ঘরে বড রকমের চুরি হয়ে গেছে।'

চুরি? শুনেই রাজীব ভ্রূ কুঞ্চিত করল। ট্যুরিস্ট লজের করিডোরে, সিঁড়িতে তখন পুলিশ এবং উৎসুক জনতার ভিড়।

একজন বোর্ডার বলল,—'হ্যাঁ মশায়। ভোরের দিকে মিঃ স্যান্ডারসনের যখন ঘুম ভাঙল, ঘরের দরজা তখন হাট করে খোলা। জিনিসপত্র ওলটপালট। চোর সমস্ত ঘরখানা তছনছ করে দিয়ে গেছে।

রাজীবকে দেখে একজন পুলিশ অফিসার বলল,—'বোধহয় ক্লোরোফর্ম কিংবা ওই ধরনের কিছু ব্যবহার হয়েছে। নইলে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তো চোর ঘরের মধ্যে ছিল। আঁতিপাতি করে জিনিসপত্র ঘেঁটেছে। আর স্যান্ডারসন সাহেবের ঘুম ভাঙল না।'

কোথা থেকে সুব্রত খবর নিয়ে এলো,—'রাজীবদা, গঞ্জালেশকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'গঞ্জালেশ নিখোঁজ?' রাজীব কেমন অদ্ভুত হাসল।

সুব্রত বলল,—'হ্যাঁ। গতকাল বিকেলে সে ট্যুরিস্ট লজে এসে ওঠে। তারপর আজ ভোর থেকেই নিপাত্তা। কোনো সন্ধান নেই।'

—'তাই কখনও হতে পারে?' রাজীব আস্থার সঙ্গে কথা কইল। বলল,—'সমস্ত কোনারক এখন পুলিশ ঘিরে আছে। একটা মাছি গলবার ফাঁক নেই। পালাতে গেলেই গঞ্জালেশ ফাঁদে পড়বে।'

সকাল হতে দেরি নেই। একটা গাড়ি এসে সানটেম্পল হোটেলের সামনে দাঁড়াল। ভুবনেশ্বর থেকে শঙ্করের দাদা-বউদি এসে পৌঁছলেন। ডাকাডাকি করতে বিদিশা, তারপর অতিবিক্রম মজুমদার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি, শোক। আর আধঘণ্টা পরেই সকলে আবার ভুবনেশ্বর যাবার জন্য তৈরি হলেন। শঙ্করের ডেড-বডি সেখানেই। ইচ্ছে করলে আজ দিনের বেলাতেই দাহ সেরে রাত্তিরের ট্রেনে কলকাতা ফেরা যায়।

মালপত্র সব গাড়িতে উঠল। শুকনো মুখে, উদাস চোখে বিদিশা ঘর থেকে নিচে নেমে এলো।

ওই ঘরে শঙ্কর তার সঙ্গে বাস করতে এসেছিল। ওই ঘর থেকেই শেষ রাত্তিরে কখন বেরিয়ে গেল—আর ফেরেনি।

রাজীব কাছে গিয়ে চাপাগলায় বলল,—'একটা কথা আপনার জানা দরকার। মানে আমার বলা উচিত।'

—'কী কথা? বলুন—'

—'এই খুনের সঙ্গে প্রশান্তর কোনো সম্পর্ক নেই। সে নির্দোষ।'

বিদিশা কোনো উত্তর দিল না। শুধু চোখ তুলে এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের দিকে তাকাল। রাজীবের মনে হল কোনো রমণীর নয়নে এমন কৃতজ্ঞ দৃষ্টি সে বহুকাল দেখেনি।

গাড়িতে ওঠার আগে অতিবিক্রম একবার পিছন ফিরে তাকালেন। সানটেম্পল হোটেল। কোণারককে হয়তো আর কোনদিন আসা হবে না। কোনোদিনই না।

রাজীব সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—'একটা কথা ছিল স্যার।'

—'কথা?' অতিবিক্রম সোজা হয়ে তাকালেন। বললেন,—'আমি আশা করব সেই স্কাউন্ড্রেলটাকে আপনি আজই অ্যারেস্ট করবেন।'

মৃদু হেসে রাজীব শুধু বলল,—'আপনার রিভলবারটা স্যার।'

—'আমার রিভলবার?'

'হ্যাঁ, মানে গতকাল আপনার বালিশের নিচে থেকে এটা নিয়ে একবার নাড়াচাড়া করে দেখেছিলাম। তারপর কখন ভুল করে আমার রিভলবারটা যে ওখানে রেখে দিয়েছি খেয়াল করিনি।'

অতিবিক্রম কী বুঝলেন কে জানে। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে রাজীবের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন। তারপর কিছু যেন মনে হতে নিজের জিনিসটা একবার খুলে দেখলেন। .৩৮ বোরের ছ-ঘরা রিভলবার। ভেতরে পাঁচটি খোপে তাজা টোটা,—শুধু একটি ঘরে গুলির খোলটা পড়ে আছে।

কোণারকে কুয়াশা নেই। পরিষ্কার স্বচ্ছ দিন। সব দেখা যায়।

দিনের আলোকে অতিবিক্রম মজুমদার কি কিছু স্মরণ করবার চেষ্টা করছেন? কিন্তু কই? কিছুই তো তাঁর মনে পড়ে না।

গাড়ি চলে যাবার পর প্রশান্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

রাজীব হেসে বলল,—'ভেরি সরি, বিদিশা দেবী এইমাত্র চলে গেলেন। আর একটু আগে এলেই দেখা হত।' পরক্ষণেই মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর করে রাজীব জানাল,—না এসে বোধহয় ভালো করেছেন। মিঃ মজুমদার আজই আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বলে গেলেন।'

প্রশান্তকে মুহূর্তের জন্য বিমর্ষ দেখাল। ফের নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—'শুনলাম গত রাত্তিরে ট্যুরিস্ট লজে একটা বড় রকমের চুরি হয়ে গেছে।'

—'হ্যাঁ। বড় গোছের চুরি বলতে পারেন। মিঃ স্যান্ডারসন তাঁর এফ. আই. আর' এ ট্রাভেলার্স চেক, টাকাকড়ি, রিস্টওয়াচ ইত্যাদি নানা বস্তু খোয়া গেছে বলে লিখেছেন।' এক মুহূর্ত থামল রাজীব। ফের কুয়াশার মত রহস্যের জাল বিছিয়ে দিয়ে বলল,—'আসলে কিন্তু ভদ্রলোকের একটি কানাকড়িও চুরি যায় নি।'

—'তাহলে? চোর কি জন্য ওর ঘরে হানা দিয়েছিল?'

—'সেটা অবশ্য একটা বহুমূল্য জিনিস।' রাজীব যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠল। কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোল—'জিনিসটা দেখতে চান?'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়।' প্রশান্তকে বেশ কৌতূহলী মনে হল।

—'দেন ওয়েট।' রাজীব মুচকি হেসে বলল, 'দেয়ার ইজ অলসো এ সারপ্রাইজ ফর ইউ'।

তারপর উড়িষ্যার পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ইঙ্গিত করে কী যেন বলেই কারো প্রতীক্ষায় সে বসে রইল।

সামনে ভূত দেখলেও প্রশান্ত বোধহয় অমন চমকে উঠত না। গঞ্জালেশ সশরীরে তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আশ্চর্য! সেই কাউ-বয় প্যান্ট আর স্কিন-জ্যাকেট কোথায় গেল? তার বদলে পরনে পুলিশের মতই ইউনিফর্ম, মাথায় টুপি। করমর্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'এক্সকিউজ মি ফর দি ট্রাবল।'

সুব্রত তাকে আশ্বস্ত করল,—আপনার লজ্জার কারণ নেই। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলেই মিঃ গঞ্জালেশ তাঁর আইডেনটিটি কারো কাছে প্রকাশ করেন নি।'

রাজীব হেসে পরিচয় দিল, 'ইনি মিঃ আলভিনো গঞ্জালেশ। সি. বি. আইয়ের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট। বিন্ধ্যাচলের কাছে প্রাচীন দুর্গামন্দিরের আটশত বছরের পুরাতন অষ্টভুজা মূর্তি কিছুদিন আগে চুরি যায়। পুলিশের কাছে সোর্স থেকে খবর আসে যে সেই অষ্টভুজা মূর্তি স্মাগলাররা কোন একজন বিদেশিকে পাচার করে দিয়েছে। তাই উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর এবং কোনারকে নজর রাখতে আমাকে পাঠানো হয়।'

একটা ঢোক গিলে প্রশান্ত বলল,—'আপনি কি তাহলে মিঃ শুভ্রাংশু গুপ্ত নন? ক্রাইম স্টোরি নিয়ে ফিল্ম করবার জন্য লোকেশন খুঁজতে এখানে আসেননি?'

—'অফ কোর্স নট।' গঞ্জালেশ হাসতে হাসতে জবাব দিল। বলল,—'হি ইজ মিঃ রাজীব সান্যাল। কলকাতা পুলিশের সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর। এ ভেরি ইনটেলিজেন্ট অফিসার।'

অষ্টভুজা মূর্তিটা নিয়ে এল সুব্রত। বেশি বড় নয়,—বড় জোর এক ফুট লম্বা। সেকালের ভারতীয় শিল্পীর নিখুঁত কারুকার্যময় সৃষ্টি।

রাজীব বলল,—'বিদেশের বাজারে এই দুষ্প্রাপ্য মূর্তিগুলোর অনেক দাম। লন্ডনে স্যান্ডারসনের কিউরিও শপ থেকে এই ধরনের মূর্তি লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রি হয়। মিঃ গঞ্জালেশ ছায়ার মত অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত স্যান্ডারসনের ঘর থেকে এই অপহৃত অষ্টভুজা মূর্তি উদ্ধার করেছেন। ওঁর কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।'

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল,—'রাজীবদা, মিঃ মজুমদারের ঘরে রিভলবারটা প্রথম দেখে নিশ্চয় আপনি সব বুঝতে পেরেছিলেন?'

—'না-না। সব বুঝব কেমন করে? তখনও ব্যালিস্টিক এক্সপার্টের রিপোর্ট এসে পৌঁছয়নি। তাছাড়া রিভলবার যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। প্রশান্তবাবু, বিদিশা দেবী কিংবা অন্য কেউ। তবে ঘটনাস্থলে একটা বড় সাইজের বোতাম পাওয়া গিয়েছিল। স্লিপিং গাউনের সঙ্গে সেটা মিলে যেতেই আমার সন্দেহ বাড়ে।'

উড়িষ্যার সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর বলল,—'শঙ্কর দত্তর জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। পুওর চ্যাপ।'

রাজীব বলল,—'আমার বেশি দুঃখ একটি মেয়ের জন্য।'

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কার কথা বলছেন? বিদিশা দেবী?'

—'উহুঁ।' রাজীব মাথা নাড়ল। বলল,—'সে এক বিদেশিনি।' লন্ডনে থাকতে শঙ্করের সঙ্গে তার পরিচয় এবং এনগেজমেন্ট হয়। মাস ছয় এখানে কাটিয়ে শঙ্কর ফের ইংলন্ডে গিয়ে মেয়েটির পাণিগ্রহণ করবে বলে ঠিক করেছিল। ইতিমধ্যে বিদিশা দেবীর সঙ্গে ডিভোর্সের নিশ্চয় একটা নিষ্পত্তি হত।'

—'একথা আপনি কার কাছে শুনলেন?'

—'কেন, লন্ডনের মানুষ খোদ স্যান্ডারসনের কাছ থেকে। এর জন্যই তো শঙ্কর দত্ত নিজের

স্ত্রীর কথা তার কাছে বেমালুম চেপে গিয়েছিল।'

কোণারকে কাজ শেষ। এবার ফেরার পালা। কুয়াশা অন্তর্হিত—চার পাশে শুধু রোদ আর রোদ। স্বচ্ছ আলোকিত দিন।...

প্রশান্তর কাছে গিয়ে রাজীব বলল,—'আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই।'

—'হ্যাঁ বলুন।' সে জিজ্ঞাসু হল।

রাজীব তাকে আশ্বস্ত করে বলল,—'চিন্তার কারণ নেই। বিদিশা দেবী আপনাকে ভুল বোঝেননি।'

প্রশান্ত কোন জবাব দিল না। শুধু হাসল, সলজ্জ কৃতজ্ঞ হাসি।

তার কাঁধে হাত রেখে রাজীব বলল,—'উইশ ইউ বেস্ট্ অফ লাক।'

গাড়িতে উঠে সুব্রত বলছিল,—'রাজীবদা, মিঃ মজুমদারকে আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। নইলে জামাইকে তো উনি হত্যা করেছেন।'

—'হয়তো তাই। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে কি তা মনে হয়? আর শঙ্কর দত্তকে তো উনি গুলি করতে চাননি। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট'—" এ Somnambulistic মার্ডার।'

সুব্রত ফের বলল,—'তাহলে কাকে লক্ষ্য করে উনি গুলি ছুঁড়েছিলেন?'

রাজীব খুব নিচুগলায় উত্তর দিল—'কেন, তার নাম প্রশান্ত বসু।'



রাত তখন দশটা

দিকনগর পেপার মিলের সুন্দরী টেলিফোন
অপারেটার তরঙ্গমালা খুন হল প্রায় নির্জন
একটা রাস্তার মোড়ে। রাত তখন দশটা।
আর সেই খুনের তদন্তে এলেন
সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল।
একাধিক সাসপেক্ট, —কাকে ছেড়ে কাকে
নিয়ে পড়বেন? এদের মধ্যে আছে
তরঙ্গের প্রেমিক নিখিলেশ, তার বন্ধু
শশাংক, ম্যানেজারের পেয়ারের লোক
ভৈরব দত্ত, বিশ্বনাথ এমন কী খোদ
ম্যানেজার প্রেমপ্রার্থী সুদর্শন চক্রবর্তী,
সব শেষে লেসবিয়ান
মহিলা সুজাতা—।



এক

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি হয়ে এলেও বর্ষা যাই যাই করেও বিদায় নেয়নি। অনেকটা অনিচ্ছুক স্কুলের ছেলের মত। বই পাততাড়ি বগলে নিয়ে রওনা হয়েছে বটে। কিন্তু বার বার পিছন ফিরে পরিচিত ঘরবাড়ি এবং সম্ভব হলে মায়ের হাসিমুখটির খোঁজ করছে।

গত দু-তিন দিন ধরে বৃষ্টির কামাই নেই। শনিবার সকাল দশটার পর ঘন্টা তিনেকের একটানা বর্ষণের ইতি হল। দুপুরে ইলিশ মাছের রঙের রোদ দেখা দিল। বিকেলে ছেলে-বুড়ো সকলের মনে খুশির হুটোপাটি, পথেঘাটে ভিড়। লোকজন, হইচই। কেনাকাটা, পায়ে হেঁটে এদিক সেদিক চক্কর দিয়ে আসা। সকলে ভাবল এ মরসুমের মত বর্ষার দফা গয়া—।

কিন্তু রাত দুপুর থেকেই হুড়মুড় করে আবার বৃষ্টি নেমেছে। আজ সকালেও বৃষ্টির কমতি নেই। ঝির-ঝির বর্ষণ হচ্ছে তো হচ্ছেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার আগে নীল আকাশের মুখ দেখা যাবে বলে মনে হয় না।

চেয়ারে বসে রাজীব সান্যাল একটা হাই তুলল। একটু আগেই ছোট্ট একটা ভাতঘুম দিয়ে উঠেছে রাজীব। থানা ছেড়ে সি. আই. ডি-তে আসার পর থেকেই শরীরটা যেন ভারী হয়ে উঠছে। দৌড়-ঝাঁপ নেই, ছুটোছুটি কম। ঘরে বসে মাথা খেলানোর কাজ। পেটে হাত দিলেই আজকাল বেশ একটু চর্বির আন্দাজ পাওয়া যায়। দেহ মোটা হলে মাথার অবস্থা কী হবে ভেবে দুর্ভাবনায় ঘুম হয় না রাজীবের।

সামনের টেবিলে একটা ফাইল রয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা পাতা উল্টে দেখেছে রাজীব। হাতে তিনটে ডাকাতির কেস। মথুরাপুরে এসে এই তিনটে ডাকাতির কেস ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। রাজীবের তদন্তের পর্বও প্রায় শেষ হয়ে এল।

ডাকাতি তিনটে হলেও আসলে একটা গ্যাংয়েরই কাজ। ঘুরেফিরে দূর দূর অঞ্চলে গিয়ে এরাই ডাকাতি করে আসছে। মনে মনে বহুদিন আগে শেখা ডিটেকটিভ নীতি-বাক্যটা আউড়ে নিল রাজীব সান্যাল। সার্চ ফর দি মার্ডারার নিয়ার টু দ্য পি. ও. অ্যান্ড সার্চ ফর দি ডকইট্ ফার ফ্রম দি পি. ও.। পি. ও. অর্থাৎ প্লেস অফ অকারেন্স। হত্যাকারী রয়েছে তারই আশেপাশে। আর ডাকাত? সে থাকে অকুস্থল থেকে বহুদূরে। তার ঠিক-ঠিকানা ধারে কাছের লোকে কেউ জানবে না।

সুদৃশ্য একটা লাইটার টিপে ধূমপান করতে চেষ্টা করল রাজীব। প্রথমবার ব্যর্থ... দ্বিতীয়বারও তাই,... কিন্তু তৃতীয় বারে ফস করে আলো জ্বলে উঠল। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সহকারী শচীদুলালের দিকে চেয়ে হাসল রাজীব। বলল,—ডিটেকটিভ হতে গেলে এই সিগারেট লাইটারটার কাছেই প্রথম শিক্ষা নিতে হবে শচী।

শচীদুলাল মুখ তুলে তাকাল।

রাজীব সান্যাল হেসে বলল—বুঝতে পারলে না শচী? দুবার লাইটারটা টিপে কাজ হল না। কিন্তু তৃতীয়বারে ফস করে আলো জ্বলে উঠল। ডিটেকটিভের চেষ্টাও তাই। দুদিকে তাকিয়ে কোনো রহস্যের সুলুক-সন্ধান তোমার দৃষ্টিতে এল না। কিন্তু তৃতীয় দিকে তাকাতেই সব ভাবনার সমাধি। আলোর সূত্রটি হঠাৎ তোমার নজরে এসে গেল। ব্যস, এবার সেদিকে এগিয়ে যাও।

রহস্যের যবনিকা উঠবেই—

রাজীব সান্যাল ফাইলের কাগজপত্রের মধ্যে আবার চোখ ডুবিয়ে বসল। শচীদুলাল কি একটা লেখার নকল করছিল। পুনরায় সেই কাজে মনোযোগী হল।

বাইরে তেমনি ছিপ-ছিপ বৃষ্টি। গাছপালাগুলো ভিজে নেয়ে উঠেছে। একটা জলে ভেজা কাক খুব অসহায় ভঙ্গি করে গাছের উঁচু ডালে বসে রয়েছে। কলরব করে বালকের দল কোথাও পুকুরে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে।

বাড়ির সামনে যেন একটা সাইকেল রিকশ এসে থামল। রাজীব সান্যাল আবার ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকাল। সহকারী শচীদুলালকে কী যেন ইঙ্গিত করল রাজীব। মাথা নেড়ে শচীদুলাল চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল।

জলে ভেজা বাতাসের স্পর্শে সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। রাজীব সান্যাল পুনরায় সেটিতে আগুন ছোঁয়াল। বেশ আয়েস করে একটা টান দিয়ে রাজীব চোখ বুজে কি যেন ভাবতে শুরু করল—।

শচীদুলাল বলল,—'শুধু সাইকেল রিকশ নয় স্যর। সাইকেলে করে আমাদের এস-ডি-পি-ওর অর্ডালি রুদ্রপ্রতাপও এসেছে।'

—'রুদ্রপ্রতাপকে বাদ দাও। রিকশতে করে কে এসেছেন বলো।'

—'একজন ভদ্রলোক স্যর। মনে হয় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বিরক্তি প্রকাশ করে রাজীব বলল, 'তুমি বড় বোকার মত কথা বলছ শচী। দেখা করবে বলেই তো এতদূর আসা। নইলে জলে ভিজে বাদলার দিনে কেউ এমনি দোরগোড়ায় এসে রিকশ থামায়?' —একটু হেসে রাজীব যোগ করল—'ওর কাছে খবর আছে শচী।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রপ্রতাপ এসে ঘরে ঢুকল। যথারীতি পুলিশি কায়দায় সেলাম ঠুকে একটা কাগজ দিল রুদ্রপ্রতাপ। কাগজ বলতে একটা স্লিপ গোছের জিনিস। সবুজ কালিতে দু-তিন লাইন লেখা। অক্ষরের ছাঁদগুলো তো চেনে রাজীব। কিন্তু কালিটাকে আরো বেশি। সবুজ কালিতে এখানে আর কেউ লেখে না। মহকুমার পুলিশ সাহেব ছাড়া—।

স্লিপের লেখাটা দুবার পড়ল রাজীব। পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষর। 'প্রসিড টু দিকনগর অ্যান্ড টেক আপ ইনভেস্টিগেশন। এ মার্ডার ইজ রিপোর্টেড টু হ্যাভ বিন কমিটেড দেয়ার। দিস ম্যান হ্যাজ সামথিং টু টেল ইউ।' নীচে পুলিশ সাহেবের দস্তখৎ—। সঙ্গে ছোট্ট একটা কাগজে ভদ্রলোকের নাম লেখা!

রুদ্রপ্রতাপের দিকে চেয়ে বলল রাজীব,—'ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দাও'।

সেলাম করে রুদ্রপ্রতাপ বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই ভদ্রলোক এসে ঢুকল। একনজরে ওর দিকে তাকাল রাজীব। বেশি বয়স নয়। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। চেহারা পাতলা। চোখ দুটি বড়, কিন্তু ঈষৎ কোটরে ঢোকা। নীচের ঠোঁটটা পুরু। চিবুকটা কেমন লম্বা ছুঁচোলো। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। মাথার চুল এককালে বেশ পুরু এবং ঘন ছিল। ইদানীং অযত্নে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সামনের দিকটা অল্প ফাঁকা হয়ে এসেছে।

নমস্কার করে ভদ্রলোক বলল—'আপনি কি সি. আই. ডি ইনস্পেক্টার রাজীব সান্যাল?'

রাজীব ঠোঁট দুটি সামান্য ফাঁক করে সম্মতিজ্ঞাপক হাসল।

—'ইনি?—'

এবার মুখ খুলতে হল রাজীবকে,—'উনি আমার সহকারী শচীদুলাল সরকার।'

—'এঁর সামনে আমি—?'

—'নিশ্চিন্তে সব কিছু বলতে পারেন। ওর আর আমার মধ্যে সব কথাবার্তারই আলোচনা হয়।'

—'আমার বন্ধু নিখিলেশ সেনকে আপনি বাঁচান ইন্সপেক্টারবাবু। ওর কোনো দোষ নেই। তরঙ্গকে ও খুন করেনি। তরঙ্গকে কেন? ওর মত ছেলের পক্ষে কোনো মেয়েকেই খুন করা সম্ভব নয়।'

রাজীব সান্যাল একদৃষ্টিতে ওকে দেখছিল।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সে বলল,—'আপনি কোলিয়ারিতে কাজ করেন?'

কেমন থতমত খেয়ে ভদ্রলোক জবাব দিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কাল সমস্ত রাত্রি জেগে ডিউটি দিয়েছেন, তাই না?'

লোকটি মাথা নাড়ল।

ওকে অবাক করে দিয়ে রাজীব বলল,—'আপনার তো বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি?'

প্রায় চমকে উঠে লোকটি জবাব দিল,—'আপনি কি স্যর অন্তর্যামী?'

রাজীব সান্যাল শব্দ করে হাসল। 'অন্তর্যামী হব কেন? দু চোখ দিয়ে যা দেখছি তাই তো বললাম আপনাকে। কি শচীদুলাল, আমি যা বললাম তা ঠিক নয়?'

—'কি জানি স্যর।' খুব হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গি করে শচীদুলাল জবাব দিল, 'আমি ঠিক অত ধরতে পারি না।—'

ভদ্রলোক তর্ক-বিতর্কের ধার এড়িয়ে সরাসরি ঘোষণা করল,—'একটা কথা কিন্তু মনে হচ্ছে স্যর। আমার বন্ধু নিখিলেশ সেনকে আপনি বাঁচাতে পারবেন। বিশ্বাস করুন স্যর। তরঙ্গকে ও খুন করেনি। করতে পারে না।'

রাজীব সান্যাল হাসল। 'চা খাবেন শশাঙ্কবাবু?'

—'চা, মানে?'

—'খান না। কাল সমস্ত রাত্রি জেগে ডিউটি দিয়েছেন। মথুরাপুরে বোধহয় এগারোটা নাগাদ এসেছেন। তার আগে দিকনগরেও কম ছোটাছুটি করতে হয়নি মনে হচ্ছে।'

লোকটি বলল—'আপনি বোধহয় মুখ দেখেই সব বুঝতে পারেন স্যর।'

—'মুখ দেখে সব নয়। তবে কিছুটা বটে। আপনি যে কাগজে আমাকে নাম লিখে পাঠিয়েছেন সেটা একটা কোলিয়ারির ফর্মের টুকরো অংশ। কোল রেইজিং-এর হিসেব-নিকেশ রাখতে কোলিয়ারিতে ঐ ফর্মের দরকার হয়। সুতরাং আপনি যে কোলিয়ারিতে কাজ করেন তা মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আপনার চোখে-মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। আর খুনের ব্যাপারে আপনার বন্ধু জড়িয়ে পড়ায় আপনাকে বেশ কিছুটা ছুটোছুটি করতে হয়েছে। এবং সেই ক্লান্তির চিহ্নও আপনার মুখে লেখা—'

—'কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় বাড়ির কথাটা স্যর—।' শচীদুলাল প্রশ্ন করল।

রাজীব সান্যাল মুখখানা গম্ভীর করে কি যেন চিন্তা করল। বলল,—'এই সামান্য কথাটা তোমার মনে এল না শচী। শশাঙ্কবাবুর যে বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি তা ওঁর কথার টান শুনলেই বোঝা যায়। বলার ভঙ্গি এবং কথার টান,—তাকে কাটিয়ে ওঠা খুব কঠিন।'

ইতিমধ্যে চাকর এসে তিন কাপ চা রেখে গেল। শশাঙ্কর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে রাজীব সান্যাল বলল,—'চায়ে চুমুক দিন। আর সেই সঙ্গে আপনার কাহিনিও শুরু করুন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে আপনাকে না ছেড়ে দিলে ডেরায় পৌঁছতে বেশ রাত্তির হয়ে যাবে।'

শচীদুলালের দিকে চেয়ে কি যেন ইশারা করল রাজীব। মুহূর্তে ছোট একটা নোটবুক আর পেন্সিল হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে বসল শচীদুলাল। দরকার মত বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ সে

নোট করে যাবে।'

শশাঙ্ক ভট্‌চায চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শুরু করল।

—'দিকনগরে যে মেয়েটি খুন হয়েছে তার নাম তরঙ্গ। পুরো নাম তরঙ্গমালা মজুমদার। নিখিলেশ ওকে তরঙ্গ বলে ডাকত। নিজেদের মধ্যে আমরা ওর নাম ধরে আলোচনা করেছি। সেজন্যেই কথা বলতে গেলে তরঙ্গ নামটাই মুখে এসে যায়। না হলে তো মিস মজুমদার বা অন্য কিছু বলে ওকে চিহ্নিত করতাম।'

—'নিখিলেশবাবু আপনার কতদিনের বন্ধু?'

—'তিন বৎসরের মত ওর সঙ্গে আমার আলাপ। ও মাইনিং সারভেয়ার আর আমি ওভারম্যান। দুজনেরই ইচ্ছে পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে অন্তত সেকেন্ড ক্লাশ ম্যানেজারশিপটা পাশ করি। কোলিয়ারিতে ঐ একটাই চাকরি স্যর। সুন্দর বাংলো বাড়ি, বয়, বাবুর্চি, খানসামা। কোম্পানির গাড়ি হুকুম তামিল করতে সর্বদাই মোতায়েন। আর কোম্পানি আপনার ঐ একটি লোককেই চেনে।...' একটু ঢোক গিলে শশাঙ্ক বলল,—'আমরা দুজনেই ব্যাচেলার স্যর। এক বাড়িতেই দুজনে মেস মতন করে থাকি। একটা চাকর আছে। রান্নাবান্না ঘরদোর সব তারই হাতে।'

—'নিখিলেশবাবুর বাড়ি কোথায়?'

—'কোলকাতায় স্যর। তবে সে ঠিক বাড়ি নয়।'

কোলকাতায় ওর এক পিসতুতো দাদা থাকে। মাঝে-মধ্যে ও সেখানেই গিয়ে ওঠে। দু দশ দিন ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে আসে। ওর আপন দাদা থাকেন বোম্বাইয়ে।

—'অন্য ভাই কিংবা বোনটোন নেই আপনার বন্ধুর?' —রাজীব সান্যাল প্রশ্ন রাখল।

'আজ্ঞে না। নিখিলেশও সংসারে বলতে গেলে একাই! মা-বাপ মারা গেছেন বহুদিন আগে। নিজের দাদা বেশ কিছুদিন বোম্বাইবাসী। বছর তিন আগে একবার নাকি কলকাতায় এসেছিলেন ভদ্রলোক। আর কোথায় বা আসবেন? দেশ-ঘর সবই তো পাকিস্তানে—'

'কিন্তু আপনার বন্ধুর সঙ্গে তরঙ্গমালা মজুমদারের খুন হবার সম্পর্ক কোথায়? সে খুন করেছে বা খুনের সঙ্গে জড়িত, এমন কথা মনে করবার কারণ কী?'

—'বলছি স্যর। শশাঙ্ক ঢোক গিলে শুকনো জিভটা সচল করে নিতে চাইল। একটু থেমে শুরু করল শশাঙ্ক। সবটা হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলে উঠতে পারছি না স্যর, কিন্তু যা জানি সবই খুলে বলব আপনাকে। কিছু গোপন করব না।'

—'নিশ্চয়। এইবার ঠিক কথা বলেছেন।' রাজীব সান্যাল সমর্থন জানাবার ভঙ্গিতে ঘোষণা করল। —'বোঝেন তো সব। ভালো সার্জেনের কাছে এসে যদি শরীরের ব্যথার কথাটা ঠিক মত না বলেন তাহলে কোন অঙ্গটা কেটে বাদ দিতে হবে তা কেমন করে ঠিক করবে সার্জেন?'

শশাঙ্ক শুরু করল—'তরঙ্গ দিকনগর পেপার মিলের টেলিফোন অপারেটর। দিকনগর পেপার মিলে কখনও গিয়েছেন স্যর?'

—'গিয়েছি দু-একবার। বেশ বড় পেপার মিল তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তরঙ্গ নয়, মিলের অফিসে অন্তত আট-দশটি মেয়ে কাজ করে। তরঙ্গ আর দু-তিনজন টেলিফোন অপারেটর। বাকিরা কেরাণি, অফিসের টাইপিস্ট। একজন বোধহয় ম্যানেজারের স্টেনো।'

—'হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনি কিন্তু নিজের কোলিয়ারির নাম-ঠিকানা এখনও বলেননি। অবশ্য আমি কিছুটা আন্দাজ করেছি। সম্ভবত আপনারা দুজনেই ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারিতে কাজ করেন?'

—'আশ্চর্য! আপনি স্যর অন্তর্যামী না হলেও নিশ্চয় হাত গুনতে জানেন। আমার ঐ স্লিপ

কাগজটার পিছনে কি সুদামডি কোলিয়ারির ঠিকানা লেখা ছিল?'

রাজীব সান্যাল মাথা নাড়ল,—'এটা বলেছি কিছুটা আন্দাজ করে এবং খানিকটা বুদ্ধি খাটিয়ে।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিভেজা আকাশ এবং গাছগাছালি লক্ষ্য করল। প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল রাজীব—'দিকনগর পেপার মিল থেকে মাইল দেড় দুই দূরেই তো ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারি। অন্য কোলিয়ারিগুলো চার থেকে ছ মাইল দূরে। আবার তরঙ্গমালার মৃত্যুর সঙ্গে আপনার বন্ধু নিখিলেশ সেনকে জড়িত করা হয়েছে। কাজেই সবচেয়ে নিকটের কোনো কোলিয়ারিই আপনাদের কর্মস্থল হওয়া সম্ভব।...'

শচীদুলাল বলল—দিকনগর কি আজই যাবেন স্যর?

রাজীব হাসল। —'সে কথা তোমাকে পরে বলছি। আগে শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে আলোচনাটা সেরে নিই। বলুন শশাঙ্কবাবু।' রাজীব উৎসাহ দিল।

—'তরঙ্গর সঙ্গে নিখিলেশের আলাপ বছরখানেক আগে। কি একটা ছুটির পর কোলকাতা থেকে দুজনেই ফিরছিলাম। মথুরাপুর স্টেশনে নেমে দেখে বাস ড্রাইভাররা ধর্মঘট করে বসে আছে। সুতরাং বাস চলাচল বন্ধ, অনেক চেষ্টা করে একটা ট্যাক্সি জোগাড় করল নিখিলেশ। মথুরাপুর স্টেশনে কটাই বা ট্যাক্সি। অথচ বাস নেই বলে দূরের যাত্রীদের সকলেরই ট্যাক্সি ভরসা। নিখিলেশ আমাকে বলেছিল স্যর, ট্রেনের কামরায় দুটো বেঞ্চে প্রায় মুখোমুখি বসেছিল ওরা। অবশ্য তখন কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু নিখিলেশ যেন প্রথম দর্শনেই তরঙ্গের প্রেমে পড়ে গেল। ট্রেনে বসে তরঙ্গ তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। হাওয়ায় নাকি ওর চুলগুলো মাঝে মাঝে উড়ছিল। ভারি উদাস আর শান্ত দেখাচ্ছিল তরঙ্গকে। সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে নিখিলেশ অনেকবার আমাকে তরঙ্গের গল্প করেছে। তখনই বুঝেছি স্যর যে নিখিলেশ মরেছে!...'

হেসে ফেলল রাজীব সান্যাল। —'আপনি বেশ গুছিয়ে বলতে পারেন কিন্তু শশাঙ্কবাবু। প্রেমের গল্প-টল্প লেখেন নাকি?'

—'ইয়ে মানে কিছু কিছু লিখি স্যর। মথুরাপুর দর্শনে আমার গল্প মাঝে মাঝে—। আপনি পড়েছেন নাকি?'

—না, এখনও পড়িনি, তবে এবার ঠিক পড়ে দেখব।

রাজীব ওকে আশ্বস্ত করল।

শশাঙ্ক বলল, —'আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে তরঙ্গের কথা অনেকবার আলোচনা হয়েছে স্যর। সকলে না জানলেও আমি ঠিক জানতাম যে, নিখিলেশের সঙ্গে তরঙ্গের বিয়ে হবে। পাত্র-পাত্রী দুজনেই যখন রাজি, আর বাধা দেবার মত অভিভাবক কারো নেই।'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাজীব বলল,—'সুতরাং সাগর আর নদীর মিলনে শুভক্ষণের অপেক্ষামাত্র। তাই না?'

—'ঠিক বলেছেন স্যর।' —শশাঙ্ক ভটচায্ মাথা হেলাল।

—আচ্ছা তরঙ্গমালার সঙ্গে আপনার পরিচয় এবং কথাবার্তা ছিল তো?

—নিশ্চয় স্যর। নিখিলেশ আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছে ওর সঙ্গে। দু-তিনবার তরঙ্গ আমাদের ব্যাচেলর'স কোয়ার্টারেও এসেছে। একবার মথুরাপুরে তিনজনে সিনেমা দেখতে গিয়েছি।

—'আপনার গল্প-টল্প কাগজে বেরুলে ওকে পড়তে দিতেন নিশ্চয়?—' রাজীব সান্যাল মুচকি হাসল।

খুব ভয়ে ভয়ে জবাব দিল শশাঙ্ক, 'দিয়েছি স্যর।'

হঠাৎ গম্ভীর দেখাল রাজীবকে। কী যেন চিন্তা করছে রাজীব সান্যাল। শচীদুলাল জানে, মাঝে মাঝে এমনি গম্ভীর হয়ে যান সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর। তখন কথা বলতে নেই। কথা বললেই

ধমক খেতে হবে।

—তরঙ্গমালা কখন খুন হয়েছে জানেন শশাঙ্কবাবু?

—'জানি মানে, শুনেছি স্যর।' শশাঙ্ক ভট্চাযকে নার্ভাস দেখাল। —'নাইট শিফটে ডিউটি ছিল ওর। ওদের লেডিজ মেস থেকে ঠিক সময়েই নাকি বেরিয়েছিল তরঙ্গ, কিন্তু অফিসে এসে হাজিরা দেয়নি।'

—'অর্থাৎ রাত দশটার সময় এসে ডিউটিতে যোগ দেবার কথা ওর। কিন্তু তরঙ্গমালা অফিসে এসে রিপোর্ট করেনি। কোনোদিন করবে না, এই তো?' ...কী যেন এক মুহূর্ত চিন্তা করল রাজীব। ভ্রূ কুঁচকে পুনরায় প্রশ্ন করল—'ডেড বডি কোথায় পাওয়া গেছে?'

ক্ষীণকণ্ঠে শশাঙ্ক জবাব দিল, -'পেপার মিলে ঢুকবার একটু আগেই একটা মোড় আছে জানেন তো?'—শশাঙ্ক থামল।

—যেখান থেকে ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারিতে যাবার পথটা বেঁকে গিয়েছে? একটা ঝাঁকড়া মতন বটগাছ আছে, না?

—হ্যাঁ, স্যর। রাস্তা থেকে হাত ত্রিশেক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে তরঙ্গকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

—আপনি ওর মৃতদেহ দেখেছেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শশাঙ্ক। তারপর হঠাৎ ফস করে সে বলে ফেলল,—'না স্যর। আমি যাইনি দেখতে।'

—নিখিলেশবাবুকে এই খুনের সংবাদ কে দিল?

—পুলিশ স্যর। এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করেছে।

—কটার সময়? পুলিশের চার্জ কী জানেন?

—নিখিলেশ তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমেছে। পুলিশ ওর খোঁজ করছে জেনে ম্যানেজার ওকে ডেকে পাঠালেন। নিখিলেশ অফিসঘরে এলে পুলিশ বলল, এই খুনের অপরাধে নিখিলেশকে তারা অ্যারেস্ট করছে। তখন বেলা নটা হবে।

—প্রমাণ? কী তথ্য আছে পুলিশের হাতে?

শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বলল, —'প্রমাণ পেয়েছে স্যর। তরঙ্গের জামার মধ্যে নিখিলেশের লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেছে।'

—'চিঠিতে কী লিখেছিল আপনার বন্ধু?' —তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রাজীব সান্যাল।

—'নিখিলেশ ওর সঙ্গে রাত দশটার সময় রাস্তার মোড়ে দেখা করবে জানিয়েছিল। কী নাকি কথা ছিল নিখিলেশের। বোধহয় পেপার মিলের গেট পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দেবার সময় নিখিলেশ কথা-টথা বলবে মনে করেছিল।'

—'এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন? তরঙ্গমালার সঙ্গে নিখিলেশ দেখা করবে কি না কিছু বলেছিল আপনাকে?'

শশাঙ্ক ভট্চায মাথা নাড়ল। এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথার সে কিছু জানে না।

—পুলিশের অভিযোগের বিরুদ্ধে নিখিলেশবাবুর কী বক্তব্য?

—সেটাই দুর্ভাবনার স্যর। নিখিলেশ কোনো কথাই বলছে না। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সে নারাজ। তরঙ্গ খুন হয়েছে শোনবার পরই সে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে। এমন কি আমার সঙ্গে পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজীব সান্যাল। ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল,—'আপনার বক্তব্য শুনলাম শশাঙ্কবাবু। বিকেল প্রায় পাঁচটা হল। সাড়ে পাঁচটার বাসটা না ধরতে পারলে

কোলিয়ারি পৌঁছতে আপনার রাত দশটা হবে।'

—নিখিলেশকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবেন স্যর। শশাঙ্ক ভট্চায হাতজোড় করল।

—ইনভেস্টিগেশনের ভার পড়েছে আমার উপর। আপনার বন্ধু যদি সত্যিই নির্দোষ হন, তাহলে পুলিশ কখনই তার বিরুদ্ধে চার্জসিট দাখিল করবে না।

—দিকনগরের দারোগাবাবু কিন্তু নিখিলেশকেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন। একরকম বলেই ফেলেছেন তিনি, খুনি নিখিলেশ ছাড়া আর কেউ নয়।

কোনো উত্তর না দিয়ে হাসল রাজীব সান্যাল। হাত তুলে নমস্কার জানাল শশাঙ্ককে। বলল, —'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে শশাঙ্কবাবু। আমার সব প্রশ্ন কিন্তু এখনও করা হয়নি।'

শশাঙ্ক ভট্চায ঢোক গিলে বলল, 'আমি প্রস্তুত স্যর, আপনি ডেকে পাঠালেই আসব।'

—'ঠিক আছে।' কথার শেষে রাজীব সান্যাল বিচিত্র হাসল।

শশাঙ্ক চলে গেলে রাজীব আবার একটা সিগারেট ধরাল। শচীদুলাল নোট বইটা বন্ধ করে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। খুনের রহস্য সম্বন্ধে তার মুখ থেকে এখনই কিছু শুনতে চায় শচী। ওর ব্যগ্রতা দেখে মনে মনে হাসছিল রাজীব। শচীদুলালের ধৈর্য বড় কম। অথচ ধৈর্য না থাকলে খুনের রহস্যের কি সন্ধান মেলে? এ যেন সেই জলে চারকাঠি পুঁতে ছিপ ফেলে বসে থাকা। কত মাছ আসবে, যাবে। ছোট বড়—পুঁটি, মৃগেল, রুই। কিন্তু আসল মাছের চেহারাটা ঠিক আন্দাজ করা চাই। পাঁকের মধ্যের বুদবুদ জল ঠেলে ওপরে আসবে। চারকাঠিতে ঠোক্কর দিতেই ফাৎনা উঠবে নড়ে। আর সেই মুহূর্তেই ঘ্যাঁচটান—। পাকা মেছেল হলে তার হাত থেকে নিস্তার নেই মাছের।

শচীদুলাল মুখ খুলল। এর বেশি ধৈর্য ওর কাছ থেকে আশা করা অসম্ভব। শশাঙ্ক যাবার পর পুরো তিন মিনিট কেটে গেছে। শচীদুলাল বলল, 'কিছু ভাবছেন স্যর?'

—একটা খোঁজ নিতে পার শচী? তরঙ্গমালার ডেড বডিটা অটোপসি করার জন্য এসেছে কি না?

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলে কি নিয়ে আসব স্যর?

—'নিশ্চয়। তবে এত তাড়াতাড়ি রিপোর্ট পাবে না। পেতে হলে তোমাকে রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' রাজীব সান্যাল সিগারেটটা নামিয়ে রেখে বলল, —'তরঙ্গমালার খুন হবার সময়টা জানা আমার প্রথম দরকার।'

শচীদুলাল প্রশ্ন করল, —'পোস্টমর্টেমে কি এটা ঠিক জানা সম্ভব?'

—সঠিক না হলেও কিছুটা ঠিক তো হবেই। মানুষ মরবার পর তার দেহের তাপ কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সঙ্গে সমান হয়ে আসে। প্রথম তিন ঘন্টায় ঘন্টা পিছু চার ডিগ্রি করে দেহের তাপ কমে এবং তারপর প্রতি ঘন্টায় এক ডিগ্রি করে। সুতরাং এর থেকে কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। মৃত্যুর ঘন্টা সাত পরে নিচের তলপেটে একটা সবুজ রঙের ছোপ প্রথম দেখা দেয়। এবং ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেহে। ঠিক এই সময়ে চোখের গোলক দুটি নরম হয়ে আসে এবং বাকি অংশটা দুধের মত সাদা দেখাবে। আর সবচেয়ে মোক্ষম কথা হল রাইগার মর্টিস। তুমি এটা জানো তো?

শচীদুলাল মাথা নাড়ল। রাইগার মর্টিস কথাটা সে আদপেই শোনেনি।

রাজীব সান্যাল বলল, —'মৃতের শরীরে যদি রাইগার মর্টিস না শুরু হয়ে থাকে তবে ধরে নিতে হবে ঘন্টা দুই-এর মধ্যে মানুষটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু রাইগার মর্টিস অর্থাৎ দেহ যদি কাঠের মত শক্ত হয়ে ওঠে, তাহলে ধরতে হবে মৃত্যুর পর তিন ঘন্টা থেকে কুড়ি ঘন্টা সময় কেটে গেছে।'

শচীদুলালের দিকে চেয়ে হাসল রাজীব সান্যাল। বলল, 'শব-ব্যবচ্ছেদ যিনি করবেন তাঁকে আরো অনেক কিছু দেখতে হবে শচী। সব কথা জানবার তোমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি বেরিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি। দেরি করো না।

শচীদুলাল চলে গেলে রাজীব সান্যাল কতক্ষণ বসে রইল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের হাসি চোখে পড়ে। সেই জলে ভেজা কাকটা পাখা মেলে কখন উড়ে গেছে। গাঢ় নীল আকাশ আর শান্ত স্নিগ্ধ পৃথিবীকে দেখলে কে বলবে এখানে তরঙ্গমালার মত মেয়েরা খুন হয়। চঞ্চল তরঙ্গরা হঠাৎ স্থির হয়ে যায়।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল শচীদুলাল। সম্ভবত সে কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছে।

—'কী ব্যাপার?' রাজীব ওকে শান্ত করতে চাইল।

—ডেড-বডি এসে গেছে স্যর। আপনি কি দেখবেন? দিকনগর থানার ও-সি নিজে এসেছেন।

রাজীব সান্যাল জামা-কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়ল। তরঙ্গমালার মৃতদেহটা তার দেখা দরকার। 'আনফরচুনেট্ গার্ল। পুওর তরঙ্গ।' নিজের মনে বিড়বিড় করে কী বলল রাজীব।

যেতে যেতে শচীদুলাল বলল, —'ডাক্তার সন্দেহ করছেন তরঙ্গমালার উপর অত্যাচার করা হয়েছে। মানে জোর করে—।'

কোনো উত্তর দিল না রাজীব সান্যাল। তার মুখে একটা দুর্জ্ঞেয় হাসির রেখা ফুটে উঠল।

দুই

মর্গের কাছে যখন পৌঁছল রাজীব, তখন সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘন হতে শুরু হয়েছে। আর একটু পরেই মহকুমা শহরটা অন্ধকারের পুরু একটা চাদরের আড়ালে গুটিসুটি হয়ে বসবে। কিছুদিন আগে শহরে বৈদ্যুতিক আলো এসেছে বলেই বাঁচোয়া। নইলে সন্ধের পরই যেন দুপুর রাত। এখানে-সেখানে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো প্রাগৈতিহাসিক মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের ছিটেফোঁটা দূর করতেও হিমশিম খেয়ে যায়।

লাশঘরটা শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে। সাইকেল রিকশ থেকে নামল রাজীব। শচীদুলাল পিছু পিছু চলেছে। ওকে আসতে দেখে দিকনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সুব্রত সরকার প্রায় ছুটে এল।

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'কি সুব্রত, হত্যাকাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ তো? এবার ঠ্যালা সামলাও—'

সুব্রত সরকারকে উদ্বিগ্ন দেখাল। সামনে কপালের উপর ঝুঁকে-পড়া চুলগুলি পিছনে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'আমি কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এসেছি রাজীবদা। হত্যাকাণ্ডই বলুন আর লঙ্কাকাণ্ডই বলুন, সব দায়িত্ব কিন্তু এখন আপনার। ইনভেস্টিগেশন শুরু করবেন আপনি। আমি এখন অন্তরালে।'

সুব্রতর বয়স বেশি নয়। সাতাশ-আঠাশ কিংবা বড় জোর ত্রিশ হতে পারে। কাজেকর্মে উৎসাহী ছোকরা। রাজীব জানে দিকনগরে প্রথম এসে ও ভারি মুষড়ে পড়েছিল। মথুরাপুরে যেদিন রাজীবের সঙ্গে প্রথম আলাপ, সেদিন সখেদে বলেছিল সুব্রত, 'কী জায়গায় এসে পড়লাম বলুন তো? এদিকে সেদিকে, যেদিকেই তাকাই শুধু কোলিয়ারির চানখ, আর ধু ধু মাঠ।'

রাজীব ওকে বলেছিল, 'ঘাবড়াও মাত্। জায়গাটা তেপান্তর হলেও থানাটা বড়। এত অল্পবয়সে

এসব থানার চার্জ সাধারণত কেউ পায় না। এখানে সুনাম রাখতে পারলেই শহর অঞ্চলে বদলি হয়ে যাবে। সুতরাং ক্যারি অন মাই ফ্রেন্ড।'

তারপরেও আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে সুব্রতর সঙ্গে। ইদানীং তাকে বেশ চনমনে আর তাজা মনে হয়েছিল রাজীবের। সম্ভবত দিকনগরে গিয়ে প্রথমে যে দিকহারা এবং অস্থির ভাব পেয়ে বসেছিল সুব্রতকে, তা এখন বেমালুম নিখোঁজ। সুব্রত সরকার মন মানিয়ে ফেলেছে।

আজ কিন্তু বেশ বিমর্ষ এবং কিঞ্চিৎ চিন্তিত দেখাল সুব্রতকে। মনে মনে রাজীব হাসল। পোড় খাওয়া দারোগা হতে সুব্রতর এখনও ঢের দেরি। একটা মার্ডার কেস হাতে পড়তেই সুব্রত সরকার যেন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ফিস ফিস করে সুব্রত বলল, 'ডেড-বডি কি এখনই দেখবেন রাজীবদা? আপনার জন্যেই চেরাফালা এখনও শুরু করেনি।'

রাজীব সান্যাল ঠোঁটে একটা সিগারেট নিল। সুব্রতকে একটা দিয়ে বলল, 'কিঞ্চিৎ ধূমপান করো হে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে নিই। তারপর মর্গে ঢুকব।'

লাইটার টিপে আলো জ্বালাল রাজীব। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, 'গতকাল কৃষ্ণা-চতুর্দশী ছিল, তাই না সুব্রত?'

'কি জানি রাজীবদা।' তিথিনক্ষত্র কোনোকালে খোঁজ করিনি। তবে অন্ধকার দেখে মনে হচ্ছে আজ বোধহয় অমাবস্যা।'

'ভরা অমাবস্যা। রাজীব সান্যাল ঘোষণা করল। 'কি ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখেছ? মর্গের এদিকটায় কারা যেন ভূত দেখেছিল না শচীদুলাল?'

শচীদুলাল ঘাড় নাড়ল। বলল,—'হ্যাঁ স্যর। আমাদের রামশরণ ওঝা নিজে চোখে দেখেছিল।'

'কী দেখেছিল বললে না? ধবধবে সাদা কাপড় আর খড়ম পায়ে কোনো ব্রহ্মদত্যি, না মিশমিশে কালো রং আর ঝাঁকড়া চুলের মামদো ভূত?' রাজীব সান্যাল রহস্য করে হাসল।

ইতিমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। মর্গের পিছনে খানিকটা পোড়ো জমি। এদিকে-সেদিকে গাছগাছালি, ঝোপঝাপ। পশ্চিম দিকে হাত কুড়ি গেলেই প্রকাণ্ড একটা নিমগাছ। জোনাকির দল অন্ধকার রাতে গাছটার চারপাশে নানা জ্যামিতিক নকশার কাজ গড়ছে আবার ভাঙছে।

সুব্রত বলল, 'একটা কথা বলছি রাজীবদা। খুনিকে বোধহয় আমি ধরে ফেলেছি। হি ইজ নাউ আন্ডার অ্যারেস্ট। লক-আপে রেখেছি ছোকরাকে।'

'সত্যি?' রাজীব সান্যাল বিস্ময় প্রকাশ করল। 'তাহলে আমার কাজ তো তুমি করেই রেখেছ সুব্রত। অপিসের বড়-সাহেবের মত এবার একটা দস্তখৎ দিলেই হয়। কিন্তু, তুমি কি খুব সিওর?'

'সিওর মানে? দস্তুরমত প্রমাণ আছে রাজীবদা। মেয়েটার জামার মধ্যে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। ওর এক লাভার মানে প্রেমিকের লেখা। রাত দশটায় ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারিতে যাবার রাস্তার মোড়ে ছোঁড়াটা ওর সঙ্গে দেখা করবে লিখেছিল। কি মজা দেখুন। দেখা-সাক্ষাৎ করবার আর সময় পেল না। রাত দশটায় রাস্তার মোড়ে যুবতী মেয়েটার সঙ্গে সে দেখা করবে। এবং সেখান থেকেই খানিকটা দূরে মেয়েটার ডেড-বডি পাওয়া গেল পরদিন সকালে। এর পরও কি বলবেন কুকাজটা অন্য কারো?...'

'তা বলছি না সুব্রত। কিন্তু মার্ডারের পিছনে একটা মোটিভ থাকা চাই। কোনো কারণ নেই অথচ একজন আর একজনকে হত্যা করল। এমন তো হতে পারে না, বা সচরাচর হয় না।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল।

'মোটিভ নেই কেন বলছেন?' সুব্রত প্রতিবাদ করল। 'এমন কি অসম্ভব রাজীবদা যে, ইদানীং ওদের সম্পর্কটা যথেষ্ট ভালো ছিল না? মনে করুন না কেন, মেয়েটা ওকে ঠিক আর সহ্য করতে

পারছিল না। অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এবং সে কারণেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে—'

রাজীব সান্যাল হাসল। 'তুমি যদি ওকে বাতিল প্রেমিক বলে প্রমাণ করতে পার, তাহলে অবশ্য খানিকটা মোটিভ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহলেও—' রাজীব সান্যাল হঠাৎ যেন কী ভাবতে শুরু করল।

মর্গের বারান্দায় পাঁচ ছ' জন লোক প্রায় ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে বসে রয়েছে। সম্ভবত দিকনগর পেপার মিলেই কাজ করে ওরা। কিংবা মৃতা তরঙ্গমালার আত্মীয়স্বজন। ডেড-বডি ফেরত পেলে ওরা দাহ করবার ব্যবস্থা করবে, পোস্টমর্টেম চুকে গেলেই হয়। এবং সম্ভবত সেজন্যই অপেক্ষা করছে।

রাজীব সান্যাল বলল, 'তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব সুব্রত। চল ডেড-বডিটা একবার দেখে আসি। বেশি দেরি করলে হরেন ডাক্তার আবার আমাদের মুণ্ডুপাত করবে।'

ঘরে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল রাজীব সান্যাল। নিহত তরঙ্গমালা মজুমদারের দেহটা এককোণে পড়ে রয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলাতেও কিংবা এমন সময় এই দেহে কত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আজ সব শেষ। স্থির, নিস্পন্দ দেহ। কোনো তরঙ্গের সৃষ্টি হবে না।

'আর একটা কথা বলছিলাম রাজীবদা', সুব্রত সরকার ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল। 'ডেড-বডির গায়ের অলংকার-টলংকার সব ঠিক ছিল। যারা শনাক্ত করেছে ওকে, তারা বলেছে এর বেশি গয়নাগাঁটি তরঙ্গমালা মজুমদার কোনদিন পরে-টরে নি।'

রাজীব মৃদু হাসল। 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ এটা মার্ডার ফর গেইনস নয়। মেয়েটাকে মেরে ওর গয়নাগাঁটিগুলো কেড়ে নেবার কোন উদ্দেশ্য খুনীর ছিল না।'

'ঠিক তাই।' সুব্রত সরকার যোগ করল।

তরঙ্গমালার দেহের দিকে চেয়ে কী যেন লক্ষ্য করল রাজীব। বলল, 'কামিনী আর কাঞ্চন দুটো আলাদা কথা, তাই না সুব্রত? আমাদের খুনির কামিনীর দিকে নজর থাকলেও কাঞ্চনে কোন আসক্তি ছিল না, কী বল?'

সুব্রত কিছু বলবার আগেই হরেন ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকল। রাজীব সান্যালের দিকে চেয়ে বলল হরেন, 'ডেড-বডি দেখেছেন নাকি?'

'কোথায় দেখলাম? এই তো সবে ঘরে পা দিয়েছি। তাছাড়া আপনার সহযোগিতা ব্যতীত—!' রাজীব সান্যাল একটু তোয়াজ করবার ভঙ্গিতে হাসল।

হরেন ডাক্তারের নির্দেশে লাশ-ঘরের ডোম মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিল। গলার কাছে নজর পড়তেই শিউরে উঠল রাজীব সান্যাল। ঘাড়ের কাছে এবং গলার নীচে কালসিটে পড়ার মত দুটো আঙুলের দাগ। সম্ভবত একটা রুমাল-টুমাল কিংবা টুকরো কাপড় হাতে জড়িয়ে তরঙ্গমালা গলা টিপে ধরা হয়েছিল। সেই কারণেই আঙুলের আকারে দাগ তেমন স্পষ্ট হতে পারেনি।

রাজীব গম্ভীর হয়ে বলল, 'স্ট্র্যাংগুলেশন কেস বলে মনে হচ্ছে। গলার কাছে নখের একটা আঁচড়ের মত কী যেন ওটা?'

হরেন ডাক্তার জবাব দিল, 'ওটা অ্যাব্রেসন, সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর। মার্কস অফ অ্যাব্রেসন। থ্রটলিং অর্থাৎ গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে কাউকে মারা হলে গলায় বা ঘাড়ের কাছে এমনি দাগ দেখতে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

কি ভেবে রাজীব বলল, 'শুধু স্ট্র্যাংগুলেশন? গলাটিপে মেয়েটাকে মারা হয়েছে? আর কিছু—'

গতকাল রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। তরঙ্গের জামাকাপড় জলে কাদায় একাকার। কিন্তু কাপড়ের দিকে চেয়ে যেন সন্দেহ হল রাজীবের। হরেন ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাতেই ডাক্তার হাসল। রহস্যময় হাসি।

ডাক্তার বলল,—'স্ট্র্যাংগুলেশনটা নিঃসন্দেহে পরের ব্যাপার। দেহের অনেক স্থানেই দাগ আর আঁচড়। স্ক্র্যাচ্ ব্রুইস এবং অ্যাব্রেসন কোনোটাই বাদ নেই। অটোপসি হয়ে যাক। একটু ধৈর্য ধরুন না ইন্সপেক্টর।'

সুব্রতর সঙ্গে এসে দাঁড়াল রাজীব। লাশঘরের লালবাড়িটা থেকে নেমে মাঠে এসে পা দিল। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত আকাশের চাঁদোয়া। মেঘ-টেঘ সব কোন নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে। ফুলঝুরির রোশনাইয়ের মত তারাগুলি আকাশের বুকে লেগে আছে। কাছেই নিমগাছটির চারপাশে জোনাকীর দল কেমন ঝিলমিল পরিবেশ রচনা করেছে। কঠিন জ্যামিতিক নানা চিত্র। তৈরি হচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজীব সান্যাল বলল 'সুব্রত, তোমার সঙ্গে বাকি কথাগুলো সেরে নিই। কোন্ বাসে দিকনগর ফিরবে ঠিক করেছ?'

—'বাস হোক, ট্রাক হোক—কিছু একটা পেয়ে যাব। লাস্ট বাসটা রাত আটটায়।'

'দিকনগর পৌঁছবে কখন?'

'ঘন্টাখানেকের বেশি সময় নেয় না। রাত্রিবেলায় পথ ঘাট ফাঁকা। বাস তো ঝড়ের মত ছোটে। আর সেই পাঞ্জাবি ড্রাইভার থাকলে তো রক্ষা নেই। ভয় শুধু বোঝাই ট্রাকগুলোকে।' সুব্রত থামল।

'কাল সকালেই দিকনগর যাচ্ছি, সাড়ে ছটা নাগাদ পৌঁছে যাব। তুমি কিন্তু রেডি থেকো। হাতে অনেক কাজ আমাদের।'

'অত ভোরে বাস কই আপনার?'

'বাস নয়। সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জিপটা চেয়ে নেব। অত ভোরে না গেলে তো কাজ হবে না সুব্রত।'

রাজীব সান্যাল সিগারেটে একটা টান দিল। ধোঁয়া বেরিয়ে এল মুখ থেকে। নাসারন্ধ্র দিয়েও নির্গত হল কিছু ধূম। রাজীব বলল, 'প্লেস অফ অকারেন্সে তুমি তেমন কিছু ক্লু পেয়েছ সুব্রত? পায়ের দাগ-টাগ লক্ষ্য করেছিলে? কজন লোক ছিল বলে কিছু আন্দাজ হয়েছে তোমার?'

সুব্রত হতাশ ভঙ্গি করল। 'কাল রাত-দুপুর থেকে কি বৃষ্টি ভাবতে পারেন। এদিকে কি তেমন বৃষ্টি হয়নি নাকি? জলের তোড়ে পায়ের দাগ-টাগ সব ধুয়ে-মুছে একাকার। আপনি কাল গেলেই দেখতে পাবেন অবস্থাটা।'

রাজীব সান্যাল আন্দাজ করেছিল। স্বয়ং বিধাতা যেন খুনির সহায়। খুনের ঘন্টা দেড় দুই পরেই তাহলে বৃষ্টি নেমেছিল? এবং সে বৃষ্টি ভোর হবার পরেও ক্ষান্ত হয়নি। সুতরাং পায়ের দাগ-টাগ, ধস্তাধস্তির চিহ্ন-টিহ্ন সব লোপাট।

—এফ আই আর থানায় এসে কে করেছিল?

—দিকনগর পেপার মিলের একজন কেরাণি।

—মৃতদেহ কি সেই প্রথম আবিষ্কার করে?

সুব্রত সরকার মাথা নাড়ল। 'মৃতদেহটা প্রথম দেখে একটা বিলাসপুরী কুলি। ঝোপের মধ্যে ডেড-বডি আবিষ্কার করে সে প্রায় চীৎকার শুরু করে দেয়।'

—ওখানে সে কেমন করে গেল?

—সকাল বেলায় প্রাতঃকৃত্য সেরে নেবার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল বলেছে।

—তারপর?

—ওর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে ছুটে আসে। পরে দিকনগর পেপার মিলের সেই কেরানি ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে নিয়ে থানায় খবর দেন।

হরেন ডাক্তারকে মর্গের বারান্দায় দেখা গেল। সম্ভবত রাজীব সান্যালের সঙ্গে কিছু কথা

বলবে ডাক্তার। অন্ধকারে ডাক্তারের সাদা প্যান্ট-জামা আর মুখের সিগারেটের জ্বলন্ত অগ্নিবিন্দুটুকু ছাড়া প্রায় সবই অদৃশ্য।

এগিয়ে গিয়ে সুব্রত বলল, 'পোস্টমর্টেম হয়ে গেল আপনার?'

'আর একটু দেরি আছে। কাটা-ফালা ডোমটা সেরে দিক। এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই।' মাঠের উপর নেমে এল ডাক্তার। মর্গের মধ্যে মৃত তরঙ্গমালার দেহে ডোম এখন ছুরি টানছে।

রাজীব সান্যাল গলা নামিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে কিছু বলবেন আপনি।'

'ধরেছেন ঠিকই। ভাবলাম আপনাকে আর কষ্ট দেব না। দু-একটা খবর দিলেই এখনকার মত শান্ত হবেন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টটা না হয় পরে দেখবেন।' হরেন ডাক্তার আয়েস করে ধূমপান করছিল।

রাজীব বলল, 'বেশ তো। কী শোনাবেন বলে ফেলুন চটপট। সি-আই-ডিদের চোখ আর কান সবসময় খোলা আছে।

'তাই নাকি?' হরেন ডাক্তার হাসল। একটু থেমে ডাক্তার মুখ খুলল, 'বডি থেকে রাইগার মর্টিস চলে যেতে শুরু হয়েছে। চোখের ঢাকনা, চোয়াল এবং মুখের পেশীগুলো আগেই নরম দেখেছি। এখন ঘাড় আর পিছন দিকটাও নরম মনে হচ্ছে। কাজেই রাইগার মর্টিস ইজ ডিসঅ্যাপিয়ারিং—'

রাজীব সান্যাল বলল, 'এখন ঘড়িতে কটা শচী?'

'সাড়ে ছটার বেশি স্যর।' শচীদুলাল জবাব দিল।

হরেন ডাক্তারের দিকে তাকাল রাজীব। বলল, 'সুতরাং ধরে নিতে পারি যে দশটা সাড়ে দশটার সময় তরঙ্গমালা খুন হয়।'

'অনুমান সঠিক হওয়াই সম্ভব। আর ঘন্টা তিনের মধ্যেই রাইগার মর্টিস পুরোপুরি চলে যাবে। কাজেই মৃত্যুর সময় বলতে ডাক্তারকে ঐ কথাই বলতে হয়।'

রাজীব সান্যাল আরো কিছু শোনবার জন্য সাগ্রহে তাকিয়েছিল। ওর মুখের দিকে চেয়ে হরেন বলল 'আপনার সন্দেহ ঠিকই ইন্সপেক্টর। মৃত্যুর আগে মেয়েটা তার সর্বস্ব খুইয়েছে। পশুলালসার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল ওকে। সম্ভবত গলা টিপে ধরবার সময় ওর শরীরে বাধা দেবার মত কোনো শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না।'

রাজীব সান্যাল সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আনফরচুনেট গার্ল। আচ্ছা আমি চলি এখন। নমস্কার ডাক্তারবাবু। আবার দেখা হবে।'

সুব্রত ওর সঙ্গে খানিকটা পথ হাঁটল। রাজীব বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি আবার কেন মিছিমিছি আসছ সুব্রত। তোমার হাতে এখনও অনেক কাজ। ডেড-বডি রিটার্ন করতে হবে। আবার ফিরে যেতে হবে দিকনগরে।'

'কাল সকালে কিন্তু আমি আপনার জন্য থানার গেটে দাঁড়িয়ে থাকব।'

রাজীব সান্যাল হাসল। সুব্রতকে পিছনে রেখে রাজীব সান্যাল হাঁটতে শুরু করেছিল। হঠাৎ কী মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়াল রাজীব। কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি শশাঙ্ক ভটচায্ নামে কোনো লোককে চেন সুব্রত?'

—আগে চিনতাম না রাজীবদা। আজই দেখা হয়েছে লোকটার সঙ্গে। ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারিতে নিখিলেশ সেনকে অ্যারেস্ট করতে গিয়ে আলাপ হল। শশাঙ্ক ভটচায্ নিখিলেশ সেনের খুব বন্ধু রাজীবদা। যাকে বলে বুজুম ফ্রেন্ড। দুজনে নাকি হরি-হর আত্মা। একই বাড়িতে থাকে।

—নিখিলেশকে তুমি অ্যারেস্ট করবে শুনে ও কী বলল?

'আজেবাজে বক্তৃতা দিচ্ছিল। ওসব কোনো কাজের কথা নয় রাজীবদা। আমি যখন বললাম মৃতার জামার মধ্যে আমি একটা চিঠি পেয়েছি এবং সে চিঠিখানা নিখিলেশ সেনের লেখা, তখনই মিইয়ে গেল একেবারে। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে বলুন?' সুব্রতর মুখখানা আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাল।

—চিঠিখানা তোমার কাছে আছে সুব্রত?

—কাছে তো নেই রাজীবদা। কিন্তু আপনি দিকনগরে গেলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

'ঠিক আছে।' রাজীব সান্যাল বিদায় নেবার জন্য তৈরি হল। যাবার আগে নির্দেশ দিল রাজীব, 'খুনের জায়গাটা থেকে কিছু দূরে একজন ওয়াচার রেখে দিও। প্লেন ড্রেসে লোকটা শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। ওখানে কেউ আসে কি না লক্ষ্য করে তোমাকে যেন জানায়। আর—'

আর কী রাজীবদা?

—ডেড-বডির মাথার চুল কয়েকটা রেখে দিও। পরে কাজে লাগতে পারে।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রাজীব সান্যাল হতাশ বোধ করল। এখন অনেকখানি পথ হাঁটতে হবে। শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে লাশঘরটা। এদিকে সাধারণত কেউ আসে না। সাইকেল রিকশা এ পথে প্রায় দুর্লভ। দিনমানে যদি বা মেলে, রাতেভিতে ডুমুরের ফুলের মত, তা অসম্ভব প্রত্যাশা।

শচীদুলাল বলল, 'আপনি বরং দাঁড়ান স্যর। আমি একটা রিকশ-টিকশ ডেকে আনি।'

'কোথায় কতদূরে গিয়ে রিকশ পাবে। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে তোমার। তার চেয়ে চল দুজনেই হাঁটা দিই। বুদ্ধি করে যদি সাইকেলটা আনতে শচী, তাহলে বরং একটা কাজ হত।' বাজীব দুঃখ করল।

প্রায় সিকি মাইল হাঁটতে হল দু-জনকে। লাশঘরটা শহরের শেষে কেন, বরং শহরের বাইরে বললেই ভাল বোঝাবে। এতক্ষণ পরে পথে লোকজন দেখা গেল। দোকান-পাট রাস্তায় মানুষজন...বেচাকেনা. .খরিদ্দারের সঙ্গে কোথাও দরকষাকষি চলছে।

একচক্ষু লণ্ঠনের ম্লান আলো ফেলে দ্রুত কি যেন এগিয়ে আসছে। রাজীব বুঝতে পারল একটা রিকশ ছাড়া আর কিছু নয়। এখন খালি থাকলেই নিশ্চিন্ত।

সৌভাগ্য নিশ্চয়ই। কারণ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা-দুটো বিশ্রাম চাইছে। যেখানে হোক একটু পা ছড়িয়ে বসতে পারলেই হয়। হাত বাড়িয়ে রিকশটা থামাল শচীদুলাল। দুজনে উঠে বসল আসনে।

বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বসল রাজীব। একটা কাগজ নিয়ে খসখস করে কী সব লিখল। লেখা শেষ করে হঠাৎ যেন চিন্তিত দেখাল রাজীবকে। কী যেন একটা জায়গায় এসে কলমটা ঠেকে যাচ্ছে। এককোণে চেয়ারে বসে শচীদুলাল আপন মনে কাজ করছিল। আড়চোখে রাজীবকে দেখে আবার মনোযোগী হল সে। প্রশ্ন করলে ভীষণ বিরক্ত হবে রাজীব সান্যাল। মুখ চোখ দিয়ে ক্রোধ ফেটে বেরুবে। রাগের সে প্রকাশ শচী আগে দেখেছে। সুতরাং নিজের চরকায় তেল দিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মিনিট তিন-চার পরে রাজীব সান্যাল সিগারেট ধরাল। লাইটারটা এক পাশে সরিয়ে রেখে ওকে ডাকল কাছে। বলল, 'সামনে চেয়ারটা নিয়ে বসো শচী। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করি।'

কাজ-টাজগুলো গুছিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল শচীদুলাল। চেয়ার টেনে এনে রাজীব সান্যালের মুখোমুখি বসল সে।

—শশাঙ্ক ভটচায্কে কী মনে হল তোমার শচী?

—বেশ ভালো লোক স্যর। বন্ধুর বিপদের সময় গা ঢাকা দিয়ে বসে নেই। তাকে সাহায্য করবার জন্য ছুটোছুটি করছে।

—তরঙ্গর সঙ্গে শশাঙ্ক ভটচাযের আলাপ-পরিচয় ছিল। একথা সে নিজে মুখে স্বীকার করেছে। মথুরাপুর দর্পণে ওর গল্পটল্প বেরুলে তরঙ্গকে সে পড়তে দিত। সুতরাং এমন কথা ভাবতে দোষ কি যে, শশাঙ্ক মনে মনে তরঙ্গের সান্নিধ্য কামনা করত। ওকে ভালবাসত।

—কিন্তু স্যর, মেয়েটি যে ওকে পছন্দ করত এমন কোনো প্রমাণ তো এখনও—

রাজীব সান্যাল হাসল। 'তদন্তই হল না। তার প্রমাণ কোথায় পাবে? এখন তো শুধু অনুমান চলছে শচী। অবশ্য ঠিকমত বিশ্লেষণ করতে পারলে অনুমানও ঠিক হয়।'

শচীদুলাল বলল, 'আপনি কি শশাঙ্ক ভটচায্‌কে সন্দেহ করেন স্যর?

—সন্দেহ করিনি, তবে সন্দেহ করতে দোষ কী, এই কথাটা ভাবছি। তুমি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প পড়নি শচী? দুটি পুরুষ একটি মেয়ে, কিংবা দুটি মেয়ে একটি পুরুষ। ব্যর্থ প্রেমিক অনেক সময় মরিয়া হয়ে ওঠে শচী। খেপে উঠলে অবশ্য মেয়েরাও সাংঘাতিক—'

শচীদুলাল লজ্জিত ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকাল।

রাজীব বলল, 'কয়েকদিন আগে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল। একটি যুবক আর একটি মেয়ে উভয়ে প্রেমে পড়ে। বেশ কিছুদিন দুজনের ভাব-ভালবাসা চলল। তারপর কোনো কারণে মেয়েটি তার প্রেমিকের উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় যুবক প্রায় পাগল। এবং অন্তর্দাহে ক্ষিপ্ত যুবক মনে মনে এক ফন্দি আঁটল।'

বাধা দিয়ে শচী বলল—'খবরের কাগজে বেরিয়েছিল স্যর?' রাজীব সান্যাল ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'এই তো মাস-দুই আগের ব্যাপার। কলকাতার কোন পাড়ার যেন ঘটনা। আমার ঠিক মনে নেই।'

তারপর স্যর?

মেয়েটিকে কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতে বলল, যুবক। বাতিল প্রেমিকের সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা করতে দোষ কী? এই ভেবে মেয়েটি এসে দাঁড়াল সেই স্থানে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রণায় দু-হাতে মুখ ঢেকে সেখানেই বসে পড়ল সে। ছেলেটি তার প্রেমিকার সুন্দর মুখে নাইট্রিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছে।

—'এ কাহিনির সঙ্গে বিচার করলে কিন্তু নিখিলেশ সেনকেই খুনি বলে ধরে নিতে হয়।' শচীদুলাল থামল।

'সুব্রতর বক্তব্য তাই। রাজীব সান্যাল শুরু করল, 'সুব্রত বলতে চায় যে নিখিলেশের সঙ্গে তরঙ্গমালার কোনো কারণে মন কষাকষি শুরু হয়ে থাকবে। হয়তো তরঙ্গ ওকে আর সহ্য করতে পারছিল না। এমনও অসম্ভব নয় যে, তরঙ্গর মন অন্য কোথাও বাঁধা পড়েছিল। ফলে নিখিলেশের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি বা প্রেমের সম্পর্কের ইতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিখিলেশ হয়তো এই মানসিক বিচ্যুতির জন্য প্রস্তুত নয়। সুতরাং তরঙ্গের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে খেপে উঠল। এতদিন তরঙ্গের সঙ্গে প্রেমের তরঙ্গে ওঠানামা করে নিস্তরঙ্গ জীবন মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব!'

শচীদুলাল বলল, 'খুবই সম্ভব স্যর যে তারপরই নিখিলেশ তরঙ্গকে চিঠি লিখল। রাত দশটায় ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারিতে যাবার রাস্তার মোড়ে সে তরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হবে।'

রাজীব বলল, 'এক্‌জাক্‌টলি, সুব্রতর বক্তব্য ঠিক তাই। বাতিল প্রেমিক সেই নির্জন রাস্তার মোড়ে তার প্রেমিকার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। সে ভাবতেই পারেনি যে, তার লেখা চিঠিটা তরঙ্গমালা জামার মধ্যে নিয়ে আসবে। আর চিঠিটাই হল আসল প্রমাণ। নইলে নিখিলেশ সেনকে সন্দেহ করবার মত অন্য কোনো সূত্র তো আমাদের হাতে নেই?'

শচীদুলাল হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল। সমর্থন জানাল রাজীবকে।

চোখ বন্ধ করে রাজীব সান্যাল আবার কী যেন চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিড়বিড় করে বলল রাজীব, 'চিঠিটাই হল ক্রাক্স অফ দি প্রবলেম্। সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে ওরই অভ্যন্তরে বুঝলে শচীদুলাল?'

দেওয়াল ঘড়িতে শব্দ করে নটা বাজল। রাজীব সান্যাল চোখ খুলে তাকাল। দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। একটু আগেই ভারী পায়ের শব্দ শুনেছে রাজীব। বুট পায়ে সম্ভবত কোনো সিপাই এসে দাঁড়িয়ে আছে।

শচীদুলাল দরজা খুলে নিয়ে এল ওকে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে সুব্রত। চশমাটা নাকের উপর বসিয়ে রিপোর্টটার উপর ঝুঁকে পড়ল রাজীব। হরেন ডাক্তার পরিষ্কার লিখেছে 'ডেথ ডিউ টু অ্যাশফ্যাক্সিয়া', কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্টের একস্থানে এসে চোখদুটি স্থির হল রাজীবের। খুনি লোকটা কি মাটির উপর সজোরে ফেলে দিয়েছিল তরঙ্গকে? এবং তারপর—?

চশমা খুলে টেবিলের উপর রাখল রাজীব। শচীদুলাল তার মুখের দিকে চেয়ে। রিপোর্টে কী লিখেছে হরেন ডাক্তার, তারই কিছু টুকরো অংশ শুনতে চায় শচী।

কিন্তু রাজীব সান্যাল পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একপাশে সরিয়ে রাখল। বলল, 'শশাঙ্ক ভটচাযের গায়ে কী রকম জোর আছে তোমার মনে হয় শচী?'

—কোলিয়ারির ওভারম্যান স্যর। আট ঘন্টা ডিউটি দেয় আন্ডার-গ্রাউন্ডে। শক্তি-সামর্থ্য নিশ্চয়ই আছে দেহে।

রাজীব সান্যালের চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রাজীব। বলল, 'কাল খুব সকালেই দিকনগর যেতে হবে। তুমি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে চলে এস এখানে।'

জানালার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশটাকে দেখছিল রাজীব। অনন্ত আকাশ, সংখ্যাহীন নক্ষত্ররাশি, গ্রহ-উপগ্রহ...দুধের মত সাদা বিস্তীর্ণ ছায়াপথ। ...অন্ধকার মানেই রহস্য। কালো রাত নিঃসন্দেহে রহস্যময়ী।

শচীদুলাল যাবার জন্য তৈরি। হঠাৎ রাজীব বলে উঠল, 'খুনি লোকটা যথেষ্ট বলশালী, এ-কথাটা মনে রেখো শচী।'

তিন

দিকনগর থানার কাছে জিপ আসতেই রাজীব সান্যাল উদগ্রীব দৃষ্টি মেলে তাকাল। পরক্ষণেই তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হল। জিপের শব্দ পেয়েই সুব্রত সরকার ছুটতে ছুটতে আসছে। কাজে আর কথায় তেমন ফারাক নেই। গতকাল সন্ধেয় মথুরাপুরে বলেছিল ঠিকই। রাজীব সান্যালের জন্য সে থানার গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে। তা গেটে না থাক, এই সাতসকালে থানায় বসে সুব্রত তো তারই জন্য অপেক্ষা করছে। ইচ্ছে করলে বিছানায় শুয়ে আড়া-মোড়া ভাঙতে পারত সুব্রত। কিংবা অলসভাবে খবরের কাগজে-টাগজে চোখ বুলোত। অথবা বউয়ের সঙ্গে স্রেফ খোশামুদে গল্প—।

কিন্তু না, সুব্রত তার কথা রেখেছে। থানায় ঢুকে সেপাই পাঠিয়ে সুব্রতকে খবর দিতে হবে না। ধীরে সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে এসে সুব্রত বলবে না, একটু দেরি হয়ে গেল রাজীবদা। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।

জিপ আসতেই একরকম লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল রাজীব।

সুব্রত বলল,—'আপনি কিন্তু লেট রাজীবদা, আমি অন্তত বিশ মিনিট আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

ঘড়িতে পৌনে সাতটার মত। রাজীব সান্যাল কাঁটার দিকে চেয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল। বলল,—'ভেরি সরি ব্রাদার। তুমি এত রেগুলার জানলে আমি ঠিক পাংচুয়েল হতাম।'

সুব্রত হাসল। 'প্লেস অফ অকারেন্সে কি এখনই যাবেন?'

শচীদুলালের দিকে তাকাল রাজীব। বলল, 'ঘটনাস্থলে যাব বলেই তো এতদূরে আসা। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেব।'

'বেশ তো।' সুব্রত সায় দিল। 'চলুন তাহলে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসি।'

কী যেন চিন্তা করল সুব্রত। বলল, 'ঘটনাস্থলে যাবার আগে এক রাউন্ড চা হবে রাজীবদা?'

'চা পান করতে তোমার আপত্তি নেই তো শচী?' রাজীব সান্যাল শচীদুলালের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল।

সুব্রত চায়ের জন্য খবর পাঠাল। রাজীব সান্যাল চারপাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা, ঝোপঝাপ, পথ-চলতি মানুষ জন সব কিছু ঘাড় ঘুরিয়ে লক্ষ্য করছিল। আজ আকাশ পরিষ্কার। উজ্জ্বল নীল। রোদ উঠেছে বেশ। গত দুদিনের বর্ষায় মাটি স্যাঁতস্যাঁতে, গাছগাছালি ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে। আরো দিন দুই এমনি খটখটে রোদে না শুকোলে ভিজে মাটিতে টান ধরবে না।

ভোরের সতেজ গাছপালার মত রাজীবকে প্রফুল্ল দেখাল। হাল্কা সুরে রাজীব সান্যাল বলল—'পেপার মিলের ম্যানেজারের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে সুব্রত?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সুদর্শন চক্রবর্তী ভারি অমায়িক মানুষ। বছর পঁয়ত্রিশের মত বয়স হবে। বিলেতে চার বছর কাটিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। পেপার টেকনোলজির ভালো ডিগ্রি আছে। নইলে এই কম বয়সে কি আর একটা মিলের ম্যানেজারি পান?

—এখানে কতদিন এসেছেন উনি?

'বছর দুই হবে। এর আগে কলকাতার কাছেই একটা পেপার মিলে ছিলেন। কিন্তু সেটা জুনিয়র পোস্ট। ম্যানেজারি পেতেই ওটা ছেড়ে দিয়ে এখানে লেগে গেলেন। আর পেপার মিলের ম্যানেজার মানে রীতিমত রাজা-উজীর ব্যক্তি। সর্বেসর্বা কিংবা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলুন, সবই উনি—।

শচীদুলালের দিকে চেয়ে বলল রাজীব, 'তুমি জিপের কাছে থাকো শচী। আমি সুব্রতর সঙ্গে থানায় বসে একটু কথা বলছি।'

ইঙ্গিতটা শচীদুলাল বুঝল। ইন্সপেক্টর গোপনে কিছু বলবে সুব্রতকে। শচীদুলালকে তার মধ্যে আসতে নিষেধ করছে।

সুব্রতর সঙ্গে রাজীব সান্যাল গিয়ে থানায় ঢুকল। ছোট্ট একটা ঘরে সুব্রত আলাদাভাবে বসে। বেশ সাজানো-গোছানো ঘরখানা। টেবিলের উপর মোটা কাচ। তার নীচে সুইজারল্যান্ড কিংবা অমনি কোনো দেশের নিসর্গচিত্র। কয়েকটা পেপার ওয়েট। দেওয়ালে একপাশে সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার, অন্যপাশে একটি ক্রাইম চার্ট। টেবিলে একটা দিনপঞ্জী।

ভৃত্য এসে চা রেখে গেল।

এক চুমুক পান করে রাজীব বলল, 'ভারি সুন্দর চা হে সুব্রত। ফিরে এসে আর এক কাপ কিন্তু চাই।'

'নিশ্চয়ই', সুব্রতর মুখটা কিঞ্চিৎ গর্বিত দেখাল।

রাজীব সান্যাল প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল। 'তোমাকে একটা কথা বলছিলাম সুব্রত। তরঙ্গমালার জিনিসপত্রগুলো আমাদের একটু দেখতে হবে। ওর আত্মীয়-স্বজনরা দুঃসংবাদ পেয়ে

কেউ এসেছেন নাকি?'

'ওর মা আর এক দাদা এসেছেন শুনেছি। সম্ভবত আজ বিকেলের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাবেন তাঁরা। বোধহয় তরঙ্গর জিনিসপত্র ওদের সঙ্গেই যাবে।'

রাজীব সান্যাল কয়েক সেকেন্ড কি চিন্তা করল। বলল, 'এখনই একজন লোক পাঠাও তুমি। তরঙ্গের বাক্স-প্যাঁটরায় অন্তত চাবি দিয়ে আসুন। আমাদের পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ হলে সেগুলো ওঁরা নিয়ে যেতে পারবেন।'

সুব্রত বলল, 'এখনই ব্যবস্থা করছি রাজীবদা।'

—হ্যাঁ, নিখিলেশ সেন এখন কোথায়?

—থানার লক আপে। এখুনি ওকে মথুরাপুরে পাঠাতে হবে। এস ডি ও-র কোর্টে ফার্স্ট আওয়ারেই হাজির করা দরকার।

রাজীব বলল, 'হাজির করা মানে আবার সময় চেয়ে নেওয়া তো? কোর্টকে একবার ছুঁইয়ে রাখা।'

—তাছাড়া আবার কী? পুলিশের তরফ থেকে প্রার্থনা করা হবে নিখিলেশ সেনকে এখন জেল রক্ষণাবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। নাহলে তদন্তের সমূহ ক্ষতি।

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি কাজটা ঠিক করোনি সুব্রত। নিখিলেশ সেনকে অ্যারেস্ট না করলেই ভাল করতে।'

যেন সাপ দেখার মত চমকে উঠল সুব্রত। 'বলেন কী রাজীবদা? তরঙ্গমালার কাছে ওর লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি লিখে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ওকে আসতে বলেছিল নিখিলেশ। এবং সেই নির্ধারিত সময়ে তরঙ্গমালা খুন হল। পরদিন তার ডেড বডি পাওয়া গেল সুদামডির মোড়ের কাছেই। এর পরেও ওকে অ্যারেস্ট না করলে লোকে কি বলত? না, ওপরওয়ালা শুনত?'

রাজীব সান্যালকে চিন্তিত মনে হল। সে বলল, 'চূড়ান্ত তদন্ত তো এখনও হয়নি। তদন্তের সময় আসামীকে ছেড়ে রাখলে অনেক সময় ভালো ফলও পাওয়া যায়। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কী রাজীবদা?'

শুধু চিঠিটা থেকে নিখিলেশকে অভিযুক্ত করা এবং খুনের চার্জ প্রমাণ করা যায় না। আর নিখিলেশ তার পক্ষ সমর্থনে কি বলবে তাও তুমি আঁচ করতে পারছ না। সুতরাং আরো প্রমাণ চাই।'

ঘড়িতে সাড়ে সাতটার মত দেখে রাজীব সান্যাল উঠে দাঁড়াল। বাইরে রোদ আরও বেড়েছে। পথে লোকজনের চলাচল আগের চেয়ে বেশি। মাল বোঝাই মস্ত একটা ট্রাক রাস্তা কাঁপিয়ে দানবের গতিতে দ্রুত অদৃশ্য হল। দূরে দূরে প্রায় ফাঁকা প্রান্তরের উপর মদমত্ত অসুরের ভঙ্গিতে কোলিয়ারির চানখ সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বয়লার ঘরের চিমনীর নালী বেয়ে কালো ধোঁয়া অশাসনে উড়ু উড়ু রমণীর কেশের মত হেথা সেথা ভাসছে।

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, আসল কথাটা কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন।'

'কী বলো তো?' রাজীব বিস্মিত হয়ে তাকাল।

—নিখিলেশ সেনের চিঠিটা। আমি জোর করে বলতে পারি রাজীবদা, এই চিঠিটা কোর্টে দাখিল করলে আত্মপক্ষ সমর্থনে ও কিছুই বলতে পারবে না—।

কিন্তু ওকে জেলে রেখে তোমার কিছু লাভ হবে না সুব্রত। বরং চলাফেরা করতে দিলে নতুন তথ্য-টথ্য লাভ করতে পারতে। সুতরাং—।' রাজীব ইঙ্গিতপূর্ণ হাসল।

—সে যাক গে। আপনি ওর চিঠিটা দেখবেন রাজীবদা?

—তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না। তবে তুমি যখন বলছ, নিয়ে এস।

রাজীব সান্যাল চেয়ার থেকে সরে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। থানার প্রাঙ্গণে বেশ সুন্দর বাগান তৈরি করেছে এরা। বেশ বড় সাইজের দোপাটি, জিনিয়া আরো কি সব ফুল বাগানটাকে আলো করে রেখেছে। মনে মনে প্রশংসা করল রাজীব। সুব্রতর সত্যি টেস্ট আছে।

'চিঠিখানা এনেছি রাজীবদা।' সুব্রত বলল।

জানালা থেকে একটু সরে এসে রাজীব ঘুরে দাঁড়াল। সুব্রত সরকারের হাতে একটা নীল রঙের কাগজ। যেন আলগোছে কাগজটা ধরে আছে সুব্রত। ওর মুখে রহস্যের হাসি, চোখে বিজয়ীর গর্ব।

'তরঙ্গমালার জামার মধ্যে চিঠিখানা লুকোনো ছিল। নিখিলেশ যদি বিন্দুমাত্রও জানত, তাহলে টান মেরে বের করে নিত এটা। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহায়।' সুব্রত সহাস্যে কথা শেষ করল।

চিঠিটা হাতে নিল রাজীব। ভারি সুন্দর নীল রঙের কাগজটা। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করল সে। তারপর চিঠির বক্তব্যের উপর দৃষ্টিপাত করল। নিখিলেশের হাতের লেখা বেশ সুন্দর। গোটা গোটা হস্তাক্ষর। কালিটা নীল বা সবুজ নয়। ঠিক কালো রঙ ... কালির কালিমা লক্ষ্য করবার মত। তবে কাগজটা জলে ভিজেছিল বলে অক্ষরগুলি কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট।

অল্প কয়েক লাইনের চিঠি। একজনকে কোনো একটা স্থানে দেখা করতে বলবার জন্য এর চেয়ে বেশি লেখার প্রয়োজন হয় না। তবু চিঠির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা মান অভিমানের সুর সহজেই ধরা পড়ে। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হবার কারণ সেটাও হওয়া সম্ভব।

চিঠিতে তারিখ নেই, কোথা থেকে লিখছে তারও কোনো হদিশ নেই। অক্ষরগুলির উপর চোখ দুটি স্থির করল রাজীব সান্যাল। নিখিলেশ লিখেছে—

আমার মিষ্টি,

তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা তোমার আর একবার ভেবে দেখা উচিৎ। ভালো করে চিন্তা করলে তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে।

মনে আছে মিষ্টি, যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। সেদিন সমস্ত পথ ট্রেনে আমরা দুজনে দুজনকে দেখেছি। কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। অথচ বুকের মধ্যে দুজনেরই কথা বলবার কি অদম্য ইচ্ছে। আবার মথুরাপুর স্টেশনে নেমেই সব ভাবনার ইতি। বহু কষ্টে ট্যাক্সি জোগাড় করে যখন তোমাকে লিফট্ দিতে চাইলাম তখন তুমি একমুখ হেসে এগিয়ে এলে। আমার মনে হল এমন মিষ্টি হাসি আমি কোথাও দেখিনি। হয়তো এমন হাসি কোনো মেয়ের ঠোঁটে এর আগে কখনও ফোটেনি।

কাল তোমার নাইট ডিউটি আছে জানলাম। রাত দশটার সময় সুদামডির মোড়ে আমি অপেক্ষা করব। মনে হয় এর মধ্যে তুমি আর একটু তলিয়ে দেখবে। এবং হয়তো আমার প্রস্তাবে রাজী হবে। কথা আছে মিষ্টি,—একটু অপেক্ষা করো।

অনেক ভালবাসা, অনেক শুভ-কামনা রইল।

ইতি—

তোমারই নিখিলেশ

চিঠিটা আর একবার পড়ল রাজীব সান্যাল। কমা, পূর্ণচ্ছেদ সব ভালো করে লক্ষ্য করল। একটু পরে ঠাট্টা তরল কণ্ঠে বলল রাজীব, 'এ চিঠিটা কোন এক মিষ্টিকে লেখা। তরঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক কী?'

'আমি খোঁজ নিয়েছি রাজীবদা। তরঙ্গ মানেই মিষ্টি—।'

—ও। মিষ্টি বুঝি ওর ডাক নাম—

সুব্রত সরকার কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা হতাশ ভঙ্গি করে বলল, 'রাজীবদা কিছু বুঝতে চাইছেন না।'

হাসল রাজীব সান্যাল। বলল, 'ঠাট্টা করছিলাম হে সুব্রত। বুঝতে আমি অনেক আগেই পেরেছি। মিষ্টি নামটা পোশাকীও নয়, ডাক নামও নয়। ওটা নিতান্তই ব্যক্তিগত দান।' একটু থেমে যোগ করল রাজীব, 'কানে কানে বললে ও নাম আরো মিষ্টি শোনাবে সুব্রত।'

সুব্রত সরকার কৌতুক করল, —'রাজীবদা কি খুন ছেড়ে এখন নাম নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করবেন নাকি?'

—নাম কি কম মজার হয় সুব্রত? বিশেষ এমনি ভালবাসার সম্বোধন। নিখিলেশ তরঙ্গকে ডাকত মিষ্টি বলে। এ শুনে তো আমাদেরই মিষ্টি লাগছে। কিন্তু আমি এক ভদ্রলোককে জানি। তিনি একজনকে কী নামে ডাকতেন জানো?—

—কী নামে আবার?

খুব গম্ভীর মুখ করে রাজীব বলল,—'দুষ্টু! পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকতাম তখন। মাঝে মাঝে কানে আসত, ভদ্রলোক বলছেন, —দুষ্টু এটা দিয়ে যাও, ওটা দিয়ে গেলে না। অনেকদিন ভেবে ভেবে পরে নামের রহস্যটা শুনলাম। দুষ্টু ওঁর স্ত্রীর নাম। মানে ওই নামে ডাকেন বউকে। কি সুব্রত, নামটা বেশ ইন্টারেস্টিং না?'

সুব্রত শব্দ করে হাসল। 'রাজীবদার দেখছি নানারকম সংগ্রহ। কিন্তু আটটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। জায়গাটা দেখতে যাবেন না এবার?'

চিঠিটা সুব্রতর হাতে ফেরত দিল রাজীব। বলল, 'ঘটনাস্থল কতদূর হবে সুব্রত? জিপ নিয়ে যাওয়া যাবে?'

'জিপ নিয়েই তো যেতে হবে। আধমাইলের বেশি হবে এখান থেকে। পেপার মিলের উত্তর দিকে জায়গাটা।'

রাজীব সান্যাল জিপে এসে উঠল। শচীদুলাল এতক্ষণ জিপের কাছে পায়চারী করছিল। কাছাকাছি বড় গাছ-টাছ নেই। থাকলে শচীদুলাল তার স্নিগ্ধছায়ায় গিয়ে দাঁড়াত। একটু আরাম পেত।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কোমরটা সামান্য টনটন করছে। ওর দিকে চেয়ে রাজীব সান্যাল ঈষৎ হাসল।

সুব্রত বলল, 'শচীবাবু থানার মধ্যে গিয়ে বসলেই পারতেন।'

রাজীব সান্যাল তির্যক দৃষ্টিতে দেখল শচীকে। সুব্রতকে বলল, 'রহস্য নিয়ে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি তাই জানবার জন্য শচী অস্থির হয়ে উঠেছে।'

প্রতিবাদ করে শচীদুলাল জবাব দিল, 'আজ্ঞে না স্যর। আমি সে কথা চিন্তা করছি না।'

রাজীব আবার হাসল, 'আত্মবঞ্চনা করে কোন লাভ নেই শচী। যারা ধূমপান করে, সিগারেট অনেকক্ষণ না টানলে তাদের রীতিমত কষ্ট হয়। পেটের ভিতর আঁকুপাকু করে। তুমি রহস্যের কারবারি,—সি. আই. ডি দারোগা। রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ, অথচ স্বাদ পাচ্ছ না। এর চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে?'

জিপ স্টার্ট নিল। ঘর-ঘর শব্দ। বাতাসে মবিল আর পোড়া তেলের বিশ্রী গন্ধ। পথের ওপাশে দশ-বারোজন লোক সাগ্রহে জিপটাকে লক্ষ্য করছে। একটা চপ-ফুলুরির দোকানে কয়েকজন খরিদ্দার নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলাবলি করছে।

'সুব্রত, তরঙ্গকে তুমি আগে কখনও দেখেছিলে?' রাজীব হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'দেখেছিলাম রাজীবদা। কাজে-কর্মে মিলের মধ্যে দু চারবার যেতে হয়েছে। ম্যানেজারের ঘরে তরঙ্গকে কয়েকবার আসতে দেখেছি। বাইরে থেকে টেলিফোন এলে তরঙ্গ ছুটে এসে খবর দিত। দরকার মনে করলে ম্যানেজার লাইন তুলে কথা বলত। নইলে তরঙ্গ নির্দেশমত অন্য কারো

কাছে পাঠিয়ে দিত লাইনটা।'

তরঙ্গ দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল, তাই না সুব্রত?

'সুন্দরী মানে?' সুব্রত সরকার কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

রাজীব বলল, 'সুন্দরী বলতে তুমি যা বুঝেছ তাই বলবে। এই ধরো,—গায়ের রং বেশ ফর্সা। চোখ দুটি কালো আয়ত। দূর আকাশে উড়ন্ত চিলের ডানার মত একজোড়া ভ্রূ। ঘন কৃষ্ণ কেশদাম বেশ ফোলা ফাঁপা। ...'

সুব্রত বলল 'এভাবে তরঙ্গমালার রূপ বর্ণনা করতে পারব না রাজীবদা। তরঙ্গর গায়ের রং হয়ত ফর্সা, কিন্তু সেই গৌরবর্ণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চোখ-টোখ কালো তো বটেই এবং বেশ বড়ো বড়ো! ভুরু দুটো চিলের ডানার মত কি না আমি জানিনে। শুধু একটা কথা আপনাকে বলতে পারি।'

—কি কথা সুব্রত?

—তরঙ্গমালাকে একবার দেখলেই আবার দেখতে ইচ্ছে করবে।

'সর্বনাশ!' রাজীব জিভ বের ক'রে একটা চুক-চুক শব্দ করল, 'এমন বেফাঁস কথাটা শচীদুলালের সামনে বলে ফেললে? বউমার কানে গেলে কি অনর্থ হবে ভাবো দিকি।'

শচীদুলাল মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল। সম্ভবত সে হাসছিল।

সুব্রত শুরু করল, 'সে যাই বলুন রাজীবদা। তরঙ্গকে জীবিত দেখলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত হতেন। ওর মধ্যে একটা শান্ত সৌন্দর্য, একটা আলগা শ্রী এমনভাবে ছিল, যে ওকে দেখে আকৃষ্ট না হয়ে বোধ হয় উপায় ছিল না।'

দিকনগরের বাজার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে জিপ চলছিল। দু'পাশে ঘরবাড়ি। কোনটা খ'ড়ো চাল, কোনটা পাকা দালান। রাস্তার দুপাশে দোকান-পসরা। পথ-চলতি মানুষজন, দোকানের প্রায় প্রত্যেকেই জিপ গাড়িটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

রাজীব সান্যাল নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে। সুব্রত তার পাশে। পিছনে শচীদুলাল রয়েছে।

—খুনের পর এখানকার অবস্থাটা কেমন সুব্রত?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—অবস্থা আর কি? এখন সর্বত্রই ঐ খুনের আলোচনা। লোকে খানিকটা ভয় পেয়েছে রাজীবদা। এ সব অঞ্চলে খুন-জখম অবশ্য খুব অপরিচিত নয়। কিন্তু ভদ্রঘরের একটি সুশ্রী যুবতী এমন নির্মমভাবে মারা পড়েছে জেনে সাধারণ লোকের মনোবল খানিকটা ভেঙে গিয়েছে। তবে নিখিলেশ সেনকে অ্যারেস্ট করায় কিছুটা কাজ হল।

—চিঠিটার ব্যাপারে নিখিলেশকে কোন প্রশ্ন কর'নি তুমি?

—করেছিলাম রাজীবদা। কিন্তু নিখিলেশ সেন খুব ঘুঘুলোক। পুলিশের কাছে মুখ খুলতে বা কোন স্টেটমেন্ট দিতে সে রাজি নয়। তার যা কিছু বলবার সে উকিলের মাধ্যমে কোর্টে জানাবে।'

রাজীব সান্যালকে চিন্তিত মনে হল। গাড়ির কাঁচের মধ্য দিয়ে সে সাপের মত আঁকাবাঁকা পীচঢালা চওড়া পথটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ সুব্রত প্রায় চিৎকার করে ঘোষণা করল, 'আস্তে করুন রাজীবদা, এবার তো আমরা চলে এসেছি। ঐ তো সুদামডি কোলিয়ারির মোড়।'

ধীরে ধীরে জিপটা থামল। ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারি যাবার পথটা বাঁ দিকে বেঁকেছে। এটাও পিচের রাস্তা। তবে এত চওড়া নয়। দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। মোড়ের উপর প্রকাণ্ড এক ঝুরিনামা বটগাছ। গাছের ঘন ছায়ায় গাড়ীটাকে রেখে রাজীব সান্যাল নামল।

এখানটায় বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া। বটগাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়, গাড়ির ভিতরে থাকার বিরক্তিটুকু মুহূর্তে উবে গেল। পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজীব সান্যাল জায়গাটা নিরীক্ষণ করল। মোটামুটি নির্জনই

বলা চলে। ঘরবাড়ি, বসতি সবই আছে। তবে তা কাছাকাছি, বা সংঘবদ্ধ নয়। এখানে ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

'পেপার মিলের গেটটা এখান থেকে কত দূরে?' রাজীব সুব্রতকে বলল।

'দূর কোথায়? মিনিট তিন-চার হাঁটলেই রাস্তাটা বেঁকেছে। মিলের নর্থ গেটটা ঐ বাঁকের মুখে। এদিকটায় যারা থাকে তারা নর্থ গেট দিয়েই কাজে ঢোকে।'

—এদিকে লোকবসতি কই তেমন?

—মিলের নিজস্ব এরিয়াটা অনেক বড় রাজীবদা। বহু লোকই মিলের মধ্যে বাস করে। কোম্পানি কিছু কিছু কোয়ার্টার করিয়েছিল। কিন্তু এখন আর ওতে কুলোচ্ছে না। লোকজন বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কোয়ার্টার বাড়ছে না।

—তাহলে তারা থাকছে কোথায়?

—যে যেখানে পাচ্ছে। দিকনগরে এসে বাড়িভাড়া পাওয়া অবশ্য দুঃসাধ্য। তবু কিছু কিছু নতুন বাড়ি হচ্ছে আজকাল। কোম্পানিকে ভাড়া দিতে অনেকেই রাজি।'

—তরঙ্গমালা কোন্ বাড়িটায় থাকত সুব্রত?

—এখান থেকে দেখতে পাবেন না রাজীবদা। একটা গাছের আড়াল পড়েছে। মিনিট ছয় সাতের রাস্তা। ধীরে সুস্থে গেলে বড় জোর দশ মিনিট।

রাজীব সান্যাল মাটির উপর অনেকক্ষণ ধরে কী লক্ষ্য করছিল। খানিকটা হেঁটে গেল রাজীব, আবার পিছিয়ে এল। হতাশ একটা ভঙ্গি করে বলল, 'না, হল না সুব্রত। চলো ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক এবার।'

সুদামডি যাবার পথ ধরে বিশ-পঁচিশ হাত গিয়ে সুব্রত থামল। পিচের পথ থেকে সরু পায়ে হাঁটা একটা পথ ঢালু অসমান জমিতে নেমেছে। ঐ পথটা ধরে নেমে এল সুব্রত। মিনিট দুই হাঁটতেই কয়েকটা ঝোপ, আগাছার জঙ্গল, ছোটখাটো গাছগাছালি চোখে পড়ল। বেশ ফাঁকা মত খানিকটা জায়গা একদিকে। চারপাশে ঝোপ-ঝাপের ভিড়। সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে সুবত বলল, 'ডেড বডিটা ওখানে পড়েছিল রাজীবদা।'

সকলকে পিছনে রেখে রাজীব এগিয়ে এল এবার। লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে দাঁড়াল সেই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে। তার পিছু পিছু সুব্রত এবং শচীদুলাল।

মাথা তুলে একবার দেখল রাজীব। শরতের প্রসন্ন নীল আকাশে উজ্জ্বল রোদের আসর বসেছে। একখণ্ড পেঁজা তুলোর আকারের শাদা মেঘ অলস গতিতে এক কোণ থেকে অন্য কোণে ভেসে যাচ্ছে। ডানা মেলে একটা নিঃসঙ্গ বক নীল আকাশের গায়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য সুন্দর একটি চিত্রপটের সৃষ্টি করল।

এখানে সেখানে জল জমে আছে। মাটি ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে। গত দু-এক দিনে কি প্রচণ্ড বৃষ্টিই না হয়েছে জায়গাটায়। সুব্রত ঠিকই বলেছিল। বৃষ্টিতে ক্লু-টু সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

এদিক সেদিক তাকিয়ে রাজীব বলল, 'এখানে একটা ইটের পাঁজা ছিল সুব্রত।'

বিস্মিত হয়ে সুব্রত জবাব দিল, 'তা কেমন করে জানলেন?'

রাজীব সান্যাল শচীদুলালের দিকে চেয়ে হাসল। এ আর এমন কি শক্ত শচী। চারপাশে ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল। অথচ মাঝখানের খানিকটা জায়গায় শুধু নরম ঘাস। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো মাটির সঙ্গে ইটের গুঁড়ো লেগে রয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অবশ্য সব ধুয়ে-মুছে একাকার। নইলে বালির মত ঝুরঝুরে ইটগুঁড়ো তোমার জুতো-টুতোয় লেগে যেত এতক্ষণ।' কথা শেষ করে রাজীব সান্যাল খুব মনোযোগী হয়ে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ শুরু করল।

সুব্রত সরকার কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল তাকে। ফস করে সে বলে উঠল, 'নিচু হয়ে ঝুঁকে কী

খুঁজছেন রাজীবদা? ঝোপেঝাড়ে চট করে যাবেন না। ময়লা-টয়লা রয়েছে হয়তো।'

তেমনি বেতের মত নত হয়ে রাজীব সান্যাল খুঁজছিল। পয়সা-টয়সা হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন খোঁজে। এদিকে সেদিকে সর্বত্র তার নজর যাচ্ছিল। খুঁজতে খুঁজতে মুখ তুলে একবার চাইল রাজীব। বলল, বাল্যকালে একটা কবিতা পড়েছিলাম সুব্রত। হয়তো ঠিক মনে নেই সবটা। তবু তোমাকে বলছি।'

—কী কবিতা রাজীবদা?

'মনে হচ্ছে কবিতাটা এই রকম—

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখো ভাই
পেলেও পাইতে পার—'

হঠাৎ কবিতা শেষ করে শিকারী বিড়ালের মত রাজীব সান্যাল কী যেন লক্ষ্য করতে লাগল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল রাজীব। ঝোপের মধ্য থেকে ধুলো কাদায় মাখা একটা রুমাল তুলে উঁচু করে ধরল। শচীদুলাল এগিয়ে এসে বলল, 'কী পেলেন স্যর? রুমাল?'

রুমালটা ওর হাতে দিল রাজীব সান্যাল। বলল, 'তোমার কাছে রেখে দাও শচী। মথুরাপুর গিয়ে এর ব্যবস্থা করব।'

সুব্রতর দিকে চেয়ে হাসল রাজীব সান্যাল। —'কাজ শেষ সুব্রত। চলো এবার তরঙ্গমালার মেসে যাই।'

ঘড়িতে নটার বেশি। রোদ আরো উজ্জ্বল। বটগাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। অনেকগুলি সন্তানের জননীর মত বটগাছের নানা ডালপালা পথিকজনকে সস্নেহ প্রশ্রয় জানাচ্ছে। এতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা ঘেমে উঠেছে রাজীব। জামার নীচের গেঞ্জিটা নিশ্চয়ই ভিজে জবজবে। সুব্রতর মুখটা টকটকে লাল দেখাচ্ছে। মনে মনে নিশ্চয় খেপে উঠেছে সুব্রত। শচীদুলালকেও খুব খুশি মনে হচ্ছে না।

কিন্তু রাজীব সান্যালের মনের গোপন প্রকোষ্ঠে অন্য একটি চিন্তা ধীরে ধীরে দানা বাঁধল। ঐ কথাটাই বারবার ভাবছিল রাজীব। রুমালটা কুড়িয়ে পাবার একটু আগে অন্য একটি বস্তুও পেয়েছে সে। খুব ছোট্ট একটি জিনিস। চট করে তুলে নিয়েছে বলে শচীদুলাল বা সুব্রত কারো নজরে পড়েনি। এবং ইচ্ছে করেই ওদের কোন কথা বলেনি রাজীব।

পকেটে হাত দিয়ে ক্ষুদ্র বস্তুটি আর একবার অনুভব করল সে। গোলাকৃতি ছোট্ট জিনিসটি। উজ্জ্বল সবুজ রং। ফুলপ্যান্টের কোমরের কাছে লাগানো থাকে এটি। সকলের অলক্ষ্যে বস্তুটি আর একবার দেখল রাজীব।

অন্য কিছু নয়—প্যান্টের বোতাম একটি।

রাজীব সান্যালকে বর্ষার মেঘ-থমকানো সন্ধ্যার মত থমথমে দেখাল।

চার

সুজাতা দাসকে দেখে রাজীব সান্যাল রীতিমত অবাক হল। বাঙালীর ঘরে এমন বাড়ন্ত গড়ন আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

কিন্তু শুধু বাড়ন্ত গড়ন বললে সুজাতা দাসকে ভুল বোঝানো হবে। সবটা ঠিক প্রকাশ করা হল না। সুজাতা দাস দীঘল তো বটেই, আয়তনেও কিছু কম নয়। চোখে যেটা লাগে, তা হল

ওর কাঠ কাঠ শক্ত শক্ত ভঙ্গি। নারীসুলভ কমনীয়তার যেন ছিটেফোঁটা নেই দেহে। বেশ পুরুষালি গড়ন। চোখের দৃষ্টিতে নরম-সরম কিছু আসে না। বরং দীপ্ত বৈশাখের দহনজ্বালার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভালো করে চেয়ে দেখল রাজীব। নাকের নীচে এবং ঠোঁটের উপরে কালো গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট। টমবয়িশ-ভাব ষোলো আনা। নমস্কার করে রাজীব সান্যাল বলল, আপনিই শ্রীমতী সুজাতা দাস?'

সুজাতা প্রতিনমস্কার করল।

সুব্রত বলল, 'আমাকে হয়তো আপনি দেখেছেন। দিকনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ আমি। ইনি হলেন সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল, আর উনি শচীদুলাল সরকার। এঁর সহকারী।' —সকলকে পরিচিত করে সুব্রত থামল।

তিনজন পুলিশের লোককে একসঙ্গে দেখে সুজাতা দাস একটু ঘাবড়ে গেছে বলে রাজীবের মনে হল। একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয়নি। একটা জলজ্যান্ত মেয়ে পথের ধারে খুন হয়ে পড়ে রইল। আর তারপরই তিন তিনটে পুলিশের লোক এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সুজাতা দাসের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে রাজীব সান্যালের মায়া হল।

একটু হেসে রাজীব বলল 'তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে মিস দাস। আপনার সহযোগিতা পাব আশা করেই আমরা এতদূর এসেছি।

চেয়ারে বসল সুজাতা দাস। বলল, 'বেশ তো। প্রশ্ন করুন আপনি।'

শচীদুলালের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করল রাজীব। সুব্রতকে বলল, 'তুমি একটু উঠে গিয়ে তরঙ্গের আত্মীয়স্বজন কারা আছেন খোঁজ নিয়ে এস। আমি মিস দাসের সঙ্গে ততক্ষণ কথাটথা বলি।'

ইঙ্গিতটা বুঝল সুব্রত। সে ভাবল, সে যদি সরে যায়, একটু গা ঢাকা দিয়ে অন্যত্র দাঁড়ায়, তাহলে রাজীব সান্যাল সহজেই আলাপ জমিয়ে ফেলবে সুজাতার সঙ্গে। শচীদুলালকেও সরিয়ে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু উপায় নেই। সুজাতা দাসের বক্তব্যের—কিছু দরকারী অংশ নোট করে নেবার জন্য শচীদুলাল অপরিহার্য। সুব্রত সরে গেল।

ততক্ষণে নোটবই খুলে তৈরি হয়েছে শচীদুলাল। পেন্সিলটা হাতে নিয়ে সুজাতা দাসের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। কোনো দিকে না লক্ষ্য করে রাজীব সান্যাল বলল, 'এই মেসে আপনারা কজন আছেন?'

—'মেস কোথায়? দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আমরা চারজন মেয়ে ছিলাম। লোকে অবশ্য এটাকে মেস বলে, নইলে মেস বলতে ঠিক যা বোঝায়—।' সুজাতা থামল।

—এ বাড়িটায় দুখানাই তো মোটে ঘর?

—হ্যাঁ। ঘর বলতে দুটোই। এ ছাড়া রান্নাঘর, বাথরুম সবই রয়েছে।

—তরঙ্গমালা তো আপনারই রুমমেট ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর দুজন মেয়ে কারা? তাদের তো দেখছি না?

—দুজনেই অফিসে চলে গেছে। একটু আগেই বেরিয়ে গেল ওরা। আপনি আধঘন্টাটাক আগে এলে ওদের সঙ্গে দেখা হত।

রাজীব সান্যাল ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে গেছে। সুতরাং অফিসের মানুষদের ঘরে পাওয়া কঠিন। ফস্ করে রাজীব সান্যাল বলল, 'আপনি অফিসে গেলেন না?'

—ভাল লাগল না। জানেন, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। চুপ করে বসে থাকলেই খালি তরঙ্গকে মনে পড়ছে।

—অফিসে গিয়ে কাজের মধ্যে থাকলেই মনটা হয়তো ভাল থাকত।' রাজীব সান্যাল মন্তব্য করল।

সুজাতা দাস উত্তর দিল না। ঠোঁট কামড়ে কী যেন চিন্তা করল। বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, অফিস কামাই করেই বা আর কদিন থাকা যাবে? এক যদি এখান থেকে চলে যেতে পারতাম—।'

বিস্মিত হয়ে রাজীব সান্যাল বলল, 'চলে যাবার কথা চিন্তা করছেন নাকি?'

সুজাতা দাস লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও কিছু না। এমনিই বলে ফেলেছি।'

রাজীব সান্যাল শুরু করল, 'দেখুন মিস দাস, তবঙ্গর সঙ্গে এক ঘরে অনেকদিন থেকেছেন আপনি। সম্ভবত ওর অন্তরঙ্গ বা ঘনিষ্ঠ বলতে আপনাকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং তরঙ্গমালার কিছু কাহিনি আপনাব মুখ থেকে শুনব বলে আশা করি।'

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে গড়াল। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর সুজাতা দাসই মুখ খুলল। ছোট্ট লেডিজ-পার্সের মুখ যেমন সামান্য একটু ফাঁক করে মেয়েরা পযসা-টয়সা বের করে, তেমনি ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটি অল্প একটু ফাঁক করে সুজাতা কথা বলল, 'তরঙ্গের সম্বন্ধে আপনাকে আমি অনেক কিছু বলতে পারি মিঃ সান্যাল। কিন্তু অতখানি শোনবার মত আপনার কি সময় হবে?'

'কেন হবে না মিস দাস?' আগ্রহ প্রকাশ কবে রাজীব বলল, 'আপনার কাছে অনেক কিছু শোনা যাবে বলেই তো এতদূরে এসেছি।'

সুজাতা দাস এদিকে ওদিকে কী যেন চেয়ে দেখল। বারান্দায় চেয়ার পেতে প্রায় মুখোমুখি বসেছিল ওরা। ভাদ্রের প্যাচপেচে গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাজীব চেয়ে দেখল সুজাতা দাসের গলায়, কপালে, কানের কাছে ঘাম জমেছে। গায়ের জামাটামা ভিজে একসা, এত ঘামছে কেন সুজাতা? শুধু গরমে, না পুলিশের সান্নিধ্যে এসে?

নিজের দিকে চেয়ে সুজাতা বলল, 'ঘরের মধ্যে গিয়ে বসবেন মিঃ সান্যাল? ওখানে সিলিং ফ্যান আছে।'

পাখার নাম শুনতেই রাজীব এক-পায়ে রাজি। শচীদুলালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো হে শচী। মিস দাস যখন বলছেন, পাখার তলায় বসে জিরিয়ে টিরিয়ে ওঁর কথা শোনা যাবে।'

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সুজাতা দাস হাত দিয়ে ঠেলতেই সেটা হাট হয়ে খুলে গেল। অভ্যর্থনা করে সুজাতা বলল, 'ভিতরে আসুন আপনারা।'

রাজীব সান্যাল ঘরটা এক নজরে পর্যবেক্ষণ করে নিল। খুব ছোট নয় ঘরটা। আন্দাজে মনে হল, কুড়ি ফুট বাই ষোলো ফুট হবে। দু-দিকে দুটো চৌকি পাতা, নিঃসন্দেহে বলা যায় একটা চৌকী তরঙ্গ ব্যবহার করত। সেটার উপর এখন বিছানা-টিছানা নেই। সম্ভবত তরঙ্গের ব্যবহৃত বাক্স বিছানা গুটিয়ে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছে।

সুজাতা দাসের বিছানাটা তখনও তোলা হয়নি। কটকটে লাল রঙের একটা চাদর বিছানার উপর পাতা। বালিশের ওয়াড়-টোয়াড় সব চড়া রঙের। বোধহয় গাঢ় রং সুজাতা দাসের খুব প্রিয়। হাল্কা রং সে পছন্দ করে না।

দেওয়ালে তিন-চারটি ছবি। দুটি প্রাকৃতিক দৃশ্য—একটি সুজাতা দাসের, অন্যটি মিলিটারী পোশাক পরিহিত এক ভদ্রলোকের। শচীদুলাল অবাক হয়ে ছবিগুলো দেখছিল। হঠাৎ রাজীব বলল, 'মিস দাস, আপনার হাইট্ কত?'

চোখ তুলে তাকাল সুজাতা। বলল, 'মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা আমি। ধরুন পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি,—এমনিই হবে।'

—আর একটা প্রশ্নও করা দরকার বলে মনে হচ্ছে। অনধিকার চর্চা বলে মনে করবেন না—।

'না, না। কী জানতে চান বলুন আপনি,' সুজাতা প্রশ্রয় দিল।

—আপনার বয়স কত মিস দাস?

সুজাতা দাসের চোখদুটো মুহূর্তের জন্য দূর আকাশের তারার মত ঝিকমিক করে উঠল। ম্লান হেসে সে বলল, 'লিখে নিন, ত্রিশ হতে আর কয়েক মাস আছে।'

—এ ঘরে কি গতকাল রাত্রে আপনি ঘুমিয়েছিলেন?

সুজাতা দাস যেন বিস্মিত হল। 'এখানেই তো ঘুমিয়েছিলাম। নইলে কোথায় আবার?'

রাজীব প্রশংসার সুরে মন্তব্য করল, 'আপনার সাহস আছে মিস দাস। অন্য মেয়েদের তুলনায় আপনি শুধু লম্বাই নন, রীতিমত সাহসিনী। নইলে তরঙ্গ খুন হবার পর এই ঘরে একা রাত কাটানো! মেয়ে কেন, অনেক ছেলের পক্ষেও কঠিন।'

সুজাতা দাস গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভূতের ভয়-টয় আমার একটু কম। অনেক দিন ধরেই মেয়ে-হোস্টেলে একা থেকে এলাম, ভয়-টয় কেটে গেছে।'

'দিকনগর পেপার মিলে আপনি কতদিন আছেন মিস দাস?' 'দু বছরের বেশি।' একটু থেমে সুজাতা যোগ করল, —'তরঙ্গ এসেছে আমার পরে। আমি এলাম ডিসেম্বরে, বছরের শেষাশেষি। তরঙ্গ জয়েন করল জুলাই কিংবা আগস্টের প্রথমে।'

—পেপার মিলে আপনি কী কাজ করেন?

—তরঙ্গের মত আমিও টেলিফোন অপারেটর।

—আপনারা দুজন ছাড়া আর কোনো টেলিফোন অপারেটর আছেন নাকি?

—'হ্যাঁ। সুমনাও এই কাজ করে। তাছাড়া এক ভদ্রলোকও রয়েছেন। তাঁর নাম ভৈরব দত্ত। সাধারণত নাইট শিফটে ওঁকে ডিউটি দেওয়া হয়।

—তাহলে তরঙ্গকে কেন শনিবার নাইট ডিউটি দেওয়া হয়েছিল?

—ভৈরববাবুকে অন্য কাজে বাইরে পাঠিয়েছিলেন ম্যানেজার। সুতরাং তরঙ্গকে ডিউটি নিতে হল। অবশ্য এর আগেও এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। আমি কিংবা তরঙ্গ কতবার নাইট ডিউটি দিয়েছি। ওভার-টাইম কাজ করলে বেশি মাইনে পেয়েছি।'

এবার সরাসরি প্রশ্ন করল রাজীব, 'খুনের ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয় মিস দাস? যে খুন হয় তার জীবনটা ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে হত্যার হদিস পাওয়া অসম্ভব নয়। তরঙ্গকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, চিনতেন। তেমন কোনো কারণ আপনার মনে হয় কি?'

সুজাতা দাসকে চিন্তিত দেখাল। নানা কথা জমে জমে মনের মধ্যে পাহাড় তৈরি হয়ে আছে। সুজাতার চোখদুটি চিন্তার ভারে ছোট হয়ে এসেছে। রাজীব সান্যাল ওকে উৎসাহিত করবার জন্য আবার বলল, চিন্তা করে আমাদের কাছে সবকিছু খুলে বলুন মিস দাস। মনে রাখবেন আপনি যা বলবেন তার মূল্য অনেকখানি।'

সুজাতা দাস শুরু করল, —'দেখুন, খুনের ব্যাপারে ঠিক সন্দেহ করবার মত কারণ-টারণ আমি দেখাতে পারব না। কিন্তু তরঙ্গ আমার রুমমেট ছিল। দীর্ঘ সময় আমরা একসঙ্গে থেকেছি। দুজনে গল্প করেছি, গভীরভাবে মিশেছি। ওর অনেক কথা আমি জানি,—অবশ্য ইদানীং তরঙ্গ ভীষণ চাপা হয়ে গেছল। আমার কাছেও কিছু বলতে চাইত না।'

রাজীব সান্যাল চুপ করে শুনছিল।

সুজাতা দাস বলল, 'নিখিলেশ সেন বলে এক ভদ্রলোকের নাম শুনেছেন ইন্সপেক্টরবাবু? তরঙ্গের সঙ্গে ওর আলাপ-পরিচয় গভীর। দুজনে চিঠি লেখালেখি, মাঝে মাঝে কলকাতায় বেড়িয়ে আসা, এখানে ওখানে চক্কর দেওয়া,— প্রায় কিছুই বাদ ছিল না। তরঙ্গকে আমি বহুবার বলেছি, ভালো করে পরিচয়-টরিচয় না জেনে অমন বোকামি করিসনে। কিন্তু তরঙ্গ কিছুতেই বুঝল না।

নিখিলেশ সেন ওকে চুম্বকের মত টেনে নিল মিঃ সান্যাল। আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই, তরঙ্গের মৃতদেহে নিখিলেশের একটা চিঠি পাওয়া গেছে?'

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'এ খবর তো এখন শাঁখের ধ্বনির মত এপাড়া ওপাড়া সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে।'

সুজাতা দাস বলল, 'নিখিলেশ ওকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল মিঃ সান্যাল। এ সংবাদ আমি জানি। কিন্তু তরঙ্গর পক্ষে এখনই বিয়ে করা সম্ভব ছিল না।'

'কেন? কেন সম্ভব ছিল না?' রাজীব সান্যালকে কৌতূহলি মনে হল।

'এ বিয়েতে তরঙ্গের মায়ের মত নেই। তার কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন। সেটাও বলছি। মাস দুই-তিন আগে তরঙ্গের মা হঠাৎ একটা চিঠি পান। একটা উড়ো চিঠি। পত্রলেখক তার নাম-ঠিকানা দেয়নি। সে লিখেছে যে তরঙ্গ সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছে। নিখিলেশ সেন নামে একটি ছেলের সঙ্গে জমাটি পরিচয় তার। দুজনে গভীর প্রেম। কিন্তু নিখিলেশ সেন আসলে একটি লম্পট। প্রেমের অভিনয় করে বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে সে। এমন কি কলকাতার কোন এক ঠিকানায় তার বউ পর্যন্ত আছে।'

—চিঠি পেয়ে তরঙ্গের মা কী করলেন?

—কিছুদিন আগে দিকনগরে এসেছিলেন তিনি। মেয়েকে কী বললেন জানি না। আমাকে আড়ালে চিঠিটা দেখালেন। মুখ শুকনো করে বললেন, কী হবে বলো দিকি মা?

—আমি চিঠিটা পড়ে হাসলাম। বললাম, কী আর হবে বলুন? তলে তলে জল যে অনেকদূর গড়িয়েছে মাসিমা।' উনি ভয় পেয়ে বললেন, তরঙ্গ তা হলে ছুটি নিয়ে কিছুদিন কলকাতায় চলুক। সেই বোধহয় ভাল হবে।'

—খুনের সংবাদ পেয়ে তরঙ্গর মা দিকনগরে এসেছেন না?

সুজাতা দাস ঘাড় নাড়ল। বলল, 'এসেছেন ওঁর এক ননদের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এলে কী হবে, এবার মাসীমার অন্য মূর্তি। শোকে তাপে যেন পাগল হয়ে গেছেন। তরঙ্গের মৃতদেহটা দেখে হাউ-হাউ করে কতক্ষণ কাঁদলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কলকাতায় পালিয়ে চলো মা। এখানে তোমরা কেউ বাঁচবে না। দিকনগরে রাক্ষস এসেছে। আমার তরঙ্গকে খেয়েছে, এবার তোমাদেরও গলা টিপে খাবে।'

রাজীব সান্যাল মাথা নিচু করে বলল, 'ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই খুব শক্ড্ হয়েছেন?'

—স্বাভাবিক মিঃ সান্যাল। তরঙ্গ ওঁর একমাত্র মেয়ে। ছেলেটি এখনও নাবালক। ক্লাস টেন-এ বোধহয় এবার উঠেছে। মাইনে পেয়ে তরঙ্গ ফি মাসে ওঁকে টাকা পাঠাত। সেই টাকা পেলে মাসিমার অনেক খরচ চলত। এমনি একটা রোজগেরে মেয়ে যদি হঠাৎ দেশলাই কাঠির আলোর মত ফস করে শেষ হয়ে যায় তাহলে মায়ের মনে কি হয় ভাবতে পারেন? আর তাছাড়া মৃত্যু যদি এমন নির্মম অস্বাভাবিক হয় তাহলে কষ্ট যে চতুর্গুণ হয়ে দাঁড়ায়।

—নিখিলেশ সেনকে আপনি তাহলে সন্দেহ করেন মিস দাস?

—কিছুটা করি বৈকি মিঃ সান্যাল। তরঙ্গকে চিঠি লিখে সে দেখা করতে বলেছিল। রাত দশটায় সুদামডির মোড়ে তার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, কেউ জানে না। পরদিন সকালে তরঙ্গকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সুতরাং নিখিলেশ সেনকে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাবতে আপত্তি কোথায়?

—নিখিলেশ সেন কি এখানে আসত? তরঙ্গর সঙ্গে দেখা-টেখা করতে?

—একবার বোধহয় এসেছিল, আমি তরঙ্গকে বারণ করেছিলাম। মেয়েদের মেসে কোনো পুরুষ মানুষেরই হুট করে ঢোকা শোভন নয়।

রাজীব সান্যাল প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল। বলল, 'নিখিলেশ ছাড়া আর কোনো লোকের সঙ্গে তরঙ্গ মিশত?'

—দিকনগর পেপার মিলে কত লোক কাজ করে, অনেকের সঙ্গেই তো মিশি আমরা। তরঙ্গও মিশত, গল্প-গুজব করত। অফিসে কাজ করতে এসে পুরুষমানুষের মুখ দেখব না বললে তো চলে না!

'আচ্ছা, এই পেপার মিলে কাজ করে না এমন কেউ?' রাজীব শেষ শব্দটি একটু টেনে উচ্চারণ করল।

সুজাতা দাস এক মুহূর্ত চিন্তা করল। বলল, হ্যাঁ। একজনের কথা আপনাকে আগেই বলা উচিত ছিল। ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্ক ভট্‌চায। নিখিলেশ সেনের খুব বন্ধু। এক বাড়িতেই নাকি থাকেন দুজনে। তরঙ্গের খোঁজে এ বাড়িতে দু-তিনবার এসেছেন ভদ্রলোক। একবার কি দুবার অফিসেও হানা দিয়েছেন। এই তো কিছুদিন আগে টেলিফোনে ভদ্রলোকের গলা শুনে আমি অবাক। উনি ভেবেছেন টেলিফোন বোর্ডে তরঙ্গ আছে। লাইন ধরে আমি অবশ্য বলেছিলাম যে অকারণে ফোন করলে কর্তৃপক্ষ খুব বিরক্ত হন।'

—'শশাঙ্ক ভট্‌চাযকে আপনার কী মনে হয় মিস দাস?'

খুব বিরক্তিকর একটা মুখভাব হল সুজাতার। চোখ দুটোতে কিছুটা ঘৃণাও যেন মেশানো। সুজাতা বলল, 'কেমন যেন গায়ে পড়া ভদ্রলোক। তরঙ্গের সঙ্গে মিশতে চান, অথচ তরঙ্গ ওকে এড়িয়ে চলত। নিজে সেধে কি সব পত্রিকা-টত্রিকা দিয়ে যেতেন ওকে। গল্প না কবিতা কি যেন লেখার বাই আছে ভদ্রলোকের। তরঙ্গ আবার ওই সব ছাইপাঁশ পড়ত। আমাকে পড়ে শুনিয়েছে কতবার। আমি আপত্তি করলেও শুনত না। ওই ওর স্বভাব। ভদ্রলোকের ছাইপাঁশ লেখা পড়ত আর খিলখিল করে হাসত। আমাকে বলত ভদ্রলোকের কাছে ওর লেখার দারুণ প্রশংসা করি। আর একটু প্রশংসা করলেই উনি কাবু।'

—শশাঙ্ক ভট্‌চার্যের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে মিস দাস?

'আলাপ কারো সঙ্গেই তেমন নেই ইনস্পেক্টরবাবু। বিশেষ করে পুরুষমানুষ, মানে ছেলেদের সঙ্গে। তরঙ্গকেও আমি কতবার নিষেধ করেছি। কিন্তু পোড়ারমুখী আমার কথা শুনবে কেন? নিয়তি ওকে টানছে।' একটু দম নিল সুজাতা দাস। বলল, 'শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে এ পর্যন্ত গোনাগুনতি গোটা কয়েক কথা হয়েছে আমার। তাও কথাবার্তা সব তরঙ্গকে নিয়ে। দেখা হলেই নমস্কার করে উনি এগিয়ে আসবেন। কত কষ্টে যে ওকে এড়িয়ে যেতে হয়। তরঙ্গর মত আমি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারি না।'

রাজীব সান্যাল ঘড়ির দিকে তাকাল। আকাশে মেঘ-টেঘের দেখা নেই। ঝিকিমিকি রৌদ্রকণাগুলি মাটিতে ঠিক বৃষ্টির মত টুপ টুপ করে ঝরে চলেছে। হয়তো আবার জল-টল হবে। যা গরম পড়েছে সকাল থেকে। সন্ধের আগে বৃষ্টি না হলে রাত্রে আরো গুমোট বাড়বে। বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত নিস্তার নেই।

রাজীব সান্যাল বলল, 'আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখব না মিস দাস। অনেক প্রশ্ন করেছি আপনাকে, অনেক কথাও বলেছেন আপনি। তদন্তের কাজে এগুলো খুব প্রয়োজনীয় হবে। আর দু-চারটে মাত্র প্রশ্ন আমার। তারপরই আপনি ফ্রি হয়ে যাবেন।'

সুজাতা দাস উত্তর দিল, 'দু-চারটে প্রশ্ন কেন? যে কটা প্রশ্ন ইচ্ছে, তাই করবেন।'

রাজীব হেসে বলল, 'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা শনিবার রাত কটার সময় তরঙ্গ ডিউটিতে বেরিয়েছিল?' সুজাতা দাস যেন তৈরি হয়েছিল। বলল, 'এই প্রশ্নটার উত্তর আমি কাউকে দিতে পারিনি। আপনাকেও পারছি না।'

'না পারবার কোন সঙ্গত কারণ আছে মিস দাস?'

সুজাতা দাস মুহূর্তের জন্য কি ভাবল। 'সমস্ত ঘটনাটা আপনাকে খুলে বলি মিঃ সান্যাল। শনিবার দুপুরে মিনতি আর প্রভা বাড়ি চ'লে যাবার পর আমার একদম ভালো লাগছিল না। ইচ্ছে করল কোথাও একটুকু বেরিয়ে আসি। এই দিকনগর থেকে অন্য কোথাও যাই। কিন্তু যাই বললেই তো আর বেরিয়ে পড়া যায় না। সমস্যা হল কোথায় যাই?'

রাজীব প্রশ্ন করল, 'মিনতি আর প্রভা মানে আপনাদের এই লেডিস মেসের অন্য দুজন মেম্বার?'

'ঠিক বলেছেন। ফি শনিবার ওরা বাড়ি যায়। খুব কাছেই বাড়ি কিনা। মথুরাপুর থেকে দুটো স্টেশন পরেই। ইচ্ছে করলে বাসেই চলে যেতে পারে।'

রাজীব বলল 'তারপর ভেবেচিন্তে আপনি কোথায় গেলেন?'

'কোথায় আবার? মোল্লার দৌড় সেই মসজিদ পর্যন্ত। তিনটের পরই মথুরাপুর যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।' একটু থেমে যোগ করল সুজাতা, 'বাসে উঠে দেখি বেজায় ভিড়। আর তেমনি গরম, ঘেমে নেয়ে সে এক বিশ্রী অবস্থা। মথুরাপুরে বাস থেকে নেমে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

রাজীব বলল, 'তরঙ্গের সঙ্গে তাহলে আপনার তখনই শেষ দেখা?' সুজাতা ঘাড় নাড়ল। 'জানেন মিঃ সান্যাল? তরঙ্গকে আমি মথুরাপুর যেতে বলেছিলাম। একলা বসে ঘরে কী করবে ও? তার চেয়ে দুজনে মিলে মথুরাপুরে যাই। টুকিটাকি যা কিনবার আছে তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি।'

—তরঙ্গ রাজি হল না যেতে?

স্পষ্ট উচ্চারণ করল সুজাতা, 'না।' কয়েক সেকেন্ড পর সে নিজেই আবার বলল, 'ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভবও ছিল না মিঃ সান্যাল। মথুরাপুর প্রায় পঁচিশ মাইল রাস্তা। যাতায়াতে কম সময় লাগে না। তারপর এই ভ্যাপসা গরম আর বাসের ঝাঁকুনি। ফিরে এসে আবার রাত জাগা পাখির মত টেলিফোন লাইনে 'পেপার মিল' কথাটা শুধু আউড়ে যেতে হবে।'

—বাড়ি ফিরে আপনি দেখলেন তরঙ্গমালা ডিউটিতে বেরিয়ে গেছে, এই তো?'

সুজাতা দাস বলল, 'হ্যাঁ, তখন প্রায় দশটা। আমি লাস্ট বাসটায় দিকনগরে এসে পৌঁছোই। এতক্ষণ অবশ্য লাগবার কথা নয়। কিন্তু একটা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে বাসটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি আর আসে না। নইলে হয়তো নটা কিংবা সওয়া নটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যেতাম।'

রাজীব সান্যাল অল্পক্ষণ চিন্তা করল। বলল 'যে মেয়েটি আপনাদের কাজ-কর্ম করে, এ বিষয়ে সে কিছু বলতে পারে না?'

'রান্নাবান্না সেরে দিয়ে কুটির মা আটটা নাগাদ রোজই চলে যায়। শনিবার তো আরো মজা, খাবার লোক বলতে আমরা দুজন। সাতটা, সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওর কাজ-কর্ম শেষ। কেউ না থাকলে ভাত-তরকারি ঢাকা দিয়ে রেখে যায়।'

—ও যখন কাজ সেরে চলে যায়, তরঙ্গ তখন বাড়িতেই ছিল তো?

—হ্যাঁ, তবে বিকেলের দিকে তরঙ্গ নাকি বেরিয়েছিল কোথায়। কুটির মা বলেছে, সন্ধের পর তরঙ্গ ফিরে এসেছিল।

ফস করে রাজীব সান্যাল বলল—'শনিবার মথুরাপুরে কোন দোকানে সওদা করেছিলেন মিস দাস?'

কথাটা শুনেই যেন বদলে গেল সুজাতা দাস। নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত দেখাল, চোখ দুটো উন্মাদ নারীর অক্ষিগোলকের মত চঞ্চল হয়ে উঠল।

সুজাতা দাস অসীম বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'মিঃ সান্যাল, কি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি?'

রাজীব হাসল। 'বিশ্বাস করব না কেন?'

—তাহলে প্রমাণ চাইছেন যে আবার?

'কি জানেন? সাড়ে চারটের সময় মথুরাপুর পৌঁছে রাত আটটা পর্যন্ত দোকানে সওদা করে বেড়ানো একটু আশ্চর্যজনক নয় কি? বিশেষ করে মাসের শেষে।' দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চাইল রাজীব। শনিবারের তারিখটার উপর দৃষ্টি পড়ল তার—আঠাশে আগস্ট।

সুজাতা দাস নিজেই এবার হাসল। বলল, 'আপনার কাছে কিছু লুকোবার উপায় নেই দেখছি মিঃ সান্যাল। বিশ্বাস করুন, কাল বিকেলে মথুরাপুর আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু কেনা-কাটা তেমন কিছু করা হয়নি। আসলে সময়ই পেলাম না। ছুটতে ছুটতে লাস্ট বাসটা অনেক কষ্টে এসে ধরেছি।'

হঠাৎ কোনো দরকারে আটকা পড়েছিলেন নাকি?

'দরকার আবার কী?' সুজাতা দাস পরিষ্কার করে বলল। মথুরাপুর গিয়ে দেখি অগ্রগামী সংঘের উদ্যোগে খুব ভালো একটা ফাংশন হচ্ছে। কলকাতা থেকে নামকরা কজন আর্টিস্ট আনিয়েছে ওরা। রীতিমত হইচই ব্যাপার। প্রবেশ-মূল্যও বেশি নয়। মাত্র দু টাকা। কেনাকাটার কথা মনে রইল না আর। তাছাড়া কেনাকাটা করবার কী বা ছিল? টিকিট কেটে ফাংশন শুনতে বসে গেলাম মিঃ সান্যাল। অবশ্য বেশ সকাল সকালই শুরু করেছিল ওরা।'

রাজীব সান্যাল বলল, 'হ্যাঁ, অগ্রগামী সংঘের ফাংশনের কথা আমি শুনেছি। বোধহয় চকবাজারের কাছে ওরা একটা বিজ্ঞাপন গোছের মস্ত ফিরিস্তি টাঙিয়ে দিয়েছিল।'

সুজাতা একটু হাসল, 'ফাংশন কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল মিঃ সান্যাল। শুনতে বসে বাসের কথা বেমালুম ভুলে গেছি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাতেই মাথা ঘুরে উঠবার জোগাড়। লাস্ট বাসটার মাত্র দশ পনেরো মিনিট দেরি ছাড়তে!'

রাজীব সান্যাল শচীদুলালের দিকে চেয়ে কী যেন ইঙ্গিত করল। নোটবুক বন্ধ করে বাইরে গেল শচীদুলাল। মিনিট তিন-চার পরেই সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল।

রাজীব হেসে বলল, 'সুব্রতর বোধহয় এতক্ষণ এক ঘুম হয়ে গেল?'

সুব্রত চোখটা একবার রগড়ে নিয়ে উত্তর দিল, 'ঘুম কোথায় দেখলেন আবার? ওই জিপের মধ্যে বসে এক চটকা একটু—'

'আহা! আমি কি তোমার নিদ্রার প্রতি কটাক্ষ করছি সুব্রত?' রাজীব সান্যাল রহস্য করল।

সুজাতা দাস চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। এখন দাঁড়িয়ে আছে ও। রাজীব কথা বলবার ফাঁকে ফাঁকে ওকে দেখছিল। লম্বায় প্রায় সুব্রতর মতই সুজাতা। আঙুলগুলো ঢেঁড়সের মত লম্বা এবং মেয়েলি নয়। কালো মোটা মোটা আঙুল। হাতের হাড় বেশ চওড়া, কবজি শক্ত বলেই মনে হয়। দাঁড়াবার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি, মুখের রেখা, শক্ত চোয়াল, দৃঢ় চিবুক, সব কিছুতেই স্পষ্ট পুরুষালী ব্যঞ্জনা।

পাখার নিচে বসেও ঘামে ভিজে উঠেছে সুজাতা। জামাটা স্থানে স্থানে দেহের সঙ্গে লেপটে। কোমরের কাছে সরু এক ফালি কুমড়োর মত অনাবৃত দেহভাগ।

রাজীব সান্যাল বলল, 'মিস দাস বোধহয় ফাংশন আর থিয়েটার খুব পছন্দ করেন?'

সুজাতা দাস মাথা হেলাল। বলল, 'হঠাৎ এ কথা কেন ইনস্পেক্টরবাবু?'

—আচ্ছা, আপনি কি কখনও মিলিটারি অফিসারের পার্ট করেছিলেন থিয়েটারে?'

খুব অবাক হয়ে সুজাতা বলল, 'কেন বলুন তো?'

দেওয়ালে টাঙানো মিলিটারী অফিসারের ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল রাজীব সান্যাল।

পিছন থেকে শচীদুলাল প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই ছবিটা মিস দাসের বলে ভাবছেন নাকি স্যর?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম, এখন সন্দেহাতীত, 'রাজীব সান্যাল সামান্য হাসল। 'খুব খুঁটিয়ে না দেখলে

অবশ্য চেনা মুশকিল মিস দাস। আপনার কপালের ঐ কাটা দাগটাই আমাকে সাহায্য করেছে। মেক-আপের সময় এই সামান্য খুঁতটুকু রাখতে গেলেন কেন?'

সুজাতা দাস গম্ভীর হয়ে বলল, 'কলকাতার যে অফিসে ছিলাম, সেখানে স্পোর্টসের সময় তোলা হয়েছিল ছবিটা। গো অ্যাজ ইউ লাইক, একটা ইভেন্ট ছিল। আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম সেবার। সবাই খুব প্রশংসা করেছিল।'

রাজীব সান্যাল হেসে বলল, 'আমিও প্রশংসা করছি আপনার। পুরুষের ছদ্মবেশে সত্যি আপনাকে চেনা শক্ত। আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও কম্মো নয়। ভুরু কুঁচকে রাজীব সান্যাল কী যেন ভাবল। বলল,—সত্যি, প্রায় নিখুঁত ছদ্মবেশ আপনার। আচ্ছা, বাই বাই—।'

পাঁচ

মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা উড়ন্ত পীরিচের মত বনবন করে ঘুরছিল। চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল রাজীব সান্যাল। চোখ দুটি বুজে কী যেন ভাবছিল। কিংবা হয়তো ঘুমোচ্ছিল রাজীব। বসে বসে মানুষ যেমন ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করে তেমনি একটা প্রয়াস। হঠাৎ চোখ খুলে তাকিয়ে রাজীব সান্যাল সচেতন হল। সময়ের নদীতে কাঠকুটোর মত এমন গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকলে চলবে না। মথুরাপুরে ফিরে যেতে হবে। হাতে এখন কাজ,—অনেক কাজ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজীব বলল, —'সুব্রত, এখন তাহলে ওঠা যাক। তিনটের পর আবার মথুরাপুর থেকে বেরিয়ে পড়ব। তোমার দিকনগরে আসতে চারটে সাড়ে চারটের বেশি হবে না। চলো হে শচী—।' রাজীব সান্যাল উঠবার চেষ্টা করল।

বাধা দিয়ে সুব্রত বলল,—'পাগল হয়েছেন রাজীবদা? এই ভরদুপুরে কে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে? ঘড়িতে ক'টা বাজছে খেয়াল আছে আপনার?'

রাজীবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে শচীদুলাল জবাব দিল,—'সাড়ে বারোটার বেশি স্যর। আমার ঘড়িটা আবার একটু জিরিয়ে জিরিয়ে চলে। এখন প্রায় একটার কাছাকাছি হবে।'

হতাশ ভঙ্গি করে রাজীব বলল, 'তাহলে উপায়?'

সুব্রত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিল, 'উপায় কী আবার? এবেলা আমার ওখানেই দুটি শাক-অন্ন গ্রহণ করতে হবে। তদন্তের কাজ আরো খানিকটা এগিয়ে না দিলে কে আপনাকে দিকনগর ছেড়ে যেতে দিচ্ছে?'

রাজীব সান্যালকে সন্তুষ্ট মনে হল। সে হেসে বলল, 'ব্যবস্থাটা মন্দ করোনি হে সুব্রত। এই দুপুর রোদে তেতে-পুড়ে মথুরাপুরে কখনই বা পৌঁছতাম? আর কখনই বা রওনা হতাম দিকনগরের পথে? অথচ হাতে এখনও অনেক কাজ। সকাল থেকে হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে সময় যে কখন বেরিয়ে গেল টেরই পেলাম না।'

সুব্রত বলল, 'আমি অবশ্য মথুরাপুর থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিয়েছি রাজীবদা। বাড়িতে জানিয়ে দেবে ওরা। মথুরাপুর পৌঁছতে আপনাদের রাত্তির হবে বলে দিয়েছি।'

উৎসাহে রাজীব সান্যাল সোজা হয়ে বসল। 'এতক্ষণে নিশ্চিন্ত করলে সুব্রত। খবর শুনে দিলখুস হল। মার্ডার কেসের তদন্ত করতে এসে কি নাওয়া খাওয়ার কথা ভাবলে চলে? প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন চিন্তার উদয় হচ্ছে মনে। কোনটা ছেড়ে কোনটা নিয়ে শুরু করি, তাই ভেবে থেই পাচ্ছি না।'

শচীদুলাল ধীরে ধীরে বলল,—'আমি কিন্তু আপনাকে বেরোবার সময় বলেছিলাম স্যর। আজ দুপুরের আহার দিকনগরেই সারতে হবে আমাদের। এক সকালে কতটুকু আর তদন্ত হবে?'

রাজীব ওর দিকে তাকাল। বলল, 'তোমার কথা মনে ছিল শচী। কিন্তু আহারপর্ব কোথায় সারা যায় সে-কথা তো বলোনি। হুট করে ওপরওয়ালার দাবি নিয়ে সুব্রতকে তো আর বলা যায় না। আর আমি ওসব পারিনে। দিকনগরে তেমন হোটেল-টোটেল থাকলে না হয় নিজেরাই ব্যবস্থা করতাম।'

সুব্রত সপ্রশংস দৃষ্টিতে রাজীবকে দেখছিল।

রাজীব বলল, 'খুনের তদন্তের তিনটে স্টেজ আছে সুব্রত। ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দাকে এই তিনটে ধাপে ধীরে ধীরে এগোতে হয়। আর একটা কথা। চট করে কোন সূত্র পেয়ে উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করলে চলবে না। একটু পক্ষপাতহীন মন হলে সবচেয়ে ভালো হয়। নইলে আসল খুনিকে ছেড়ে হয়তো কোনো নির্দোষ মানুষকে দোষী ভেবে রাতের ঘুম ছুটে যাবে।'

শচীদুলাল হাসল, 'তিনটে ধাপ কী কী, তা তো বললেন না স্যর।'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে রাজীব সান্যাল বাকী অংশটুকু মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে থেঁতলে দিল। বলল, 'পেটের চিন্তা যখন নেই, তখন মনও হাল্কা । সুতরাং তিনটে ধাপের কথা তোমাকে নিশ্চয় বলব শচী। কতদিন আর আমার সঙ্গে থাকবে চেলা হয়ে? এরপর হয়তো তোমাকে নিজেই তদন্তের ভার নিতে হবে। দু-এক বছরের মধ্যে কোথায় বদলি-টদলি হয়ে যাবে তার ঠিক কী? তখন আর দোয়ারকী নয়,—একেবারে মূল গায়েন হয়ে আসরে নামতে হবে।'

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত নিঃশেষ হল।

রাজীব সান্যাল সুরু করল, 'খুনের তদন্ত সিঁড়ি ভাঙার অঙ্ক নয় সুব্রত যে ধাপে ধাপে উঠে যাবে। বরং একে লুকোচুরির খেলা বলতে পার। খুনী তার অপকর্মের প্রত্যেকটি চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা করছে। আর গোয়েন্দাকে সেই চিহ্ন ধরে অনুসরণ চালিয়ে যেতে হবে। খুনির কাছে এটা হল জীবন-মরণের সমস্যা। আর গোয়েন্দার কাছে এ-খেলা হল বুদ্ধির প্যাঁচে হার অথবা জিত।'

সুব্রত বলল. 'সুতরাং এমন শক্ত প্যাঁচ দিতে হবে রাজীবদা, যেন খুনি কিছুতেই তা না ধরতে পারে।'

রাজীব সান্যাল মাথা হেলিয়ে সায় দিল। বলল, 'ঠিক তাই। খুনের তদন্তের প্রথম ধাপে অবজার্ভেশন বা পর্যবেক্ষণটাই বড় কথা। অবজার্ভেশন করেই তুমি যদি সাত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আস, তাহলেই বুদ্ধির খেলায় খুনির কাছে তুমি বোকা বনে যাবে। কাজেই পর্যবেক্ষণ বা অবজার্ভেশন করে চট করে কোন সিদ্ধান্তে আসা চলবে না। আরো ভাবো। মনের সব দ্বারগুলি খুলে দিয়ে চিন্তা শুরু করো।'

সুব্রত প্রশ্ন করল, 'অবজার্ভেশন শেষ হবার পর কী শুরু করতে হবে রাজীবদা?'

রাজীব সান্যাল হেসে উত্তর দিল,—'এখন দ্বিতীয় ধাপে তদন্ত চলছে আমাদের। অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপ হল ইন্টারোগেশন বা জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে পারবে তুমি। অবজার্ভেশনের সঙ্গে ইন্টারোগেশন যুক্ত হলে দেখবে রহস্য অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ভোর হবার আগে অন্ধকার যেমন একটু ফিকে হয়ে আসে তেমনি মনে হবে তোমার।'

'আর তৃতীয় ধাপে স্যর?' শচীদুলাল উৎসুক চোখে তাকাল।

'তৃতীয় ধাপ মানেই সব শেষের কথা শচী। শেষ ধাপ হল ইনফরমেশন বা সংবাদসংগ্রহ। তৃতীয় ধাপে সংবাদসংগ্রহই কাজ। তোমাকে সংবাদসংগ্রহে মনোযোগী হতে হবে শচী। মিলিয়ে দেখতে হবে পর্যবেক্ষণ আর জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্যে উপনীত হয়েছ, তার সঙ্গে সংবাদের ঠিক মিল আছে কি না।'

সুব্রত বাধা দিয়ে বলল, 'এত ধীরে ধীরে বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোবার সময় কই রাজীবদা? কাজের চাপে হাই পাচ্ছি না, এত ভেবে মাথা ঠাণ্ডা করে চলতে সময় কোথায়? আমাদের হল, দে গরুর গা ধুইয়ে—!'

রাজীব সান্যাল হাসল। —'খুনের তদন্তের কিনারা ওঠ ছুঁড়ি তোর বে'র মত নয় সুব্রত। সময় করে নিতে হবে। আবার অত সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে হয়তো দেখবে শেষ রক্ষা হল না। কারণ অনেক সময় খুনীরা গোয়েন্দার চেয়েও বুদ্ধিমান। তবে আমরা বলি গোয়েন্দার সহায় ঈশ্বর, অর্থাৎ ভগবান তার সঙ্গে। আর খুনির পিছনে শয়তান, তার অপকর্মের ইন্ধনদাতা।'

জামার বুকের শাদা ঝিনুকের বোতামগুলি খুলে দিয়ে রাজীব সান্যাল একটু হাল্কা হতে চাইল। কয়েকবার জোরে জোরে বাতাস নিল। বলল, 'এখন তরঙ্গ হত্যারহস্যের কিনারা করতে পারলে হয়। অপরাধী কি ধরা পড়বে?'

সুব্রত জবাব দিল, 'রাজীবদা, ওসব চিন্তা রাখুন। স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়া করবেন চলুন। খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে আবার খুনির পিছনে ধাওয়া করবেন। আর দু-এক ঘন্টার মধ্যে খুনি তো দেশ জুড়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে না।'

রাজীব সান্যাল রসিকতা করল। 'সকাল থেকে যেভাবে ভূত তাড়ানো মন্ত্র আউড়ে চলেছি সুব্রত, তাতে আর খুব একটা ভরসা নেই। ভূত না গেরস্থর বাড়ি ছেড়ে শেষে পগার পার হয়।'

বাইরে উজ্জ্বল তপ্ত দুপুর। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজীব সান্যাল একটা আরাম চেয়ারে গড়িয়ে নিচ্ছিল। জানালা দিয়ে তাকালে বহুদূরে দৃষ্টি ছুঁয়ে আসে। দিকনগর থানাটা প্রায় এক প্রান্তে। একদিকে মাঠ, ...মাঠের শেষে কি একটা গ্রামের মত ছবি। ওদিকে আদিগন্ত প্রান্তরের মধ্যে ভুইফোঁড় বিচিত্র এক অতিকায় প্রাণীর মত কোলিয়ারির চানখ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বয়লার ঘরের চিমনী বেয়ে দানবের নিঃশ্বাসের মত ধোঁয়া উঠেছে। দিকনগর পেপার মিলটা সম্ভবত পিছনে। নাহলে শুয়ে শুয়ে রাজীব পেপার মিলের চারপাশের উঁচু কম্পাউন্ড দেওয়ালটা দেখতে পেত। কি খেয়াল হ'তে রাজীব সান্যাল মাথা উঁচু করে চাইল। নীল আকাশে একটুকরো শাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মত অলসভাবে ভেসে চলেছে। ঘরছাডা কোন পথিকজনের মত মেঘটা অজানা অচেনা নিরুদ্দেশের পথ ধরেছে।

কতক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে ছিল রাজীবের খেয়াল নেই। একদিকে দৃষ্টি পড়তেই রাজীব সান্যাল চমকে উঠল। কে একটা লোক দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছে। রাজীব সান্যাল উঠে বসতেই লোকটা মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। তারপরই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা,—এক দৌড়ে একটা বাড়ির আড়ালে গিয়ে পড়ল। এরপরই তাকে আর দেখা গেল না।

চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করল না রাজীব। ইচ্ছে করলে এক ডজন সিপাই পাঠানো যেত সন্দেহজনক লোকটাকে ধরে আনতে। কিন্তু লোকটার পাত্তা কোথায়? রাজীব সান্যাল তাতে দু-তিন সেকেন্ডের মত দেখেছিল। তারপরই ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল সে। এখন অন্য পোশাকে দেখলে রাজীব সান্যাল কি তাকে চিনতে পারবে? সিপাইদের সাধ্য কি লোকটাকে শনাক্ত করে?

রাজীব সান্যাল বাইরে এসে দাঁড়াল। থানা থেকে নেমে রাস্তায় পা দিল। এদিকে ওদিকে তাকাল রাজীব সান্যাল। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করল। দ্বিপ্রহরে দিকনগরে শূন্য নগরের দশা। লোকজন কই? মাঝে মাঝে পথের উপর ধুলোর ছোট ঘূর্ণিঝড়। বেলা দুটোয়, ভাদুরে গরমে সমস্ত দিকনগরটা পথশ্রান্ত বুড়োমানুষের মত ঝিমোচ্ছে।

মনে মনে চিন্তা করছিল রাজীব। লোকটা কে? তার উপর নজর রাখছে কেন? উদ্দেশ্য কী লোকটার? সম্ভবত খুনি আসামীর কোন চর। কিংবা আসামী নিজেই। দিকনগরে সুব্রতর কতজন

ইনফর্মার রয়েছে? সংবাদ সংগ্রহে কতখানি সাহায্য করতে পারে ওরা? রাজীব সান্যালের মনে হল, দিকনগরে অনেক আগেই কয়েকজন ভালো ইনফর্মার তৈরি করা উচিত ছিল তার। গাফিলতিতে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। এখন সুব্রত যতদূর সাহায্য করতে পারে তাই ভরসা।

বেলা আড়াইটে বাজতেই রাজীব সান্যাল শচীদুলালকে ডাকল। বলল,—'সুব্রত কোথায়? তরঙ্গের মাকে এবার নিয়ে আসতে বলো। তার সঙ্গে দরকারি কথাগুলো সেরে নিই।'

সুব্রত এল মিনিট দশেক পরে। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল সুব্রত। তার এত্তেলা পেয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে উঠে এসেছে। জল ছিটিয়ে ঘুম তাড়িয়েছে চোখ থেকে, কিন্তু ঘুমকাতুরে মুখটা এখনও সহজ স্বাভাবিক হয়নি। চোখ থেকে সরে ঘুম এখন সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুব্রত বলল,—'তরঙ্গের মা আর দাদাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি রাজীবদা। দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন।'

—ওরা কোথায় এখন?

—পেপার মিলের গেস্ট হাউসে।

—কখন কলকাতা যাচ্ছেন খবর নিয়েছ?

—আজই, সন্ধের পর—

রাজীব সান্যাল গম্ভীরমুখে চিন্তা করছিল। তরঙ্গের হত্যারহস্যটা যেন ধীরে ধীরে আরো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সে ভেবেছিল জট পাকানো সুতোটা একটু একটু করে খুলতে পারছে। রহস্যের জমাট অন্ধকার এবার বোধহয় গলতে শুরু করল। কিন্তু কোথায় কি? এখন মনে হচ্ছে যে তিমিরে সে ছিল, সেই তিমিরেই ঢাকা পড়ে আছে। পথ-টথ সব অন্ধকার,—সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা। পা টিপে টিপে কোনদিকে এগোবে রাজীব? কোন পথে?

থানার সামনে একটা সাইকেল রিকশ এসে থামল। অলক্ষ্যে সেদিকে তাকাল রাজীব। এক বিধবা ভদ্রমহিলা আর একটি যুবক। রিক্‌শ থেকে নামল ওরা, রাজীব সান্যাল বুঝল, তরঙ্গের মা এবং তার সেই পিসতুতো দাদা। ভদ্রমহিলা মুখ তুলে তাকাতেই রাজীব দেখল ভালো করে। তরঙ্গের ছবি-টবি এখনও দেখেনি রাজীব। মৃতা তরঙ্গের মুখে সৌন্দর্যের কোনো চিহ্ন সে খোঁজেনি। সে অনুসন্ধান করেছিল আঘাতের দাগ-টাগ। মরবার সময় কত যন্ত্রণা আর কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা।

তরঙ্গের মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রাজীব নিঃসন্দেহ হল। এমন মায়ের মেয়ে সুন্দরী না হয়ে যায় না। সুব্রত ঠিকই বলেছিল, তরঙ্গকে দেখলেই আবার দেখতে ইচ্ছে করবে। কম বয়সে ভদ্রমহিলা যে রীতিমতো সুন্দরী ছিলেন, তা মুখ দেখলেই আঁচ করা যায়। এখন অবশ্য বয়স হয়েছে। শোকে তাপে এবং বয়সের চাপে সৌন্দর্যের অনেকখানিই ধুয়ে মুছে নিঃশেষ। তবু অবশিষ্ট যা আছে, তাই বা কম কী? অপরাহ্ণের শেষ আলোয় বসুমতী কি কম শ্রীময়ী?

উনি চেয়ারে বসবার পর রাজীব বলল, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম একটু। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গেস্ট হাউসে যাওয়াই উচিত ছিল আমার। কিন্তু উপায় ছিল না। গোপনীয়তা রাখবার জন্য এ কাজ করতে হয়েছে। মার্জনা করবেন।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, 'কষ্টের আর বাকি কিছু নেই। যা দুঃখ কষ্ট সারাজীবন পেয়ে এলাম তার কাছে কোন কষ্টই অসহনীয় নয়।' কথা শেষ হতেই ম্লান হাসলেন ভদ্রমহিলা। বিষণ্ণ, ভার-ভার হাসি।

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে রাজীব কী ভাবল। বলল, 'আমি সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। আপনার মেয়ের হত্যার তদন্তের ভার পড়েছে আমার উপর। কিন্তু তদন্তের মানে হল অন্ধকূপের অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোর রেখা খুঁজে বেড়ানো। আর গোয়েন্দা তো

সবজান্তা জ্যোতিষী নয়। যে ছক কেটেই মুহূর্তে খুনির নাম-ঠিকানা বলে দেবে। তাকে পথ চলতে হয় আরো দশজনের মত পা ফেলে। তার ভরসা পঞ্চজনের সহযোগিতা।'

'আমি কি সাহায্য করতে পারি বলুন? মেয়েটা নৃশংসভাবে খুন হল। কে ওকে জোর করে সরিয়ে দিল পৃথিবী থেকে? রূপ থাকলেই তার সর্বনাশ করতে হবে ইন্সপেক্টরবাবু? আমি জোর করে বলতে পারি, তরঙ্গ আমার কারো অনিষ্ট করেনি। ওর কোনো দোষ ছিল না ইন্সপেক্টরবাবু। সাদাসিধে, বোকাসোকা মেয়েটা আমার। কাউকে অবিশ্বাস করতে পর্যন্ত জানত না।' একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'পাড়াপড়শী বলত,—ও তোমার শুধু তরঙ্গ নয় মা। ও হল রূপের তরঙ্গ। অমন মেয়েকে একা একা দূরদেশে পাঠিও না চঞ্চলের মা।'

রাজীব সান্যাল বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে এই ছেলেটি কে?'

—'আমার ননদের ছেলে। ওকে সঙ্গে নিয়েই এবার দিকনগরে এসেছি। অবশ্য এই শেষ আসা। দিকনগরে এসে আমার তরঙ্গ যে হারিয়ে যাবে একথা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা থামলেন।

রাজীব ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনি যদি একটু ও ঘরে—।' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উঠল। বলল, 'ঠিক আছে। আমি ও ঘরে গিয়ে বসছি। আপনি মামিমার সঙ্গে কথা বলুন।'

ছেলেটি চলে যেতেই রাজীব বলল, 'আপনার কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে মিসেস মজুমদার। আপনি খুব একটা চিন্তা না করে, খোলা মনে প্রশ্নগুলির জবাব দিন।'

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে প্রশ্নের প্রতীক্ষায় রইলেন।

রাজীব বলল, 'আচ্ছা, আপনার মেয়ে তরঙ্গমালাব কত বয়স হয়েছিল?'

চিন্তা না করেই জবাব দিলেন তিনি, 'এই আষাঢ়ে তরঙ্গ তেইশ পূর্ণ হয়ে চব্বিশে পা দিয়েছিল।'

—কলকাতার কোথায় আপনারা থাকেন? নিজেদের বাড়ি ওখানে?

—নিজেদের বাড়ি কোথায় পাবো? ভাড়া বাড়ি। তবে বছর দশ হল বেহালাতেই আছি। উনি মারা গেলেন, তা ছ-সাত বছর হবে। সেও ঐ বাড়িতেই। মেয়ে আর ছোট ছেলেটাকে নিয়ে আমি যেন অকূল পাথারে পড়লাম।

—আপনার ছেলের এখন কত বয়স?

'বছর চৌদ্দ হল। এইবার ক্লাস টেন-এ উঠেছে। লোকের মুখে খবর পেয়ে ছেলেটার কি কান্না। ইন্সপেক্টরবাবু, সে কান্না দেখলে কেউ স্থির থাকতে পারবে না। দিদিকে বড্ড ভালবাসত চঞ্চল। তরঙ্গও চঞ্চল বলতে অজ্ঞান ছিল। একটু থেমে ভদ্রমহিলা বললেন, 'দিকনগরে দিদিকে শেষবার দেখবে বলে কি কান্না তার।' ভদ্রমহিলা রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

রাজীব বলল, 'আচ্ছা, তরঙ্গ মাঝে মধ্যে কলকাতায় যেত না?'

—ফি মাসে একবার করে যেত। কোনো মাসে দুবার,—হ্যাঁ, তাও গিয়েছে, শেষদিকে মাসে দু-তিনবারও এসেছে!

—কলকাতায় গিয়ে বাড়িতেই থাকত ও? না খুব ঘোরাঘুরি করত?

ভদ্রমহিলা কী যেন চিন্তা করলেন। 'দেখুন বছর দুয়েক হল তরঙ্গ দিকনগরে এসেছিল। প্রথমদিকে ফি মাসে একবার করে বাড়ি আসত তরঙ্গ। মাসের প্রথমে, মাইনে-টাইনে পেয়ে। আমাকে টাকাকড়ি দিত। ভাইকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে যেত। সিনেমা দেখত, কিংবা ওর বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি এক চক্কর ঘুরে আসত। কিন্তু—।'

—কিন্তু কী মিসেস মজুমদার?

—ইদানীং কিছুদিন হল তরঙ্গের হাবে-ভাবে আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

—কতদিন এই পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে হয় আপনার?

তা মাস সাত-আটেক হবে। কিংবা আরো কিছুদিন বেশি।' মিসেস মজুমদারকে চিন্তিত দেখাল। একটু ভেবে তিনি ফের শুরু করলেন, 'আগে আগে বাড়ি এলে তরঙ্গ প্রায় ঘরেই থাকত। মাঝে মাঝে অবশ্য বেরোত। কিন্তু বাইরে যাবার জন কোনো চাঞ্চল্য বা ছটফটানি আমি আগে দেখিনি। কিন্তু মাস সাত-আটেক আগে আমার যেন হঠাৎ মনে হল তরঙ্গ খুশি খুশি হয়ে উঠেছে। দুপুরে ভাত খেয়ে দেয়ে উঠেই সেবার আমায় বলল,—মা আমি একটু বেরুচ্ছি। ফিরতে সন্ধে উতরে যাবে। তুমি যেন আবার চিন্তা শুরু কোরো না। ওর চোখের দিকে চেয়ে আমার কী যেন মনে হল। একটা চাপা আনন্দ মেয়ের চোখের মণি থেকে আলোর মত বেরোচ্ছে। তরঙ্গ কিছুতেই সেটা চাপতে পারছে না। আমার সন্দেহ হল ইন্সপেক্টরবাবু। ও কারো প্রেমে পড়েছে। ভালবাসা না পেলে মেয়েরা তো এমন চকমকি ঠোকা আগুনের ফুলকির মত হাসে না। কিন্তু আমাকে কিছু বলছে না দেখে আমিও জোর করলাম না। তিন-চারদিন থেকে তরঙ্গ চলে গেল দিকনগরে। মাসখানেক পরে আবার ফিরে এল ও। তেমনি দুপুরে ভাত খেয়ে দেয়ে আমাকে বলল,—মা আমাকে একটু বেরুতে হবে। আমি বললাম, এই তো এলি সকালে। দুপুরে জিরিয়ে নে। ও হেসে বলল, হেড অফিসে একবার যেতে হবে মা। ম্যানেজারসাহেব একটা কাজ গছিয়ে দিয়েছেন। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল,—জানো মা, এই কাজটা নিয়ে এসেছি বলে যাতায়াতের খরচ কোম্পানি থেকেই পেয়ে যাব। ভাবলাম, হবেও বা। মিছিমিছি মেয়েটাকে দুষছি। কিন্তু—'

রাজীব সান্যাল বলল, 'বলে যান মিসেস মজুমদার। থামলে তো চলবে না।'

ভদ্রমহিলা ম্লান হেসে উত্তর দিলেন,—'হ্যাঁ, বলছি সব। সব কথাই বলব ইন্সপেক্টরবাবু। আমার ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটাকে যে এমন নৃশংসভাবে খুন করে গেল, ঈশ্বর তাকে কখনও অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে দেবেন না। দোষী ধরা পড়বেই, সে বিশ্বাস আমার আছে। একটু থেমে ভদ্রমহিলা শুরু করলেন, হ্যাঁ, যে কথা আপনাকে বলছিলাম। দিন দুই পর চঞ্চল আমাকে আড়ালে বলল, —মা দিদির সঙ্গে এক ভদ্রলোককে বেড়াতে দেখলাম। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কাকে আবার দেখলি সঙ্গে? কোথায় দেখতে পেলি। ছেলে আমার তেমনি লাজুক। অনেকক্ষণ পরে বলল—আমি দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম মা। ওরা দুজনে একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। দিদিকে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক আবার ট্যাক্সিতে উঠে হুস করে চলে গেলেন।'

মিসেস মজুমদার একটু থেমে রাজীব সান্যালের দিকে তাকালেন।

'জল খাবেন মিসেস মজুমদার?' রাজীব তাড়াতাড়ি বলল।

—হ্যাঁ, একটু জল খেতাম—।

আদেশ মত ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল এল সুন্দর কাচের গ্লাসে। ঢক ঢক করে জল খেয়ে গ্লাসটা নিঃশেষ করে দিলেন ভদ্রমহিলা। চোখে-মুখে একটা তৃপ্তির ভাব এল তাঁর। বললেন, 'বেশ ঠাণ্ডা জল। খেয়ে সুস্থ লাগছে।'

কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে রাজীব বলল, 'তারপরে কী যেন বলছিলেন?

'হ্যাঁ। সেদিন সন্ধেয় তরঙ্গকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। ছেলেটি কে? কতদিন ওর সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে? কী করে ও? প্রথমে মেয়ে আমার সব কথা উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু আমি জোর করলাম। খানিক পরেই তরঙ্গ নরম হয়েছিল ইন্সপেক্টরবাবু। নিখিলেশ সেনের নাম সেদিনই আমি প্রথম শুনলাম ওর মুখে। ধীরে ধীরে সব কথা বলেছিল আমায়। কবে আলাপ হল, কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে ওরা। মনে হয় আমাকে কিছু গোপন করেনি তরঙ্গ। আমি বলেছিলাম, —সুজাতা, সুজাতা এসব জানে? ও মুখে হাত দিয়ে আমার কথা বলা বন্ধ করে দিল। বলল, —'দোহাই মা। সুজাতাদিকে এসব কথা একদম বলো না। নিখিলেশকে দু'চক্ষে দেখতে পারে

না সুজাতাদি। শুধু নিখিলেশ কেন? পুরুষমানুষের সঙ্গে দুটো কথা বললেই সুজাতাদির চোখ জ্বালা শুরু হল। অমনি আমাকে শাসন শুরু করে দেবে। ওরা খারাপ...পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।' একটু থেমে ভদ্রমহিলা বললেন,—'কথা বলতে বলতে মেয়ে আমার খিলখিল করে হাসত ইন্সপেক্টরবাবু।' শেষদিকে গলার স্বরটা করুণ শোনাল।

রাজীব বলল, 'সুজাতা আপনার বাড়িতে কখনও এসেছে?'

'হ্যাঁ।' চোখ তুলে এক সেকেন্ড ভেবে ভদ্রমহিলা বললেন, 'একবারই এসেছিল। অনেকদিন আগে। দিন দুই আমাদের বেহালার বাড়িতে ছিল সুজাতা।'

—আচ্ছা, এই সুজাতা মেয়েটিকে আপনার কেমন মনে হয়?

—বেশ ভালো মেয়ে। খুব গম্ভীর প্রকৃতির—আমার তরঙ্গের মত হাল্কা, আমুদে নয়। সুজাতা কারো সঙ্গে বেশি মিশত না শুনেছি। কিন্তু আমার তরঙ্গমালাকে খুব ভালবাসত ও। বড়দিদির মত দেখাশুনা করত।

—আর একটা কথা মিসেস মজুমদার, তরঙ্গর খোঁজে আপনার বাড়িতে আর কেউ কখনও গিয়েছিল?

ভদ্রমহিলা একটু ভাবলেন। যে পথ ধরে জীবনটা আজ এই নিঃস্ব প্রায়ান্ধকার প্রান্তরে এসে পৌঁছেছে, সেই পথ ধরে আবার পিছু হেঁটে যাওয়া কঠিন কাজ। আর শুধু হাঁটা নয়। পথের দুপাশের পরিচিত অপরিচিত মানুষগুলিকে আবার চিহ্নিত করা। তাদের মৃত অবয়বগুলির মুখোমুখি হওয়া।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরই মুখ উজ্জ্বল করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'দিকনগর পেপার মিলের ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী দু-তিনবার এসেছেন তরঙ্গর খোঁজে।'

—বিশেষ কোন দরকারে টরকারে?

—কি দরকারে উনি এসেছিলেন, তা আমি ঠিক বলতে পারব না ইন্সপেক্টরবাবু। তরঙ্গ আমাকে সব কথা খুলে বলত না। কখনও দেখতাম ম্যানেজারের গাড়ি এসে থামলেই তরঙ্গের মুখটা ব্যাজার হয়ে উঠত। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে যেন ঘর থেকে বেরোত তরঙ্গ।

—কোথায় যেত ওরা কিছু জানেন নাকি?

—না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই তরঙ্গ বলত, অফিসের কাজে। আমি বলতাম ছুটিতে এসে আবার অফিসের কাজ কী রে? চোখ মুখ ঘুরিয়ে ও বলত, কী করব বলো মা? মুখপোড়া ম্যানেজারের যেমন অভিরুচি তাই তো হবে। একদিন আমাকে হেসে বলেছিল, জানো মা, বউয়ের সঙ্গে একদম বনিবনা নেই আমাদের ম্যানেজারের। দিকনগরের বাংলোবাড়িতে ও একাই থাকে। বউ থাকে বালিগঞ্জে,—বাপের বাড়িতে। মাঝে মধ্যে অবশ্য যায়। কিন্তু দু-চারদিনের বেশি থাকে না।'

—আর? আর কিছু বলেছিল নাকি তরঙ্গ?

'ও আর কী শুনবেন? কানাঘুষো কথা,—বড় ঘরের কেলেংকারি সব। দিকনগরে সবাই নাকি একথা জানে। মথুরাপুর থেকে মাইল পনেরো দূরে আলোকপুর বলে একটা বড় জায়গা আছে না? সেখানে নাকি প্রায়ই যেতে হয় ম্যানেজারকে। তরঙ্গ বলেছিল ওর আর একটা বউ আছে আলোকপুরে।' ভদ্রমহিলা রহস্য করে হাসলেন।

দিকনগরে উজ্জ্বল অপরাহ্ণ নেমেছে। রোদের তেজ খোলস-খসা সাপের মত নিস্তেজ হয়ে এল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাজীব সান্যাল মোহভরা অপরাহ্ণকে লক্ষ্য করছিল। সারাদিনের ঘাম প্যাচপ্যাচানি গরম এখন প্রায় অন্তর্হিত। থানার বাগানে একটা ঝাঁপালো পাতাবাহার ঝোপের আড়ালে বিচিত্র রংবেরংয়ের কি একটা পাখি উড়ে এসে বসল। রাস্তার ওদিকে একটা তেঁতুল

গাছের উঁচু ডালে হলদে রোদ দিনশেষের নিশানার মত স্থির হয়ে রয়েছে।

নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাজীব বলল, "আচ্ছা মিসেস মজুমদার, আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না। কিন্তু আপনার কলকাতার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যান। প্রয়োজন হতে পারে।'

ভদ্রমহিলা ঠিকানাটা বললেন। রাজীব লিখে নিয়ে ওঁর দিকে তাকাল। কেমন খটকা লাগল মনে। যেন আরো কিছু বলতে চান উনি।

'একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।' মিসেস মজুমদার চিন্তিত মুখে বললেন। 'আমার মনে হয় এটা আপনাকে বলা দরকার—।'

—বেশ তো, বলুন না!

—নিখিলেশের সঙ্গে তরঙ্গের বিয়েতে আমি আপত্তি করেছিলাম। মেয়ে আমার কথা শুনতে চায়নি। গত মাসে কলকাতায় গিয়ে আমাকে একরকম বলেই এসেছিল। সে নিখিলেশ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। কাউকে না—

মৃদু হেসে রাজীব বলল, 'কিন্তু আপনার আপত্তির কারণটা কী? নিখিলেশ ভালো চাকরি করে। ভবিষ্যৎ আছে। তবে?'

—ওর সম্বন্ধে একটা উড়ো চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল নিখিলেশ ভালো নয়, —কলকাতায় নাকি ওর আরেকটা বউ আছে।

রাজীব সান্যাল আবার হাসল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তরঙ্গের বাবার একটা ইচ্ছে ছিল ইন্সপেক্টরবাবু। শেষ ইচ্ছে বলতে পারেন। তরঙ্গকে যে কোনোদিন পেটের জন্য দূরদেশে চাকরি করতে হবে এ আমাদের কল্পনাতেও সেদিন আসেনি। ওঁর ইচ্ছে ছিল, আমারও স্বপ্ন ছিল। তরঙ্গের একটা ভালো বিয়ে দিই। সুন্দর, ভদ্র, একটি ছেলের সঙ্গে। স্বামী আর সংসার নিয়ে সুখে থাকুক তরঙ্গ। কিন্তু—।' ভদ্রমহিলার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

রাজীব সান্যাল বলল, 'মনে মনে কাউকে পাত্র হিসেবে ভেবেছিলেন নাকি?'

মিসেস মজুমদার বললেন, 'চুঁচুড়ায় ওঁর এক বন্ধু থাকেন। স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার। উনি বেঁচে থাকতেই একবার কথাবার্তা হয়। তরঙ্গর তখন কত আর বয়স? ষোলো সতেরো হবে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাও দেয়নি। কথা ছিল কয়েক বছর পরে ওঁর ছেলের সঙ্গে তরঙ্গের বিয়ে দেবেন। ততদিনে ছেলেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।'

—তারপর?

'গত মাসে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম চুঁচুড়ায়। প্রতিশ্রুতি রাখতে উনি রাজি। ছেলেটি এখন কলেজের প্রফেসর। বলুন তো এমন সৌভাগ্য কি সকলের হয়?' ম্লান হেসে উনি যোগ করলেন, 'আমার অবশ্য দুর্ভাগ্যের কপাল। সৌভাগ্য কি ঠাঁই পায়?'

প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে শচীদুলাল থামল। আচমকা একটা ঝোড়ো হাওয়ায় দরজাটা যেন সশব্দে খুলে গেল।

—কী ব্যাপার শচী?

—ঐ রুমালটা স্যর, কাদামাখা ঐ রুমালটা কেচে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি। ও রুমালটা কার জানেন স্যর?

রাজীব কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

চিৎকার করে শচীদুলাল বলল, 'নিখিলেশের স্যর। এই দেখুন, এক কোণে এমব্রয়ডারির কাজ। ছোট্ট একটা ফুল,—তার নীচে এন অক্ষরটা কেমন জ্বলজ্বল করছে, না স্যর?'

ছয়

শচীদুলালের হাত থেকে রুমালটা নিয়ে রাজীব মিসেস মজুমদারের দিকে তাকাল। বলল, 'আগে আপনাকে ছেড়ে দিই। আমার সহকারী শচী ভারি ব্যস্ত লোক। কিন্তু ওর সঙ্গে পরে আলোচনা করলেও চলবে।'

মৃদু হাসল রাজীব। চোখ দুটি অবিচল। ঘটনার তাপে-উত্তাপে নির্বিকার, স্থির—

ভদ্রমহিলা কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন, 'কি রুমালের কথা উনি বলছিলেন ইন্সপেক্টরবাবু? কোথায় পাওয়া গেল রুমালটা?'

'ও কিছু নয়।' রাজীব হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। বলল, 'মাটি খুঁড়তে শুরু করলে এটা সেটা অনেককিছু উঠে আসবে। কিন্তু আসল বস্তুটি বহুদূরে। খনির খোঁজ পেতে হলে অন্তরে যেতে হবে আপনাকে গভীর অভ্যন্তরে।' —রাজীবের দুটি চোখে রহস্যের ঝিলিক দেখা গেল।

মিসেস মজুমদার কী বুঝলেন কে জানে। বললেন, 'আপনি অনুমতি করলে আমরা এখন যেতে পারি তাহলে।'

'বিলক্ষণ', রাজীব সান্যাল সোজা হয়ে বসল, আর দেরি করলে সন্ধের পর যাত্রা করবেন কী করে?' একটু থেমে যোগ করল রাজীব, 'আর মিনিট দশেক আটকাব আপনাকে। তারপরই যেতে পারবেন আপনি।' রাজীবের গলার স্বরে সান্ত্বনার আভাস।

বোধহয় আরো কিছু প্রশ্ন। তারই জবাব দিতে হবে, এই ভেবে মিসেস মজুমদার সোজা হয়ে বসলেন। রাজীব বলল, 'আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করছি। সেই উড়ো চিঠিটা কি আপনার কাছে রয়েছে?'

'উড়ো চিঠি মানে সেই--?'

'হ্যাঁ।' রাজীব কথার খেই ধরে বলল, 'নিখিলেশের সঙ্গে তরঙ্গের মাখামাখি দেখে যে আপনাকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। লিখেছিল কলকাতায় নিখিলেশের বউ রয়েছে—।'

মিসেস মজুমদার সামান্যক্ষণ ভাবলেন। বললেন, 'এখনই ঠিক বলতে পারব না ইন্সপেক্টরবাবু। অনেকদিন হয়ে গেল তো। তবে খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে চিঠিটা। এখন ভাবি কে লিখতে গেল ওটা? কী উদ্দেশ্য ছিল ওর?' কয়েক সেকেন্ড থেমে মিসেস মজুমদার বললেন, 'আচ্ছা, ঐ চিঠিটার সঙ্গে এই খুনের কোনো যোগ নেই তো?'

রাজীব সান্যাল, টেবিলের উপর একটা লাল নীল রঙের পেন্সিল ঠুকছিল। কায়দা করে বলল রাজীব, 'চট করে বলা মুশকিল মিসেস মজুমদার। আমরা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে কেবলমাত্র পথে নেমেছি। গন্তব্যস্থল অনেকদূর।'

'কলকাতায় ফিরে চিঠিটার আমি খোঁজ করব ইন্সপেক্টরবাবু। খুঁজে পেলে ওটা কি পাঠিয়ে দেব আপনাকে?'

মাথা নাড়ল রাজীব। 'তার প্রয়োজন নেই। চিঠিটা পেলে আপনি যত্ন করে রেখে দেবেন। দরকার মনে করলেই আমি আনিয়ে নেব ওটা।'

কয়েক সেকেন্ড দুজনেই চুপচাপ। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রাজীব। একটু চিন্তিত দেখাল তাকে। মস্তিষ্কের কোষে, চিন্তার তরঙ্গের উপর যেন সদ্যোজাত একটি নতুন সূত্র ধীরে ধীরে উঠছে নামছে। কী ভাবতে ভাবতে রাজীব বলল, 'মিসেস মজুমদার, আপনার মেয়ের জিনিসপত্রগুলি একবার দেখব চলুন। প্রয়োজন মনে করলে কয়েকটা কাগজপত্র, সাধারণ জিনিস আমাদের রেখে দিতে হবে।'

ওর জিনিসপত্র কিছুই আমি দেখিনি। বাক্সপ্যাঁটরা খুলে দেখবার মত মনও আমার নেই। দেখেশুনে আপনার যা প্রয়োজন রেখে দিন ইন্সপেক্টরবাবু।

খুব গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ গলায় রাজীব বলল, 'আপনার মনের অবস্থা আমি জানি মিসেস মজুমদার। কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাবেন না। সি. আই. ডি ইন্সপেক্টরকে সাহায্য করছেন আপনি। আপনার নিরপরাধ মেয়েকে যে হত্যা করেছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। আপনিও নিশ্চয়ই তাই চান?'

'কিন্তু আমি কী করতে পারি? কি করা সম্ভব আমার পক্ষে?' প্রায় কাঁদ-কাঁদ মুখে বললেন মিসেস মজুমদার।

'আপনি শক্ত হোন। গভীর দুঃখে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না।' রাজীব সান্যাল শেষের কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে রাজীব মালখানায় এল। বুদ্ধি করে তরঙ্গের বাক্সপ্যাঁটরা, বিছানাপত্র থানায় এনে রেখেছে সুব্রত। জিনিসপত্র মন্দ নয়। একটা চামড়ার সুটকেস, একটা কালো রঙের বড় সাইজের তোরঙ্গ এবং বিছানাপত্র।

'মিসেস মজুমদারকে বসতে একটা চেয়ার দাও সুব্রত।' রাজীব প্রায় আদেশ করল।

চেয়ার এল তখনই, সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্রমহিলা বসলেন। সুব্রতর আদেশে একজন সিপাই এসে তোরঙ্গের চাবি খুলে ডালাটা তুলে ধরল। জামা-কাপড়ে তোরঙ্গটা একেবারে ঠাসবোঝাই। রাজীব অপাঙ্গে চেয়ে দেখল। নানা রঙের সব শাড়ি, জামা, মেয়েদের অন্তর্বাস। কয়েকটা শাড়িতে বেশ সুন্দর নক্‌শা। চিত্রবিচিত্র, রঙবাহার এবং দামী বলে মনে হয়। সুব্রত ধীরে ধীরে একটি করে কাপড়জামা তোরঙ্গ থেকে বের করে নামিয়ে রাখছিল।

তরঙ্গ বেশ সৌখীন মেয়ে ছিল। কথাটা রাজীবের হঠাৎ মনে হল। প্রসাধনের টুকিটাকি নানা দ্রব্য জাদুকরের মত হাতের কায়দায় সুব্রত তরঙ্গের মধ্য থেকে বের করছিল। প্রতিবারই যেন একটা বিস্ময়। এবার সুব্রত কী বের করে আনে তারই জন্য একটা বুকচাপা কৌতূহল।

তরঙ্গ সাজগোজ করতে ভালবাসত। রাজীব নিঃসন্দেহ হল। অবশ্য সেজেগুজে শ্রীময়ী এবং অপরূপ হতে কোন মেয়ে না চায়? সিকি রূপকে প্রসাধনের পরশে যোলো আনা রুপিয়া করে তোলাই তো মেয়েদের কাজ। সুতরাং সাজগোজ করতে তরঙ্গ ভালবাসবে, এ আর এমন বিচিত্র কী? অবশ্য ওরই মধ্যে একটু রকমফের, ইতরবিশেষ আছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি দ্রব্য নামিয়েছে সুব্রত। ছ-সাতটা খোঁপার জাল,—যার সাহায্যে মউচাকের মত সুদৃশ্য খোঁপা রচনা করত তরঙ্গ। চার পাঁচটা সুগন্ধী সেন্টের শিশি। ওর মধ্যে দু-তিনটে তো অব্যর্থ বিলিতি মাল। নিউমার্কেট কিংবা গড়িয়াহাট অঞ্চল থেকে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করতে হয়েছে তরঙ্গকে। ঠোঁটরাঙানো লিপস্টিক, গাল দুটিতে শীতের দেশের লোকের মত লালিমা ফুটিয়ে তুলবার জন্য রুজ রয়েছে দু-তিনটি। নানা ধরনের তিন চারটে পুঁতির মালা, ছোট বড় সাইজের গোটা চার ভ্যানিটি ব্যাগ। প্লাস্টিকের খুব সুন্দর একজোড়া চটি কাগজে মোড়া ছিল। কৌতূহল হতে রাজীব চটিজোড়াটা হাতে নিয়ে দেখল। না, তরঙ্গ ব্যবহার করেনি এটা। প্লাস্টিকের চটিটা এদেশে তৈরি হয়নি। বেশ নিপুণ কাজ চটিতে। রাজীব লক্ষ্য করে দেখল ওটা ফরাসিদেশের কোনো কারখানায় তৈরি হয়েছে। কিন্তু দিকনগরে তরঙ্গের তোরঙ্গে কেমন করে এল এই পাদুকা? ভ্রূ কুঁচকে রাজীব কিছুক্ষণ চিন্তা করল। প্লাস্টিকের চটি কি কলকাতায় কিনেছিল তরঙ্গ? না পাদুকাটি কোনো সঙ্গকামী পুরুষের প্রণয়োপহার? কিনে থাকলে কেন এটা ব্যবহার করেনি তরঙ্গমালা? তোরঙ্গের নীচে এমন লুকিয়ে রেখেছিল কেন বস্তুটি?

সুব্রত তোরঙ্গটি প্রায় খালি করে এনেছিল। নীচের দিকে কয়েকটা বই, কিছু কাগজপত্র, তরঙ্গের

একটা অ্যালবাম। দু তিনটে খামে লেখা চিঠি, কয়েকটা পোস্টকার্ড, উল বুনবার কাঁটা, ছ-সাতটা ন্যাপথলিন বড়ি, একটা ওষুধের খালি শিশি।

রাজীব বলল, 'ওগুলো আমার হাতে দাও সুব্রত।' বইপত্র খুচরো কাগজ, ছবির অ্যালবাম আর চিঠিগুলো সুব্রত এগিয়ে দিল। একনজরে সেগুলি নিরীক্ষণ করে রাজীব বলল, 'মিসেস মজুমদার, এই জিনিসগুলি আপাতত আমাদের কাছে থাকবে। আর হ্যাঁ, ওই প্লাস্টিকের চটি জোড়াটাও। পরে অবশ্য সবই আপনি ফেরত পাবেন।'

বিষাদমাখা কণ্ঠস্বরে ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন,—'কী হবে আর ফেরত নিয়ে? কার জিনিস কার জন্যে নিয়ে যাব ইন্সপেক্টরবাবু? কাকেই বা দেব ওগুলো?'

চামড়ার সুটকেসটায় জিনিষপত্র কম। সুব্রত এবার সেটি নিয়ে বসল। শীতবস্ত্র...নক্শাকাটা কালো রঙের কাশ্মিরী শাল, একটা গোলাপী রঙের কার্ডিগান, উলের মোজা, হাতে বোনা সুন্দর একটা স্কার্ফ, একটা লেডিজ কম্ফর্টার। এ অঞ্চলে শীত প্রচণ্ড, সেজন্য শীতবস্ত্রের প্রয়োজন আছে, এবং সংগ্রহও বেশি।

গরম জামাকাপড়ের নীচে টুকিটাকি দু-একটা অলঙ্কার। দুটো আংটি,—একটা পাথর বসানো সরু গলার হার। একজোড়া বালা। জয়পুরী কাজকরা কানের দুল। খুব সম্ভব এই গয়নাগুলো মাঝে মধ্যে ব্যবহার করত তরঙ্গ। কোথাও যেতে আসতে কিংবা নিমন্ত্রণ হলে বাড়তি গয়নাগুলো অঙ্গে পরে নিত।

রাজীব বলল, 'কলকাতায় গিয়ে তরঙ্গ কি গয়নাটয়না গড়তে দিয়ে আসত?'

'ও কোথায় গয়না গড়াবে?' মিসেস মজুমদার বাধা দিয়ে বললেন, 'যা গয়নাটয়না দেখছেন সব হারু স্যাকরা গড়েছে। টাকাপয়সা জমিয়ে আমি একটু একটু করে গয়না গড়িয়েছি। চাকরি বাকরি যাই করুক। একদিন তো মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছে তখন স্বামীপুত্তুর নিয়ে ঘরসংসার করাই হল শেষ কথা। কিন্তু অভাগীর কপালে তা নেই তো কী হবে?'

'এই গয়নাগুলো কি সব হারু স্যাকরাই গড়েছে? ভাল করে দেখুন তো?' রাজীব অনুরোধ করল।

—গয়নাটয়না সব আমার মুখস্থ। কলকাতায় গিয়ে তরঙ্গ একটা রেখে অন্যটা নিয়ে আসত আমার কাছ থেকে। এই কোলিয়ারি মুল্লুকে গয়নাগাঁটি সঙ্গে আনা ভয়ভাবনার কথা। এইজন্যে আমি ওকে পই-পই বারণ করতাম। গলায় একটা হার, কানে একজোড়া ফঙ্গবেনে দুল। হাতে চারগাছি ব্রোঞ্জের চুড়ি। এর বেশি সঙ্গে রাখবার কি দরকার? যা থাকবে সঙ্গে, তা রইবে আমার অঙ্গে। সুটকেসে বাক্সে গয়না রাখা বুদ্ধিমানের কথা নয় ইন্সপেক্টরবাবু। কিন্তু মেয়ে আমার কথা শুনতে চাইত কি?

রাজীব বলল 'আপনি হাতে নিয়ে গয়নাগুলো পরীক্ষা করুন একবার। সবই হারু স্যাকরার তৈরি তো?'

মিসেস মজুমদার সাগ্রহে হারটা তুলে নিলেন হাতে, 'এই তো হারু স্যাকরার হাতের কাজ। এমন সুন্দর পালিশ, মানানসই করে পাথর বসানো হারু ভিন্ন আর কে পারবে?' ভদ্রমহিলা হারটা রেখে বালাটা দেখলেন, 'এই ছোট ছোট ফুল কোথায় কোন সিনেমায় গিয়ে দেখেছিল তরঙ্গ। কাদের বাড়ির বউমানুষ এমনি বালা পরে বসেছিল ওর পাশেই। হয়তো কোনো বড়লোকের ঘরের বউ-টউ হবে। তারপর থেকে মেয়ের ইচ্ছে হল এমনি একজোড়া পারফোর বালা গড়াবে। শেষে হারু স্যাকরাকে বাড়িতে ডেকে তিন-চারটে ডিজাইনের বই বেছে এই বালা গড়তে দেওয়া হল।'

রাজীব এবার ফুল দুটো এগিয়ে দিল ভদ্রমহিলাকে। সুব্রতকে বলল, 'আচ্ছা তরঙ্গর গায়ে

যে গয়না-টয়নাগুলো ছিল সেগুলো কি দেখেছেন উনি?'

মিসেস মজুমদার নিজেই বললেন, 'নতুন করে দেখবার আর প্রয়োজন নেই ইন্সপেক্টরবাবু। ওগুলো আমি আগেই দেখেছি। আমার তরঙ্গ নেই, ও গয়নাতেও আমার কাজ নেই। ও সব সর্বনেশে জিনিস। ওরই লোভে হয়তো তরঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শয়তানটা।'

রাজীবের ইচ্ছে হল, ওর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে ওকে। তরঙ্গকে খুন করবার পিছনে ওর অলংকার কটি হাতিয়ে নেবার উদ্দেশ্য আততায়ীর কণামাত্রও ছিল না। মোটিভ নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবং সেই মোটিভটা কী, তাই খুঁজছে রাজীব সান্যাল। বহুরূপী ক্যাঁকলাসের মত সেটা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে।

শোকসন্তপ্ত জননীকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। রাজীব নিরস্ত হল। শুধু বলল, 'তরঙ্গের গায়ের গয়নাগুলো সব হারু স্যাকরার হাতের জিনিস ছিল তো?'

ভদ্রমহিলা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

জয়পুরী কাজ করা কানের সেই ঝুমকো দুল জোড়া খুঁটিয়ে দেখা শেষ। মুখ দেখেই রাজীব সান্যাল উত্তরটা আঁচ করল, বেহালার সেই হারু স্যাকরাই হার গড়েছে। এই সুন্দর দুল জোড়াও তার কর্ম। বাকি শুধু দুটো আংটি।

রাজীব বলল, 'নিন, এই আংটি দুটো দেখে শেষ কথা বলুন দিকি। এ দুটো হারু স্যাকরার হাতের জিনিস তো?'

এতক্ষণে রাজীবের মুখটা উজ্জ্বল দেখাল। যা প্রত্যাশা করেছিল তাই যেন এবার খুঁজে পেয়েছে রাজীব। মিসেস মজুমদারের মুখখানা কেমন সন্দিগ্ধ দেখাচ্ছে। যে আস্থার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি, সে ভাব সম্পূর্ণ অদৃশ্য। রাজীবের মনে হল ওষুধে এতক্ষণে কাজ দিয়েছে। ভদ্রমহিলার ভাবান্তর দিবালোকের মত স্পষ্ট।...

দুটো আংটির একটিতে শাদা পোখরাজ পাথর বসানো। অন্যটির উপর পাথর-টাথর নেই। ইংরেজী একটি অক্ষর এনগ্রেভ করা। খুব বেশি সোনা নেই কোনোটিতে। মেরে কেটে সিকি ভরি পর্যন্ত হতে পারে। ভদ্রমহিলা পোখরাজ বসানো আংটি ফেরত দিলেন রাজীবকে। বললেন, 'এটা হারু স্যাকরা গড়েছিল। গত শীতে তরঙ্গ বলল,—একটা পাথর বসানো আংটি ওর চাই।'

'চাই মানে নিজের জন্য তো?'

'না।' ভদ্রমহিলা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমার বেশ মনে আছে ইন্সপেক্টরবাবু। কার বিয়েতে যেন আংটি দেবে বলেছিল তরঙ্গ।'

'বিয়েতে আংটি?'

'ঠিকই বলেছেন। আংটি প্রেজেন্ট করবার মত কি অবস্থা আমাদের? আমি তরঙ্গকে বলেছিলাম সেকথা। কিন্তু মেয়ে আমার কথা শুনল না। বলল, বিশেষ জানাশোনা তার সঙ্গে। দামী কিছু না দিলে সম্মান থাকে না।'

রাজীব পোখরাজ পাথরটা পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'এখন দেখা যাচ্ছে তরঙ্গ আংটিটা কাউকে প্রেজেন্ট করেনি। এতদিন ধরে নিজের কাছেই রেখেছিল।'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। চার দেয়ালের আগল দেওয়া ঘরের মধ্যে থেকে রাজীব যেন ছিটকে পড়েছে বাইরে। জমাট অন্ধকারে ঢাকা একটা প্রান্তরের মধ্যে। শুধু অন্ধকার, ...নিকষ কালো অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলেয়ার আলোর মত একটা নিশানা দপ করে চোখের সামনে জ্বলে ওঠে। পরক্ষণেই কালোছায়া। দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান।

অন্য আংটিটা তখনও ভদ্রমহিলার হাতে। রাজীব বলল, 'মনে হচ্ছে ও আংটিটা হারু স্যাকরার তৈরি নয়।'

মিসেস মজুমদার স্বীকার করলেন ও আংটিটা তাঁর চেনা নয়। কোনোদিন তরঙ্গের কাছে দেখেননি তিনি। এই আংটির বিন্দু-বিসর্গ জানেন না।

রাজীব হাসল। 'জানবেন কেমন করে? আমাদের নিজেদেরই কতটুকু জানি আমরা? তা চাকুরে মেয়ে তো বহু দূরের কথা। তরঙ্গের একটা নিজের জগৎ ছিল মিসেস মজুমদার। আর সে জগতের কী জানবেন আপনি? একটি যুবতী মেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব কিছু মিশিয়ে সে জগতের বুনিয়াদ—। সেখানে আপনিও হয়তো বাইরের মানুষ।'

কোনো উত্তর দিলেন না ভদ্রমহিলা।

রাজী^ বলল, 'এ আংটিটা আমাদের কাছেই এখন থাকবে। আর চিঠিপত্র, বইটই, কাগজটাগজগুলো তো রইল। ওই জুতো জোড়াটাও রেখে দিতে হচ্ছে। সময়ে সব পাবেন।' সুব্রত চামড়ার সুটকেশ থেকে খান কয়েক চিঠি, কয়েকটা হিজিবিজি লেখা স্লিপ কাগজ ও একটা ছবির অ্যালবাম বের করে রাখল।

মিসেস মজুমদার বললেন, 'আমি তাহলে এখন উঠি ইসপেক্টরবাবু। সাড়ে সাতটার বাসটাতেই যাব ভেবেছি।'

রাজীব ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবেন। এমনিতেই আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আশাতীত সহযোগিতা পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। ভবিষ্যতেও পাব বলে আশা রাখি।'

রাস্তা পর্যন্ত রাজীব আর সুব্রত এগিয়ে দিল। রিক্‌শ ডেকে ভদ্রমহিলা আর সেই ছেলেটিকে উঠতে সাহায্য করল সুব্রত।

বেলা যায় যায়। ভাদ্র শেষের অপরাহ্নের বিষণ্ণ আলোটুকু প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। দূরে কোথায় শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। কলরব করে একদল পাখি সম্ভবত নীড়াভিমুখী হয়েছে।

রাজীব বলল, 'সামনের সপ্তাহেই আবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে।'

—কলকাতা যাবেন?

'হয়তো যেতে হবে। আচ্ছা নমস্কার—।' রাজীব দুই হাত জোড় করে হাসিমুখে তাকাল।

থানায় ঢুকে চেয়ারের উপর আয়েস করে বসল রাজীব। পকেট থেকে লাইটারটা বের করল। একটা সিগারেট মুখে দেবার আগে সুব্রতকে বলল, 'তুমিও ধরাও একটা। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে মগজ কিছুতেই সাফ হবে না।'

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে রাজীব চোখ বন্ধ করে কী যেন চিন্তা করতে লাগল। কপালটা কুঁচকে উঠছে। মাঝে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে কপালটা টিপছিল রাজীব। চোখ মেলে চাইল আরো কিছুক্ষণ পরে।

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, নতুন কিছু চিন্তা করছেন নাকি?'

পুরনো কিছু হাতে নেই তো সুব্রত। সুতরাং নতুন পুরনোর প্রশ্ন ওঠে না।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল, 'এখন চিন্তা করছি, সন্ধান করছি—কিন্তু হদিশ পাচ্ছি কই?'

আহত ভঙ্গিতে সুব্রত বলল, 'রাজীবদা কি নিখিলেশকে খুনী বলে সন্দেহ করেন না? রুমালটা পাবার পরেও কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে?' কথা শেষ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে সুব্রত ঘোষণা করল 'আমি জোর করে বলতে পারি, খুনী নিখিলেশ সেন ছাড়া আর কেউ নয়।'

রাজীব ফিক করে হাসল। বলল, 'আধুনিক জীবন ভারি জটিল সুব্রত। খুন হল জটিলতর। একটা পূর্বকল্পিত উদ্দেশ্যমূলক খুনের পিছনে জটিল অভিসন্ধি খেলা করছে। আমি যদি বলি খুনীর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিখিলেশ সেনকেই শেষ করা, তাহলে তুমি কী বলবে?'

অবাক হয়ে সুব্রত বলল, 'তাহলে তো নিখিলেশকেই হত্যা করত সে।

—কী প্রয়োজন? তরঙ্গমালাকে হত্যা করে নিখিলেশকে বেশ ফাঁসিয়ে দিয়েছে খুনী। এখন

নিখিলেশ সেনকে ফাঁসির আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে। দায়রায় সোপর্দ যে হবে তা অবধারিত। এবং বিচারে কী যে রায় হবে তা বলা কঠিন। ফাঁসির দণ্ডাদেশ হবে না এমন কথা কে বলতে পারে? সুতরাং খুনীর উদ্দেশ্য সফল হবার ষোলো আনা সম্ভাবনা।

সুব্রত বিস্ফারিত চোখে বলল, 'বলেন কী রাজীবদা?'

'খুব বেশি চিন্তা করলে এমন আরো অনেক জিনিস মনে আসবে। অবশ্য আমি যা অনুমান করছি তা হয়তো সঠিক নয়। ভ্রান্ত অনুমানও হতে পারে। কিন্তু একটা কথা ঠিক জেনো সুব্রত। ডিম না ভেঙে ওমলেট কোন উপায়েই তৈরি করা যায় না। নিখিলেশ সেনকে যদি ওমলেট ভাব, তাহলে তরঙ্গই হল গোটা ডিম। সুতরাং ডিম ভাঙতে হয়েছে। নাহলে ডিম থেকে ওমলেটে পৌঁছবার জন্য কোনো রাস্তা নেই।'

'কিন্তু চিঠির ব্যাপারটা রাজীবদা। নিখিলেশ নিজে চিঠি লিখে তরঙ্গকে দেখা করতে বলেছিল। সুদামডির মোড়ে তরঙ্গ যেন তার সঙ্গে দেখা করে। রাত দশটার আগে। হাতের লেখা নিখিলেশের কিন্তু। আপনি মিলিয়ে দেখুন।'

'মিলিয়ে দেখতে হবে না।' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজীব বলল, 'চিঠিখানা নিখিলেশই লিখেছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওর মধ্যে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। বুঝলে সুব্রত, চিঠিটা তুমি আমাকে আজ দিও তো।'

সুব্রত বলল, 'এই ব্যাপারটাই আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে উঠছে রাজীবদা। নিখিলেশ চিঠি লিখে আসতে বলল, ওকে। অথচ খুনের সঙ্গে নিখিলেশের কোনো সম্পর্ক নেই ভাবছেন। ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে না রাজীবদা?'

একপাশে চুপ করে বসেছিল শচীদুলাল। অনেকক্ষণ সে কোনো কথা বলেনি। বরং কথা শুনছিল। টুকরো টুকরো কথা। রাজীব যেমন বলছিল—'

হঠাৎ সে বলল, 'আপনি তাহলে কাকে সন্দেহ করেন স্যর?'

রাজীব উদার চোখে হাসল। 'কাউকে না। এত তাড়াতাড়ি সন্দেহ শুরু করলে তদন্তের বারোটা বাজবে শচী। বলছি না তোমাকে? খুনের তদন্তে খোলা মন নিয়ে এগুতে হবে। কাউকে সন্দেহ করলেই মনটা বর্ষার ঘোলা জলের মত কাদাটে হয়ে উঠবে। তখন ভাবনা চিন্তা সব এক বিন্দুতে এসে থেমে যাবে। যাকে সন্দেহ করেছ তাকে ভিন্ন আর কাউকে তুমি দোষী বলে ভাবতে পারছ না।'

খানিকটা সময় অলক্ষ্যে গড়িয়ে গেল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাজীব বলল, আমি শুধু আমার মতটা ব্যক্ত করেছি সুব্রত। তার অর্থ এই নয় যে আমি বেঠিক হতে পারব না। তবে আমার কেমন মনে হচ্ছে নিখিলেশকে খুনি বলে সন্দেহ করার ব্যাপারটা আগাগোড়া সাজানো। স্রেফ চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা।'

সুব্রতর বাড়ি থেকে চা এল। ধূমায়িত তিন কাপ চা। রাজীব সাগ্রহে একটা কাপ টেনে নিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! তোমার চায়ের কথা আমি কেমন করে এতক্ষণ ভুলেছিলাম বলো ত?'

চায়ে চুমুক দিয়ে রাজীব বলল, 'আংটিটা দেখেছ সুব্রত?'

—কোন আংটি রাজীবদা?

—মিসেস মজুমদার যে আংটির কথা বিন্দুবিসর্গও জানেন না বললেন। ভাবছি তরঙ্গ ওটা পেল কেমন করে? এটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সুব্রত।

—হয়তো কোথাও কিনে থাকবে রাজীবদা।

'তরঙ্গ আংটি কিনলে মিসেস মজুমদার জানতে পারবেন না, এটা অমাবস্যার চাঁদের মত অসম্ভব ব্যাপার সুব্রত। শাড়ি গয়নার গল্পের চেয়ে প্রিয় আর কিছু মেয়েদের কাছে নেই।' একটু থেমে

রাজীব বলল, 'আর একটা পয়েন্ট মনে রেখেছ সুব্রত? গত শীতে তরঙ্গ একটা পাথর বসানো আংটি গড়িয়েছিল। মাকে বলেছিল কার বিয়েতে যেন প্রেজেন্ট করবে। পরে দেখা যাচ্ছে, আংটিটা তরঙ্গ কাউকে প্রেজেন্ট করেনি। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, পোখরাজ বসানো আংটিটা প্রমাণ সাইজের। কোনো মেয়ের আঙুলের মাপে ওটা তৈরি হয়নি।'

—আপনি কি বলতে চান আংটিটা তরঙ্গ ওর লাভারকে দেবে বলে তৈরি করিয়েছিল?

'হ্যাঁ তাই। হয়তো কোনো রক্তিম শান্ত সন্ধ্যায় প্রেমিকের আঙুলে ওটা পরিয়ে দেবে বলে তরঙ্গ ভেবেছিল।' রাজীব খুব মিষ্টি করে হাসল।

হতাশ ভঙ্গি করে সুব্রত তাকাল।

উৎসাহ দিয়ে রাজীব বলল, 'কই অন্য আংটিটার কথা তো কিছু বললে না? ওটা দেখনি তুমি?'

টেবিলেই পড়ে ছিল আংটিটা। সুব্রত উল্টেপাল্টে আংটিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

রাজীব বলল, 'আংটিতে একটা ইংরেজি অক্ষর এনগ্রেভিং করা আছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।' সুব্রত চিন্তিত মুখে বলল, 'অক্ষরটা 'এস' রাজীবদা।'

'ঠিক বলেছ সুব্রত। অক্ষরটা 'এস'।' রাজীব সান্যাল 'এস' অক্ষরটার কাছে এসে যেন অকস্মাৎ অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ পরে রাজীব বলল, 'এস' কোনো নামের আদ্যক্ষর। এটা আমরা ধরে নিতে পারি সুব্রত? কী বলো—'

সুব্রত সায় দিল। রাজীব বলল, 'কোন নামের আদ্যক্ষর 'এস' বলো দিকি শচী?'

শচীদুলাল ভাবছিল।

রাজীব হেসে বলল, 'শচীদুলাল আর সুব্রত সরকার দুজনের নামের আদ্যক্ষরই দেখছি এস।' ঘাড় ঘুরিয়ে রাজীব তাকাল সুব্রতর দিকে। বলল, 'কী সুব্রত? তরঙ্গকে কোনোদিন আংটি প্রেজেন্ট করে বসনি তো?' ভাবছি তোমাকেই সন্দেহ করব নাকি?'

শচীদুলাল মুচকি হাসল।

'আপাতত 'এস' অক্ষর দিয়ে তিনটি নাম আমি খুঁজে পাচ্ছি।'

রাজীব মুখ উঁচু করে বলল, 'একটি মহিলার। অন্য দুটি নাম পুরুষের। এদের প্রত্যেকেই তরঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। অবশ্য আরো নাম থাকতে পারে। তাদের এখনও আমরা খুঁজে বের করতে পারিনি।'

'কী কী নাম স্যর?' শচীদুলাল তার দুর্নিবার কৌতূহল ব্যক্ত করল।

বলছি শচী। কিন্তু নামগুলো তো তুমিও জানো। একটি মহিলার। তিনি মিস সুজাতা দাস। অন্য দুটি নামের একটি হল শশাঙ্ক ভট্টাচার্য। শেষের নামটি যার তার সঙ্গে এখনও আমি পরিচিত হইনি। তিনি মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী।' রাজীব সান্যাল খুব গম্ভীর মুখ করে বলল, 'সুব্রত, কালই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো। সুদর্শন চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাদের দেখা করা দরকার। আমার মনে হচ্ছে, সুদর্শন চক্রবর্তী মাস্ট বি অ্যান ইন্টারেস্টিং ম্যান।'

টেবিলের উপর চিঠিপত্র, বইটই, নানা খুচরো কাগজ, প্লাস্টিকের সেই সুদৃশ্য চটি জোড়াও পড়ে রয়েছে। একটা নীলচে কাগজ হঠাৎ চোখে পড়ল রাজীবের। ক্যাশমেমো বলে মনে হল তার। দ্রুত কাগজটায় চোখ বুলিয়ে গেল রাজীব। ক্যাশমেমোই বটে,—একটা নয়, দুটো। স্ট্যাপলার দিয়ে আঁটা বলে নীচেরটা নজরে আসেনি। পড়তে পড়তে রীতিমত উত্তেজিত দেখাল রাজীবকে। প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্যাশমেমোটা পড়ল রাজীব। প্রথমে একটা,—তারপর দ্বিতীয়টাও তেমনিভাবে পড়ল। একটা নামকরা অভিজাত রেস্তোরাঁর ক্যাশমেমো। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে যেখানে সন্ধ্যায় হাল্কা বিলিতি সুর বাজে। সুবেশ নরনারীর দল ভিড় করে। বাজনার তালে তালে মেয়ে পুরুষ কোমর জড়িয়ে

বিদেশি নাচের ছন্দে পা ফেলে। নাচে-গানে, হাস্যে-লাস্যে, রাত্রির প্রথম প্রহর ধীরে ধীরে ভোল পাল্টায়। যুবতী মেয়ের মদির চাউনি দিয়ে আগন্তুককে অবশ নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

পার্ক স্ট্রিটের এই রেস্তোরাঁয় কি তরঙ্গ গিয়েছিল? কিন্তু কার সঙ্গে? ক্যাশমেমোতে দুজনের মত খাবারের উল্লেখ আছে। আর আছে সুরাপানের কথা। অবশ্য এখানে এলে মদ্যপান করাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তরঙ্গ সুরাপান করেছিল কি না বোঝা যাচ্ছে না। সাকুল্যে আড়াই পেগ শেরির উল্লেখ রয়েছে মেমোতে। লোকটি দু' পেগ খেয়ে থাকলে বাকি আধ পেগ কার জন্য? আধ পেগ শেরি কি আনাড়ি তরঙ্গকে দেওয়া হয়েছিল? কিংবা লোকটিই আড়াই পেগ শেরি একাই নিঃশেষ করে উঠেছে।

গম্ভীর মুখে রাজীব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সুব্রত আজ তাহলে উঠলাম হে। কাল আবার দেখা হবে।'

সুব্রত বলল, 'মনে হচ্ছে কী যেন চিন্তা করছেন রাজীবদা।'

'হ্যাঁ।' রাজীব স্বীকার করল। ধীরে ধীরে বলল, 'ভাবছি তরঙ্গমালা মজুমদার বেশ খেলুড়ে মেয়ে ছিল হে সুব্রত।'

সাত

মুখের আকৃতি পানের পাতার মত নয়। লম্বাটে কিংবা ডিমালো তো নয়ই। বরং গোল,—চক্রাকার বললেই ঠিক বলা হবে। তবে ফর্সা। —টুকটুকে ফর্সা। চোখের উপর কম দামী গোল ফ্রেমের একটা চশমা। মেয়েটির বয়স আন্দাজ করতে চেষ্টা করল রাজীব। তেইশ, চব্বিশ,—কিংবা বড় জোর পঁচিশ হতে পারে।

ওর মুখের উপর দৃষ্টিটা এক পলকে বুলিয়ে নিল রাজীব। কেমন ভীরু দৃষ্টি। অপরিচিত মানুষজনকে কাছাকাছি দেখলে পাখিরা যেমন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, পাখা মেলে উড়ে যাবার আগে যেমন সংকুচিত দৃষ্টিতে চায়, মেয়েটি তেমনিভাবে রাজীবকে যেন নিরীক্ষণ করছিল।

একটু আগেই জিপের শব্দ কানে গিয়েছে ওর। গাড়ি থেকে দুজন আরোহী নেমে বারান্দায় উঠেছে। অবশ্য পুলিশের পোশাক দুজনের কেউ পরে আসেনি। সি. আই. ডিতে. আসার পর থেকে রাজীব তো খাকী পোশাকের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। আর সুব্রত? থানার বড় দারোগা হলেও সুব্রত আজ পোশাকের ব্যাপারে দশজনের মতই সাধারণ। পুলিশের ইউনিফর্ম নয়, সুব্রতর পরনে দেশি ধুতি। ঊর্ধ্বাংগে সদ্য পাটভাঙা পাঞ্জাবি।

'আপনার নামই শ্রীমতী প্রভা মুখার্জি?' রাজীব লঘু সুরে আলাপ আরম্ভ করল।

মেয়েটি কথা বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল,—অর্থাৎ সে প্রভা, প্রভা মুখার্জি।

রাজীব বলল, 'সাতসকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম মিস মুখার্জি। কিছু মনে করবেন না। গতকালও আমরা এসেছিলাম। তখন আপনি অফিসে।'

প্রভা এতক্ষণে যেন আগন্তুকদের পুরোপুরি পরিচয় জানল। বলল, 'বুঝতে পেরেছি। সুজাতাদি কাল বলছিলেন আপনার কথা।'

'তাই নাকি?' রাজীব সান্যালকে রীতিমত উৎসাহিত মনে হল। 'কী বলছিলেন উনি?'

'তেমন কিছু নয়।' প্রভা অল্প একটু হাসল। 'সুজাতাদি বলছিলেন খুনের তদন্ত করতে একজন সি. আই. ডি. এসেছেন। ভদ্রলোকের হাজার প্রশ্ন। জবাব দিতে গিয়ে নাজেহাল হবার জোগাড়।'

রাজীব স্মিত হাসল। বলল, 'মুশকিল কাণ্ড তাহলে। দুর্নামে দেশ যে ভরে উঠল। এখন আপনাদের মুখোমুখি হতেই লজ্জা।'

প্রভা স্থিরদৃষ্টিতে রাজীবকে লক্ষ্য করছিল। কথা শেষ হতেই সে উত্তর দিল, 'ওমা! লজ্জা কীসের? খুনের তদন্তই তো আপনার কাজ। আর সেই তদন্তের জন্য প্রশ্ন-টশ্ন তো আছেই।'

রাজীব বলল, 'তাহলে ভরসা পেলাম। এখন নিশ্চিন্তে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি। কি জানেন মিস মুখার্জি, প্রশ্ন করলেই অনেকে ভীষণ বিরক্ত হন। উত্তর দেবার আগেই রেগে টং। তা ঠিক উত্তর পাব কেমন করে?'

'আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?' প্রভা চিন্তিতমুখে বলল।

'নিশ্চয়ই। প্রশ্ন কখনও একতরফা হওয়া উচিত নয়। আর শুধু প্রশ্ন করছি এবং উত্তর শুনছি ভাবলে নিজেকে কেমন একজামিনার বলে মনে হয়।'

'আমাকে প্রভা মুখার্জি বলে জানলেন কেমন করে? আগে কখনও দেখেছেন নাকি?'

তারিফ করার ভঙ্গিতে রাজীব উত্তর দিল, 'সত্যি, বুদ্ধিমতী আপনি। ঠিকই তো, প্রভা মুখার্জি না হয়ে আপনি মিনতি আইচ হতে পারেন। সুতরাং আপনাকে মিনতি আইচ বলে সম্বোধন করলাম না কেন?'

'ঠিক তাই', প্রভা কৌতূহলি হয়েছে মনে হল।

রাজীব বলল, 'শ্রীমতী আইচকে দেখলাম বাজারের দিকে চলেছেন। খুব ব্যস্ত মনে হল।'

—কি আশ্চর্য! আপনি গিনতিকেও চেনেন নাকি?

রাজীব রহস্য করে চোখ দুটি নাচাল, 'চিনি দুজনকেই। শুধু আলাপ পরিচয় এতদিন ছিল না'। হেসে বলল, 'আজ তাও হল।—'

প্রভা মুখার্জি খুব বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিন্তু কবে চিনলেন আমাদের, সে কথা বলবেন তো?'

'কাল রাত্রে। বিশ্বাস করুন, তার আগে আপনাদের চিনতাম না আমি।' রহস্যের আবরণ সরিয়ে আসল কথাটা ব্যক্ত করল রাজীব। 'কাল রাত্রে একটা অ্যালবামে আপনাদের ছবি দেখেছি। অবশ্য সুব্রতও সাহায্য করেছে। সুব্রতকে চেনেন তো? দিকনগর থানার অফিসার-ইনচার্জ। আপনারা যাকে বলেন বড় দারোগা। কিন্তু আপনি সুব্রতকে কখনও দেখেননি?' সহাস্যে সুব্রতর দিকে তাকাল রাজীব।

'ঠিক মনে করতে পারছি না—।' প্রভা মুখার্জিকে আশ্চর্য ভদ্র মনে হল।

ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখল রাজীব। সাড়ে আটটার বেশি। মথুরাপুর থেকে বেরিয়েছে সাতটার আগে। শচীদুলালকে আজ আর সঙ্গে নেয়নি। বিশেষ একটা কাজের ভার দিয়েছে শচীদুলালের উপর। সমস্তদিন খোঁজখবর করুক শচীদুলাল। খুঁজে পেতে যদি সেই লন্ড্রিটা বের করতে পারে তাহলে খানিকটা কাজ হয়। অবশ্য লন্ড্রিটা দিকনগরেরও হতে পারে। কিন্তু দিকনগরের সঙ্গে লন্ড্রিটার যোগ নেই বলেই রাজীবের ধারণা। মথুরাপুরে না হলে অন্য কোন ঠিকানা হবে লন্ড্রিটার। কলকাতার কোনো গলির ঠিকানা হওয়াও অসম্ভব নয়।

হাতে সময় কম। বড় জোর আধঘন্টা হবে। দিকনগর পেপার মিলের অফিস টাইম আর পাঁচটা অফিসের মতই সাধারণ। দশটা থেকে পাঁচটা। সুতরাং নটার পরই প্রভা মুখার্জিকে ছেড়ে দিতে হয়। স্নান-টান, আহারপর্ব রয়েছে। তারপরই মেয়েলি সাজগোজ,—ছিটেফোঁটা প্রসাধন। আর খেয়ে উঠলেই শরীরটা একটু ভারী, আরাম খোঁজে। অতএব ভরা পেটে ঢিমে তালে পথ হাঁটবে প্রভা। এই পথটুকু শেষ করতে দশ থেকে পনেরো মিনিট গড়াবে।

রোদ ঝলমলে দিনটি। ফটফটে নীল আকাশ। শরতের সদানন্দ সকাল। আশ্চর্য লাগল রাজীবের। আজ এতটুকু গরম নেই। গতকালের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হতে পারে না। এই

বারান্দায় বসে কাল কি বিশ্রী ঘামছিল রাজীব। অথচ আজ? ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শের মত ফুরফুরে তাজা হাওয়া সর্বক্ষণ গায়ে এসে লাগছে।

রাজীব সোজা হয়ে বসল। হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে সময়ের ছোট ছোট ভগ্নাংশ মিনিট সেকেন্ড গুঁড়ো বালির মত নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর সতর্ক না হয়ে উপায় নেই।

একগাল হেসে রাজীব বলল, 'আচ্ছা তরঙ্গ মজুমদার তো আপনার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল। তাই না?'

প্রভা মুখার্জি বাঁ দিকের ভ্রূটা ঈষৎ কুঁচকে কী যেন ভাবল। বন্ধু ছিল ঠিকই, তবে প্রিয় বন্ধু বলতে ঠিক কি বোঝায় না জেনে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।'

রাজীব হাসল। বলল,—'প্রিয় বন্ধু বলতে আমি যা বুঝি, সেটুকুই আপনাকে খুলে বলতে পারি মিস মুখার্জি। ধরুন যে বন্ধুর কাছে অবাধে মনের সব কথা খুলে বলা চলে, তাকে আপনি নিশ্চয়ই প্রিয় বন্ধুর পর্যায়ে ফেলতে পারেন।'

—অর্থাৎ আপনি প্রশ্ন কবছেন তরঙ্গের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বা কাহিনিগুলো আমি জানি কি না?

রাজীব সান্যাল সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল। মেয়েদের তুলনায় প্রভা রীতিমত বুদ্ধিমতী, প্রায় মুখের ভাব দেখেই ও মনের কথা আঁচ করতে পারে। এর সঙ্গে কথা বলবার সময় রাজীবকে সতর্ক হতে হবে। এ মেয়েকে কোনো প্রশ্ন করবার আগে প্রশ্নের পিছনে একটা শক্ত ব্যাফল ওয়াল তৈরি করে রাখতে হবে রাজীবকে। নইলে হয়ত প্রশ্নটাই বুমেরাং অস্ত্রের মত তার দিকে তাগ করে ফিরে আসবে।

মন খুলে কথা বলবার চেষ্টা করল রাজীব। 'দেখুন তরঙ্গমালা মজুমদারের খুনের ব্যাপারটা আমাকে রীতিমত চিন্তিত করেছে। এখনও পর্যন্ত যা সূত্রটুত্র পেয়েছি, তা অবশ্য সামান্যই। কিন্তু সেগুলো থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।' একটু থেমে প্রভা মুখার্জির মুখের দিকে চাইল রাজীব। কিন্তু প্রভা মুখার্জিকে অবিচল দেখাল। ভালো করে বিষয়টা না শুনে তার মুখ থেকে মন্তব্য বের হবে আশা করা যায় না।

সুতরাং শুরু করল রাজীব, 'মৃতা তরঙ্গমালা সম্বন্ধে আমার মনে হয়েছে যে মেয়েটি বেশ আলাপী ছিল। কারো কারো সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ ছিল তরঙ্গ। এই প্রসঙ্গে নিখিলেশবাবুর নামটা সর্বাগ্রে এসে পড়ে। আচ্ছা এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু বলতে পারেন আমাকে?'

'দেখুন, একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলি।' প্রভা ধীরে ধীরে মুখ খুলল। 'মৃতের নিন্দা করা অনুচিত এবং হয়তো অন্যায় কাজ। তবু আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সব কথা খুলে বলা দরকার। তরঙ্গ খুব হাসিখুশি আর আলাপী ছিল ঠিকই। কিন্তু মনে মনে ভীষণ দেমাক ছিল ওর। এই দেমাকের জন্য অনেক মেয়ে ওকে আড়ালে খুব অপছন্দ করত।'

—তাই নাকি? কিন্তু কীসের দেমাক? কী নিয়ে বড়াই করত তরঙ্গ?'

প্রভা ঠোঁট টিপে হাসল। —'মেয়েরা কী নিয়ে দেমাক করে তা কি আপনাকে বলে দিতে হবে ইন্সপেক্টরবাবু?'

'ও'। রাজীব অল্প একটু চিন্তা করল।

প্রভা বলল, 'তরঙ্গের জিনিসপত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনি একটা অ্যালবাম খুঁজে পেয়েছেন? যে অ্যালবামে আমার আর মিনতির ছবি দেখেছেন?

'ঠিকই ধরেছেন', রাজীব স্বীকার করল।

'তরঙ্গের ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ্য করেছেন আপনি?'

'নিশ্চয়।'

'ছবির চেয়েও সুন্দর দেখতে ছিল তরঙ্গ। ফটো ওর কোনোদিন ভালো উঠত না। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, তরঙ্গের মত সুন্দরী দিকনগরে একটিও চোখে পড়েনি। সুজাতাদি অবশ্য আরো একটু বাড়িয়ে বলেন। ওর মতে দিকনগর কেন, মথুরাপুর মহকুমায় তরঙ্গের জুড়ি ছিল না।'

—নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তরঙ্গ খুব সচেতন ছিল, তাই না মিস মুখার্জি?

—রীতিমত। সুজাতাদি, এবং আরো কয়েকজন তরঙ্গের রূপ আর সৌন্দর্যের বেপরোয়া প্রশংসা করতেন। এত রূপের স্তুতি শুনলে কার মাথার ঠিক থাকে বলুন?

রাজীব সান্যাল খুব গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবল। বলল, 'মিস দাসকে আমি চিনি প্রভাদেবী। কিন্তু তিনি ছাড়া শ্রীমতী তরঙ্গের রূপমুগ্ধ আর কারা ছিলেন? তাঁরা নিশ্চয়ই পুরুষ?'

'পুরুষ মানুষ নিশ্চয়ই। কিন্তু কার নাম বলব বলুন?' প্রভা ফিক করে হাসল, 'তারা কি দলে কম? তরঙ্গের স্তাবক তো একটি দুটি নয়। কয়েকজন তো প্রশংসায় সোচ্চার। তলে তলে আরো কজন সৌন্দর্য-পূজারী ছিলেন কে বলতে পারে?'

মনে মনে নিজের বাকপটুতার তারিফ করছিল রাজীব। বুদ্ধিমতী প্রভা মুখার্জিকে বেশ খানিকটা কোণঠাসা করা গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল এ মেয়ে ভীষণ চালাক আর তেমনি চাপা। শত চেষ্টাতেও এর মুখ খোলানো যাবে না। কিন্তু, না। ব্রিজ খেলতে বসে ঠিকমত লিড দিতে পারাটাই যেমন কাজের কথা। জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারেও তাই। ঠিকমত বিষয়টিতে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এবং তার জন্য প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থানটিতে সুড়সুড়ি কিংবা প্রয়োজন হলে আঘাত করা প্রয়োজন। রাজীব বুঝতে পেরেছিল মনে মনে প্রভা মুখার্জি বেজায় ঈর্ষাপরায়ণ। তরঙ্গের সৌন্দর্য প্রশস্তি দীর্ঘদিন ওকে রীতিমত পীড়া দিয়েছে।

রাজীব বলল, 'বেশ তো। যে কজন পূজারীকে আপনি জানতেন তাদের কথাই বলুন। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি মিস মুখার্জি। যা কিছু আমাকে বলবেন, তা কাকপক্ষীতে টের পাবে না।'

প্রভা মুখার্জিকে সামান্য অস্থির দেখাল। অনিচ্ছায় যেন মুখ খুলতে হচ্ছে ওকে। রাজীব দৃশ্যটা উপভোগ করল। একটা বুনো পায়রা কেমন সুন্দর পোষ মেনেছে। খাঁচায় ঢোকবার আগেই যা ছটফটানি।

এদিক ওদিক চেয়ে প্রভা বলল, 'আমাদের অফিসের ভৈরব দত্তকে চেনেন আপনি? উনিও তরঙ্গের মতই টেলিফোন অপারেটর। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে—বছর চল্লিশ তো হবেই। বরং দু-চার বৎসর বেশি। বাড়িতে বউ রয়েছে। দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে এইবার নাকি স্কুল ফাইনাল দেবে। অথচ—।'

—অথচ কী?

'কী আবার!' তরঙ্গ বলতে ভদ্রলোক একেবারে অজ্ঞান। যখন তখন যেন তরঙ্গের হুকুমের চাকর। তরঙ্গের মুখ থেকে কথা খসবার তর নেই। ভদ্রলোক ছুটে যাবেন সবার আগে। কেউ যদি তরঙ্গের নিন্দে করে তাহলে আর কথা নেই। উনি তখনই রুখে দাঁড়াবেন, প্রায় আস্তিন গুটিয়ে ছুটে যান আর কি!'

রাজীব মজা অনুভব করল। বলল, 'এ বিষয়ে তরঙ্গমালার কী মত ছিল? কিছু বলেছিল আপনাকে?'

প্রভা এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করল। বলল, 'দেখুন পরের ব্যাপারে আমি সাধারণত মাথা ঘামাই নে। কিন্তু ভৈরব দত্তের আদেখলেপনা আমিও একদিন সহ্য করতে পারিনি। তরঙ্গকে

স্পষ্ট বলেছিলাম, নিখিলেশ সেনের সঙ্গে প্রেম করছিস ভালো কথা। কিন্তু এইসব বুড়ো হাবড়াগুলোকে কেন লাই দিয়ে বাঁদর নাচাচ্ছিস?'

—তরঙ্গমালা কী উত্তর দিয়েছিল?

নাক কুঁচকে একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাল প্রভা। বলল, 'তরঙ্গকে লোকে যতখানি নিপাট ভালোমানুষ বলে মনে করত আসলে কিন্তু ও তার উল্টো। সাদা-সরল মোটেই ছিল না তরঙ্গ। আমি বলতেই এমন একটা ভাব দেখাল যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। বলল,— কী করতে পারি বল? ওরা যদি নিজেরাই নাচানাচি শুরু করে, তাহলে আমার কী দোষ? ভাবলাম ফটো তোলার কথাটা এই সুযোগে বলি—।'

বাধা দিয়ে রাজীব বলল, 'ফটো তোলার কথা মানে? কী ফটো,—কার ফটো?'

—বলছি ইন্সপেক্টরবাবু। ভৈরব দত্তের একটা বিলিতি ক্যামেরা আছে। ফটো তোলায় হাত আছে ভদ্রলোকের। চেষ্টা করলে সে লাইনে হয়ত উন্নতিও করতে পারতেন। আপনি তো ওর হাতের ছবি দেখেছেন। তরঙ্গের যে অ্যালবামটা পেয়েছেন, তার সবই তো প্রায় ভৈরব দত্তের হাতে তোলা। ভালো না ছবি?

রাজীব সায় দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই ভালো। খুব ভালো ছবি।'

—তরঙ্গের যেন ছিট ছিল মাথায়। ফি মাসে ওর ছবি তোলানো চাই। ভৈরব দত্তকে হুকুম করবার অপেক্ষা মাত্র। হপ্তা শেষ হবার আগেই ফিল্ম কিনে ভৈরব দত্ত এসে ওকে পাকড়াও করত। নিজের ছবি, আমাদের ছবি,—সকলের গ্রুপ ফটো। সব মিলিয়ে সে যেন এক উৎসব ইন্সপেক্টরবাবু।

—আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব?

—কি জিজ্ঞেস করবেন? বলুন না!

—গতকাল সুজাতা দেবী কিন্তু ভৈরব দত্তের কথা একবারও আমার কাছে বলেননি। শুধু নামটা একবার উল্লেখ করেছিলেন। এর কারণ কিছু অনুমান হয় আপনার?

প্রভা মুখার্জি বিনীতভাবে হাসল। বলল, 'না। কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। হয়ত ভৈরব দত্তের বয়সের জন্যই ব্যাপারটা তেমন দৃষ্টিকটু মনে হয়নি সুজাতাদির। নইলে তরঙ্গের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা তো সবাই জানে। তবে—।'

—তবে কী মিস মুখার্জি?

প্রভা গলা নামিয়ে বলল, 'দেখবেন, একথা যেন পাঁচকান না হয়। ভৈরব দত্ত ম্যানেজারের লোক। কেউ কেউ বলে, সুদর্শন চক্রবর্তীর ও ডানহাত। মনে মনে ভৈরব দত্তকে ভয় করে, সুজাতাদি। ওকে ঘাঁটাতে চায় না।'

সুব্রত আজ শচীদুলালের কাজ করছিল। নিবিষ্টমনে,—প্রায় মনোযোগী ছাত্রের মত। ছোট নোটবই খুলে লিখছিল সুব্রত। মাঝে মাঝে রাজীবের দিকে তাকাচ্ছিল। কখনও প্রভা মুখার্জির গোলগাল মুখখানার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। আবার রাজীবের নীরব নির্দেশ পেতেই নোটবই খুলে লিখতে তৎপর হল।

রাজীব হেসে বলল, 'সুদর্শন চক্রবর্তীকে আপনার কী মনে হয় মিস মুখার্জি?'

—কী বলব ইন্সপেক্টরবাবু। এতবড় একটা মিলের ম্যানেজার উনি। বিলেতে অনেকদিন নাকি কাটিয়েছেন। ভালো ভালো সব ডিগ্রি আছে। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি। অঢেল পয়সা তাদের। কিন্তু তলে তলে উনিও তরঙ্গের একজন ভক্ত।

'আশ্চর্য!' রাজীব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল, 'আচ্ছা মিস মুখার্জি, আপনি তলে তলে কথাটা ব্যবহার করছেন কেন?'

'কারণ ওর মত একজন পদস্থ মানুষের পক্ষে প্রকাশ্যে তরঙ্গের পিছু পিছু দৌড়োদৌড়ি করা সম্ভব নয়। কাজেই ডুব দিয়ে জল খাওয়া ছাড়া ওর উপায় কি?' প্রভা মুখার্জি একটু হেসে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামল। বলল,—'জলের নীচেও যে প্রাণী আছে একথা বোধহয় আমাদের ম্যানেজার সাহেবের খেয়াল থাকে না।'

রাজীব হেসে বলল,—'আপনার এ উপমার অর্থ কী?'

'বলছি শুনুন না', ছদ্ম কোপ প্রকাশ করে প্রভা বলল 'ভারি অধৈর্য মানুষ তো আপনি। আগে শুনবেন তো আমার কথা!'

রাজীব অপাঙ্গে চেয়ে দেখল। সুব্রত মুখ টিপে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

মাথার চুলগুলো কানের নীচে নেমে এসেছে। প্রভা সেগুলি সরিয়ে স্বচ্ছন্দ হতে চাইল। বলল, 'আমাদের মিলের এক ভদ্রলোক কলকাতায় একবার দৃশ্যটা দেখেছিল। জলের নীচের প্রাণীর উপমাটা তাই বললাম ইন্সপেক্টরবাবু।'

—কী দেখেছিল সে?

—বাস স্টপে ভদ্রলোক নাকি দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় মস্ত এক গাড়ি চালিয়ে ম্যানেজার সাহেব হু-উস করে চলে গেলেন। ওর পাশে তরঙ্গ বসেছিল।

—এ নিয়ে কানাঘুষো হয়নি মিলে?

—হবে না কেন? কিন্তু তরঙ্গ কি কম চালাক ছিল? স্রেফ বলল ও, কোথায় দোকানে সওদা করতে গিয়ে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা। তরঙ্গকে নিজের গাড়িতে একটা লিফ্‌ট দিয়েছিলেন উনি। এই ব্যাপার মাত্র।

রাজীব সান্যাল নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'দুজন ভক্তের কথা তো বললেন মিস মুখার্জি। কিন্তু আর,—আর কারা এই দলে?'

'নিখিলেশ সেনকে তো আপনি চেনেন। তার বন্ধু শশাংক ভট্‌চাযকে। উঃ—ঐ এক গায়ে পড়া ভদ্রলোক। তরঙ্গের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ভদ্রলোক কতদিন যে মিলের গেটে ঘোরাঘুরি করেছেন।' প্রভা সখেদে ব্যক্ত করল।

—এদের কথা আপনি বাদ দিন মিস মুখার্জি। নতুন কেউ,—তরঙ্গের অন্তরঙ্গ মহলে আর কার আসন ছিল?

প্রভা মুখার্জির মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল দেখাল। বলল, 'একজনের কথা বলতে ভুলে গেছি আপনাকে। আমাদের পারচেজ অফিসের বিশ্বনাথ বসু। ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়, চব্বিশ-পঁচিশ কিংবা হয়তো আমাদেরই বয়সী হবেন।'

—উনি কতদিন এসেছেন মিলে?

—এক বৎসর। মাস নয় দশও হতে পারে। মেদিনীপুর না কোথায় যেন বাড়ি। ভৈরববাবু বলেছিলেন একবার। বাড়ির অবস্থা ভালো নয় ভদ্রলোকের। আমাদের মিলের কোনো ডিরেক্টরকে ধরে চাকরি হয়েছে। অথচ এদিকে ঘোড়ারোগে পেয়েছে ভদ্রলোককে।

—গরিবের ঘোড়ারোগ বলছেন?

ঠোঁট উল্টিয়ে প্রভা বলল, 'ঘোড়ারোগ, নয় তো কী বলুন।' আমি জানি ইন্সপেক্টরবাবু, তরঙ্গকে ও একবার কি উপলক্ষে ছল করে দামী একটা কলম প্রেজেন্ট করেছিল।'

কিছু বলল না রাজীব। প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করল। কুটিল ঈর্ষাপরায়ণ মুখটা। তরঙ্গমালাকে এক বিন্দুও সহ্য করতে পারত না প্রভা মুখার্জি। নইলে একনাগাড়ে এতক্ষণ কি কেউ মৃতার সম্বন্ধে এমন কটূক্তি করতে পারে?

রাজীব সান্যাল আত্মগত চিন্তায় সমাহিত ছিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেনি। অনেকগুলি

ঢেউ যেন মিছিল করে ওর চোখের সামনে এসে থামছে, আবার ভেঙে পড়ছে।

হঠাৎ মুখ খুলল রাজীব। বলল, 'আচ্ছা মিস মুখার্জি, আর একটা বিষয়ে আপনি কিছু বলুন আমাদের। সুজাতা দেবী কি তরঙ্গকে খুব পছন্দ করতেন?'

'পছন্দ মানে?' যেন প্রজ্জ্বলিত দেশলাই কাঠির ছোঁয়া লাগল শুকনো খড়ের বুকে। প্রভা টুনটুনি পাখির মত মুখ উঁচু করে বলল, 'শুধু পছন্দ নয় ইন্সপেক্টরবাবু। তরঙ্গকে খুব ভালবাসত সুজাতাদি। নিজের ছোটবোনকেও লোকে অত ভালবাসে না। গত শীতে তরঙ্গ একবার খুব ভুগে উঠল। বুকে সর্দি বসেছিল,—সাত আটদিন পড়ে রইল বিছানায়। সুজাতাদি তখন কি ওর কম সেবা করেছেন?'

—তাই নাকি?

প্রয়োজনের চেয়েও বেশি ইন্সপেক্টরবাবু। দু'তিন রাত সুজাতাদি একরকম জেগেই কাটিয়েছেন ওর বিছানার পাশে বসে। অফিস কামাই করেছেন, ঘন্টায় ঘন্টায় ওষুধ আর পথ্য দিয়েছেন। নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দিতেন। মাথায় হাত বুলোতেন। কপাল টিপে দিয়েছেন। বাচ্চা মেয়েকে লোকে যেমন আদর করে। ওর তেমনি ব্যবহার তরঙ্গের সঙ্গে। তবু—!

—তবু কি মিস মুখার্জি? থামলেন কেন?

ফর্সা মুখটা রাঙা হয়ে উঠল প্রভার। বলল, 'না, না, ওসব কথা আপনাকে বলা যায় না।'

'না বললে তো হবে না মিস মুখার্জি,' রাজীবের কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনাল। 'আমি বরং সুব্রতকে আড়ালে যেতে বলছি।' নির্দেশ পেয়ে সুব্রত অন্যত্র চলে গেল।

প্রভার মুখখানা অসহায় দেখাল। কিন্তু রাজীব নিজেকে আরও শক্ত করে রাখল। কী এমন ব্যাপার? যা বলতে গিয়ে প্রভার গলা কেঁপে উঠল? মুখখানা রমণীসুলভ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

প্রভা বলল, 'ব্যাপারটা আমার বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে ইন্সপেক্টরবাবু। কিন্তু এ কথা কাউকে বলা যায় না। তরঙ্গকে না—সুজাতাদিকে না। কাউকে না, কিন্তু সি-আই-ডিরা যে নাছোড়বান্দা হয়—!'

রাজীব উৎসাহ দিয়ে বলল, 'আপনার চোখে যা দৃষ্টিকটু লাগল, তা বলবেন বৈকি।'

'দৃষ্টিকটু! শব্দটা ঠিকই ব্যবহার করছেন ইন্সপেক্টরবাবু। আমি হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম। খুব ভোরে সেদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। তখনও বেশ অন্ধকার, দু-চারটে কাক ডাকছে। কেউ ওঠেনি।'

'কতদিনের কথা বলছেন?'

'বেশিদিন নয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে, হ্যাঁ বেশ মনে আছে আমার। সেটা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ। বারান্দায় এসে সুজাতাদির গলা শুনে আমি সচেতন হলাম। এত ভোরে সুজাতাদি উঠে কী করছেন? শুনলাম ফিস ফিস করে তরঙ্গও কথা বলছে। আমার খুব কৌতূহল হল ইন্সপেক্টরবাবু। এত ভোরে ওরা কী গল্প করছে?' প্রভা দম নেবার জন্য একটু থামল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই শুরু করল প্রভা, 'পা টিপে টিপে আমি ওদের জানালার কাছে গিয়ে আড়ি পাতলাম। ঘরটায় ছায়া ছায়া অন্ধকার। আমি অবাক হলাম। মনে হল খুব কাছাকাছি বসে ওরা কথা বলছে। নইলে এমন ফিসফিসানি চাপা কণ্ঠস্বর কেমন করে অন্যের কানে পৌঁছবে?'

'তারপর?'

প্রভা মুখার্জি আবার রাঙা হয়ে উঠল। বলল, 'কৌতূহল চেপে রাখতে পারিনি ইন্সপেক্টরবাবু। জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। অন্ধকারে সব কিছু চোখে পড়ে না। তবু যা দেখলাম—।'

'কী দেখলেন? ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে?' রাজীবের কণ্ঠস্বর ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থবহ।

প্রভা বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক পাশাপাশি নয় ইন্সপেক্টরবাবু। ওরা কেমন ঘেঁষাঘেষি, জড়াজড়ি

করে শুয়ে আছে। আর—।'

'আর কী? বলুন মিস মুখার্জি।' রাজীব যেন ধমক দিল।

ঠোঁট কামড়ে নিজেকে শক্ত, দৃঢ় করতে চাইল প্রভা।

'আমার মনে হল সুজাতাদির মুখটা তরঙ্গের মুখের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার সরে আসছে। কখনও গালের কাছে কপালের দিকে কী যেন খুঁজছে।'

'তারপর?'

—'আমি শুনলাম হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল তরঙ্গ। বলল, এই সুজাতাদি, কী হচ্ছে এসব। ছাড়ো দিকি আমাকে।'

কথা শেষ করে প্রভা দুই করতল দিয়ে মুখ ঢাকল। লজ্জায়, উত্তেজনায় ওর মুখটা মরসুমি টম্যাটোর মত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

'এ ঘটনা আপনি কারো কাছে গল্প করেছেন?'

'না, না ইন্সপেক্টরবাবু। শুধু—।'

'শুধু কী?'

'মিনতি,—মিনতিকে আমি বলেছিলাম পরের দিন।'

'ও কী বলল?'

'মিনতি ভীষণ ভীতু। সুজাতাদিকে ওর সাপের মত ভয়। আমাকে নিষেধ করে বলল,—একথা কার কাউকে বলিসনি। বিশ্রী কাণ্ড হবে। সুজাতাদি সাংঘাতিক মেয়ে, তোকে ছেড়ে কথা কইবে না।'

খুব গম্ভীর দেখাল রাজীবকে। মনে হল গভীরভাবে কোনো একটা বিষয় বিশ্লেষণ করছে। অথচ সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না।

রাজীব বলল—'এ গল্প আপনি কারো কাছে করবেন না। আমিও নিষেধ করছি আপনাকে। প্রয়োজন নেই এই কাহিনি রটাবার। শুধু শুধু—!' রাজীব থামল।

কে একটি মেয়ে রাস্তা থেকে নেমে এদিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই রাজীব চিনল। ফটোয় দেখা সেই কালো ছিপছিপে তরুণী। রাজীব লক্ষ্য করছিল। ভারি শান্ত ও,—সাতে-পাঁচে নেই। ওর চোখের ভাষাই সে কথা বলছে। কবে যেন বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা শান্ত নিস্তরঙ্গ একটা পুকুর দেখেছিল রাজীব। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে। মেয়েটিকে দেখে সেই পুকুরটাই কথাই মনে এল। ওর আয়ত কালো চোখ দুটিতে স্তব্ধ দুপুরের সেই দিঘির জলের ছায়া।

মিনতি আইচ বারান্দায় এসে উঠল।

প্রভা বলল, 'মিনতিকেও তো কাল রাত্রে চিনেছেন আপনি।'

রাজীব হাসল।

'ইনি সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। তোকে প্রশ্ন করবেন কিছু। তরঙ্গের খুনের তদন্ত করতে এসেছেন উনি।'

রাজীব হেসে বলল, 'ওঁকে কিছু প্রশ্ন করব না। প্রয়োজন হলে না হয় পরে। তবে প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।'

'সে কি? ওকে বাদ দিচ্ছেন কেন?'

কোনো উত্তর না দিয়ে রাজীব করজোড় করল। বলল, 'মনে হচ্ছে আপনাকে আবার আমার প্রয়োজন হবে মিস মুখার্জি।'

পিচঢালা পথে জিপটা স্পিডে ছুটছিল। সুব্রত বলল, 'ওই ঢাকামুখী মেয়েটা কী বলছিল আপনাকে? কী এত সংবাদ দিল রাজীবদা?'

রাজীব একগাল হেসে বলল, 'কী বলছিল জানো?'

সুব্রত তাকাল।

'বলছিল সব মেয়েই ললিতলবঙ্গলতা নয়। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বেজায় হুলো—!'

আট

ঘরের ভিতরটা স্বল্পবাস বিদেশিনী রমণীর মত দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এক পা ভিতরে দিয়েই রাজীব সান্যাল সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়াল। পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গী অঞ্চলে অদ্ভুত সাজের টুরিস্ট মেয়েদের দেখা মেলে। ঠোঁটে টকটকে লাল রঙ বোলানো। কটা কটা এক মাথা ফোলানো ফাঁপানো চুল, পিঙ্গল আঁখি, উর্ধ্বাঙ্গে শরীরের উপর পাতলা রবারের মত চেপে বসা চিত্র-বিচিত্র বেশবাস। নিম্নাঙ্গে গোড়ালি পর্যন্ত নেমে-আসা ব্রিচেসের ধরনের আঁট আঁট আবরণ। নইলে হাঁটু-ঝুল স্কার্ট ফ্রক। সেও কোমর ছাড়িয়ে ক্রমে সরু হতে শুরু করেছে। ফলে সর্বক্ষেত্রেই সুগোল নিতম্বের উৎকট প্রকাশ।

দেওয়ালে স্নিগ্ধ সবুজ রঙ। জানালার পর্দাগুলিও সবুজ,—অবশ্য ফুলটুল আঁকা। টেবিলের উপরকার রেকসিন কাপড়টা তো সবুজেরই। এমনকী অ্যাশট্রের রঙটাও তাই। পেনস্ট্যান্ডে রাখা দুটি কলম—একটি লাল। সম্ভবত লাল কালি ভরা ওতে। অন্যটি সবুজ। ভদ্রলোক কি সবুজ কালিতেই লেখেন নাকি? রাজীব সান্যাল কথাটা চিন্তা করল।

ঘরের ভিতরটা হিম হিম। কি সুন্দর ঠাণ্ডা সর্বত্র ছড়ানো। অবশ্যই কুলারের কেরামতি। আলোটাও ভারি অদ্ভুত। চোখে লাগে না। অথচ সব কিছুকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। সবুজ রংয়ের উপর প্রতিফলনটা ভালো হয়েছে। দেওয়ালে আলো ঠিকরে পড়ায় সবুজ রঙটা যেন হেসে উঠেছে।

সুদর্শন চক্রবর্তী উঠে দাঁড়িয়ে সাদব অভ্যার্থনা করল, 'আসুন মিস্টার সান্যাল, আসুন মিস্টার সবকার। সেই এগারোটা থেকে আমি আপনাদের জন্য ওয়েট করছি। মানে প্রতীক্ষায়।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুদর্শন একটি বিলিতি কায়দায় হাতের আঙুল কটি ঘোরাল।

ঘরের মালিককে এক নজরে দেখল রাজীব। না, মা-বাবা সার্থক নাম রেখেছিল ভদ্রলোকের। সুদর্শন চক্রবর্তী, আর কিছু না হতে পারে, কিন্তু সুদর্শন তো বটেই। এমন সুপুরুষ তাকিয়ে দেখার মত চেহারা কটা মেলে? লম্বায় পৌনে ছ' ফুট কিম্বা ছ' ফুট হবে। সায়েব-সুবোর মত ফর্সা গায়ের রঙ। কোঁকড়া এক মাথা ঘন কৃষ্ণ চুল। উজ্জ্বল কালো চোখের দৃষ্টি। পুরু জোড়া ভ্রূ, চওড়া কাঁধ। হাতের কবজি সম্ভবত শক্ত এবং যথেষ্ট মোটা।

রাজীব হেসে বলল, 'ভারি দুঃখিত মিস্টার চক্রবর্তী, আমি চেষ্টা করেছিলাম ঠিক এগারোটাতেই আসতে। কিন্তু হয়ে উঠল না। তদন্তের কাজে ঐ ভারি অসুবিধে। কোথায় কতক্ষণ যে লেগে যাবে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাজীব যোগ করল, 'প্রায় পনেরো মিনিট সময় নষ্ট করলাম আপনার।'

সুব্রত সমর্থন করবার ভঙ্গিতে বলল, 'তদন্তের ব্যাপারে রাজীবদাকে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে মিস্টার চক্রবর্তী। নইলে মিল ম্যানেজারের কাছে পনেরোটি মিনিট কেন, পনেরোটি সেকেন্ডেও অমূল্য। এত বড় একটা মিলের দায়িত্ব যখন হিমালয় পাহাড়ের মত মনের উপর চেপে বসেছে—।'

সুদর্শন হাসল, মোলায়েম মিষ্টি হাসি। 'না, না, তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। এতক্ষণ বসে বসে দু-একটা ফাইলের কাজ সারছিলাম। পনেরো মিনিট সময় নষ্ট হতে দিই নি। কোম্পানির কাজেই

সদ্ব্যবহার করেছি।' মিল ম্যানেজার তেমনি হাসছিল।

রাজীব বলল, 'পেপার মিল সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল রয়েছে ম্যানেজার সাহেব। এতদিন মথুরাপুরে রয়েছি, অথচ দিকনগর পেপার মিলটা দেখা হয়নি। কলকাতায় থাকতে একবার একটা সুযোগ এসেছিল। পেপার মিলটা কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। মাইল কুড়ি-বাইশ দূরত্ব বড়জোর। কিন্তু কী কারণে যেন সেবারেও প্রোগ্রামটা ভেস্তে গেল।'

সুদর্শন চক্রবর্তী দুঃখ প্রকাশ করবার ভঙ্গিতে জিভ দিয়ে কেমন একটা শব্দ করল। বলল, 'ভেরি সরি মিস্টার সান্যাল। আজ লাঞ্চের পরই একটু যেতে হবে মথুরাপুরে। আমাদের কোম্পানির একজন ডিরেক্টরের আসবার কথা। নইলে আপনাকে সঙ্গে করে পেপার মিলটা আমিই দেখিয়ে আনতাম।' সুদর্শন খুব অমায়িক এবং বিনীত মুখ করে তাকাল।

'না, না। পেপার মিলটা অন্য একদিন এসে দেখে গেলেই হবে। আমিও আছি, আর আপনিও পালাচ্ছেন না এখান থেকে।' কথার শেষে রাজীব সুব্রতর দিকে আড়চোখে তাকাল।

সুদর্শন মুখ উঁচু করে সম্ভবত বাতাস টানল। বলল, 'আপাতত পালাচ্ছি না ঠিকই। কিন্তু দিকনগরে বেশিদিন টিকবার ইচ্ছে নেই মিস্টার সান্যাল। জানেন তো, এক সময় মিলটা পুরোপুরি বিলিতি কনসার্ন ছিল। এখন অবশ্য তা নেই। আর ইংরেজরা যেন এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বেচে দিতে পারলেই বাঁচে।' একটু হেসে সুদর্শন বলল, 'কিন্তু প্রথম চাকরি জোগাড় করা যত কঠিন, তাকে টিকিয়ে রাখা তার চেয়েও কঠিন কাজ। রিয়্যালি ডিফিকাল্ট জব।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিল ম্যানেজার সেই বিলিতি কায়দাটার পুনরাবৃত্তি করল।

সুব্রত বলল, 'বিলেত থেকে আপনি ফিরেছেন কতদিন আগে?'

গলার টাইটা এদিক-ওদিক সরাতে আরম্ভ করেছিল সুদর্শন। হয়ত একটু আলগা করতে চেষ্টা করছিল। সহজ হয়ে সোজাভাবে বসল সে। বলল, 'পাঁচ-ছ বছর। হ্যাঁ, তার বেশি হবে না।' মনে মনে হিসেব করে সুদর্শন যেন নিশ্চিত হতে চাইল।

রাজীব বলল, 'আপনি কি পেপার টেকনোলজি নিয়ে পড়বার উদ্দেশ্যেই ওদেশে গিয়েছিলেন?'

সুদর্শন হেসে সায় দিল। বলল, 'ইচ্ছে করে ওদেশে ফিরে যাই। এখানে রট করার কোনো মানে হয় না।' কয়েক মুহূর্ত থেমে সুদর্শন শুরু করল, 'বেনারস থেকে এম এস-সি পাস করি আমি। রেজাল্ট বেশ ভালোই হয়েছিল। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ইচ্ছে ছিল রিসার্চ করি—ডক্টরেট নিয়ে ইউনিভার্সিটিতেই থেকে যাই। শুরুও করেছিলাম তাই, প্রায় বছর দেড়েক ধরে রিসার্চ করলাম সেলুলোজের উপব। ডক্টরেট পাওয়া একরকম নিশ্চিত হয়ে আসছিল। এমন সময় ফরেন স্কলারশিপ একটা জুটে গেল আমার। পড়লাম উভয় সঙ্কটে—যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়।' সুদর্শন পাইপে কামড় দিয়ে একটা ভঙ্গি করল।

'তারপর?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'পরের কথা তো জানাই। বিদেশের হাতছানি উপেক্ষা করবার মত শক্তি ছিল না। সবাই একবাক্যে বলল, এদেশের ডিগ্রি নিয়ে মাস্টারি করে জীবন কাটানোর কোনো মানে-হয় না। চান্স যখন পেয়েছ তখন ভেসে পড়। তরী কোথায় গিয়ে ভিড়বে সে চিন্তা এখন করে লাভ নেই। শুধু সেল অন, অ্যান্ড সেল অন........'

রাজীব বলল, 'দিকনগর পেপার মিলে আপনি তো বেশ কিছুদিন রয়েছেন। আচ্ছা, কাগজ তৈরির কাঁচামাল মোটামুটি কী, আর কোথা থেকে সেগুলো আসছে?'

—'কাঁচামাল বলতে অনেক কিছু বোঝায় ইন্সপেক্টর সাহেব। তবে মোটামুটিভাবে বাঁশ আর সাবাই ঘাসকেই আসল কাঁচামাল বলা যেতে পারে। আজকাল সাবাই ঘাসের সাপ্লাইয়ে পড়ছে টান। তার বদলে আমরা বাগাস ব্যবহার করছি।'

'বাগাস? সে আবার কী?'

'অতি সাধারণ বস্তু, 'সুদর্শন হাসিমুখে তাকাল। বলল, 'সেরাইকেল্লা থেকে সাবাই ঘাস তেমন আসছে না। দরে পোষাতে বাগাস ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নেই আমাদের।' মুখ উজ্জ্বল করে সুদর্শন যোগ করল, 'বাগাস হল আখের ছিবড়ে। সুগার মিলের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে আমাদের। বাগাস পেতে কোন অসুবিধে নেই।'

'দিকনগর পেপার মিলে সবরকম কাগজই তৈরি হয়?'

সুদর্শন চক্রবর্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'কাগজের অনেক রকম ভ্যারাইটি আছে মিস্টার সান্যাল। এক একটা মিল এক এক ধরনের কাগজের উপরই জোর দেয়। যেমন দিকনগর পেপার মিলে ডুপ্লিকেটিং পেপারটাই বেশি তৈরি হয়। তবে ব্যবসা করতে নেমে সবকিছুই করতে হয় আমাদের। অর্ডার পেলে অ্যাজিউর লেড্ পেপার থেকে হোয়াইট প্রিন্টিং পর্যন্ত সব কিছুই আমরা তৈরি করে থাকি।'

রাজীব বলল, 'দিকনগর পেপার মিলটা বেশ বড়ই, তাই না মিস্টার চক্রবর্তী?'

'খুব বড় না।' রাজীব সান্যাল নেতিবাচক হতে চাইল। বলল, 'মাঝারি ধরনের বলতে পারেন। এর চেয়ে বড় পেপার মিল অনেক রয়েছে এদেশে। অবশ্য এরও এক্সটেনশেন হতে পারত। সাহেবরা মালিক থাকলে নিশ্চয়ই তা করত। কিন্তু আমাদের ডিরেক্টাররা ইন্ডাস্ট্রিতে ঠিক ইন্টারেস্টেড নন। ওঁদের মন কীসে জানেন?'

রাজীব সহাস্যে তাকাল।

একগাল হেসে মিল ম্যানেজাব বলল, 'সে বস্তুটি হল ফাটকা। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মতে ইন্ডাস্ট্রি মানেই কতকগুলি ঝুটঝামেলা। সুতরাং গেট রিড্ অফ ইট। ফলে দিকনগর পেপার মিলের বৃহত্তর হবার কোনো চান্স নেই।'

'আরো মিনিট পনেরো সময় আপনার বাজে নষ্ট করলাম। এর সঙ্গে তদন্তের কোনো সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, নাউ টু বিজনেস—কী বলেন?'

'নিশ্চয়ই', চোখের একটা ভঙ্গি করে মিল ম্যানেজার গম্ভীর হল। বলল, 'সেই কারণেই তো আপনাদের আসা!'

রাজীব সান্যাল সুব্রতকে ইঙ্গিত করল। নোটবুকটা খুলে সুব্রত তৈরি হযে বসল।

ফস করে সুদর্শন বলল, 'খুনের ব্যাপারে আমি আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি? এর বিন্দু-বিসর্গও তো জানা নেই আমার।'

রাজীবের শক্ত চোয়াল দুটো আরও দৃঢ় দেখাল। মিল ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'খুনের বিন্দুবিসর্গ আপনি জানবেন কেমন করে? সে কথা জানবে শুধু খুনি।' রাজীব ইঙ্গিতপূর্ণ হাসল।

কথাটা ঠিক বলা হয়নি। সুদর্শন বুঝতে পেরেছিল। নিজেকে শুধরে নেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বলল, 'তা তো ঠিকই। তবে মিস্টার সরকার যেভাবে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন তাতে মনে হল একটা জবানবন্দী লিখে নেবার জন্য উনি তৈরি হয়েছেন।' সুদর্শন হা হা করে হেসে সমস্ত ব্যাপারটাকে লঘু করতে-চাইল।

'যে মেয়েটি খুন হয়েছে তার নাম তরঙ্গমালা মজুমদার। ওর সম্বন্ধেই আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব আমি।' রাজীব শুরু করল।

'বেশ তো, বলুন।' সুদর্শন নির্জীবের মত বলল।

'তরঙ্গমালা এখানে টেলিফোন অপারেটরের কাজ করত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'মাঝে মাঝে ওকে অন্য কাজও কি করতে হত?'

'না, টেলিফোন অপারেটররা কখনও অন্য কাজে সাহায্য করে না।'

'আচ্ছা, অপারেটরের পোস্ট থেকে কোনো উন্নতি হবার আশা থাকে?'

'খুব একটা না। তবে ওদের মধ্যে যে সিনিয়র, তাকে ইনচার্জ বলা হয়। সে একটা অ্যালাউন্স পায়, এই পর্যন্ত।'

'আপনার মিলে অপারেটর কজন?'

'টেলিফোন অপারেটর বলতে চারজন,—তিনজন মেয়ে আর এক ভদ্রলোকও রয়েছেন এই পোস্টে। তবে টেলিফোনের কাজ অফিসের দু একটি মেয়েও জানে। প্রয়োজন হলে ওরা এসে সাহায্য করে।'

'টেলিফোন অপারেটর তো মেয়েরাই হয়। এর মধ্যে আবার একজন পুরুষ কেন?'

'ভৈরববাবু বছর তিন চার হল এখানে এসেছেন। আমার চেয়েও পুরনো উনি, অপারেটদের মধ্যে সকলের চেয়ে সিনিয়র। কলকাতা থেকে আমাদের একজন ডিরেকটর ওঁকে পাঠিয়েছিলেন চিঠি দিয়ে। টেলিফোনের কাজ জানেন শুনে ওঁকে এই পোস্ট দিয়েছিলেন মিল ম্যানেজার। অন্য কোথাও হয়তো ভেকেন্সি ছিল না। ব্যাপারটা অনেক আগের—আমি তখন এখানে আসিনি।' সুদর্শন থামল।

'একজন পুরুষকে টেলিফোন অপারেটর নেওয়াতে সুবিধে হয়েছে নিশ্চয়?'

'খানিকটা বটে। নইলে ওঁকে অন্য কোনো সিটে বদলি করে একজন মেয়ে অপারেটর নিতে কী আপত্তি ছিল?'

'সুবিধেটা কী ধরনের বলবেন?'

'কি জানেন,—কলকাতা থেকে এতদূরে এসে মেয়েরা সাধারণত বেশিদিন থাকতে চায় না। প্রয়োজনে পড়ে, তাগিদের চাপে এখানে এসে চাকরি নেয়। কিন্তু পরের মাস থেকেই নতুন চাকরির জন্য দরখাস্ত ছুঁড়তে থাকে। কলকাতার কাছাকাছি একটা চাকরি পেলেই হল। নেকস্ট মান্থেই ফুড্ডুৎ—!' সুদর্শন বিচিত্র কায়দায় তিনটি আঙুল ঘুরিয়ে একটি মুদ্রা রচনা করল।

'আপনি বলতে চাইছেন ছেলেরা সাধারণত দূরে এসেও টিকে থাকে?' রাজীবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

'ঠিক তা নয়। অতখানি বলতে আমি চাই না। আমি বলছি ভৈরব দত্তের কথা। ভৈরববাবু বোধহয় এখানেই টিকে গেলেন। ফ্যামিলিম্যান, এই বয়সে নতুন করে কোথায় আবার শুরু করবেন? তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কী ম্যানেজার সাহেব?'

'আমি জানি মেয়েদের পক্ষে এতদূর এসে শুধু কাজ নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। এ ম্যান ক্যান রিমেন অ্যালোন, বাট এ উওম্যান ক্যান নেভার লিভ উইদাউট এ কম্প্যানি। কেবল সুজাতা দাস,—।' একটু থেমে প্রায় স্বগতোক্তির মত বলল সুদর্শন, 'ইয়েস, শি ইজ অ্যান এক্‌সেপশন।'

রাজীব সান্যাল টেবিলের উপর ঝুঁকে বসল। 'সুজাতা দাসকে ব্যতিক্রম বলে মনে হয় কেন মিস্টার চক্রবর্তী?'

'আই ক্যান্ট সে।' মিল ম্যানেজার বিড় বিড় করে বলল 'কিন্তু মিস দাস বোধহয় দিকনগর ছেড়ে যাবেন না। অন্তত আমার ধারণা তাই। আর তরঙ্গমালা? নাউ শি হ্যাজ লেফ্‌ট অল অফ আস। কিন্তু বিশেষ একটা কারণ না থাকলে সম্ভবত সেও কবে অন্যত্র চলে যেত।'

'বিশেষ কারণ বলতে আপনি—?'

'কারণ তো আপনিও জানেন মিস্টার সান্যাল। আমি রিয়্যালি সারপ্রাইজড্‌। আই কুড নেভার

গেস দ্যাট শি ওয়াজ ইন লভ্।'

প্রসঙ্গ এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজীব প্রশ্ন করল, 'তরঙ্গ আগে কোথায় কাজ করত?'

সুদর্শন বলল, 'আমাদের ডিরেক্টরদের একটা ট্রেডিং কনসার্ন আছে। চীনাবাজারে অফিস— এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা। আগে ফলাও কারবার ছিল। কিন্তু এখন ইম্পোর্ট লাইসেন্স প্রায় নেই। ফলে কারবারটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে এল। তরঙ্গ ঐ কনসার্নেই ছিল। টেলিফোনে বসত। কারবার গুটিয়ে আসতেই তরঙ্গমালার চাকরি গেল। কিন্তু আমাদের ডিরেক্টর মিস্টার উমেশপ্রসাদ ওয়াজ কাইন্ড টু হার। দিকনগর পেপার মিলে ওকে পাঠিয়ে দিলেন একটা চিঠি দিয়ে। ব্যস, চাকরি হল তরঙ্গর। যেমন মাইনে-টাইনে পাচ্ছিল তেমনই পাবে। বাট তরঙ্গ ওয়াজ নট হ্যাপি অ্যাট ফার্স্ট।'

সাগ্রহে রাজীব প্রশ্ন করল 'কেন বলুন তো?'

'কেন আবার? দিকনগরে চাকরি করতে এসে কলকাতাকে ভুলতে পারেনি। এখানে ওখানে দরখাস্ত দিত। আমাকে কতবার বলেছে, জানাশুনো কোনো একটা অফিসে ওকে একটু পুশ করে দিতে। এমন কি কম মাইনেতে চাকরি নিতেও ও রাজি। ইদানীং অবশ্য তরঙ্গের মুখে কলকাতায় চাকরি নেবার কথা শুনিনি। দিকনগরে মন পড়ে থাকলে অন্যত্র সরে যাবার কথা ওঠে না।' সুদর্শন রহস্য করে হাসল।

রাজীব বলল, 'আপনার অন্য অপারেটাররা বুঝি কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য যথেষ্ট ব্যস্ত নয়?'

'অন্য অপারেটরদের মধ্যে ভৈরববাবুর কথা আপনাকে বলেছি। হি ইজ ওভার ফর্টি ইয়ার্স। সম্ভবত অন্য কোথাও যাবেন না ভৈরববাবু। আর সুমনা বলে একটি মেয়েকে অল্পদিন হল নেওয়া হয়েছে কাজে। ওর বাড়ি এখানেই, কলকাতায় গিয়ে টাইপ আর টেলিফোনের কাজ শিখে এসেছে। আমাদের মিলেরই এক ভদ্রলোকের মেয়ে। সুমনার বাবা পাবচেজে আছেন। আমার মনে হয় শুধু চাকরির জন্য সুমনা কলকাতা কিম্বা অন্য কোথাও যাবে না। তবে শি মে নট কন্টিনিউ হিয়ার।'

'কেন এরকম অনুমান করছেন?'

'ভৈরববাবু বলছিলেন যে, সুমনার বাবা ওর বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছেন। ছেলের জন্য খোঁজ-টোজ হচ্ছে, দু একটি ভালো সম্বন্ধও নাকি এসেছে। ভালোই করছেন ভদ্রলোক। মেয়ের বিয়ে দেওয়াই বাপের কর্তব্য। আফটার অল দে নিড এ শেল্টার ফার্স্ট।

'কিন্তু সুজাতা দেবী? মিস দাস কি কখনও চাকরি নিয়ে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি?'

'শুনিনি কারো কাছে। আমার কেমন মনে হয় মিস দাস দিকনগরে থাকতেই পছন্দ করছেন। ঠিক দিকনগর বললে একটু ভুল বলা হবে। উনি বোধ হয় শহর-টহর, গোলমাল, হইচই, হাল্লা থেকে একটু দূরে থাকতে চান। গত দু বছরে মিস দাস ছুটি-টুটি বলতে গেলে একদম নেন নি। সব মিলিয়ে বড়জোর পনেরো দিন হবে। আর দেখেছেন নিশ্চয়ই শি ইজ স্ট্রংলি বিল্ট, রোগ অসুখের বালাই নেই—।'

'আচ্ছা, সুজাতা দেবী এর আগে কোন অফিসে কাজ করতেন?'

'ভালো কোম্পানিতে মশায়। বেটিশ অ্যান্ড রবসন লিমিটেডের নাম শুনেছেন তো? ওদের ওষুধ-টষুধের ফলাও কারবার। কোম্পানির কলকাতা অফিসে কাজ করতেন মিস দাস। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন? শি ওয়াজ নট স্যাকড্।'

'তা হলে চাকরি ছাড়লেন কেন?'

'মিস দাসকে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম একবার। বেটিশ অ্যান্ড রবসন নামকরা কোম্পানি। ভালো পার্সেন্টেজের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স দেয়। বোনাসের জন্য তেমন লড়াই করতে হয় না। তাহলে কেন কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিলেন উনি?—'

'কী জবাব দিয়েছিলেন মিস দাস?'

'খুব স্যাটিসফ্যাকটরি কোন উত্তর নয়। বনিবনা হচ্ছিল না বললেন, কলকাতায় স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল। অথচ—।' সুদর্শন কী যেন চিন্তা করল।

'অথচ কি?'

'বেটিশ অ্যান্ড রবসন কোম্পানিতে আমার এক বন্ধু রয়েছে। ওদের সিনিয়র কেমিস্ট। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কলকাঠি অবশ্য তার হাতে নয়। তবু সে বলেছিল যে, সুজাতা দাস খুব নাম করেছিল কাজে। এভরিবডি ওয়াজ প্লিজড উইথ হার।'

রাজীব সান্যাল মনে মনে কী ভাবছিল। ডানহাতের তর্জনীর সাহায্যে মাঝে মাঝে মাথার চারপাশে টোকা দিচ্ছিল রাজীব। সম্ভবত মগজে একটা নাড়া দেবার সে চেষ্টা করছিল। চিন্তার স্রোতগুলি যেন মস্তিষ্কের খাতে ঠিকমত বইতে শুরু করে।

সুদর্শন চক্রবর্তী হাসল। বলল, 'আপনার ডিফিকাল্টিজ আমি বুঝতে পারছি, ইন্সপেক্টর। এদেশে অপরাধীকে দ্রুত খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য কাজ। ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট কতদূর পোক্ত অবশ্য আমি জানিনে। কিন্তু লন্ডনে ওরা এসব ব্যাপারে বহুদূর এগিয়ে আছে। আবার ডিটেকটিভ্ হওয়ার প্রস্তুতিও কম নয়। নো ম্যান ক্যান বিকাম এ ডিটেকটিভ্ আনটিল হি হ্যাজ ফার্স্ট সার্ভড সাম টু ইয়ার্স অ্যাজ এ ইউনিফর্মড কনস্টেবল অন দি বীট।' সুদর্শন আবার একমুখ হাসল।

রাজীব বলল 'লন্ডন পুলিশের বিশ্বজোড়া নাম। তার সঙ্গে আমাদের কি তুলনা হয়?'

'একজাক্টলি।' সুদর্শন মাথা দুলিয়ে সমর্থন করল। একটা নাইস ডিটেকশনের গল্প শুনবেন ইন্সপেক্টর? আমি ইংলন্ডে থাকার সময় ঘটেছিল। খুব সুনাম হয়েছিল লন্ডন পুলিশের।

সুব্রত কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, 'কী ধরনের ক্রাইম?'

'বলছি।' সুদর্শন ওকে নিরস্ত করল। 'ক্রাইমটা তেমন কিছু নয়। ছোটখাটো বার্গলারি। লন্ডনের অনেকগুলি ফ্ল্যাটে লোকটা পর পর চুরি করে। কিছুতেই ওকে সময়মত ধরা যায় নি। লোকটা যে ফ্লাটে ঢুকেছিল এর কোন প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রমাণ না থাকলে কোর্টে চালান দেওয়ারও কোনও মানে হয় না। অনেক চেষ্টার পর একটা ক্লু পাওয়া গেল। একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢুকে চোরটা আধ-খাওয়া একটা চকোলেট ম্যান্টাল-পিসের উপর ফেলে যায়। সেই কামড়ানো চকোলেটের একটা অনুরূপ আকৃতি মোমের সাহায্যে তৈরি করা হল। এবং দাঁতের কামড়ের সঙ্গে সন্দেহভাজন লোকটির দাঁতের আকৃতি অবিকল এক হয়েছে দেখা গেল। কোর্টে কনভিকশন হয়ে গেল লোকটার।'

রাজীব বলল, 'কেসটা আমি জানি ম্যানেজার সাহেব। আঙুলের ছাপের মত কোনো দুটি লোকের দাঁতের আকৃতিও একরকম নয়। ভালো দন্ত চিকিৎসক মৃতের দাঁত দেখে বলতে পারেন লোকটা কোনো সময় তার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিল কি না। অবশ্য যদি রোগীদের দাঁতের ক্ষয়-আকৃতি এবং রোগের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখবার অভ্যেস তাঁর থাকে।'

সুদর্শন বলল, 'আই সি। আপনি দেখছি অপরাধ বিষয়ে রীতিমত খোঁজ-খবর রাখেন। দ্যাটস্ নাইস।' বিলিতি কায়দায় সুদর্শন তার পাইপে কামড় দিল।

সুব্রত বড় বড় চোখ করে বলল, 'আপনি জানেন না ম্যানেজার সাহেব, রাজীবদা পুলিশ

ডিপার্টমেন্টে একটি অ্যাসেট। অনেক বহস্যের পর্দা উনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। অপরাধীকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে ওঁর দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত।'

'তাই নাকি?' সুদর্শন চক্রবর্তী প্রায় সোজা হয়ে বসল। অদ্ভুত হেসে বলল সুদর্শন, 'তাহলে মিস মজুমদারের হত্যা রহস্যের একটা কিনারা হবে আমরা আশা করতে পারি?'

রাজীব বাধা দিয়ে বলল, 'তা কেমন করে বলা যায়? যত্ন নিয়ে কাজ করলাম এই পর্যন্ত। সিদ্ধিলাভ না হলে দোষ কোথায়?'

'তবু আপনার হাতযশের উপর আমরা নিশ্চয়ই ভরসা করতে পারি।' সুদর্শন ডানদিকের নীচের ঠোঁটটা সামান্য টেনে যেন ব্যঙ্গ করল।

ব্যাপারটা গায়ে মাখল না রাজীব। সে বলল, 'কাজের কথার মধ্যে অনেক বাজে কথা এসে পড়ছে। তদন্তের ব্যাপারে এটা অবশ্য প্রয়োজন। কথা বলতে না দিলে মনের ভিতরটা ঠিক প্রকাশ হয় না।' সামান্য একটু হাসল রাজীব।

সুদর্শন বলল, 'বেশ তো, কাজের কথাই শুরু করুন। বলুন কী প্রশ্ন আপনার?' একটু আয়েস করে বসল ম্যানেজার।

তরঙ্গমালাকে কী মনে হত আপনার মিস্টার চক্রবর্তী? মেয়েটি বেশ আলাপি, মিশুক আর—।' বাজীব যেন হঠাৎ থামল।

'মিস মজুমদার আলাপি আর মিশুকে ছিলেন বৈকি। খুব প্লিজিং ম্যানার্স ছিল ওঁর। কিন্তু আর যেন কী বলছিলেন আপনি?'

'না, তেমন কিছু নয়। তরঙ্গমালাকে কি খুব সুন্দরী বলে মনে হত আপনার?' রাজীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল।

'এ প্রশ্ন কেন করছেন বলুন তো? একজন টেলিফোন অপারেটারের রূপসৌন্দর্য সম্বন্ধে মিল ম্যানেজার কি কনসাস থাকতে পারে? এ প্রশ্ন অবান্তর।'

সুদর্শন বিরক্ত হয়েছে মনে হল।

'অবান্তর নয় ম্যানেজার সাহেব। আপনি অযথা রাগ করছেন। আমি জানতে চেয়েছি তরঙ্গকে আপনার সুন্দরী বলে মন হত কি না? খুব ছোট্ট প্রশ্ন। রাগবার বা ভাববার মত কোনো কারণ নেই।'

সুদর্শনকে খুব গম্ভীর দেখাল। বলল, 'মিস মজুমদার সুন্দরী ছিলেন। এ তো সকলের কথা। আমার বলা না বলায় কিছু যায় আসে না।'

'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে মিস মজুমদারকে সুন্দরী বলে মনে হত আপনার? আচ্ছা, ম্যানেজার সাহেব,.. কতকগুলি পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নের জবাব দিন আপনি। প্রশ্নগুলো খুব তুচ্ছ, —হয়তো অর্থহীন। বাট দে আর নট অ্যানয়িং।'

রাজীব সুব্রতর দিকে চেয়ে কী যেন ইঙ্গিত করল। নোটবুক বন্ধ করে সুব্রত বাইরে চলে গেল।

'শীত আর শরৎ এ দুটো ঋতুর মধ্যে কোনটা বেশি পছন্দ আপনার?' প্রথম প্রশ্ন করল রাজীব।

অনেকক্ষণ হেসে সুদর্শন গম্ভীরমুখে জবাব দিল,—'শীত।'

'সানডে অথবা স্যাটারডে কোনটা বেশি প্রিয় আপনার?'

'দুটোই। কিংবা ধরুন স্যাটারডে—হ্যাঁ ছুটির শুরুটাই আমার বেশি পছন্দ।'

'লাল নীল, সবুজ আর শাদার মধ্যে কোনটি আপনার প্রিয় রং?

'সবুজ।' সুদর্শনের গলা বেশ ভারী শোনাল।

'মাছ, মাংস, ডিমের মধ্যে কোন প্রিপারেশনটা বেশি পছন্দ আপনার?'

'ফিশ। আরো জানতে চান? ফিশ ফিঙ্গার খেতে খুব ভালোবাসি আমি।' সুদর্শনের চোখে রাজ্যের বিরক্তি।

'চা আর কফির মধ্যে কোনটা প্রিয় আপনার?'

'কফি। বাট হোয়াই দিজ সিলি কোয়েশ্চেনস্?' সুদর্শন প্রায় চিৎকার করল।

'জিন, শেরি আর হুইস্কির মধ্যে কোনটা প্রেফার করেন আপনি?' রাজীব বিনীতভাবে বলল।

'শেরি।' সুদর্শন চিন্তা না করেই জবাব দিল।

এখন রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। সামান্য অসুস্থ বলে মনে হল।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজীব। মুখের ভাবখানা কঠিন এবং শক্ত দেখাল। চোখ দুটি সামান্য ছোট হয়ে এল। গম্ভীর গলায় রাজীব বলল,—'জুলাই মাসের শেষের দিকে আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন ম্যানেজার সাহেব। পার্ক স্ট্রিটের একটি দামী হোটেলে এক রবিবারের সন্ধ্যায় আপনাকে দেখা গেছে। আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। সঙ্গিনীটি সুন্দরী—কিন্তু আপনার স্ত্রী নন। মেয়েটি তরঙ্গ—আপনাদের টেলিফোন অপারেটর। একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?'

যেন হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে গেল সুদর্শন। উত্তেজনা, হম্বি-তম্বি এবং বিরক্তির ভাব অন্তর্হিত। মিল ম্যানেজারের মুখখানা এখন রক্তশূন্য। প্রায় আমতা আমতা করে বলল সুদর্শন. 'কিন্তু তার সঙ্গে এই খুনের সম্পর্ক কোথায়?'

বাঁকা হেসে রাজীব বলল, 'সেজন্যই জানতে চেয়েছিলাম তরঙ্গমালাকে আপনার সুন্দরী বলে মনে হত কি না। অবশ্য আপনি যা বলেছেন তাও সত্যি। এর থেকেই কাউকে খুনি বলে প্রমাণ করা যায় না।'

নয়

কামরার মধ্যে একটা থমথমে আবহাওয়া। অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি কেউ। সুদর্শন মুখ নিচু করে কিছু লক্ষ্য করছিল, কিংবা চিন্তা করছিল মনে। রাজীব দেওয়ালের সবুজ রং, জানালার পর্দার বিচিত্র নকশা, ক্যালেন্ডারের একটি রমণীর ছবি, ঘরের এক কোণে রাখা বড় সাইজের জয়পুরী কাজ করা ফুলদানির উপরের দীঘল রজনীগন্ধা এবং আরো অনেক কিছুর উপর চোখ বুলোচ্ছিল।

সুদর্শন চক্রবর্তীকে কেমন বিপর্যস্ত দেখাল। মনের মধ্যে একটা অশান্ত ঘূর্ণিঝড়ের দাপাদাপি চলছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সুদর্শন বোধহয় কেন্দ্রচ্যুত। মুখ তুলে সুদর্শন বলল, 'খুনের ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন ইন্সপেক্টর?'

রাজীব ঈষৎ হাসল। 'করছি না বললে মিথ্যে বলা হবে। ইয়েস আপনিও একজন সাসপেক্ট মিস্টার চক্রবর্তী। তবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি তো আপনি একা নন। পাঁচ ছ'জন। এখন তদন্ত করে দেখতে হবে সাক্ষ্যপ্রমাণ কার বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পাওয়া যাচ্ছে।' কয়েক সেকেন্ড থেমে রাজীব পুনরায় বলল, 'অবশ্য সাসপেক্ট মানেই যে খুনি নয় একথা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

সুদর্শন কী যেন চিন্তা করল। বলল—'আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন ইন্সপেক্টর?'

রাজীব তাকাল। বলল, 'আর বেশিক্ষণ নয়। বড়জোর আধঘণ্টা ডিটেন করব আপনাকে। মথুরাপুরে কাকে যেন রিসিভ করতে যাবেন বলছিলেন?'

সুদর্শনের কণ্ঠস্বর কেমন স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে ভিজে শোনাল। সে বলল, 'আর বলেন কেন? আমাদের কোম্পানির একজন ডিরেক্টর আসবেন আড়াইটের ট্রেনে। ওঁকেই স্টেশনে রিসিভ করার কথা আছে।'

রাজীব বলল, 'আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব, কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনাকে করব। আপত্তি না থাকলে উত্তর দিন।'

'বলুন।' —সুদর্শন অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল।

'আপনি বিবাহিত নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার স্ত্রী দিকনগরেই থাকেন তো?'

সুদর্শন ঘাড় নাড়ল। 'উনি সব সময় থাকেন না এখানে। কলকাতায় মানুষ। আমার শ্বশুরমশায় খুব বড়লোক। দিকনগরে এসে আমার স্ত্রীর মন টেঁকে না। মাঝে মাঝে অবশ্য আসেন। দু' চারদিন থেকে চলে যান আবার।'

'আপনার এখানের ঘর-সংসার তাহলে কার হাতে?'

'কার হাতে আবার? চাকরবাকর, বয় বাবুর্চির হাতে।

'আপনি মাঝে মাঝে কলকাতায় যান তো? ধরুন ফি শনিবারে—?'

'পাগল হয়েছেন।' সুদর্শন ম্লান হাসল। 'একটা মিলের চার্জে থাকলে এক মিনিট আপনি স্থির থাকতে পারবেন না। ফি শনিবারে কেন, অনেক সময় মাসে একবারও আমার যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই অনুযোগ করেন এর জন্য।'

সুদর্শন একটু হাসল। বিষাদক্লিষ্ট হাসি। বলল, 'ইন্সপেক্টর, সব কিছুই পৃথিবীতে অভ্যাস। স্ত্রীর সঙ্গে বাস মানুষের একটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। অনভ্যাসটা রপ্ত হয়ে গেলে অভিযোগ অনুযোগের প্রশ্ন ওঠে না। দু'পক্ষের বেলাতেই এ কথা খাটে।'

রাজীব স্বীকার করল কথাটা। বলল, 'তাহলে তো আপনি ভাগ্যবান মানুষ। সংসার করেছেন অথচ সংসারের বেড়ি পরতে হয়নি।' একটু থেমে রাজীব পুনরায় প্রশ্ন করল, 'আপনার ছেলেমেয়ে কটি?'

সুদর্শন বিচিত্র হাসল। বলল, 'নো ইসু অ্যাজ ইয়েট।'

রাজীব বলল, আপনি কতদিন হল বিয়ে করেছেন ম্যানেজার সাহেব?'

'বিলেত থেকে ফিরবার কিছুদিন পরই বিয়ে করি আমি। তা চার বৎসরের বেশি,—হ্যাঁ ঐরকমই হবে।'

রাজীব সামান্য কিছুক্ষণ চিন্তা করল। বলল, 'আমার প্রশ্নগুলো এবার আরো একটু ব্যক্তিগত শোনাবে। কিন্তু আপনি যদি উত্তর দেন তাহলে আমার পক্ষে তদন্তের সুবিধে হয়।'

'বেশ তো। কী জানতে চান, বলুন।'

অর্থপূর্ণ হেসে রাজীব বলল, 'তরঙ্গর সঙ্গে আপনার পরিচয়, মানে ঘনিষ্ঠতা কতদিনের?'

সুদর্শন চক্রবর্তী নড়েচড়ে বসল। বলল, 'আমার সব কথা আপনি বিশ্বাস করবেন ইন্সপেক্টর?'

—'কেন করব না? আপনি একজন সাসপেক্ট বলেই যে এলোমেলো মিথ্যে কথা বলবেন, তা ভাববার মত কোনো কারণ নেই।'

'দেখুন, তরঙ্গকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি' সুদর্শন ধীরে ধীরে বলল। 'প্রথম দিকে তরঙ্গই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল। মিল ম্যানেজারের ঘরে ঢোকবার জন্য টেলিফোন অপারেটরদের পারমিশন নিতে হয় না। ওদের জন্য ম্যানেজারের কক্ষেও অবারিত দ্বার। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কী ম্যানেজার সাহেব?'

'বাইরে থেকে টেলিফোনে কেউ কথা বলতে চাইলেই মিল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলা যায় না। আগে টেলিফোন অপারেটরকে নামধাম বলতে হবে। অপারেটর মিল ম্যানেজারকে সেই নাম-ঠিকানা শোনাবেন। ম্যানেজার রাজি হলে পরই তার টেবিলের টেলিফোনে ঝংকার বেজে উঠবে।'

কথা কেড়ে নিয়ে রাজীব বলল, 'কিন্তু এর জন্য টেলিফোন অপারেটরকে কি ছুটে আসতে হয় আপনার ঘরে?'

'ছুটে আসবার কথা নয়। অন্য লাইনে অপারেটর মিল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। আর তাই করেন সবাই। শুধু তরঙ্গ, তরঙ্গই প্রথম দিকে এই কাণ্ডটি শুরু করেছিল। টেলিফোন এলেই ও ছুটে আসত আমার ঘরে। নাম-ধাম বলে জানতে চাইত এ ঘরে লাইন দেবে কি না?'

'টেলিফোন রুমটা বুঝি আপনার ঘরের কাছেই?'

'কাছে মানে পাশাপাশি নয়। ঘরটা করিডোরের ঐ প্রান্তে।'

'তরঙ্গ ফি বারেই আপনার ঘরে এসে ঢুকত? আপনার কথা বলবার প্রয়োজন এবং ইচ্ছে আছে কি না জেনে নিত?'

'ঠিক তাই।'—সুদর্শন সায় দিল।

'আপনি আপত্তি করেননি?' রাজীব জানতে চাইল।

'প্রথম প্রথম মনে হত মেয়েটি নতুন চাকরিতে ঢুকেছে বলে ওর ঘর থেকে আমাকে সংবাদটা জানাতে ভয় পাচ্ছে। ভেবেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই কেটে যাবে ভয়টা। তখন লাইনের মাধ্যমেই সহজভাবে কথাবার্তা বলবে।'

'কিন্তু মাসখানেক পরও ওর ভয় কাটল না, এই তো?' রাজীব রহস্য করে হাসল। বলল, 'তখন কেন ওকে বারণ করে দেননি ম্যানেজার সাহেব?'

স্বীকার করতে লজ্জা নেই ইন্সপেক্টর। ইভন দি টপ বস ইজ মেড অফ ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড। তরঙ্গকে আপনি দেখেন নি। খুব টকটকে ফর্সা, টিকল নাক বা মস্ত টানা টানা চোখ ছিল না তরঙ্গর। কিন্তু যা ছিল সব মিলিয়ে তাই ইর্‌রেজিস্টিবল হয়ে উঠত। তরঙ্গ ঘরে এসে দাঁড়ালে কলম রেখে ওর সঙ্গে দু মিনিট কথা না বলে পারিনি। মাঝে মাঝে টেলিফোন তুলেও ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছি। কখনও প্রয়োজনে, কখনও সম্পূর্ণ অকারণে ইন্সপেক্টর।'

'কিন্তু তরঙ্গের উপর আপনার এই দুর্বলতার কথা মিলের মধ্যে জানাজানি হয়নি?'

ঠোঁট দুটি বন্ধ করে সম্মতিসূচক 'ম' ধ্বনির মত একটা শব্দ করল সুদর্শন। বলল, 'জানাজানি হয়নি মানে? এক সময় রীতিমত গুঞ্জন উঠেছিল এ নিয়ে। তরঙ্গই আমাকে বলেছিল ব্যাপারটা। কলকাতায় ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। এই মিলেরই কে তখন দেখেছিল আমাদের। ফিরে এসে সে রসালো করে গল্প করেছিল সকলের কাছে। তবে গত কয়েক মাস ধরে আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে কোনো কলরব ওঠেনি।'

রাজীব বলল, 'তরঙ্গ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয় ম্যানেজার সাহেব?'

'আকৃষ্ট হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। রমণীর মন ইন্সপেক্টর, যে কোন হত্যারহস্যের চেয়েও রহস্যময়। তবে প্রথম আলাপ এবং তার থেকে ঘনিষ্ঠতা সঞ্চারের ব্যাপারে তরঙ্গর ভূমিকা বিন্দুমাত্র নিষ্ক্রিয় ছিল না।'

'আপনি বিবাহিত একথা তরঙ্গ জানত?'

'জানত বৈকি। গত দু বছরে আমার স্ত্রী চার-পাঁচবার তো এসেছেন। দু-তিন রাত কাটিয়েও গেছেন বাংলোতে। তরঙ্গ নিশ্চয়ই ওকে দেখে থাকবে। তাছাড়া ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রী যে দিকনগরে এসে থাকতে চান না, এ নিয়ে খ্যাতি-অখ্যাতির নানা গল্প ছড়িয়ে আছে মিলে।'

'আপনি বলতে চান বিবাহিত জানা সত্ত্বেও তরঙ্গ আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। এবং আপনার ডাকে সাড়া দিত?'

'বিবাহিত লোক যে একটা সীমার মধ্যেই ঘুরপাক খাবে এ তথ্য নিশ্চয়ই তরঙ্গের জানা ছিল। তবে ঘনিষ্ঠতাই বলুন বা সাড়া দেওয়া-টেওয়াই বলুন, ব্যাপারটা তেমন বেশিদূর গড়ায়নি। আর গত কয়েক মাস ধরে তরঙ্গের দিক থেকে আগ্রহ বা আকর্ষণ বলতে কিছুই ছিল না।'

রাজীব বলল, 'বেশ তো, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। শেষের দিক এখন মুলতবি থাক। প্রথম দিক অর্থাৎ আদি-পর্বই শোনান ভালো করে।'

রসালো এবং সুড়সুড়ি জাগানো একটি প্রেমের কাহিনি শুনবে, এমনি একটা ভাব এবং কৌতূহল প্রকাশ করে রাজীব সান্যাল টেবিলের উপর ঝুঁকে বসল। বলল, 'আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিতে পারি তো ম্যানেজার সাহেব?'

'নিশ্চয়ই।' সুদর্শন অনুমতি দিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করল সুদর্শন। ওর কপালের চামড়ার ভাঁজ এবং বক্ররেখাগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। এবার সোজা হয়ে বসে সুদর্শন শুরু করল, 'তরঙ্গর দিক থেকে আমি খানিকটা প্রশ্রয় পেয়েছিলাম ইন্সপেক্টর। ওর প্রতি আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়ল। মনে মনে আমি ওর সঙ্গ কামনা করতে শুরু করলাম। কিন্তু দুর্বলতা জাগতেই মনকে শাসন করলাম। এত বড় একটা মিলের চার্জে আছি। সামান্য একটা টেলিফোন গার্লের কটাক্ষে আত্মহারা হয়েছি জানলে লোকে কী বলবে। দিকনগরে ওকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে কেলেঙ্কারির আর কিছু বাকি থাকবে না। সুতরাং আমার ঘরে ওকে ডেকে পাঠিয়ে কিংবা ও নিজে এসে দাঁড়ালে দু পাঁচ মিনিট কথাবার্তা হত বড়জোর, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু তরঙ্গই একদিন আমাকে পথের নির্দেশ দিল।'

'কী রকম?'

'কোম্পানির কাজেই আমাকে কলকাতা যেতে হল সেবার। অন্তত তিন-চার দিন থাকতে হবে। তরঙ্গ সেটা জানত। আমাকে এসে বলল, সেও কলকাতায় যাচ্ছে। হেড অফিসে গিয়ে আমাদের ডিরেক্টর উমেশপ্রসাদজির সঙ্গে দেখা করবে একবার। আমি জানতাম উমেশ প্রসাদ ওকে স্নেহ করেন। তাঁর সুপারিশেই দিকনগর পেপার মিলে ওর চাকরি হয়েছে। তরঙ্গের কথা শুনে আমি হেসে বললাম, তাহলে তো হেড অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার। কথা শুনে ও কিছু বলেনি ইন্সপেক্টর। শুধু ফিক করে হাসল।

'তারপর?' রাজীব আগ্রহী শ্রোতার মত বলল।

'হেড অফিস থেকে কাজ সেরে বেরিয়ে দেখি নীচের তলায় লিফটের কাছে তরঙ্গ দাঁড়িয়ে। মন-মর্জি ভালো ছিল না তখন। মার্চেন্ট অফিস মানে জানেন তো? নানা বিষয় নিয়ে ডিরেক্টরদের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। লিফটের কাছে তরঙ্গের মিষ্টি হাসিমুখ দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বললাম, কোথায় যাবেন এখন? ও ঠোঁট টিপে অদ্ভুতভাবে হাসল। বলল,—চলুন

না। যেখানে হোক,—যতদূর ইচ্ছে আপনার।'

'অর্থাৎ তরঙ্গই আপনাকে ভাসিয়ে নিলে গেল?' রাজীব একটু হেসে মন্তব্য করল।

সুদর্শন খানিকটা সহজ হয়ে আসছিল। বলল, 'ঠিক বলেছেন। উপমাটা ভারি সুন্দর হয়েছে আপনার। প্রত্যেক মেয়েই একটি তরঙ্গ,—জলতরঙ্গ ছাড়া আর কী? আর এ যৌবন জলতরঙ্গ রুখবার সাধ্য কি পুরুষমানুষের?'

সুদর্শনের পাইপের আগুনটা কখন নিভে গিয়েছিল। লাইটারের সাহায্যে পুনরায় আগুন ছুঁইয়ে নিল সে। বলল,—'ওকে নিয়ে একটা ভালো রেস্তোরাঁয় এসে উঠলাম। লাঞ্চের সময় প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। এদিকে পেট চুঁইচুঁই, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। মনে হল তরঙ্গও কিছুটা ক্ষুধার্ত। বাড়ি থেকে কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছে কে জানে।'

রাজীব বলল, 'রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেলেন তো?'

সুদর্শন ঘাড় নেড়ে বলল, 'তরঙ্গ যেতে চাইল না। আমাকে বলল তার হাতে এখনও ঘণ্টা দেড় সময় আছে। মোটরে করে একটু বেড়িয়ে আসতে চাইল তরঙ্গ। কলকাতা ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে গিয়েছিলাম আমরা। ফিরবার সময় ওর বাড়ির কিছুটা তফাতে একটা মোড়ের কাছে নেমে গেল তরঙ্গ।'

'কিছুটা তফাতে কেন?'

সুদর্শন অল্প একটু ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল, 'ম্যানেজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা বাড়ির লোকের কাছে সেদিন গোপন রাখতে চেয়েছিল বোধহয়। পরে অবশ্য আর কোন গোপনীয়তা ছিল না। গাড়ি নিয়ে সরাসরি আমি তরঙ্গর বাড়ি গেছি, ওকে তুলে নিয়েছি গাড়িতে। এ নিয়ে মিস মজুমদারকে কখনও মুখভার করতে দেখিনি।'

রাজীব সান্যাল ভ্রূ কুঞ্চিত করে কী যেন ভাবল। বলল, 'আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করছি ম্যানেজার সাহেব। আচ্ছা, তরঙ্গ আপনার কাছে কি আশা করেছিল? কেন ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল আপনার সঙ্গে? শুধু বন্ধুত্ব, বসের কৃপাদৃষ্টি, না আরো কিছু?' রাজীব ঠোঁট কামড়ে পুনরায় ভাবছিল।

সুদর্শন বলল,—'আপনার এ প্রশ্নটা নিয়ে আমি আগেও চিন্তা করেছি ইন্সপেক্টর। তরঙ্গ আমার কাছে কী চেয়েছিল? কেন আমার সঙ্গে ও ঘনিষ্ঠতা করল? কী উদ্দেশ্য ছিল ওর? শুধু বন্ধুত্ব বললে আমি অস্বীকার করব ইন্সপেক্টর। এই মিলে বন্ধুত্ব করবার মত লোকের অভাব ছিল না তরঙ্গর। তার জন্য মিল ম্যানেজার পর্যন্ত দৌড়বার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া টেলিফোন গার্লের সিঁড়ি থেকে ম্যানেজারের ঘরটা অনেকদূর। বন্ধুত্বের বন্ধনটা খুব ক্ষীণ যোগাযোগ মাত্র।'

'তাহলে বসের কৃপাদৃষ্টির জন্য বলছেন?'

'তাও নয়। জানেন ইন্সপেক্টর, তরঙ্গকে আমি একটা প্রস্তাব করেছিলাম। আমার একজন পার্সোনাল ক্লার্কের প্রয়োজন হয়েছিল একবার। কোম্পানির স্যাংশন এল কলকাতা থেকে। মাইনেপত্র সাধারণ কেরানির চেয়ে কিছু বেশি। সে বসবে আমারই পাশের ঘরে। প্রয়োজনে এবং ডাক দিলেই তাকে আসতে হবে আমার কামরায়। ইচ্ছে হল পোস্টটা তরঙ্গকে দিই। টেলিফোন অপারেটরের চেয়ে কিছু মাইনে বেশি। ও হয়ত রাজি হয়ে যাবে। নিজের কামরায় ডেকে পাঠিয়ে তরঙ্গকে দিলাম সংবাদটা। ভাবলাম কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠবে তরঙ্গ। দুটি চোখ ধন্যবাদের ভাষায় চঞ্চল দেখাবে। কিন্তু তরঙ্গ রাজি হল না পোস্টটা নিতে। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।'

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল, 'এ ঘটনা কতদিন আগের?'

একটু চিন্তা করে সুদর্শন জবাব দিল, 'মাস আষ্টেক হবে। ইয়েস ইট ওয়াজ ইন জানুয়ারি লাস্ট।'

'ঐ পোস্টে আপনি আর কাউকে নিয়েছেন?'

'অনেকদিন পরে একজনকে নিতে হল। তরঙ্গ রাজি না হওয়াতে আমি খুব উৎসাহী ছিলাম না। ইন ফ্যাক্ট পোস্টটা ওকে মনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। মাস চারেক হল আর একটি মেয়ে জয়েন করেছে এই কাজে।'

'নতুন নেওয়া হল?'

'ঠিক নতুন নয়। আমাদের মিলেই কাজ করত মেয়েটি। স্টেশনারি অফিসের ক্লার্ক। মেয়েটি গ্র্যাজুয়েট, এবং কাজেকর্মেও সুনাম আছে ওর।

'কী নাম মেয়েটির?'

'আপনি কি চিনবেন ওকে? মেয়েটির নাম প্রভা,—প্রভা মুখার্জি। তরঙ্গের সঙ্গে একই মেসে থাকত।'

'আই সি। ঐ মেয়েটিই আপনার পার্সোন্যাল ক্লার্ক এখন? আচ্ছা, ওর সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার?'

'প্রভা মুখার্জি কাজকর্ম ভালোই করে। ইংরেজিটা মন্দ লেখে না। টাইপ জানে। আর এ ছাড়া কি বলতে পারি ওর সম্বন্ধে?'

রাজীব বলল, 'চার মাস ধরে ওকে দেখছেন। একটা ইমপ্রেশন নিশ্চয়ই হয়েছে আপনার?'

সুদর্শন বলল, 'মেয়েলি কৌতূহলটা বোধহয় একটু বেশি মিস মুখার্জির। তা ছাড়া শি ইজ এ বিট জেলাস।'

'জেলাস?' রাজীব সান্যাল কথাগুলি যেন লুফে নিল। বলল, 'জেলাসি কার উপর ছিল ম্যানেজার সাহেব? মিস মজুমদারের উপর নিশ্চয়ই?'

সুদর্শন ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'আমার তাই মনে হয়েছে ইন্সপেক্টর।'

প্রসঙ্গ বদলে রাজীব আবার তার আগের কথায় ফিরে যেতে চাইল। —'তাহলে দেখা যাচ্ছে তরঙ্গ বন্ধুত্ব কিংবা কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেনি। প্রশ্ন হল, এর কারণটা কী? উদ্দেশ্য কী ছিল ওর?'

সুদর্শন হেসে বলল, 'আমার কি মনে হয় জানেন? রূপসী মেয়েদের মনে দিগ্বিজয়ের নেশার মত একটা বাসনা লুকিয়ে থাকে। তরঙ্গের চরিত্রে এমনি একটা দিক আছে। এখন ওর সম্বন্ধে সত্যি মিথ্যে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে। স্তাবকের অভাব তরঙ্গের ছিল না। রূপ এবং রূপসীর পূজারী আর সব জায়গার মত দিকনগরেও প্রচুর। আমার মনে হয় তরঙ্গ আমাকেও জয় করতে চেয়েছিল। ও জানত আমি বিবাহিত, কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করি। আমাকে জয় করা কঠিন হবে না ওর পক্ষে। দশটা হেঁজিপেঁজি মানুষ ছেড়ে যদি ম্যানেজারের মত একটা শক্ত মানুষকে জয় করতে পারে তবে সে আনন্দ দিগ্বিজয়ের উত্তেজনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

রাজীব হাসল। —'কি জানি ম্যানেজার সাহেব। আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আপনি বলছিলেন যে কিছুদিন হবে তরঙ্গের দিক থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছিলেন না আপনি?'

সুদর্শন স্বীকার করল। —'একথা ঠিক। গত কয়েকমাস ধরে তরঙ্গ আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। এ ঘরেও সে কম এসেছে। অবশ্য আমি ডেকে পাঠালে ছুটে আসতে দেরি করেনি। আর কলকাতায় গেলে নানা ছলছুতোয় কিংবা এটা সেটা বলে আমার অনুরোধ আহ্বানকে ও উপেক্ষা করছিল।'

'এতে আপনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছেন ম্যানেজার সাহেব?'

'বিরক্ত হলেও কোনো উপায় ছিল না ইন্সপেক্টর। মেয়েদের মনে জোয়ার-ভাটা এখন-তখন হয়ে থাকে। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই।'

সুদর্শন ঘড়ির দিকে তাকাল। সম্ভবত ওর সময় হয়ে এসেছিল। লাঞ্চের পরই মথুরাপুর ছুটতে হবে ওকে। কোন ডিরেক্টর না কার যেন আসবার কথা। তাকে রিসিভ করবে স্টেশনে।

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'আপনাকে এবার ছেড়ে দিচ্ছি ম্যানেজার সাহেব। প্রয়োজন হলে না হয় আর একদিন বসা যাবে আপনার সঙ্গে। শুধু একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই লাস্ট কোয়েশ্চন টু ডে।'

সুদর্শন মুখ উঁচু করে রাজীবের প্রশ্ন শুনবার অপেক্ষা করল।

'ঘটনার দিন অর্থাৎ শনিবার রাত্রে আপনি কি দিকনগরেই ছিলেন?'

সুদর্শন বলল, 'ছিলাম। সন্ধের পর একটু বেরিয়েছিলাম অবশ্য। ফিরতে সামান্য রাত হয়েছিল।'

'রাত হয়েছিল মানে? শেষরাতের দিকে ফিরেছিলেন নাকি?'

'না, না। শেষরাত্তির হবে কেন? রাত এগারোটার মধ্যেই ফিরেছিলাম।'

'কোথাও গিয়েছিলেন তাহলে? মানে দিকনগর ছাড়িয়ে?'

'হ্যাঁ। কোথাও মানে, এমনিই বেড়াব মনে করে বেরিয়ে পড়লাম। মথুরাপুর ছাড়িয়ে কিছুদূরে গিয়েছিলাম। ঐ যে আলোকপুর বলে একটা জায়গা আছে না ওইখানে?'

রাজীব হেসে বলল, 'আলোকপুর! তাই না ম্যানেজার সাহেব?'

সুদর্শন জানতে চাইল, 'আপনি কখনও গিয়েছেন নাকি আলোকপুরে?'

'না, যাওয়ার সুযোগ হয়নি।' রাজীব উত্তর দিল 'কিন্তু এবার হয়তো যেতে হবে একবার।'

দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিল সুদর্শন। বলল, 'একটা টেলিফোন করে যখন খুশি চলে আসবেন। আচ্ছা, উইস ইউ গুড লাক অ্যান্ড সাকসেস।'

জিপে বসে সুব্রত ঢুলছিল। দু-তিনটে সিগারেট এরই মধ্যে ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছে। আধপোড়া অংশগুলি জিপের টায়ারের কাছে পড়ে। চারপাশে চনমনে রোদ, বাগানের গাছগাছালি, পক্ষীকুল এবং মিলের ছোটবড় কোয়ার্টার্সের নারীপুরুষ সবাই যেন দুপুর রোদে শান্ত হয়ে এসেছে। একটা নিঝুম ভাব ছড়িয়ে পড়তে দেরি নেই।

গাড়িতে উঠে আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপারটা সুব্রতকে শোনাল রাজীব।

অবাক হয়ে সুব্রত বলল, 'ওকে সাসপেক্ট বলে মনে করছেন, একথা কেন বলতে গেলেন রাজীবদা?'

'কী হবে বললে?'

'দোষী হলে ও খুব সাবধান হয়ে যাবে। আত্মরক্ষার জন্য জান দিয়ে লড়বে।'

তাচ্ছিল্য করে রাজীব বলল, 'কিচ্ছু করবে না। ওর ক্ষমতা কতদূর আমার জানা হয়ে গেছে। আসলে ও একটা কাগজের বাঘ।'

'লোকটা খুব স্নব, তাই না রাজীবদা?'

'বিলেত ঘুরে এসেছে। এতদিন বড় পোস্টে রয়েছে। কিছুটা স্নবারি থাকবেই।'

সুব্রত বলল, 'আপনি কিন্তু সাংঘাতিক লোক রাজীবদা। ক্যাশমেমো দেখে কী করে বুঝলেন যে মদ গিলতে সুদর্শন চক্রবর্তীই মেয়েটিকে নিয়ে হোটেলে ঢুকেছিল? অন্য কেউ তো হতে পারত?'

'ক্যাশমেমোটা তুমি দেখেছিলে সুব্রত?'

'বারে। আপনিই তো দেখালেন!'

'তাহলে শুধু দেখেছিলে। ওটা নিয়ে চিন্তা করোনি?'

'ক্যাশমেমো নিয়ে চিন্তা করবার কী আছে?' সুব্রত ধীরে ধীরে বলল।

'সব মিলিয়ে তিপ্পান্ন টাকার ক্যাশমেমো। মদ আর দুজনের খাবারদাবার। জুলাই মাসের শেষ দিকে এক দমকায় অতগুলো টাকা কে ছুঁড়ে দিতে পারে? নিশ্চয়ই কোনো শাঁসালো মস্তান, আর এ ক্ষমতা নিখিলেশ সেনের হবে না। সুতরাং সুদর্শন চক্রবর্তীর দিকে চোখ গিয়ে পড়ছে।'

সুব্রত হাসিমুখে তাকাল। দুর্বোধ্য একটা ধাঁধার উত্তর পেলে ছেলেরা যেমন খুশি হতে চায়, ওর মুখভাবটা তেমনি দেখাল।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ টেবিলের উপর টেলিফোনটা বেজে উঠল। খুব মনোযোগ দিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করছিল রাজীব। বিরক্তমুখে টেলিফোনের হাতলটা তুলে নিল সে। এত রাতে কে আবার জ্বালাতে চাইছে? কী খবর দিতে চায় তাকে?

অপর প্রান্তের গলা শুনল রাজীব, 'হ্যালো, আপনিই কি স্যর সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর রাজীববাবু?'

কৌতূহলি মন নিয়ে রাজীব উত্তর দিল—'হ্যাঁ, কী বলবেন চটপট বলুন।'

'তরঙ্গ-হত্যা কেসে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই স্যর।'

'বেশ তো, কী নাম আপনার?'

'আমাকে নাম বললে তো আপনি চিনবেন না স্যর—'

'কোথায় গেলে আপনার সাহায্য পাওয়া যাবে?' —রাজীব জানতে চাইল।

কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'দিকনগর পেপার মিলে চলে আসুন স্যর। আমি আপনার জন্য গেটে দাঁড়িয়ে থাকব।'

রাজীব মুচকি হাসল। বলল,—'গেটে দাঁড়াতে হবে না। আমি ঠিক আপনাকে খুঁজে নেব।'

—'সে কেমন করে হবে স্যর? আপনি তো আমায় চেনেন না, বা নামও জানলেন না।'

রাজীব উত্তর দিল, 'আপনাকে আমি চিনি মশাই, নামও জানি।'

লোকটার গলা কাঁপা কাঁপা শোনাল। টেলিফোনে সে বলল, 'কেন ঠাট্টা করছেন স্যর। আমাকে আপনি কস্মিনকালেও দেখেননি। মিথ্যে এ গরিবের সঙ্গে কেন ছলনা করছেন দাদা?'

রাজীব শব্দ করে হাসল। লোকটার কথাবার্তা বলবার ভঙ্গি বিচিত্র। কণ্ঠস্বরও অদ্ভুত,—কেমন জড়ানো। রাজীবের মনে হল মানুষটা ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। সম্ভবত ড্রিংক করেছে।

টেলিফোনে আবার বলল সে, 'আমার সাহায্য পেলে আপনার সুবিধে হবে স্যর। যদি চলে আসেন তো—।'

রাজীব উত্তর দিল 'বলেছি তো যাব। আপনাকে আমি চিনি। এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছি বলেই ধারণা আমার।'

'আমার নামও আপনি জানেন?' লোকটা সন্দেহের সুরে জানাল।

'মা বাবা আপনার নাম কী রেখেছিল তা অবশ্য জানিনে। তবে দিকনগরে আপনি যে নামে পরিচিত তা আমি জানি।'

'সেটা কি যদি অধমকে বলেন তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম স্যর।'

একগাল হেসে রাজীব প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি দারুণ ব্যক্তি। ভৈরব—ভৈরব দত্ত নাম আপনার।'

আশ্চর্য। ও প্রান্ত থেকে রাজীব আর কোনো সাড়াশব্দ পেল না।

দশ

সাততলা বাড়িটার চূড়োর দিকে মাথা তুলে তাকাল রাজীব। রাস্তা থেকে উঁচুতলার জানালা দরজা, সব কেমন ছোট ছোট লাগে। হাতের সিগারেটটায় শেষটান দিয়ে সেটা ফুটপাতে ফেলে দিল রাজীব। তারপর জুতোর নীচে চেপে দিল আগুনটুকু।

একতলাটাও রাস্তা থেকে সামান্য কিছু উঁচুতে। তিন চারটি সিঁড়ির ব্যবধান। হৃষ্টচিত্ত বালকের মত কয়েক লাফে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে রাজীব লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল। দেওয়ালে ছোট ছোট কাঠের ফলকে কিংবা প্লাস্টিকের অক্ষরে বিভিন্ন সব কোম্পানির নাম এবং তাদের অস্তিত্বের হদিশ। কেউ তিনতলায়, কেউ চারতলায়...কেউ বা সর্বোচ্চ, অর্থাৎ সাততলাতে। রাজীব তার ঈপ্সিত কোম্পানিটির নাম খুঁজছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কোম্পানির নামটি তার দৃষ্টিতে এল। অফিস এই বিল্ডিঙেরই পাঁচতলায়। রাজীব এবার খুশিমনে নিম্নগামী লিফটের প্রতীক্ষায় দাঁড়াল। লিফট নেমে এলেই সে পাঁচতলায় পৌছবার জন্য খাঁচাবন্দি হবে।

পাঁচতলায় বেটিশ অ্যান্ড রবসন কোম্পানির অফিসটা বাঁদিকে। ডান দিকে ছোট ছোট আরো দু-তিনটে অফিস। কিন্তু বাঁদিকটায় বেটিশ অ্যান্ড রবসনের নিরঙ্কুশ একাধিপত্য। অনেক লোকজন, কেরানীকুল বিশিষ্ট মনে কাজ করছে, ছোট ছোট কামরায় অফিসারদের বসবার স্থান। এক নজরে দেখেই রাজীব বুঝল। বেটিশ অ্যাণ্ড রবসন ছোট কোম্পানি নয়। মাঝারি তো বটেই, হয়তো বড়ই বলা যায়। হেড অফিসে প্রায শ'খানেক লোক কাজ করছে। ফ্যাকটরিতে এবং অন্যান্য শাখায় মিলিয়ে কর্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত কম হবে না।

এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে রাজীব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। ফলকে নাম লেখা—মিঃ টি মুখার্জি। সুইং ডোরের ফাঁক দিয়ে চকিত দৃষ্টি হেনে রাজীব লক্ষ্য করল, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের এক ভদ্রলোক টেবিলের ফাইলের উপর ঝুঁকে একমনে কী যেন পড়ছেন। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা চোখে। খুব গম্ভীর বলে মনে হল মানুষটাকে। সামনের দিকের চুলগুলি উঠে গিয়ে কপালটাকে আরো চওড়া দেখাচ্ছে। উর্দিপরা চাপরাশীর হাতে নিজের নাম আর পরিচয় লিখে পাঠাল রাজীব। এক টুকরো কাগজের উপর পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লিখল—রাজীব সান্যাল, সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর।

স্লিপ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান। এই ধরনের কোম্পানিগুলোকে রাজীবের ভালোই চেনা। সরকারী কর্মচারী এলেই ওরা সাদর আহ্বান জানায়। আর পুলিশ এলে তো দু'হাত গুটিয়ে আসার অবস্থা। এ ক্ষেত্রে সি. আই. ডি'র অকস্মাৎ আবির্ভাব নিশ্চয়ই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে ভাবিয়ে তুলেছে। কী এমন গাফিলতি হল কোম্পানির? কোন লুকোচুরিটা ধরা পড়ে গেল আবার! চিন্তা সেইটা নিয়ে। ভয়ের উৎপত্তি সম্ভবত সেখান থেকেই।

হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন মিঃ মুখার্জি। 'আসুন স্যর। বলুন, কী প্রয়োজনে আপনার আসতে পারি?' উর্দিপরা বেয়ারাটাকে চোখের ইঙ্গিতে সম্ভবত চা আনতে নির্দেশ দিলেন অফিসার।

রাজীব গদিআঁটা চেয়ারে আয়েসি ভঙ্গিতে বসল। বলল, আমি মথুরাপুর থেকে আসছি। একটা এনক্যোয়ারির ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার হবে।'

'মথুরাপুর? সে তো অনেক দূর!'

'হ্যাঁ। বাংলাদেশের এক প্রান্তে বটে!'

মিঃ মুখার্জি হাসলেন। বললেন,—'কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে স্যর?'

রাজীব কনুইয়ের উপর ভর রেখে টেবিলে উপর ঝুঁকে বসল।

—'আচ্ছা, মিস সুজাতা দাস বলে এক ভদ্রমহিলা আপনাদের এখানে কাজ করতেন?'

'সুজাতা দাস? —হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।' মিঃ মুখার্জি কিছুক্ষণ ভেবেই যেন মেয়েটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

রাজীব বলল, 'এই কোম্পানিতেই কাজ করতেন ভদ্রমহিলা!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের হেড-অফিসেই টেলিফোন অপারেটর ছিল মেয়েটি। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা!'

'অনেকদিন তো হবেই।' রাজীব সায় দিল, 'দু বছরের বেশি। এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে উনি দিকনগর পেপার মিলে চলে যান।'

—'তা হবে। মিস সুজাতা দাস কোথায় চলে গেলেন অত আমার মনে নেই। ওর বদলে আর একটি মেয়েকে নিলাম আমরা। তিনিও বেটার চান্স পেয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। বৎসরখানেক হল আর একজন এসেছেন। তিনিও মিস দাস, —সুরভি দাস না কী নাম যেন।'

রাজীব সান্যাল ধীরে ধীরে বলল, 'মিস সুজাতা দাস সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন আছে আমার। আচ্ছা উনি এখানের চাকরী কেন ছেড়ে দিয়ে গেলেন বলতে পারেন? আমি শুনেছি উনি স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন—।'

—'কেন চলে গেলেন, তা চট করে বলা মুশকিল। তবে একটু খুঁজে ওর সার্ভিস ফাইলটা দেখলে হয়ত কারণটা জানা যাবে।'

—'সার্ভিস ফাইলে কী পাবেন আশা করছেন?'

'মানে ওর রেজিগনেশন লেটারটা দেখতাম। কেন উনি ছেড়ে যেতে চাইলেন তা নিশ্চয়ই লেখা থাকবে।'

'কালি-কলমে যে কারণই দর্শানো থাক, তাতে আমি ইন্টারেস্টেড নই। আচ্ছা আপনাদের অফিসে মিস সুজাতা দাসের সঙ্গে কার ঘনিষ্ঠতা ছিল বলতে পারেন?'

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে চিন্তিত মনে হল। কপালে কোঁচকানো চিন্তার রেখা পড়ল। ভদ্রলোক বললেন, 'মিস দাসের সঙ্গে কার বন্ধুত্ব ছিল একথা চট করে বলতে পারছি না। আচ্ছা দাঁড়ান, একজনের কাছে খোঁজ নিচ্ছি।'

বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন মিঃ মুখার্জি। ইতিমধ্যে নকশাশোভিত ট্রের উপর চায়ের কাপ সাজিয়ে সে এদিকেই আসছিল। টেবিলের উপর ধূমায়িত চায়ের কাপ রেখে লোকটি চলে যাবে কি না ভাবছিল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ডাকলেন ওকে।

'ডেসপ্যাচ সেকশনের সুরেশবাবু এসেছেন না? যদি ঘরে থাকেন তো ডেকে আনো ওঁকে।' মিঃ মুখার্জি আদেশ করলেন।

একটু পরেই বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়সের একটি কালো ছিপছিপে ভদ্রলোক ঘরে এসে দাঁড়াল। লোকটির চুল সুন্দরভাবে ব্যাকব্রাশ করা। এমনও হতে পারে যে, সিট ছেড়ে উঠে আসবার আগেই সে চুলে চিরুনি বুলিয়েছে। লোকটির গলা সুন্দরী মেয়েদের মত ঈষৎ লম্বা। ডানদিকে ঘাড় কাত করে দাঁড়াবার ভঙ্গি।

মিস্টার মুখার্জি বললেন,—'আচ্ছা সুরেশবাবু, আমাদের অফিসে মিস সুজাতা দাস বলে একটি মেয়ে কাজ করত না? টেলিফোন অপারেটর—। আপনার মনে পড়ে?'

দেখা গেল সুরেশবাবু মিস দাসকে ভোলেনি। সামান্য একটি হাসির আলোতে চোখদুটি উজ্জ্বল দেখাল সুরেশবাবু। ঈষৎ হেসে সে বলল, 'উনি তো আমাদের অফিস থেকে হঠাৎ চলে গেলেন।'

'হঠাৎ মানে?' রাজীব চোখ তুলে তাকাল।

'মানে, কোনোরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে। একদিন সকালে এসে দুম করে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে

দিলেন ম্যানেজারের ঘরে। বিকেল থেকেই ওর রেজিগনেশন অ্যাকসেপটেড্ হয়ে গেল। ব্যস, পরদিন সকাল থেকেই উনি আর এলেন না।'

'তাই নাকি?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল। —'চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে কোনো কথা আপনাদের বলেছিলেন নাকি?'

'কিচ্ছু না। স্রেফ শরীরের দোহাই দিয়ে রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় ওর শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। অথচ—।' লোকটি থামল।

'অথচ কী?'

'মিসেস দাসের স্বাস্থ্যের গণ্ডগোল আমরা আগে কোনোদিন শুনিনি। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে অমন অটুট স্বাস্থ্য আপনি বড় একটা পাবেন না।'

'মিস দাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছিল তো সুরেশবাবু?—'

'বন্ধুত্ব?' যেন আঁতকে উঠল সে। 'বলেন কী স্যর? মিস দাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল আমার! আমি তো তুচ্ছ একজন কেরানি। বেটিশ অ্যান্ড রবসন কোম্পানির কোন মনসবদারই কখনও মিস দাসের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেননি।'

কৌতূহল প্রকাশ করে রাজীব বলল, 'তবু অফিসে যখন কাজ করছেন তখন নিশ্চয়ই কোন কোনো লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা বেশি থাকবে। আর তার মধ্যেই কোনো একজন বা দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বাভাবিক।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়ল। —'কি জানি আমার তো ঠিক মনে আসছে না। যতদূর জানি কারো সঙ্গেই মিস দাসের তেমন ইয়ে, মাখামাখি ছিল না। তবে হ্যাঁ, একটি মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল মিস দাসের। আমার মনে আছে দুজনে একসঙ্গে বেরুত অফিস থেকে।'

'তাই নাকি?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল। 'সেই মেয়েটি কী কাজ করে এখানে?'

—'কার কথা বলছেন সুরেশবাবু?' অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের বিল সেকশনের জ্যোৎস্না কর স্যর। আগে যিনি গুহ ছিলেন।'

'উনি এসেছেন তো আজ?' রাজীব জানতে চাইল।

'এসেছেন বলেই জানি।' ভদ্রলোক সংক্ষিপ্ত হবার চেষ্টা করল। 'মিস দাসের সঙ্গে একমাত্র ওরই খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আপনি বরং ওকেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন।'

সুরেশবাবু চলে গেলে মিঃ মুখার্জি বেয়ারাকে আবার পাঠালেন। বিল সেকশনের জ্যোৎস্না করকে ডেকে আনতে। রাজীব লজ্জিত হয়েছে এমনি ভাব প্রকাশ করে বলল, 'আপনার দরকারি সময় কিন্তু অনেকখানি অপচয় হচ্ছে। আই অ্যাম রিয়্যালি সরি।'

'না, না। দুঃখিত হবার কী আছে। আপনি একটা এনকোয়্যারি নিয়ে এসেছেন,—আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাই তো আমাদের উচিত। একটু থেমে মিঃ মুখার্জি বললেন, 'কিন্তু স্যর, একটা বিষয় জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। এনকোয়্যারিটা কীসের? মিস দাস এর মধ্যে আসছেন কেন?'

রাজীব এদিক-ওদিক চেয়ে অফিসারের মুখোমুখি হল। বলল, 'এনকোয়্যারিটা ঠিক মিস দাসের সম্বন্ধে নয়। আপাতত ওর সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানবার প্রয়োজন হয়েছে মাত্র, আসল ব্যাপারটা অন্য।'

সি. আই. ডি ইন্সপেক্টরের ভাবভঙ্গি অফিসারকে আরো কৌতূহলি করে তুলল।

'অন্য ব্যাপার কী বলছিলেন স্যর?' একটি নিরীহ প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলেন অফিসার।

একটু চাপা গলায় রাজীব বলল, 'কয়েকদিন আগে একটি মার্ডার কেসের সংবাদ পড়েছিলেন কাগজে? দিকনগর পেপার মিলের একজন টেলিফোন অপারেটারকে কে বা কারা শ্বাসরোধ করে

মেরে ফেলে?'

'দ্যাট মার্ডার কেস,—আই সি।' অফিসার বিস্ময়সূচক ভঙ্গিতে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন।

রাজীব বলল,—'ঐ মার্ডার কেসটার তদন্তের ভার পড়েছে আমার উপর। আর সেইজন্যেই এতদূর ছুটোছুটি।' কথার শেষে রাজীব একগাল হাসল।

জ্যোৎস্না কর এসে ঘরে ঢুকল। ভারি মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গোছের। এককালে হয়তো কালোই বলা যেত। কিন্তু দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকার ফলে এবং যত্নে ও চেষ্টায় ত্বকের বর্ণ রৌদ্র আড়াল দেওয়া ইটচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাশে। এবং সে কারণেই উজ্জ্বল বা কিঞ্চিৎ ফর্সা দেখায়। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটির চোখদুটি। বেশ টানা টানা। চোখের পাতাগুলি বড়। ফলে মেয়েটি তাকালেই কেমন বিপন্ন অথচ সুন্দর মনে হয় ওকে।

'আমাকে ডেকেছেন স্যর?' মেয়েটি ধীরে ধীরে বলল।

'হ্যাঁ।' মিস্টার মুখার্জি ইঙ্গিতে ওকে বসতে বললেন।

মেয়েটি বসল। রাজীব দেখল ওর কপালে খুব বড় সাইজের একটা টিপ। সম্ভবত সিঁদুরের টিপ নয় ওটা, কোনো রং। আজকাল বাজারে তো কত রকমের সব প্রসাধন সামগ্রী উঠেছে। মাথায় মউচাকের আকারের বড় সাইজের খোঁপা। খুব সম্ভব মেয়েটি সুকেশী। ওর পরনে হাল্কা সবুজ রঙের একটা শাড়ি। গায়ের জামাটাও তাই। তবে অত্যাধুনিকাদের মত সেটা শ্লিভলেস নয়। জামার হাত বাহুমূল ছাড়িয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে।

'ইনি মিস্টার রাজীব সান্যাল। দিকনগর থেকে এসেছেন এখানে। আমাদের একজন পুরনো এমপ্লয়ির সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে। সেই এমপ্লয়ির নাম মিস সুজাতা দাস। আমি শুনলাম মিস দাসের সঙ্গে আপনার খুব বন্ধুত্ব ছিল। দেখুন, ইফ ইউ ক্যান হেল্প হিম।'

'সুজাতা দাস? মানে—।' মেয়েটি খানিকটা আবিষ্কারের উত্তেজনায় এবং কিছুটা আনন্দে বলে উঠল,—'সুজাতাদির কথা জানতে চান? যিনি আমাদের এখানে টেলিফোন অপারেটর ছিলেন?'

'ঠিক কথা। ওঁর সম্বন্ধেই আমার কিছু জানবার আছে। আপনি কি দয়া করে সাহায্য করবেন আমাকে?' রাজীব খুব সদাশয় এবং বিনীত হবার চেষ্টা করল।

মেয়েটি মাথা হেলাল। অর্থাৎ তার সাধ্যমত সে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে।

রাজীব অফিসারের মুখের দিকে চেয়ে বলল,—'মিস্টার মুখার্জি, আপনার কাজকর্মের খুব ক্ষতি করছি ভেবে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। তাই বলছিলাম কি, অন্য কোন একটা ঘরে বসে যদি মিসেস করকে আমি প্রশ্ন-ট্রশ্ন করতাম।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হল রাজিবের। লোকটা সম্ভবত বুদ্ধিমান। মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই তার কাছে দিকনগরের হত্যাকাণ্ড এবং তদন্তের নায়ক হিসেবে রাজীবকে যে বর্ণনা করেননি এই যথেষ্ট। খুনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে সে এসেছে শুনলে মেয়েটি ভীষণ ঘাবড়ে যেত। ভালো করে মুখ খুলত না তার কাছে।

'কিন্তু অন্য একটা ঘর—।' বলেই মুখার্জির হঠাৎ ভাবান্তর হল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের পারচেজ অফিসার শ্রীনিবাসন আজ আসেননি। আপনি ওই ঘরটাতে বসে কথাবার্তা বলুন। অসুবিধে হবে?'

রাজীব লোকটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হল। বলল,—'আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার মুখার্জি। যে কোনো একটা ঘর হলেই হবে। আধঘন্টার বেশি সময় লাগবে না আমার।'

অফিসার নিজে এসে বসিয়ে দিলেন ঘরে। সুইচ টিপে ফ্যানটা ঘুরিয়ে দিলেন। মেয়েটির দিকে চেয়ে বললেন, 'বসুন মিসেস কর। উনি কি জানতে চান শুনুন এবার।'

মিস্টার মুখার্জি চলে গেলে রাজীব মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। মুখ যদি মনের দর্পণ কিংবা ওর কাছাকাছিও হয় তাহলে জ্যোৎস্না করকে এখনও সহজ, স্বাভাবিক বলা যায়। ভয়ের

কোন রেখা, চিন্তার কোনো ঢেউ ওর মুখে ছাপ ফেলে যায়নি।

'এ অফিসে আপনি কতদিন আছেন মিসেস কর?' রাজীব ওকে নিয়েই প্রশ্নমালার পাতা খুলল।

মেয়েটি হাসল। বলল,—'চার বছর হয়ে গেল গত জুনে।'

'বাঃ। তাহলে আপনি এখানকার একজন পুরনো কর্মচারী। এ অফিসেই বরাবর কাজ করছেন, না অন্য কোথাও ছিলেন এর আগে?'

'এখানেই আমার হাতেখড়ি। বি. এ. পাস করেই ঢুকলাম।'

'সুজাতা দাসকে তো আপনি জানেন। উনি কি আপনার আগেই এখানে ঢুকেছিলাম?'

'সুজাতাদির কথা বলছেন? উনি আমার চেয়েও বছরখানেক আগে ঢুকেছিলেন এ অফিসে। তবে সুজাতাদি কেরানি ছিলেন না। টেলিফোন অপারেটর।'

'তা জানি।' রাজীব লঘু সুরে বলল, 'আচ্ছা মিসেস কর, সুজাতাদেবীর সঙ্গে আপনার তো বেশ বন্ধুত্ব ছিল, তাই না?'

কী ভেবে মেয়েটি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। তা ছিল।'

'আচ্ছা উনি কোথায় থাকতেন এখানে?'

'ভবানীপুরে একটা ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেল আছে। সেখানেই তেতলার ঘরে সুজাতাদি থাকতেন। সিঙ্গেল সিটের রুম—বেশ ভালো হস্টেলটা।'

রাজীব হেসে বলল—'সিঙ্গেল সিটের রুম, তাই না? আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই ওই হস্টেলে অনেকবার গিয়েছেন? মানে, সুজাতা দেবীর ঘরে?'

মেয়েটি আবার চিন্তা করল। অনেকদিন আগের ঘটনা। হয়তো সবটাই ঠিক ঠিক মনে আসছে না ওর। তাই উত্তর দিতে গিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

মেয়েটি ধীরে ধীরে বলল, 'হ্যাঁ হস্টেলে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। ছুটির দিনে কিংবা অফিস ছুটির পরও। সুজাতাদি বলতেন, 'চল না আমার ঘরে। সাত সকালে বাড়ি গিয়ে কী করবি?'

রাজীব মন দিয়ে শুনছিল। সে বলল, 'আচ্ছা মিসেস কর, বিয়ের আগে আপনি তো গুহ ছিলেন? আপনার বিয়ে কতদিন হয়েছে?'

জ্যোৎস্না করকে লজ্জিতা মনে হল। কর্ণমূলে ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাস। সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল সে। বলল, —'বছর দুই-তিন হল বিয়ে হয়েছে আমার।' ইংরেজি একটা সালের উল্লেখ করে মেয়েটি যোগ করল, 'সেটা অঘ্রাণ মাস, —নভেম্বরের পঁচিশ তারিখ।'

'আচ্ছা মিসেস কর, সুজাতা দেবী কেন এতবড় একটা কোম্পানির চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন বলতে পারেন?' একটু বিশ্লেষণ করবার ভঙ্গিতে রাজীব বলল, 'ধরুন কলকাতার উপর একটা চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুধু শুধু কোলিয়ারি মুলুকে ছোটার তো কোন মানে হয় না। আর নতুন চাকরীতে আমি শুনেছি মাইনে-পত্র এখানের মতই ছিল। বরং বেটিশ এ্যান্ড রবসনে বোনাস-টোনাস বেশি। সব খতিয়ে দেখলে লাভ নেই, লোকসানের ছবিটাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

মেয়েটি উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।

রাজীব বলল, 'দেখুন চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরিতে লোক যায় বৈকি। তবে নিঃসন্দেহে সেটা বেটার চান্স। আর নয়তো মনিবের সঙ্গে বনিবনা না হলে কিংবা প্রতিকূল পরিবেশ হলে চাকরি ছেড়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে। আচ্ছা, এখানে সুজাতা দেবীর সঙ্গে কর্তাদের কোনো খিটিমিটি হয়েছিল?'

মেয়েটি মুখ খুলল, 'কই তেমন কিছু মনে পড়ছে না। বরং আমি যতদূর জানি 'কাজে-কর্মে সুজাতাদির রীতিমত সুনাম ছিল। কেউ টেলিফোন করে সুজাতাদির গলায় কোনোদিন চড়া কথা শোনেনি।'

'স্ট্রেঞ্জ!' রাজীব মন্তব্য করল, 'ব্যাপারটা তাহলে রহস্যই থেকে যাচ্ছে। কালি-কলমে সুজাতা দাস অবশ্য পদত্যাগের একটা কারণ উল্লেখ করেছেন। সেটা তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির কথা। কলকাতায় তাঁর দেহমন টিকছিল না। সেজন্যই পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হল। কিন্তু—'রাজীব সান্যাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে ফের শুরু করল, 'আমার কী মনে হয় জানেন? সুজাতা দাসের হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পিছনে কোন আশাভঙ্গের কাহিনি রয়েছে। এবং সেটা আমার জানা দরকার। বাট হু ক্যান হেল্প মি? মিসেস কর, আপনি কি এভাবে জিনিসটা ভেবে দেখেছেন?'

জ্যোৎস্না ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ এভাবে ব্যাপারটাকে সে ঘুরিয়ে দেখেনি।

রাজীব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনার বিয়ে হল নভেম্বরে, আর মিস দাস কবে চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন?

শান্ত কণ্ঠে মেয়েটি উত্তর দিল, 'তার পরই তো চলে গেলেন সুজাতাদি। কী যে মাথায় এল ওর, তা ভগবানই জানেন। বিয়ের সময় পনেরো দিন ছুটি নিয়েছিলাম আমি। অফিসে জয়েন করতে এসে শুনলাম সুজাতাদি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। ওর হস্টেলে গিয়ে আরো অবাক। তারা বলল জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে হস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন উনি। কোথায় তা অব্দি কেউ বলতে পারে না।'

রাজীব সান্যাল গভীরভাবে চিন্তা করছিল। কয়েক সেকেন্ড পরে রাজীব বলল 'আচ্ছা ওই হস্টেলে মিস দাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু কেউ ছিল জানেন?'

মেয়েটি সরাসরি সম্ভাবনা নাকচ করে দিল। বলল,—'সুজাতাদি তেমন মিশতেন না কারো সঙ্গে। অন্তরঙ্গতা হবে কেমন করে? সিঙ্গেল সিটেড ঘরে থাকতেন। ঘর ছেড়ে বেরোতেন না বড় একটা। আমি গেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন।'

'তাই বুঝি?' রাজীব চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করল। হেসে বলল, 'এক ধরনের লোক আছে, বিশ্ব-সংসার থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়। তারা ঘরের দরজা সদাসর্বদা বন্ধ রাখে, রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকলে থামের আড়ালে কিংবা ওরই কাছাকাছি বসতে চায়। যাতে লোকজন তাদের না দেখতে পায়। এবং তারা সহজে চিহ্নিত না হতে পারে। সুজাতা দাস কি এমনি ধরনের তবে?'

'না, না।' জ্যোৎস্না প্রায় প্রতিবাদ করল, 'সুজাতাদি মোটেই কোটরে লুকিয়ে থাকবার পাত্রী নন। কাউকে পরোয়া করে চলবার স্বভাবই নয় সুজাতাদির। তবে কি জানেন, সকলকে ঠিক সহ্য করতে পারতেন না উনি। বিশেষ করে ছেলেদের। অফিসের কেউ কেউ সুজাতাদির সঙ্গে গায়ে পড়ে মিশতে গিয়ে রীতিমত ধমক খেয়েছিল।'

ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে রাজীব বলল, 'অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি আপনাকে। আধঘন্টার জায়গায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এবার আমার আর একটি প্রশ্নের জবাব দিন দিকি। আচ্ছা, বিয়ের দিন মিস দাস নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন আপনাদের বাড়িতে। বন্ধু-বান্ধবী, অন্তরঙ্গ মেয়েরা তো প্রায় সারাদিনই থাকে কনের সঙ্গে। মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, গল্পগুজব করে।—হইচই করে বিয়ের দিন কাটায়।'

জ্যোৎস্না করকে ভাবনাবন্দী মনে হল। খুব হতাশ এবং শীতল কণ্ঠে সে বলল, 'সুজাতাদি আমার বিয়ের দিন আসতে পারেননি। হঠাৎ অসুখে পড়ে সব বানচাল হয়ে গেল লিখেছিলেন।'

'লিখেছিলেন? কী অসুখ বললেন না তো?'

'বিয়ের দিন সন্ধেয় হস্টেলের একটি ঝি মেয়েকে দিয়ে সুজাতাদি প্রেজেন্টেশন পাঠালেন। বেশ দামী একটা সোনার আংটি। ছোট্ট একটা চিঠিতে লিখেছিলেন,—তিনি অসুস্থ। আসতে না

পারার জন্য দুঃখিত। আমি যেন তাঁকে ক্ষমা করি।'

'মেয়েটিকে আপনি জিজ্ঞেস করেননি কিছু? কি এমন অসুখ যে তিনি আসতে পারলেন না বিয়েতে?'

'তখন সবাই ভীষণ ব্যস্ত। বিয়েবাড়ির হই-হট্টগোল বুঝতে পারছেন তো? তবু ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কী অসুখ? ও বলতে পারল না। তবে দিদিমণিকে চাদর মুড়ি দিয়ে সারাদিন শুয়ে থাকতে দেখেছে বলল।'

রাজীব সান্যাল উঠে দাঁড়াল। বলল,—'ঠিক আছে মিসেস কর। আপনি এবার যেতে পারেন। মুখার্জি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমি বেরিয়ে পড়ব।'

—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?' দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব-কম্পিত স্বরে মেয়েটি অনুমতি চাইল।

'বেশ তো। কী জানতে চান বলে ফেলুন।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আপনি কে, কই তা তো বললেন না। সুজাতাদির চেনা-জানা নাকি? এত প্রশ্ন কীজন্য বলুন তো?'

খুব ভারিক্কী চালে রাজীব কথা কইল। জবরদস্ত অফিসারের ভঙ্গি। প্রশ্নকারিণীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রয়াস।.......

—'আমার নাম রাজীব সান্যাল। একটু আগেই তো শুনেছেন। দিকনগরে সুজাতা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। প্রয়োজন আছে বলেই এত প্রশ্ন করছি আপনাকে। এর বেশি জানতে চাইবেন না।'

ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় রাজীব আর একবার তাকাল ওর দিকে। ভারি সুন্দর মুখ। এমন একটা আলগা শ্রী রয়েছে যে ওর দিকে তাকালে দু-দশ সেকেন্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়।

রাজীব হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলল, 'আচ্ছা চলি তাহলে।'

হু হু করে ট্রেন ছুটছিল। এক্সপ্রেস গাড়ি,—প্রায় মাইল ষাটেক একটানা দৌড়ে স্টেশনে ধরবে। তার আগে বুড়ি ছুঁয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। গাড়ির মধ্যে রাত্রির তরল অন্ধকার। ঘড়ির দিকে তাকাল রাজীব। প্রায় সাড়ে সাতটা। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মথুরাপুরে পৌঁছবার কথা। মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠা স্টেশনের আলো, লোকজনের কলরব, ঘর-বাড়ি...কিংবা বিপরীত দিক থেকে সমান্তরাল অন্য লাইনে ধাবমান মাল কিংবা প্যাসেঞ্জার গাড়ির ইঞ্জিনের আর্ত হুইসিল। নইলে অন্ধকারের চাদরে ঢাকা সবুজ ধানখেত, প্রায় ঘুমন্ত ছোট ছোট গ্রাম, অথবা অশরীরী আত্মার মত বিরাটাকৃতি কোনো গাছের দীর্ঘ ছায়া।

আর একটু হলেই ট্রেনটা মিস করত রাজীব। কলকাতায় আজ চরকিবাজির মত পাক খেয়ে ঘুরছে সে। বেটিশ অ্যান্ড রবসন থেকে বেহালায় ছুটতে হয়েছিল তাকে। মিসেস মজুমদারকে কথা দেওয়া ছিল। খুব শীঘ্র তার সঙ্গে দেখা করবে। এত শীঘ্র যে হবে মিসেস মজুমদারও ভাবতে পারেননি। রাজীবকে দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়েছিলেন মিসেস মজুমদারও। তাঁর মনে হয়েছিল সামনের হপ্তায় সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর হয়তো কলকাতায় আসবে। কিন্তু এ যেন না চাইতেই মেঘের দেখা। মিসেস মজুমদারের কাছে থেকে সেই চিঠিটা সংগ্রহ করেছে রাজীব। বাড়ি গিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে অক্ষরগুলি পরীক্ষা করবে। নিখিলেশের সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কে এমন সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে গেল? কী তার স্বার্থ? তরঙ্গমালার ভালমন্দে তার কী যায় আসে?

ট্রেন ধীরে ধীরে স্টেশনে ঢুকল। পরিচিত গাছপালা, ঘরবাড়ি, শান্ত পৃথিবী। কলকাতার হইচই, এতদুর মফঃস্বলকে এখনও মুখর করতে পারেনি। রাজীব জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখল।

গাড়ি মথুরাপুরে এসেছে।

স্টেশনের প্লাটফর্মে শচীদুলাল দাঁড়িয়ে। রাজীব ওকে লক্ষ্য করে অবাক হল।

'কী ব্যাপার শচী?' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রাজীব প্রশ্ন করল।

'খবর আছে স্যর।' শচী কথার সাহায্যে তাকে প্রায় নাড়া দিল।

বলল, 'নিখিলেশ সেন ছাড়া পেয়েছে স্যর।'

'ছাড়া পেয়েছে? তার মানে?'

'জামিনে খালাস পেয়েছে।' শচী ভগ্নদূতের মত সংবাদ ব্যক্ত করল।

রাজীব একমুহূর্ত চিন্তা করল। শচীর কাঁধে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে হেসে বলল, 'সুসংবাদ দিলে শচী। ইয়েস, তদন্তের কাজে এবার সুবিধে হবে।'

'সুসংবাদ? বলেন কী স্যর?' শচী চোখদুটি প্রায় কপালে তুলল।

রাজীব আবার হাসল। বলল, 'ধৈর্য ধরো শচী। ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। সময়ে সব জানবে।'

এগারো

ভেজানো দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল কে যেন একটু উঁকি দিয়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে। খাটের উপর শুয়ে রাজীব লক্ষ্য করল ব্যাপারটা। শিকারী মার্জারের মত ওত পেতে বসবার ভঙ্গি করে সে উঠে বসল। তার কৌতূহল হল উঠে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু পরে কি ভেবে রাজীব নিরস্ত হল। ভাবটা, দেখাই যাক না, কতদূর আর গড়াবে? দরজার ফাঁক দিয়ে যে মানুষটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে সে আর কতক্ষণ আত্মগোপন করে থাকতে পারে? দেখা দেবে বলেই তো ও এতদূর উজিয়ে এসেছে। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে রাজিবের বরং হাসি পেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে গেল। রাজীব তেমনি বসে সময়টা আন্দাজ করতে চেষ্টা করল। চারটে বাজলে পড়ন্ত রোদ জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের সিলিঙের কাছাকাছি পৌঁছয়। কিন্তু রোদ এখনও সিলিঙে উঠতে অনেক দেরি। বেলা বড়জোর তিনটে,—কিংবা তার ধারেকাছে। রাজীব পুনরায় দরজার দিকে তাকাল। আশ্চর্য! দরজাটা আবার তেমনি ফাঁক হচ্ছে। একমাথা কালো চুল, পিটপিটে একজোড়া চোখ এবং সন্দিগ্ধ একপলক দৃষ্টি চকিত বিদ্যুৎচমকের মত একবার দেখা দিয়েই দরজার আড়ালে অদৃশ্য হতে চাইল।

দরজাটা আবার বন্ধ হতেই রাজীব বিছানা ছেড়ে উঠল। আর বেশি গড়িমসি করা উচিত হবে না। কে জানে ভয় পেয়ে লোকটা কী করে বসে। হয়ত গুটি গুটি উল্টোমুখে বাড়ির পথ ধরে হাঁটতে শুরু করবে। দুবার দরজা ঠেলেও যে ভিতরে এক পা দিতে সাহস করেনি, সে মানুষটার সৎসাহসের নিতান্ত অভাব। আর ওর ধরনধারণও যেন কেমনতর। ইচ্ছে করলে কড়া নেড়ে গেরস্থকে আহ্বান জানাতে পারত সে। কিংবা দরজা ঠেলে মুখ বাড়িয়ে নিজেকে ঘোষণা করতে চেষ্টা করা সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু লোকটা এর কোনোটাই করেনি। দরজা ঠেলতেও ওর দ্বিধা এবং কিছুটা শংকাও। আর কড়া নেড়ে নিজের উপস্থিতি জানাতে ওর সাহসে কুলোয়নি। রাজীব ভুরু কুঁচকে কী যেন আন্দাজ করতে চাইল। লোকটাকে ভালো করে দেখবার আগেই বোঝা যায় যে সে দ্বিধাগ্রস্ত, মনের মধ্যে একটা লুকোচুরি ভাব এবং সম্ভবত আত্মপ্রকাশ করতে, ও কিছুটা অরাজি।

দরজা খুলেই রাজীব লোকটিকে দেখতে পেল।.....

পরনে সদ্য পাটভাঙা ধুতি। ঊর্ধ্বাঙ্গে ঘি রঙের একখানা শার্ট। সেটা সিল্ক কিংবা অন্য ঐ ধরনের কিছু হবে। লোকটির মুখে বসন্তের দাগ, কিছুক্ষণ আগে পান খেয়েছিল বলে ঠোঁটটা এখনও সামান্য লাল। চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো। বোধহয় কেশ পরিচর্যায় ও কিঞ্চিৎ সৌখীন। কারণ খুব মিষ্টি সুগন্ধী তেলের একটা সুবাস রাজিবের নাকে এসে লাগল। লোকটির পায়ে খুব সুদৃশ্য একজোড়া স্যান্ডেল। ওর চেহারা এবং বেশবাসের সঙ্গে পাদুকা জোড়া বেশ মানানসই।

রাজীবকে দেখেই লোকটি একটা কাঁচুমাচু ভঙ্গি করে নমস্কার জানাবার চেষ্টা করল। খুব বিনীত এবং লজ্জিত একটি হাসি ওর ঠোঁটে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল।

'কী চান মশায়?' রাজীব সরাসরি জানতে চাইল।

'ইয়ে, আপনার সঙ্গে স্যর একটু কথা ছিল আমার।'

'বেশ তো। ভিতরে আসুন।'

'মানে ইয়ে—' লোকটি কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, 'আর কেউ ভিতরে যদি থাকেন তাহলে—।'

রাজীব হাসল।—উঁকি দিয়ে তাই দেখছিলেন বুঝি? কেউ ভিতরে থাকলে বোধহয় অ্যাবাউট টার্ন করে হাঁটা দিতেন?'

'আজ্ঞে না স্যর। তাহলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম কিছুক্ষণ। আপনি ফাঁকা হলে আসতাম কাছে।'

'কিন্তু এত ঢাক-ঢাক ব্যাপার কীসের মশাই? কী বলবেন আপনি? কী বারতা?'

'ইয়ে মানে ব্যাপারটা একটু প্রাইভেট অর্থাৎ গোপনীয় ছিল স্যর। আপনি যদি মন দিয়ে শোনেন—।'

'শুনব বৈকি।' রাজীব ওকে উৎসাহ দিল, 'কথা বলবেন বলে আপনি এতক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। আর আমি কি তা না শুনেই আপনাকে যেতে বলতে পারি। কৌতূহল বস্তুটা তো আমার দেহেও কিছুটা আছে।'

রাজীব কথা শেষ করে ওর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল।

লোকটি কিছু বলবে মনে করে সম্ভবত প্রস্তুত হচ্ছিল। এবং হয়তো সাহস সঞ্চয় করছিল অন্তরে।

হঠাৎ রাজীব বলল, 'আচ্ছা মশাই, আপনি কোথা থেকে আসছেন বলুন তো? দিকনগর থেকে নাকি?'

লোকটি মাথা হেলাল। অর্থাৎ সে ওখান থেকেই রওনা হয়েছে।

'আই সি।' রাজীব আঙুল কামড়ে কী যেন চিন্তা করল। বলল, 'বুঝতে পেরেছি মশায়। আপনি তো সেই মহৎ ব্যক্তি। আপনার সঙ্গে তো পরশু দিনই একদফা আলাপ হয়েছে আমার।'

ধরা পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে দোষীর মুখখানা যেমন নিস্পন্দ, শক্ত দেখায়, তেমনি মনে হল ওকে। একটা অব্যক্ত ধ্বনি প্রকাশ করে লোকটি যেন সহজ হতে চাইল।

রাজীব বলল, 'আপনি তো কালকেও এসেছিলেন, তাই না ভৈরববাবু? কী, নামটা ঠিক বলেছি? না ভুল হয়েছে আমার?'

'আপনার ভুল হবে? কি যে বলেন স্যর। মুখ দেখলেই মনের কথা জানতে পারেন আপনি।' লোকটি প্রায় স্তুতি করতে শুরু করল।

রাজীব বলল, 'ভিতরে আসুন ভৈরববাবু। সি. আই. ডি পুলিশের ঘরের দরজায় অতক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকতে নেই। ওতে লোকে ভুল বোঝে, বিপক্ষদল জানতে পারে। তাতে হিতে বিপরীত।'

ভৈরব দত্ত জুতো খুলতে যাচ্ছিল। রাজীব আপত্তি করল। জুতো ছেড়ে ভিতরে ঢুকবার মত কোনো কারণ নেই। এটা অফিস ঘর, দেবমন্দির নয়। সুতরাং জুতো খুলবার কোনো মানে হয় না।

ঘরে ঢুকে রাজীব চেয়ারে বসল। ভৈরব দত্তকে বসতে বলল অন্য একটিতে। টেবিলের উপরে রাখা সিগারেট প্যাকেট খুলে রাজীব ধূমপানের আয়োজন করল। ভৈরবকে অনুরোধ করবে কি না ভাবল। পরে মনঃস্থির করে সিগারেট প্যাকেটটা সরিয়ে রাখল।

রাজীব বলল, 'আমি শুনলাম গতকালও কে একজন এসেছিলেন আমার খোঁজে। আজ আপনাকে দেখেই মনে হল সে কথা। মন বলল কাল আপনিই এসেছিলেন এখানে। এখন দেখছি আমার আন্দাজ বেঠিক হয়নি।'

ভৈরব বলল, 'গতকাল শুনলাম আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন স্যর। তাই দিকনগরেই ফিরে যেতে হল।'

রাজীব উত্তর দিল, 'খুব প্রয়োজন ছিল যাবার। কাজ শেষ করে ফিরতে প্রায় রাত্তির নটা হল।'

ভৈরব বলল, 'টেলিফোনে আপনাকে বিরক্ত করা অব্দি মনে শান্তি পাচ্ছি না স্যর। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি মথুরাপুরে।'

রাজীব ভ্রূ কুঞ্চিত করে কী যেন ভাবল। অন্ধকার ঘরের প্রদীপের আলোর মত সামান্য একটু হাসির ছটায় মুখখানা উজ্জ্বল দেখাল রাজিবের। সে হেসে বলল, 'অশান্তিটা কীসের ভৈরববাবু? মনে হচ্ছে আমাকে কিছু বলবার জন্য আপনি রীতিমত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।'

'ঠিক ধরেছেন স্যর। কদিন ধরে আমার মনের ভিতরে একটা কথা খালি পাক খেয়ে ঘুরছে। সেটা বলবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছি স্যর। কিন্তু আপনার দেখা পাইনে। আবার দেখা পেলেও ফাঁকায় পাই কোথায়?'

রাজীব বলল, 'ভৈরববাবু, আপনার কাছে আমার যাওয়া উচিত ছিল, আজ বিকেলে হয়তো যেতামও। কিন্তু এ ভালো হল, এমনভাবে নিরিবিলি আপনার সঙ্গে বসবার সুযোগ হয়তো দিকনগরে হত না।'

'সেজন্যই তো এতদূরে আসা স্যর। কথাটা আপনাকে প্রাইভেটে বলতে চাই। পাঁচ কান হলে আবার,—মানে কার মনে কী আছে, বলা যায় না তো স্যর। কে কী ভেবে বসবে—।' ভৈরব বাকি অংশটুকু আর পরিষ্কার করবার প্রয়োজন মনে করল না।

একটু স্মরণ করবার ভঙ্গি করে রাজীব বলল, 'আমার মনে আছে ভৈরববাবু। পরশু রাত্রে আপনি টেলিফোনে বলেছিলেন কথাটা। তরঙ্গ মার্ডার কেসে আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান। সম্ভবত গোপনে আপনি দেখা করতে চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে।' অল্প হেসে রাজীব যোগ করল, 'মানে প্রাইভেটে।'

ভৈরব দত্ত নড়েচড়ে বসল। —'ঠিক মনের কথাটি বলেছেন স্যর। কত সহজে বুঝে ফেলেছেন আমাকে।'

রাজীব বলল, 'কিন্তু ভৈরববাবু, একটা কথা আমি ধরতে পারছি না। তরঙ্গ খুন হল শনিবার রাত্রে। আর আপনি আমাকে ফোন করলেন মঙ্গলবার, —সন্ধের পর। এর আগে আপনি চুপচাপ ছিলেন কেন? ইচ্ছে করলে সোমবার দিনই আমাকে ফোন করতে পারতেন।'

ভৈরব যেন উত্তর নিয়ে প্রস্তুত ছিল। বলল, 'আমি জানতাম স্যর, এ প্রশ্ন আপনি করবেন। কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি করে বলতে পারি, ভৈরব দত্ত আপনার সামনে একটি মিথ্যে কথা বলবে

না। তরঙ্গ খুন হয়েছে জানবার পর কথাটা আমি দারোগাবাবুকে বলব ভেবেছিলাম।'

'তাহলে সুব্রতকে বলেননি কেন?'

'সাহসে কুলোয়নি স্যর। মেয়েটা খুন হয়েছে শুনে মনে ভীষণ ভয় হল। খুনের ব্যাপারে মাথা গলাতে গিয়ে শেষে না ফ্যাসাদে পড়ি। তাই ভাবলাম কী দরকার এ নিয়ে কিছু বলবার। অন্ধকার রাতে কী দেখেছি, দিনমানে তা কি হলপ করে বলা যায়?'

রাজীব বলল, 'পরে বুঝি মন বদলে গেল?'

'তা যা বলেছেন স্যর।' ভৈরব দত্ত খুশি হয়ে বলল, 'মঙ্গলবার সকাল থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল আমার। ভাবলাম কথাটা চেপে যাওয়া ঘোরতর অন্যায় হবে। আমি যা দেখেছি, যতটুকু জানি তাই হয়তো খুনের তদন্ত করতে মস্ত সহায় হবে। কী থেকে কী যে হয়, তা কেউ বলতে পারে স্যর?'

'নিশ্চয়ই, রাজীব ওকে সমর্থন করল। —অন্তত মার্ডার কেসে ও কথাটা ভীষণ খাটে। কোথা থেকে কী যে হয়, তা বলা মুশকিল। এই ধরুন আপনি, এতদূর ছুটে এসেছেন আমাকে একটা সংবাদ দিতে। উদ্দেশ্য মহৎ—সহকর্মিণীর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পুলিশকে সাহায্য করতে চান। কিন্তু এমনও হতে পারে যে আপনার এই দৌড়ে আসার ব্যাপারটা একেবারেই আকস্মিক নয়। সমস্তটাই পূর্ব-পরিকল্পিত। হয়ত তরঙ্গমালা খুন হবার আগেই এ প্ল্যান তৈরি হয়ে আছে।' কথা শেষ করে রাজীব মুচকি হাসল।

ভৈরবের মুখখানা ঈষৎ ফ্যাকাশে দেখাল। ভীত শীতল কণ্ঠে সে বলল 'বিশ্বাস করুন স্যর, ঈশ্বরের দিব্যি, আমার মনে কোন ফন্দি-টন্দী নেই। এই কথাটাই আমি আগে ভেবেছিলাম স্যর। খবর দিতে গিয়ে যেন নিজে না ফেঁসে যাই। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, আর পুলিশে একবার সন্দেহ করলে তার থেকে নিস্তার নেই।'

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে না মশায়। কে আপনাকে সন্দেহ করছে! স্রেফ কথাচ্ছলে বলা। আপনি ঘাবড়াবেন না। কী বলবেন যেন?'

'দেখবেন স্যর। আপনিই ভরসা আমার। গরিবকে যেন ফাঁসিয়ে দেবেন না আবার। এ কথা আমি এখনও পর্যন্ত কারো কাছে ভাঙিনি। এমন কি ম্যানেজারবাবুর কাছেও নয় স্যর। পাঁচ কান করব না বলেই নিরিবিলিতে আপনার সঙ্গে বসতে চেয়েছি।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' রাজীব আশ্বাস দিল। ধীরে ধীরে মুখের চেহারাটা বদলাল ওর। এখন সিরিয়াস মনে হচ্ছে ওকে। হাল্কা, পরিহাসতরল কণ্ঠস্বর বদলে রাজীব প্রশ্ন করল, 'বলুন ভৈরববাবু, সে রাত্রে আপনি কী দেখেছিলেন? যা মনে আসে সবটুকু বলবেন, বিচার-বিবেচনা করে বলবার চেষ্টা করবেন না।'

ভৈরব দত্ত এদিক ওদিক চেয়ে অবাঞ্ছিতজনের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করল। বলল, 'রাত তখন সাড়ে দশটার মত হয়েছে স্যর। মিলের ভোঁ বেজেছে খানিকক্ষণ আগে। থার্ড শিফটের ভোঁ। আমাদের দিকনগরে ঘড়ির অত রেওয়াজ নেই। মিলে কাজ করি সবাই, —পেপার মিলের ভোঁ বাজলেই কটা বাজল, আমরা বুঝতে পারি। ওতেই আমাদের চলে যায়।'

'রাত সাড়ে দশটার সময় আপনি কোনখান থেকে আসছিলেন ভৈরববাবু?' রাজীব জানতে চাইল।

'বলছি স্যর। সন্ধের সময় সাহেব একবার মথুরাপুর স্টেশনে পাঠিয়েছিলেন আমাকে।'

'মথুরাপুরে? কেন বলতে পারেন?'

ভৈরব লজ্জিতভাবে হাসল। 'সন্ধে সাতটার ফাস্ট প্যাসেঞ্জারটায় মেমসাহেবের আসবার কথা

ছিল স্যর। সাহেব সকালবেলায় আমায় বললেন ডেকে। গাড়ি নিয়ে মথুরাপুরে যেতে হবে।'

'এ কাজে আপনিই বরাবর যান? ম্যানেজারসাহেব নিজে যান না স্ত্রীকে রিসিভ করতে?'

ভৈরব আবার হাসল। এবার লজ্জার হাসি নয়, রহস্য মেশানো অদ্ভুত হাসি। একটা চোখ ঈষৎ ছোট করে ভৈরব বলল 'নিজে যাবেন কী করে? মেমসাহেবের আসার কি ঠিক আছে? কথাটা আপনাকে প্রাইভেটে বলছি স্যর। দেখবেন, আবার যেন পাঁচ কান না হয়। ম্যানেজারসাহেব জানতে পারলে চাকরিটা যাবে। ছেলে বউ নিয়ে পথে বসব।'

রাজীব প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'পাঁচ কান কেন হতে যাবে? আপনি নিশ্চিন্তে বলে যান।'

'কী জানেন স্যর। বড় বাড়ির ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। স্বামী রইলেন এতদূরে পড়ে, আর স্ত্রী থাকবেন তার পিত্রালয়ে। আমাদের মেমসাহেবের মন-মর্জি বোঝা দায় স্যর। কোনো স্থিরতা নেই মতের। এই খবর পাঠালেন, দিকনগর রওনা হচ্ছেন। সাহেবের বাংলোতে সাজসাজ রব। গাড়ি নিয়ে স্টেশনে ছুটছি। ওদিকে কলকাতায় তার মত বদলে গেল। হয়তো ফেঁসে গেলেন কোন বন্ধু-টন্ধুর পাল্লায়। দিকনগর যাওয়া শিকেয় উঠল।'

রাজীব বলল, 'সেদিন সন্ধের সময় আপনি মথুরাপুরে গেলেন মেমসাহেবকে রিসিভ করতে? কোন ট্রেনে আসার কথা ছিল যেন?'

'আজ্ঞে সন্ধে সাতটার ফাস্ট প্যাসেঞ্জারটায়।'

'কলকাতায় সাড়ে তিনটের সময় যেটা ছাড়ে?'

'হ্যাঁ স্যর। আমি ইস্টিশানে পৌঁছবার দু'চার মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা এল।'

'কিন্তু তিনি এলেন না তো?'

'এসেছিলেন স্যর। তবে ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে নয়।' একটু থেমে ভৈরব পুনরায় শুরু করল, 'সাহেবকে আমি ইস্টিশানের কাছের একটা দোকান থেকে টেলিফোন করলাম। লোকটা আমাদের মিলের সাপ্লায়ার। ফোন ব্যবহার করতে চাইলে আপত্তি করে না।'

'কী বললেন ম্যানেজার সাহেবকে? মিসেস আসেননি?'

ঠিক তাই স্যর। উনি শুনে প্রথমে কিছু বললেন না। পরে শুধু বললেন, আচ্ছা।'

'তারপর?'

'আমার কিন্তু মনে হল পরের ট্রেনটা দেখে যাওয়া উচিত। মেমসাহেবের খেয়ালখুশির অন্ত নেই। যদি সন্ধের এক্সপ্রেসটায় উঠে বসেন। ইস্টিশানে এসে গাড়ি না পেলে কাউকে আর আস্ত রাখবেন না। রণরঙ্গিনী মূর্তিতে নেচে বেড়াবেন।'

'বলে যান ভৈরববাবু। থামলে চলবে না।' রাজীব ওকে উৎসাহ দিল।

সাড়ে আটটার এক্সপ্রেসটায় মেমসাহেব নামলেন স্যর। আমি নমস্কার করে দাঁড়াতেই উনি খুশি হয়ে একটু হাসলেন। দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে সাড়ে তিনটের প্যাসেঞ্জারটা ধরতে পারেননি। নইলে আগেই এসে পৌঁছতেন—।'

রাজীব বলল, 'তাহলেও দিকনগরে ফিরতে আপনাদের সাড়ে নটার বেশি হওয়া উচিত নয়।'

'সাড়ে নটা কেন স্যর?' নটার সময়ই এসে পৌঁছলাম দিকনগরে। আমাদের মিলের নতুন কেনা শাদা গাড়িটা নিয়ে গেছলাম। রাতে পথঘাট ফাঁকা। গাড়িটা প্রায় পাখির মত উড়ে এল।'

'মেমসাহেবকে পৌঁছে দিলেন বাংলোতে?'

'না স্যর। দিকনগর বাজারের কাছে আমি নেমে গেলাম গাড়িটা থেকে। গাড়ি মেমসাহেবকে নিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেল।'

'তার মানে? বাজারের কাছে আপনি হঠাৎ নামতে গেলেন কেন?'

ভৈরব দত্ত ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'এটা অবিশ্যি প্রাইভেট নয় স্যার। প্রায় সকলেই জানে। ইয়ে মানে, মাঝে মধ্যে একটু খাই স্যার।' হাতের আঙুলের সাহায্যে ভৈরব ছোট্ট একটি গেলাসের আকৃতি রচনা করতে চেষ্টা করল।

রাজিব বলল, 'গাড়ি ছেড়ে আপনি তাহলে ওয়াইন শপে ঢুকলেন?'

ভৈরব হেসে বলল, 'শপই বলুন আর বারই বলুন স্যার, —দিকনগরে এই একটিই সবেধন নীলমণি। আমাদের মত দু' পাঁচজনের আশাভরসা।'

'কোন দোকানটা বলুন তো?'

'আজ্ঞে আমাদের বীরেনের দোকানটা স্যার। তবে দোকানটা চালু। বোতলের ভালো জিনিস থেকে চোলাই মদ পর্যন্ত সব কিছু ওর দোকানে থাকে। আবার পিছন দিকে ছোট একটা ঘরও আছে। নিঃশব্দে দু'চার ঢোঁক গিলে আপনি বেরিয়ে পড়ুন। কাকপক্ষীতে টের পাবে না।'

'কতটা মদ গিলেছিলেন ওর দোকানে?' রাজিব ধমক দিল।

'বেশি নয় স্যার। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি। ম্যানেজারসাহেব দশটা টাকা দিয়েছিলেন আমাকে। কোথাও পাঠালে মাঝে মধ্যে এমনি দেন উনি। দশ বিশ টাকা ওঁর হাতের ময়লা স্যার।' একটু দম নিয়ে ভৈরব বলল, 'তাহলেই বিবেচনা করুন, দশটা টাকায় কতখানি মাল হতে পারে। বীরেন শালা এমনিতে ভালো। কিন্তু পয়সাকড়ির ব্যাপারে চামার। কানা আধলাও ধার দেবে না।'

'ওর দোকান থেকে কটার সময় বেরিয়েছিলেন মনে আছে?'

'বললাম না স্যার? সাড়ে দশটার মত রাত হবে। থার্ড শিফটের ভোঁ-টা খানিক আগেই বেজেছে। কী অন্ধকার রাত স্যার। পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। বাজারটা ছাড়িয়ে যেতেই দু'পাশ ফাঁকা। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। কেবল আমাদের মিলের বয়লারটার হিস হিস শব্দ কানে এসে লাগছিল।'

'তারপর? কী দেখলেন বলুন তো?'

'সুদামডির ওই মোড়টার কাছে আমি একটা লোককে যেতে দেখলাম।'

'কোথায় যেতে দেখলেন?'

'লোকটা বাজারের দিকে যাচ্ছিল।'

'আপনি ওই মোড়টার কাছেই লোকটাকে দেখলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। লোকটা খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল।'

'ওকে আপনি দিকনগরে আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে হয়?'

'কোনোদিন না।'

'লোকটা হয়তো কোন কাজে যাচ্ছিল বাজারের দিকে!'

'কি জানি স্যার। তবে লোকটার চাউনি দেখে আমার কেমন ভয় হল। আমার দিকে কটমট করে চেয়েছিল একবার, তারপরই হন হন করে হেঁটে চলে গেল।'

'কত বয়স হবে লোকটার?'

'বলতে পারব না স্যার। দাড়ি গোঁফওলা এক পাঞ্জাবি শিখ। কিন্তু লোকটার চোখ দুটো ভয়ংকর। অন্ধকারে যেন জ্বলছিল।'

'হবে কোনো ট্রাকের ড্রাইভার। প্রয়োজনে যাচ্ছিল বাজারের দিকে!'

ভৈরব দত্ত হেসে বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম স্যার। কোনো ট্রাকের ড্রাইভার কিংবা কন্ট্রাক্টর গোছের কেউ হবে। কিন্তু পরদিনই খুনের সংবাদটা পেয়ে আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে।'

'কী সন্দেহ?' রাজীব ওর চোখের দিকে তাকাল।

'লোকটা তরঙ্গকে মেরে হয়তো—।' ভৈরব মাঝপথেই থেমে গেল।

'আচ্ছা ভৈরববাবু, ছবি তোলায় আপনার হাত খুব ভালো। তরঙ্গর অনেক ছবি আপনি তুলেছেন। বিভিন্ন ভঙ্গিমায়,—তাই না?'

'কে বলেছে আপনাকে স্যর? ঐ হুলো মাগী নিশ্চয়?'

'হুলো মাগী? কার কথা বলছেন ভৈরববাবু?'

'ঐ যে সুজাতা বলে মেয়েটা স্যর। নামেই মেয়েমানুষ, ইদিকে ঢং ঢাং সব মরদের মত। তরঙ্গকে যেন আগলে বেড়াত।'

'বাজে কথা রাখুন।' রাজীব ওকে ধমক দিল।—'তরঙ্গমালার পিছু পিছু অনেক ভ্রমরই ঘুরেছে। লিস্টি করলে আপনার নামও তাতে দিতে হয়।'

'কি যে বলেন স্যর। ওই মাঝে মাঝে একটু ছবি তুলে দেওয়া ছাড়া আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। আর দেখছেন তো চেহারাটা। এতখানি বয়স, তাতে মুখে বসন্তের দাগ। তরঙ্গমালা কি এতে মজবার মত মেয়ে?'

রাজীব রহস্য করে হাসল।—'অত নিরাশ হবার কী আছে? প্রেমেতে মজিলে মন, —সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। বয়স তখন কোনো বাধাই নয়। আর বসন্তের দাগই হয়তো বসন্তের ফুল হয়ে ফুটবে মনে।'

কথা শেষ করে রাজীব ভৈরব দত্তকে ভালো করে দেখল। চুলে সুগন্ধী তেল মাখে লোকটা। পঞ্চাশের কোঠাতে দাঁড়িয়েও বেশ সতেজ এবং প্রফুল্ল। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সুন্দরী মেয়েদের ছবি তোলে ও! হয়তো তাদের পিছু পিছু ঘোরে। এবং সম্ভবত তাতেই খুশি। নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

রাজীব বলল, 'আজ আপনি আসুন তাহলে। দিকনগর থানার বড় দারোগার আসার কথা। সুতরাং আপনার—।'

কথা শুনেই ভৈরব দত্ত উঠে দাঁড়াল।—'চলি তাহলে স্যর। গরিবকে একটু দেখবেন। যেন ফেঁসে না যাই। আর আপনাকে প্রাইভেটে যা বললাম, তা যেন পাঁচ কান না হয় স্যর।'

রাজীব কোনো কথা বলল না। অল্প একটু হেসে ওকে আশ্বস্ত করল। ভৈরবের চোখের ঠিক নীচে খানিকটা মাংস থলথলে ফোলা ফোলা। না বলে দিলেও সহজেই ওটি চেনা যায়, —অ্যালকহলিক ফ্যাট।

শূন্য ঘরে বসে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করল রাজীব। বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এল। কোথাও পাখিদের জটলা,—কিচিরমিচির শব্দ কানে আসছে। ঘরের এক কোণে বেলাশেষের একটুকরো অবসন্ন রোদ্দুর।

কতকগুলো কাগজপত্তর নিয়ে রাজীব কি পরীক্ষা করছিল। ওর হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। কোনো গবেষক বিজ্ঞানীর মত কাগজের লেখার মধ্যে রাজীব কি যেন অনুসন্ধান করে ফিরছিল।

সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল। ওর উপস্থিতি প্রথমে টের পায়নি রাজীব। টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই আগন্তুকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন হল।

মুখ তুলে তাকিয়ে রাজীব বলল, একটা চিঠি দেখবে সুব্রত?'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ, চিঠি নিয়েই তো এতক্ষণ নাড়াচাড়া করছিলাম। চিঠি মানে অবশ্য প্রেমপত্র। তরঙ্গের বাক্সে অনেকগুলো চিঠি পাইনি আমরা।'

সুব্রত হেসে বলল, 'প্রেমপত্র পড়ছিলেন বুঝি রাজীবদা? কোন এক মিষ্টিমণিকে লেখা চিঠি নিশ্চয়ই। লেখক নিঃসন্দেহে নিখিলেশ সেন?'

'হ্যাঁ। নিখিলেশের চিঠিও রয়েছে এর মধ্যে। সবই প্রায় ওরই লেখা। এ ছাড়া তরঙ্গর মার চিঠি আছে। সেগুলি আমি আলাদা করে রেখেছি। বাকি শুধু একখানা চিঠি। এবং সেটাই তোমাকে পড়তে দিতে চাই।'

'আবার কার চিঠি?' সুব্রত কৌতূহল প্রকাশ করল।

'দেখই না। ছোট্ট চিঠি,—কিন্তু ভারি ইন্টারেস্টিং।' রাজীব পত্রখানা এগিয়ে দিল সুব্রতকে।

লেখার দিকে একনজর তাকিয়েই সুব্রত বলল, 'হাতের লেখা তো নিখিলেশবাবুর নয় রাজীবদা। কিন্তু কার এই চিঠি?'

স্থান বা তারিখের কোন উল্লেখ নেই পত্রে। তিন চার লাইনের ছোট্ট চিঠি। সুব্রত ধীরে ধীরে পড়ল—

আর কতদিন বাপের বাড়িতে থাকবে? এবার চলে এস। অনেকদিন হয়ে গেল না? তোমার অদর্শনে আমি যে শুকিয়ে যাচ্ছি।

চিঠির উত্তর চাই না। তার বদলে সশরীরে এলেই আরো খুশি হব।

এখানের সব খবর ভাল। আমার ভালবাসা নিও। ইতি

হাজব্যান্ড

সুব্রতর মুখে কোনো কথা নেই। চিঠিটা আরো একবার পড়ল সে। আশ্চর্য। খামের উপর একই হস্তাক্ষরে তরঙ্গের নাম এবং কলকাতার ঠিকানা লেখা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুব্রতর মুখে কোনো বাক্য সরল না।

রাজীব হেসে বলল, 'কী বড় দারোগাবাবু? একেবারে স্পিকটি নট হয়ে গেলে যে। ভেবে বল দিকি, এই স্বামী ভাগ্যবানটি কে?'

বারো

চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে সুব্রত বলল,—'মাপ করুন রাজীবদা। ও স্বামী-স্ত্রী খুঁজে বের করা আমার কম্মো নয়। কে কোথায় গোপনে কার পতিদেবতা সেজে বসে আছে, তা জানতে হলে খোদ বিধাতাপুরুষের কাছে যেতে হয়। বড় দারোগা কি সে কথা হাত গুনে বলবে?'

রাজীব সান্যাল চিঠিখানা হাতে নিয়ে নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করছিল। প্রথমে হাতের লেখা, কলমের কালি, পত্রের ভাষা লক্ষ্য করল। তারপর চিঠির বিষয়বস্তু ছেড়ে পত্রলেখা কাগজটাকে নিয়ে পড়ল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ কাগজটাকে নিরীক্ষণ করল রাজীব। কখনও কাছে, কখনও বা দূরে রেখে। অন্ধকারে ফেলে কিংবা আলোর রশ্মি ওর বুকে প্রতিফলিত করে পর্যবেক্ষণের কাজ চলতে লাগল।

পরীক্ষা শেষ করে রাজীব বলল, 'স্বামী মহাশয়ের ও পত্রখানা আমাকে খুব বেকায়দায় ফেলে দিল সুব্রত। তদন্ত করতে নেমে এখন দেখছি এক জটিল ধাঁধার সামনে পড়ে গেছি।'

সুব্রত কপালে বাঁ হাতটা রেখে খুব হতাশ একটা ভঙ্গি করে বসল। ভাবখানা এই যে, রাজীবদা যেখানে হালে পানি পাচ্ছেন না, সেখানে সুব্রত অসহায় শিশু। সুতরাং এ ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করছে না।

রাজীব বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে সুব্রত? চিঠির কাগজটা ঠিক গোটা নয়। এর খানিকটা আগেই কেটে ফেলা হয়েছে।'

'তাই নাকি?' সুব্রত সোৎসাহে বলল, 'কই দেখি চিঠিটা আর একবার।'

চিঠিটা পরীক্ষা করে স্থির হল সুব্রত! রাজীবদার কথাই ঠিক। কাগজের মাথার দিকটা খানিকটা কেটে ফেলে পত্রখানার রচনা শুরু হয়েছে। এবং হয়তো খুব তাড়াতাড়ি আঙুলের সাহায্যেই খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলে চিঠির একটা প্রান্ত কেমন অসমান, কোথাও ঢেউ খেলানো। আতসকাচের সাহায্যে উঁচুনিচু ভাবটা আরো স্পষ্ট দেখায়।

রাজীব বলল, 'ভালো করে আর একবার দেখো সুব্রত। কাগজটা দেখে আর কিছু মনে হয় তোমার?'

কিছুক্ষণ কাগজটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সুব্রত। হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, 'রাজীবদা, আমার মনে হচ্ছে এটা একটা লেটার প্যাডের কাগজ।'

ছাত্রের কৃতিত্বে গর্বিত মাস্টারমশায়ের মত মুখ উজ্জ্বল করে রাজীব বলল, 'সুন্দর বলেছ সুব্রত। আমি ঠিক এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম।' সুব্রতর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে রাজীব পুনরায় সেটা পরীক্ষা শুরু করল। বলল, 'কাগজটা বেশ দামী লক্ষ্য করেছ সুব্রত? এ দেশের মিলে এ কাগজ তৈরি হয় কি না বলা শক্ত।'

'কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে লেটার প্যাডের মাথার দিকটা ছিঁড়ে ফেলা হল কেন?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'এর একটাই মাত্র উত্তর হয় সুব্রত। স্বামী ভদ্রলোক বোধহয় আত্মগোপন করে থাকতে চান। তার মনে হয়তো আশংকা ছিল যে পত্রটা অন্য কারো হাতে পড়ে যাওয়া খুব অসম্ভব নয়। এবং তাহলে লেটার প্যাডের উপরের ঠিকানা থেকে পত্রলেখকের পরিচয় জানা যেত।'

'কিন্তু রাজীবদা, চিঠি যাকে লেখা হল সে নিশ্চয়ই পত্রলেখককে জানত?'

রাজীব হো হো করে হাসল। পরিহাসতরল কণ্ঠে সে বলল, 'কী যে তুমি বলো সুব্রত! হাজব্যান্ড তার বউকে চিঠি দিচ্ছে, আর বউ কিনা সেই পরমগুরুর পরিচয় জানবে না?' হঠাৎ রাজীবের কপালে দু'-একটি কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। অল্প কিছুক্ষণ চিন্তিত দেখল ওকে। কপালের কোঁচকানো রেখা কটি মিলিয়ে যেতেই রাজীব বলতে শুরু করল, 'অবশ্য তুমি যা বলতে চাইছ সুব্রত, তাও খানিকটা ঠিক হতে পারে। তরঙ্গের বাক্সে এই হাজব্যান্ড ভদ্রলোকের চিঠি মাত্র একটাই। সন তারিখ নেই পত্রে, এবং খামের উপর শীলমোহরের দাগ থেকেও তারিখটা ঠিক পড়া যায় না। সম্ভবত তরঙ্গ বেশ লম্বা একটা ছুটি কাটাচ্ছিল ওর মায়ের কাছে। এই সময় চিঠিখানা লেখা হয়েছে তরঙ্গকে। ভুয়ো প্রেমিক সেজে কেউ তরঙ্গকে এমনি উড়ো চিঠি যে লেখেনি, একথা জোর করে বলা যায় না।'

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, আর একটা জিনিস মনে হয়েছে আপনার? চিঠিটা যেন বড্ড ছোট। অমন সুন্দরী মেয়েকে এই একরত্তি চিঠি লিখে কি মনের কথা জানানো যায়?'

সুব্রতর পিঠে একটা আলগা চাপড় মেরে রাজীব বলল, 'এটা ভারি সুন্দর বলেছ বড়বাবু। চিঠিখানা সত্যি বড় ছোট। লোকটা দেখছি শুধু হাজব্যান্ডই, তরঙ্গের প্রেমিক নয়। প্রেমিক কখনও এতটুকু চিঠি লিখে ক্ষান্ত হবে না। আর একটা কথাও আমার মনে আসছে। চিঠিখানা যেন এক নিঃশ্বাসে লেখা। এর থেকে দুটো সিদ্ধান্তে আসা যায়।—'

সুব্রত কৌতূহলের সঙ্গে রাজীবের সিদ্ধান্তের কথা জানবার জন্য তাকিয়েছিল।

গলা পরিষ্কার করে রাজীব বলল, 'চিঠি লেখার ধরন দেখে মনে হয় ভদ্রলোক ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, কোনমতে দু' ছত্র লিখে পাঠিয়েছেন। আর নইলে বাংলা গদ্যে পত্র রচনায় তার অনভ্যাস। কলম দিয়ে কালি সরলেও অক্ষর যেন সরে না।'

'কিন্তু তদন্তের ব্যাপারে এই চিঠিটা কি খুব কাজে লাগবে রাজীবদা?'

'একটা কথা বলব সুব্রত?' রাজীব সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে শুরু করল, 'কোন্ বস্তুটি তদন্তের কাজে লাগবে আর কোন্টি অপ্রয়োজনীয়, তা এখনই বলার সময় আসেনি।' একটু থেমে রাজীব প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা সুব্রত, একটা প্রশ্ন তোমার মনে হয়?'

'কী প্রশ্ন রাজীবদা?'

'এই মার্ডার কেসের মূল কথা যেটা, অর্থাৎ মোটিভ বিহাইন্ড দি মার্ডার। আমার মনে হয় এর উত্তরটা এখনও ঠিক পরিষ্কার হয়নি।' রাজীব আবার সিগারেটে টান দিল।

আপত্তি জানিয়ে সুব্রত বলল, মোটিভ পরিষ্কার হয়নি একথা জোর করে কি বলা যায় রাজীবদা? আপনি যদি নিখিলেশকে খুনি বলে সাব্যস্ত করেন, তাহলে মোটিভ ফর মার্ডার ইজ অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ ডেলাইট।'

রাজীব হেসে বলল, 'তার মানে? তুমি আর একটু প্রাঞ্জল হও সুব্রত।'

'আমি বলতে চাই তরঙ্গের সঙ্গে নিখিলেশের বেশ ঘনিষ্ঠতা, —ইয়ে প্রেম-ট্রেম ছিল। এর যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তরঙ্গের মা স্বীকার করেছেন কলকাতায় নিখিলেশ এবং তার মেয়ে দুজনে এখানে-ওখানে ঘুরত।'

বাধা দিয়ে রাজীব বলল, 'আমি স্বীকার করে নিচ্ছে সুব্রত, দুজনের মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।'

'বেশ, তাহলে আপনি একথাও স্বীকার করুন যে তরঙ্গ আরো অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করত। এবং অনেকেই তার সঙ্গ কামনা করেছে। এদের কারো কারো সঙ্গে তরঙ্গ যে প্রেমের অভিনয় করেনি, একথা আপনি বলতে পারেন না।'

'আমি সেকথা বলতে চাই না সুব্রত।'

'অন্য পুরুষের সঙ্গে তরঙ্গের ঘনিষ্ঠতা, ভাব ভালবাসার গল্প নিখিলেশের কানে যে পৌঁছয়নি একথা কি বলা যায় রাজীবদা? বিশেষ করে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আব একজনের সঙ্গে তরঙ্গের ঘনিষ্ঠতাটা প্রেমের অধিক হয়ে প্রায় দাম্পত্য সম্পর্কের রূপ নিয়েছিল। তরঙ্গের এই গোপন অভিসার এবং প্রেমলীলার কথা নিখিলেশের কানে কি না গিয়েছে? আর প্রবঞ্চিত পুরুষের মনে যে দাহের সৃষ্টি হয়, তা কি উন্মত্ত প্রতিহিংসার রূপ নিতে পারে না রাজীবদা?'

'পারে বৈকি সুব্রত। সেজন্যই তো বলছিলাম হাজব্যান্ডের লেখা এই চিঠিখানা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' রাজীব নরম গলায় কথাগুলি শেষ করল।

সিগারেটটা কখন নিভে গিয়েছিল। রাজীব খেয়াল করেনি। টেবিলে রাখা লাইটারটা তুলে সিগারেটের মুখে সে অগ্নিসংযোগ করল। প্রথম চোটে দম শেষ করা এক টানে বেশ খানিকটা ধোঁয়া উদরস্থ করে রাজীব তাকাল। সুব্রতের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার দিকে চেয়ে রাজীব বলল, 'নিখিলেশকে ধরো আমরা নির্দোষ বলে মেনে নিলাম। তাহলে খুনি কে? নিশ্চয়ই অন্য কেউ। এবং সম্ভবত তরঙ্গের পরিচিত কোনোজন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

বাধা দিয়ে সুব্রত যোগ করল, 'শুধু পরিচিত বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না রাজীবদা। সে নিশ্চয়ই তরঙ্গের প্রণয়প্রার্থীদের একজন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তরঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ সে পেয়েছে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে সে ক্ষেত্রেও খুনের মোটিভ একই। তরঙ্গ নিখিলেশের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত জেনেই প্রণয়ী তাকে খুন করেছে।'

সুব্রত মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

বেলা মরে গিয়ে কখন সন্ধে নেমেছে বাইরে। অন্ধকার ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। কোথায় দূরে শাঁখে ফু দিচ্ছে মেয়েরা। ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে

সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল রাজীব। চাকরকে ডেকে দু কাপ চায়ের জন্য বলে আবার চেয়ারে এসে বসল।

সুব্রতর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে রাজীব বলল, 'মোটিভের কথা এখন বাদ দাও সুব্রত। শুধু মোটিভের দিকে তাকিয়ে খুনের তদন্ত করা ডিটেকটিভের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সব কেসেই মোটিভ সমান নয়। তদন্ত শেষ করে যে মোটিভ আবিষ্কার করা গেল, তা হয়ত বাস্তবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যই মনে হল না। অনেক সময় দেখা গেছে যে খুনের পিছনে মোটিভের প্রশ্নটা খুব বড় ছিল না। টাকাকড়ি, সম্পত্তি, বা কোন লাভের সম্ভাবনায় খুন না হয়ে থাকলে, শুধুমাত্র মোটিভকে তদন্তের মুখ্য অবলম্বন করা উচিত নয়। আর মানুষের মনের কথা শয়তানেরও অজানা। মোটিভ বা খুনের উদ্দেশ্যকে সঠিক আবিষ্কার করার পিছনে এটাই হল পর্বতপ্রমাণ বাধা।'

'মৃতের সঙ্গে খুনীর সম্পর্কটাকে ধরে নাড়া দিলে হত্যার উদ্দেশ্যটা কি পরিষ্কার হয় না রাজীবদা?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

রাজীব হেসে বলল, 'একটা কথা মনে রেখ সুব্রত। ডিটেকটিভ ট্রেনিং নেবার সময় আমরা শুনেছিলাম কথাটা। দি মোটিভ মোর অফন দ্যান নট রিমেনস দি ডার্ক সিক্রেট অফ দি মার্ডারার। আর সম্পর্কের কথা বলছ? ধরো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। স্বামী যদি স্ত্রীকে খুন করে তাহলে খুনের উদ্দেশ্য বা মোটিভ কী হতে পারে? এক নম্বর বলতে পার যে স্বামী অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। সুতরাং স্ত্রীকে পৃথিবী থেকে সরানো প্রয়োজন। দু' নম্বর ধরো, স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে হয়ত স্বামীর বিত্ত, সম্পত্তি বা ইনসিওরেন্সের টাকা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব স্ত্রীকে শেষ করা হল। আর তিন নম্বর ধরো, দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান অথবা একজন রোগে অশক্ত এবং দাম্পত্যজীবনে অপটু। এর ফলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল কর্তা কিংবা গিন্নির মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল রাজীব, 'মজার ব্যাপার কি জানো সুব্রত? এই তিন রকম মোটিভের কোনো একটি না থাকলেও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করছে কিংবা মহিলাই তার পতিদেবতাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

অবাক হয়ে সুব্রত বলল, 'বলেন কী রাজীবদা? এ কেমন করে সম্ভব?'

'সম্ভব নিশ্চয় সুব্রত। আমেরিকাতে এক ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলেন। খুনের পিছনে তেমন কোনো মোটিভ বা উদ্দেশ্য বহু চেষ্টা করেও আবিষ্কার করা যায়নি। খুবই অবাক হবার কথা। কিন্তু মহিলা কেন গুলি চালিয়েছিলেন শুনলে তুমি নিশ্চয়ই আরো অবাক হয়ে যাবে। ব্রিজ খেলতে বসে ভদ্রলোক একটা ভুল করে বসেন। শেষে খেলায় হার, পরাজয়কে মেনে নিতে পারলেন না মহিলা। আর তারই ফলে স্বামীকে প্রাণ হারাতে হল স্ত্রীর গুলিতে।'

সুব্রত বলল, 'তাহলে বলছেন মোটিভকে বড় করে দেখার এখন প্রয়োজন নেই?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে সুব্রত। অন্তত তরঙ্গ মার্ডার কেসে মোটিভ নিয়ে মাতামাতি করা ঠিক হবে না। মোটিভ যাই হোক একটা ছিল। তা কতখানি যুক্তিযুক্ত, সম্ভব-অসম্ভব,—সে নিয়ে এখনই আমাদের ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। মোটিভ ধরে খুনিকে বের করার চেয়ে, ঘটনার সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়াই এ ক্ষেত্রে ঠিক লাইন হবে বলে আমার ধারণা।'

সুব্রত হঠাৎ কী যেন মনে পড়েছে এমন একটা ভাব করে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'ঘটনার কথা বলছেন রাজীবদা। শুনেছেন নিশ্চয়ই শেষ খবরটা?'

'কী শেষ খবর আবার?' রাজীব স্মিতমুখে চাইল।

'নিখিলেশ জামিনে খালাস পেয়ে সুদামডিতে ফিরে এসেছে।'

'ও, হ্যাঁ। এ খবর তো আমি কাল রাত্রেই পেয়েছি। শচীদুলাল স্টেশনে ছিল। ট্রেন থেকে নামতেই আমাকে খবরটা দিয়েছে।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল।

'ডিস্ট্রিক্ট জজ জামিনে খালাস দিয়েছেন ওকে। পুলিশের তরফ থেকে যথারীতি আপত্তি জানানো হয়েছিল। কিন্তু জজসাহেব শুনলেন না। অবশ্য পুরোপুরি মুক্ত নয় নিখিলেশ। দিকনগর থানার চৌহদ্দি পেরিয়ে অন্যত্র সে যেতে পারবে না। এমন কি মথুরাপুর পর্যন্ত নয়। যতদিন তদন্তের কাজ শেষ না হচ্ছে, ততদিন নিখিলেশ সেনের যত্রতত্র যাওয়ার স্বাধীনতা নেই।'

কথা শুনে রাজীবের তেমন কোনো ভাবান্তর হল না। ঈষৎ হেসে সে বলল, 'এ তো ন্যায্য বিচারই হয়েছে সুব্রত। আমাদের তরফ থেকে আপত্তি করবার মত কোনো কারণ নেই। নিখিলেশ যদি চোখের সামনেই থাকে তাহলে মিছিমিছি তাকে জেলে পুরে রাখবার কী দরকার? আর তদন্তের কাজে নিখিলেশ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে এ হল নেহাৎই আজগুবি কথা। এতখানি ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাব প্রতিপত্তি সুদর্শন চক্রবর্তীর থাকলেও হয়তো বা সম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে নিখিলেশ সেনের কানাকড়ির মুরোদও নেই।'

চায়ের কাপ এসে হাজির হল টেবিলে। উষ্ণ ধূমায়িত চা। চামচের সাহায্যে চিনি নেড়ে নিতে আরম্ভ করে রাজীব বলল, 'তোমার বাড়ির মত সুন্দর চা নয় সুব্রত। তবু খেয়ে নাও কষ্ট করে।'

স্মিতমুখে সুব্রত চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাল।

রাজীব বলল, 'তুমি দিকনগর পেপার মিলের টেলিফোন অপারেটর ভৈরব দত্তকে চেন সুব্রত?'

'চিনি মানে দু-চারবার দেখেছি রাজীবদা। আলাপ-পরিচয় একবার হয়েও হল না। কারণ ভদ্রলোক তখন—।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাজীব বলল, 'অপ্রকৃতিস্থ এই তো?'

'বারে! আপনি কেমন করে জানালেন?' সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল।

রাজীব উত্তর দিল, 'আন্দাজ করেছি সুব্রত। কিন্তু তারপর? তুমি থেমো না,—বক্তব্য শেষ করো।'

সুব্রত বলল, 'ভদ্রলোককে একবার থানায় ধরে এনেছিল রামশংকর। রাত্রে বাজারের মোড়ে ডিউটি ছিল তার।'

'অপরাধ?'

'রাস্তার উপরে ভীষণ হই-হল্লা আর মাতলামি শুরু করেছিল ভৈরব দত্ত। কে একজন সঙ্গীও ছিল। দুজনকেই থানায় এনে হাজির করে রামশংকর।'

'সারারাত থানায় আটক ছিল নিশ্চয়?'

'অতটা বাড়াবাড়ি করিনি। ম্যানেজার সাহেবকে টেলিফোনে জানাতেই উনি লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন।'

'সুদর্শন চক্রবর্তীর তাহলে ভৈরবের সম্বন্ধে একটা সফট্ কর্নার আছে?'

একটু চিন্তা করে সুব্রত উত্তর দিল, 'মনে হয় রাজীবদা। আমি শুনেছি মিল ম্যানেজারের অন্দরে পর্যন্ত ওর আনাগোনা। বাড়ির নানা কাজকর্ম ভৈরবই করে।'

'কাজকর্ম মানে? কী কাজ করে সে?'

'তেমন কিছু নয়। ধরুন ওষুধ-টষুধের প্রয়োজন হলে ভৈরব দত্তকে ছুটতে হয় জেলা শহরে এমন কি কলকাতা পর্যন্ত। নানা কাজে মথুরাপুরে আসা তো হামেশাই লেগে আছে। ম্যানেজার সাহেবের জামাকাপড় কাচতে দিতে ভৈরবকে যেতে হয় স্টিম লন্ড্রিতে, অর্থাৎ আলোকপুরে আবার ধরুন, বাংলোতে হঠাৎ কোন পার্টি বা ভোজটোজ হলে ভৈরবকেই সব ভার নিতে হয় বলে শুনেছি। মাছের রান্না থেকে কক্‌টেল তৈরি পর্যন্ত সর্ব ব্যাপারে ভৈরবের কিছু না কিছু

ভূমিকা আছে।'

'তাহলে ভৈরব দত্ত মিল ম্যানেজারের দক্ষিণ হস্ত, কী বলো সুব্রত?'

'আমি তাই শুনেছি রাজীবদা। মিলে ওর খুব প্রতিপত্তি। ম্যানেজারের লোক বলে মিলের অনেকে ওকে এক-আধটু ভয় করে। সেদিন দেখলেন না, প্রভা মুখার্জি প্রায় স্বীকার করল কথাটা।'

রাজীব গম্ভীর মুখে বলল, 'ভৈরব দত্ত আজ এসেছিল এখানে।'

'এসেছিল? কী ব্যাপার, কেন এসেছিল রাজীবদা?'

মুচকি হেসে রাজীব জবাব দিল, 'পাঁচ কান করতে মানা করে গেছে।'

সুব্রত অভিমান করে তাকাল। মুখে কিছু বলল না।

রাজীব হেসে বলল, 'বেশ তো। পাঁচকান না হয় হোক, কিন্তু তুমি আবার সাত কান কোরো না কথাটা।'

'পাগল হয়েছেন।' সুব্রত ওকে আশ্বাস দিতে চাইল।

অগত্যা রাজীব সান্যাল মুখ খুলল,—'ঘটনার দিন রাত্রে ভৈরব দত্ত ঐ রাস্তা ধরে ফিরছিল। তখন প্রায় সাড়ে দশটা। সুদামডির মোড়ের কাছে একটা লোককে যে যেতে দেখেছে।'

'কোনদিকে যাচ্ছিল লোকটা?'

'ভৈরব বলল, লোকটা যাচ্ছিল দিকনগর বাজারের দিকে। কিছুক্ষণ আগে বীরেন শ'র দোকান থেকে মাল খেয়ে সে বাড়ির দিকে ফিরছিল। সুদামডির মোড়ের কাছে লোকটার সঙ্গে দেখা।'

'কোনো কথা হয়েছিল ওর সঙ্গে?'

'একটি শব্দ বিনিময়ও নয়।' একটু থেমে রাজীব বলল, 'লোকটি পাঞ্জাবি শিখ বলে ধারণা হয়েছে ভৈরবের। ওকে দেখে কেমন দ্রুত চলে যায় লোকটি। যাবার সময় ভৈরবের দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল।'

'আপনার কী মনে হয় রাজীবদা? তরঙ্গের খুন হবার সঙ্গে এর কি কোনো সম্পর্ক আছে?'

রাজীব খুব চিন্তা করে বলল, 'এর কোনো উত্তর দেওয়া এখনই সম্ভব নয় সুব্রত। কিন্তু সম্পর্ক থাকলে আমাদের ষোলো আনা ভোগান্তি। উটকো লোক এসে তরঙ্গকে খুন করে গেলে তদন্তের কিনারা করা দুরূহ। খুনের কেসে ডিটেকটিভের একটা মস্ত সুবিধে আছে হে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুনি মৃতের পরিচিত হয়ে থাকে। অ্যান্ড দি মার্ডারার রিমেন্স নিয়ার টু দ্য পি ও।'

'কিন্তু লোকটা কে রাজীবদা?'

'বিবরণ শুনে মনে হয় কোনো ট্রাকের ড্রাইভার কিংবা পাঞ্জাবি কন্ট্রাক্টর হবে। হয়তো সুদামডি থেকে ফিরছিল অত রাত্রে। দিকনগর বাজারে কোথাও এসে রাতটা কাটাবে বলে।'

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত শেষ হল। হঠাৎ রাজীবকে উৎসাহিত দেখাল। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি একটা কাজ কর সুব্রত। দিকনগরে পাঞ্জাবিদের একটা ডেরা রয়েছে না?'

সুব্রত মাথা হেলিয়ে সায় দিল। বলল, 'শহরে ঢুকবার একটু আগে আড্ডাটা। একটা হোটেল মত রয়েছে। সাধারণত পাঞ্জাবি ট্রাক-ড্রাইভাররা এসে ওঠে। ইচ্ছে করলে একটা রাত কাটায়। হৈ-হল্লা, ফুর্তিটুর্তি করে। নইলে খানাপিনা শেষ করেই দৌড়।'

'আড্ডাটা সম্বন্ধে তোমার কাছে কোনো রিপোর্ট হয়েছে?'

'কিছু না। লোকগুলি এমনিতে ভালো। কয়লা-ভর্তি ট্রাক নিয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালায়। ক্লান্তি বোধ করলে নিজেদের ডেরার কাছে নেমে পড়ে। দু-চার ঘন্টা কিংবা বড়জোর একটা রাত কাটিয়ে আবার ঝড়ের গতিতে ছুটে চলে।'

'কাল একবার ওখানে খোঁজ নিও সুব্রত। রাত সাড়ে দশটার পর কেউ ওখানে এসে উঠেছিল কি না। একটা কথা শুধু মনে রেখ, লোকটির সঙ্গে ট্রাক বা অন্য কোনো গাড়ি ছিল না। সে

পায়ে হেঁটে সুদামডির মোড় থেকে দিকনগর বাজারের দিকে যাচ্ছিল।'

'কিন্তু ভৈরব দত্তকে সে-রাতে কি কাজে যেন পাঠানো হয়েছিল না?'

'মিস দাস আমাদের সে কথা বলেছিলেন। তোমার হয়তো তাই মনে আছে সুব্রত। কাজটা কিন্তু মিলের নয়, মিল ম্যানেজারের।'

সুব্রত মন দিয়ে শুনছিল।

রাজীব বলল, 'ঘটনার দিন রাত সাতটার ফাস্ট প্যাসেঞ্জারটায় মিসেস চক্রবর্তীর আসবার কথা ছিল কলকাতা থেকে। এবং সে কারণেই ভৈরবকে পাঠানো হয়েছিল স্টেশনে। কিন্তু ভদ্রমহিলা ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে আসেননি। ভৈরব সে-কথা ফোন করে জানিয়েছিল ম্যানেজারকে। নির্দেশ না থাকলেও নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে পরের ট্রেনটাও সে অ্যাটেন্ড করে। এবং রাত আটটার একস্‌প্রেসটায় ভদ্রমহিলা এসে হাজির হলেন স্টেশনে। তাকে নিয়ে ভৈরব দিকনগরে পৌঁছায় ঠিক সময়ে। তখন ন'টা বেজে পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি হয়নি। বাজারের কাছে এসে মোড়ের মাথায় গাড়ি থেকে ভৈরব নেমে পড়ে। পরে সে দিকনগর বাজারে বীরেনের দোকানে মদ খেতে ঢোকে।'

'এ সব কথা সুদর্শন চক্রবর্তী কিন্তু আমাদের বলেনি রাজীবদা।' সুব্রত বলল।

রাজীবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল।—'অবশ্য আমরা এসব প্রশ্ন করিনি ওকে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আম্মাদের কাছে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে সুব্রত।'

'কী প্রশ্ন রাজীবদা?'

'প্রশ্ন হচ্ছে মিসেস চক্রবর্তী কবে ফিরে গেলেন কলকাতায়?' ভৈরব দত্ত এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। অথচ ঘটনার দিন সন্ধের পর সুদর্শন চক্রবর্তী আলোকপুরে গিয়েছিল। এবং বাংলোয় ফিরে আসতে তার একটু রাত্তির হয়। প্রায় এগারোটার মত। এ-কথা সুদর্শন চক্রবর্তীর মুখ থেকেই শোনা। তাহলে দেখা যায় যে, মিসেস চক্রবর্তী এই ঘন্টা দুয়েক সময় একাই ছিলেন বাংলোতে। অথচ পরের দিন তাঁকে কেউ দেখেছে বলে শোনা গেল না।'

সুব্রত বলল, 'এ-প্রশ্নের উত্তর তো সুদর্শন চক্রবর্তীর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে রাজীবদা?'

'তা হয়তো মিলবে। কিন্তু আর একটা ব্যাপার চিন্তা করেছ সুব্রত? তরঙ্গ যে-সময়ে খুন হয়েছে বলে আমরা আন্দাজ করছি, ঠিক সেই সময়টির কথা একবার ভাবো। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে, তারা তখন কে কোথায়? সুদর্শন চক্রবর্তী বলে, সে গিয়েছিল আলোকপুরে। হয়তো তখন আলোকপুর থেকে ফিরছিল ম্যানেজার। শশাংক ভট্চায কোলিয়ারিতে ছিল, ডিউটি দিতে ব্যস্ত। সুজাতা দাস মথুরাপুর থেকে বেরিয়ে দিকনগরের দিকে আসছিল। কিংবা হয়তো দিকনগরে সবেমাত্র পৌঁছেছে। প্রভা মুখার্জি তখন অনেক দূরে। এবং ভৈরব দত্ত মদের দোকানে মাল খেতে ব্যস্ত। বাকি থাকছে নিখিলেশ সেন। ঘটনার দিন রাত্রে সে কোথায় ছিল? বলা যায় না, তারও কোন অ্যালিবাই আছে। এ কাস্ট আয়রন অ্যালিবাই—' রাজীব স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল।

সুব্রত হেসে বলল, 'আপনি কিন্তু এক ছোকরাকে বাদ দিয়ে গেলেন রাজীবদা। বিশ্বনাথ বসু কি সন্দেহাতীত?'

'পাগল হয়েছ? খুনের তদন্ত হল দেওয়ানি মামলারও এক ধাপ উপরে। যত বেশি লোককে পক্ষ করবে, ডিক্রি তত বেশি পোক্ত হবে। বিশ্বনাথ বসুকে কালই দরকার আমার।'

সশব্দে দরজাটা খুলে গেল।

শচীদুলাল এরকম বিনা নোটিসেই ঘরে এসে উদয় হল। মনে হল ভীষণ ব্যস্ত সে। দ্রুত সাইকেলে প্যাডল করে এসেছে বলে এরকম হাঁপাচ্ছে।

রাজীব অভ্যর্থনা করে বলল, 'এস এস শচী, চেয়ারে বসে আগে একটু জিরিয়ে নাও।'

চেয়ারে বসেই শচীদুলাল সংবাদ দিতে সরব হয়ে উঠল, 'খবর আছে স্যর। সেই রুমালটার গায়ের নম্বরটার হদিশ করতে পেরেছি।'

মুখ উজ্জ্বল করে রাজীব বলল, 'সত্যি?'

সুব্রত প্রশ্ন করল, 'কোন রুমালটা রাজীবদা? যেটা ঘটনাস্থলে পাওয়া গেল? নিখিলেশের নামের আদ্যক্ষর লেখা ছিল না ওতে?'

রাজীব বলল, 'রুমালে একটা লন্ড্রিমার্ক ছিল সুব্রত। মাত্র একবারই সেটা কাচানো হয়েছিল লন্ড্রিতে। শচী বহু চেষ্টা করে ওর হদিশ করতে পেরেছে।'

শচীদুলাল খুব বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল, 'রুমালটা কে কাচতে দিয়েছিল জানেন স্যর?'

'কে?' রাজীব উৎসুক চোখে তাকাল।

'শশাংক ভট্চায। শুধু রুমাল নয় স্যর,—একটা ফুলপ্যান্ট, জামা আর ঐ রুমালটা।'

খুব গর্বিতভাবে শচীদুলাল এবার পকেট থেকে একটা জিনিস বের করল। লন্ড্রির রসিদ বই সেটি, মথুরাপুরের একটি ঠিকানা লেখা। এই শহরেরই লন্ড্রি।

রাজীব শশাংকের নামে লেখা সেই রসিদটি পড়ল। একটা সবুজ কাপড়ের ফুলপ্যান্ট, একটা সাদা শার্ট এবং ঐ রুমালটার উল্লেখ রয়েছে রসিদে। ঘটনার পরের দিন আগের তারিখ। চারদিন পরে মালের ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে।

শচীদুলাল বলল, 'লন্ড্রিওয়ালা একটা খবর দিল স্যর। পরশু দিন শশাংক নাকি আর এক প্রস্থ জামাকাপড় কাচতে দিয়ে গেছে। একটা সবুজ ফুলপ্যান্টও রয়েছে তার মধ্যে। হয়তো আগেরটা হতে পারে।'

রাজীব সোজা হয়ে বসল। 'ঐ ফুলপ্যান্টটা কালই এখানে নিয়ে আসবে শচী।' আদেশ করল সি আই ডি ইন্সপেক্টর।

রাজীবের চোখের সামনে একটা সবুজ গোলাকার বস্তু ট্রেন ছাড়বার নির্দেশজ্ঞাপক আলোর সংকেতের মত স্থির হয়ে জ্বলছিল। চকচকে সবুজ বোতামটার কথা বারবার মনে পড়ছিল রাজীবের। স্থানচ্যুত প্যান্টের বোতাম। এখন একটা আলোর সংকেত দিচ্ছে।

....সিনেমা হলে মাইকে গান দিয়েছে। নৈশ-বাতাসে ভেসে আসা সঙ্গীত আরো শ্রুতিসুখকর। মফস্বলের কলেজে পড়াশুনো রাজীবের। শো ভাঙবার পর এমনি গান দিত সেখানেও। পড়া বন্ধ করে রাজীব গান শুনছ।...কতদিন আগেকার কথা সব।

প্রথম যৌবনের গন্ধভরা মফঃস্বল কলেজের হাসি-উত্তাপের দিনগুলি কুয়াশাচ্ছন্ন নদীর ওপারের মত বহুদূর, ...অস্পষ্ট।

তেরো

'আপনার নামই বিশ্বনাথ বসু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দিকনগর পেপার মিলের পারচেজ সেকশনে আছেন তো?'

এবারও একই উত্তর। অর্থাৎ, পারচেজ অফিসেই ভদ্রলোকের কাজ।

রাজীব সান্যাল অপাঙ্গে চেয়ে দেখল। প্রভা মুখার্জি ঠিকই বলেছিল। ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। চব্বিশ, পঁচিশ কিংবা দু-এক বৎসর এদিক-ওদিকও হতে পারে। রোগা রোগা শ্যামলা চেহারা।

একমাথা কালো চুল। চোখ দুটি বেশ বড়, এবং সে কারণেই উজ্জ্বল। কথাবার্তায় চটপটে এবং সপ্রতিভ। মফঃস্বলে মানুষ হয়েছে বলে শুনেছিল। কিন্তু তাই বলে তেমন মুখচোরা বা লাজুক বলে মনে হল না ওকে।

সন্ধে হতে অল্প কিছু বাকি। দিনের আলো মরতে বসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবু ডুবু। নীড়াভিমুখী বিহঙ্গকুলের কূজন থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে। কারো কিচিরমিচির কাকলি, কারো বা কুক্ কুক্ ডাক। শেষ অপরাহ্লের নিস্তব্ধতা প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছে।

আধশোয়া ভঙ্গিতে চেয়ারের উপর বসেছিল রাজীব। মাথাটা চেয়ারের পিছনে হেলে পড়েছে। পায়ের পাতা চেয়ার থেকে দূরে মেঝের উপর প্রসারিত। বাঁ হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, দুই আঙুলের মাঝখানে চেপে ধরে আছে।

'অফিস থেকেই সোজা আসছেন বিশ্বনাথবাবু?'—

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিকেল চারটের সময় থানার একজন এ. এস. আই গিয়ে হাজির সেক্শনে। আমাকে বললেন, সন্ধের সময় একবার থানায় গিয়ে দেখা করতে হবে। বড়বাবু ডেকেছেন। অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবলাম, দেখাটা সেরেই যাই। নইলে সারাদিন অফিসে খেটে একবার ঘরে ফিরলে তখনই আর বেরিয়ে পড়তে পা ওঠে না।'

রাজীব বলল, 'বড়বাবু মানে আমিই আপনাকে দেখা করতে বলেছিলাম। অবশ্য ইচ্ছে করলে আমিও আপনার ওখানে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে সামান্য অসুবিধে দেখা গেল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটু নিভৃতে বসলে ভালো হয় বিশ্বনাথবাবু। বিশেষ করে এই ধরনের কেসে।' রাজীব ওর দিকে মুখ তুলে দেখল।

বিশ্বনাথ বলল 'থানায় ডেকে পাঠিয়েছে শুনলেই মনটা কেমন বিদ্রোহ করে ওঠে। নইলে একবার এসে দেখা করে যেতে আপত্তি কীসের? যাই হোক, কেন ডেকেছেন তা এবার নিশ্চয়ই বলবেন।'

রাজীব ঈষৎ হাসল। 'আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে কী প্রশ্ন করব, তা অবশ্য বলা শক্ত। কিন্তু কেন ডেকে পাঠিয়েছি তা একটুও ধরতে পারেন নি বিশ্বনাথবাবু?'

বিশ্বনাথ নিরুত্তর। কী যেন চিন্তা করছিল সে।

রাজীব বলল, 'আমার বিশ্বাস আপনি ব্যাপারটা ঠিকই আঁচ করেছেন। এবং কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি তা মোটামুটি জেনেও আপনার মনে একটা প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে আপনি এসে উঠেছেন থানাতে।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে রাজীব যোগ করল, 'তরঙ্গ মরেছে। কিন্তু আপনার কৌতূহল আর আকর্ষণ কিন্তু আজও অটুট, অমর।'

বিশ্বনাথকে বিরক্ত মনে হল। কিছুটা আহত এবং সে কারণেই ঈষৎ উত্তেজিত। সে বলল, 'আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলেই দেখা করতে এসেছি। কীসের কৌতূহল, বা কোন আকর্ষণের কথা বলছেন আপনি?'

রাজীব হেসে ফেলল। 'এই যা। আপনি দেখছি বিষম খাপ্পা হয়ে গেছেন। অথচ দুদিন আগেই সুদর্শনবাবু বলছিলেন আপনার কথা। খুব আলাপি আর ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ আপনি।'

'কী বলছিলেন ম্যানেজারবাবু? আমার সম্বন্ধে হঠাৎ কথা হল কেন?'

রাজীব তেমনি হাসছিল। বলল, 'ম্যানেজারবাবুর কথা আবার বলে ফেললাম আপনাকে। অথচ কথা দেওয়া ছিল যে দিকনগর পেপার মিলের কর্মচারীদের গুণাগুণ সম্বন্ধে ম্যানেজারবাবুর মতামত কাউকে জানাব না।'

বিশ্বনাথ এবার হাসল, 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। এ কথা আমি কাউকে বলছিনে। আর

বলার কি কম ঝক্কি? তলে তলে কে কোথায় সর্বনাশটি করে দেবে, তা আগে থেকে জানার কোন উপায় নেই।'

'ব্যাপার কী বিশ্বনাথবাবু? কীসের সর্বনাশ? কোনো আশংকা আছে নাকি আপনার?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল।

বিশ্বনাথ কণ্ঠস্বর কোমল করে বলল, 'আমাদের পারচেজ সেকশনে একজন সিনিয়ার ক্লার্কের পোস্ট খালি হচ্ছে। আমি অবশ্য অনেকের চেয়ে জুনিয়র; কিন্তু তাতে কী বলুন? যোগ্যতা কি আমার কারো চেয়ে কম? শুধু পারচেজ সেকশন কেন, সমস্ত পেপার মিলে এম-কম পাস জুনিয়র ক্লার্ক একটিও নেই।'

রাজীব বলল, 'আপনার তো বৎসর খানেক হল এখানে।'

'এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয়নি', বিশ্বনাথ ম্লান হাসল। 'মাসখানেক এখনও বাকি। নইলে এত দুশ্চিন্তা কীসের? প্রমোশন দিলে আর সকলে এখনই হইচই করে উঠবে। বলবে ও হল কচি কেরানি। এই তো সেদিন জন্ম হল অফিসে। এখনও আঁতুড়ের গন্ধ যায়নি। এর মধ্যেই ওর প্রমোশন হবে কেন? কিন্তু দেখুন একবার, আমার যে একটা এম-কম ডিগ্রি আছে, সেদিকে কেউ ফিরেও চাইবে না। তার কোনো দাম নেই।'

সহানুভূতি জানাতে রাজীব বলল, 'ভারি দুঃখের কথা।'

'অথচ সিনিয়র ক্লার্ক মানে কি জানেন? যত ম্যাট্রিক, আর আই. এ, র ভিড়। বি-এ পাশ চারজন আছে। কিন্তু মাস্টারস্ ডিগ্রি কারো নেই। খোঁজ করলে বরং দু-দশজন এন-এ-কিউ পেয়ে যাবেন।'

'এন. এ. কিউ না কী যেন বললেন। ওর মানে কী?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল।

'ওটা একটা কোড আমাদের। আপনি হয়ত ভাবছেন কোন ডিগ্রি-টিগ্রি।' বিশ্বনাথ খুব মজার ভঙ্গি করে হাসল। বলল, 'এন. এ. কিউ অর্থাৎ নো অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন।

রাজীব হেসে বলল, 'তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম এন.এ. কিউ আবার না জানি কি জিনিস।' একটু থেমে সে যোগ করল, সুদর্শনবাবুর হাত থাকলে আপনার অবশ্য একটা চান্স আছে। আমার মনে হয়, ইউ আর ইন দি গুড বুক অফ দি ম্যানেজার।'

'হাত কি বলছেন? প্রমোশন দেওয়ার ব্যাপারে ম্যানেজারসাহেবের ইচ্ছেই তো সব। উনি মনে করলেই একজনকে ঠেলে তুলতে পারেন। আর দশজনে কে কী বলল, তাতে কিছু যায় আসে না।' বিশ্বনাথ তার জ্ঞানের থলির সবটুকু উজাড় করে দিল।

রাজীব বলল, 'একটু ধৈর্য ধরুন বিশ্বনাথবাবু। প্রমোশন বা উন্নতি সময়ে হবেই। মিথ্যে ছটফটিয়ে কোনো লাভ নেই, বরং ওতে ঠকতে হয়।'

খুব হতাশ একটা ভঙ্গি করে বিশ্বনাথ বলল, 'ভগবান জানেন, কবে প্রমোশন-টমোশন হবে। চেষ্টা তো কম করলাম না। আপনি ঠিকই বলেছেন, মিথ্যে ছটফটিয়ে কোনো লাভ নেই।'

তাস খেলতে বসে রঙের কথা ঘোষণা করে খেলুড়ে যেমন প্রতিপক্ষের দিকে তাকায়, রাজীব তেমনি ভঙ্গিতে চাইল। বলল, 'আমি কিন্তু আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি খুনের কেসের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করব বলে।'

হঠাৎ এক ঝলক হিমেল হাওয়া এলে মানুষ যেমন শীতার্ত, শিরশির অনুভব করে বিশ্বনাথকে তেমনি সংকুচিত এবং ভীরু দেখাল। উত্তাপময় এবং আশাব্যঞ্জক একটি প্রসঙ্গ ছেড়ে এ যেন কোন নিশীথ-শীতল দিঘির ঘাটে অবতরণ।

রাজীব বলল, 'বিশ্বনাথবাবু, গত শনিবার রাত্রে টেলিফোন অপারেটর তরঙ্গ মজুমদার নৃশংসভাবে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে। কে বা কারা তাকে মারল তা এখন রহস্যের আড়ালে।

কিন্তু আমাদের সকলের কর্তব্য এই রহস্যজাল সরিয়ে খুনীকে খুঁজে বের করা।'

বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা, মানে পেপার মিলের লোকেরা এ বিষয়ে আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?'

'যা পারেন, যতটুকু পারেন,' রাজীব হেসে বলল।

বিশ্বনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, সম্ভবত সে কিছু ভাবছিল কিংবা এই খুনের ব্যাপারে কীভাবে তার বক্তব্য রাখবে তাই নিয়ে ইতস্তত করছিল।

রাজীব বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু, খুনের সংবাদ প্রথম শুনে আপনার কী মনে হল?'

'খুনের সংবাদ?' বিশ্বনাথ চোখ বড় বড় করে বলল, 'কি জানেন, দিনটার কথা ভাবলে আমার এখনও গা শির শির করে ওঠে। বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা-আটটা তখন। আমাদের মেসের চাকরটা এসে হইচই শুরু করে দিল। খুন হয়েছে, খুন হয়েছে বলে সে এঘরে ওঘরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।'

'আপনি বুঝি মেসে থাকেন বিশ্বনাথবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচ-ছ জনে মিলে একটা মেস করে আছি।'

'কোম্পানির বাড়ি নিশ্চয়?'

'কোম্পানির বাড়ি! কোথায় পাবেন মশাই? তার হিসেব-নিকেশ আর এস্টিমেট কোনোদিনই শেষ হবে না। কবে নতুন বাড়ি তৈরি হবে, তা ভগবান জানেন।'

রাজীব বলল, 'আপনাদের মেস বাড়িটা মিল থেকে কতদূর?'

'তা বেশ অনেকখানি পথ হবে। আধমাইলটাক হতে পারে। হেঁটে আসতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগে।'

'দিকনগর বাজারটা যে পথে, বাড়িটা সেদিকেই নাকি?'

বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক উল্টোদিকে, মিল থেকে বেরিয়ে বাজারের রাস্তা ধরলে আমাদের মেসে কোনোদিনও পৌঁছতে পারবেন না।'

রাজীব প্রশ্ন করল, 'খুনের সংবাদ পেয়ে আপনি ডেড-বডি দেখতে ছুটলেন তো?'

'বিশ্বাস করুন খবরটা শুনেই আমার কেমন মাথা ঘুরে উঠল। হাতের পাতা, পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল। তরঙ্গর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। জানাশুনো কেউ একজন খুন হয়েছে শুনলে মনের কেমন অবস্থা হয় বলুন তো?'

'তাহলে মৃতদেহ দেখতে আপনি যাননি, তাই না বিশ্বনাথবাবু?'

'ঠিক তা নয়।' বিশ্বনাথ অস্বীকার করে বলল, 'একটু পরেই আমি গিয়েছিলাম। তখন অবশ্য সকলে ফিরে আসছিল। ওরা বলল ডেড-বডি তুলে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মথুরাপুরে চালান দেবে।'

রাজীব বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু, একটু আগেই আপনি বলছিলেন যে তরঙ্গের সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় ছিল। আলাপ-পরিচয় মানে শুধু জানাশুনো, না—?' রাজীব যেন কতকটা ইঙ্গিত এবং কিছুটা নিস্তব্ধতার সাহায্যে তার বক্তব্যের বাকি অংশটুকুকে প্রাঞ্জল করতে চাইল।

'তরঙ্গের সঙ্গে জানাশুনো মানে আলাপ পরিচয়, তা কিছুটা ছিল বৈকি।' বিশ্বনাথ খানিকটা স্বীকারোক্তি করল।

রাজীব হেসে বলল, 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো। তাতে দু পক্ষেরই সুবিধে। কী বলেন আপনি?'

বিশ্বনাথ আমতা আমতা করে জবাব দিল, 'তা তো ঠিকই। মানে কথাবার্তা খোলাখুলি বলাই তো উচিত।'

'তরঙ্গের সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয়টা কতদূর গড়িয়েছিল বিশ্বনাথবাবু? দুটি যুবক-যুবতীর

জানাশুনো, পরিচয় একটু নিবিড় হলে হৃদয় বিনিময়ের মত একটা অঘটন ঘটে যাওয়া বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। বিশেষ করে সে ক্ষেত্রে মেয়েটি যদি সুন্দরী বলে বিবেচিত হয়।'

বিশ্বনাথের কপালে কুঞ্চিত রেখা পড়ল। সে বলল, 'আপনি কী বলতে চাইছেন? পুলিশ কি সন্দেহ করে যে তরঙ্গের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল?'

'একজ্যাক্টলি। আপনি ঠিক জায়গাটিতে এসে পড়েছেন। লোকে বলে তরঙ্গের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতা ছিল। এবং সম্পর্কটা মধুর প্রেমের বলে মনে করবার মত সঙ্গত কারণও আছে।' কথার শেষে রাজীব বাঁকা হাসল।

প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে বিশ্বনাথ বলল, 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তরঙ্গের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল এরকম মনে করবার কী কারণ খুঁজে পেলেন আপনি?' কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বিশ্বনাথ সরাসরি জানতে চাইল, 'সেই কারণটা কী, তা দয়া করে খুলে বলবেন একবার?'

রাজীব হেসে বলল, 'আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন। স্থির হ'ন বিশ্বনাথবাবু। কারণ যা জানতে পেরেছি তা নিশ্চয়ই আপনাকে বলব।' হাতের পেন্সিলটা টেবিলের উপর বার দুই ঠুকে কী যেন পরীক্ষা করল রাজীব।

বলল, প্রমাণ আছে বিশ্বনাথবাবু। কিছুদিন আগে তরঙ্গকে আপনি একটা দামী কলম প্রেজেন্ট করেছিলেন। এমনিই—হঠাৎ উপহার দিলেন। আমাকে বুঝিয়ে বলুন দিকি এবার। একটি অনাত্মীয়া, রীতিমত সুন্দরী মেয়েকে আপনি অকারণে দামী কলম প্রেজেন্ট করতে গেলেন কেন?'

বিশ্বনাথ টেবিলের উপর হাত দুটি প্রসারিত করে এবং খানিকটা ঝুঁকে একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল। বলল, 'উঃ। আপনি দেখছি সাংঘাতিক মানুষ। কিন্তু তরঙ্গকে কলম প্রেজেন্ট করার কথা আপনি কেমন করে জানলেন?'

রাজীব কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল।

বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করুন। তরঙ্গের সঙ্গে আমার প্রেম-ভালবাসা কোনোদিন হয়নি। দিকনগর পেপার মিলের জুনিয়র ক্লার্ক আমি। মাইনে-কড়ি যা পাই তা শুনলে আপনি হাঁ হয়ে যাবেন। সাকুল্যে এক'শ চুয়াল্লিশ টাকা মাইনে আমার। এর চেয়ে তরঙ্গও বেশি পেত। টিউশনি করে তিরিশ টাকা পাই বলে দেশে আশি টাকার মত পাঠাতে পারি। আমার টাকা না গেলে দুটো ভাইবোন আর বিধবা মাকে উপোস ক'রে থাকতে হবে।'

রাজীব বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু বিশ্বনাথবাবু। পণ্ডিতেরা কী যেন বলে গেছেন না? ভালবাসা অন্ধ। টাকা-কড়ি বা অবস্থার দিকে সে ফিরেও চায় না।'

বিশ্বনাথ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমাকে ঠাট্টা করবেন না দয়া করে। তরঙ্গের সঙ্গে কোনো মধুর সম্পর্ক আমার গড়ে ওঠেনি। একথা বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদের হাতে। তবে তরঙ্গের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। এবং হয়তো কিছুটা অন্তরঙ্গতাও হয়ে থাকবে। তরঙ্গের স্বভাবই ছিল অমনি। একবার আলাপ হলে ওর সঙ্গে ভাব জমানো কঠিন ছিল না।'

রাজীব বলল, 'তা না হয় মানলাম। কিন্তু কলম উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা আপনি এখনও পরিষ্কার করে বলেননি।'

'আমি স্বীকার করছি আপনার কাছে কলম উপহার দেবার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল।' বিশ্বনাথ নিজেকে ব্যক্ত করল।

'টিউশনির পুরো একমাসের টাকা খরচ করে আমি ওর জন্যে কলম কিনেছিলাম। তিরিশ টাকার মত দাম নিয়েছিল। মনে ভেবেছিলাম কলমটা পেয়ে খুশি হবে তরঙ্গ। হয়তো আমার কাজটা করে দেবে। তাহলে অমন কত তিরিশ টাকা উঠে আসবে।'

'তাহলে কলমটা আপনার ঠিক উপহার নয়,—একটা ইনভেস্টমেন্ট।'

বিশ্বনাথ চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন। ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না।'

'তাহলে বলুন, ইনভেস্টমেন্টটা কীসের জন্য।'

বিশ্বনাথ ঠোঁট ফাঁক করে ছোট্ট একটুখানি হাসল। হাসিটা আনন্দের নয়, ঈষৎ লজ্জামেশানো হাসি। বলল, 'তরঙ্গ আমাকে বলেছিল যে আমার প্রমোশনের জন্য ও বিশেষ চেষ্টা করবে।'

'প্রমোশনের জন্য চেষ্টা করবে! এতে তরঙ্গের হাত কোথায়?'

'ঠিক হাত নেই। আবার ইচ্ছে করলে তরঙ্গ একজন কেরানিকে অনায়াসে একটা প্রমোশন পাইয়ে দিতে পারত।' সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে রাজীবের দিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথ বলল, 'ব্যাপারটা আপনি ধরতে পারছেন না?'

খানিকটা না বোঝার ভান করে রাজীব বোকার মত হাসল।' বলল, 'নিজে থেকে বুঝে নেওয়ার চেয়ে বরং আপনি বলুন।'

বিশ্বনাথ বলল, 'কথাটা আমাদের ম্যানেজার সাহেবকে নিয়ে। আপনি নিশ্চয়ই কিছুটা জানেন। তরঙ্গ কি আমার মত ছোট কেরানির প্রেমে পড়তে পারে? খোদ রাজাই ওর প্রেমের কাঙাল হয়ে হাত বাড়িয়েছিলেন। এক'শ চুয়াল্লিশ টাকার কেরানি ওর কৃপার পাত্র। বিশ্বাস করুন, আমি মনে মনে ওর কৃপাপ্রার্থী ছিলাম।'

রাজীব হাসল। 'তরঙ্গের সঙ্গে ম্যানেজার সাহেবের একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে আমি শুনেছি। কিন্তু কথাটা কতদূর সত্যি তা অবশ্য বলতে পারিনে।'

হাত তুলে সংবাদটায় সত্যতা ইঙ্গিতে সমর্থন করল বিশ্বনাথ। বলল, 'কথাটা ঠিক। দিকনগর পেপার মিলে খবরটা অনেকেই জানে। অমন রাশভারী ম্যানেজার সাহেব। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পুরনো কেরানিরাও ভয় পায়। কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন মুখে ছেলে-ছোকরার মত হাসি।' গলা নামিয়ে বিশ্বনাথ যোগ করল, 'এতদিন পরে আপনার কাছে বলছি। কোনোদিন কারো কাছে ভাঙিনি। তরঙ্গকে কথা দিয়েছিলাম, কাউকে বলব না। এখন তরঙ্গ বেঁচে নেই। বলতে আর দোষ কীসের?'

আগ্রহ প্রকাশ করে রাজীব বলল, 'কী কথা বলুন তো?'

'তরঙ্গ আমার কাছে স্বীকার করেছিল। ম্যানেজার সাহেবকে দিয়ে ও ছোটখাট কাজ অনায়াসে করতে পারে। আমাকে একটা প্রমোশন পাইয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিল তরঙ্গ। বলেছিল, সুযোগ পেলেই ও কথাটা ম্যানেজার সাহেবকে জানাবে।'

'কিন্তু তরঙ্গ আপনার উপকার করেনি, এই তো?' রাজীব হাসল।

বিশ্বনাথ বলল, 'মাস তিনেক ধরে আমি রীতিমত খোসামোদ করেছি ওর। তরঙ্গ কখনও আমাকে নিরাশ করেনি। বলেছে সুযোগ বুঝে কথাটা ও বলবে ম্যানেজারকে। আমি ভেবেছিলাম সিনিয়র ক্লার্কের ভেকেন্সিটা হলেই তরঙ্গকে ভালো করে ধরব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সেই ভেকেন্সি এতদিনে হতে চলেছে। কিন্তু আজ ভেকেন্সি হলে আমার আর কতটুকু যায় আসে। কী আশা আছে আমার—?'

রাজীব বলল, 'কলমটা ওকে কবে উপহার দিলেন?'

'মাসখানেক হবে। কলমটা নিয়ে তরঙ্গ ভীষণ রাগ করেছিল কিন্তু। আমার অবস্থার কথা তো জানে। চোখ নাচিয়ে বলেছিল, এসব কি হচ্ছে আবার? এই টাকা দিয়ে তো ভালো একজোড়া জুতো কিনতে পারতেন।' কথা শেষ করে বিশ্বনাথ লজ্জিতভাবে হাসল। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জুতোটা একেবারে গেছে। সামনের মাসে এটা না বদলালে নয়।'

রাজীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু, ঘটনার দিন রাত্রে আপনি

কোথায় ছিলেন?'

আচমকা প্রশ্নে খানিকটা বিহ্বল হবার ভঙ্গি করে বিশ্বনাথ বলল, 'ঘটনার দিন রাত্রে, অর্থাৎ—'

'অর্থাৎ যে শনিবার রাত্রে তরঙ্গ খুন হল। সেদিন সন্ধের পর কোথায় ছিলেন আপনি? কার কার সঙ্গে সময় কাটালেন?'

'কেন বলুন তো? সন্ধের পর থেকে মানে শনিবার দিন সন্ধের পর—।'

রাজীব বলল, 'বলে যান চটপট। থেমে থেমে বলবেন না'।

বিশ্বনাথ বলল, 'সন্ধের সময় টিউশনিতে গেলাম।'

'টিউশনির পর। সেখান থেকে—'

একটু চিন্তা করে বিশ্বনাথ বলল, 'এক জায়গায় তাস খেলতে গিয়েছিলাম। ফি শনিবারেই তাসের আড্ডা হয়।'

'তাস খেলতে গিয়েছিলেন?' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল, 'কী খেলা হল? ব্রিজ না অন্য কিছু?'

বিশ্বনাথ নিরুত্তর।

রাজীব বলল, 'বুঝতে পেরেছি মশাই। আপনি তিন তাসে বসেছিলেন। কী হল খেলায়, হার না জিত?'

মুখ উজ্জ্বল করে বিশ্বনাথ বলল, 'জিত হয়েছিল শনিবারে। বারো টাকার মত পকেটে করে উঠেছিলাম।'

'নেশাটা ভালো নয় বিশ্বনাথবাবু। ঘন ঘন যাবেন না তাসের আড্ডায়।' রাজীব মন্তব্য করল।

বাধা দিয়ে বিশ্বনাথ বলল, 'আমি খুব কম যাই ওখানে। মাসে একবার কিংবা দুবার। দশ বিশ টাকা জিততে পারলে একটু সাশ্রয় হয় আমার।'

'আর হেরে গেলে?'

বিশ্বনাথ হেসে বলল, 'কি জানেন? আমি খুব কম হেরেছি। হারলেও দু-তিন টাকার বেশি আমার পকেট থেকে কোনোদিন যায়নি।'

'সেদিন মেসে ফিরতে কত রাত হয়েছিল আপনার?'

'সাড়ে দশটা এগারোটার মত।' বিশ্বনাথ উত্তর দিল।'

'পথে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'কারো সঙ্গে দেখা? না, অত রাতে কাউকে পাইনি পথে।'

একটু থেমে বিশ্বনাথ যোগ করল, 'এদিকে রাত নটা বাজলেই পথঘাট নির্জন হয়ে আসে। সাড়ে দশটা মানে দুপুর রাত।'

'আর একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।' রাজীব ওর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাল। 'এই খুনের ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

অল্পক্ষণ চিন্তা করল বিশ্বনাথ। 'সন্দেহ'? মাথা নেড়ে সে বলল, 'মাপ করবেন। সন্দেহ করবার মত কাউকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

রাজীব উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, আপনি এখন মেসে যেতে পারেন বিশ্বনাথবাবু।'

বিশ্বনাথ উঠল। রাজীব দেখছিল ওকে। একটু চিন্তিত, অসহায় ভাবভঙ্গি; অর্থচিন্তায় এই বয়সেই ন্যুব্জ মনে হয়।

হঠাৎ রাজীব বলল, 'আচ্ছা বিশ্বনাথবাবু। আপনার নাম-ঠিকানা আর ঐ নতুন পোস্টটার কথা একটু লিখে দিন তো।'

বিশ্বনাথ বিস্মিত। সম্ভবত সে কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

রাজীব বলল, 'দিন না লিখে। আমার আবার ভীষণ ভুলো মন। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে আপনার কথা বলব একবার। যদি কিছু উপকার হয়—?'

কলম আর কাগজ নিয়ে বিশ্বনাথ প্রস্তুত হল লিখতে। রাজীব বলল, পুরো নাম ঠিকানা লিখবেন কিন্তু। বাংলায় লিখে দিন। ইংরেজীতে লেখা হলে আবার অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে গুলিয়ে যাবে।'

বিশ্বনাথ কাগজটা এগিয়ে দিল রাজীবকে। একটু হেসে সেটি নিল রাজীব। বলল, 'আচ্ছা, নমস্কার বিশ্বনাথবাবু। পরে আবার দেখা হবে।'

সুইচ টিপে আলোটা জ্বালল রাজীব। বিশ্বনাথের হস্তাক্ষরের উপর একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অক্ষরের সাইজ, লেখার ছিরিছাঁদ, অন্তের বিশেষ টানগুলি বারবার সে পরীক্ষা করছিল। আতসকাচের নীচে রেখে নানাভাবে দেখল।

পিছন থেকে সুব্রত বলল, 'অমন ঝুঁকে পড়ে কি দেখছেন রাজীবদা? আবার কোন চিঠিপত্র এসে গেল নাকি হাতে?'

মুখ না ফিরিয়েই রাজীব প্রশ্ন করল, 'তুমি কখন ফিরলে?'

'এই তো এলাম। উঃ, সেই দুপুর থেকে ঘুরে ঘুরে হয়রান রাজীবদা।'

বিশ্বনাথের দেখা কাগজটা পকেটস্থ করে রাজীব তাকাল।

'ও কাগজটা কি রাজীবদা?

'তেমন কিছু নয়। সামান্য একটা হাতের লেখা। অবশ্য সামান্য বস্তুরও মাঝে-মধ্যে অসামান্য দাম হয়।'

ঠোঁট টিপে রাজীব বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল।

শুক্লপক্ষের রাত। সম্ভবত চতুর্থী তিথি। আকাশে ছোট্ট একফালি চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো বলতে নেই। চতুর্থীর চাঁদ আলো ছড়িয়ে পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তোলে না। বরং ছায়া-ছায়া অন্ধকারে, ধরিত্রী অপরিচিত রহস্যময় দেখায়।

রিকশ'তে উঠে রাজীব বলল, 'মিল অফিসের টেলিফোন অপারেটর ভৈরব দত্তের বাড়ি নিয়ে চল।'

'ভৈরব দত্ত? কোন্ ভৈরববাবু গো? সেই মাল-খাওয়া ভৈরববাবু?' রিকশওলা সঠিক হতে চাইল।

'মালখাওয়া ভৈরববাবুকে চেনো তুমি?'

'হুই? চিনি না, মানে?' রিকশওলা তর্ক করতে রাজি। বলল, 'কতদিন রেতে বেঁহুশ বাবুকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছি।'

পথে লোকজন। সাইকেল এবং রিকশর একচক্ষু আলো। দুপাশে গাছগাছালি, অন্ধকার....... কোথাও আলোছায়ার খেলা।

মিল এরিয়ার মধ্যে ভৈরব দত্তের বাড়ি। বাড়ি অর্থাৎ কোম্পানির কোয়ার্টার্স। দিনের আলোয় হয়তো এ-পথে জিপ চালিয়ে এসেছে রাজীব। এখন রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত জায়গাটাই চোখে অপরিচিত ঠেকছে।

বড় রাস্তাটা থেকে অপেক্ষাকৃত সরু আর একটা রাস্তা বাঁদিকে গিয়েছে। সেদিকে খানিকটা গিয়ে রিকশটা একটা ছোট বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

রাজীব বুঝতে পারল, এটাই ভৈরবের বাড়ি এবং রিকশওলা বাড়িটা চেনে। দরজায় কড়া নেড়ে রাজীব ভৈরবের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু পরেই দরজাটা অল্প একটু ফাঁক হল। তের-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে মুখ বের করে বলল, 'কাকে চান আপনি?'

ভৈরববাবুকে। উনি আছেন বাড়িতে?'

'বাবা তো আলোকপুরে গিয়েছেন?'

'আলোকপুরে?' একটু ভেবে রাজীব বলল, 'কেন গিয়েছেন বলতে পার তুমি? কখন ফিরবেন?'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আলোকপুরে গেছেন ম্যানেজার সাহেবের কাপড় কাচতে দিতে। এখুনি ফিরবেন। আপনি বসবেন একটু?'

রাজীব ঘরের মধ্যে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। প্রায় যোলো ফুট বাই বারো ফুট সাইজ। সম্ভবত এরকম তিনখানা ঘর আছে বাড়িতে। আসবাবপত্রও বেশ সুন্দর। একটা শোকেসে নানারকম দর্শনীয় বস্তু। দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি। কোনোটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, কোনোটা পরিবারের লোকেদের বলে মনে হল তার। একপাশে কয়েকজোড়া জুতো। সেদিকে চোখ পড়তেই রাজীব হঠাৎ মনোযোগী হল।

ইতিমধ্যে মেয়েটি বাড়ির ভিতর কি কাজে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে রাজীব ঘরখানা দ্রুত পর্যবেক্ষণ করল। দেওয়ালের ছবিগুলি দেখল। তাকের উপর সাজানো বইগুলি খুব ব্যস্তভাবে নেড়েচেড়ে রাখল। এবং সবশেষে জুতোগুলির কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াল।

মেয়েটি ফিরে আসতেই রাজীব বলল, 'আমি বরং এখন আসি। তোমার বাবার সঙ্গে না হয় কাল সকালে এসে দেখা করব।'

মেয়েটি একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'বসবেন না' একটু? আচ্ছা কী নাম বলব আপনার?'

'নাম বলার দরকার নেই। ব'লো মিলের একজন সাপ্লায়ার এসেছিলেন। তিনি আবার সকালে আসবেন।' কথা শেষ করে রাজীব ফের রিকশতে গিয়ে বসল।

থানার কাছাকাছি আসতেই রাজীব অবাক হয়ে তাকাল। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। ভৈরব দত্ত থানার কাছেই দাঁড়িয়ে। একটু দূরে রিকশটা ছেড়ে দিয়ে রাজীব ধীরে ধীরে হাঁটল। ওর সম্মুখীন হয়ে খুব অবাক হবার ভান করে বলল, 'কী খবর ভৈরববাবু? হঠাৎ এখানে দাঁড়িয়ে?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি স্যর। মথুরাপুরে শুনলাম যে আপনি দিকনগরে এসেছেন। একজন সেপাই বলল যে, আপনি এখুনি ফিরবেন। জিপ দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।'

'কোনো খবর আছে নাকি ভৈরববাবু?' রাজীব স্মিতমুখে তাকাল।

'প্রাইভেটে আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম স্যর। দেখবেন, যেন পাঁচকান না হয়।' এদিক-ওদিক চেয়ে ভৈরব বলল, 'সুজাতা দাস রেজিগনেশন দিয়েছে। আজই ম্যানেজার সাহেবের কাছ থেকে খবরটা জানতে পেরেছি।'

চৌদ্দ

সুরার একটা তীব্র উৎকট গন্ধ রাজীবের নাকে এসে লাগল। ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। ভৈরব দত্ত আজও মত্ত। একটু আগেই মাল টেনেছে। বস্তুটি সম্ভবত হুইস্কি। নইলে এমন মাতাল গন্ধে সমস্ত জায়গাটা রম রম করে ওঠে।

কথা শুনে রাজীবের চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠবার জোগাড়। 'বলেন কী মশায়? মিস দাস রেজিগনেশন দিয়েছেন?'

ভৈরব মিটিমিটি হাসছিল। বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখখানা অল্প অল্প দুলিয়ে সে বলল, 'ছুলোমাগী এবার পাখা মেলে উড়তে চাইছে স্যর।'

চিন্তিতমুখে রাজীব প্রশ্ন করল, 'রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট্ করেছেন ম্যানেজার সাহেব?'

'কি জানি স্যর। ও কথাটা বলেননি আমাকে। তবে খবরটা কাকপক্ষীতে জানে না এখনও। সারাদিন অফিসে ঘুরে আমি জানতে পারিনি। ছুলোমাগী কি কম শয়তানী স্যর। কখন ফাঁকতালে সাহেবকে কাগজটি গছিয়ে দিয়ে গেছে। পাশের ঘরে বসে প্রভাই হয়ত টের পায়নি।' একটু থেমে ভৈরব আবার যোগ করল, 'আমি হলপ করে বলতে পারি স্যর। ও মাগী চুপি চুপি কেটে পড়তে চায় দিকনগর থেকে!'

রাজীব হেসে বলল, 'তা হতে পারে না ভৈরববাবু। মিস সুজাতা দাস এখন দিকনগর ছেড়ে যেতে পারেন না। ম্যানেজার সাহেবকে কথাটা বলতে হবে আমাকে। উনি কি এখন বাংলোতে আছেন? কী করছেন?'

ভৈরব বিনীত ভঙ্গিতে জানাল, 'একটু সেবা করছেন দেখে এলাম।'

'সেবা করছেন? কী জিনিস?'

চোখ মটকে ভৈরব জবাব দিল—'বস্তুটি কি, তা আবার বলে দিতে হবে আমাকে? দেখে এলাম আজিজুল গ্লাসে মিশিয়ে-টিশিয়ে দিচ্ছে। সাহেব তারিয়ে-তারিয়ে খাবেন।'

'উনি কি বাড়িতেই বসে ড্রিঙ্ক করেন?'

'এই দেখুন। নইলে সাহেব মানুষ যাবেন কোথায়? বীরেনের দোকানে গেলে লোকে যে মদ-মাতালে বলে নিন্দে করবে। ঘরে বসে খেলে তো মাতাল হয় না। পাঁচজনে বড়জোর বলবে শরীরটা চাঙ্গা করবার জন্য উনি একটু ড্রিঙ্ক করছেন।' কথা শেষ করে ভৈরব টেনে টেনে আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে হাসল।

রাজীব হেসে বলল, 'মথুরাপুরে কেন গিয়েছিলেন ভৈরববাবু?'

'মথুরাপুরে নয় স্যর। গিয়েছিলাম আলোকপুরে।'

'হঠাৎ আলোকপুরে?' কী ব্যাপার?'

'ম্যানেজারসাহেবের কাজে।' একটু হেসে ভৈরব বলল, 'স্ট্রিম লন্ড্রিতে কাপড় কাচতে দিতে যেতে হয়েছিল।'

'ফিরে এসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বুঝি? রেজিগনেশন দেখার খবর তো তখনই শুনলেন?'

ঘাড় হেলিয়ে ভৈরব বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।'

রাজীবকে এবার উৎফুল্ল দেখাল। খানিকটা কৃতজ্ঞ বলেও মনে হল। ভৈরবের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'যাই হোক, সময়ে খবরটা দিয়ে আমাদের খুব উপকার করেছেন কিন্তু।' দাঁত চেপে রাজীব বলল, 'সুজাতা দাস যদি পালিয়ে যাবার মতলব করে থাকে তাহলে সে খুব ভুল করেছে।' একটু থেমে রাজীব ফের শুরু করল, 'ভৈরববাবু, আপনাকে কিন্তু আমার একটু দরকার ছিল।'

'বলুন স্যর। যা হুকুম করবেন, ভৈরব দত্ত যথাসাধ্য তামিল করবে।'

'তা জানি ভৈরববাবু। দু-একটা খবর যা এনেছেন তাতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। তবু ভবিষ্যতে এমনি খবর আরো কিছু পেলে সত্যিকার উপকার হয়।'

ভৈরব বলল, 'সে আপনাকে বলতে হবে না স্যর। খবর পেলেই একটি মুহূর্ত দেরি না করে আপনাকে পৌঁছে দেব। কিন্তু দেখবেন স্যর, আমার নামটা আবার যেন না পাঁচকান হয়। দয়া করে যেন ফাঁসিয়ে দেবেন না।'

রাজীব বলল,—'আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। সুব্রত আজ পাঞ্জাবিদের ডেরায় গিয়ে একটা লোকের খোঁজ পেয়েছে। সে নাকি গত শনিবার রাত এগারোটার সময় ওখানে এসে উঠেছিল। ওর বাড়ি কলকাতায়,—ভবানীপুরে। ব্যবসা সংক্রান্ত কী সব খোঁজ-খবর নিতে লোকটি

কোলিয়ারিতে গিয়েছিল।'

কথা শুনে ভৈরবের চোখ দুটো চকচকে উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল, 'বলেছিলাম না স্যর? লোকটাকে দেখেই আমার কেমন খটকা লাগল।'

রাজীব বলল, 'আচ্ছা, ওর পরনে কী ছিল বলুন দিকি?'

'মানে ও কী পরেছিল জানতে চাইছেন?' একটু ভেবে ভৈরব বলল, 'প্যান্ট জামা পরেছিল স্যর।'

'প্যান্ট অর্থাৎ ফুলপ্যান্ট আর শার্ট। তাই না?'

ভৈরব উত্তর দিল, 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

রাজীব খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'মুশকিল হয়েছে কি জানেন? পরদিন সকালে উঠে লোকটা কলকাতায় ফিরে যায়। তার নাম-ঠিকানা কেউ জানে না। ভবানীপুরে থাকে, এইটুকু মাত্র বলেছিল অন্যদের। কিন্তু এই সামান্য সূত্র থেকে লোকটাকে খুঁজে বের করা খুব মুশকিল।'

ভৈরব নিশ্চিত জেনেছে এমনি একটা ভঙ্গি করে বলল, 'আমার তো মনে হয় স্যর, তরঙ্গকে ঐ ষণ্ডা জোয়ানটাই শেষ করে গিয়েছে।'

'আচ্ছা লোকটার প্যান্টের কাপড়ের কী রঙ ছিল বলতে পারেন?'

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ভৈরব বলল,—'সবুজ রঙ বলে মনে পড়ছে স্যর।'

'আর শার্ট?'

'জামাটা শাদা রঙের।'

'পায়ে নিশ্চয়ই শু জুতো?' রাজীব বাঁকা চোখে তাকাল।

'জুতোর কথা জিজ্ঞেস করছেন স্যর?' একটু চিন্তা করে ভৈরব বলল,—'জুতোর কথা মনে নেই আমার। তবে হ্যাঁ, শু জুতো হতে পারে। হওয়াই সম্ভব।'

'সম্ভব কেন বলছেন?' রাজীব জানতে চাইল।

'ফুলপ্যান্টের সঙ্গে শু ছাড়া আর কি মানানসই হবে?'

রাজীব ঈষৎ হেসে কী যেন ভাবল মনে। বলল, 'আচ্ছা ভৈরববাবু আপনি বিশ্বনাথ বসু বলে কাউকে চেনেন?'

'বিশ্বনাথ বসু? আমাদের পারচেজ সেকশনের ঐ নতুন কেরানির কথা বলছেন তো?' ভৈরব একটু না থেমেই বলে গেল,—'ওকে বিলক্ষণ চিনি। ছোকরা দিন-কতক তরঙ্গের পিছনে ছিনে জোঁকের মত লেগেছিল। ওর ভাবগতিক দেখে আমি মনে মনে হাসতাম স্যর। আরে ব্যাটা, ও হল মগডালের রসাল। তুই বামন হয়ে উঁচুডালের পাকা ফলে হাত বাড়াচ্ছিস।'

'বিশ্বনাথ বসুর সম্বন্ধে আর কিছু জানেন?'

'ভীষণ দেমাকী ছোকরা স্যর। এম. এ না কি যেন পাস করেছে। সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। ইদিকে বাবুর জুয়ার আড্ডাতেও যাতায়াত আছে।' ভৈরব গলা নামিয়ে শেষের কথাগুলি বলল।

'তাই নাকি?' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করল, 'ওর সঙ্গীসাথী সব কারা?'

'জুয়ার আড্ডায় কারা যায় সে কি আপনাকে বলে দিতে হবে স্যর? বাজে ছোকরা সব। মদ আর জুয়ো,—চা আর লুডো খেলার শামিল বলে মনে করে।'

রাজীব চিন্তিত মুখে বলল, 'ছোকরার সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নিন দিকি।'

ভৈরব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'নিশ্চয় নেব স্যর। কালই পারচেজ সেকশনের শিবনাথ দাসকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সাপ্লায়ারদের বিল পাস করে শিবনাথ। ঠাণ্ডা মানুষ,—চুপচাপ নিজের কাজ করে যায়। কিন্তু তাহলে কী হবে? চাঁদির চশমার আড়ালে সব দিকে ওর নজর আছে।'

রাজীব বলল, 'ঠিক আছে ভৈরববাবু। আর একটা মাত্র প্রশ্ন আপনাকে। তাহলেই ছুটি আপনার।'

ভৈরব সোৎসাহে বলল, 'বলুন স্যর।'

'আপনার ম্যানেজার সাহেবের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা একটু লিখে দেবেন আমাকে? খুব প্রয়োজন।'

সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেল ভৈরব। কেমন ভিজে ভিজে গলায় বলল, 'কাজটা কি ঠিক হবে স্যর? ছাপোষা মানুষ। সাহেবের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে শেষে চাকরিটা খুইয়ে বসব না তো?'

'আরে না, না।' রাজীব ওকে সাহস দিয়ে বলল, 'কে জানতে পারছে আপনার নাম? আর সাহেবের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা কি আপনি শুধু একাই জানেন?'

'ঈশ্বরের দিব্যি স্যর। আমি শুধু ঠিকানাটাই জানি। কোনদিন ও তল্লাটে যাইনি।'

রাজীব বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে থানায়। ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাবেন। আমি কথা দিচ্ছি, এ ব্যাপার তৃতীয়জনের কর্ণগোচর হবে না।'

এক টুকরো কাগজ আর কলম ওকে এগিয়ে দিল রাজীব। বলল, 'ওই চেয়ারটায় বসে লিখে ফেলুন।' মনে মনে হাসছিল সে। একটু আগে বিশ্বনাথ বসুও ওই চেয়ারে এসে বসেছিল। রাজীবের নির্দেশমত সেও কাগজে খানিকটা লিখেছে।

ভৈরবের সাজ-পোশাকে বেশ ছিমছাম সৌখীনতা। অল্প একটু চওড়া পাড়ের দিশি ধুতি, গায়ে শার্ট নয়, বকের পালকের মত ধবধবে পাঞ্জাবি। মাথার চুল থেকে তেলের সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে এসে লাগছে।

রাজীব হেসে বলল, 'ধুতি-পাঞ্জাবিতে বেশ মানায় আপনাকে। প্যান্ট জামা পরলে নিশ্চয়ই এমন সুন্দর দেখাত না।'

ভৈরব হাসল। 'কী বলব স্যর। এই দিশি পোশাকে আমি যাই বলে আর পাঁচজনের চক্ষু জ্বালার কারণ হয়েছি। আড়ালে কী বলে জানেন? ব্যাটার সাজ-পোশাকের বাহার দেখ, যেন ছোট ম্যানেজার।'

ভৈরব চলে যেতেই রাজীব ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত সাড়ে আটটার মত। খানিকটা হেঁটে ভৈরব একটা রিকশ নিয়েছে। রাজীব তা লক্ষ্য করেছিল। অপসৃয়মাণ রিকশটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রাজীব জিপ গাড়িটায় উঠে বসল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জিপটা সশব্দে স্টার্ট নিল। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাজীব উল্টোদিকে এগিয়ে চলল। দুবার রাস্তা বদল করে ঠিক জায়গাটিতে এসে পৌঁছতে তার মিনিট ছয়-সাতের বেশি লাগল না। এদিকটা এরই মধ্যে নিশুতি, নির্জন। পথের দু পাশে ঝোপজঙ্গল, বড় বড় গাছ দৈত্য-দানোর মত দীর্ঘ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে।

বাঁ দিকে ওয়েস্ট সুদামডি কোলিয়ারি যাবার রাস্তা।

মোড়ের কাছে এসে রাজীব হঠাৎ ব্রেক কষল। এ পথে লোকজন প্রায় নেই। শাখা-প্রশাখা মেলা সেই বিরাট বটগাছটা এক পাশে। কি খেয়াল হতে রাজীব ঘন সন্নিবদ্ধ ডালপালার উপর টর্চের আলো ফেলল। সম্ভবত বিরক্ত হয়ে একটা পাখি ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল। বটগাছটার পিছনের দুর্ভেদ্য ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে পাখিটা কোথায় যে উধাও হল, তা কিছুতেই চিহ্নিত করতে পারল না রাজীব।

রাতের প্রথম প্রহরেই পথ-ঘাট ফাঁকা। সুদামডি পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। মাথার উপর স্লেট রঙের আকাশের গায়ে মরসুমি ফুলের মত অজস্র তারা। কোলিয়ারির মাইনিং সার্ভেয়ার আর ওভারম্যানের কোয়ার্টার খুঁজে পেতে এতটুকু কষ্ট হল না রাজীবের। জিজ্ঞেস করতেই একজন

অঙ্গুলি সংকেতে বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

খোঁজখবর নিয়েই এসেছে রাজীব। শশাংক ভট্‌চায বেলা দুটোর শিফটে খাদে নেমেছে। তার ছুটি হবে রাত দশটার পর। ঘন্টাখানেক ওভার টাইম কাজও করতে পারে সে, সুতরাং এখন কিছুটা সময় নিশ্চিন্ত। নিখিলেশকে ঘরে একা পাওয়া যাবে বলেই তার ধারণা।

জিপের শব্দ শুনেই সম্ভবত নিখিলেশ উৎকর্ণ ছিল। দরজার কাছে জুতোর মচমচানি কানে যেতেই সে তাড়াতাড়ি কবাট খুলে মুখ বের করল।

'আপনি?'

করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে রাজীব বলল, 'আমাকে হয়তো আপনি আগে দেখেননি নিখিলেশবাবু। আমি রাজীব,—রাজীব সান্যাল। মথুরাপুরের সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর।'

নমস্কার করে নিখিলেশ বলল, 'ভিতরে আসুন, আপনার নাম আমি শুনেছি। কিন্তু আমার কাছে হঠাৎ এলেন যে!'

ঈষৎ হেসে রাজীব বলল, 'ভয় পাচ্ছেন নাকি? কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই নিখিলেশবাবু। আমি আপনার কাছে বন্ধুর মত এসেছি।'

সামান্য একটু ঠোঁট প্রসারিত করে নিখিলেশ কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল, 'খুনি আসামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন ইন্সপেক্টরবাবু!'

'কে বলল আপনি খুনী? বিচারে এখনও তা সাব্যস্ত হয়নি যখন।'

'সে পরের কথা।' নিখিলেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দিকনগর আর সুদামডির লোকে আমাকেই খুনি বলে জেনেছে। অথচ জানেন—' কথাটা বলেই নিখিলেশ হঠাৎ চুপ করে গেল।

'কী বলছিলেন যেন?' রাজীব ওর মুখে কথা তুলে দিতে চাইল।

'কিন্তু এ-সব কথা আপনাকে বলা কি উচিত হবে? আজ পর্যন্ত কারো কাছে আমি এ ব্যাপারে মুখ খুলিনি ইন্সপেক্টরবাবু।'

নিখিলেশকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল।

খুব মিষ্টি করে হাসল রাজীব। গলার স্বরে দরদ মিশিয়ে বলল, আমাকে আপনি সাহায্য করুন নিখিলেশবাবু। আমার স্থির বিশ্বাস তরঙ্গর খুন হবার কারণ আমরা দু'জনে চেষ্টা করলে ঠিক খুঁজে পাব।'

বাঁকা হেসে নিখিলেশ বলল,—'কিন্তু পুলিশ তো আমাকেই দোষী বলে ধরে নিয়েছে।'

'সাক্ষ্য-প্রমাণ যা পাওয়া গেছল, তাতে পুলিশের অন্য উপায় ছিল না নিখিলেশবাবু। একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে এমনিভাবেই সাজানো হয়ে থাকে, যাতে দোষটা সহজেই অন্যের উপর বর্তায়।'

শান্তভাবে নিখিলেশ বলল,—'বেশ। তাহলে আমার কথাই শুনুন।'

ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে রাজীব বলল, 'আগে আপনি দু একটা প্রশ্নের জবাব দিন। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ, মানে পরিষ্কার হয়ে আসবে।'

সিগারেটে টান দিয়ে রাজীব বলল, 'তরঙ্গের ভালবাসায় কোনো খাদ ছিল বলে মনে হয়েছে আপনার? আপনি নিশ্চয়ই জানতেন, তরঙ্গের অনেক পুরুষ বন্ধু ছিল। অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশত সে। কোনোদিন আপনার মনে সন্দেহের মেঘ জমেনি?'

প্রশ্ন শুনে নিখিলেশ হাসল। বলল, 'তরঙ্গ অবিশ্বাসিনী কিম্বা সে আমাকে প্রতারণা করবে এ চিন্তা কোনোদিন আমার মনে হয়নি। আর অনেকের সঙ্গে মিশলেই কি মেয়েরা খারাপ হয় ইন্সপেক্টরবাবু?'

রাজীব লজ্জিত হয়েছে মনে হল। 'তা ঠিক নয়', সে বলল। 'তবে প্রশ্নটা বোধহয় আপনার

খারাপ লেগেছে, তাই না নিখিলেশবাবু? আসলে আপনি নির্দোষ কি না তার সঠিক বিচার হতে পারে আপনার এই উত্তরের উপর।'

নিখিলেশ নিজের মনে চিন্তা করল কিছু। কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল, 'আপনার বক্তব্য আমি বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা শুনলে নিশ্চয়ই এ বিষয় নিয়ে আপনাকে বেশি ভাবতে হবে না।'

'কী কথা?' রাজীব আগ্রহ প্রকাশ করল।

'তরঙ্গের সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ থাকলে আমি কি ওকে বিয়ে করতে পারতাম?'

'বিয়ে করতে পারতেন মানে? তরঙ্গকে আপনি বিয়ে করেছিলেন না কি?' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করল।

নিখিলেশ বলল, 'গত বুধবার কলকাতায় আমাদের বিয়ে হয়।' একটু থেমে কলকাতার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের ঠিকানাটা উল্লেখ করল নিখিলেশ।

'এ বিয়ের সংবাদ এখানের কেউ জানে না?'

'কেউ না। আমরা কাউকে বলিনি। তরঙ্গ নিষেধ করেছিল জানাতে।'

'তরঙ্গর মা'ও জানেন না?'

'না। আমাদের বিয়েতে তরঙ্গের মার মত ছিল না। তরঙ্গ বলেছিল দিকনগর ছেড়ে চলে যাবার সময় মাকে গিয়ে আমরা প্রণাম করে আসব।'

'দিকনগর ছেড়ে চলে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন আপনারা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ের পর এখানে থাকতে তরঙ্গের একবিন্দুও ইচ্ছে ছিল না। ওর ইচ্ছে ছিল রবিবার দিন সকালে ম্যানেজারসাহেবের কাছে রেজিগনেশন দিয়ে আসবে। আর রবিবার বিকেলেই আমাদের কলকাতা যাবার ঠিক ছিল।'

'ভেরি আনফরচুনেট টেল!' রাজীব স্বগতোক্তির মত বলল, 'নিখিলেশবাবু, আপনার জন্য আমি দুঃখিত। ভাগ্যের এমন বিড়ম্বনার কথা আমি আগে কখনও শুনিনি।'

নিখিলেশ বলল, 'তরঙ্গের অনেক ইচ্ছে ছিল ইন্সপেক্টরবাবু। নতুন বাসায় গিয়ে ভাল করে ঘরদোর সাজাবে। ছোট ভাই আর মাকেও নিয়ে যাবে ওখানে। খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে আমরা থাকব। কত কী, সে ভেবেছিল। অথচ কী যে হয়ে গেল—!' খুব বিষাদপূর্ণ একটি সঙ্গীতের শেষ কটি লাইন যেন আবৃত্তি করল নিখিলেশ।

ঘরের আবহাওয়াটা বেশ দুঃখপূর্ণ এবং ভারী মনে হল রাজীবের। খুব তাড়াতাড়ি এটা কাটিয়ে ওঠা দরকার। নইলে সময়টা হুস করে কখন পেরিয়ে যাবে। তখন আফসোসের অন্ত থাকবে না।

রাজীব বলল, 'আচ্ছা আপনাদের বিয়ের সংবাদ কেউ জানে না বলেই মনে হয়? তরঙ্গ হঠাৎ কলকাতা গেল, এ নিয়ে কেউ চিন্তা করতে পারে না?'

'কলকাতা যাব বলে কাউকে বলিনি আমরা। তরঙ্গ বলেছিল আলোকপুরের হাসপাতালে সে গলা পরীক্ষা করাতে যাবে। ক'দিন আগে গলার ব্যথা হয়েছিল ওর। আলোকপুরের বড় হাসপাতালে অনেকেই তো চিকিৎসার জন্য যায়।' একটু থেমে নিখিলেশ যোগ করল, 'অবশ্য বিবাহ-সংবাদটা বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে চাইনি আমরা।'

রাজীব সমস্ত ব্যাপারটা সাজিয়ে বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের ঠিক তিনটি দিন পর তরঙ্গ খুন হয়েছে এবং খুন না হলে তার পরদিন বিকেলে সে দিকনগর ছেড়ে চলে যেত। আর কোনোদিন হয়তো এখানে আসত না। আচ্ছা, এখানকার চাকরি ছেড়ে কোথায় যাবেন ঠিক করেছিলেন আপনারা?'

'ঝরিয়ার কাছে একটা কোলিয়ারিতে আমি চান্স পেয়েছি। ওখানকার ম্যানেজার আমার পরিচিত। সেখানেই যেতাম,—অবশ্য প্রথমে কলকাতায়।'

রাজীব কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল আপন মনে।

কিছুক্ষণ পরে সে শুরু করল, 'নিখিলেশবাবু, দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের কথা আগে ঘোষণা করতে তরঙ্গের দিক থেকে আপত্তি ছিল। এর কোনো কারণ আপনি অনুমান করতে পারেন? ব্যাপারটা জানতে চাননি আপনি তরঙ্গের কাছে?'

'চেয়েছিলাম। কিন্তু তরঙ্গ বোধহয় ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলতে চায়নি। আমিও জোর করিনি ইন্সপেক্টরবাবু। তরঙ্গ বলেছিল, আমি তোমার আপনজন হতে চলেছি। আমি বারণ করছি তোমায়। এখানকার মানুষগুলো ভীষণ পাজি। এদের আগে থেকে শুভ-সংবাদ জানাবার কোনো মানে হয় না।'

রাজীব নিরুত্তর।

নিখিলেশ নিজে থেকে বলল,—'আমার মনে হয়েছিল সংবাদটা বিশেষ দু-একজনের কাছে গোপন রাখতে ইচ্ছে তরঙ্গের। এর বেশি কিছু বলতে পারব না আমি।'

রাজীব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ম্যানেজার-সাহেবের সম্বন্ধে তরঙ্গ কিছু বলেছিল আপনাকে?'

'মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী?' একটু চিন্তা করে নিখিলেশ বলল, 'হ্যাঁ, অনেকবার ওকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের। ও বলত, ম্যানেজারসাহেব লোক খারাপ নন। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তবু অনেক কিছু পেয়েও সুখী লোক হতে পারেননি উনি। স্ত্রী সঙ্গে নাকি বনিবনা হয়নি চক্রবর্তীসাহেবের। তরঙ্গ বলত যে কোনো দিন ওদের ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে।'

হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে রাজীব বলল, 'তরঙ্গের রুমমেট সুজাতা দাসকে চেনেন আপনি? ওর সম্বন্ধে কী বলত তরঙ্গ?'

'চিনি ভদ্রমহিলাকে,' নিখিলেশ সহজেই বলল, 'ভারী গম্ভীর আর শক্ত ভঙ্গি। খুব কড়া মহিলা নিশ্চয়ই। তরঙ্গ বলত, সুজাতাদি একটা পাগল। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ ওর।' একটু থেকে সে আবার বলল, 'তরঙ্গ আমাকে ওর গল্প পরে শোনাবে বলেছিল।'

'প্রভা মুখার্জি বলে একটি মেয়েকে চেনেন?'

'তরঙ্গের মেসের ফর্সা মেয়েটি তো? হ্যাঁ চিনি ওকে, তবে আলাপ-সালাপ নেই। ও বলত, মেয়েটি নাকি খুব হিংসুটে। কারো ভালো সহ্য করতে পারে না।'

'ভৈরব দত্ত বলে মিলের এক ভদ্রলোককে জানেন?'

নিখিলেশ হেসে বলল, 'ভৈরববাবু বিখ্যাত ব্যক্তি। ম্যানেজার-সাহেবের ঘরের লোক বলে সবাই জানে। খুব বেশি মদ খান উনি। তবে হ্যাঁ, একটা গুণও আছে,—ভালো ফটোগ্রাফার। তরঙ্গ ওর সম্বন্ধে কী বলেছিল জানেন? এমনিতে বেশ আছেন উনি, কিন্তু খেপে উঠলেই আর রক্ষা নেই।'

'তখন কালভৈরব, তাই না?' রাজীব হেসে বলল।

নিখিলেশ বিষণ্ণ হাসল।

'বিশ্বনাথ বসু বলে কাঁরো নাম শুনেছেন আপনি তরঙ্গের কাছে?'

নিখিলেশ ঘাড় নাড়ল। 'মনে পড়ে না।'—সে বলল।

'আচ্ছা, আপনার বন্ধু শশাংক ভট্চায কেমন লোক?'

'খুব ভাল ছেলে। জানেন নিশ্চয়ই, জজসাহেবের কাছে মামলা নিয়ে গিয়ে ওই আমায় জামিনে খালাস করে নিয়ে এসেছে।'

রাজীব বলল 'তা ঠিক। তবে স্ত্রী-জাতির প্রতি আপনার বন্ধুর একটু দুর্বলতা আছে। অবশ্য

এ দুর্বলতাটা প্রায় সব পুরুষেরই। তবু ওরই মধ্যে একটু ইতর বিশেষ হয়। সুন্দরী মেয়ে দেখলে আপনার বন্ধু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খোঁজেন।'

নিখিলেশ অল্প হাসল। অর্থাৎ এ-দোষটুকু সে ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছে না।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজীব তাকাল।—'আচ্ছা নিখিলেশবাবু, এই কিছুদিনের মধ্যে তরঙ্গ তেমন কোনো কথা বলেছিল আপনাকে? হয়তো আপনার কাছে সেটা তুচ্ছ মনে হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছে করলে সেটা সিরিয়াসভাবে নেওয়া যায়।'

নিখিলেশ আগের মতই চিন্তা করল নিজের মনে। প্রায় দু-তিন মিনিট। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।

'কী কথা?' রাজীব উটের মত ঘাড় বাড়িয়ে রইল।

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা ক'জন একটা রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিলাম। বন্ধুদের কাজ ছিল, ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমাদের হাতে তখনও ঘণ্টা দেড়েক সময়। স্টেশনে এসে কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্মে, আবার কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে দু'জনে গল্প করলাম। তখন তরঙ্গ একটা কথা বলেছিল আমায়।'

'সেই কথাটাই বলুন।' রাজীব ওকে তাড়া দিল।

'তরঙ্গ বলল, মঙ্গলবার দিন বিকেলে অফিসে সে একটা চিঠি পেয়েছে। ওদের টেলিফোন ঘরেই পেয়েছিল চিঠিটা। কারো পকেট থেকে হয়তো পড়ে গিয়ে থাকবে। মেয়েদের কৌতূহল বোঝেন তো? চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। তরঙ্গ বলেছিল চিঠিটা নাকি সাংঘাতিক। ওর মধ্যে একটা চুরির হদিশ আছে।'

'চিঠিটা আছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ।' নিখিলেশ ধীরে ধীরে বলল, 'তরঙ্গ ওটা রাখতে দিয়েছিল আমাকে। আমি ফেলে রেখেছি বাক্সতে। ভেবেছিলাম ও চিঠিতে কী দরকার আমাদের। আমরা যখন চলেই যাব।'

'চিঠিটা নিয়ে আসুন তো।' রাজীব আদেশ করল।

বাক্স খুলে চিঠিটা বের করে আনল নিখিলেশ।

কয়েক লাইন পড়েই বিস্ময়কর অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল রাজীবের মুখ থেকে। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, 'এ চিঠির খবর তরঙ্গ আর কাউকে বলেছিল জানেন?'

নিখিলেশ মাথা নাড়ল। অর্থ, এটা তার অজ্ঞাত।

চিঠিটা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রাখল রাজীব। বলল, 'এর গল্প আর কারো কাছে করবেন না। চলুন, এবার আমি উঠব। কিন্তু তার আগে আপনার বন্ধুর ঘরটা একবার দেখে যেতে যাই।'

'ওর অনুপস্থিতিতে সেটা কি ঠিক হবে?'

রাজীব হাসল।—'আমাকে সি. আই. ডি. বলে মনে করছেন কেন? একজন বন্ধু বলে ধরে নিন। আমরা তো শুধু ঘরটা দেখবমাত্র।'

শশাংকের ঘরটা অন্য ঘরেরই মত। আয়তনে বরং সামান্য ছোট হতে পারে। আগোছালো ঘর, বিছানার চাদরটা বেশ ময়লা, দেওয়ালের কোণে ঝুল, এক কোণে কয়েকটা কাগজপত্র জমে রয়েছে। ময়লা দু-তিনটে জামা-কাপড় একপাশে ডাঁই করে রাখা।

রাজীব হেসে বলল, 'আপনার বন্ধুর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। কি অবস্থা দেখেছেন ঘরের!'

নিখিলেশের মুখের দিকে চেয়ে রাজীব নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। বিয়ের কথা নিয়ে এত তাড়াতাড়ি কোনো রসিকতা করা উচিত হয়নি তার। তার সম্বন্ধে কি ভাবছে নিখিলেশ? কে জানে কী মনে করছে তাকে?

বাতিল করা কাগজপত্রের মধ্য থেকে একটা বলের মত পাকানো কাগজ তুলে নিল রাজীব।

অনেকখানি কি সব লেখা রয়েছে ওতে। রাজীব বলল, 'আপনার বন্ধুর একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখছি, নিয়ে যাই, এক সময় বরং পড়ে দেখা যাবে।'

জিপে উঠে রাজীব সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল গাড়িতে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিখিলেশের বাড়ির সামনে গাড়ির টায়ারের দাগ ছাড়া আর কোন পরিচয় রইল না পড়ে।

দিকনগর থানায় ফিরে রাজীব শুনল, সুব্রত বাড়িতে গেছে। ঘড়িতে প্রায় দশটার মত। রাজীব টেলিফোনটা মুখের কাছে নিয়ে দিকনগর পেপার মিলকে চাইল।

নারীকণ্ঠে ঘোষণা হল, 'পেপার মিল।'

'কে, মিস দাস বলছেন?'

'আমি সুজাতা দাস। আপনি কাকে চান?'

নিজের পরিচয় বলল রাজীব।—'সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল।'

বিস্ময় প্রকাশ করে উত্তর এল, 'আপনি! এত রাত্রে? কী খবর বলুন?'

'খবর তো আপনার কাছেই শুনব আশা করছি। বলুন আপনি।'

'আমার কাছে?' এবার গলার স্বর ভিজে, ঠাণ্ডা মনে হল রাজীবের। থতমত ভঙ্গি। অনেকক্ষণ পরে উত্তর এল ভেসে, সরি। আমার কাছে কোনো খবর নেই।'

একটু হেসে রাজীব টেলিফোনটা রেখে দিল।

পনেরো

অত রাতে শচীদুলাল তার জন্য বসে।

রাজীব ঘরে পা দিয়ে অবাক হয়ে তাকাল, 'কী ব্যাপার শচী?'

ওকে দেখে শচীদুলাল উঠে দাঁড়াল। 'লন্ড্রি থেকে সেই জামা-প্যান্ট নিয়ে এসেছি স্যর। সন্ধে থেকে আপনার জন্য বসে। কেবলই ভাবছি, এই বুঝি আপনি এলেন।'

রাজীবকে ঈষৎ লজ্জিত মনে হল। 'তুমি তাহলে অনেকখানি সময় আমার জন্য নষ্ট করে বসে আছ শচী। আমি দুঃখিত,—ভেরি সরি। জামা-প্যান্ট নিয়ে তুমি যে সন্ধের সময় আসবে সে কথা একেবারেই মনে ছিল না।'

কাগজের একটা প্যাকেট করে জামা আর ফুল প্যান্টটা শচীদুলাল এনেছে, একটানে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে রাজীব আধময়লা পরিধেয় দুটির উপর ঝুঁকে পড়ল। প্রথমে শাদা হাফ শার্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপরে ফুল প্যান্টটা,—পায়ের দিক থেকে কোমর পর্যন্ত, মায় বোতাম-টোতাম সমস্ত অংশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিল। কিন্তু কোথায়? কিছুই না পেয়ে খুব হতাশ হয়ে রাজীব বললে, 'হল না শচী। জামা-প্যান্ট তুমি লন্ড্রিওয়ালাকে ফেরত দিয়ে এস।'

আদেশমত শচীদুলাল. উঠল। আগের মতই জামা আর প্যান্টটা মুড়ে নিয়ে কাগজের একটা প্যাকেট করল। বলল, 'আমি তাহলে যাই স্যর।'

চেয়ারে বসে দুই চোখ বন্ধ করে সম্ভবত কিছু ভাবছিল রাজীব। চোখ না খুলেই বলল, 'কাল সকালেই একবার এস শচী। তোমাকে আলোকপুরে একটা কাজে পাঠাব।'

শচীদুলাল চলে যেতেই রাজীব সোজা হয়ে বসল। পকেট থেকে নিখিলেশের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল। আশ্চর্য! এ চিঠিটা কে লিখতে গেল? চিঠির মাধ্যমে পত্রলেখক কাকে যেন হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছে। পত্রে কোনো সম্বোধন নেই। কালো কালো

ডেয়ো পিঁপড়ের সারির মত কতকগুলি আঁকাবাঁকা অক্ষর কাগজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়েছে। মনোযোগী ছাত্রের মত চিঠিটা পড়ল রাজীব। সম্বোধনহীন পত্রখানি খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বেশ তাৎপর্যময়। চিঠির শেষে গর্জন বলে একটা ছোট্ট নাম লেখা। অর্থাৎ গর্জন নামের কোনো লোক এই চিঠিটা লিখে কাউকে হুঁশিয়ার হতে বলেছে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে সমূহ বিপদ।

রাজীব অনেকক্ষণ চিন্তা করল মনে। গর্জন? নামটা কেমন বেখাপ্পা আর অদ্ভুত। এমন নাম কখনও শুনেছে বলে তার মনে পড়ল না। পুরো নামটা কী হতে পারে? গর্জনকুমার? উঁহু,—ওটা বিশ্রী শোনায়। আচ্ছা গর্জনপ্রসাদ হলে কেমন লাগবে কানে? রাজীব সজোরে মাথা নাড়ল। নামটা মোটেই সুখশ্রাব্য নয়। হঠাৎ গর্জন সিং নামটা রাজীবের মনে হল, পেন্সিল কাগজ নিয়ে দুবার নামটা লিখল রাজীব। স্বগতোক্তির মত খুব ধীরে ধীরে নামটা উচ্চারণ করল।

চিঠিতে অবশ্য আরো দুটি নামের উল্লেখ রয়েছে। পুরো নাম নয়, সে দুটিও ছোট্ট নামের সংকেত মাত্র। একটি শী বাবু,—লোকটি গর্জনের কাছ থেকে তার প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে এসেছে। অন্য নামটি উমোবাবু বলে এক ভদ্রলোকের। গর্জনের আশঙ্কা একে নিয়ে। তার ভয় অন্য কেউ উমোবাবুর কান ভারী করেছে। এবং উমোবাবুর আকস্মিক আগমনের সঙ্গে এই কান ভারী করার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলেই গর্জন মনে করে। চিঠির সবশেষে একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে গর্জন। ফেঁসে গেলে একসঙ্গে সকলে বিপদে পড়বে। বাঁচতে হলে খুব হুঁশিয়ার থাকা ভিন্ন উপায় নেই।

সম্বোধনহীন পত্রখানা আরো কয়েকবার পড়ে এক পাশে সরিয়ে রাখল রাজীব। পরে আবার ওটা কাজে লাগবে। শনিবার রাতে তরঙ্গ খুন হবার পর থেকে সমস্ত ঘটনাগুলি নিজের মনে সাজাচ্ছিল রাজীব। একের পর অন্যটি, পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে। আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করে রাজীবকে যথেষ্ট গম্ভীর মনে হল। খুনী লোকটা ভীষণ ধূর্ত। এমন সুন্দরভাবে আত্মগোপন করে আছে যে তাকে পাওয়া কঠিন। এবং খুঁজে পেলেও খুনের অপরাধ প্রমাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য।...

অন্যদিনের চেয়েও অনেক ভোরে ঘুম ভাঙল রাজীবের। পূর্বের আকাশটা তখন সবে লাল হতে শুরু করেছে। বাতাসে ঠাণ্ডা শিরশিরানি ভাব। শিশির পড়ে ঘাস, গাছপালা সব ভিজে মনে হচ্ছে। সমস্ত রাত ভালো করে ঘুমোতে পারে নি রাজীব। শুধু শেষরাতে কখন এক চটকা ঘুম এসে থাকবে। খুনের কেস হাতে থাকলে শেষ দিকটায় এমনি অবস্থা হয় রাজীবের। আর মনের অবস্থাটা এমনি হলে অন্তরে রাজীবও খানিকটা আশ্বস্ত হয়। সে জানে এর পর আর দু-একদিন মাত্র অপেক্ষা। রহস্যের কঠিন আবরণ ভেদ করে অনুসন্ধিৎসু মন হত্যাকারীকে খুঁজে পাবেই।

জামা-প্যান্ট পরে অফিসে এসে বসতেই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

এত সকালে টেলিফোন? রাজীবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টরের কাছে সাতসকালে টেলিফোন এলে চিন্তার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দুঃসংবাদ বলে জানা গেছে। কপালে অনেকগুলি রেখা পড়ল রাজীবের। কেউ খুন হল নাকি আবার? টেলিফোনে হাত দেবার আগে প্রতিধ্বনির মত কথাটা মানসিক ভূভাগে বহুক্ষণ অনুরণিত হল।

'হ্যালো', টেলিফোনে তখনই নিজের পরিচয় দিতে রাজীব চাইল না।

'মে আই স্পিক উইথ মিস্টার সান্যাল—সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর?'

'ইয়েস, আই অ্যাম অন দি লাইন।' রাজীব এবার স্পষ্ট হল।

'কে, মিস্টার সান্যাল? আরে মশাই, কাল সন্ধের পর থেকে আপনাকে দুবার ফোন করেছি। দুবারই আপনারা পাত্তা নেই। আপনাদের পুলিশ লাইনের অপারেটর বলল যে, আপনি মথুরাপুরের

বাইরে গিয়েছেন।'

'কিছু প্রয়োজন ছিল ম্যানেজারসাহেব?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল, 'কাল বিকেলের দিকে একবার বেরোতে হয়েছিল কাজে। ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল।'

টেলিফোনে হাল্কা একটুখানি হাসি ভেসে এল। সুদর্শন চক্রবর্তী বলল, 'আপনি দেখছি ভীষণ অ্যাকটিভ, ইন্সপেক্টর। বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খুনী আসামীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!'

'রাত দশটায় আপনি টেলিফোন করেছিলেন নাকি?' রাজীব প্রশ্ন করল।

সুদর্শন যেন খোঁচা দিয়ে বলল, 'এর পরে টেলিফোন করলে রাতদুপুরে আপনার ঘুম ভাঙাতে হত। কিন্তু ব্যাপারটা অত জরুরী বলে আমার মনে হয়নি।'

ইচ্ছে করলে উষ্মা প্রকাশ করতে পারত রাজীব। কিন্তু তাতে ক্ষতি বৈ লাভ নেই। অন্তত এ ক্ষেত্রে। মিল ম্যানেজার কি বলতে চায় তা অবশ্য আঁচ করতে পেরেছে রাজীব। তবু অনেক সময় অজ্ঞতার ভান করতে হয়। ন্যাকা সাজা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

'কী ব্যাপার বলুন দিকি?' রাজীব খুব নরম গলায় বলল।

'আমাদের টেলিফোন অপারেটর মিস সুজাতা দাস রেজিগনেশান দিয়েছেন। ওটা অ্যাকসেপ্ট করে নিলে মিস দাস সম্ভবত তখনই দিকনগর ছেড়ে চলে যাবেন।'

টেলিফোনে প্রশ্ন হল,—'উনি কোনো নোটিস দেননি?'

'ইচ্ছে করলে এক মাসের নোটিস অবশ্য আমরা দাবী করতে পারি। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তা ঠিক চাওয়া হয় না। ইট ইজ নো ইউজ কিপিং অ্যান আনউইলিং ওয়ার্কার। ওতে কোম্পানির বরং ক্ষতি হয়। অনিচ্ছুক লোকে কাজ করে না।'

'আপনি কী ঠিক করেছেন?'

'অন্য সময় হলে আমি মিস দাসের রেজিগনেশান অ্যাকসেপ্ট্ করে নিতাম। মানে, উইদাউট এনি হেজিটেশন। কিন্তু এখন সারকামস্টান্সেস ভিন্ন। আমার মনে হচ্ছে পুলিশের একটা গ্রিন সিগন্যাল নেওয়া দরকার।' টেলিফোনে সুদর্শন তার বক্তব্য জানাল।

হঠাৎ রাজীব বলল,—'মিস দাস রেজিগনেশান দিয়েছেন একথা আর কেউ জানে?'

'আর কারো জানবার কথা নয়। মিস দাসকে আমি ব্যাপারটা গোপনীয় রাখতে বলেছি,—টিল হার রেজিগনেশান ইজ অ্যাকসেপ্টেড।'

'পদত্যাগপত্রটা নিশ্চয়ই হাতে লেখা?'

'ঠিক ধরেছেন। টাইপ করতে গেলেই জানাজানি হবে। সম্ভবত সেজন্যই মিস দাস ওটা হাতে লিখেছিলেন। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কি জানেন? উনি পদত্যাগ পত্রটি মাতৃভাষায় রচনা করেছেন—'

'ওতে কিছু মনে করবার নেই। হয়তো ইংরেজীতে তেমন দখল নেই মিস দাসের। সেজন্যই বাংলাতে চিঠি লিখেছেন। ভুলচুক হবার সম্ভাবনা কম।'

কয়েক সেকেন্ড পরে রাজীব আবার বলল, 'কিন্তু পদত্যাগপত্রটা আমি কি একবার দেখতে পারি? অবশ্য ম্যানেজারসাহেবের যদি আপত্তি না থাকে।'

টেলিফোনে মিল ম্যানেজার জানাল, 'রেজিগনেশান লেটারটা দেখানো অবশ্য উচিত নয়। তবে আপনি যখন বলছেন,—দেখে যেতে পারেন। খুব শাদামাঠা চিঠি লিখেছেন মিস দাস। দিকনগরে তার শরীর মন ভেঙে পড়ছে। তাই চাকরি ছেড়ে দিতে চান।'

'আজ এগারোটা নাগাদ আপনার ওখানে আসছি তাহলে।'

'আজ?' সুদর্শন যেন নিষেধ করতে চাইল। 'আজ আমি এখনই কলকাতায় যাচ্ছি। ফিরতে রাত নটার বেশি হবে। আপনি বরং কাল আসুন।'

রাজীব বলল, 'আপনি আজই যাচ্ছেন?'

'কেন বলুন তো?' টেলিফোনে মিল ম্যানেজারের গলাটা একটু বিরক্ত শোনাল। 'কোম্পানির কাজে আমায় যেতে হচ্ছে। খুব দরকার।'

এবার হেসে ফেলল রাজীব। বলল,—'আমারও খুব জরুরী প্রয়োজন ছিল মিস্টার চক্রবর্তী। যাই হোক আপনি ফিরে আসুন।'

টেলিফোনে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তারপর, আপনার তদন্তের কতদূর?'

রাজীব হেসে উত্তর দিল, 'ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। নতুন একটা ক্লু পেয়েছি। ঘটনার দিন রাত দশটার পর একজন পাঞ্জাবি শিখকে সুদামডির মোড়ের কাছে দেখা গেছে। লোকটাকে ঠিক ট্রেস করা যাচ্ছে না।'

'পাঞ্জাবী শিখ? ওরে বাবা!' কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আভাস।

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা ম্যানেজারসাহেব, আপনি তাহলে কলকাতা থেকে ফিরে আসুন। মোর হোয়েন উই মিট এগেন।' টেলিফোনটা ছেড়ে দিল রাজীব।

দরজা খুলে শচীদুলাল ঘরে ঢুকল। সাতসকালেই ওর স্নানটান সারা। চুলটুল পরিপাটি করে আঁচড়ান। কামাবার পর গালে একটু ক্রিম বা ঐ জাতীয় কিছু ঘষেছে বলে মুখটা একটু তেলতেল মনে হচ্ছে।

রাজীব হেসে বলল, 'এসে গিয়েছ শচী। বস ঐ চেয়ারটায়' একটা শ্লিপ কাগজ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কী যেন সে লিখতে লাগল।

চেয়ারে বসে শচীদুলাল বলল, 'কোথায় পাঠাবেন যেন বলেছিলেন স্যর।'

'আলোকপুরে।' রাজীব মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'সন্ধের সময় আমার সঙ্গে দেখা করো শচী। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

শ্লিপ কাগজে লেখা শেষ হলে রাজীব বলল, 'তোমাকে আলোকপুরে গিয়ে কী করতে হবে তা এই কাগজে লিখে দিলাম শচী। বি ভেরী কেয়ারফুল, প্রত্যেকটি নির্দেশ ঠিকমত মেনে চলবে। নইলে পরে আমাদের ট্রাবলে পড়তে হতে পারে।'

'আমি তাহলে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ি স্যর?' শচী অনুমতি চাইল।

'বেশ তো'—রাজীব আপত্তি করল না।

শচীদুলাল চলে যেতেই রাজীব টেলিফোনটা নিল। অপারেটরকে বলল দিকনগর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে।

অন্য প্রান্তে টেলিফোন বাজবার শব্দ পাওয়া গেল।

রাজীব বলল 'কে? সুব্রত?'

কণ্ঠস্বর ভেসে এল 'আমি সুব্রত রাজীবদা। কাল কখন চলে গেলেন আমি জানতেই পারলাম না।'

রাজীব বলল, 'তুমি বাড়ি গিয়েছ শুনে তোমাকে আর ডিসটার্ব করলাম না।'

কণ্ঠস্বর আবার কানে এসে লাগল, 'বলুন রাজীবদা, কী করতে হবে?'

'তোমার কুটির মার কথা মনে আছে সুব্রত?'

'কুটির মা?'

'হ্যাঁ। ঐ যে মেয়েটি, প্রভা মুখার্জিদের মেসে রান্না করে। ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলা দরকার।'

'কোথায় বলবেন?'

'থানায় বসে। আমি যতদূর জানি বেলা নটা নাগাদ রান্নাবান্না সেরে মেয়েটি ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। আর কোথাও কাজ করে কি না জানি না। কিন্তু বেলা সাড়ে নটার সময় ওকে

'আমি দিকনগর থানায় দেখতে চাই। তুমি সেইমত ব্যবস্থা করো।' রাজীব নির্দেশ দিল।

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল রাজীব। পৌনে আটটার মত। টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে এবার দিকনগরের পথে বেরিয়ে পড়া যেতে পারে। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীটা একবার দেখল রাজীব। উজ্জ্বল রোদ গাছপালায় মাটির বুকে, সতেজ স্বতঃস্ফূর্ত। কাগজ কলম নিয়ে বসবার আগেই খুট করে শব্দ এল ওর কানে। রাজীব চোখ তুলে তাকিয়ে অবাক হল। শশাংক ভট্চায সামনে দাঁড়িয়ে।

'আসুন, আসুন শশাংকবাবু। বসুন।' রাজীব এক গাল হাসল।

শশাংক নমস্কার করে বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম স্যর। নিখিলেশ বলছিল আপনি নাকি কাল গিয়েছিলেন আমাদের ওখানে?'

'হ্যাঁ।' রাজীব স্বীকার করল, 'শুনলাম নিখিলেশবাবুকে আপনি জামিনে খালাস করে নিয়ে এসেছেন। তাই আলাপ পরিচয় করতে গিয়েছিলাম।'

'বেশ করেছেন স্যর। নিখিলেশের সঙ্গে আলাপ পরিচয় না হলে ওর সম্বন্ধে আপনার একটা ধারণা হবে না। ও বলছিল আপনি নাকি আলাদা মানুষ। খুব প্রশংসা করছিল স্যর।'

রাজীব বলল, 'আজ আপনার ডিউটি নেই শশাংকবাবু?'

'ছিল স্যর। সকালে ছটার সময়েই নামতে হত খাদে। কিন্তু ডিউটিতে যেতে আজ পা উঠল না।'

'কেন?' রাজীব কৌতূহল প্রকাশ করল।

'শেষ রাতে খাদে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। দুটো লোক একেবারে শেষ। একটা বিলাসপুরী কুলি আর একজন আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান। ছোকরা অল্পবয়সী, মাস ছয়েক হবে কোলিয়ারিতে এসেছিল।' শশাংক সখেদে ব্যক্ত করল।

রাজীব বলল, 'কিন্তু খাদ তো বন্ধ নেই শশাংকবাবু।'

'তা নেই ঠিক। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট হলে সেদিন আমি আর খাদে নামি না স্যর। আমার খুব খারাপ লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, ডেড-বডি পর্যন্ত আমি দেখতে যাইনি।'

রাজীব অনেকক্ষণ একদৃষ্টে শশাংকের দিকে চেয়ে রইল। সম্ভবত শশাংক অস্বস্তি বোধ করছিল। এবং কিছু বলবার জন্য উসখুস করছিল মনে মনে। ওর অবস্থা বুঝে রাজীব বলল, 'আচ্ছা শশাংকবাবু, একটা প্রশ্ন আপনাকে করব?'

'নিশ্চয় স্যর?'

'তরঙ্গের সঙ্গে আপনার কখন শেষ দেখা হয়েছিল?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে শশাংক উত্তর দিল, 'শনিবার দিন সকালে। সাড়ে দশটা নাগাদ।'

'কোথায় দেখা হয়েছিল?'

'দিকনগর বাজারে। সাবান না তেল কী যেন কিনতে এসেছিল তরঙ্গ।'

'আপনিও নিশ্চয় কিছু কিনতে এসেছিলেন দিকনগরে?'

'আজ্ঞে না। আমি এসেছিলাম বাসের লোকের হাতে মথুরাপুরে একটা চিঠি পাঠাব বলে।'

'কী কথা হয়েছিল তরঙ্গের সঙ্গে? আপনাকে অবাক করে দেবার মত কোন কথা বলেছিল তরঙ্গ?

শশাংক বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করল। বলল, 'হ্যাঁ। ওর দুটো কথা আমার হেঁয়ালির মত মনে হয়েছিল স্যর।'

'কী কথা বলুন তো?'

'তরঙ্গ বলেছিল তার কাছে আমার একটা খাওয়া পাওনা আছে। রবিবার বিকেলে মথুরাপুরে

ও আমাকে খাওয়াবে।'

'শুনে আপনি কী বললেন?'

'আমি অবাক হয়েছিলাম। ভাবলাম তরঙ্গ কোনো নতুন চাকরি-বাকরি পেয়েছে। নইলে খাওয়াবার প্রশ্ন উঠছে কেন? ওকে বলেছিলাম, দিকনগর ছেড়ে চললেন নাকি? তরঙ্গ হেসে জবাব দিল,—'বলা যায় না কিছু। হয়তো দেখবেন, কাল রবিবারেই রওনা দিয়েছি।'

রাজীব টেবিলে পেন্সিল ঠুকে কী যেন চিন্তা করছিল। মুখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আর একটা কথা কী বলেছিল সে? যেটা আপনার হেঁয়ালির মত মনে হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তরঙ্গ আমাকে ফস করে আর একটা কথা বলল। খাওয়ানোর সঙ্গে তার কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কী কথা বলুন তো?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল।

'তরঙ্গ বলল, চাকরি ছেড়ে দিলে সে একটা গোপন খবর ফাঁস করে দেবে। তার কাছে নাকি দারুণ সব কাগজপত্তর আছে।'

'কী কাগজপত্তর আপনি জিজ্ঞেস করেননি?'

শশাংক এক গাল হাসল। বলল, 'তরঙ্গেব এ কথাটার আমি কোন মূল্য দিইনি। ওর কথা বলার এমনি একটি ভঙ্গি ছিল স্যর। খুব কায়দা করে চোখ ঘুরিয়ে কথা বলত তরঙ্গ। সব সময়ই অগাধ রহস্যের খবর রাখে এমনি একটা ভাব ছিল ওর।'

রাজীব নিজেও হাসল। বলল, 'নারীজাতি বড় ভাবপ্রবণ শশাংকবাবু। একটু কিছু পেটে গেলেই বড় আঁকুপাঁকু করে ওঠে। যতক্ষণ না সেটা বলতে পারছে, ততক্ষণ ওদের সোয়াস্তি নেই। এ সর্বনাশটি অবশ্য যুধিষ্ঠিরবাবু করে গিয়েছেন।'

'যুধিষ্ঠিরবাবু?' শশাংক আশ্চর্য হয়েছে মনে হল।

'মহাভারতের যুধিষ্ঠিরবাবুর কথা বলছি। আপনি জানেন না? ভদ্রলোক অভিশাপ দিয়েছিলেন, —নারীজাতির পেটে কথা থাকবে না। যেই থেকেই ভোগান্তি চলছে ওদের।'—কথা শেষ করে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাজীব বলল, 'আমাকে একবার দিকনগরে যেতে হচ্ছে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। আপনি ইচ্ছে করলে যেতে পারেন আমার সঙ্গে। যাবেন নাকি?'

শশাংক ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। 'আমার স্যর একটু কাজ আছে মথুরাপুরে। দিকনগরে আপনি একাই যান।'

রাজীব তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। 'আজ কী বার জানেন?'

'মানে, আজ তো শনিবার!' শশাংক কেমন মিইয়ে গেল।

'গত শনিবার এই সকাল বেলাতেই তরঙ্গের সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল না?'

প্রায় আমতা আমতা করে শশাংক জবাব দিল, 'হ্যাঁ স্যর। আমি ভাবতেও পারিনি ওর সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না।'

রাস্তায় নেমে রাজীব জিপে উঠে বসল। নির্দেশ পাওয়া মাত্র নেপালি ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

মথুরাপুর থেকে দিকনগরের পথটা বেশ সুন্দর। দুপাশে আদিগন্ত মাঠ। কোথাও ধানের ক্ষেত, সবুজ হিলহিলে ধানের চারা। কোথাও প'ড়ো অকর্ষিত জমি। বর্ষার জল হাওয়ায় গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাপ, আগাছার জঙ্গল। মাথার উপর রৌদ্রস্নাত শরতের সুনীল আকাশ।

সাড়ে ন'টার অনেক আগেই জিপ এসে থানার কাছে থামল।

সুব্রতের ঘরের দরজার কাছেই বছর চল্লিশ বয়সের একটি মেয়ে জড়সড় হয়ে বসে। মেয়েটি কে, একনজরে তাকিয়েই আন্দাজ করল রাজীব। কথার উত্তর দেবে কি? ভয়ে ও এরই মধ্যে

আধমরা হয়ে গেছে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সুব্রত বলল, 'আসুন রাজীবদা। মেয়েটাকে আমি থানায় বসিয়ে রেখেছি।'

'তা তো দেখলাম,' রাজীব চেয়ারে বসে বলল, 'কিন্তু তুমি ওকে ধমকেছ নাকি?'

'ধমকাব কেন?' সুব্রত অবাক হয়ে বলল।

'ওর মুখ চোখ খুব শুকনো দেখলাম। ভয় পেয়েছে বলে মনে হল।' রাজীব সহানুভূতি প্রকাশ কববার চেষ্টা করল।

উত্তর না দিয়ে সুব্রত অল্প একটু হাসল।

ডেকে পাঠাতেই একজন সিপাই এসে ঘরের মধ্যে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল। রাজীবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুব্রত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটির দিকে এক পলক তাকাল রাজীব। আধময়লা শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ। হাতে দু'গাছি চুড়ি ছাড়াও শাঁখা আর নোয়া—এয়োস্ত্রীর পরিচয়। বয়স চল্লিশ কিংবা দু-চার বৎসর বেশিও হতে পারে, অভাব অনটনে দৃষ্টি ভাবলেশহীন, নিরানন্দ।

খুব সহজ হবার ভঙ্গিতে রাজীব বলল, 'ওগো বাছা, প্রভা দিদিমণিদের ওখানে তো তুমিই বান্নাবান্না কর?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ কাজটা সেই করে।

'তোমার কাছে দু-একটা খবর জানার দরকার ছিল। মনে করে একটু বলবে কি?'

এবার সাহস পেয়ে মেয়েটি মুখ খুলল। 'বলুন, কি জানতে চাইছেন আমার কাছে।'

'তেমন কিছু নয়। ছোট ছোট দু' একটা প্রশ্ন। তুমি নির্ভয়ে উত্তর দাও দিকি।' রাজীব ওকে অভয় দিয়ে ফের বলল,—'শনিবার দিন বিকেলের কথা তোমার মনে আছে?'

'আছে বাবু। আপনি জিজ্ঞাসা করুন।'

'তুমি সন্ধের দিকে কখন কাজে গিয়েছিলে?'

'বেলা পাঁচটার পর। তখনও সন্ধে হয়নি।'

'তরঙ্গ দিদিমণি তখন ঘরে ছিলেন?'

'উনিই তো ছিলেন। সুজাতা দিদিমণি মথুরাপুরে গিয়েছিলেন। আর দু'জনের তো ফি শনিবারে বাড়ি যাওয়া আছে।'

'কী করছিলেন তরঙ্গ দিদিমণি?'

'আর একজন বাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন ঘরে বসে।'

'তুমি চেন বাবুকে?'

'ওমা! চিনি না আবার? উনি তো মিলেই কাজ করেন। বিশ্বনাথবাবু নাম।'

'বাবু কখন গেলেন?'

'আধ ঘণ্টা পরে। আমি চা করে দিলাম, দু'জনে খেলেন বসে।'

'এর পর আর কেউ এসেছিলেন?'

'এসেছিলেন বৈকি। আমাদের ভৈরববাবু এলেন আর খানিক পরেই। ভীষণ গম্ভীর মুখ। দিদিমণির খোঁজ করলেন আমার কাছে।'

'তোমার দিদিমণি তখন কোথায়?'

'বাথরুমে গিয়েছিলেন গা ধুতে। আমি ভৈরববাবুকে বসতে বললাম। উনি দিদিমণির ঘরে বসে টেবিলের কাগজপত্তর দেখছিলেন।'

'তারপর?'

'দিদিমণি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ওনার সঙ্গে কথা বলছিলেন।'

'কী কথা বলছিলেন জানো?'

'না বাবু। মনে হল আপিসের কোন কাজকর্মের কথা বলছেন দু'জনে। বোধহয় কিছু শলাপরামর্শ করছিলেন।'

'হুঁ।' রাজীব গম্ভীরমুখে বলল, 'তারপর?' উনি কখন গেলেন?'

—'খানিক পরেই। দিদিমণিও ওনার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তখন সন্ধে হতে দেরি নেই বাবু।'

'তরঙ্গ দিদিমণি কিছু বললেন তোমাকে?'

'হ্যাঁ বাবু। মেয়েটি ঢোক গিলে বলল,—'বলেছিলেন সকালে আসিস। তোর মেয়েকে একটা শাড়ি দেবো।'

'তুমি কী বললে?'

'আমি বললুম, হঠাৎ শাড়ি কেন গো দিদিমণি কোনো সুখবর আছে না কি? তা হেসে বললেন, —কাল সকালে শুনিস।' মেয়েটি হঠাৎ চোখ মুছতে মুছতে বলল 'সকালে যা শুনলাম গো বাবু তার চেয়ে খারাপ খবর কোনোকালে শুনিনি।'

রাজীব ধমক দিয়ে বলল, 'কাঁদছ কেন? আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।'

সওয়া এগারোটা নাগাদ রাজীব এসে পৌঁছল মিল অফিসে। ম্যানেজারসাহেবের কামরা খালি। দরজাটা হাট করে খোলা। উর্দিপরা বেয়ারাটার কোনো পাত্তা নেই। পাশের ঘরে বসে প্রভা নিজের মনে কাজ করছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজীব বলল, 'আসতে পারি?'

'আসুন, আসুন।' প্রভা সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

'আপনাকে বলেছিলাম না? আর একদিন আপনার কাছে আসতে হবে!'

'হ্যাঁ,' প্রভা ফিক্ করে হাসল, 'আপনার দেখছি সব মনে থাকে।'

'তা থাকে একটু।' রাজীব হাসিমুখ করল।

'ম্যানেজারসাহেব কিন্তু অফিসে নেই। আজ আসবেন না।'

'মিস্টার চক্রবর্তীকে দরকার নেই। আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

'কি সৌভাগ্য আমার!' প্রভা চোখ দুটি বড় বড় করে বলল। 'বলুন আপনার কী কাজে আসতে পারি?'

'সেটা পরে বলছি। তার আগে একটা কথা বলি আপনাকে। আজ শনিবার, আপনার কিন্তু বাড়ি যাওয়া চলবে না।'

'সে কি? আমার যে সব ঠিকঠাক!'

'প্ল্যান ভেস্তে দিন।' রাজীব হেসে বলল। একটু পরেই মুখখানা গম্ভীর দেখাল তার। খুব চাপাগলায় রাজীব উচ্চারণ করল,—'আজ কালের মধ্যেই খুনিকে আমি ধরতে পারব আশা করছি। কিন্তু আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন হবে।'

'আমার সাহায্য?' প্রভা চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল।

'কোনো ভয় নেই আপনার।' রাজীব ওকে আশ্বস্ত করল। 'আচ্ছা, মঙ্গলবারদিন মিলে কে এসেছিলেন কলকাতা থেকে?'

'কোম্পানির একজন ডিরেক্টর। কেন বলুন তো?'

'কী প্রয়োজনে বলতে পারবেন?'

'মানে, আমি ঠিক জানি না—।'

'জানেন, কিন্তু বলতে চাইছেন না।' রাজীব মন্তব্য করল।

'কি মুশকিলে ফেললেন বলুন তো? এসব কোম্পানির হাঁড়ির খবর। আমিও ঠিক জানিনে। শুধু—।'

'শুধু কী?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল।

'মনে হয় কোনো কারচুপি বা গণ্ডগোলের খবর পেয়ে উনি এসেছিলেন। আবার হয়তো আসতে পারেন।' একটু থেমে প্রভা বলল, 'দেখবেন, কাউকে আবার বলে বসবেন না যেন। ম্যানেজারসাহেব জানলে চাকরিটা যাবে।'

রাজীব হাসল। 'আচ্ছা প্রভাদেবী, তরঙ্গের সঙ্গে আপনার শেষ কখন কথাবার্তা হয়েছিল?'

'শনিবার দিন। অফিস থেকে ফিরে দেখি তরঙ্গ আমার ঘরে বসে রয়েছে।'

'তেমন কোনো কথা বলেছিল তরঙ্গ? আপনাদের অফিস নিয়ে?'

প্রভা মিনিটখানেক চিন্তা করল আপনমনে। বলল, 'হ্যাঁ, একটা কথা তরঙ্গ বলেছিল আমায়।'

'কী কথা?'

'অফিসের কি সব খবর নাকি ও জানতে পেরেছে। যা ফাঁস হলে অনেক ঘুঘু নাকি জব্দ হয়ে যাবে।'

'শুনে আপনি কী বললেন?'

'কী বলব আবার? ও অমনি মেয়ে—হয়তো ম্যানেজারসাহেবের কাছে কি একটু শুনেছে। তাই নিয়ে দপদপিয়ে মরছে।'

রাজীব বলল, 'আমি এখন উঠছি। কাল সকালে আপনি একবার থানায় আসুন।'

'থানায়?' আতঙ্কগ্রস্ত লোকের মত প্রভা বলল।

'কোনো ভয় নেই। ঠিক আটটার সময়। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব কিন্তু—!'

দিকনগর বাজারের কাছে সুজাতা দাসের সঙ্গে দেখা। নির্দেশমত নেপালি ড্রাইভার ঠিক ওর পাশেই গাড়ি থামাল। গলা বাড়িয়ে রাজীব বলল, 'এই ভরদুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন?'

সুজাতা দাস উত্তর দিল, 'দড়ি কিনতে!'

'দড়ি?'

'মানে এই বাঁধাছাঁদা করার জন্য।' সুজাতা দাস অদ্ভুত হাসল।

রাজীব বলল, 'কাল রাতে আপনাকে একটা খবর দেব ভেবেছিলাম।'

'খবর দেবেন কি, আপনিই তো খবর চাইলেন।' সুজাতা মন্তব্য করল।

'আগের বুধবার তরঙ্গ একটি কাণ্ড করে গিয়েছে শুনেছেন?'

খুব অবাক হয়ে সুজাতা বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'তরঙ্গের শেষ কীর্তিটি আপনি শোনেননি?' রাজীব পুনরায় বলল।

'কী কীর্তি আবার?'

'বুধবার দিন তরঙ্গ নিখিলেশকে বিয়ে করেছিল। কলকাতায় ওদের দু'জনের রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়।'

ভীষণ বোকা বোকা আর ভাবলেশহীন মনে হচ্ছিল সুজাতাকে।

রাজীব ওর দিকে চেয়ে হাসল। বেচারী সুজাতা,—এরকম মুখ অনেকদিন আগে ও একবার মাত্র আয়নায় হয়তো দেখে থাকবে।

সন্ধের অনেক আগেই শচীদুলাল এসে হাজির। রাজীব সুব্রতর সঙ্গে কেসের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিল। শচীদুলাল এসে সশব্দে ফেটে পড়ল, 'পেয়েছি স্যর।'

'কী পেয়েছ শচী?' রাজীব সহাস্যে তাকাল।

'সবুজ ফুলপ্যান্ট আর সাদা শার্ট। ব্যাটা মালিক আমায় খুব ভুগিয়েছে। মিল ম্যানেজারের জামাকাপড় সে কিছুতেই দেবে না। শেষে ভয় দেখিয়ে রসিদ দিয়ে এনেছি।'

খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবুজ ফুলপ্যান্টটা পর্যবেক্ষণ করল রাজীব। কোমরের কাছে একটা বোতাম নেই। ড্রয়ার খুলে কুড়িয়ে পাওয়া সেই বোতামটা মিলিয়ে দেখল রাজীব। অবিকল এক জিনিস। রাজীব অল্প একটু হাসল।

শচীদুলাল একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, 'এই দাগটা দেখেছেন স্যর?'

হাল্কা বাদামী রঙের গোলাকার খানিকটা দাগ। রাজীব বলল 'রক্তের দাগ বলে মনে হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' শাদা জামাটা উল্টে-পাল্টে দেখে কি একটা বস্তু টেনে আনল রাজীব। কলারের কাছ থেকে,—খুব লম্বা একটা চুল। বেশ দীর্ঘ।

সুব্রত বলল, 'নিশ্চয় মেয়েছেলের চুল রাজীবদা। ব্যাটা ম্যানেজারটা দেখছি শয়তান। তরঙ্গকে ওই খুন করেছে। আজ রাতেই ওকে অ্যারেস্ট করব রাজীবদা।'

রাজীব রহস্য করে হাসল। বলল, 'ধীরে সুব্রত। ধীরে অগ্রসর হও। রজনী এখনও বাকি!—'

ষোলো

অনেকক্ষণ পরে শচীদুলাল বলল, 'কিন্তু স্যর, রক্তের রঙ কি এমনি হয়? দাগটা কেমন ফিকে বাদামী বলে মনে হচ্ছে না?'

গোলাকার কয়েকটি দাগ, যেন একই কেন্দ্র হতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্যান্টের কাপড়ের সেই দাগটা আলোর কাছে তুলে পরীক্ষা করল রাজীব। নিরীক্ষণ শেষ হলে সে বলল, 'গরম জলে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করলে এমনি দেখাতে পারে। যাই হোক একবার পরীক্ষা করতে দিলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।' একটু থেমে ফের বলল রাজীব, 'অন্য উপায় কিছু দেখছি না। সুদর্শন চক্রবর্তীকে চেপে ধরলে ভদ্রলোক হয়তো ওটা মাছের রক্ত বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন।'

—'কিন্তু মেয়েদের মাথার লম্বা চুলটা রাজীবদা?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

'ওটা?' রাজীব বাঁকা চোখে তাকাল। 'চুলটার সম্বন্ধে সোজা উত্তর তো পড়ে আছে সুব্রত। পুরুষমানুষের জামার কলারে লম্বা চুল পাওয়া গেলে ওটা অর্ধাঙ্গিনীর বলে চালিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আদর অভিমানের কোনো একটি নিবিড় ঘন মুহূর্তে জামার কলারের কাছে ওটা আটকে গিয়ে থাকবে।'

সুব্রত মনে করে বলল, 'তরঙ্গের মাথার কয়েকটা চুল হরেন ডাক্তার বোধহয় রেখে দিয়েছে রাজীবদা।'

রাজীব হাসল। 'আমার মনে আছে সুব্রত। চুলগুলো কালই পরীক্ষার জন্য পাঠাব। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে এক একটি চুল ঠিক পেনসিলের মত দেখায়,—অর্থাৎ বাইরেটা রঙিন, ভিতরটা কাঠ, এবং আরও ভিতরে একটা কালো শীস। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলি মেডুলা, কোরটেক্স এবং কিউটিকল। দেখা যাক জামার কলারে পাওয়া চুলের সঙ্গে, তরঙ্গের চুলের কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায় কি না।'

সুব্রত সহর্ষে বলল, 'আমার আর তর সইছে না রাজীবদা। সুদর্শন চক্রবর্তীকে হাজতে না ঢোকানো পর্যন্ত আমার মনে সোয়াস্তি নেই।'

কথা শুনে রাজীব প্রায় ধমক দিল। —'বড্ড ব্যস্ত তুমি সুব্রত। খুনের কেসে ছটফট করলেই কিন্তু সব মাটি। পূর্ব-পরিকল্পিত একটা খুনের পিছনে কোনো একজন বা অনেকজন দীর্ঘসময় মাথা ঘামিয়েছে। সুতরাং জট ছাড়াতে ধৈর্যের প্রয়োজন।' অল্পক্ষণ চিন্তা করে রাজীব বলল, 'আমার

মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে খুনিকে হাতে-নাতে ধরতে পারা যাবে।'

সুব্রত সোৎসাহে বলল, 'কেমন করে রাজীবদা?'

রাজীব ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'ওকে আর একটা খুন করবার সুযোগ দিয়ে।'

'আর একটা খুন? বলেন কী স্যর?' শচীদুলাল চোখ দুটোকে প্রায় কপালে তুলল।

'ইয়েস। আর একটা খুন। মনে রেখো শচী। এ মার্ডারার ইজ সেলডম্ কনটেন্ট উইথ ওয়ান ক্রাইম। গিভ হিম টাইম অ্যান্ড এ ল্যাক অফ সাসপিশন অ্যান্ড হি উইল কমিট অ্যানাদার।' রাজীব কথা শেষ করেই অল্প হাসল। বলল, 'আচ্ছা, আজকের মত তাহলে সভা ভঙ্গ সুব্রত।'

খুব সকালে দিকনগরের পথে জিপগাড়িটা দ্রুত ছুটছিল। দুপাশে সেই পরিচিত দৃশ্য। গাছপালা, ধানক্ষেত, ঝোপঝাপ আর আগাছার জঙ্গল। কোথাও বন্ধ্যা নারীর মত অনাবাদী মাটি। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রাজীব সময় দেখল। সাড়ে সাতটার কাছাকাছি। শচীদুলালকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে খানিকটা সময় গেছে। নইলে আরো খানিকটা সময় পেত রাজীব। সকালের এক্সপ্রেসটায় রওনা হয়ে বেলা দশটার মধ্যেই শচীদুলাল কলকাতায় পৌঁছে যাবে। রক্তের সেই দাগটা আর শার্টের কলারের কাছে পাওয়া চুলটার পরীক্ষা করানোর জন্যই শচীকে কলকাতায় পাঠান। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ফলাফল সংগ্রহ করে ফিরতে হবে। রাজীব বারবার বলে দিয়েছে সম্ভব হলে শচী যেন রাত নটা নাগাদ নিশ্চয়ই মথুরাপুরে এসে পৌঁছয়।

দিনটা রবিবার। কথাটা খেয়াল হতেই রাজীবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির খোদ কর্তার সঙ্গে তার একটু জানাশুনো আছে। শচীর হাতে রাজীব একটা চিঠি দিয়েছে। পত্র নিয়ে খোদ কর্তার সঙ্গে দেখা করবে শচীদুলাল, যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়। কলকাতায় বিকেলের ট্রেনটা ধরবার একটা সম্ভাবনা থাকে।

জিপগাড়িটা অফিসগামী কোনো বাসের মতই দিকনগরের নিকটবর্তী হল। দূরে দূরে কোলিয়ারির চানখ, গাছপালার আড়ালে ঘরবাড়ি, আর পেপার মিলের বয়লার ঘরের চিমনির মুখ থেকে উদগত কালো ধোঁয়া চোখে পড়তেই রাজীব নড়েচড়ে বসল। আর কয়েক মিনিট পরেই গাড়ি দিকনগরে ঢুকবে। সুতরাং আলস্যের আর অবসর নেই।

নেপালি ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে রাজীব বলল, 'বাহাদুর, বীরেন শ'র দোকান চেনো?'

সাতসকালে মদের দোকানের খোঁজ দেখে বাহাদুর মুচকি হাসল। মাথা হেলিয়ে সে বলল, 'জী, হাঁ।' অর্থাৎ দোকানটা তার চেনা।

রাজীব গম্ভীর মুখে হুকুম করল, 'লে চলো।'

চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জিপগাড়িটা এসে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল। মাটিতে পা দিয়ে মাথা তুলে দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকাল রাজীব। বড় বড় হরফে লেখা, শ'জ ওয়াইন শপ। নীচে বাংলা অক্ষরে শুধু মদের দোকান কথাটি লেখা হয়েছে। এত সকালে সুরারসিকদের আগমনের কথা নয়। ওদের অনেকেরই চোখে এখনও নিশীথের অন্ধকার। বেলা ন'টার আগে শয্যাত্যাগ প্রায় অকল্পনীয়। অবশ্য খোয়ারি ভাঙতে কেউ কেউ সকালবেলাতেও এসে জোটে। এক পাত্র পেটে ঢেলে দিয়ে দেহের অবসাদ তাড়ায়।

রাজীবকে দেখে দোকানি লোকটি জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। পরনে খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট। হাতে একটা মোটা রুল। নতুন আবগারী দারোগা নয় তো বাবু? দোকানী মনে মনে কথাটা ভাবছিল।

'তোমার নাম বীরেন শ?'

'আজ্ঞে না। আমি তেনার কর্মচারী—'

'বীরেনবাবু কোথায়?'

'বাড়িতে আছেন। ডেকে নিয়ে আসব হুজুর?'

'দোকানে সন্ধের পর কে থাকেন?'

'আমি হুজুর—।'

'বীরেনবাবু?'

'তিনিও থাকেন। তবে মাঝে মাঝে তেনাকে ইখানে-সিখানে যেতে হয়।'

'ম্যানেজার সাহেবকে চেনো তুমি? পেপার মিলের ম্যানেজার সাহেব—?'

'চিনি হুজুর।'

'দোকান থেকে মদের বোতল যায় ওর বাংলোতে?'

জিভ কেটে লোকটা উত্তর দিল,—'কী যে বলেন হুজুর। ম্যানেজার সাহেবের জন্যে মাল কিনতে ভৈরববাবুকে কলকেতা ছুটতে হয়। সময় কম থাকলে আলোকপুরে তো নির্ঘাত। আমাদের দোকানের মালে কি ওঁর রুচি হয় আজ্ঞে? —না ওনার সম্মান থাকে? দামী শ্যাম্পেন আমরা কোথায় পাব বলুন?'

'এর আগের শনিবারের কথা মনে আছে তোমার?'

'কী কথা হুজুর?'

'দোকানে তুমি সন্ধের পর সর্বক্ষণ ছিলে?'

'আজ্ঞে হুজুর।' লোকটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল।

'বীরেনবাবু?'

'আজ্ঞে তিনি রাত আটটার পর গণপত মাড়োয়ারির গদিতে একটা কাজে গিয়েছিলেন।'

'কখন ফিরলেন?'

'আজ্ঞে রাত দশটা নাগাদ।'

'দোকানে তখন কেউ ছিল?'

'কেউ না হুজুর। তার একটু আগেই ভৈরববাবু দু পেগ হুইস্কি খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।'

'ভৈরববাবু কখন এসেছিলেন দোকানে?'

'রাত ন'টার পর।'

রাজীব ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় কী সব বলল।

ঠিক তখনই লোকটার চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাল। বলল, 'কথাটা তো আমি ভুলেই গেছিলাম হুজুর। তেনার ভাবগতিক দেখে আমি তো হেসে বাঁচিনে। মালিক আসতেই বললাম তেনাকেও। তা মালিকও আমার তেমনি। হি হি করে হেসে বলল, নেশাটা বোধহয় বেশি হয়ে গেছে। তাই ঝোঁকের মাথায় কাণ্ডটি করেছে।'

দিকনগর থানায় এসে রাজীব দেখল, সুব্রত তার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজীবের চোখের তারায় উপচানো খুশি, ঠোঁটের চাপা হাসি, আর মুখের উজ্জ্বল ভাব দেখে সুব্রত বলে ফেলল, 'ব্যাপার কী রাজীবদা? আজ যে ভীষণ ব্রাইট দেখাচ্ছে আপনাকে!'

মুচকি হেসে রাজীব বলল, 'এখুনি এক ভদ্রমহিলা আসবেন, সি ইজ এ প্রেটি ইয়ং গার্ল। তুমি বাড়ি গিয়ে দু' কাপ চা পাঠিয়ে দাও। আর দোহাই সুব্রত, উনি যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ আমাকে রাজীবদা বলে ডেকে কাছে এস না।'

কথাটার অর্থ সুব্রতর ঠিক বোধগম্য হল না। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে বেরিয়ে গেল।

প্রভা ঠিক সময় এল। আশমানী রঙের একটা শাড়ি, গায়ে অমনি রঙেরই ম্যাচ-করা একটা জামা। এই সকালবেলাতেই কেমন নিপুণ হাতে কাজল টেনেছে চোখে। স্নো-পাউডার ঘষে গোল মুখখানা যতদূর সুন্দর করা যায়, দীর্ঘ সময় তারই প্রস্তুতি চলেছে।

'বলুন কী জন্য ডেকেছেন?' প্রভা এসেই চড়াও হল।

খুব গম্ভীরভাবে রাজীব বলল, 'আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম মনে আছে?'

'আছে—।' প্রভা স্বীকার করল।

'বাঘ শিকারের গল্প পড়েছেন মিস মুখার্জি।' রাজীব ঈষৎ যেন হেঁয়ালি শুরু করল।

'বাঘ শিকারের?' প্রভা খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'বাঘ শিকারে অনেক সময় টোপ ব্যবহার করতে হয়। ছাগল-টাগল, গরু-বাছুর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে টোপ হিসেবে মানুষ ব্যবহার করারও চেষ্টা হয়েছে।'

'তাতে কী?' অত ভনিতা করে বলছেন কেন?'

রাজীব দাঁত টিপে বলল, 'ভয় পাবেন না মিস মুখার্জি। আপনাকে আমি টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই।'

'আমাকে?' আতঙ্কে প্রভার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। পকেট থেকে রাজীব একটা কাগজ বের করে প্রভাকে পড়তে দিল। মিনিটখানেকের মধ্যেই পড়া শেষ করে প্রভা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন?'

'পেয়েছি, —যেখানেই হোক,' রাজীব হাসল।

'জানেন, কি সাংঘাতিক খবর আছে এ-চিঠিতে?'

রাজীব আবার হাসল। বলল, 'এই খবরটা আপনাকে জানাতে হবে একজনকে।'

'কী খবর?'

'বলবেন, শনিবার বাড়ি যাবার সময় তরঙ্গের কাছ থেকে একটা গল্পের বই নিয়েছিলেন আপনি। বইটার মধ্যে একটা অদ্ভুত চিঠি ছিল।'

'তারপর?' প্রভা খুব ভয়ে ভয়ে বলল।

'বলছি', রাজীব ওর ফ্যাকাশে মুখটার দিকে চেয়ে হাসল। 'বলবেন চিঠিটা ডিরেক্টরদের হাতে পড়লে বহু ঘুঘু ব্যক্তি ফাঁদে পড়ে যাবেন।'

'কিন্তু আমার কথা কি সে বিশ্বাস করবে? যদি বলে, এতদিন কেন আমি চিঠির কথা চেপে গিয়েছিলাম?'

ইতিমধ্যে দু'কাপ চা এসে হাজির টেবিলে। এক চুমুক চা পান করে রাজীব বলল, 'সেই কথাটা জানেন মিস মুখার্জি? পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। এখানেও ব্যাপারটা তাই। চিঠির কথা যার মনে ছ্যাঁকা দিচ্ছে, আপনার কথা সেই বিশ্বাস করবে। বলবেন, তরঙ্গ খুন হবার পর ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন আপনি। পুলিশের ভয়ে চিঠির কথা কাউকে ফাঁস করেননি।'

'তারপর?' প্রভা মনোযোগী শ্রোতার মত প্রশ্ন করল।

ভবিষ্যৎ বক্তার মত রাজীব উচ্চারণ করল,—'তারপর আর কি? আজ রাতেই খুব সম্ভবত তিনি আসবেন আপনার কাছে—।'

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ। চিঠিটা সংগ্রহ করতে হবে না? তার জন্যেই তো এই খুনোখুনি!'

প্রভা বিস্ময়ে হাঁ করে রইল।

রাজীব বলল, 'ভয় পাবেন না। আমি সদাসর্বদা আপনার সঙ্গে আছি। নির্ভয়ে এগিয়ে যান।'

প্রভা চলে যেতেই সুব্রত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল। বলল, 'চাকামুখী মেয়েটা কি সাজগোজ দেখলেন রাজীবদা! সাত-সকালে কেমন পটের বিবি সেজে এসেছিল।'

রাজীব তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। 'তুমি দেখছি মেয়েদের মত ঈর্ষায় জ্বলছ বড়বাবু।'

'দূর! ঈর্ষা করতে যাব কেন?' —সুব্রত হাসল।

'বেরোতে হলে মেয়েদের সাজসজ্জার একটু প্রয়োজন হয় বড়বাবু', রাজীব একটু থেমে যোগ করল—'রমণীতনু মানে একটি ফুলের বাগান। ঠিকমত পরিচর্যা না করলে খোলতাই হয় না।'

বেলা এগারোটার সময় রাজীব এসে দাঁড়াল মিল ম্যানেজারের কামরার সামনে। দিনটা রবিবার। মিলের অফিস-টফিস কিছু-কিছু বন্ধ। কোনো কোনো ঘরে এবং কারখানায় যথারীতি কাজ চলছে। রাজীবকে দেখে উর্দি-পরা বেয়ারা মস্ত এক সেলাম জানাল।

'ম্যানেজার সাহেব আছেন?'

'হ্যাঁ সাব।' লোকটি সামান্য নত হয়ে বিনয় প্রকাশ করল।

স্লিপ দিতেই সুদর্শন চক্রবর্তী ডেকে পাঠাল তাকে।

'কী খবর ইন্সপেক্টর সাহেব? আপনার সেই পাঞ্জাবি শিখের পাত্তা পেলেন নাকি?' মিল ম্যানেজার শুরুতেই তদন্তের গল্প শুরু করল।

খুব হতাশ ভঙ্গি করে রাজীব বলল, 'কোনো হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না লোকটার। তবে পুলিশ বসে নেই,—অনুসন্ধান চলছে।'

'মিস দাসের পদত্যাগপত্রটা দেখবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এসেছি যখন, চোখ বুলিয়ে যাই একবার।'

পদত্যাগ পত্রটা পড়ে রাজীব মুচকি একটু হাসল। ব্যাপারটা সুদর্শন চক্রবর্তীর দৃষ্টি এড়ায়নি। সে বলল, 'ওতে হাসির কী পেলেন?'

'কিছু না। লেখাটা বেশ সুন্দর, গোটা গোটা দেখলাম। নিজের হাতের লেখা খুব খারাপ। তাই মনের দুঃখে একটু হাসলাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে রাজীব বলল, 'একটা কথা বলব ম্যানেজার সাহেব?'

'কী কথা? বলুন না—।'

'আপনার মিলের একটা গাড়ি দেবেন? মানে আমাকে একটু মথুরাপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে?'

'নিশ্চয় দেব। কিন্তু আপনার জিপগাড়ির কী হল?'

'আর বলবেন না। সাহেব কোথায় যেন যাবেন দশটার পর। তাই জিপটা ছেড়ে দিতে হল।'

টেলিফোনটা তুলে সুদর্শন চক্রবর্তী বলল, 'ভৈরববাবু? হ্যাঁ, একবার আসুন তো এখানে।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভৈরব এসে ঢুকল ঘরে। রাজীবকে দেখে খানিকটা আশ্চর্য এবং খানিকটা বিনয়ের ভাব প্রকাশ করে সে বলল, 'স্যর আপনি?'

'হ্যাঁ, ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে একটু দরকার ছিল।' রাজীব বাকিটুকু উহ্য রাখল।

সুদর্শন বলল, 'ভৈরববাবু, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন ইন্সপেক্টর সাহেবকে। মথুরাপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে ওঁকে।'

ভৈরব একগাল হাসল। —'নিশ্চয়ই স্যর, আসুন আমার সঙ্গে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে রাজীব বলল, 'একটা ভালো গাড়ি দেবেন কিন্তু ভৈরববাবু। দেখবেন পথের মধ্যে আবার না খারাপ টারাপ হয়ে যায়। গিন্নীকে কথা দিয়ে এসেছি, বারোটার মধ্যে ফিরব বলে। বিশেষ দরকার আছে, সময়ে পৌঁছতে না পারলে হোমফ্রন্টে কালবোশেখী শুরু

হয়ে যাবে।'

ভৈরব দত্ত মিষ্টি হেসে বলল, 'কিছু চিন্তা করবেন না স্যর। কোম্পানির নতুন কেনা শাদা গাড়িটা আপনাকে দিচ্ছি। পাখির মত হুস করে নিয়ে মথুরাপুরে হাজির হবে।'

'ড্রাইভার? বেশ ভালো চালায় তো?'

'শাদা গাড়িটা ইয়াসিনই চালায় স্যর। মিলের সেরা ড্রাইভার। একবার দেখুন না বসে। গাড়ি তো নয় স্যর, যেন পুষ্পক রথ।' ভৈরব আকর্ণবিস্তৃত হাসি উপহার দিল।

রাত ন'টার পরই এদিকটা নির্জন হয়ে গেল। সন্ধের পরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসটা ভিজে, গাছপালা জলে নেয়ে কাঁপছে। মাঝে মাঝে হু-হু পুবে-হাওয়া, সম্ভবত গভীর রাতে আরো দু'-এক পশলা বৃষ্টি হবে। আকাশে পাতলা একটা মেঘের চাদর। জ্যোৎস্না তার আড়ালে লুকিয়েছে। তারাভরা সুন্দর আকাশী চিত্রটার উপর কে যেন মস্ত একটা ব্রাশে এক পোঁচ মেঘ রঙ মাখিয়ে হিজিবিজি টেনে দিয়েছে।

দোকানপাট অনেকক্ষণ বন্ধ। পথে লোকজন নেই। নির্জন স্তব্ধ পৃথিবী। একা-একা পথ হাঁটতে কেমন যেন গা ছমছম করে। রাত আটটার পরই খাওয়া-দাওয়া সেরে সুজাতা বেরিয়ে গেছে। ওর আজ নাইট ডিউটি।

ফিস ফিস করে সুব্রত বলল, 'রিপোর্টে কী বলেছে রাজীবদা? ওটা রক্তের দাগ তো?'

'হ্যাঁ। মানুষের রক্ত।'

'আর চুলটা?'

'তরঙ্গের চুলের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে তার।' রাজীব চাপা গলায় উত্তর দিল।

বাড়ির চারপাশে খানিকটা মাঠ। খোলা জানালা দিয়ে বহুদূরে কি একটা আলো দেখা দিল। আলেয়ার আলোর মত ভৌতিক সংকেত। কাছেই একটা গাছের চারপাশে জোনাকির আলো যেন অশরীরী আত্মার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্বের হদিশ দিয়ে জ্বলছে, আবার নিভছে। হঠাৎ কাছেপিঠে কোথায় শৃগালের দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

বিছানায় শুয়ে প্রভা বলল,—'আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে। লোকটা যদি আমার গলা টিপে ধরে।'

খুব বিরক্তি প্রকাশ করে রাজীব বলল, —'আপনি চুপ করবেন দয়া করে? বেশি কথা বললে দেখছি আমাকেই আপনার গলা টিপে ধরতে হবে।'

প্রভা ভয়ে ভয়ে চুপ করল।

দিকনগর থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজল। মশার একটা মোক্ষম কামড় খেয়ে সুব্রত কাতরে উঠল। সে অস্ফুটে বলল, 'কতক্ষণ এমন ঘাপটি মেরে বসে থাকা যায় রাজীবদা?'

রাজীব প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ।'

হঠাৎ খুব মৃদু একটা-শব্দ রাজীবের কানে এল। সন্তর্পণে পা ফেলে কে যেন এগিয়ে আসছে। শব্দটা গড়াচ্ছে এদিকেই। লোকটার পায়ে নিশ্চয় রবার সোলের জুতো। নইলে শব্দটা আরো জোরে শোনাত।

টুক টুক করে কে যেন টোকা দিল দরজায়।

বিছানাতে উঠে বসে প্রভা বলল, 'কে?'

'আমি।' চাপা গলায় জবাব এল।

দরজা খুলে খুব অবাক হল প্রভা। 'আপনি? এই বেশে?' সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল।

দীর্ঘকায় লোকটি। ফুলপ্যান্ট আর জামার উপর বর্ষাতি। মাথায় বৃষ্টি বাঁচাবার জন্য টুপি।

'চিঠিটা দেখতে এলাম।' আগন্তুক তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিল।

প্রভা পিছন ফিরল। 'সুইচটা খারাপ হয়ে গেছে। ঘরে অন্ধকার।' সে নিজের মনে বলল। কোথা থেকে দেশলাই বের করে প্রভা একটা কাঠি ধরাল। টেবিলের ড্রয়ার টেনে চিঠিটা হাতে নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অব্যক্ত একটি ধ্বনি বেরুল প্রভার মুখ দিয়ে। তারপরই মনে হল ঘরের মধ্যে সবল কোন এক প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছটফট করছে প্রভা।

তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিল রাজীব। মেঝেতে খুব ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ। প্রভাকে ফেলে দিয়ে লোকটা ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রাজীব ওকে ধরে ফেলল। প্রচণ্ড শক্তিতে লোকটাকে ধরাশায়ী করে উঠে দাঁড়াল।

সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'রাজীবদা, এ তো সুদর্শন চক্রবর্তী নয়। এ যে ভৈরব দত্ত।'

'হ্যাঁ', রাজীব দ্রুত বলে গেল 'ভৈরব দত্তই তরঙ্গকে খুন করেছে। আজ আমরা না থাকলে প্রভাকেও সে গলা টিপে শেষ করত। এবং তারপর নিশ্চয় অন্য কোনো লোকের ব্যবহার করা একটা জিনিস ইচ্ছে করে ফেলে রেখে যেত এখানে। পুলিশ সেই লোকটাকে খুনি বলে সন্দেহ করত। এবং তাকে অ্যারেস্ট করত। যেমন নিখিলেশকে করেছে।...'

মুখে সামান্য একটু জলের ঝাপটা দিতেই প্রভা সুস্থ বোধ করল। উঠে বসল। রাজীব বলল, 'মিস মুখার্জি খুব ভয় পেয়েছেন। লোক পাঠিয়ে কুটির মাকে নিয়ে এস সুব্রত। আজ রাতটা সে এখানে থাকুক।'

ইতিমধ্যে চার-পাঁচজন সেপাই নিয়ে শচীদুলাল এসে হাজির। একটু দূরে সকলের সঙ্গে সে আত্মগোপন করেছিল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলতেই দলবল নিয়ে ছুটে এসেছে।

মেঝের উপর ভৈরব দত্তকে পড়ে থাকতে দেখে শচী বড় বড় চোখ করে বলল, 'কী সাংঘাতিক কাণ্ড স্যর। এই লোকটাই তাহলে খুনি! কেমন ভালো মানুষ সেজে ঘোরাঘুরি করত।'

...কথা হচ্ছিল দিকনগর থানায় বসে। বেলা প্রায় সাড়ে ন'টার মত। ফটফটে নীল আকাশ এখন। মেঘ-টেঘ সব কোথায় নিরুদ্দেশ। ইলিশ রঙের উজ্জ্বল রোদে মাটি, গাছপালা ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে।

সুব্রত বলল, 'রাজীবদা, ভৈরবকে কি আপনি খুনি বলে সন্দেহ করেছিলেন?'

'সন্দেহ নিশ্চয় করেছিলাম। তবে ভৈরবকে একা নয়। শশাঙ্ক থেকে শুরু করে শ্রীমতী সুজাতা পর্যন্ত প্রত্যেককেই সন্দেহ হয়েছে আমার।'

সুব্রত বলল, 'তাহলে অন্য সকলকে বাদ দিয়ে ভৈরবের সম্বন্ধেই আপনার সন্দেহ গাঢ় হল কেন?'

বিশ্লেষণ করবার ভঙ্গিতে ব্যাপারটা বলছিল রাজীব। —'খুনের কেসটা হাতে নিয়ে প্রথমেই একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হল। তরঙ্গের মৃত্যুতে কারো লাভবান হবার কথা নয়। অর্থাৎ তরঙ্গ মারা গেলে কেউ সম্পত্তির বেশি ভাগ পাবে না, কিংবা ইন্সিওরেন্সের টাকাও কারও কপালে জুটবে না। এমন কি যে ওকে খুন করেছে, তরঙ্গের গা থেকে সে একটি গয়নাগাঁটি পর্যন্ত খুলে নেয়নি। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। খুনের মোটিভ অন্য কোনোখানে। কিন্তু সেটা কী, তা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।'

'কিন্তু তরঙ্গের জামার মধ্যে নিখিলেশের ঐ চিঠিটা—!'

রাজীব হেসে ফেলল, 'খুনের ব্যাপারটা বেশ সুন্দর সাজিয়েছিল ভৈরব। তরঙ্গের ঘর থেকে

ঐ চিঠিটা সে সংগ্রহ করে। এমনকী নিখিলেশের একটা রুমাল পর্যন্ত। একটা জিনিস তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সুব্রত। অবশ্য সেই রাতের প্রচণ্ড বর্ষণে চিঠিটা জলে ভিজে বেশ নষ্ট হয়ে যায়। খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে চিঠিটার এক জায়গায় ছোট্ট একটা লেখা যেন তুলে ফেলা হয়েছে। আসলে এটাই হল তারিখ। চিঠিটা বাড়িতে এনে আতসকাচ দিয়ে ভালো করে দেখলাম। আমার সন্দেহ ঠিক। এবং তখনই আমি মনঃস্থির করলাম। খুনি নিখিলেশ নয়, অন্য কেউ।'

সুব্রত এবং অন্য সকলেই খুব মন দিয়ে শুনছিল।

রাজীব বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে তরঙ্গকে যে খুন করেছে সে নিখিলেশকেও ফাঁসাতে চায়। তবে কি তার আক্রোশ ওদের দুজনের ওপরেই? লোকটা তরঙ্গের আর এক প্রণয়ী নাকি? খোঁজ করতে শুরু করলাম। ত্রিভুজ প্রেমের তৃতীয় কৌণিক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তিনি কোনজন? দেখা গেল, তরঙ্গ রীতিমত সুন্দরী। এবং তার স্তাবক আর পূজারীর সংখ্যা এক নয়, একাধিক। শশাঙ্ক, বিশ্বনাথ, ম্যানেজার, ভৈরব এমন কি একজন মহিলাও তার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী। প্রায় সকলেই তরঙ্গের অন্তরঙ্গ। এবং তার অঙ্গুলি হেলনে ওঠা-বসা করতে চায় এমন অভাজন এরা সবাই। দেখলাম, এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী আর শাঁসালো লোকটি হল মিল ম্যানেজার সুদর্শন চক্রবর্তী।'

ইতিমধ্যে চা এসেছে। একটু চা গিলে রাজীব ফের শুরু করল। 'ঘটনাস্থলে আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। একটা প্যান্টের বোতাম সুব্রত। খুব দামী কাপড়ের প্যান্টে এ ধরনের বোতাম লাগানো হয়। আমার মনে হল খুনী নিশ্চয়ই একটা দামী ফুলপ্যান্ট পরে এখানে এসে থাকবে। কিন্তু সে কোনজন?'

বিশ্বনাথের অবস্থা ভালো নয়। তার মাইনের বহর আঁচ করা যায়। ফলে সন্দেহটা তার উপর থেকে সরে এল। শশাঙ্ক খুব সাধারণ। এমন দামী ফুলপ্যান্ট কি সে ব্যবহার করে? বাকি রইল সুজাতা দাস। পুরুষের ছদ্মবেশে সে নিখুঁত। কিন্তু দামী ফুলপ্যান্ট কি তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব? আমার সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল সুদর্শন চক্রবর্তীর উপর। এবং মুখের উপর তাকে সাসপেক্ট বলে প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাইলাম।

কিন্তু এইটুকু বলবার পরই কাজ হল। ভৈরব দত্ত তার কোটর থেকে বেরিয়ে এল। সুদর্শন চক্রবর্তীর অনুগৃহীত সে। পুলিশ ম্যানেজারকে সন্দেহ করুক, এটা সে চায়নি। গায়ে পড়ে ইনফর্মেশন দিতে এল ভৈরব। রাত দশটার পর সুদামডির মোড়ে সে একজন পাঞ্জাবি শিখকে দেখেছে। অন্তরের অভিলাষ, সুদর্শনের উপর থেকে সন্দেহের দৃষ্টি সরিয়ে নিক পুলিশ।

কিন্তু তখনও আমি ভাবছি, অপরাধী কে? সুদর্শন? বিশ্বনাথ? সুজাতা দাস? শশাঙ্ক? না ভৈরব দত্ত? কিন্তু ভৈরব তো ফুলপ্যান্টই পরে না। চকচকে, উজ্জ্বল, দামী, সবুজ বোতামটার সঙ্গে ওর যোগসূত্র কোথায়?' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রাজীব বলতে শুরু করল, 'কি খেয়াল হতে একদিন ভৈরবের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। ভাগ্য প্রসন্ন। ভৈরব বাড়িতে ছিল না। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি জুতো। দত্ত পরিবারের সকলের। হঠাৎ একজোড়া শু-জুতোর উপর নজর পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। জুতোর নিচে ইটের গুঁড়োর দাগ। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে সুব্রত, যেখানে তরঙ্গর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে আগে একটা ইটের পাঁজা ছিল বলে আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম।'

অনেক আগেই রাজীবের নির্দেশমত ভৈরবের বাড়ি থেকে জুতো জোড়া আনা হয়েছিল। শচীদুলাল তাড়াতাড়ি সেটি পরীক্ষা করে দেখল! জুতোর সোলে এবং অন্যান্য দু-এক জায়গায় ইট-গুঁড়ো লেগে আছে।

'কিন্তু খুনের মোটিভটা কী তা তো বললেন না রাজীবদা?

সহাস্যে পকেট থেকে একটি কাগজ বের করল রাজীব। বলল, 'মোটিভ এখানেই পাবে।'

সম্বোধনহীন একখানি চিঠি। গর্জন নামে কোনো এক ব্যক্তি ভয় পেয়ে এই চিঠিখানি লিখেছে। সুব্রত ধীরে ধীরে পড়ল—খবর পেয়েছি উমোবাবু খুব জরুরী কাজে দিকনগরে আসছেন। শুক্রবার শী বাবু এসে তার হাজার টাকা নিয়ে গেছেন। আপনার বাকি দু-হাজার টাকা ঠিক করে রেখেছি, যেদিন মনে হবে নিয়ে যাবেন। বলেন তো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

উমোবাবু কেন আসছেন জানতে পেরেছেন কি? শুনছি, শাদা গুঁড়োর সেই মালটায় এখনও হাত পড়েনি। এদিকে পুরো তিন কুইন্টল মাল কম দিয়েছি। উমোবাবু জানতে পারলে কোমরে দড়ি পড়বে। আপনি, আমি, শীবাবু কেউ বাদ যাবে না।

মনে হচ্ছে উমোবাবুর কানে কোনো শালা চুকলি কাটছে। জুবিলির সময় আপনার কথামত দু'শ বোতল মালের সঙ্গে একশ'টা জলের বোতল মিশিয়ে দিয়েছিলাম। শুনছি সাপ্লাইয়ের খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে। শেষ-মেশ কী হবে ভগবান জানেন।

একটু হুঁশিয়ার থাকুন। উমোবাবু সাংঘাতিক লোক। একবার যখন সন্দেহ হয়েছে তখন আতি-পাঁতি করে দেখবে। জানাজানি হলেই খেল খতম। আপনার চাকরী আর আমার বিজনেস দুই লাটে উঠবে। জল আরো কতদূর গড়াবে কে জানে।

দশদিন বাদে দেখা করব—

গর্জন

সুব্রত বলল, 'এর মানে কী রাজীবদা? উমোবাবু আর শীবাবু কে এরা?'

গম্ভীর মুখে রাজীব বলল, 'এই চিঠিখানা তরঙ্গ পেয়েছিল। সম্ভবত ওর মেয়েলি কৌতূহলের জন্য কোনো গোপন স্থানে ও সেটা আবিষ্কার করে। চিঠিটা ভৈরবকেই লেখা। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটা হল ওরই মৃত্যুবাণ।'

টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের নতুন প্যাকেটটা ছিঁড়ে রাজীব ধূমপান শুরু করল। খানিকটা ধোঁয়া নাক-মুখ দিয়ে বের করে রাজীব বলল, 'শীবাবু লোকটা কে জানো সুব্রত? পারচেজ সেকশনের শিবনাথ, ভৈরবের আশ্রিত লোক। ওর কাজ হল সাপ্লায়ারদের বিল পাস করা।' একটু থামল রাজীব। বলল, আমি জানতে পেরেছি মিলের সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে মোটা টাকা পেত ভৈরব। ক'মাস আগেই পেপার মিলের জুবিলি উৎসব হল। তখন মদের বোতলের সঙ্গে জলের বোতলের সাপ্লাই যোগসাজশে চালিয়ে দিয়েছে ও। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আর খবরটা পৌঁছেছে উমোবাবুর কানে।'

'কিন্তু উমোবাবুটি কে রাজীবদা।'

'দিকনগর পেপার মিলের অন্যতম ডিরেক্টর উমেশপ্রসাদজী। তরঙ্গকে উনি স্নেহ করতেন। গত মঙ্গলবারে এই ব্যাপারে তদন্ত করতেই এসেছিলেন ভদ্রলোক'—রাজীব সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে শুরু করল,—'খুব বোকামি করেছিল তরঙ্গ। এমন একটা সাংঘাতিক চিঠি পেয়ে ভীষণ কলরব শুরু করে। পেপারমিলের চুরির ঘটনা সে জানে। ইচ্ছে করলে সব ফাঁস করে দিতে পারে। কথাটা কানে গেল ভৈরবের। তরঙ্গ উমেশপ্রসাদজীর লোক। ওকে আগেই সন্দেহ করেছিল ভৈরব। চিঠিটা খোয়া যাবার পর সে মরিয়া হয়ে উঠল। তার মনে হল চিঠিটা তরঙ্গই গোপনে সংগ্রহ করেছে। এবং সুযোগ পেলেই উমেশপ্রসাদজীর হাতে সে ওটা তুলে দিতে পারে। সুতরাং তরঙ্গমালাকে শেষ করতে ভৈরব দত্ত কৃতসঙ্কল্প হল।' সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে রাজীব বলল, 'ভৈরব লোকটা কিন্তু একেবারে পশু। মেয়েটার গলা টিপে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি। এমন কি ওর নারীদেহ উপভোগ করতে চেয়েছিল ভৈরব। সম্ভবত বোতামটা তখনই—।

'কিন্তু ম্যানেজারসাহেবের প্যান্টটা ও কখন পরল স্যর?'

'বীরেন শ'র দোকানে। কর্মচারী লোকটা দেখেছিল ভৈরবকে,—ফুলপ্যান্ট শার্ট ইত্যাদি পরে সাহেব সাজছে। ও ভেবেছিল নেশার ঝোঁকে ভৈরববাবু খোদ ম্যানেজার সাজতে চাইছেন।'

শশাংক এসেছিল রাজীবের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের মধ্যে অতগুলি লোক দেখে সে কেমন বোকার মত হাসল।

রাজীব প্রশ্ন করল, 'নিখিলেশবাবু আসেননি?'

'এল না স্যর। কালই ঝরিয়া চলে যাবে। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।'

রাজীব মুখ নিচু করে বলল, 'হুঁ। আপনাকে কিন্তু আমি প্রথমে খুনি বলে সন্দেহ করেছিলাম শশাংকবাবু। ডেড্-বডি দেখতে আপনি যাননি, এটা কিন্তু ভাল কথা নয়।' একটু হেসে রাজীব ফের যোগ করল,—'শশাংকবাবু খুব দুর্বলপ্রকৃতির লোক সুব্রত। অ্যাকসিডেন্ট শুনলেই ভড়কে যান। ওদের কোলিয়ারির পিটে ক'দিন আগে অ্যাকসিডেন্ট হল। তা উনি ডেড্-বডি দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, সারা দিন ডুব দিয়ে মথুরাপুরে এসে বসে রইলেন।'

মথুরাপুর ফেরার জন্য জিপে উঠতে যাচ্ছিল রাজীব। সুব্রত বলল, 'ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা করবেন না রাজীবদা?'

'না।' রাজীব শক্ত হয়ে দাঁড়াল। একটু পরে বলল, 'ম্যানেজার আমার কাছে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল সুব্রত। ঘটনার দিন রাত্রে সে এগারোটার সময় দিকনগরে ফেরে নি। ফিরেছিল রাত দুটোর পর।'

'কী করে জানলেন?'

'ওর ড্রাইভার ইয়াসিন মিঞা আমাকে সব বলেছে। কর্তাকে ঘরে না পেয়ে গিন্নি খুব অপমানিত বোধ করেন। এবং তখনই তিনি ফিরে যান স্টেশনে। রাত এগারোটার ডাউন ট্রেন ধরে সোজা কলকাতা। দশ টাকা বকশিস পেয়েছিল ইয়াসিন। মেমসাহেবকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সে গিয়েছিল আলোকপুরে—সুদর্শনকে খবরটা দিতে। প্রণয়িনীর ঘরে বসে ম্যানেজার তখন মদ গিলছিল। ইয়াসিন খবর দিতে এসেছিল বলে তাকে মারতে বাকি রাখে।' ম্লান হেসে রাজীব বলল, 'ইয়াসিন আমাকে কী বলল জানো সুব্রত? কি তাজ্জব বাত দেখুন ইন্সপেক্টর-সাব, বিবি গোঁসা করে চলে গেল তো সাহেবের এতটুকু দুখ নাই।'...

গাড়ি ফিরছিল মথুরাপুরের দিকে। ড্রাইভারের পাশে রাজীব। পিছনের সীটে শচীদুলাল আর সুব্রত। সেও মথুরাপুর যাচ্ছে। এস-ডি-পি-ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে বলে।

দু'পাশে ঘরবাড়ি। দিকনগরের মানুষজন। বাজারে কর্মব্যস্ত লোকের গুঞ্জন। আর একটু পরেই বাসস্ট্যান্ডটা পড়বে।

হঠাৎ সুব্রত বলল, 'কিন্তু রাজীবদা, আপনি আর দুটো চিঠির রহস্য এখনও ফাঁস করেননি।'

'আবার কোন্ চিঠি?'

'কেন তরঙ্গের মা যে চিঠি পেয়েছিলেন। নিখিলেশের সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা ছিল ওতে।'

রাজীব হেসে বলল, 'ওটা বোধহয় প্রভার কীর্তি। তুমি ওকে পরে জিজ্ঞেস কোরো। নিশ্চয় স্বীকার করবে।'

'আর হাজব্যান্ডের লেখা চিঠিখানা? হাজব্যান্ডটি কে রাজীবদা?'

রাজীব মুচকি হাসল। মথুরাপুরগামী একটা বাসে পরিচিত একটি রমণীমূর্তি চোখে পড়ল। আর একটু পরেই বাসটা ছাড়বে।

মেয়েটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে রাজীব বলল, 'ওকে চেন সুব্রত?'

'চিনি বৈকি রাজীবদা। ওই তো টেলিফোন অপারেটর সুজাতা দাস।'

হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে ও। হাজব্যান্ড বলে সই-করা চিঠিটা ওরই লেখা। আংটিটাও ওরই প্রেজেন্টেশন।'

'বলেন কি রাজীবদা? সুজাতাই হাজব্যান্ড?' সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করল।

'হ্যাঁ, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে সই পাতায়, বকুলফুল পাতায়, আরো কত কি। সুজাতা বর-বউ সম্পর্ক পাতিয়েছিল তরঙ্গের সঙ্গে। মেয়েটা আসলে একটা ট্রাইবেড্। একটু হেসে বাসের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল রাজীব, 'পুওর লেসবিয়ান।'

সুজাতা ওদের দেখেনি। সে তাকিয়েছিল শূন্যে আকাশের দিকে। শরতের রৌদ্রস্নাত নীল আকাশ। রাজীব জানে সুজাতার দৃষ্টিটাই এমনি। আকাশের অনেক নীচে মাটির পৃথিবী। ঘর-বাড়ি, সবুজ ধানক্ষেত, মেয়ে-পুরুষের হাসিখুশি, পরিহাস উত্তাপ,—সব এখানেই।

আকাশের দিকে চাইলে শুধু শূন্যতা,—পূর্ণতা নেই।



অথৈ জলে মানিক

ছেলে চুরি নতুন ঘটনা নয়,
আকছার হয়। কিন্তু বাচ্চাটা যদি
সদ্যোজাত কিম্বা একদিনের
তাহলে তদন্তে নেমে গোয়েন্দা
গলদঘর্ম। কারণ তার গলায় শুধু
একটা নম্বর। সেটি সরালেই সে
কার সন্তান বোঝা কঠিন। তবু
জননীকে সেই বাচ্চা ফিরিয়ে দিল
রাজীব সান্যাল।
সওয়াল আর মেডিক্যাল
সায়েন্সের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে।
হ্যাঁ, অথৈ জল থেকে মানিক
আবার মায়ের কোলে।



চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে রাজীব সান্যাল খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখল। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে দেশের এবং বিদেশের নানা চাঞ্চল্যকর সংবাদ। কোথায় সিনাই মরু অঞ্চলে ইজরায়েলি সৈন্যের অতর্কিত গোলাবর্ষণ এবং মিশরীয়দের পাল্টা জবাব। উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা দাবি। কোহিমার নিকট সহস্রাধিক আত্মগোপনকারী নাগার জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ। আসানসোলের কাছে একটি কোলিয়ারির ছাদ ধসে কয়েকজন খনি শ্রমিক ভূগর্ভে পাঁচ দিনেরও বেশি আটক থাকার পর আবার উদ্ধার পেয়েছেন। এখন তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ।...

প্রথম পাতার আরো অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক সংবাদের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল রাজীব। কোনো খবরই তার দৃষ্টিকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারল না। রাজীব অন্য পাতায় মনোযোগ দেওয়ার আগে আবার চায়ের কাপে ঠোঁট রাখল।

সময়টা কার্তিকের শেষ। দিনের বেলায় তেমন ঠাণ্ডা না মনে হলেও রাতে বেশ হিম। শেষ রাতে রীতিমত শীত করে। পায়ের কাছে গুটিয়ে রাখা একটা পাতলা লেপ কিংবা মোটা চাদর অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে নিতে হয়। ভোরের দিকে সর্বাঙ্গে লেপ কিংবা চাদরের আচ্ছাদন ব্যতীত ঘুমটুকু মাটি। কিন্তু কার্তিকের আর ক'দিন? হপ্তা শেষ হবার পরই কার্তিক মাসও কাবার। আর অঘ্রাণের শুরুতেই শীত পড়বে। উত্তুরে বাতাস জোরে বইবে। সকালবেলায় এমনি জামা গায়ে ঘুর-ঘুর করতে হবে না। জামার নীচে একটা গরম সোয়েটার কিংবা চাদর জড়িয়ে নেওয়া চাই। নইলে শীতের বাতাসে হি-হি করে কেঁপে মরতে হবে।

মাস তিন চার হল চন্দনপুরে বদলি হয়ে এসেছে রাজীব। জায়গাটা মহকুমা শহর। কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি বলে আয়তনে আর জনসংখ্যায় অনেক জেলা শহরকেও হার মানায়। এখান থেকে কলকাতায় যাওয়ার হাঙ্গামাও কম। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনে বড়জোর সওয়া ঘন্টা। আবার তেমনি জুৎসই গাড়ি পেলে যাত্রাপথ পৌনে এক ঘন্টার মধ্যেই হুস করে ফুরিয়ে আসে।

এই ক'মাস তেমন বড় কোনো কেসের কিনারা করে উঠতে পারেনি রাজীব। শ্রাবণের প্রথম দিকে সে এল চন্দনপুরে। আকাশে তখন কালো মেঘের জমাট আসর। এখন-তখন বৃষ্টি। হু-হু পুবে হাওয়া, মেঘের গুরু গুরু ডাক আর আকাশের বুক চিরে নাগিনীর দ্রুতগতির মত আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের ঝিলিক। মাঠে মাঠে রোয়া-পোঁতার মরসুম। কোথাও পুরোদমে কাজ—আবার কোথাও বা আগেই তা শেষ। বর্ষার জলহাওয়া পেয়ে আগাছার বন-জঙ্গল হঠাৎ প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

কার্তিকের শুরু থেকেই রাজীব উঠেপড়ে লেগেছে। হাতে বেশ কিছু কাজ। গোটা তিনেক ডাকাতি কেস, দুটো খুনের আসামীর অনুসন্ধান এবং খুচরো এটা-সেটার খোঁজ-খবর করতে রাজীবকে রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে। এদিকে জেলা শহর থেকে খোদ বড়কর্তা পত্রাঘাত শুরু করেছেন। অমুক কেসটার তদন্ত শেষ করতে এত গড়িমসি কেন? ডাকাতি কেসে গোটা গ্যাংটার হদিশ বের করতে এত দেরি কেন হচ্ছে সি, আই, ডি ইন্সপেক্টরের? দেখা হলেই মহকুমা পুলিশ সাহেবের ব্যস্ত ছটফটে দৃষ্টি। সব সময় মুখে যেন প্রশ্ন আঁকা—কেসগুলোর কতদূর? মোকাবিলা হতে কত দেরি?

খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে রাজীব কোণের ঘরটার দিকে তাকাল। সর্বাঙ্গে মোটা চাদর জড়িয়ে সুব্রত এখনও ঘুমে অচেতন। গতকাল সন্ধ্যেয় চন্দনপুরে এসেছে সুব্রত। কলকাতায় কি কাজ ছিল ওর। ফেরার পথে চন্দনপুরে নেমে রাজীবের সঙ্গে মোলাকাত করে যাবার লোভ সামলাতে পারেনি। রাজীবকে অবশ্য সন্ধের পরেই বেরোতে হয়েছিল। এখান থেকে মাইল চারেক দূরে,—মদনপুরে। মাস দুই আগে এ অঞ্চলে একটা বড় ডাকাতি হয়ে গেছে। তদন্তের ব্যাপারে প্রায়ই মদনপুরে ছুটতে হয় রাজীবকে। ওখানে দুজন ভাল ইনফর্মার আছে তার। তদন্তের কাজে ওদের সহযোগিতা অপরিহার্য। ...খবরের কাগজে মুখ রেখেই রাজীব ডাকল,—'সুব্রত, এবার শয্যাত্যাগ করে ফেলো। ঘড়িতে প্রায় সাতটা হল যে, পুলিশ অফিসারের এত ঘুম ভাল নয়।'

রাজীব চেয়ে দেখল, সুব্রত একটু নড়েছে। এপাশে ফিরল, আবার উল্টো দিকে গড়াল। মিনিট দু-তিনের মধ্যেই বিছানা থেকে নামল সুব্রত। হাই তুলল, হাত দুটো টান করে আড়ামোড়া ভাঙল। খাটের তলা থেকে চটি দুটো বের করে পায়ে গলিয়ে নিল। আঙুলের সাহায্যে চোখের কোণের পিচুটি সরিয়ে রাজীবের দিকে তাকাল সুব্রত। সহাস্যে বলল—'মনোযোগ দিয়ে কাগজে কী অত পড়ছেন রাজীবদা?'

মুখ না তুলেই রাজীব জবাব দিল,—'এতক্ষণ বিজ্ঞাপন পড়ছিলাম হে। এবার ব্যক্তিগত সংবাদগুলো দেখছি।'

—'কী বললেন?' সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করল। 'ব্যক্তিগত সংবাদ? ওর আবার কী পড়বেন?'

কাগজ থেকে মুখ তুলে রাজীব তাকাল! 'বল কী সুব্রত? ব্যক্তিগত সংবাদই তো আসল খবর। এতেই তো রসের স্বাদ। এই দেখ, আজ প্রথমেই আছে শ্রীমতী এবং রঞ্জনের সংবাদ। সাত বছর আগে এই দিনটিতে ওদের শুভদৃষ্টি হয়, এবং ওরা আজও খুব গভীরভাবে দিনটিকে স্মরণ করছে। কি জমাট প্রেম বলো দিকি!'

সুব্রত কৌতুক বোধ করছিল। বলল,—'তারপর?'

—'দ্বিতীয় সংবাদ মুকুন্দবিহারী দত্তের। ভদ্রলোক কলকাতার পার্কসার্কাসগামী একটি ট্রামে ভুল করে তার ফোলিও ব্যাগটি ফেলে এসেছেন। ব্যাগে তাঁর ইন্সিওরেন্স পলিসি, অফিসের কাগজপত্তর একগোছা চাবি এবং কিছু টাকা আছে। যদি কোনো সহৃদয় ভদ্রলোক—'

সুব্রত ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলল,—'ভুলোমানুষ হলে অমন ব্যাগ-ট্যাগ খোয়াতে হয়। তার জন্য আবার ফলাও করে বিজ্ঞাপন কীসের?'

রাজীব ঈষৎ হাসল। বলল,—'আহা! রাগ করছ কেন সুব্রত? শোনোই না। পরেরটা নিশ্চয় তোমার পছন্দ হবে—।'

জামার বোতামগুলো ঠিক করে লাগাচ্ছিল সুব্রত। মুখ না তুলেই সে জবাব দিল—'পড়ুন তাই, আবার কি ব্যক্তিগত সংবাদ আছে দেখি—'

রাজীব পড়ল, —'সীমা, এক বছর আগে এই দিনটিতে তোমার সঙ্গে ঔরঙ্গাবাদে আমার দেখা হয়। আজও ভাবি বিবি-কা-মকবারার সামনে সেদিন কেন তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ইতি—পথিক।'

সুব্রত হো-হো করে হাসল। বলল—'রাজীবদা লোকটা কী নাম দিয়েছে যেন? পথিক, তাই না?' একটু হেসে সে নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করল, —'হায় পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ।'

কাগজ সরিয়ে রেখে রাজীব কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বৈঠকখানা ঘরে টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। সুব্রত ও রাজীব দুজনেই অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সাতসকালে হঠাৎ টেলিফোন কীসের? এই তো সবে সাতটা বাজল। এত সকালে সাধারণত টেলিফোনে সরব ঝংকার ওঠে না।

সুব্রত বলল, —'যান রাজীবদা। দেখুন, আবার কী দুঃসংবাদ এল সকালবেলায়।'

ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে রাজীব খুশি হল। বলল—'দুঃসংবাদ তো বটেই। পুলিশের কাছে আবার শুভ-সংবাদ জানাতে কে আসবে?'

একটু হেসে রাজীব বলল, —'মুখ-টুখ ধুয়ে চা খেয়ে নাও সুব্রত। ঘন্টা-খানেকের মধ্যেই আমি বেরুব। চন্দনপুরে যদি এক চক্কর ঘুরে আসতে চাও তাহলে কিন্তু এই মওকা।'

টেলিফোন তুলে রাজীব বলল,—'হ্যালো! আমি রাজীব সান্যাল বলছি।'

অপরপ্রান্ত থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল,—'কে, মিঃ সান্যাল? আমি এস. ডি. পি. ও বটব্যাল।'

—'বলুন স্যর।' রাজীব চাঞ্চল্য প্রকাশ না করেই জবাব দিল—! 'এইমাত্র একজন ভদ্রলোককে আপনার কাছে পাঠালাম। খুব ইন্টারেস্টিং আর পিকিউলিয়ার কেস এসেছে একটা। গতকাল সমস্ত রাত চেষ্টা করেও থানার পুলিশ কোনো সুরাহা করতে পারেনি। খুব আপসেট আর নার্ভাস হয়ে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করেছেন সকালে। কেসটা আমি আপনার উপরেই চাপালাম। অ্যান্ড আই উইশ ইউ অ্যান আর্লি সাক্সেস।'

রাজীবের মুখ চোখ ধীরে ধীরে চিন্তাচ্ছন্ন হল। টেলিফোন ধরেই সে বলল,—'কেসটা কী স্যর? একটু আভাস পেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে সুবিধে হত।'

অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মিঃ বটব্যাল বলছিলেন, –'ব্যাপারটা খুবই আনফরচুনেট্ ইন্সপেক্টর। আবার তেমনি ইন্টারেস্টিং আর পিকিউলিয়ার কেস। এমন অদ্ভুত ঘটনা আমি আগে কখনও শুনিনি। এখনও তো ভেবে পাচ্ছি না এর পিছনে কী মতলব থাকতে পারে।'

টেলিফোনে কান পেতে শুনল রাজীব। মিঃ বটব্যাল আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বলে গেলেন। রাজীব শুনছিল, মাঝে মাঝে তার কপালে চিন্তার কুঞ্চিত রেখা দেখা দিয়ে আবার তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। কাহিনি শেষ করে মিঃ বটব্যাল যোগ করলেন,—'আমি অবশ্য খুব ছোট করে বললাম। অমিয়বাবু মানে এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে আপনি বিস্তারিত সংবাদ শুনবেন। দেখুন, —যদি ওকে সত্যিকার সাহায্য আমরা করতে পারি। আমি তো শুনলাম ভদ্রলোকের স্ত্রী প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছেন।'

রাজীব বলল,—'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব স্যর। কিন্তু আমাদের লাইনে সাক্সেস অনেকটা ম্যাটার অফ চান্স। ঠিকমত যোগাযোগ না হলে কিছুই হবার নয়। আর কেসটা তো অদ্ভুত। রীতিমত ইনটারেস্টিং এবং আনইউজুয়্যাল।'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে রাজীব শোবার ঘরে এল। শান্তমনে যে মানুষটা এতক্ষণ কাগজ পড়ে ঠাট্টাতরল পরিহাস করছিল, টেলিফোন পাবার পর থেকেই সে বদলে গেছে। সত্যি, এই মুহূর্তে রাজীব অন্য মানুষ। সে অনুভব করল তার মনের আকাশটা চিন্তার মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছু ভাবছিল রাজীব। এখুনি কাজ শুরু করা দরকার। নইলে হয়তো অমিয়বাবুকে কোনো সাহায্যই করা যাবে না। আর বেচারী মিসেস! তাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোনো ভাষাই খুঁজে পাবে না কেউ।

রাজীব তাকিয়ে দেখল বাথরুমের দরজা বন্ধ। অর্থাৎ সুব্রত ভিতরে। ওর বেরোতে অন্তত আরো পনেরো মিনিট দেরি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই অমিয়বাবু এসে পৌঁছবেন। এবং কয়েকটি দরকারি কথা রাজীব সেরে ফেলতে পারবে।

দরজায় ধীরে ধীরে টোকা পড়ল। রাজীব অনুমান করল অমিয়বাবু এসে দাঁড়িয়েছেন বাইরে। ভৃত্যকে নির্দেশ দিল সে, ভদ্রলোককে বাইরের ঘরে বসাতে।

দু-এক মিনিটের মধ্যে বেশবাস পাল্টে নিল রাজীব। টুকিটাকি কথাবার্তা সেরে অমিয়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া দরকার! প্রাথমিক তদন্তের সময় ভদ্রলোকের সাহায্য খুব বেশি প্রয়োজন।

শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। শোকার্ত রমণীর কাছে স্বামীকে রাখলে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

নমস্কার করে রাজীব বলল,—'আপনিই অমিয়বাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভদ্রলোক খুব ধীরে ধীরে বললেন।

—'মিঃ বটব্যাল আমাকে কেসটা বলেছেন। আপনাকে আর আদ্যোপান্ত বলতে হবে না।' একটু থেমে রাজীব বলল,—'এখনই আমাদের কাজ শুরু করা দরকার।'

ভদ্রলোক শুকনো মুখে চেয়ে রইলেন।

রাজীব একনজরে দেখল ওঁকে। বয়স বেশি হবে না। বড়জোর ত্রিশ, বত্রিশ। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পরনে মিহি ধুতি, ডান হাতের অনামিকায় বেশ বড় সাইজের সুদৃশ্য পাথর বসানো আংটি। ঝড়ে বিপর্যস্ত ধানক্ষেতের মত চুলগুলি এলোমেলো। চোখ প্রায় লাল। সম্ভবত গতকাল সমস্ত রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি ভদ্রলোক। দৃষ্টি তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত ভীত এবং উদ্‌ভ্রান্ত।

রাজীব বলল,—'একেবারে ভেঙে পড়েছেন দেখছি। একটু ধৈর্য ধরুন। এখনও তো সব আশা মিলিয়ে যায়নি।'

অমিয় দত্ত ম্লান হাসলেন। —'আমাকে তো তবু ভাল দেখছেন। আমার স্ত্রী অবস্থা দেখলে আপনার করুণা হত। এই শকেই না শেষ হয়ে যায় বেচারা—'

রাজীব বলল,—'বটব্যাল সাহেবকে আমি কথা দিয়েছি অমিয়বাবু। আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। দেখি, যদি ঈশ্বর সহায় হন—'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজীব। অমিয়বাবুকে উদ্দেশ করে বলল,—'চলুন আপনি। কথাবার্তা সব তোলা রইল এখন। প্রথমেই আমাদের হাসপাতালে যেতে হবে। আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবেন।'

পিছনে তাকিয়ে রাজীব দেখল, সুব্রত কখন এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। স্নান-টান সেরে জামা কাপড় বদলে সে তৈরি। এতক্ষণ তাদের কথাই সম্ভবত শুনছিল।

রাজীব বলল,—'একটা কেস হাতে এসেছে সুব্রত। এখনই তদন্ত শুরু করা দরকার। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—'যেতে পারি।' সুব্রত ঘাড় নেড়ে জানাল। 'কিন্তু কেসটা কী রাজীবদা? কেউ খুন-টুন হয়েছে নাকি?'

'খুন-ডাকাতি নয় সুব্রত। একটা চুরির কেস,' —রাজীব কথা শেষ করে ওর চোখের দিকে তাকাল।

চুরির কথা শুনে যেন মিইয়ে গেছে সুব্রত। সাদামাটা চুরির কেসের তদন্তে যেতে ওর পা উঠছে না। রাজীব তা বুঝতে পারল।

হেসে বলল সে, —'কী চুরি গেছে জানো?'

সুব্রত ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করল। বলল,—'গয়নাগাটি কিংবা টাকা পয়সা, তাই না রাজীবদা?'

—'তার চেয়েও অনেক দামী জিনিস সুব্রত।'

—'বলেন কি, আরো দামী? তাহলে কি হিরে জহরত?'

রাজীব বলল, —'সাত রাজার ধন মানিক চুরি গেছে সুব্রত। এখন সেই হারানিধিকে খুঁজে পাওয়া চাই।'

কিছু বুঝতে না পেরে সুব্রত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। পরিষ্কার করে বলল রাজীব, —'কাল

রাত আটটার সময় এই ভদ্রলোকের ছেলে চুরি হয়েছে সুব্রত।'

—'ছেলে চুরি?' সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, —'ভালো করে খোঁজ খবর নিয়েছেন নিশ্চয়, রাগ করে কোথাও চলে-টলে যায়নি তো?'

রাজীব এবার আরো প্রাঞ্জল হল। বলল,—'চলে যাবে কী করে? ছেলেটির তখন কত বয়স জানো সুব্রত?'

বিমূঢ় সুব্রতের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলল,—'মাত্র একদিন।'

দুই

দূর থেকেই চিনতে পারল রাজীব। শ্রীমতী অমলা দত্তের বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না। মুখটা দেখলে আরো কম মনে হতে পারে। সামনের দাঁত দুটি ঈষৎ উঁচু...মরালীর মত লম্বা গ্রীবা। ঘন কৃষ্ণ এক মাথা চুল। বিরাট একটা মৌচাকের সাইজের মত খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে হেলে পড়েছে। চোখ নাক সব মিলিয়ে ওকে সুশ্রী কেন সুন্দরীই বলা চলে।

বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিল অমলা। ফোলা ফোলা চোখ, সম্ভবত সমস্ত রাত ধরে কেঁদেছে সে। দু চোখের পাতা নিশ্চয় এক করতে পারেনি। ফলে চোখ দুটি বেশ লাল দেখাচ্ছে।

খুব বিষণ্ণ আর স্তিমিত দেখাচ্ছিল অমলাকে। রোদে ঝিমিয়ে পড়া ফুল গাছের মত। গভীর রাতে ঘুমন্ত মানুষের যথাসর্বস্ব যদি চোর নিয়ে চম্পট দেয় তাহলে ভোর সকালে সেই মানুষটার কপাল চাপড়ে হায় হায় করা ভিন্ন উপায় থাকে না। কিন্তু অমলার মুখে বাক্য নেই। গভীর শোকে রাতারাতি জ্যান্ত মানুষটা যেন পাথর হতে বসেছে।

স্বামীর সঙ্গে রাজীবকে এগিয়ে আসতে দেখে অমলা নড়ে চড়ে মুখ তুলে তাকাল। রাজীব ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসল। ছোট্ট একটা সংবাদ পাবার জন্য কেমন তৃষিত চাতকের মত ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়েছে অমলা। রাজীব অকস্মাৎ দুঃখ বোধ করল। অমলার জন্য সত্যিকার কষ্ট অনুভব করল ও।

স্ত্রীর চঞ্চল মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয় দত্ত খুব ধীরে ধীরে বললেন—ইনি সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। তদন্তের ভার এখন এঁরই উপর অমলা। তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন বলে উনি এসেছেন।

মুহূর্তে অমলার উজ্জ্বল চোখ দুটো কেমন নিরুত্তাপ আর স্থির দেখাল। হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া পেয়ে যেন মিইয়ে গেছে অমলা। প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি ওর। বেচারী! ভেবেছিল অপহৃত সন্তানকে খুঁজে বার করতে পেরেছে পুলিশ। আর সেই সংবাদটুকু শুনবার জন্য অসীম আগ্রহে অমলা তাকিয়েছিল ওদের দিকে।

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে রাজীব বলল—'আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি মিসেস দত্ত। আমার স্থির বিশ্বাস আপনাদের ছেলে বেশ সুস্থ এবং ভালোভাবেই আছে। এবং আমার ধারণা যে ওকে আপনি আবার কোলে ফিরে পাবেন।'

আশা নিঃসন্দেহে ছলনাময়ী। ফ্যাকাশে পাণ্ডুর মুখেও সে রক্তোচ্ছ্বাস আনে। রাজীব অপাঙ্গে চেয়ে দেখল তার কথায় কাজ হয়েছে। অমলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসল। মনে মনে নিজেকে তৈরি করল রাজীব। তাসের খেলায় এবার লিড দেবার পালা। ঠিকমত লিড দিতে না পারলে ডাউন অবশ্যম্ভাবী।

হাসপাতালের এই অংশটা পেয়িং ওয়ার্ড। কী যেন একটা নামও আছে এর। রাজীব লক্ষ্য

করল সাকুল্যে বারোটা বেড রয়েছে ঘরে। দশটা বেডে পেশেন্ট রয়েছে। অন্য দুটি খালি। তবে, হাসপাতালের ব্যাপার। এই মুহূর্তে খালি আছে, খানিক পরেই হয়ত পেশেন্ট এসে সেগুলি দখল করে বসবে।

একটা ওয়ার্ডবয় এসে তিনটে চেয়ার পেতে দিয়ে গেল বেডের কাছে। রাজীব বসল মাঝখানের চেয়ারটায়। একপাশে অমিয়বাবু, অন্য দিকটায় সুব্রত।

নির্দেশমত কলম খুলে সুব্রত তৈরি। অর্থাৎ অমলার জবানবন্দিটা সেই লিখবে। রাজীব প্রশ্ন করবে এবং সুব্রত তার মুখ থেকে শোনা কথাগুলির দরকারি অংশ নোট করে যাবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে রাজীব একবার চারপাশটা দেখে নিল। অন্যান্য বেডের রোগিণীরা মাঝে মাঝেই এদিকে তাকাচ্ছে। কিছু শোনার জন্য সকলেই উৎকর্ণ। জলজ্যান্ত একটি সদ্যোজাত শিশু হাসপাতাল থেকে চুরি হয়ে গেল এমন একটা ঘটনা শুনে সব জননীরই বুকের রক্ত হিম হবার জোগাড়। মনে মনে সবাই এখন সন্ত্রস্ত।

তবু উপায় নেই। জিজ্ঞাসাবাদ এরই মধ্যে সারতে হবে। কারণ শ্রীমতী দত্ত এখনও বেশ দুর্বল। বিছানা ছেড়ে ওঠানামা নিষেধ। দৈহিক ক্লেশ যা হবার তা হয়েছে। তার উপর আবার এই মানসিক আঘাত। অনুমতি দেবার সময় হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট কথাটা বারবার বলে দিয়েছেন। ভদ্রমহিলার প্রেসার একশ বাই সত্তর। হার্টের অবস্থা দুর্বল। সুতরাং সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর যেন একটু বুঝে-সুঝে প্রশ্ন করেন।

একটু হেসে রাজীব শুরু করল, —'আপনি হাসপাতালে কবে এলেন মিসেস দত্ত?'

—'পরশুদিন সকালে।' অমলা উত্তাপহীন কণ্ঠে উত্তর দিল।

—'আসার পর কোন ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন আপনাকে।'

—'ডাক্তার দাস। ওঁর চেম্বারেই আমি মাঝে মাঝে চেকআপের জন্য যেতাম।'

—'এখানে সকলের সঙ্গেই নিশ্চয় বেশ আলাপ-সালাপ হয়ে গেছে আপনার?'

—'সকলের সঙ্গে ঠিক হয়নি'। অমলার কণ্ঠস্বর কেমন নির্জীব মনে হল। একটু পরে খুব ঠাণ্ডা, অনুত্তেজিত গলায় সে বলল—'কয়েকজনের সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে। তবে পাশের বেডের এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটু বেশি পরিচয় আমার।'

—'খুব স্বাভাবিক।' কথাটা বলে রাজীব সমস্ত ঘরটা পর্যবেক্ষণ করল।

অমলা দত্তের বেডটা ঘরের এককোণে। সামনেই দরজা, পাশের বেডটা হাত তিন-চার দূরে। রাজীব চেয়ে দেখল বছর ত্রিশ বয়সের এক মহিলা আধশোয়া ভঙ্গিতে একটা পত্রিকার পাতা উল্টে চলেছেন। দেখতে তেমন সুশ্রী নয় মেয়েটি। লম্বাটে মুখ, কপালটা বেশ একটু উঁচু। গায়ের রং ফর্সা। কিন্তু অক্ষিগোলক দুটি কালো নয়, কটা বলে মনে হল রাজীবের।

গলা নামিয়ে রাজীব বলল—'এখানে সবাই কি ডেলিভারি পেশেন্ট? পাশের বেডের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যোগ করল, —'উনিও কি—'

মুখে আঙুল ঠেকিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল অমলা। একটু এগিয়ে বসবার চেষ্টা করল। খুব নিচু গলায় সে বলল, —'রুমাদির বাচ্চাকাচ্চা নেই। অথচ এই নিয়ে চারবার হাসপাতালে এলেন।'

—'সে কী!' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করে অমিয় দত্তের দিকে তাকাল।

অবস্থাটা অনুমান করে অমিয় দত্ত রাজীবের দিকে ঝুঁকে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন—'বাইরে চলুন। এর কিছুটা আমার জানা। খুব স্যাড কেস। শুনলে হয়তো আপনারও দুঃখ হবে।'

রাজীব দেখল, অমলা কিছুটা সহজ হয়েছে। এখন অনায়াসে আসল বক্তব্যে যাওয়া চলে। রাজীবের ইচ্ছে করছিল একটা সিগারেট ধরায়। কিন্তু হাসপাতালে বিশেষ করে মেয়েদের ওয়ার্ডে

ধূমপান নিশ্চয়ই অনুচিত। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই ভেবে সে নিশ্চিন্ত হল।

—'আচ্ছা মিসেস দত্ত, ডেলিভারির পর প্রথম কখন আপনার জ্ঞান হল?' রাজীব চোখ তুলে তাকাল।

—'অনেক রাতে। কত রাত্তির বলতে পারব না। তবে রাত দেড়টা দুটোর মত হতে পারে। জ্ঞান হতেই নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল আমার।'

উৎসাহ দিয়ে রাজীব বলল, —'বলে যান মিসেস দত্ত।'

—'আমি খুব ক্ষীণকণ্ঠে নার্সকে ডাকবার চেষ্টা করলাম। তখন ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছিল আমার। কিন্তু কোথায় নার্স? কিংবা হয়তো চেয়ারে বসে ও ঢুলছিল। আমার চিঁ চিঁ ডাক ওর কানে পৌঁছয়নি।'

একটু থেমে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল অমলা। বলল—'মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় করছিল আমার। মনে হল এখনই হয়তো মরে যাব। বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল, অনেকক্ষণ কাউকে না কাছে আসতে দেখে আবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।'

—'তারপর?' রাজীব সহাস্যে তাকাল।

—'খুব সকালে নার্স এসে এক গ্লাস দুধ খেতে দিল আমাকে। হেসে বলল শুভ-সংবাদ এনেছি। কী খাওয়াবেন বলুন? আমি খুব ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছে? ছেলে না মেয়ে? চোখ নাচিয়ে নার্স বলল, ফুটফুটে ছেলে হয়েছে আপনার। সাড়ে সাত পাউন্ডের বেশি। তাই'ত এত জখম হয়েছেন।' কথা শেষ করেই কেমন আনমনা হয়ে গেল অমলা। গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি রাজীব বলল, —'আচ্ছা, ওই নার্সটির নাম কী বলতে পারেন?'

অমলা আগের মতই স্যাঁৎস্যাঁতে গলায় বলল—'বিশাখা নাম, কী পদবি ঠিক বলতে পারব না।'

—'আচ্ছা ছেলেকে কখন আপনার কাছে নিয়ে এল ওরা?'

চোখ দুটো এবার উজ্জ্বল দেখাল অমলার। টুনটুনি পাখির মত মুখ উঁচু করে রইল সে। বলল—'বেলা দশটার পর খোকনকে ওরা নিয়ে এল আমার কাছে। বেবি কটে শুইয়ে দিল ওকে। একবার দু-পাঁচ মিনিটের জন্য কোলেও নিয়েছি খোকনকে। কী সুন্দর দেখতে, তা আপনাকে কী বলব ইন্সপেক্টরবাবু। বড় বড় কালো চোখ, এক মাথা চুল, বাঁশির মত নাক। আর আঙুলগুলো ঢেঁড়শের মত লম্বা। ওকে কোলে নিয়ে আমার দেহের কষ্ট-ক্লেশ মনের ভয়-ভাবনা সব যেন কর্পূরের মত উবে গেল।' দুই করতল দিয়ে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে রইল অমলা।

রাজীব বলল—'স্থির হোন মিসেস দত্ত। আমি তো বলেছি আপনাকে। ছেলেকে আপনি আবার কোলে ফিরে পাবেন। কিন্তু তার জন্যে আমাদের একটু সাহায্য করুন। নইলে আমরা যে অন্ধের মত শুধু অন্ধকারই দেখব। আলোর নিশানা খুঁজে পাব না।'

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত নিঃশেষ হল।

রাজীব ফের বলল—'আচ্ছা তারপর থেকেই কি বাচ্চা রইল আপনার কাছে? সারাদিন ওকে কাছে পেয়েছিলেন আপনি?'

অমলা ম্লান হেসে বলল—'সারাদিন আর ওকে পেলাম কোথায়? সাড়ে এগারোটার পর ওকে নার্স এসে নিয়ে গেল বেবি ওয়ার্ডে। সমস্তদিন আর ওকে আনল না। সন্ধে সাতটার একটু আগে আবার খোকনকে রেখে গেল আমার পাশে।'

রাজীব বলল—'তখন ছেলেকে বেশ সুস্থ দেখেছিলেন তো?'

অমলা বলল—'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে অবশ্য এক আধটু কাঁদছিল। কিন্তু সে কিছু নয়।'

—'তারপর?' রাজীব কৌতূহলি শ্রোতার মত প্রশ্ন করল।

—'সাতটার পরই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল আমাদের। আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়ার কথা। আটটা বাজলেই বেশি পাওয়ারের বাতিটা নিভিয়ে দেবে ওরা। রাত্তিরে একজন নার্স দেবার জন্য দরখাস্ত করে গিয়েছিলেন উনি। রাত দশটা থেকে ভোর ছ'টা অব্দি সে আমার কাছে থাকবে। এত বড় ঘরে বারোজন পেশেন্টকে দেখতে হাসপাতালের মোটে একটি নার্স। চট করে তাকে হাতের কাছে পাওয়া মুশকিল। সারাক্ষণ প্রাইভেট নার্স রাখতে পারলেই সুবিধে।' অল্পক্ষণের জন্য থামল অমলা। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল,—'বেশ একটু তন্দ্রা এসেছিল আমার। একটু আগেই দেখেছি হাত দুটো মাথার দুপাশে ছড়িয়ে খোকন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।' বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে অমলা বলে গেল,—'হঠাৎ কেন জানি না ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। চেয়ে দেখি নার্স কখন আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলা। বারান্দায় আলোর ছটা পড়ে যা এক আধটু দেখা যাচ্ছে। মনে হল কেউ জেগে নেই। ভালো করো চেয়ে ঘরের মধ্যে ডিউটি নার্সকেও দেখতে পেলাম না। হঠাৎ খোকনের বিছানাটার দিকে চেয়ে আমার মাথাটা ঘুরে গেল ইন্সপেক্টরবাবু। ছোট খাটটা খালি। বিছানায় খোকন নেই—'

রাজীব প্রশ্ন করল—'তখন কী করলেন আপনি?'

—'রুমাদিকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। বললাম, খোকন কোথায় গেল রুমাদি? কে ওকে নিয়ে গেল?' অমলা দত্তের চোখ দুটি ছলছল হয়ে এল। কয়েক সেকেন্ড পরে বলল—'ডিউটি নার্স তখনই এসে ঢুকল ঘরে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। বয়েস বেশি নয়। বাংলাও বোঝে এবং বলতে পারে। সে খুব অবাক হয়ে বলল—'বেবিকে তো আর কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা নয়। এখন থেকে সে মায়ের কাছেই থাকবে।'

—'কী নাম ওই নার্সটির? জানেন নাকি?'

—'মিস ক্লারা সিম্পসন।' অমলা স্পষ্ট উচ্চারণ করল।

—'ঠিক আটটার সময় ডিউটি রুম ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন উনি।'

—'কোন এক মেট্রনের সঙ্গে কী দরকার ছিল। তাই কিছুক্ষণের জন্য ছিলেন না ঘরে।'

রাজীব মাথার চুলে আঙুল বুলোল। কি ভেবে সে বলল—'তখনই নিশ্চয় আপনার খোকনের জন্য খোঁজ পড়ে গেল হাসপাতালে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু তাকে খুঁজে পাবে কোথায়? অসুস্থ না হলে বাচ্চাকে চব্বিশ ঘন্টার পর আর মায়ের কাছ থেকে সরানো হয় না। সুতরাং বেবি ওয়ার্ডে খোকনকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কেলেঙ্কারি আর বদনামের ভয়ে হাসপাতালে নার্স, ডাক্তাররা সকলে মিলে একরকম ছোটাছুটি শুরু করল। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের মুখখানাও চিন্তা-ভাবনায় এতটুকু হয়ে এল ইন্সপেক্টরবাবু। ঢোঁক গিলে অমলা ফের বলল,—'আসল কথাটা কী জানেন? হাসপাতালের সমস্ত স্টাফ ভীষণ ভয় পেয়েছিল। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, সে দুর্ভাবনা আছে বৈকি।

রাজীব বলল,—'পুলিশ এল কখন?'

—'রাত দশটার সময়। আমাকে বেশি কিছু প্রশ্ন করেনি! হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের ঘরেই ছিল অনেকক্ষণ।'

ভ্রূ কুঁচকে রাজীব কী যেন ভাবল। 'আচ্ছা আপনার খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে কেউ এসেছিল বলে মনে আছে?'

—'কেউ না। আমি কাকেও দেখিনি। তবে—'

—'তবে কী?'

'ওদিকে আট নম্বর বেডের মিসেস সরকার একজন নার্সকে বারান্দায় কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন।'

—'কখন দেখেছিলেন?'

—'সাড়ে সাতটার পর নার্স বারান্দায় ঘুরছিল। আর মাঝে মাঝে এই ঘরের বেডগুলোর দিকে তাকিয়ে কী লক্ষ্য করছিল।'

—'সেই নার্সকে কি উনি আগে কখনও দেখেছেন এখানে?'

—'আগেও না। পরেও না।' অমলা খুব হতাশ ভঙ্গিতে জানাল।

—'তারপরেও না! তার মানে কী?' রাজীবকে বিস্মিত মনে হল।

অমলা বলল,—'সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব সমস্ত নার্সকে এনেছিলেন এখানে। কিন্তু মিসেস সরকার এদের কাউকে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেননি।'

—'তাহলে?' রাজীব চিন্তিত মুখে বলল। 'ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক মনে হচ্ছে।' রাজীবের কপালে অনেকগুলি চিন্তার রেখা পড়ল।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজীব। বলল,—'আজ আসি মিসেস দত্ত। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। খুব তাড়াতাড়ি যেন আমরা খোকনকে আপনার কোলে তুলে দিতে পারি।'

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে রাজীব একটা সিগারেট ধরাল। সুব্রত ওর কপালের কুঞ্চিত রেখার ভাঙাগড়া পড়ছিল। পরিহাস করে সে বলল,—'গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছেন, তাই না রাজীবদা?'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রাজীব কথাটা স্বীকার করল। বলল,—'বাচ্চাটা পাওয়া গেলে পরই কিন্তু মুশকিল শুরু।'

—'মুশকিল কিসের?' সুব্রত হাঁ করে রইল। 'বাচ্চাকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল।'

—'অত সহজ নয় সুব্রত।' রাজীব ঈষৎ হেসে মন্তব্য করল। 'বাচ্চা যে মিসেস দত্তের তা কোর্টের কাছে প্রমাণ করবে কী করে? একদিনের বাচ্চাকে দশ-বিশ দিন পরে শনাক্ত করবে কে? জানো'ত হাসপাতালে বাচ্চাদের সঙ্গে একটা নম্বর লাগানো থাকে। বাচ্চাকে পেলেও তার নম্বরটা নিশ্চয়ই বেপাত্তা হবে।'

তিন

সুপারিনটেনডেন্টের ঘরের দিকে পা বাড়াল রাজীব।

ঘড়িতে আটটার বেশি। হাসপাতালে এখন সাজ সাজ রব। আউটডোরে রোগীদের ভিড় হয়েছে। তাদের নাম ধরে ডাকা শুরু হবে এইবার। যা দিনকাল। বেশি দেরি হলে হৈ-চৈ কিংবা একটা অনর্থ ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ঢিমেতালে হাঁটছিল ওরা। সুপারিনটেনডেন্টের ঘরটা অফিস বাড়ির তিনতলায়, একেবারে কোণের দিকে। অফিস বাড়িটা মিনিট তিন-চার এর রাস্তা। মাঝখানে একখণ্ড সবুজ মাঠ। সেটা পেরোলেই একতলার সারবন্দী ঘরগুলোয় হাসপাতালের নানা অফিস। মাথার উপর ফটফটে নীল আকাশ। কার্তিকের শিশিরভেজা ঘাসের উপর রুপোলি রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখায়।

ঘাড় ঘুরিয়ে রাজীব বলল,—'অমিয়বাবু, আপনাকে এবার একটা প্রশ্ন করি।'

—'নিশ্চয় করবেন। বলুন—'

—'আচ্ছা রুমা দেবী বলে যে ভদ্রমহিলা পাশের বেডে রয়েছেন, ওর কেসটা কী যেন বলছিলেন।'

অমিয়বাবু বললেন,—'কেসটা খুবই স্যাড্। এই নিয়ে চতুর্থবার হাসপাতালে এলেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু এবারেও সেই দুর্ভাগ্য। অর্থাৎ মৃত শিশু প্রসব করেছেন উনি।'

—'এর আগের তিনবারও কি একই ব্যাপার? অর্থাৎ মৃত সন্তান জন্মেছিল ওর?'

ঈষৎ লজ্জিত দেখাল অমিয় দত্তকে। বললেন,—'সঠিক জানি না। তবে স্ত্রীর মুখে শুনলাম ভদ্রমহিলার একটি সন্তানও বেঁচে নেই। নিশ্চয় কোনো জটিল রোগ-টোগ রয়েছে। নইলে বারবার এমন অঘটন কেন? কিন্তু মা-বাপের কথাটা একবার ভেবে দেখুন ইন্সপেক্টরবাবু। মনের উপর কি প্রচণ্ড আঘাত। খোকন নিখোঁজ হবার পর থেকে আমরা দুটি প্রাণী শুধু পাগল হতে বাকি। আর পর পর চারবার শক্তিশেলের মত এই আঘাত ওরা সহ্য করেছেন ভাবলেও অবাক হতে হয়।'

সুব্রতের দিকে চেয়ে রাজীব বলল,—'এদেরই তো আমরা মৃতবৎসা নারী বলি সুব্রত, তাই না?'

সুব্রত ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল।

রাজীব বলল,—'অমিয়বাবু, রুমাদেবীর স্বামীর সঙ্গে কি আপনার আলাপ হয়েছে?'

অমিয় দত্ত এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। বললেন, —'আজ্ঞে না। অমলা এখানে ভর্তি হবার দিন সাতেক আগেই রুমা দেবী হাসপাতালে এসেছেন। কী সব কমপ্লেন ছিল ওঁর। মাঝে মাঝে পেন হ'ত। আবার সব ঠিক-ঠাক। ডাক্তার তাই ওয়াচে রাখবার জন্য ওকে ভর্তি করে নেন। এদিকে কী কাণ্ড দেখুন। অমলা যেদিন এল, ঠিক তার দুদিন আগেই মৃত সন্তান হয়েছে ওঁর। দুপুরের দিকে দেখা করতে আসতেই ব্যাপারটা আমাকে জানাল অমলা। খুব ভয়ে ভয়ে বলল, —'অলুক্ষণে কাণ্ড শুনেছ? পাশের বেডের ওই ভদ্রমহিলার মরা বাচ্চা হয়েছিল। খবরটা শুনেই আমার বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছে বাপু।'

রাজীব মন্তব্য করল—'অশুভ সংবাদ শুনলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে।'

অমিয়বাবু বললেন, —'ঠিক বলেছেন। কিন্তু অমলা কেন, ভয় আমিও একটু পেয়েছিলাম। মনের ভিতরে কেমন একটা খচখচানি শুরু হল। আসলে কী জানেন? আমার স্ত্রীর এই প্রথমবার। শুরু থেকে আশঙ্কা আর অমঙ্গলের চিন্তায় মনটা অস্থির। তারপর হাসপাতালে পা দিতেই এই অলক্ষুণে সংবাদ কানে এল। ফলে মনের মধ্যে একটা অমঙ্গলের ছায়া সব সময় উঁকি দিয়েছে।'

মুখ ঘুরিয়ে অল্প একটু হাসল রাজীব। স্বীকার করতেই হবে স্ত্রীর জন্য সত্যিকার দুর্ভাবনা আছে ভদ্রলোকের।

রাজীব বলল, —'এখন আপনি তাহলে আসুন অমিয়বাবু। আজ রাতে একবার আমার সঙ্গে দেখা করুন।' একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে রাজীব ফের যোগ করল,—'রাত্ত নটার সময় আসুন। আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করব।'

অমিয় দত্ত নমস্কার জানিয়ে পিছন ফিরলেন। রাজীব ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল ভদ্রলোককে। তারপর মাথা তুলে সুব্রতের মুখের উপর চোখ রাখল। বলল,—'ভদ্রলোককে কেমন মনে হল সুব্রত?'

বিন্দুমাত্র না ভেবেই সুব্রত উত্তর দিল,—'কেমন আবার? শান্তশিষ্ট সাদাসিধে গোবেচারী ভদ্রলোক। প্রথম সন্তান আকস্মিকভাবে নিখোঁজ হওয়াতে অন্তরে খুব আঘাত পেয়েছেন।'

'হুম।' রাজীব কিছু ভাববার চেষ্টা করতেই ওর কপালে কুঞ্চিত রেখা পড়ল।

সুব্রত হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'কী বুঝছেন রাজীবদা? ছেলেটাকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে? ওকে মেরে-টেরে ফেলা হয়নি তো?'

—'ছেলেটার বয়স মাত্র একদিন,' রাজীব স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল। 'খুব জোর করে বলতে চাই না সুব্রত। তবে আমার মনে হয় যে, ছেলেটা বেঁচে আছে। বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই ওকে সম্ভবত চুরি করা হয়েছে।' কথা শেষ করেই হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল রাজীব। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে অনেকখানি পুড়িয়ে নিঃশেষ করল সে। পরমুহূর্তে আধপোড়া সিগারেটটাকে সজোরে মাঠের এক কোণে ছুড়ে দিয়ে রাজীব অগ্রসর হল।

সুপারিনটেনডেন্ট রজতকান্তি আইচের নামের সঙ্গে চেহারার মিল নেই। ভদ্রলোকের গায়ের রং বেশ কালো, বয়স প্রায় পঞ্চাশের মত। মস্তকের অনেকখানি জুড়ে টাক। মুখখানা গম্ভীর। চোখের উপর মোটা খয়েরি ফ্রেমের চশমা পরাতে গাম্ভীর্য অনেকখানি বেশি দেখায়। বেঁটে গোলগাল চেহারা, মার্জিত এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক। নিজের শাস্ত্রে রীতিমত পাণ্ডিত্য আছে বলেই মনে হয়। ডাক্তার আইচের নামের পাশে শুধু এদেশের নয়, বিদেশেরও গুটি দুই-তিন ডিগ্রি জ্বলজ্বল করছে।

রাজীব ঘরে পা দিতেই ডাক্তার আইচ কাজ ফেলে তাকালেন। 'বসুন মিঃ সান্যাল, তারপর মিসেস দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শেষ হল আপনার?'

—'ওই হল একরকম।' চেয়ারে বসে রাজীব জবাব দিল। ইঙ্গিতে সুব্রতকে পাশের আসনে বসতে বলল।

রজতকান্তি চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে ফেলে শুরু করলেন,—'খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি মশায়। পাঁচজনের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবো ভেবে পাচ্ছি না। হাসপাতাল থেকে জলজ্যান্ত একটা বেবি নিখোঁজ হল। অথচ তার কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সকলে তবে আছি কীসের জন্য? ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের দারোয়ান সব কি নাকে তেল দিয়ে যোগনিদ্রা যাচ্ছিল? লোকে যে এখনও হাসপাতালের উপর চড়াও হয়নি, এই ঢের রক্ষে।' শেষদিকে তাঁর গলার স্বর কেমন কাঁপা কাঁপা শোনাল।

ডাক্তার আইচ বেশ ভয় পেয়েছেন বুঝতে পেরে রাজীব একটু হাসল। বলল,—'মিথ্যে ভয়-ভাবনা বাড়িয়ে লাভ কী ডাক্তার আইচ? তার চেয়ে আসুন বাচ্চাটাকে যাতে খুঁজে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা শুরু করি।'

'নিশ্চয়।' রজতকান্তি টেবিলের উপর ছোট একটা চাপড় মেরে রাজীবকে সমর্থন জানালেন।

রাজীব বলল,—'আপনার হাসপাতালের বার্থ রেজিস্টারটা একবার নিয়ে আসুন। সেটা সর্বাগ্রে দরকার।'

রজতকান্তি বেল টিপে একজন পিওনকে ডাকলেন। সংশ্লিষ্ট কেরানির কাছ থেকে বার্থ রেজিস্টারটা আনতে আদেশ দিলেন।

তিন চার মিনিটের মধ্যেই বার্থ রেজিস্টারটা টেবিলের উপর এসে পড়ল। রাজীব তারিখ খুঁজে মিসেস দত্তের নাম এবং তার পুত্রসন্তান লাভের কথাটির উল্লেখ চিহ্নিত করতে চেষ্টা করছিল। একটু প্রয়াস করতেই ঠিক নম্বরটি পেয়ে গেল রাজীব, সমস্ত বিবরণ সেখানে লেখা। বেড নম্বর দুই,—রোগিণীর নাম অমলা দত্ত, স্বামীর নাম এবং ঠিকানা। রাত আটটা বত্রিশ মিনিটে একটি পুত্রসন্তান হয়েছে অমলার, বেবির ওজন সাত পাউন্ড দশ আউন্স।

ঘাড় সোজা করে রজতকান্তির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রাজীব, —'সাত পাউন্ড দশ আউন্স মানে বেশ হেলদি বেবি, তাই না ডাক্তার আইচ?'

'তা আর বলতে', রজতকান্তি হেসে উত্তর দিলেন। হাসলে পর ডাক্তারের মুখখানা প্রায়

গোলাকার মনে হয়। একটু আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে রজতকান্তি বললেন, —'বেবির বেশি ওজন হওয়া মানে কি জানেন? জননীকে রীতিমত জখম করে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে রাজীব বলল,—'আচ্ছা, মিসেস দত্তের ডেলিভারির সময় কোন ডাক্তারবাবু ডিউটিতে ছিলেন বলতে পারেন?'

'কেন পারব না?' রজতকান্তি আবার হাস্যময় হয়ে উঠলেন। —'সম্ভব হলে সেই ডাক্তারবাবুকে একটু ডেকে পাঠান।'

রজতকান্তি করিৎকর্মা। মিনিট দশ পরেই ডাক্তারকে প্রায় বগলদাবা করে তিনি ফিরলেন। রাজীবকে বললেন, —'কী জিজ্ঞেস করবেন বলছিলেন, তাই একেবারে ধরে নিয়ে এলাম ভদ্রলোককে।'

রাজীব পরিহাস করে বলল,—'ধরে এনেছেন, তাই রক্ষে। আমি তো ভাবলাম আপনি বোধহয় বেঁধে নিয়ে আসবেন।' রজতকান্তি আইচের মুখখানা হাসিতে পুনরায় গোল দেখাল। আগন্তুকের দিকে চেয়ে রাজীব বলল,—'আমার পরিচয়টা নিশ্চয় আগে পেয়েছেন। আমি রাজীব সান্যাল, সি. আই. ডি, ইন্সপেক্টর। ইনি আমার সহকর্মী সুব্রত সরকার। গত রাতে হাসপাতাল থেকে যে বাচ্চাটি চুরি গেছে, সেই কেসের তদন্ত করতে আমার আসা।'

ডাক্তারের বয়স অল্প। তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়। গায়ের রং ফর্সা। চোখ দুটি বড়। মুখটা লম্বাটে বলে ঈষৎ শীর্ণ দেখায়। নমস্কার করে সে বলল,—'বলুন, আমার কাছে আপনি কী জানতে চান?'

—'এখানে আপনি কতদিন রয়েছেন?'

—'মাস ছয়েক। ডাক্তার পরেশ দাসকে জানেন তো? উনি আমার বিশেষ পরিচিত। বাঁকুড়া থেকে পাস করার পর একরকম ওঁর সুপারিশেই কাজ হয়েছে আমার।'

—'দু নম্বর বেডের পেশেন্ট অমলা দত্ত তো ওঁরই আন্ডারে ভর্তি হয়েছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। শ্রীমতী দত্তের ডেলিভারির সময় আমার ডিউটি ছিল লেবার-রুমে।'

—'একটা প্রশ্ন আমার জানবার আছে। কেসটা কি নর্মাল, না কোনো—?'

—'ঠিক নর্মাল নয়।' ছোকরা ডাক্তার প্রায় প্রতিবাদ করে জানাল। 'অবশ্য বড় কোনো অপারেশন দরকার হয়নি, তবে আমাকে ফরশেপস্ ব্যবহার করতে হয়েছিল।'

—'ফরশেপস্! তাই না?' রাজীবের চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল।

ছোকরা ডাক্তার জবাব দিল—'উপায় ছিল না কোনো। রাত আটটার সময় ডাক্তার দাসকে আমি টেলিফোন করি। উনি বললেন, আর অপেক্ষা না করে ফরশেপস্ ব্যবহার করতে। আমিও ফরশেপস্ দেব বলে ভাবছিলাম। পেশেন্টের অবস্থা ভালো নয়। আর দেরি করলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে।'

রাজীবকে প্রসন্ন দেখাল। রজতকান্তির দিকে সে তাকিয়ে বলল,—'একে প্রশ্ন করা আমার হয়েছে ডাক্তার আইচ। এবার দরকার দুজন নার্সকে।'

—'দুজন নার্স? কাদের কথা আপনি বলছেন?' রজতকান্তি কৌতূহল প্রকাশ করল।

সুব্রত বলল,—'নাম দুটো আমি নোট করে রেখেছি রাজীবদা। বলব নাকি?'

রসিকতা করে রাজীব বলল,—'এখনও অত বুড়ো হইনি সুব্রত। যে মেয়েদের নাম আধ ঘন্টা আগে শুনে ভুলে মেরে দেব।' রজতকান্তির দিকে চেয়ে রাজীব যোগ করল,—'নার্স বিশাখা আর ক্লারাকে আমার বিশেষ দরকার। ওদের একটু এই ঘরে ডেকে পাঠান।'

—'ক্লারাকে পাওয়া সহজ।' রজতকান্তি জানালেন। 'হাসপাতাল কম্পাউন্ডেই ও থাকে। কিন্তু বিশাখার বাড়ি প্রায় আধ মাইলটাক দূরে। দেখি, যদি ও ডিউটিতে এসে থাকে।'

কপাল ভালো বলতে হবে। বিশাখাকে খুঁজে পেতে মিনিট পনেরোও লাগল না। রজতকান্তির পিওন তাকে ডিউটি-রুম থেকে ডেকে আনল।

ছোকরা ডাক্তারটি অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। রাজীবের নির্দেশমত রজতকান্তি আর সুব্রতও ধারে-পাশে কিছুক্ষণের জন্য গা-ঢাকা দিয়েছে। চেয়ারে উপবিষ্ট বিশাখার মুখের দিকে চার পাঁচ সেকেন্ড চেয়ে রইল রাজীব।

মেয়েটির বয়স কম, বড়জোর একুশ বাইশ হতে পারে। গায়ের রং ঠিক ফর্সা বলা যায় না। চোখ দুটি বড় নয়, মাঝারি। কেমন বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নীচের ঠোঁটটা একটু পুরু। বাঁ গালে ছোট্ট একটুকু তিল।

অবস্থাটা অস্বস্তিকর। বিশাখার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল রাজীব। মনে মনে ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত ফুঁসছে বিশাখা। প্রশ্ন করতে রাজীব যেন ইচ্ছে করেই দেরি করছে।

অবশেষে মুখ খুলল রাজীব। 'আপনার নাম?'

খুব বিরক্ত মনে হল বিশাখাকে। অল্প একটু ঠোঁট ফাঁক করে সে জবাব দিল,—'আমার নাম বিশাখা—বিশাখা পাল।'

—'এই হাসপাতালে কতদিন আছেন?'

—'মাস তিন চার।'

—'এর আগে অন্য কোথাও ছিলেন।'

—'কোথাও না। নার্সিং পাশ করার পর এখানে এসেছি।'

—'আপনার বাড়ি? এখানে নাকি—'

মাথা নাড়ল বিশাখা। বলল,—'কোলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকি আমরা। মানে বাবা মা সবাই। অক্রুর সরকার লেনে...নম্বর বাড়ি।'

—'এখানে কোথায় থাকেন?'

—'কাছেই। ছোট একটা বাসা ভাড়া করে আমি আর এক ভদ্রমহিলা দুজনে থাকি। উনি এখানকার স্কুলের টিচার।'

—'গতকাল তারিণী দেবী ওয়ার্ডে ডিউটি ছিল আপনার?'

—'ছিল। ভোর ছ'টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত।'

—'দু নম্বর বেডের পেশেন্ট অমলা দত্তকে পুত্রলাভের শুভ-সংবাদ প্রথম আপনিই দিয়েছিলেন না?'

বিশাখা একটু মনে করবার চেষ্টা করে উত্তর দিল,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ডিউটিতে গিয়ে শুনলাম গত রাতেই পেশেন্টের বাচ্চা হয়েছে। ভদ্রমহিলা ভীষণ দুর্বল চোখ খুললেই ওঁকে এক গ্লাস গরম দুধ খাইয়ে দিতে বলেছেন ডাক্তার।'

রাজীব দুঃখপ্রকাশ করে বলল, —'ভোরের শুভসংবাদ কিন্তু সন্ধে রাতেই দুঃসংবাদে দাঁড়াল বিশাখা দেবী।'

বিশাখা ম্লান হেসে বলল—'ভদ্রমহিলার কপাল মন্দ। এমন ফুটফুটে হেলদি বেবি খুব বেশি হয় না। চুরি না গেলে একটা দেখাবার মত ছেলে হত।

ফস করে রাজীব বলল,—'গতকাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন বিশাখা দেবী?'

—'আমি, মানে,—কেন বলুন তো? বাড়িতেই তো ছিলাম—'।

'—না, কিছু নয়। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।' রাজীব হেসে বলল।

—'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন আমাকে?' বিশাখা জানতে চাইল।

রাজীব হাত তুলে বিদায় জানিয়ে বলল,—'ঠিক আছে, এখন আপনি আসুন।'

বিশাখা বেরিয়ে যেতেই সুব্রত ঘরে ঢুকল। সম্ভবত সে কাছেই করিডরের কোনো অংশে আত্মগোপন করে ছিল। ঘরে পা দিয়েই সুব্রত বলল,—'একটা কথা বলব রাজীবদা?'

—'কি কথা, বলো।'

—'ফরশেপস ব্যবহার হয়েছে শুনে আপনি এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন?'

রাজীব ঈষৎ হাসল। বলল,—'তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা করছি সুব্রত।'

কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর মুখে রাজীব ফের বলল,—'আনাড়ী হাতে ফরশেপস্ ব্যবহার হয়ে থাকলে আমাদের তদন্তের সুবিধে হতে পারে হে।'

চার

সশরীরে ক্লারা সিম্পসন হাজির। লম্বা শক্তসমর্থ গড়ন, দৃঢ় চিবুক, পিঙ্গল আঁখি, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা ফোলা ফাঁপা ববছাঁট চুল। ক্লারার গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা। পরনে হাঁটুঝুল স্কার্ট ফ্রক। ঠোঁটে, গালে অল্প রং। তবে কি কোথাও বেরোবে বলে তৈরি হয়েছিল ক্লারা? হঠাৎ হাসপাতালের পিওন গিয়ে তাকে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের এত্তেলা জানিয়েছে।

রাজীব হাসিমুখে বলল, —'বসুন আপনি। বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না। কয়েকটা মাত্র প্রশ্ন আছে আমার।'

ক্লারা পরিষ্কার গলায় উত্তর দিল,—'আমার কোনো তাড়া নেই। কি প্রশ্ন আছে করুন।'

আগের মতই আত্মপরিচয় দিয়ে শুরু করল রাজীব। বলল,—'গত রাতে তারিণী দেবী ওয়ার্ড থেকে একটি বাচ্চা চুরি গেছে। সেই কেসটার তদন্ত করতেই আসা। আমার নাম রাজীব সান্যাল, সি, আই, ডি ইন্সপেক্টর।'

ঈষৎ হেসে ক্লারা বলল—'কাল রাত্তিরেও কিন্তু পুলিশ তদন্তের জন্য এসেছিল।'

রাজীব ওর মনের কথা বুঝতে পারল। আগের রাত্তিরেই তো পুলিশ এসে একদফা জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। আবার নতুন করে কি জানতে চায় পুলিশ? এত ঘন ঘন তাকেই বা প্রয়োজন কীসের?

রাজীব বলল,—'যে কোনো কেসেই ঠিকমত সূত্র খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন মিস সিম্পসন। ফলে তদন্তের প্রথম দিকে একটু বেশি ছোটাছুটি করতে হয় আমাদের। অনেক সময় একই লোককে দু-তিন বার প্রশ্ন করার দরকার হয়ে পড়ে।'

ক্লারা কোন মন্তব্য করল না।

খোলাখুলি বলল রাজীব, 'গতকাল তারিণী দেবী ওয়ার্ডে আপনি কতক্ষণ ডিউটিতে ছিলেন?'

—'বেলা দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। অবশ্য,'—ক্লারা একটু থামল।

—'অবশ্য কী মিস সিম্পসন?'

—'অন্য কিছু নয়। গতকাল রাত দশটা কেন, দুপুর রাত পর্যন্তও আমি ব্রেহাই পাইনি।'

কারণটা অনুমান করতে পারল রাজীব। রাত দশটার সময় পুলিশ এসেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হতে গভীর রাত্তির হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং আরো অনেকের সঙ্গে ক্লারা সিম্পসনেরও ছুটি মেলেনি।

রাজীব বলল—'আচ্ছা গতকাল বাচ্চাটাকে ওর মায়ের কাছে কখন এনেছিলেন আপনি?'

—'সন্ধের পর, সাতটার একটু আগে। বেবির কোনো কমপ্লেন্ ছিল না। সাধারণত জন্মাবার পর চব্বিশ ঘন্টার মত বেবিকে আলাদা রেখে ওয়াচ করা হয়। কোনো কমপ্লেন না থাকলে তাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয় এরা। বেবি ওয়ার্ডে আর রাখে না।'

—'বেবিকে ওর বিছানায় শুইয়ে দেবার পর থেকে আপনি কি সারাক্ষণ ডিউটি রুমে ছিলেন?'

—'প্রায় সমস্তক্ষণ। কেবল আধ ঘন্টার মত একবার অন্য ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম।'

—'কোন সময় গিয়েছিলেন?'

—'রাত আটটার সময়। পেশেন্টদের খাওয়া-দাওয়া সাড়ে সাতটার মধ্যেই শেষ। আটটার মধ্যেই সবাই শুয়ে পড়ল ওরা। ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আমি ওদের ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করলাম। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সবাই চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছে দেখলাম। আটটার একটু আগে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি।'

'একজন পেশেন্ট বলছেন যে সাড়ে সাতটার পর করিডোরে নার্সের বেশ বাস পরা একটি মেয়েকে তিনি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। আপনি কি কাউকে লক্ষ্য করে থাকবেন?'

ক্লারা উত্তর দিল,—'আমি চেয়ারে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। দু-একবার ঘরের মধ্যে এর-ওর কাছে গিয়েছি। কই আমার তো কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

—'আধ ঘন্টা সময় আপনি কোথায় ছিলেন মিস সিম্পসন?'

—'এই হাসপাতালের মেট্রনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার নাম মিসেস কর। ইচ্ছে করলে ওকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

—'তার প্রয়োজন দেখছি না', রাজীব দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল। 'আচ্ছা, আমার শেষ প্রশ্নটায় এবার আসছি। বাচ্চাটাকে বেশ হেলদি দেখেছিলেন আপনি, তাই না?'

—'হ্যাঁ। বেশ লাভলি বেবি। সাড়ে সাত পাউন্ডের বেশি ওজন ওর।'

—'মিস সিম্পসন,' রাজীব ওর মুখের উপর চোখ রেখে প্রশ্ন করল। 'এ ব্যাপারে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?'

ক্লারা সিম্পসনের কোনো ভাবান্তর হল না। সে বলল—'সন্দেহের কথা বলছেন? কিন্তু আমি কাকে সন্দেহ করব?' একটু থেকে ক্লারা ধীরে ধীরে বলল—'বরং পুলিশ সম্ভবত আমাকেই সন্দেহ করছে।'

উত্তর শুনে রাজীব একটু হাসল। ক্লারা সিম্পসন নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতী। সে বলল,—'ঠিক আছে মিস সিম্পসন, এখন আপনি আসতে পারেন। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই। আপনাকে দ্বিতীয়বার ডেকে প্রশ্ন করতে হল বলে আমি দুঃখিত। রিয়েলি সরি।'

ক্লারা চলে যেতেই রাজীব পুশবেল টিপল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পিওন এসে দাঁড়াল সামনে। রজতকান্তিকে খবর পাঠাল রাজীব, এবার সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ঘরে ফিরে আসুন। তার কোনো অসুবিধে নেই।

সুব্রত বলল, —'অফিস বাড়ির এদিক-ওদিক অনেকখানি ঘুরে এলাম রাজীবদা। সর্বত্রই এই কথার গুঞ্জন। একজন তো পরিষ্কার বলল,—হাসপাতালে নাকি অজানা, অচেনা, বহু লোক ঘুরে বেড়ায়। কী মতলবে তারা আসে যায়, কেউ জানে না। তাদের দেখে কোনো রোগীর খোঁজ-খবর করতে এসেছে বলে মনেই হবে না। ওরা বলছিল বাচ্চাটাকে চুরি করে নিপাত্তা হওয়া এদেরই কাজ। এর পিছনে রীতিমত একটা গ্যাং থাকাও বিচিত্র নয়।'

কোনো মন্তব্য না করে রাজীব শুধু বলল—'হুম।'

রজতকান্তি ঘরে ঢুকেই বললেন,—'কতদূর এগোলেন মিঃ সান্যাল। দু-একদিনের মধ্যেই বেবির একটা খোঁজ পাওয়া যাবে তো?'

রাজীব পরিহাস করে বলল,—'কিছুই বলতে পারি না ডাক্তার আইচ। অবস্থাটা এখন খড়গাদায় বসে ছুঁচ খোঁজার মত। ছুঁচের হদিশ কবে মিলবে, কেউ বলতে পারে না।'

রজতকান্তি ম্লান হাসলেন, 'কী জানেন মিঃ সান্যাল? হাসপাতালের একটা বিশ্রী দুর্নাম হল। লোকে গায়ে পড়ে দুটো কথা শুনিয়ে গেলেও জবাব দেবার মুখ নেই। তবে বেবিকে যদি ওর মার কোলে আবার তুলে দিতে পারতাম, তাহলেও না হয় একটা কথা ছিল।'

রাজীব বলল,—'আচ্ছা মিঃ আইচ, এখানকার ডাক্তার আর নার্সরা কি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে থাকেন?'

—'ডাক্তারদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য তা পারেন। আবার অনেকে না পারলেও গোপনে দু-চারটে কল অ্যাটেন্ড করে যান।' প্রশান্ত হাসিতে রজতকান্তির মুখখানা আবার গোল দেখাল। চোখ নামিয়ে ডাক্তার আইচ বললেন,—'কি জানেন, কিছু বাড়তি পয়সা প্রায় প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। ওর আকর্ষণ দুর্নিবার। আইন করে বোধ হয় তা বন্ধ করা যায় না।'

—'আর নার্সরা? তারাও কি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারে?'

—'হাসপাতালের নিজস্ব নার্সরা নিশ্চয়ই তা পারে না।' রজতকান্তি খুব জোরের সঙ্গে বললেন। 'তবে এখানেও সেই একই অবস্থা। তলে তলে কে কোথায় একটু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে কামাচ্ছে, কে-ই বা তার খোঁজ রাখে বলুন?' একটু থেমে ডাক্তার আইচ যোগ করলেন,—'তাছাড়া সমাজের সমস্ত অঙ্গে দুষ্ট ক্ষত। গোপনীয় নানা কারণে ডাক্তার নার্সদের সাহায্য যে দরকার হচ্ছে না, এমন কথা কি জোর করে বলা যায়?'

রাজীব বলল,—'আচ্ছা মিঃ আইচ, তারিণী দেবী ওয়ার্ডের চার নম্বর বেডের পেশেন্ট শ্রীমতী রুমা দেবীকে আপনি দেখেছেন?'

রজতকান্তি স্মৃতির দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি করে কিছু মনে করবার চেষ্টা করলেন। একটু পরেই সম্ভবত নামটা মনে পড়ল তাঁর। মাথার টাকের উপর আঙুল বুলোন বন্ধ করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চার নম্বর বেডের পেশেন্টের কথা মনে পড়েছে বটে। রুমা ঘোষ ওঁর নাম। আজ সকালেই তো ভদ্রমহিলার রিলিজড্ হবার কথা। এতক্ষণ হয়তো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন।'

রাজীব বলল,—'ভদ্রমহিলার স্বামীর নাম আর ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারেন?'

—'নিশ্চয় পারি।' রজতকান্তি পিওনকে ডেকে আবার একটা কি খাতা আনতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, —'রুমা দেবীর কেসটা খুব স্যাড ইন্সপেক্টর। এই নিয়ে চতুর্থবার ওঁকে হাসপাতালে আসতে হল। কিন্তু এবারেও ডেড্ চাইল্ড ভদ্রমহিলার। আমার তো মনে হয় ওদের দুজনেরই রক্ত পরীক্ষা করে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার।' ইতিমধ্যে বোর্ড বাঁধানো একটা মোটা খাতা এনে রেখে গেছে পিওন। কয়েকটা পাতা উল্টে রজতকান্তি প্রায় চেঁচিয়ে বললেন,—'এই যে পেয়ে গেছি ঠিকানাটা। চন্দনপুরে দেখছি রুমা দেবীর বাড়ি নয়। সম্ভবত ওঁর কোনো আত্মীয়ের ঠিকানা এটা। বাবা কিংবা ভাই-টাই হয়তো কেউ হবেন। ওর স্বামীর ঠিকানাটা দেখছি কলকাতার।'

'কী ঠিকানা বলুন তো?'

রজতকান্তি ঠিকানাটা বললেন। রাজীবের নির্দেশমত সুব্রত তা লিখে নিল।

রাজীব বলল,—'আচ্ছা মিস সিম্পসনের আজ ডিউটি কখন?'

—'আজ ডিউটি দেওয়া হয়নি ক্লারাকে। গতকাল বিকেলেই সে আজকের জন্য ছুটি চেয়ে নিয়েছিল।' রজতকান্তি খাতাটা একপাশে সরিয়ে রেখে উত্তর দিলেন।

রাজীবের কপালে কোঁচকানো রেখা দেখা দিল। কি যেন চিন্তা করল রাজীব। বলল,—'গতকাল বিকেলেই ছুটির দরখাস্ত দিয়েছিল ক্লারা, তাই না?'

—'হ্যাঁ। কলকাতায় কি বিশেষ কাজ আছে ওর। তাই ছুটির দরকার বলেছে।'

খুব দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজীব। বলল,—'ধন্যবাদ ডাক্তার আইচ। এখন তাহলে আমরা আসি।'

রজতকান্তি তাড়াতাড়ি বললেন,—'বেবির কোনো হদিশ-টদিশ পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করবেন দয়া করে।'

—'নিশ্চয়। সেকথা বলতে হবে না আপনাকে।' রাজীব আশ্বাস দিল।

হাসপাতালের মাঠে পা দিয়ে রাজীব আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। কার্তিকের হিমে নেয়ে ওঠা ঝকঝকে নীল আকাশ। রোদের তেজ নির্বিষ সাপের মত। সূর্যটা যেন পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ঘাসের উপর একটা চিত্রবিচিত্র সুন্দর প্রজাপতি উড়ে উড়ে খেলা করছে। কার্তিক মাসেও হাসপাতালের এক কোণে স্থলপদ্ম গাছটায় বেশ কয়েকটা বড় সাইজের ফুল ফুটে আছে।

রাজীব বলল,—'কি সুব্রত, কেসটা কেমন লাগছে তোমার? খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?'

সুব্রত উত্তর দিল, —'ইন্টাররেস্টিং তো বটেই রাজীবদা। কিন্তু এর আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারছি না। একদিনের বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, এমন আজগুবি কাহিনি বোধ হয় ভূভারতে কেউ শোনেনি।'

রাজীব হেসে বলল,—'ধৈর্য ধরো সুব্রত। আস্তে আস্তে আরো অনেক কিছু শুনবে। আধুনিক জীবন বড় জটিল হে। আধুনিক কালের অপরাধও জটিল রহস্যে ঢাকা। এত চট করে তার কার্যকারণ বোঝা যাবে না।'

বেলা বারোটার সময় ক্লারা সিম্পসনকে চন্দনপুর ইস্টিশানে দেখা গেল। সাধারণত এই সময়টাতে মানুষজনের আসা-যাওয়া কম। ফলে ইস্টিশানটা অন্য সময়ের চেয়ে একটু ফাঁকা। হকার, ফিরিওলা এবং চা-বিক্রেতার শোরগোল প্রায় নেই। কিছু রেলযাত্রী প্ল্যাটফর্মের সিমেন্ট বাঁধানো আসনগুলোতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে।

ক্লারা এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই কেউ কেউ ওর দিকে তাকাল। এদিক-ওদিক চেয়ে কী যেন দেখল ক্লারা। তারপর দু-পা পিছিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোল।

সকালের সেই বেশবাস কখন বদলে ফেলেছে ক্লারা। এখন ওর পরনে আশমানী রঙের হাঁটুঝুল ফ্রক। ঠোঁটে কড়া লাল রং। গালেও লাল আভা। চোখে কালো রঙের সানগ্লাস। হাতে সুদৃশ্য ছোট একটা সুটকেস। বেশ ছিমছাম ভঙ্গি।

মিনিট দশ পরেই হাওড়াগামী একটা ইলেকট্রিক ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। ক্লারা সিম্পসন কোনো দিকে না চেয়ে মেয়েদের একটা প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠে পড়ল। অনেকে নামল ট্রেন থেকে, অনেকে উঠল। ক্লারা সিম্পসন লক্ষ্য করেনি, লুঙি-পরা একটা আধবুড়ো লোক তার পিছু পিছু প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটার চোখে একটা পুরোনো চাঁদির চশমা, কাঁধে একটা ঝোলা, মুখে খানিকটা কাচা-পাকা দাড়ি। মেয়েদের গাড়ির ঠিক পাশের একটা তৃতীয় শ্রেণির কামরায় লোকটা নিঃশব্দে উঠে পড়ল।

হাওড়া স্টেশনে নেমে কোনো দিকে চাইল না ক্লারা। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে খুব দ্রুত স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বালীগঞ্জগামী একটা ট্রামে উঠে পড়ল ক্লারা। লুঙি-পরা সেই লোকটা একসময় টুপ করে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পা রাখল। আধঘন্টাটাক পরে ট্রামটা এসে দাঁড়াল পার্কসার্কাস ময়দানের কাছে। ট্রাম থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খোঁজ করল ক্লারা। কাউকে না পেয়ে একটু হতাশ দেখাল ওকে। ধীর পায়ে ক্লারা সিম্পসন একটা বাস স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল।

মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই উল্টোদিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে একটা লোক এসে দাঁড়াল ওর

কাছে। 'কতক্ষণ এসেছেন?' লোকটি লজ্জিত মুখে বলল।

—'বেশিক্ষণ না।' ক্লারা উত্তর দিল।

পকেট থেকে একটা খাম বের করে লোকটি দিল ক্লারাকে। বলল, —'চলুন, ঐ সিগারেটের দোকান থেকে একটা প্যাকেট কিনে নিয়ে খানিকটা পথ আপনার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যাই।'

সিগারেটের দোকানের কাছে এসে ক্লারা বলল, —'এতে সব টাকাটাই আছে তো?'

'পুরো পাঁচশ। আমি কথার খেলাপ করি না।'

—'বেবিকে পৌছে দেবার কথা মনে আছে তো?'

—'নিশ্চয়!' লোকটা ঈষৎ হাসল।

—'ঠিক সন্ধের সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবে ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কোণে।' ক্লারা সিম্পসন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

—'গাড়ি?'

-'হ্যাঁ, একটা কালো রঙের অ্যামবাসাডর'—

পাঁচ

সিগারেটে আগুন লাগিয়ে এক মুখ ধোঁয়া টানল লোকটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ধোঁয়াটা ওর নাকমুখ দিয়ে একটু একটু করে বেরোল।

লোকটা বলল—'গাড়ির নম্বরটা কত বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ'। ক্লারা মাথা হেলাল। এদিক ওদিক চেয়ে গাড়ির নম্বরটা সে বলল,—'ডব্লু বি—'

—'নাম ঠিকানা সব তো আপনাকে লিখে দিয়েছি কাল। তবে ঠিকানা খুঁজে যাবার প্রয়োজন নেই। ভদ্রলোক বারণ করে দিয়েছেন।'

—'উনি কি একাই আসবেন গাড়ি নিয়ে?'

—'ঠিক বলতে পারব না! তবে সম্ভবত ওঁর স্ত্রী আসবেন সঙ্গে। একটি মাত্র সন্তানের অভাবে ওদের দাম্পত্যজীবন মরুভূমি হতে বসেছে। সেজন্যই বেবিকে তাড়াতাড়ি পেতে ওঁদের এত আগ্রহ।'

লোকটা বলল—'আচ্ছা এখন তাহলে আসি। দরকার হলে আপনাকে আবার খোঁজ করব।'

'নিশ্চয়। চন্দনপুরে আমার কোয়ার্টারে তো গিয়েছেন আপনি। তাছাড়া কলকাতায় রিচার্ড তো আছে। ওকে খবর দিলেই আমি সংবাদ পেয়ে যাব। তবে একটা কথা আপনাকে বলা দরকার।'

—'কী কথা বলুন তো?' লোকটা সাগ্রহে জানতে চাইল।

—'খুব শিগ্‌গির এখন আর চন্দনপুরে আসবেন না। হঠাৎ ফেঁসে যেতে পারি।'

—'ব্যাপারটা কী?' লোকটা সভয়ে প্রশ্ন করল। 'পিছনে ফেউ লাগল নাকি?'

—'তেমন কিছু নয়।' ক্লারা ওকে আশ্বস্ত করল। চোখ টিপে বলল,—'একটু সাবধানে থাকবেন। আর খবরটা যেন—' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লোকটা তাড়াতাড়ি বলল—'আমার দিক থেকে নিশ্চিন্তে থাকুন। এ কথা কাকপক্ষীতে টের পাবে না।'

উল্টোদিক থেকে একটা বাস এসে সামনে দাঁড়াল। লোকটা হাত তুলে ক্লারাকে নমস্কার করল। তারপর কৌশলে মানুষ-বোঝাই বাসটার ফুটবোর্ড একটা পা রেখে হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে উধাও হল।

ক্লারা সিম্পসন দু'এক মিনিট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর ট্রামলাইনটা পিছনে

ফেলে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। মিনিট পনেরো পরে একটা ছোটখাটো দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল ক্লারা।

পাড়াটায় ছত্রিশ জাতের বসতি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল শুরু হতে দেরি নেই। সূর্য এখন হেলে পড়েছে। কাছাকাছি কোনো একটা স্কুলের সম্ভবত ছুটি হল। কলরব করতে করতে একদল ছেলে রাস্তা পেরোল। এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে তারা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হল।

দোকানে লোক ছিল না। একটা অল্পবয়সী ছেলে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বোধ হয় খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করছিল। ক্লারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—'রিচার্ড? রিচার্ড কোথায়?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছেলেটা বলল,—'নিউমার্কেটে গেছে। কিছু জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি দরকার।'

বসবার জন্য ক্লারাকে টুল এগিয়ে দিল ছেলেটি। কিন্তু ক্লারা সিম্পসন বসল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় লক্ষ্য করে সে বলল,—'কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, —'কিছু বলে যায়নি। তবে মাল না পেলে ওকে বড়বাজার পর্যন্ত দৌড়ুতে হবে।'

ক্লারা আর অপেক্ষা করল না। ছেলেটিকে বলল—'আমি উঠলাম। রিচার্ডকে এলে বলো আমার কথা। সময় পেলে দু-একদিনের মধ্যে যেন চন্দনপুরে যায়।'

খুব ক্লান্ত দেখাল ক্লারাকে। দোকান থেকে বেরিয়ে একটা দেবদারু গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল ক্লারা। পথের উপর দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। কোনো আরোহী নেই দেখে হাত বাড়িয়ে ক্লারা ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ট্যাক্সিতে উঠে সে শুধু বলল,—'হাওড়া স্টেশন।'

পরেশ ডাক্তারের চেম্বারের কাছে এসে রাজীব এদিক-ওদিক চাইল। ঘড়িতে রাত আটটার মত। নেহাৎ বাজার জায়গা। নইলে পথঘাট এতক্ষণ বাদলা দিনের সন্ধ্যার মত নির্জন হয়ে আসবার কথা।

চেম্বারের সামনে বড় বড় হরফে পরেশ ডাক্তারের নাম। আর নামের পাশেই জ্বল জ্বল করছে দেশি-বিদেশি ডিগ্রিগুলো। অনেকগুলো ডিগ্রি। বড় বড় হরফে নাম আর অতগুলো ডিগ্রি, সব মিলিয়ে কেমন জবড়জং লাগল রাজীবের কাছে।

দরজার সামনেই দুখানা গাড়ি। একটা নিশ্চয় পরেশ ডাক্তারের। কারণ গাড়ির কাচে ডাক্তার কথাটি বড় বড় করে লেখা। অন্যটি তবে? হয়ত কোন রোগী-টোগীর। পরেশ দাস এখানের নাম-করা ডাক্তার। তার হাতে শাঁসালো রোগী থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

টেলিফোনে আগেই কথা বলেছিল রাজীব। পরেশ ডাক্তার সম্ভবত ওরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। ঘরে পা দিয়ে রাজীব দেখল পরেশ একা নন। আরো কে একজন বসে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন ডাক্তার।

রাজীবকে দেখে পরেশ ডাক্তার অভ্যর্থনা করে বললেন—'আসুন মশাই। আটটার সময় আপনাকে টাইম দিয়েছি। এ দিকে সাড়ে সাতটার পরেই ফাঁকা হয়ে গেলাম। এতক্ষণ শুধু আপনার জন্যই বসে আছি।' একটু হেসে পরেশ দাস যোগ করলেন,—'চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। তাই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পগুজব করছি।'

অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখল রাজীব। বেশ মিষ্টি চেহারা ভদ্রলোকের। বয়স চল্লিশের বেশি নয়। ফর্সা রং, ঈষৎ কুঞ্চিত পাতলা চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। পরনে শান্তিপুরী ধুতি আর গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে চকচকে পাম্পসু। দুই হাতের আঙুলে তিনটি আংটি। দুটিতেই বেশ দামী পাথর বসানো বলে মনে হল রাজীবের। একটি নিশ্চয় হিরে। অন্যটি কী ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু বাম হাতের অনামিকায় পরা তৃতীয় আংটিটির দিকে চেয়ে অবাক হল রাজীব। খুব সাধারণ

সেটি, ম্যাট্‌মেটে পুরাতন।

পরেশ ডাক্তার বললেন, —'আসুন আলাপ করিয়ে দিই আপনাদের। ইনি শ্রীজগদীশ রায়, কলকাতায় চীনাবাজারে ব্যবসা আছে এঁর। ওখানে নিজের বাড়িও করেছেন।' তারপর রাজীবের দিকে চেয়ে একটু হেসে পরেশ ডাক্তার তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন—'ইনি সি আই ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল।'

রাজীব হাত তুলে নমস্কার করে বলল,—'একটা কথা বলব মিঃ রায়। আপনার বাঁ হাতের আঙুলে ওই আংটিটা কিসের? কোনো ধাতুর নিশ্চয়ই?' একটু থেকে রাজীব ফের বলল—'আপনার মত লোকের হাতে ওটা খুব বেমানান লাগছে।'

জগদীশ হেসে বললেন—'ওটা একটা সীসের আংটি মশাই। এক জ্যোতিষীর কথামত বছর দুই আগে ধারণ করি।

পরিহাস করে রাজীব বলল—'তেমন কোনো ফল পেয়েছেন নাকি?'

জগদীশ রায়কে একটু চঞ্চল দেখাল। 'ফল কোথায় আর পেলাম। পাথর-টাথর ফেলে বাঁধ দিয়ে নদীর জলকে রোখা যায়, কিন্তু আঙুলে পাথর বা ধাতু বেঁধে ভাগ্যের গতিকে বদলানো যায় না।' ভদ্রলোকের গলার স্বরে বেশ একটু আক্ষেপ প্রকাশ পেল।

পরেশ ডাক্তার এবার মুখ খুললেন। 'ভাগ্য তো এখন আপনার উপর প্রসন্ন মশাই। পরশু দিন রাত্তিরে অমন সুন্দর একটি বাচ্চা হয়েছে আপনার। এর পরেও কি ভাগ্যকে দোষ দেওয়া যায়?'

রাজীব বলল—'পরশু রাতে ওর একটি সন্তান হয়েছে নাকি?'

পরেশ ডাক্তার একগাল হাসলেন। অনেকটা আত্মপ্রসাদের হাসি।

বললেন—'রীতিমত কষ্ট করতে হয়েছে মশাই। পুরো তিনটি ঘন্টা আমাকে থাকতে হল ওখানে। তারপর পেশেন্ট আর বেবি দুজনকেই বেশ সুস্থ দেখে প্রায় মাঝ-রাত্তিরে ঘরে ফিরি।'

জগদীশ রায় টেবিলে হাত রেখে দাঁড়ালেন।

রাজীব বলল,—'কী, উঠলেন নাকি?'

—'হ্যাঁ, আপনারা কথা বলুন, আমাকে আবার খানিকটা পথ যেতে হবে।

পরেশ ডাক্তার বললেন—'গতকাল সারাদিন আমি আপনার কথা ভেবেছি মিঃ রায়। বেবি আর তার মা কেমন রইল একবারও জানালেন না। আজ সন্ধের সময় আপনি না এলে হয়তো আমাকেই একজন লোক পাঠাতে হত।'

জগদীশ কিছু বললেন না। স্মিত মুখে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই রাজীব চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তারের মুখোমুখি বসল।

—'কী খবর বলুন?' পরেশ ডাক্তার এবার যেন সংক্ষিপ্ত হতে চাইলেন।

রাজীব বলল,—'ভদ্রলোকের কি চন্দনপুরেই বাড়ি?'

—'বাড়ি একটা আছে অবশ্য এখানে। তবে সেটা ঠিক চন্দনপুর নয়, এখান থেকে মাইল দুই দূরে।'

—'এই বাচ্চাটি কি সেই বাড়িতেই হয়েছে ডাক্তারবাবু?' রাজীব প্রশ্ন করল।

পরেশ ডাক্তারের চোখ দুটো বড় নয়। একটু ছোট। কিছু চিন্তা করতে শুরু করলেই চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। রাজীবের দিকে চেয়ে পরেশ ডাক্তার বললেন,—'ভদ্রলোকের মনের জোর একটু কম। এইটি ওঁর দ্বিতীয় সন্তান। আগেরটি কলকাতায় হয়েছিল। কিন্তু সেটি বেঁচে নেই।'

—'বেঁচে নেই মানে? বড় হয়ে মারা যায়?'

—'ঠিক বড় হয়ে নয়। বাচ্চাটি জন্মেছিল কলকাতার একটি নামী নার্সিং হোমে। কিন্তু জন্মের পরই নিমোনিয়া হয় বাচ্চার। ওকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।'

রাজীব বলল,—'ঘটনাটা কতদিন আগের?'

—'প্রায় সাত বছর আগের কথা।'

—'সাত বছর!' রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করল। 'ইতিমধ্যে আর বাচ্চা কাচ্চা হয়নি?'

পরেশ ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

রাজীব বলল,—'আচ্ছা, ওঁর মত ধনী মানুষ কলকাতা ছেড়ে এই চন্দনপুরে কেন স্ত্রীকে নিয়ে এলেন বলুন তো?'

পরেশ ডাক্তারকে আহত মনে হল। খুব গম্ভীর মুখ করে তিনি বললেন,—'কেন চন্দনপুরে কি ডাক্তার নেই?'

নিজেকে সংশোধন করতে রাজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'না, না। আমি সে কথা বলছি না। তবে কলকাতা ছেড়ে সাধারণত কেউ তো আসতে চান না। অবশ্য চন্দনপুরে আপনার মত বড় ডাক্তার আছেন। এরকম সুবিধে মফস্বলের অন্যত্র নেই।'

পরেশ ডাক্তার হেসে বললেন,—'হাসপাতাল আর নার্সিং হোমের উপর ভদ্রলোকের একটুও আস্থা নেই। তাই হঠাৎ একদিন চন্দনপুরে স্ত্রীকে নিয়ে আমার চেম্বারে হাজির।'

—'আপনি ওঁকে কী অ্যাডভাইস দিলেন?'

—'আমি ভদ্রলোককে হাসপাতালের কথা বলেছিলাম একবার। কিন্তু উনি রাজি হবেন না বুঝতে পেরে আর পীড়াপীড়ি করিনি। বাড়িতে বাচ্চা হলে দোষ কিছু নেই। আগেকার দিনে তো তাই হয়েছে।'

—'তা ঠিক।' রাজীব মাথা চুলকে বলল।

পরেশ ডাক্তার হেসে বললেন,—'আর একটা কথাও বলি আপনাকে। ভদ্রলোক মোটা টাকা ফি দিয়েছেন। শুধু আমাকে নয়, আমার সঙ্গে যে নার্স ছিল, তাকেও ফি দিতে কার্পণ্য করেন নি। পুরো এক'শ টাকাই ফি পেয়েছে বিশাখা।'

—'বিশাখা মানে, বিশাখা পাল? সেই কি অ্যাসিস্ট্ করেছিল আপনাকে?'

—'হ্যাঁ, জুনিয়র ডাক্তার একজন পেলে সুবিধে হত। কিন্তু চট করে অত রাতে কাউকে পেলাম না। মনে হল, ফ্যাকড়া বাধলেই হাসপাতালে নিয়ে আসব। কিন্তু ঈশ্বর সহায়। একেবারে নর্মাল কেস। কোনো অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়নি।'

রাজীব বলল,—'বিশাখা পাল কি সমস্ত রাত্তির ছিল ওখানে?'

—না, না। জগদীশবাবু কলকাতা থেকে একজন নার্স এনে রেখেছেন। ওদের খুব জানাশুনো মেয়েটি। নার্সিংয়ের কাজ সেও বেশ জানে। পেশেন্টের সেবা সেই করছে।'

'আচ্ছা ডাক্তার দাস, ক্লারা সিম্পসন বলে একজন নার্সকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন?

—'অবশ্য চিনি। খুব কাজের মেয়ে ক্লারা। ডেলিভারি কেসে ওর তুলনা নেই। একাই সব দিকে সামাল দিতে পারে।'

—'ওকে তাহলে নিয়ে গেলেন না কেন?'

—'ক্লারা সিম্পসন তো পরশুদিন চন্দনপুরে ছিল না। তার আগের দিন সন্ধেবেলায় জরুরি কাজে সে কলকাতায় গিয়েছিল।'

রাজীব তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ঈষৎ কামড়ে শুধু বলল —'আই সি।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কারো মুখে শব্দ নেই।

তারপর রাজীবই বলল,—'আচ্ছা ডাক্তার দাস, হাসপাতাল থেকে বাচ্চাটা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে

আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?'

—'সন্দেহ মানে', পরেশ ডাক্তার একটু চিন্তা করে বললেন—হাসপাতালের কেউ নিশ্চয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলে আমার অনুমান।'

—'ক্লারা সিম্পসন?'

হাতির মত চোখ ছোট করে পরেশ ডাক্তার শুধু বললেন,—'মনে হয় না ইন্সপেক্টর। ক্লারার পক্ষে এ ধরনের কাজ।'

কথা শেষ না করেই থামলেন ডাক্তার। চোখ দুটো আগের মত ছোট। বোধহয় তখনও কিছু চিন্তা করছিলেন পরেশ ডাক্তার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই রাজীবের পায়ে কি যেন ঠেকল। অন্য কিছু নয়—আলপিনে আটকানো দশ-পনেরটা ছোট বড় সাইজের কাগজ। ওযুধের প্রেসক্রিপশন ক্যাশমেমো, আরো অনেক কিছু। এক নজরে কাগজগুলো দেখেই রাজীব বলল,—জগদীশবাবু ফেলে গেছেন দেখছি।' পরেশ ডাক্তার হাত বাড়িয়ে বললেন—'দিন কাগজগুলো। কাল-পরশু উনি না এলে কাউকে দিয়ে পাঠাব'খন।

রাজীব বলল,—'আমাকে কাল সকালে একবার যেতে হবে ওদিকে। যদি অনুমতি করেন তো আমিই ওঁকে পৌঁছে দিতে পারি।'

—'বিলক্ষণ। তবে তো খুব উপকার হয়।' পরেশ ডাক্তার বিনয়ে বিগলিত হলেন।

বাড়িতে এসে খুব মনোযোগ দিয়ে কতকগুলি কাগজপত্র পরীক্ষা করছিল রাজীব। কয়েকজনের জবানবন্দী, নোট করা বিভিন্ন কথা, আরো কিছু কাগজপত্র। রাজীবের কপালে চিন্তার ক্ষুদ্র ঢেউ শিশুগুলি সৃষ্টি হয়ে আবার তা মিলিয়ে যাচ্ছিল।

কোথা থেকে দু-তিনটে মোটা বই এনে টেবিলের উপর রাখল সুব্রত। বলল,—'এই নিন আপনার ডাক্তারি বই। পুলিশের তদন্তে আবার এসব যে কী কাজে লাগবে তা তো ভেবে পাচ্ছি না।'

দরজার কাছে কার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। রাজীব তাকিয়ে দেখল, অমিয় দত্ত। ভদ্রলোক ঠিক নটার পরেই এসেছেন।

হঠাৎ সশব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। লাইন ধরে কী যেন শুনল সুব্রত। পরক্ষণেই প্রায় চিৎকার করে সে বলল,—'রাজীবদা, শুনেছেন? থানা পুলিশ এই মাত্র ফোনে খবর দিচ্ছে। স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে রেল-লাইনের পাশে কাপড় জড়ানো একটা আঁতুড়ঘরের বাচ্চাকে পাওয়া গেছে।'

শোনামাত্র প্রায় ছুটে এসে রাজীব টেলিফোনের হাতলটা ধরল।

ছয়

টেলিফোন ধরেই রাজীব বলল,—'হ্যালো, কে বলছেন? অপর প্রান্ত থেকে গলা ভেসে এল—'আমি টাউন সাব-ইন্সপেক্টর সমাদ্দার বলছি স্যর।'

—'বাচ্চাটাকে কোথায় পাওয়া গেছে?' রাজীব প্রশ্ন করল। 'চন্দনপুর স্টেশনের কাছেই। রেল-লাইনের ধারে একটা ঝোপের পাশে কাপড়ের একটা পুঁটুলির মধ্যে বাচ্চাটা ছিল।—'

'বাচ্চাটাকে থানায় এনেছেন নিশ্চয়?' কান পেতে কি যেন শুনে রাজীব আবার বলল,—'ডেড্ চাইল্ড নয় তো?'

উত্তর শুনে রাজীবের মুখখানা উজ্জ্বল দেখাল। টেলিফোন রেখে অমিয় দত্তের মুখের দিকে তাকাতেই তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। অমিয়বাবুর মুখখানা রক্তশূন্য। ওঁর হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানি যে যথেষ্ট বেড়েছে, তা এখনই হলপ করে বলা যায়।

রাজীব বলল,—'আরে মশাই, আপনি এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? বেওয়ারিশ একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে বলেই এমনি ঝুলে পড়বেন? দেখুন না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

ধরাচূড়ো পরে দু মিনিটের মধ্যে তৈরি রাজীব। সুব্রতকে বলল,—'তুমি একটু বাড়িতে থেকো সুব্রত। আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরব।'

অমিয় দত্ত তখনও এক ঠ্যাঙে তালগাছের মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে।

রাজীব বলল,—'চলুন মশাই, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসবেন।' একটু হেসে ফের বলল রাজীব—'যা অবস্থা দেখছি আপনার। ঘরে রেখে গেলে তো ছটফটিয়ে মরবেন।'

অন্ধকার রাত। মাথার উপর শ্লেট রঙের কালো আকাশ। অসংখ্য, অগুনতি জ্বলজ্বলে তারা। দুধশাদা বিস্তীর্ণ ছায়াপথ মহাকাশে ন্যাশনাল হাইওয়ের আকৃতিতে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

জিপে উঠে রাজীব বলল, —'একটা কথা জিজ্ঞেস করব অমিয়বাবু?'

—'বলুন না', অমিয় দত্ত তাড়াতাড়ি বললেন।

—'আপনি তো ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তেমন কোনো শত্রু আছে আপনার?'

—'শত্রু মানে?' অমিয় দত্ত আমতা আমতা করলেন।

—'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ইন্সপেক্টরবাবু।' রাজীব এবার পরিষ্কার গলায় বলল,—'আপনার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারে, এমন কাউকে মনে হয়?'

অমিয় দত্তের বুকটা যেন কেঁপে উঠল। তিনি বললেন,—'তেমন কেউ থাকতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না।'

—'হুম', রাজীব নিজের মনে বলল, 'আচ্ছা আপনার ছেলে কোনো সম্পত্তি-টম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে?'

অমিয়বাবু সোজাসুজি বললেন,—'এরকম কোনো খবর তো আমার জানা নেই ইন্সপেক্টরবাবু। তাছাড়া তেমন কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় কোথায় আমার?'

—'আপনার স্ত্রীর সম্পর্কে?'

—'সেদিকটা তো একেবারেই ফাঁকা। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই এক বৎসরের মধ্যে গত হয়েছেন। তাদের বাড়ি-ঘর সব পাকিস্তানে। এখানে কিছুই করে উঠতে পারেননি। একটিই সম্বন্ধী। সে এখন কাজ করে দিল্লীতে। বাংলা দেশের সঙ্গে বলতে গেলে তার সম্পর্কই নেই।'

রাজীব হেসে বলল, —'তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

—'তার মানে?' অমিয় দত্ত বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

—'মানে আবার কী? আপনার ছেলে বেঁচে আছে এবং আপনারা তাকে ফিরে পাবেন।' রাজীব প্রায় জ্যোতিষীর মত ভবিষ্যদ্বাণী করল।

থানাতে এসেই একটা সিগারেট ধরাল রাজীব। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—'বাচ্চাটা কোথায়?'

টাউন সাব-ইন্সপেক্টর সমাদ্দার এগিয়ে এসে বলল,—'আনতে পাঠিয়েছি স্যর। আমাদের

সিপাইদের ব্যারাক ঝাঁটপাট দেয় একটা বুড়ি। বাচ্চাটাকে তার যত্ন-আত্তিতেই জিম্মা দিয়েছি।'

—'বেশ করেছেন।' রাজীব এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিল।

বাচ্চাটাকে আনতেই ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রাজীব। একদিনের বাচ্চা বড় জোর। মাথায় চুল-টুল প্রায় নেই। লালচে রং। কিন্তু সবল, পুষ্ট বেবি।

সমাদ্দার বলল,—'ঠিক সন্ধের পরই ইস্টিশানের একজন কর্মচারী ঐ পথ ধরে আসছিল। ছেলেটার চিৎকারে সে আকৃষ্ট হয়। পরে চেঁচামেচি করে লোকজন ডেকে আনে।' কয়েক সেকেন্ড পরে ফের বলল সমাদ্দার,—'ভাগ্যিস, তখনই ও ফিরছিল। নইলে আর একটু পরেই শেয়াল কুকুরে ওটাকে ছিঁড়ে খেত।'

রাজীব বলল,—'কাপড়ের সেই পুঁটুলিটা কোথায়? যার মধ্যে বাচ্চাটাকে শুইয়ে রেখেছিল।'

সমাদ্দারের কথামত একজন সিপাই নিয়ে এল পুঁটুলিটা। একটা ছেঁড়া সুতো-ওঠা কাঁথা আর এক টুকরো পুরোন কাপড় দিয়ে তৈরি ওটি। রাজীব পুঁটলিটা খুলে সেটাকে সজোরে ঝেড়ে ফেলল। কাঁথা আর কাপড়ের মধ্যে এক টুকরো ছোট কাগজ ছিল। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মেঝের উপর পড়ল সেটি। রাজীব খুব দ্রুত কাগজটি কুড়িয়ে নিল। পেন্সিলে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে অল্প কয়েকটি কথা কেউ লিখেছে। রাজীব একনজরে কাগজটি দেখেই সেটি পকেটস্থ করল।

অমিয় দত্তের মুখের দিকে চেয়ে রাজীব বলল,—'চলুন মশাই। মিছিমিছি খানিকটা সময় নষ্ট হল এখানে।'

সমাদ্দার বলল,—'বাচ্চাটাকে তাহলে স্যর?'

রাজীব অল্প একটুক্ষণ ভেবে জবাব দিল,—'দেখুন না, কটা দিন ওকে যদি ওই বুড়ির হেপাজতেই রাখা যায়। তারপর একটা ব্যবস্থা করলেই হবে।'

অমিয় দত্ত বললেন, —'বাচ্চাটা কেমন করে ওখানে এল ইন্সপেক্টরবাবু?'

রাজীব প্রায় ধমক দিয়ে বলল,—'সে খোঁজে আপনার কী দরকার মশায়? কৌতূহল একটা মেয়েলি দোষ। ওটা বর্জন করে ফেলুন।'

ফেরার পথে রাজীব বলল,—'অমিয়বাবু, আপনি জগদীশ রায় বলে কোনো লোককে চেনেন?'

—'জগদীশ রায়!' অমিয় দত্ত তাড়াতাড়ি বললেন,—'বিলক্ষণ চিনি। ডাক্তার দাসের চেম্বারেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ। রীতিমত ধনী ব্যক্তি। ওঁর স্ত্রীকে দেখাতে আনতেন ওখানে। তারপর এই তো, কাল সকালেই দেখা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। হাসপাতালে পর্যন্ত এলেন।'

—'হাসপাতালে উনি এসেছিলেন নাকি?'

—'হ্যাঁ। আমার স্ত্রী আর বাচ্চাটাকে দেখে গেলেন। জানেন ইন্সপেক্টরবাবু, ঠিক আগের দিন রাতে জগদীশবাবুরও একটি ছেলে হয়েছে। ডাক্তার দাস নিজে গিয়েছিলেন ডেলিভারির জন্য।' একটু থেমে অমিয়বাবু আবার বললেন, 'ডাক্তার দাস একবার বলেছিলেন কথাটা। সম্ভবত আমাদের দুজনেরই ছেলে বা মেয়ে একই শুভক্ষণে জন্মাবে।'

দাঁত চিপে রাজীব মন্তব্য করল, —'হ্যাঁ, শুভক্ষণই বটে।'

পরদিন সকালে উঠে সুব্রতকে বলল রাজীব,—'তোমাকে একবার কলকাতা যেতে হবে সুব্রত।'

—'কলকাতা হঠাৎ?' সুব্রত বিস্মিত হয়েছে মনে হল।

—'ব্যাপারটা গোপনীয়। তুমি কাছে এস, আমি বুঝিয়ে বলছি।'

কথা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে সুব্রত বলল,—'ওরে বাবা! তলে তলে এত কাণ্ড। সত্যি রাজীবদা, আপনি দেখছি তিলকে তাল করে তুলতে পারেন।'

রাজীব বলল,—'প্রথম কাজটা কঠিন নয়। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবে। নিরিবিলিতে আমি একটু কথা বলতে চাই।' একটা কাগজে ডাক্তারের নাম ঠিকানা

লিখে ওকে দিল রাজীব।

কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে সুব্রত বলল,—'এতো দেখছি একজন প্যাথলজিস্ট্। চন্দনপুরে কি প্যাথলজিস্ট্ পেলেন না রাজীবদা?'

কোনো মন্তব্য না করে রাজীব শুধু একটু হাসল। বলল,—'দ্বিতীয় কাজটা কিন্তু একটু কঠিন। ছদ্মবেশটা নিখুঁত না হলে তোমার কিন্তু মারধোর খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

কথা শেষ করে রাজীব বেরিয়ে পড়ল। কার্তিকের মিষ্টি সকাল। চন্দনপুর ছাড়িয়ে পথ বেশ ফাঁকা। দুপাশে অবারিত মাঠ,—পক্কশস্যভারে ধানের গাছ মাঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে। আকাশে উজ্জ্বল রোদের আসর। দু'একটা জায়গায় ইতিমধ্যেই ধানকাটা শুরু হয়েছে।

জগদীশ রায়ের বাড়িটা মাইল দেড় দূরে। ছোট একতলা বাড়ি। পিছনে পুকুর। চারপাশে বাগান। পুকুরের চারধারে অনেক কলাগাছ। তারপরই ধানক্ষেত।

বাগানটা নির্জন। কুক্ কুক্ পাখির ডাক। লোকজন কাউকে না দেখতে পেয়ে রাজীব সজোরে হর্ন টিপল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জগদীশ রায়। রাজীবকে ঠিক আশা করতে পারেননি ভদ্রলোক। প্রথমে চিন্তা, পরে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বললেন,—'আরে! আপনি হঠাৎ? আসুন, আসুন,—'জগদীশ রায় ব্যস্ত হলেন।

রাজীব হেসে বলল,—'ডাক্তার দাস আমাকে পাঠালেন। কাল ওঁর চেম্বারে কতকগুলো কাগজপত্র ফেলে এসেছিলেন। আমি এদিকে আসব শুনে ওগুলো আমাকে দিলেন।'

কথা শেষ করেই রাজীব কাগজগুলো জগদীশ রায়ের হাতে দিল।

জগদীশ রায় তাড়াতাড়ি বললেন,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাল, বাড়ি এসে আর কাগজগুলো কিছুতেই খুঁজে পাই না। মনে হল ডাক্তার দাসের কাছে একবার খোঁজ করি। কিন্তু আমার এখানে টেলিফোন নেই। তাই খোঁজ নেওয়া আর সম্ভব হয়নি।'

রাজীব বলল,—'আপনার বাড়িটি বেশ সুন্দর। প্রায়ই এখানে আসেন নাকি?'

—'মাঝে মাঝে আসি। কিছুদিন ধরে এখানে থাকলেও খারাপ লাগে না আমার। হইচই নেই, গণ্ডগোল কম। মানে কোনো ডিসর্টাবেন্স পাবেন না।' একটু থেমে সখেদে বললেন জগদীশবাবু—'কিন্তু কাজে কর্মে এত ব্যস্ত থাকি ইন্সপেক্টরবাবু, যে কলকাতা থেকে বেরোবার ফুরসতই পাই না।'

—'এবার বোধহয় অনেকদিন রয়ে গেলেন এখানে? কাজকর্মের নিশ্চয় খুব ক্ষতি হল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্ষতি তো হচ্ছেই। কর্মচারীদের উপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে আসা। কিন্তু উপায় নেই। তবে আমার স্ত্রী একটু সুস্থ হলেই কলকাতা যাব।'

—'কলকাতা থেকে আপনি কি একজন নার্স এনেছেন?' জগদীশ রায় ঈষৎ হেসে বললেন—'আপনি কেমন করে জানলেন?'

—'ডাক্তার দাস বলেছিলেন কাল। হাসপাতাল আর নার্সিং হোমের উপর আপনার নাকি একটুও আস্থা নেই। তাই ডাক্তার দাসের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাও ডেলিভারির ব্যবস্থা বাড়িতে।'

—'ঠিকই শুনেছেন।' জগদীশ রায় বললেন,—'আসলে কি জানেন? বাঁচা-মরা সব ঈশ্বরের হাত। সেই কারণেই কলকাতা আর চন্দনপুর, হাসপাতাল আর ঘর সব আমার কাছে এখন এক হয়ে গেছে।'

ইতিমধ্যে চাকর এসে চা রেখে গেল টেবিলে। অন্য একটি ডিসে কয়েকটি সুদৃশ্য বিস্কিট। ঘাড় ঘুরিয়ে চাকরটাকে দেখল রাজীব। বছর চল্লিশ কিংবা আরো কিছু বেশি বয়স ওর। সম্ভবত পুরাতন ভৃত্য।

রাজীব বলল,—'এখানে কে কে আছেন আপনারা?'

—'আমরা স্বামী-স্ত্রী, একজন চাকর আর নার্স।' জগদীশ জবাব দিলেন।

—'বাচ্চা কেমন আছে? কোনো কমপ্লেন-টমপ্লেন নেই তো?'

—'তেমন কোনো কমপ্লেন নেই। তবে পেটে একটু ফাঁপ হয়েছিল কাল রাত্তিরে। তাই কান্না জুড়েছিল। শেষে আধ চামচে ওষুধ দিতেই সুস্থ হয়ে ঘুমোল।'

সামনে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। বছর তিরিশ বয়স। ডান দিকের চোখের উপর ইঞ্চি-খানেক কাটা দাগ। ডিমালো মুখ, মাঝারি গড়ন। গায়ের রং ঠিক কালো নয়,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

মেয়েটি বলল,—'সকাল থেকে ছেলেটার আবার পেটে ফাঁপ হয়েছে। কান্নাকাটি করছে, দেখুন যদি ডাক্তারকে খবর দেবেন।'

জগদীশ রায়কে একটু বিরক্ত মনে হল। তিনি বললেন,—'আচ্ছা, তুমি ভিতরে যাও। যা ব্যবস্থা করবার আমি করছি।'

রাজীব বলল—'এই মেয়েটিই তো নার্স। কলকাতার কোনো হাসপাতালে আছেন নিশ্চয়?'

জগদীশ রায় অন্যমনস্কের মত বললেন,—'হাসপাতালের নার্স নয় ও। এমনি, মানে প্রাইভেট নার্স। আমার এক বন্ধু ওকে দিয়েছেন।'

রাজীব বলল,—'আচ্ছা উঠি তাহলে জগদীশ বাবু।' নমস্কার করে কৌতূহলি দৃষ্টিতে জগদীশ রায়ের আঙুলের দিকে তাকাল রাজীব।' বিস্ময়ের সঙ্গে বলল,—'আপনার সেই পুরোনো আংটিটা কী করলেন? ফেলে দিয়েছেন নাকি?'

খুব গম্ভীর মুখ করে জগদীশ রায় বললেন,—'না খুলে রেখেছি।'

জিপ এসে থামল পরেশ ডাক্তারের চেম্বারের সামনে। হাসপাতালে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন ডাক্তার। রাজীবকে দেখে তার চোখ দুটো যথারীতি ক্ষুদ্র হয়ে এল।

চেয়ারে বসল না রাজীব। ডাক্তারের কাছে এসে বলল,—'জগদীশবাবুর ছেলের পেটে ফাঁপ হয়েছে। একবার দেখে আসুন।' কথা শেষ করে ডাক্তারের কানের কাছে মুখ নিয়ে আরো কিছু বলল রাজীব।

—'পেটে ফাঁপ? তাহলে তো একজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট্ পাঠাতে হয়।' একটু থেমে পরেশ ডাক্তার বললেন,—'কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার মশাই। আপনি দেখছি আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বেন। ঠিক আছে, রাত নটার মধ্যেই খবর পেয়ে যাবেন। বাচ্চা কেমন রইল, তাও জানিয়ে দেব।'

বিকেলের একটু আগেই একজন ফিরিওয়ালা এসে ঘরে ঢুকল। ওর দিকে তাকিয়ে বকরূপী ধর্মের মত প্রশ্ন করল রাজীব,—'কা চ বার্তা?'

কাঁধ থেকে ছোট ঝোলাটা নামাল সুব্রত। তারপর নকল গোঁফ আর ফিরিওয়ালার পোশাক খুলতে খুলতে বলল,—'বার্তা কি আবার?'

—'মারধোর আমি যা বলেছিলাম, তাই খেয়েছ নাকি?'

—'পাগল হয়েছেন? মারধোর খাবার সম্ভাবনা থাকলে আমি সেখানে দাঁড়াই?' সুব্রত সগর্বে জানাল।

—'বাজে কথা রাখো। কি সংবাদ বলো—'

সত্যি অবাক কাণ্ড রাজীবদা। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। শ্রীমতী রুমা ঘোষ বাচ্চা কোলে নিয়ে আদর করছেন। পাড়ার একটা বুড়িঝিও সেই কথা বলল। কদিন আগেই দিদিমণির খোকা হয়েছে।'

—'হুম', রাজীব গম্ভীর মুখে জবাব দিল।

ঠিক সন্ধের পর সমাদ্দার এল ক্লারা সিম্পসনের কাছে। বাজার থেকে কয়েকটা জিনিস কিনে ক্লারা সবে ঘরে পা দিয়েছে। এমন সময় দরজায় কড়া বাজল।

মুখ বাড়িয়ে দেখল ক্লারা। বাইরে পুলিশের পোশাক পরে কে যেন দাঁড়িয়ে। মুখ শুকনো করে ক্লারা শুধু বলল,—'কাকে চান?'

সমাদ্দার বলল,—'আপনি একবার থানায় চলুন মিস সিম্পসন।'

—'থানায় কেন?' ক্লারা চমকে উঠে বলল।

—'প্রয়োজন আছে।' সমাদ্দারের গলা গম্ভীর শোনাল।

থানাতে বড় দারোগার ঘরে রাজীব সান্যাল একা। ঘরে পা রেখে ক্লারা সিম্পসন একটা চেয়ার ধরে দাঁড়াল।

লঘু স্বরে রাজীব বলল,—'কী, সব কথা স্বীকার করবেন তো মিস সিম্পসন? দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়ুন।'

—'কী কথা স্বীকার করব আপনার কাছে?' ক্লারা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল।

রাজীব ধমক দিল ওকে—'মিথ্যে কথা চাপবার চেষ্টা করলে সমস্ত রাত আপনাকে হাজতবাস করতে হবে মিস সিম্পসন।' অঙ্গুলি সঙ্কেতে ক্লারাকে হাজত ঘরটা দেখাল রাজীব।

কিন্তু ক্লারা সিম্পসন অটল। তাকে নোয়ানো কঠিন।

—'কাল দুপুরে কলকাতায় কেন গিয়েছিলেন আপনি?'

—'আমি কলকাতায়, মানে—' ক্লারা ভীতকণ্ঠে বলল।

ব্যঙ্গ করে রাজীব বলল,—'কেন, টাকার সেই খামটার কথা ভুলে গেলেন এরই মধ্যে?' একটা চোখ ছোট করে রাজীব যোগ করল,—'রিচার্ডের দোকানটাও আমি চিনি মিস সিম্পসন।'

ক্লারা সিম্পসনের মুখখানা পাণ্ডুর রক্তশূন্য হয়ে এল। কী একটা কথা বলতে গিয়ে ঝরঝর কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্লারা।...

রাত দশটার পর টেলিফোন তুলে চন্দনপুর হাসপাতালকে চাইল রাজীব। সুপারিনটেনডেন্ট রজতকান্তিকে প্রয়োজন তার।

অপরপ্রান্ত থেকে গলা ভেসে এল,—'হ্যালো, আমি ডাক্তার আইচ বলছি।'

রাজীব বলল,—'মেন্ডেলস ল অফ হেরিডিটিটা আমাকে এখন একটু বুঝিয়ে দেবেন ডাক্তার আইচ?'

—'এত রাত্তিরে ল অফ হেরিডিটি? কী ব্যাপার মশায়। আপনি হঠাৎ ডাক্তারি শিখতে চাইছেন কেন?' রজতকান্তি বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

হেসে বলল রাজীব,—'আপনার হাসপাতালের নিখোঁজ বেবিকে যে পেয়ে গেছি ডাক্তার আইচ। কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে গেলে ডাক্তারি-শাস্ত্রের বেশ কিছুটা জানা দরকার।'

সাত

ছেলে চুরির মামলা। দায়রা আদালতে বিচার। সমস্ত শহরে হইচই। কোর্ট ঘরটা মানুষের মাথায় গিজগিজ করছে। এমন চাঞ্চল্যকর একটি মামলা বহুদিন আদালতে ওঠেনি। শহরের লোকেদের মুখে এখন এই মামলার কথা। হিরে-মণি-মাণিক্য নয়, হাসপাতাল থেকে জলজ্যান্ত একটা ছেলে চুরি। তাও ছেলেটা মাত্র একদিনের।

আসামীর দিকে একবার তাকালেন জজসাহেব। তারপর ওর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগগুলি

পড়ে গেলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী সব শুনল। কিন্তু আশ্চর্য! ওর কোনো ভাবান্তর হল না।

পাবলিক প্রসিকিউটর রাজীবের কাছ থেকে দরকারি কয়েকটি কথা জেনে নিচ্ছিলেন। আসামীর পক্ষে জেলার নামকরা ফৌজদারী উকিল তপেন তরফদার। ঘাড় ঘুরিয়ে রাজীব মাঝে মাঝে তরফদারকে দেখছিল। কী যেন চিন্তা করছে তরফদার। ঝোপ বুঝে একটি কোপ চালিয়ে মামলা কাঁচিয়ে দিতে তরফদারের জুড়ি নেই।

যথারীতি আসামীকে প্রশ্ন করলেন জজসাহেব । সে কি দোষ স্বীকার করছে? অর্থাৎ গিল্টি আর নট গিল্টি—।

এতক্ষণ মাথাটা ঝুঁকে ছিল ওর। জজসাহেবের প্রশ্ন শুনে আসামী মাথা তুলল। লোকটি এই মামলার প্রধান আসামী। দীর্ঘ, পরিচ্ছন্ন চেহারা। ছেলে চুরির দায়ে এমন একজন ভদ্রলোককে অভিযুক্ত করা যেতে পারে, তা যেন কোর্টঘরে উপস্থিত মানুষজনের বিশ্বাস হতে চায় না।

পাবলিক প্রসিকিউটর একদৃষ্টে চেয়েছিলেন আসামীর দিকে। জজসাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে এত দেরি করছে কেন আসামী? তাহলে কি ও দোষ স্বীকার করছে? পরিষ্কার গলায় বলবে, যে সে গিল্টি।

জজসাহেব চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতেই আসামী মুখ খুলল। সমস্ত আদালত ঘরটা নিস্তব্ধ। হঠাৎ ঘুমন্ত নিশীথ রাতের এক ঝলক হাওয়া এসে যেন সকলকে সুপ্তির দ্বারে ঠেলে দিয়েছে।

চোখ ঘুরিয়ে সমস্ত আদালত ঘরটা একবার লক্ষ্য করল লোকটি। তারপর জজসাহেবের দিক চেয়ে সে ধীরে ধীরে বলল,—'নট গিল্টি'। অর্থাৎ সে নির্দোষ। মিথ্যা অভিযোগে জড়িত।

সরকার পক্ষের উকিলের কপালে কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। আশ্চর্য কিছু নয়। সমস্ত মামলাটাই হয়তো মনগড়া, পুলিশের সাজানো। আর কারসাজি। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অভিযোগের সপক্ষে সরকারপক্ষের প্রথম বক্তব্য রাখার কথা। এবং আদালতের কাছে পুলিশের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর গাছ-কোমর বেঁধে তৈরি।

হঠাৎ আসামীপক্ষের উকিল তপেন তরফদার উঠে দাঁড়ালেন। বিস্মিত জজসাহেব বললেন, —'এনি কোয়েশ্চেন মিঃ তরফদার?'

তরফদার হেসে মাথা নাড়লেন। বিচারকের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—'ইয়োর অনার, সরকারপক্ষের বক্তব্য পেশ করবার আগে ডিফেন্সের তরফ থেকে দু'জন সাক্ষীকে আমি আপনার কাছে হাজির করতে চাই।'

রাজীবকে চিন্তিত দেখাল। পাবলিক প্রসিকিউটর নির্বাক। প্রসিকিউশনের সপক্ষে সরকারের বক্তব্য এবং যুক্তি দেখানো শেষ হবার আগেই আসামী তার পক্ষের সাক্ষীদের হাজির করতে চাইছে কেন?

জজসাহেব রাজি হলেন। তপেন তরফদার তাঁর প্রথম সাক্ষীকে হাজির করলেন। বিচারকের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন তরফদার—'ইয়োর অনার। আসামীর পক্ষে প্রধান সাক্ষী বিখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পরেশ দাস। এই একজন সাক্ষীর মুখের কথা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, পুলিশ কীভাবে একজন মাননীয় ভদ্রব্যক্তিকে শুধুমাত্র হয়রানি করবার উদ্দেশ্যে এই মামলায় জড়িয়েছে। মহামান্য আদলতের কাছে আমার নিবেদন, যে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সঠিক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হোক।'

সরকার পক্ষের উকিল কী যেন বলতে চাইছিলেন। কিন্তু আদালতের কাছে তার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হ'ল। আসামীর উকীলকে নির্দেশ দিলেন জজসাহেব—'প্লিজ্ ক্যারি অন মিঃ তরফদার।'

তপেন তরফদার বলে চললেন—'ইয়োর অনার, সংক্ষেপে এই মামলার ইতিহাস আদালতের

কাছে আমি উপস্থাপিত করছি। আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে চন্দনপুর হাসপাতালের তারিণী দেবী ওয়ার্ডের দু নম্বর বেডের পেশেন্ট শ্রীমতী অমলা দত্তের একটি পুত্র-সন্তান হয়। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। ঠিক পরদিন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হবার কিছুটা বিলম্বে, আনুমানিক রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ওয়ার্ড থেকেই শিশুটি চুরি যায়। পেশেন্টদের কাছে তখন যে নার্সের থাকবার কথা, সেই ভদ্রমহিলা ঐ সময়ে ওয়ার্ডে ছিলেন না। কোনো প্রয়োজনে ওয়ার্ড ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন তিনি। সরকারপক্ষের অভিযোগ, আমার মক্কেল অর্থাৎ এই মামলার এক নম্বর আসামী শ্রীজগদীশ রায় একটি মেয়ের সহায়তায় বাচ্চাটিকে চুরি করে তার বাড়িতে নিয়ে যান।

তপেন তরফদার তার হাতের ব্রিফটা টেবিলে নামিয়ে রেখে পুনরায় শুরু করলেন,—'পুলিশের এই অভিযোগ যে কত ভিত্তিহীন তা এই সাক্ষীর জবানবন্দি শুনলে মহামান্য আদালত সহজেই উপলব্ধি করবেন।'

সাক্ষীর কাছে গিয়ে তরফদার প্রশ্ন করলেন,—'আসামীকে আপনি চেনেন মিঃ দাস?'

—'চিনি। ওঁর স্ত্রী মিসেস রায় আমার পেশেন্ট।'

—'কোনো রোগের ব্যাপারে পরামর্শ করতে কি আপনার চেম্বারে গিয়েছিলেন ওঁরা?'

—'আজ্ঞে না। মিসেস রায় তখন গর্ভবতী, —আই মিন শি ওয়াজ ক্যারিং। তাই আমার চেম্বারে এসেছিলেন।'

—'ডাক্তার হিসেবে আপনি রোগিণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলেন নিশ্চয়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কয়েকবার আমি মিসেস রায়কে পরীক্ষা করেছি। প্রয়োজন মত নির্দেশও দিয়েছি।'

'ডেলিভারির সময় আপনাকেই কি কল দেওয়া হয়?'

—'হ্যাঁ, মিঃ রায়ের ইচ্ছে ছিল যে ডেলিভারি তার বাড়িতেই হবে এবং সেইরকম বন্দোবস্তও করা হয়। সন্ধের পর ওর লোক মারফত পেন উঠবার সংবাদ পেয়েই আমি মিঃ রায়ের বাড়িতে যাই।'

জজসাহেব সাক্ষীর মুখের দিকে তাকালেন।

চিন্তাচ্ছন্ন হতেই ডাক্তার পরেশ দাসের চোখ দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি হল। সাক্ষীর আসনে দাঁড়িয়ে পরেশ ডাক্তার বললেন—'আমি গিয়ে পৌঁছবার ঘণ্টা দুই পরেই মিসেস রায়ের একটি পুত্রসন্তান হ'ল।'

—'নর্মাল ডেলিভারি নিশ্চয়?' তরফদার প্রশ্ন করলেন।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। কোনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়নি।'

তপেন তরফদার বিচারকের দিকে চেয়ে বললেন,—'ইয়োর অনার, নবজাতক তার মা অর্থাৎ মিসেস রায়ের কোলে আদর-যত্নে এতদিন বড় হচ্ছিল। কিন্তু পুলিশের হাস্যকর অভিযোগ যে বাচ্চাটি রায়-দম্পতির নয়। হাসপাতাল থেকে বাচ্চাটিকে চুরি করে জগদীশ রায় তার স্ত্রীর কোলে ওকে তুলে দিয়েছেন। এবং মানবকটিকে নিজের সন্তান বলে সকলের কাছে মিথ্যে প্রচার করছেন। ইয়োর অনার এই অভিযোগ যে কত ভিত্তিহীন তা নিশ্চয়ই আদালতের কাছে আমাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তবু আর একজন সাক্ষীকে আমি আদালতের কাছে হাজির করব। ইনি ডাক্তার দাসের সঙ্গে ডেলিভারি কেসে গিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা চন্দনপুর হাসপাতালের একজন নার্স, —নাম শ্রীমতী বিশাখা পাল।

সাক্ষ্য দিতে উঠে বিশাখা পালও সেই কথাই বলল। সেদিন রাতে ডাক্তার দাসের সঙ্গে জগদীশ রায়ের বাড়িতে গিয়েছিল সে। তারা যখন গিয়ে পৌঁছল, মিসেস রায় তখন প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির। ঘণ্টা দুই পরেই ফুটফুটে একটি ছেলে হল মিসেস রায়ের। বিশাখার মনে আছে পুত্রলাভের খবরটা দিতেই মিসেস রায় খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—'ছেলে বেশ ভাল আছে তো?'

তপেন তরফদার কালো ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন,—'ইয়োর অনার, আসামী পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষীর মুখের কথা শুনবার পর সমস্ত ব্যাপারটা নিশ্চয় আদালতের কাছে পরিষ্কার এবং প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। কেমন করে পুলিশ একজন নির্দোষ ভদ্রলোককে এই মামলার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে পৃথিবীর জঘন্য হীনতম কু-কার্যের নায়করূপে চিহ্নিত করতে অগ্রসর হয়েছে তা আদালত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। তাই আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা যে আসামী জগদীশ রায়কে সসম্মানে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে তার যোগ্য মর্যাদায় পুনরায় ফিরে যেতে দিন।'

তরফদার বসে পড়তেই আদালত ঘরে একটা গুঞ্জন উঠল। কিছু লোককে অশান্ত মনে হল। পুলিশের অভিযোগ সম্বন্ধে অনেকেই যেন সন্দিহান। মামলাটা সাজানো বলে মনে হচ্ছে। গোলমাল একটু বেশি হতেই জজসাহেব বলে উঠলেন—'অর্ডার অর্ডার।'

প্রসিকিউশনের পক্ষে বলতে ওঠে, পাবলিক প্রসিকিউটর শুরু করলেন—'ইয়োর অনার। আমার বন্ধু স্বনামধন্য তরফদার মহাশয় আসামীর পক্ষে বলতে উঠে কেসটার ইতিহাস অনেকখানি বলেছেন। তাতে সরকার পক্ষের সুবিধেই হয়েছে। বস্তুত, এই মামলাটি বিচিত্র—এর নজির মেলা দুষ্কর। ছেলে চুরির কেস আমাদের দেশেও কিছু নতুন নয়। কিন্তু এমন সুন্দরভাবে পূর্বপরিকল্পিত উপায়ে একটি বাচ্চাকে কৌশলে হাসপাতাল থেকে চুরি করে নিজের স্ত্রীর কোলে তুলে দেওয়াটা অভিনব তো বটেই—এর দৃষ্টান্ত বিরল।'

একটু থেমে সরকারপক্ষের উকিল রাজীবকে কী যেন প্রশ্ন করলেন। কথা শুনে নিজের ফোলিও ব্যাগটা হাতড়ে কয়েকটা কাগজ বের করল রাজীব। উকিল কাগজগুলি ওর হাত থেকে তুলে নিয়ে বলতে শুরু করলেন—'ইয়োর অনার, আমার বন্ধুর যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য। যে রাতে শ্রীমতী অমলা দত্তের একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে ঠিক সেই রাতে রায়-দম্পতিও একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেছেন। সুতরাং হাসপাতাল থেকে অপরের সন্তান চুরি করবার প্রশ্ন অন্তত জগদীশ রায়ের বেলায় ওঠে না। পুত্ররত্ন যিনি লাভ করেছেন, অপরের পুত্র হরণের চৌর্য মনোভাব তাঁর হবে কেন?'

পাবলিক প্রসিকিউটর বিচারকের দিকে চেয়ে বললেন,—'কাজেই সর্বপ্রথম আমি প্রমাণ করব রায়-দম্পতি যে পুত্র সন্তানটিকে নিজেদের বলে দাবি করেছেন, ওটি আসলে তাঁদের নয়।'

আদালত ঘর স্তব্ধ। মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত শান্ত। উকিল ভদ্রলোক বলে চললেন—'ইয়োর অনার, আমি আগেই বলেছি যে মামলাটি অসাধারণ এবং অভিনব বললে অত্যুক্তি হয় না। যে অফিসার এর তদন্ত পরিচালনা করেছেন, তার নিষ্ঠা এবং বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না।' আমি আবার বলছি যে মামলাটি জটিল এবং এই কেসে আসামীদের অপরাধ প্রমাণ করতে হলে মেডিকেল সায়েন্সের কয়েকটি জটিল বিষয়বস্তুর অবতারণা না করে উপায় নেই। একমাত্র কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাহায্যেই চন্দনপুর হাসপাতাল থেকে নবজাতকের অন্তর্ধান রহস্যের উপর আলোকপাত করা সম্ভব।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে সওয়াল করছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর। '—মহামান্য আদালত এবং উপস্থিত সকলের নিশ্চয়ই অজানা নয় যে আমাদের শিরায় উপশিরায় ধমনীতে এবং দেহের কোষে কোষে পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত। বংশপরম্পরায় সেই রক্তের বিশেষ অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চিকিৎসা বিজ্ঞান বেশ কিছুটা অগ্রসর। অন্তত পিতামাতা এবং সন্তানের ক্ষেত্রে প্রবহমান এই রক্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য চিকিৎসা বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে। এই সূত্র ধরে অগ্রসর হয়ে আদালতের কাছে সরকার প্রমাণ করবেন যে শিশুটি রায়-দম্পতির হওয়া অসম্ভব। বরং বাচ্চাটি শ্রীমতী অমলা দত্তের গর্ভজাত হতে পারে।'

বিচারক বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন,—'ভেরি ইমপরট্যান্ট পয়েন্ট। শুধু ব্লাড রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এটা প্রমাণিত হবে?'

তরফদারের দিকে চেয়ে ঈষৎ হাসল রাজীব। অকস্মাৎ আক্রমণে তরফদারকে বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন—'ইয়োর অনার, আমাদের দেহের রক্তকে মোটামুটিভাবে চারটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। এগুলিকে যথাক্রমে গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ ও এবং গ্রুপ এ-বি বলা হয়। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে একটি বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। চিকিৎসকরা একে অ্যাগ্লুটিনোজেন নামে অভিহিত করেন। বাপ মায়ের ব্লাড—গ্রুপের সঙ্গে সন্তানের ব্লাড গ্রুপের একটি বিশেষ সম্বন্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ পিতা-মাতার যে ব্লাড—গ্রুপ সন্তানের রক্তও তার যে কোন একটি বিভাগের মধ্যে আসতে বাধ্য। আমাদের এই মামলায় রায়-দম্পতির উভয়েরই ব্লাড—গ্রুপ ও। কিন্তু শিশুটির ব্লাড—গ্রুপ বি। দেশের যে কোন নামী চিকিৎসক এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে আহ্বান করলে আদালত নিশ্চয়ই বুঝবেন যে এক্ষেত্রে শিশুটি কখনও রায়-দম্পতির হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়।

একটু থেমে পাবলিক প্রসিকিউটর অমিয় দত্তের দিকে অপাঙ্গে তাকালেন। পরে জজসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন,—'ইয়োর অনার আমরা জেনেছি শ্রীযুক্ত দত্তের ব্লাড গ্রুপ এ এবং শ্রীমতী দত্তের ব্লাড গ্রুপ বি। আবার শিশুটির ব্লাড গ্রুপ বি। কাজেই শিশুটি দত্ত-দম্পতির সন্তান হওয়া অসম্ভব নয়।'

বিচারক প্রশ্ন করলেন—'যদি স্বীকার করে নেওয়া যায়, যে শিশুটি রায়-দম্পতির সন্তান নয়, তাহলেও আসামী জগদীশ রায় যে এই শিশুটিকেই হাসপাতাল থেকে অপহরণ করেছেন তার প্রমাণ কী?'

সরকার পক্ষের উকিল ঈষৎ হেসে বললেন, 'যথার্থ কথা বলেছেন ইয়োর অনার। সে প্রমাণ নিশ্চয়ই আমরা আদালতের কাছে হাজির করব।'

আট

কোর্ট থেকে বেরিয়ে পরেশ ডাক্তার বললেন,—'আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক রাজীববাবু। এই জন্যই বুঝি বাচ্চাটার কোন ব্লাড-গ্রুপ, তা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন?'

কোনো উত্তর না দিয়ে রাজীব মৃদু হাসল।

গোলগাল রজতকান্তি বললেন,—'অমিয় দত্ত আর অমলা দেবীর ব্লাড-গ্রুপগুলি উনি আমার সাহায্যে জেনে নিয়েছেন। কিন্তু জগদীশ রায় আর তার মিসেসের ব্লাড-গ্রুপের খোঁজ আপনি কোথা থেকে পেলেন মশাই?'

এবার রাজীব মুখ খুলল,—'তদন্তের ব্যাপারে কপাল বস্তুটির একটা মস্ত বড় ভূমিকা। অবশ্য চেষ্টা আর পরিশ্রমও দরকার। লেগে থাকলে খড়গাদায় ছুঁচও খুঁজে বের করা যায়। ইনভেস্টিগেশনও ঠিক তাই। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দু-একটা ক্লু হাতে আসে যে নিজেরাই আশ্চর্য না হয়ে পারি না।'

এক মুহূর্ত থামল রাজীব। পরেশ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল,—'সত্যি, চেষ্টা করলে কত কিছু জানতে পারা যায় ডাক্তার দাস। এর আগে কলকাতায় নার্সিং হোমে শ্রীমতী রায় তো আরো কয়েকবার গিয়েছেন। দু বার ওকে রক্ত দেবারও প্রয়োজন হয়েছিল।'

—'তাই নাকি?' রজতকান্তি সোজা হয়ে বসল।

একটা চোখ অল্প একটু ছোট করে রাজীব বলল,—'আপনার বাড়িতে এক তাবড়া কাগজ ফেলে গিয়েছিলেন জগদীশ রায়। সে কথা আপনার মনে আছে ডাক্তার দাস?'

—'বিলক্ষণ! কিন্তু ওর মধ্যে কি কাগজ ছিল?

—'ছিল কিছু।' রাজীব চোখ নাচিয়ে বলল। 'কলকাতার কয়েকজন ডাক্তার, প্যাথলজিস্ট যাঁরা রায় পরিবারের চিকিৎসা করেছেন, কাগজগুলো পড়ে তাদের ঠিকানা পেলাম। এমন কি দুটো নার্সিং হোমের খোঁজ পর্যন্ত।—'

সুব্রত এগিয়ে এসে বলল,—'আপনার হাতযশ আর কেরামতির সঙ্গে কপালের কথাটাও স্বীকার করুন রাজীবদা। রায়-দম্পতির কারো, ব্লাড-গ্রুপ বি হলে কিন্তু আপনার কেসই টিকত না!-'

—'বারে, সে কথা তো আগেই বলেছি।' রাজীব আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল।

পরদিন আদালতে আরো ভিড়। পাবলিক প্রসিকিউটর পুলিশের অভিযোগ খাড়া করতে আরো সব প্রমাণ হাজির করবেন। বিচিত্র এই মামলার ফলাফল জানতে চন্দনপুরের সমস্ত লোকই অধীর এবং উৎসুক।

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন,—'ইয়োর অনার! এই কেসে আসামীর অপরাধ প্রমাণ করতে হলে, তার এই শিশু-অপহরণের পিছনে কি মোটিভ বা উদ্দেশ্য ছিল, তা ভালো করে জানা দরকার। আনুপূর্বিক সমস্ত ইতিহাসটা ঘটনার ঘনঘটায় বিচিত্র তো বটেই, রীতিমত চাঞ্চল্যকর! আসামী জগদীশ রায় ধনী ব্যক্তি। কলকাতায় দু-তিনটি ব্যবসার মালিক। বিভিন্ন কলকারখানা, কোলিয়ারি এবং চা-বাগিচায় কিছু শেয়ারও তাঁর রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় একটি বড় বাড়িও তার। চন্দনপুরের অদূরে সুন্দর বাগান বাড়িটি—জগদীশ রায়ের সুরুচিরই সাক্ষ্য বহন করে। ইয়োর অনার, ঈশ্বর জগদীশ রায়কে সব দিয়েছেন। ঐশ্বর্য, সম্পদ,—মানুষ যা কামনা করে সব কিছু। কিন্তু এই সঙ্গে একটি নির্মম অভিশাপও তার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। জগদীশ রায় একাধিকবার সন্তান-শোক পেয়েছেন। কখনও মৃত সন্তান, কখনও বা সন্তান জন্মাবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে মা-বাপকে পরিত্যাগ করে গেছে। জগদীশ রায়ের গৃহ শিশুর হাসি-কান্নায় ভরা স্বর্গ হতে প্রতিবারই দূরে, বহুদূরে থাকল।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে পাবলিক প্রসিকিউটর শুরু করলেন,—'ইয়োর অনার, ডাক্তার দাসের কাছে আসামী জগদীশ রায় অবশ্য এত কথা বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে বছর সাতেক আগে তাদের একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। এবং বাচ্চাটি জন্মের পরই নিমোনিয়া হয়ে মারা যায়। ডাক্তারের চিকিৎসা এবং চেষ্টার কিছু ত্রুটি ছিল বলেই জগদীশবাবুর ধারণা। হাসপাতাল আর নার্সিং হোমের উপর সেজন্যই তার আস্থার অভাব। তাই বাড়িতে রীতিমত বিখ্যাত ধাত্রী বিদ্যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে স্ত্রীর ডেলিভারির ব্যবস্থা করেছিলেন জগদীশ রায়। ব্যাপারটা এ পর্যন্ত সহজ, সরল। কিন্তু আসামী জগদীশ রায় অনেক কথাই চেপে গিয়েছেন। সাত বৎসর আগে তার একটি পুত্র সন্তান হয়ে মারা যায়। একথা ঠিক, কিন্তু তারপরও রায়-দম্পতির দুবার সন্তান লাভের সুযোগ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনোবারই সন্তান বাঁচেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তারা চলে যায়। জগদীশ রায় অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি। শেষবারে নবজাতকের দেহে রক্ত-অনুপ্রবেশ বা ব্লাড-ট্রান্সফিউশন করেও ফল মেলেনি।'

বিচারকের দিকে তাকিয়ে উকিল বললেন,—'কিন্তু কেন? কেন বারবার জগদীশ রায়ের উপর দুর্ভাগ্যের এই নির্মম নিষ্ঠুর খড়্গ নির্দয়ভাবে নেমে এসেছে? এই প্রশ্নের উত্তর জগদীশ রায় নিশ্চয় জানেন। কিন্তু তিনি চন্দনপুরের কারো কাছে সেকথা প্রকাশ করেন নি। ইয়োর অনার, এই মামলার

তদন্তকারী অফিসার রাজীব সান্যাল বহু ক্লেশে, সেই রহস্য উদঘাটিত করেছেন। আমাদের রক্তের মধ্যে অ্যাগ্লুটিনোজেনের মত আর একটি বস্তুও চিকিৎসকরা পেয়েছেন। এটিকে বলা হয় আর এইচ্ ফ্যাক্টর। সর্বপ্রথম রীসাস বাঁদরের মধ্যে এই বস্তুটি পাওয়া যায়। আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সাধারণত আর. এইচ. পজিটিভ হয়ে থাকে! কিন্তু সৃষ্টির কোনো অজানা কারণে স্বামী-স্ত্রীর আর. এইচ. যদি পজিটিভ এবং নেগেটিভ হয়, তবে তার ফল অকল্পনীয়,—এক দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। এই অবস্থাকে চিকিৎসকরা বলেন, আর. এইচ. ইনকম্প্যাটায়বিলিটি। আমরা যাদের মৃতবৎসা নারী বলি, অনেক ক্ষেত্রেই সেই দম্পতির আর. এইচ. একে অন্যের বিপরীত হওয়াই সম্ভব।

আসামীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন জগদীশ রায় তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর রক্ত-পরীক্ষা করিয়ে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁদের সন্তান জন্মালেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা এক দুরূহ প্রচেষ্টা। তাই শ্রীমতী রায় চতুর্থবার সন্তানসম্ভবা হলে জগদীশবাবু চলে এসেছিলেন চন্দনপুরে। ডাক্তার দাসের চেম্বারে অমিয় দত্তের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। ডাক্তারি হিসেব অনুযায়ী দুজনের প্রায় একই দিনে সন্তান লাভের কথা। আর তা জানতে পেরেই জগদীশ রায় মনে মনে ফন্দী এঁটেছিলেন। তার সন্তান যদি না বাঁচে, তবে অমিয় দত্তের সন্তানকে অপহরণ করে স্ত্রীর কোলে তুলে দিলে কেমন হয়? পত্নীর মাতৃত্বকে বিকশিত করে তোলার জন্য এই পথই বেছে নিলেন জগদীশ রায়। এবং এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য কলকাতা থেকে তিনি একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন। চন্দনপুরে তার পরিচয় দিলেন নার্স বলে। কিন্তু মেয়েটি আসলে নার্স নয়, কোন একটা হাসপাতালে কিছুদিন আয়ার কাজ করেছে। কলকাতার একটি বস্তি থেকে ওকে সংগ্রহ করেন জগদীশ রায়। পুরো পাঁচ'শ টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে এনেছিলেন এখানে। হাসপাতাল থেকে ছেলেটিকে সকলের অলক্ষ্যে তুলে নিয়ে আসাই হবে ওর প্রধান কাজ। মেয়েটিও খুব এক্সপার্ট, একেবারে নিখুঁত চাইল্ড-লিফ্টার। এমন সুন্দরভাবে সুযোগ বুঝে হাসপাতালের অত লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সে এই কাজ করেছে যে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।'

হঠাৎ তরফদারকে একটু চঞ্চল দেখাল। কথার মধ্যে হস্তক্ষেপ করে তিনি বললেন,—'ইয়োর অনার, আমার বন্ধু বেশ সুন্দর একটি গল্প ফেঁদেছেন। কিন্তু তার কাছে আমার দুটি প্রশ্ন আছে। প্রথমটি হ'ল, এই বাচ্চাটাকেই যে হাসপাতাল থেকে অপহরণ করা হয়েছে তার প্রমাণ কী? এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হ'ল অপর নবজাতকটি কোথায়? ডাক্তার দাস রায়-দম্পতির যে পুত্র-সন্তান লাভের কথা স্বীকার করেছেন, সেই ছেলেটি কোথায় গেল?'

তরফদার বসে পড়ার পরই পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন—'ইয়োর অনার, আমার বন্ধু আসামী পক্ষের উকিল শ্রীতরফদার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রশ্ন দুটোর উত্তর আমি নিজেই দিতাম। কারণ এ দুটো প্রশ্নের সঠিক জবাব এবং প্রমাণ দিতে না পারলে এই মামলার নিষ্পত্তি হয় না। আদালতের কাছে আমি স্বীকার করছি, শুধু মুখ দেখে একদিনের ছেলেকে আজ এক মাস পরে শনাক্ত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু শনাক্তকরণ তো শুধু মুখ দেখেই হয় না। দেহের কোনো একটি বিশেষ চিহ্ন বা দাগের মিল দেখেও তা হতে পারে। সরকার পক্ষের অন্যতম সাক্ষী লেবার-রুমের ডিউটি-অফিসারকে আমি যথাসময়ে আদালতের কাছে হাজির করব। ইয়োর অনার, হাসপাতালের নথিপত্রে আছে যে শ্রীমতী দত্তের নর্মাল ডেলিভারি হয় নি। ডিউটি-রত ডাক্তারকে ফরশেপস্ হাতে তুলে নিতে হয়েছিল। ভদ্রলোক অল্পবয়সী এবং নতুন। হাতও পাকা নয়। ডাক্তার দাস তখন জগদীশবাবুর বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। লেবার রুমের সেই ডাক্তারের কাছে পুলিশ জেনেছে সে ফরশেপসের দাঁড়া দুটো বেবির কপালের দুই পাশে পড়ায় দুদিকেই খানিকটা ট্রমা বা দাগের সৃষ্টি হয়। ইয়োর অনার, আজ একমাস পরেও

বাচ্চার কপালের সেই দাগ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে আমি আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কুশলী ডাক্তার পরেশ দাসকে জগদীশবাবুর বাড়িতে ফরশেপস্ বা কোনো অস্ত্রোপচারের আয়োজন করতে হয়নি।'

কোর্টরুমে কলরব শুরু হয়ে গেছে। আসামীকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সকলে দেখছে এখন। জনতার মনে এই মুহূর্তে আর কোনো সন্দেহ নেই। জগদীশ রায় দোষী,—জননীর ক্রোড় হতে শিশু অপহরণের অপরাধে অপরাধী।

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন—'ইয়োর অনার যে মেয়েটির সাহায্যে জগদীশ রায় শ্রীমতী দত্তের সন্তানকে চুরি করে স্বগৃহে এনেছিলেন, তাকে তারিণী দেবী ওয়ার্ডের একজন রোগিণী সম্ভবত চিনবেন। ঘটনার দিন সন্ধের পর নার্সের পোশাক পরা ঐ মেয়েটিকে তিনি সন্দেহজনকভাবে করিডরে ঘুরতে লক্ষ্য করেছেন। আর সব শেষে আমার বন্ধু শ্রীতরফদারের অন্য প্রশ্নটির জবাব দেওয়া প্রয়োজন। আদালতের কাছে উনি প্রশ্ন তুলেছেন যে রায়—দম্পতির সেই নবজাতক শিশুটি তবে কোথায়? এর উত্তর বড় করুণ, বড় দুঃখজনক।'

আসামীর দিকে তাকিয়ে সরকার পক্ষের উকিল বললেন—জগদীশ বাবুর সত্যিকার দুর্ভাগ্য। এর আগের তিনবারের মত এবারও শিশুটি বাঁচেনি। পরদিন সকাল থেকেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জগদীশ রায় সকালেই ছুটে এসেছিলেন একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টের কাছে। কিন্তু বিধাতা নির্মম। দুপুরের পরই শিশুটি মারা যায়।

একটু থেমে পাবলিক প্রসিকিউটর ফের বললেন, 'বাচ্চাটার মৃত্যুসংবাদ তাঁর স্ত্রীকে দেননি জগদীশ রায়। রাত নটা নাগাদ অপহরণ করে আনা শিশুটিকে অসুস্থা জননীর কাছে শুইয়ে দিয়ে তার আত্মজ মৃত সন্তানকে বাড়ির অদূরে গর্ত খুঁড়ে শেষ শয্যায় শুইয়ে দিয়ে আসেন। ইয়োর অনার, এই কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য জানবেন। এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে সরকারপক্ষ সাক্ষীরূপে আদালতের সামনে যথাসময়ে উপস্থিত করবে।'

বিচারক ভ্রূ কুঁচকে বললেন,—'প্রত্যক্ষদর্শী? হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'ইয়েস ইয়োর অনার', পাবলিক প্রসিকিউটর জোর দিয়ে বললেন,—'জগদীশ রায়ের গৃহভৃত্য গোবর্ধন মণ্ডল পুলিশের কাছে সমস্ত কথা স্বীকার করেছে। মোটা টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন জগদীশবাবু। কিন্তু গোবর্ধন সাধারণ ভৃত্য হলেও শুধু টাকার জন্য একটা দুরভিসন্ধিমূলক মিথ্যাকে সে সত্যের মর্যাদা দিতে নারাজ।'

অকস্মাৎ কোর্ট-রুমে একটা হইচই শব্দ উঠল। কী ব্যাপার? রাজীব চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল আসামীর কাঠগড়ার চারপাশে মুহূর্তের মধ্যে ছোট একটা ভিড় সৃষ্টি হয়েছে। জজসাহেব ব্যাকুল হয়ে বলছেন,—অর্ডার, অর্ডার।

একটু পরেই সব পরিষ্কার হ'ল। জগদীশ রায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। আদালত তাকে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে পরেশ ডাক্তার রাজীবের পিঠ চাপড়ে মনের ভাব প্রকাশ করলেন। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট রজতকান্তি আইচ একগাল হেসে বললেন,—'সত্যি মশাই, ছেলে চুরির পিছনে যে এত রহস্য লুকিয়ে আছে, তা কে জানত?'

পরেশ ডাক্তার শুধোলেন,—'আচ্ছা মিঃ সান্যাল, জগদীশ রায়কে দেখে আপনার সন্দেহ হ'ল কেন?'

ঈষৎ হেসে রাজীব বলল,—'এর উত্তর খুবই সরল। আপনারা ডাক্তাররা রোগী পরীক্ষা করে একটা কথা প্রেসক্রিপশনে প্রায়ই লেখেন। সে কথাটি হ'ল এন. এ. ডি। অর্থাৎ নো অ্যাবনর্ম্যালিটি

ডিটেক্‌টেড্‌। আমাদের গোয়েন্দাদের ঐ অ্যাবনর্ম্যালিটির দিকে চোখ-কান খুলে রাখতে হয়। স্ত্রীর ডেলিভারির জন্য কলকাতার ডাক্তার-বদ্যি, নানা সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে চন্দনপুরে আসাটা ঠিক নর্মাল মনে হয় কি? কিন্তু এই অ্যাবনর্ম্যালিটি কেন? তাছাড়া—'

—'তাছাড়া কী রাজীবদা?' সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকাল।

আগের মতই হাসল রাজীব। বলল,—'আরো একটা ব্যাপার আমার নজরে পড়েছে। জগদীশ রায়ের আঙুলে আমি একটা খুব সাধারণ আংটি দেখেছিলাম। হিরে এবং অন্য দামী পাথর বসানো আংটির পাশে একটা সীসের আংটি কেন পরেছেন জগদীশ রায়? ব্যাপারটা একটু তলিয়ে চিন্তা করেই এর উত্তর পেলাম। নিশ্চয় আংটিটা কোনো জ্যোতিষীর প্রেসক্রিপশন। এবং মনে হ'ল জগদীশবাবুর সন্তান-স্থানে দোষ থাকাই সম্ভব। আমার ধারণা ওর লগ্ন হতে পঞ্চম ঘরটা শনির ঘর। আর সেই ঘরে রবির অধিষ্ঠান। ফলে রবি শত্রুগৃহগত! এই কারণেই ওঁকে সীসের আংটি পরতে বলেছেন কেউ। তখনই আমার মনে হয়েছিল সন্তানের ব্যাপারে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে জগদীশবাবুর। অবশ্য গণ্ডগোল মানেই যে এমনি অগাধ রহস্য তা কিন্তু তখনও আমি বুঝিনি।'

হাঁটতে হাঁটতে কোর্টের চৌহদ্দি ছেড়ে সকলে বেরিয়ে এসেছে। রাস্তায় এসে সুব্রতর সঙ্গে একটা রিকশাতে উঠল রাজীব। পরেশ ডাক্তারের সঙ্গে রজতকান্তি অন্যদিকে গেলেন।

রিকশা চলতে শুরু করলে সুব্রত চুপি চুপি শুধোল,—'কিন্তু ক্লারা সিম্পসনের ব্যাপারটা কী রাজীবদা? রুমা দেবীই বা বাচ্চা কোথায় পেলেন?'

একটুও না ভেবে রাজীব বলল,—'ক্লারা সিম্পসন নির্দোষ মেয়ে। রিচার্ড আমার কাছে সব কথা স্বীকার করেছে। তার এক বন্ধুর বোন মুহূর্তের ভুলে এক চরম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। সেই পুরনো কাহিনি। অবিবাহিতা তরুণীর দেহে মাতৃত্বের সঞ্চার। ব্যাপারটা যখন জানাজানি হ'ল তখন আর কোনো উপায় নেই। রিচার্ডের কথামত বোনকে নিয়ে ক'লকাতায় এসেছিল ভদ্রলোক। ক্লারা সিম্পসন গোপনে তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে। শুধু ডেলিভারি নয়, বাচ্চাটাকে সন্তানহীনা রুমা ঘোষের কোলে তুলে দিয়ে ক্লারা কুমারী মায়ের মনে সত্যিকার সান্ত্বনা দিয়েছে। নইলে হয়তো বাচ্চাটাকে কাপড়ে জড়িয়ে পথে-ঘাটে ফেলে আসতে হ'ত। এদেশে হামেশাই তো এমন খবর কানে আসে।'

স্টেশনে এসে রাজীব দেখল দত্ত-দম্পতি আগেই হাজির। ট্রেনেরও আসার দেরি নেই। ডিসট্যান্ট সিগন্যাল প্রত্যাশিত গাড়িটাকে যেন নুয়ে পড়ে প্রণিপাত জানাচ্ছে।

এদিকটা ফাঁকা। শহর আরো মাইল খানেক দূরে। মনোরম সুন্দর অপরাহ্ণ। পাখির ডাক, ঝোপঝাপ, গাছগাছালির উপর অস্তসূর্যের হলদে রশ্মি এসে পড়েছে। দূরে আকাশের বুকে একখণ্ড লঘু মেঘ কেমন তরতর করে ভেসে যাচ্ছে।

রাজীবকে দেখে অমলা দত্ত এগিয়ে এল।

—'ছেলেকে জেলা হাসপাতালের বেবি ওয়ার্ডে দেখে এসেছেন তো?' লঘু সুরে রাজীব শুধোল।

ম্লান হাসল অমলা। বলল,—'আমার ছেলে বলছেন কেন? এখনও তো জজসাহেব রায় দেননি।'

আশ্বাস দিয়ে রাজীব জানাল,—'রায় তো দেবেনই। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছেন আপনি—'

অমলা বলল,—'জানেন, খোকাকে আজ দুদিন চুপি চুপি গিয়ে দেখে এলাম। সেই নাক, মুখ, সেই চোখ, চিবুকের গড়ন। ও ছেড়ে আমার,—মায়ের মন ঠিক বুঝতে পারে। তাই না ইন্সপেক্টরবাবু?'

—'নিশ্চয় পারে।' রাজীব ওকে সমর্থন করল।

অমলা বলল,—'কাল থেকে আমি একটা কথা ভাবছি জানেন?'

—'কী কথা?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল।

—'আমি ভাবছি, ফিরে পেলে খোকার কী নাম রাখব বলুন তো?'

—'কী নাম রাখবেন?' রাজীব এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের অমলার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল,—'কিন্তু আমি কেমন করে তা বলব?'

—'বারে!' অমলা চোখ তুলে কথা কইল। বলল,—'হারানো মানিক তো আপনিই ফিরিয়ে আনলেন। সুতরাং ওর নামও আপনাকে বলতে হবে।'

—'নাম তো হয়ে গেল। এই মাত্র আপনার মুখ থেকে শুনলাম। তা বেশ নাম,—খুব সুন্দর শোনাবে।'

'—ওমা! কি নাম বললাম আবার?' অমলা প্রায় হাঁ করে রইল।

—'কেন, মানিক?' রাজীব ঈষৎ হাসল। বলল,—'মানিক নামটা পছন্দ হয় না আপনার? খোকন মানেই তো সোনার মানিক, সাত রাজার ধন মানিক। সেই মানিক হারিয়ে গিয়েছিল। পড়েছিল অথৈ জলে। কি কষ্টে ওকে উদ্ধার করেছি। আপনিই বলুন না, একদিনের ছেলে হারিয়ে গেলে কম ফ্যাসাদ! তাকে তার আসল মা-বাবার সন্তান বলে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব নয়?'

—'তা সত্যি! আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন।' অমলা কৃতজ্ঞতায় প্রায় গদ গদ হয়ে উঠল। রাজীব আর একটি কথাও বলল না। মৃদু হেসে শুধু নমস্কার জানাল।

ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে শ্লথগতি ট্রেনটা ততক্ষণে প্রায় প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে।



অন্তরে আঁধার

কী খেয়াল হতে দয়াল দত্ত একটা ক্ষুর কিনলেন দাড়ি কামাবেন বলে। আর তান্ত্রিকের পরামর্শে আঙুলে পরলেন রক্তমুখী নীলা। একদিন সকালে দেখা গেল দয়াল দত্ত নিজেই তার গলা কেটেছেন। ক্ষুরটা হাতে গোঁজা। কিন্তু সন্দেহভাজন তো অনেকে। ববসার পার্টনার হরকান্ত, আত্মীয় মণিরঞ্জন, মধ্যবয়সী মেয়ে সারদা যে সংসার দ্যাখে। আর ছেলে প্রভঞ্জন, —স্ত্রীকে ফেলে যে বম্বেতে এক গোয়ানিজ রমণীর সঙ্গে থাকে। আর পুত্রবধূ, —রাত্রে যার ঘরে ফিসফিসানি।

এ ছাড়া কনভেন্টে-পড়া দিলীপ। যাকে লোকে বাবুর পুষ্যিপুত্তুর বলে জানে।



এক

বাথরুম থেকে বেরোবার সময় শমিতা গুনগুন করে গান করছিল। এতক্ষণ স্নানের ঘরে আলো জ্বলছিল, শাওয়ার থেকে ঝির ঝির জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, দরজার কাছে কান পাতলে গুনগুন গানের কলিও শোনা যেত।

এ বাড়িতে এখন সবাই তা জানে। শমিতা বাথরুমে ঢুকলে আর সকলে নিশ্চিন্ত হতে পারে, অন্তত আধঘণ্টার আগে বন্ধ দরজা খুলবে না। তবে অসুবিধে নেই। বাড়িতে আরো দুটো বাথরুম আছে। এত সরেস না হলেও, হেলাফেলার নয়। তাড়া থাকলে তারই একটাতে ঢুকে পড়ে।

স্নান করা আর গা ধোয়া যেন শমিতার এক বাই। দিনে চারবার সে স্নানের ঘরে ঢোকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে, দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে, তারপর বিকেলে চুল-টুল বেঁধে তো একবার গা ধোয়া চাই। ফের রাত্রে আর একবার, বিছানায় শুতে যাবার আগে শমিতা কতক্ষণ ধরে গায়ে জল ঢালে। অঙ্গ শীতল না হলে যেন তার চোখে ঘুমই নামবে না।

ঘরে ঢুকেই শমিতা ছিটকিনিটা তুলে দেয়। দেওয়ালে চৌকো মাপের একটা মস্ত আয়না ফিট করা আছে। তার সামনে দাঁড়ালে দেহের প্রায় সমস্তটাই দেখা যায়। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে শমিতা তাকিয়ে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। প্রতিদিন এই তার অভ্যেস। নিজেকে ভালো করে দেখা চাই। হয়তো এও এক বাই। নইলে নিত্যদিন একইভাবে দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার কী অর্থ আছে?

বাথটাবের কানায় কানায় ভর্তি টলটলে জল। শমিতা আকণ্ঠ দেহ ডুবিয়ে কতক্ষণ তার মধ্যে পড়ে থাকে। ঠিক গ্রীষ্মদিনের তাপক্লিষ্ট কোনো চতুষ্পদ প্রাণীর মত। মাঝে মাঝে আঁজলা করে জল নিয়ে শমিতা মুখে চোখে দেয়। তারপর এক সময় উঠে পড়ে। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ব্র্যাকেট থেকে সুগন্ধী সাবানটা টেনে নেয়। ছোট ছোট খোকাখুকুদের কিংবা পোষা সারমেয়কে আদর করার মত ভঙ্গিতে, সাবানটা হাতের তেলোয় চেপে ধরে বুলোয়। নরম গালে, গলায়, বাহুতে, পিঠে, দেহের পিছনে সর্বত্র সাবান ঘষে। তখন বরফের কণার মত সাবানের ফেনাগুলো যত্র তত্র থিক থিক করে। শমিতা শাওয়ারটা খুলে দিয়ে জলের ধারার নীচে দাঁড়ায়। ছেলেমানুষের মত জল ছিটোয়। গানের কলিতে সুর ভাঁজে। তারপর ফুলকাটা দামী তোয়ালে দিয়ে সযত্নে গায়ের জল মোছে। কোনমতে শুকনো শাড়িটা অঙ্গে জড়িয়ে নেয়। ভেজা পায়ে, একটু দ্রুতগতিতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

এতক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। বন্ধ মানে ভেজানো নয়, বাথরুমে যাওয়ার আগে শমিতা ঘরে চাবি দিয়ে যায়। এ বাড়িতে উটকো লোকের অভাব নেই। দাস-দাসী আছে, ঠাকুর-চাকর আছে। সুতরাং কার ভরসায় শমিতা ঘর খুলে রেখে যাবে? টুকিটাকি সোনার গয়না-টয়না, হাতঘড়ি, খুচরো টাকা সর্বদা আলমারিতে সাবধানে রাখা যায় না। রাতে শোবার আগে কত সময় হাতের বালা, কানের দুল শমিতা টেবিলের উপর খুলে রাখে। দরজা খোলা থাকলে যে কেউ তা হাতিয়ে নিতে পারে। তারপর ভালমানুষ সেজে সে হাঁটবে, বেড়াবে। দশজনের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করলেই বা কে কী করছে?

দরজা খুলেই শমিতার চোখ দুটো দুশ্চিন্তার ভারে ছোট হয়ে এল। ফের সেই চিঠি। মেঝের উপর খামটা পড়ে। লালচে রঙের লম্বা খাম। অত বড় খামখানার মধ্যে কিন্তু এক টুকরো ছোট্ট চিঠি আছে, শমিতা তা জানে। এর আগে আরো দুবার সে মেঝে থেকে অমনি খাম কুড়িয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার। শমিতা যখন ঘরে থাকে না, স্নানের ঘরে ঢোকে কিংবা বাইরে-টাইরে যায় ঠিক তখনই কেউ চিঠিখানা ঘরের মধ্যে ফেলে দেয়। বাড়িতে লোকজন—চাকর-বাকর। তার মধ্যে সে কখন আসে, দরজার সামনে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে ফাঁক দিয়ে চিঠিটা গলিয়ে দেয়। তারপর টলটলে, ভারী বৃষ্টিকণার মত একসময় টুপ করে ঝরে পড়ে। কেউ টের পায় না।

শমিতা এক মুহূর্তের জন্য ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। তারপর একটু হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে নিল। মুখ ছিঁড়তেই চার ছত্রের চিঠিখানা বেরিয়ে এল। পত্রের ভাষা সেই একই রকম। চিঠির বয়ান আগের মতই।

মিতা,

আজ রাত্রে আসব, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। ব্যালকনির দিকের দরজাটা খুলে রেখো। প্লিজ,—এই শেষবার। আর তোমাকে ডিসটার্ব করব না। ইতি—

শমিতা চিঠিখানা ফের পড়ল। কিন্তু সেটি আর খামে বন্দি করল না। একটু বিরক্তভাবে সে কুচি কুচি করে কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর খামটাও, দলা পাকিয়ে কাগজের টুকরোগুলি জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

ভাদ্রমাস। সারাদিনই গুমোট করে আছে। আকাশে মেঘ ঘুরছে। কিন্তু বর্ষণ নেই। শুধু সন্ধের পর একবার তড়বড়িয়ে কয়েক ফোঁটা ঝরল। কিন্তু যে যৎসামান্যই। তাতে গরম কাটেনি, বরং গুমোট বেড়েছে।

ঘড়িতে রাত দশটা। এখনই ঝি এসে খেতে ডাকবে। শমিতা ভাবছিল কী করা যায়। আজ রাত্তিরেও তাকে ব্যালকনির দিকে দরজাটা খুলে রাখতে হবে! শুধু তাই নয়, সে না আসা পর্যন্ত ঘুমোনো চলবে না। উপায় নেই, লোকটা অবশ্য ভীষণ সাবধানি। প্রায় বাতাসের মত নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢোকে। কিন্তু তাই বলেই তো নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায় না। ও বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত শমিতার স্বস্তি নেই। বুকের ভিতর কেমন একটা অস্থিরতা, ধুকপুকানি শুরু হয়। ভাত-টাত খেয়ে শমিতা একটা বই নিয়ে বসে! টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে পড়বার চেষ্টা করে। তারপর বইটা হাতে নিয়েই খাটে এসে ওঠে। শোয়—এপাশ ওপাশ করে। বইয়ের পাতায় চোখ ডুবিয়ে সময় কাটাতে চায়। কিন্তু মন বসে না। এগারোটা... ধীরে ধীরে বারোটাও বাজে। তবু শমিতার কেমন মনে হয় রাতটা বড় দীর্ঘ। সময়ের নানা ভাগ, সেকেন্ড, মিনিট সব যেন বড় মন্থর, কিছুতেই এগোয় না।

বেশবাস ঠিক করে শমিতা ফের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। গালের উপর নরম তুলতুলে পাউডারের পাফটা বুলোল। জামা-টামা পরার আগেই গায়ে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়িয়েছিল। এখন ফের ঘাড়ে, গলায়, পিঠের অনাবৃত অংশে পাউডার মাখানো পাফটা আলতোভাবে বুলোল।

দরজায় খুট করে শব্দ হতেই শমিতা পিছন ফিরে তাকাল। সে ভেবেছিল ঝি তাকে খাবার জন্য ডাকতে এসেছে। কিন্তু দরজা খুলে যে ঘরের ভিতরে এল সে দাসী নয়—সারদা মাসি।

শমিতা মাথায় অল্প একটু কাপড় টেনে বলল—'আসুন মাসিমা। আপনি খেয়েছেন তো?'

সারদা মাসি হেসে বলল—'এইমাত্র তোমার শ্বশুরকে খাইয়ে দাইয়ে এলাম। সেই সাড়ে আটটা থেকে সমানে তাগাদা দিচ্ছি। সওয়া নটা বাজলে পর খেতে বসলেন। কী যে এত কাজ, আমি তো কিছু বুঝতে পারিনে। নাওয়া খাওয়ার আর অবসর মেলে না।'

সারদা মাসির বয়স বেশি নয়। বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্য বেশ মজবুত, মাংসল ভারী মুখ...লম্বাটে নয়, বরং গোলাকার। চোখ দুটি বড় নয়—দেহের তুলনায় ছোটই বলা যায়। ভদ্রমহিলা বিধবা—কিন্তু থান কাপড়ের বালাই নেই। তার কাপড়ের রঙিন পাড়। আচার-নিষ্ঠা নিয়ে শুচিবাই দেখা যায়নি। রাত্তিরে ভাতই আহার—তবে মাছ-মাংস, পেঁয়াজ-ডিম বাদ। ওসব চলে না।

শমিতা একগাল হেসে বলল—'তাহলে চলুন মাসিমা, দুজনে একসঙ্গে বসে খেয়ে নিই।'

সারদা মাসি বলল—'তাই ভেবেই তো এলাম বউমা। মনে হল, তুমি এখনও খাওনি। তোমাকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গেই বসি।'

হঠাৎ শমিতার কপাল আর সিঁথির দিকে তাকিয়ে সারদা মাসি একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ভালো করে লক্ষ্য করে বলল—'বউমা, কদিন বোধহয় সিঁথিতে সিঁদুর বুলোওনি। কপালে টিপ পরোনি। এয়োস্ত্রী মেয়ে—এমন করে কি থাকতে আছে?'

শমিতা প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। ম্লান হেসে বলল—'মাঝে মধ্যে পরি তো মাসিমা। ওতেই চলবে মনে হয়। সবই তো বোঝেন—ঘটা করে এর চেয়ে বেশি সিঁদুর পরলে পাঁচজনে আড়ালে হাসবে।'

সারদা মাসি মুখখানা একটু করুণ করে বলল—'তোমার কষ্ট বুঝি বউমা। এত রূপ-যৌবন, সোনার পিতিমের মত চেহারা। তোমার মত মেয়ে স্বামী-সুখ পেল না ভাবলেও দুঃখ হয়। সেই বলে না—অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর—অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।'

শমিতা প্রায় জোর করেই কথাটা গায়ে মাখল না। বাঁ হাত দিয়ে খোঁপাটা ঠিক করে নিয়ে জবাব দিল—'কি যে সব বলেন মাসিমা। বাদ দিন ওসব কথা। রাত হল—চলুন খেয়ে নিই—'

সারদা মাসি ঠিক পরিবারের কেউ নয়। বাড়ির কর্তা দয়াল দত্তের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই। এ বাড়িতে উনি আশ্রিতা। কর্তার এক বন্ধু সারদা মাসিকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। শমিতার তখন বছরখানেক বিয়ে হয়েছে। শাশুড়ি একরকম বিনা নোটিসেই হঠাৎ ওপারে রওনা হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়। প্রভঞ্জনের সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা তখন পরিষ্কার। গোলঘাঁট, জানাজানি সব চুকেছে। শমিতা স্পষ্টই বুঝল, নিজের পোড়া-কপাল। স্বামী তার দখলে নেই। বোম্বাইয়ের সেই অজাত-কুজাতের মেয়েটাই প্রভঞ্জনের চোখের মণি। তাকে নিয়েই সে থাকবে। শমিতাকে বিয়ে করা শুধু মা-বাবাকে খুশি করবার জন্য। একটা ঘোমটা-টানা মেয়ে পেলেই যদি মায়ের মন ভরে, তাহলে প্রভঞ্জন সেটুকু করতে রাজি। তাই বলে শমিতাকে নিয়ে সে ঘর-সংসার পাতবে বলেনি।

এমন দিনে সারদা মাসিকে পাওয়া গেল। দয়াল দত্ত চিঠি পড়েই বললেন—'উমেশ আমার সত্যিকার বন্ধু। চিঠিতে ওকে সংসারের কথা লিখেছিলাম। একজন উপযুক্ত লোক পেলে অচল সংসারটা একটু সচল হয়। বউমার কাছে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারিনে। হতভাগা যে তলে তলে এমন একটি কাণ্ড করে বসে আছে, তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারিনি।'

শমিতার মনে আছে সারদা মাসি একটি কথাও বলেনি। শুধু মুখ টিপে হেসেছিল। সেদিন থেকেই সে সংসারের হাল ধরল। পাকা মেয়েছেলে। মাসখানেকও ফুরোল না। তার আগেই সারদা মাসি ঘরের কর্ত্রী হয়ে বসল। সংসারের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সব কিছু সারদা মাসির হুকুমে চলে। প্রত্যেক কাজেই তার হুঁ চাই। নইলে কোনো কাজই হবে না।

মাস তিনেক পরে দয়াল দত্তও একদিন তারিফ করে বললেন—'তা সারদার সত্যি ক্ষমতা আছে। ভাঙা সংসার জোড়াতালি দিয়ে ওই ফের চালু করল। সারদা এসে হাল না ধরলে আমরা কোথায় ভেসে যেতাম।'

খেতে বসে সারদা মাসি বলল,—বুঝলে বউমা, কর্তা এমাসে দিলীপকে টাকা পাঠাননি। সে তো রেগে মেগে চিঠি লিখেছে, তিন দিনের মধ্যে টাকা না পেলে হোস্টেল থেকে চলে আসবে। কি কাণ্ড বলো দিকি?'

শমিতা এক টুকরো আলু মুখে দিয়েছিল। সে মুখ তুলে শুধোল—'বলেন কী? দিলীপকে টাকা পাঠানো হয়নি?'

সারদা মাসি কাঁচালংকার একটু অংশ মুখে নিয়ে উত্তর দিল—'তাই তো শুনছি। কর্তার কি যে মতিগতি হচ্ছে দিন দিন। সকাল থেকে মুখ বুজে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। একটা কথা বলতে গেলে যেন তেড়ে মারতে আসেন।'

অবাক হবার কথা। দিলীপকে কর্তা টাকা পাঠাননি, তা বিশ্বাস করাও শক্ত। প্রভঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হবার পর থেকে দিলীপকেই কর্তা মানুষ করেছেন। কাগজে-কলমে কতদূর কী আছে, তা অবশ্য কেউ জানে না। কিন্তু ছেলেটা যে দয়াল দত্তের পুষ্যিপুত্তুর একথা সবাই জানে। কেউ কেউ বলে কর্তা গত হলে বিষয় সম্পত্তি সব ওরই হবে। দয়ালবাবুর উইলে সেই রকমই নির্দেশ আছে।

দিলীপ যখন এ বাড়িতে আসে তখন তার বয়স মোটে ছয়। ফুটফুটে ছেলে—এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। হাসিখুশি মুখে একটু দুষ্টুমি ভাব। জন্মের সময় ওর মা মারা যায়। এতদিন কোনো আশ্রমে মানুষ হয়েছে। বাপ এক টো-টো কোম্পানির চাকরে। পেটের দায়ে হিল্লি-দিল্লি করতে হয়। কটা বছর সে আরামে টাকা পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ছেলের কপাল—তাও সইল না। বিদেশ বিভুঁয়ে বাপও একদিন ফৌৎ হল। লোকটা কর্তার চেনাজানা। কোনো এক সূত্র হতে দয়ালবাবু সব খবর পেয়েছিলেন। এবং তারপর নিজে গিয়ে সেই আশ্রম থেকে দিলীপকে নিয়ে এলেন।

দিলীপ অবশ্য এ বাড়িতে মানুষ হয়নি। ছুটিছাটায় এসেছে এই পর্যন্ত। কর্তা তাকে দার্জিলিঙের কাছে এক কনভেন্টে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই গতবছরে সে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় পাস করেছে। তারপর কর্তা তাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। সে কলেজে ঢুকেছে। এখনও হস্টেলেই থাকে। ফি মাসে কর্তা তাকে টাকা পাঠান।

সেই দিলীপ। দয়ালবাবু যাকে রীতিমত স্নেহ করেন। আর তাকেই নাকি এ মাসে টাকা পাঠানো হয়নি?

শমিতা এক ঢোক জল খেয়ে বলল—'উনি বোধহয় টাকা পাঠাবার কথা ভুলে গিয়েছেন মাসিমা, আপনি বরং একটু মনে করিয়ে দিন না—'

সারদা মাথা নাড়ল। 'তুমি জানো না বউমা, কর্তার বয়স হয়েছে সত্যি, কিন্তু এখনও ভুলচুক হয় না। সব জিনিস ঠিক মনে আছে। কবে কাকে কী চিঠি লিখেছিলেন, এখনও গড়গড় বলতে পারেন।'

খাওয়া দাওয়া শেষ করে শমিতা এসে তার ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজিয়ে ছিটকিনিটা তুলে দিল। আলমারি খুলে একটা মশলার কৌটো বের করে একটু মুখে রাখল। ফের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অল্প একটু জিভ বার করে মশলার কুচিগুলি দেখল। লাল রঙের ছোট ছোট দানা। জিভের লালার সঙ্গে মিশে সেগুলি গলতে আরম্ভ করেছে।

ঘড়িতে রাত এগারোটার মত। ঘুমে শমিতার চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু তার এখন ঘুমোলে চলবে না। সে আসবে। রাত আরও নিশুতি হলে গোপন প্রেমের মত নিঃশব্দে সে ঘরে ঢোকে। শুধু দরজাটা খুলবার সময় খুট করে মৃদু শব্দ হয়। লোকটার পায়ে রবার সোলের জুতো থাকে। তবুও সে সন্তর্পণে পা টিপে হাঁটে। যাতে কেউ না তার উপস্থিতি বুঝতে পারে। কথা বলে

নিচু গলায়। কাছের মানুষটিরও তা বুঝতে কষ্ট হয়।

শমিতা বিছানার উপর ভেঙে পড়ল। এখনও ঘণ্টা দুই-তিন তাকে জেগে থাকতে হবে। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিতেই একটা আবছা অন্ধকারে সমস্ত ঘরটা ভরে উঠল। শমিতা চোখ বন্ধ করে নানা রকম কথা ভাবছিল! তার শ্বশুর হঠাৎ দিলীপকে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন কেন? সে ভেবেছিল ব্যাপারটা ভুলচুক মাত্র, কিন্তু সারদা মাসি তা স্বীকার করেনি। তার ধারণা ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত। কর্তা জেনে শুনেই দিলীপকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছেন। কিন্তু কেন? শমিতা বারবার কথাটা চিন্তা করল।

কখন চোখে ঘুম নেমেছে শমিতা বুঝতেও পারেনি! হঠাৎ এক উষ্ণ করস্পর্শে তার ঘুম ভেঙে গেল। শমিতা ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল। মুখ তুলে সে দেখল অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত সেই মানুষটা সামনে দাঁড়িয়ে। পিঠে হাত রেখে সে এতক্ষণ তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছিল।

'ফের তুমি কেন এসেছ?' শমিতা একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলল।

লোকটা হাত বাড়িয়ে তার মুখখানা প্রায় চেপে ধরল। ফিস ফিস করে বলল—'আস্তে কথা বল, সারদা মাসি শুনতে পেলে এখুনি একটা কেলেঙ্কারি হবে।'

কথাটা সত্যি। সারদা মাসির ঘরটা দূরে নয়, বরং কাছেই। মাসির ঘুমও পাতলা। জানালা দিয়ে একটা বেড়াল ঢুকলে পর্যন্ত কখনও টের পায়। ঘরের মধ্যে কথাবার্তা চলছে জানলে সারদা মাসি নির্ঘাত একটা হইচই করবে। কর্তাকে বলবে। ঝি-চাকর বাড়ির অন্য লোক, কারো জানতে বাকি থাকবে না। সুতরাং শমিতা চুপ করল। গলা নামিয়ে শুধোল—'কী বলবে বলো, কেন ফের এসেছ?'

'কাগজটা খুঁজে পেয়েছিলে?'

—'না।' শমিতা মাথা নাড়ল।

'খুঁজবার চেষ্টা করেছিলে তো?'

'একদিন আলমারিটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। সেদিন সারদা মাসি বাড়িতে ছিল না। পুজো দিতে কালীঘাটে গিয়েছিল। তেমন কাগজ কই চোখে পড়ল না। আর একদিন খোঁজ করব ভেবেছিলাম। কিন্তু সারদা মাসির নজর রয়েছে। মনে হচ্ছে সুবিধে হবে না।'

—'এর মধ্যে গোপালবাবু এসেছিলেন?'

'বাড়িতে? কই না তো'—শমিতা জবাব দিল।

'কর্তার ডায়েরি বইটা একবার খুঁজে দেখো। যদি পাও তো আদ্যোপান্ত প'ড়ো! আর লুকিয়ে -চুরিয়ে ওটা পাচার করে দিতে পারলে তো কথাই নেই! মনে হচ্ছে ডায়েরির পাতায় কিছু আভাস-ইঙ্গিত মিলবে।' লোকটা সন্তর্পণে বলল।

শমিতা ভীরু পাখির মত জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা তার দুই কাঁধের উপর বাঘের থাবার মত মুঠোগুলি চেপে ধরে একটা মৃদু ঝাঁকুনি নিল।

—'রাত দুপুরে তুমি এমন করে এস না। আমার ভীষণ ভয় করে। কখন দুজনে ধরা পড়ে যাব। সারদা মাসির চোখে নিত্যি ধুলো দেওয়া যায় না। একদিন ও ঠিক বুঝতে পারবে।'

ভ্রূ কুঁচকে সে কী ভাবল। তারপর হাত বাড়িয়ে শমিতার চিবুকটা তুলে ধরে বলল,—'আর বেশিদিন লুকোচুরি খেলবার প্রয়োজন হবে না। মাসখানেকের মধ্যেই একটা ফয়সালা হবে। তারপর দুজনে'—কথা সম্পূর্ণ না করেই সে শমিতার গাল টিপে একটু আদর করল।

ব্যালকনির দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে এগোলেই স্পাইর‍্যাল সিঁড়ি। সে পা টিপে খুব নিঃশব্দে নীচে নামতে লাগল। জানালায় দাঁড়িয়ে শমিতা দেখছিল। লোকটা বাগানের গাছগাছালির আড়াল দিয়ে পিছনের পাঁচিল টপকে দ্রুত অদৃশ্য হল।

দুই

দয়াল দত্তের ঘরখানা বড়। একপাশে প্রমাণ মাপের একটা পালঙ্ক। তাতে সুন্দর গদি পাতা। বালিশগুলি বেশ গুছিয়ে উঁচু করে সাজানো। কোণের দিকে স্টিলের বড় আলমারি। ঘরের মধ্যেই একটা কাঠের টেবিল। তাতে লেখার কাগজ-পত্র, কলম, খানকতক বই। টেবিলের উপর টেলিফোন রয়েছে। পাশেই একরাশ খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা। তার মধ্যে পোকামাকড়, আরশুলা, টিকটিকি এমন কি কাঁকড়া বিছে পর্যন্ত থাকতে পারে।

মাথার চুল প্রায় শাদা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাঝারি চেহারা। রোগাও নয়—আবার মোটা সোটাও বলা যায় না। বছর খানেক হল অবসর নিয়েছেন। চাকরি করতেন ম্যাকমরিস কোম্পানিতে। খুব অল্প মাইনেয় সাধারণ কেরানি হয়ে ঢুকেছিলেন। তারপর যোগ্যতা দেখিয়ে ধাপে ধাপে অনেকদূর পর্যন্ত উঠেছেন। রিটায়ার করেছেন কোম্পানির পারচেজ অফিসার হবার পর।

কর্মজীবনেই দয়ালবাবু বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। কলকাতায় তার দুখানা বাড়ি। একখানায় নিজে থাকেন। সেটি শহরের উপর নয়—বরং শহরতলিতে বলা চলে। বাড়িটা দোতলা—কিন্তু বেশ প্রশস্ত। চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির পিছন দিকে একটা বাগান আছে। তাতে পেয়ারা, সুপারি, আতা, পেঁপে এমন কি ছোট দু-তিনটে আমগাছও রয়েছে। অন্য বাড়িটা খাস শহরের বুকে। গোলদিঘির কাছে,—কলেজ স্ট্রিটের উপর। সামনের দিকে দোকানদানী...পিছনে ভাড়াটেরা থাকে। বাড়িটা তিনতলা—অনেকগুলো ঘর আছে। মাস গেলে হাজার দুই টাকা ভাড়া আসে।

অবসর নিয়েও দয়ালবাবু অবশ্য বসে নেই। আসলে বসে থাকতে পারেন না। এতদিন পারচেজে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতা আছে, তাই সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ধরেছেন। কাজ-পাগল মানুষ। চিরকাল কাজেই ডুবেছিলেন। এখন কাজ ছেড়ে উঠে এসে হাঁড়ি কলসিতে জিইয়ে রাখা মাছের দশা। খালি খলবলিয়ে ওঠেন। অনেক কিছু করতে চান। প্ল্যান-ফন্দি করেন। কিন্তু পেরে ওঠেন না।

সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা অবশ্য ভালই। রিটায়ার করার সময় দয়ালবাবু লালমুখো গিবসন সাহেবকে ধরে কাজটা গুছিয়ে নিয়েছেন। ম্যাকমরিস কোম্পানির কয়েকটা মালের এজেন্সি। কোলিয়ারির প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কোম্পানির কারখানায় তৈরি হয়। সেই মাইনিং ইকুইপমেন্টসের এজেন্সি বাগিয়েছেন দয়াল দত্ত। নিজের কোম্পানির বেশ জুতসই একটা নামও দিয়েছেন। মাইনিং অ্যান্ড অ্যালায়েড্ ইকুইপমেন্ট করপোরেশন। কলকাতার ক্যানিং স্ট্রিটে হেড অফিস। আসানসোলে কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চও রয়েছে। শুধু ম্যাকমরিস কোম্পানির জিনিস নয়। অর্ডার পেলে সব রকম জিনিস সাপ্লাই করতে দয়ালবাবু রাজি আছেন।

কোম্পানিটা অবশ্য তাঁর একার নয়। একজন পার্টনার আছে। লোকটার নাম হরকান্ত বিশ্বাস। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। এ লাইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আগে জ্যাকসন লেনে তার দোকান ছিল। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কারবার। বড় বড় কোম্পানি ঘুরে কোটেশন দেওয়া—তারপর মুনাফা রেখে সাপ্লাই। ম্যাকমরিস কোম্পানিতে হরকান্ত মাল সাপ্লাই করত। সেই সূত্রেই জানাশোনা। দয়াল দত্ত ব্যবসায় নাববেন শুনে হরকান্ত নিজেই এগিয়ে এল। ইচ্ছে করলে দয়ালবাবু তাকে ম্যানেজার কিম্বা এমনি কোনো কাজ দিতে পারতেন। কিন্তু দয়াল দত্ত বুদ্ধিমান লোক। এই বয়সে নতুন ব্যবসা ফেঁদে বাজিমাত করা তাঁর একার কম্মো নয়। সেজন্য শক্ত-পোক্ত উপযুক্ত লোক চাই।

আর শুধু লোক হলেই তো হবে না। কাজকর্মে তার রীতিমত আগ্রহ থাকা দরকার। কোম্পানির দু'পয়সা লাভ হলে, সেও দুটো পয়সা পাবে। এমনি একটা বন্দোবস্ত হলেই সুবিধে। হরকান্তকে তিনি তাই পার্টনার করে নিয়েছেন। হাজার টাকা মূলধন ফেলে সে দু-আনার অংশীদার হয়েছে। দয়ালবাবু অবশ্য তাকে কলকাতায় রাখেননি। হরকান্তকে তিনি আসানসোলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানকার ব্রাঞ্চে সে সর্বেসর্বা। কলকাতা থেকে মাল গেলে দূর দূর কোলিয়ারিতে পাঠিয়ে দিতে হয়। টুকটাক্ অর্ডারপত্রের খোঁজেও সে ঘোরে। শুধু তাই নয়, বিল-টিল পাঠানো, টাকাকড়ি আদায় করা। ছোট কোম্পানিতে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব দিক একজনকেই সামলাতে হয়।

এতদিন হরকান্ত ভালই চালিয়েছে। দয়ালবাবু খুশি ছিলেন। হপ্তায় হপ্তায় হেড-অফিসে স্টেটমেন্ট এসেছে। টাকাকড়ি, চেক-টেক হিসেব মত সব হাজির। একটি কানাকড়ির গরমিল নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা খবর পেয়ে দয়ালবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। গতমাসে হরকান্ত একটা মেসিনের অর্ডার জোগাড় করেছিল। কোলিয়ারিরি এক এজেন্ট তাকে অর্ডারটা দেয়। হরকান্ত বোকাসোকা—মুখ্যু নয়। বরং বেশ চালাক চতুর। ইতিমধ্যেই তিন-চারটে কোলিয়ারির পারচেজ ডিপার্টমেন্টে বাবুদের সঙ্গে তার মুখ শোঁকাশুঁকি হয়েছে। অর্ডারপত্রও মন্দ জোগাড় করে না। তবে বেশির ভাগ কোলিয়ারির হেড অফিস কলকাতায়। পারচেজ ডিপার্টমেন্টও সেখানেই। তাই অনেক সময় ছুটোছুটি সার হয়। ফললাভ ঘটে না।

চিঠি পেয়েই দয়ালবাবু মেসিনটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তেত্রিশ হাজার টাকা দামের মেসিন। আলাদা করে পত্রও দিলেন। টাকাটা খুব শীঘ্র পেলে ভাল হয়। এখানে কলকাতায় ক্যাশ চেক জমা দিয়ে তাকে মেসিনটা কিনতে হয়েছে। এতগুলি টাকা বন্দি হয়ে থাকলে তার নিজের পঙ্গু অবস্থা। ব্যবসাপত্তর অচল।

অবশ্য হরকান্ত ব্যবস্থা করেছে। দিন পনের'র মধ্যে হেড অফিসে পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক এল। কিন্তু বাকি টাকার দেখা নেই। অথচ বিল জমা দেবার পর প্রায় দু'মাস ফুরোতে চলল। কোম্পানি সাধারণত ত্রিশ দিনের পরই পেমেন্ট করে। দয়াল দত্ত ভেবেছিলেন কোলিয়ারি গড়িমসি করছে। এমন হয়। ঠিকমত তদ্বির-তদারক না হলে বিল পাস হয় না। কিন্তু গতকাল তিনি একটা খবর পেয়ে প্রায় চমকে উঠেছেন। টাকাটা নাকি পেমেন্ট হয়েছে। দু খেপে হরকান্ত টাকাটা নিয়ে এসেছে। দু-দশ টাকা নয়। করকরে আট হাজার টাকা। আজ পনেরো দিনের উপর হল হরকান্ত টাকা পেয়েছে। অথচ তা হেড-অফিসে এসে পৌঁছয়নি। এমন কী সে একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত এবং গুরুতর। টাকা পেয়ে হরকান্ত বেমালুম চেপে যাবে একথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু হয়তো তাই সত্যি হতে চলেছে। এবং খবরটা পাবার পর থেকে দয়াল দত্ত রীতিমত দুশ্চিন্তা বোধ করছেন। এতগুলি টাকা বেমাক্কা খোয়া গেলে তার ব্যবসা-পত্রের কী হাল হবে?

কাল রাত্তিরেই তিনি টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। হরকান্তকে পেতে অসুবিধে হয়নি। তার নামে কল বুক করলেন। ঘণ্টাখানেক পরই লাইন পাওয়া গেল। ফোনে অবশ্য তিনি টাকার কথা বলেননি। শুধু হরকান্তকে একবার কলকাতায় আসতে বলেছেন। জরুরি প্রয়োজন—তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। অতি অবশ্য সে যেন আসে। দয়ালবাবু সকালের ট্রেনেই আসতে বলেছিলেন। কিন্তু হরকান্ত রাজি হয়নি। হুট করে অমনি গেলেই হল? বেলা দশটার সময় তার এক কোলিয়ারির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবার কথা। ওরা কিছু মালপত্র কিনবে। অন্তত হাজার পাঁচেক টাকার অর্ডার বাগানো খুবই সম্ভব। এমন দাঁও ফেলে কলকাতায় দৌড়ুতে সে খুঁতখুঁত

করল। অগত্যা দয়ালবাবু তাকে বিকেলের ট্রেনেই আসতে বলেছেন। সন্ধের একটু আগেই একখানা গাড়ি আছে। এক্সপ্রেস ট্রেন, খুব কম স্টেশনেই থামে! রাত নটা নাগাদ হাওড়া পৌঁছয়। হরকান্ত অনায়াসে দশটার আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে।

হঠাৎ দয়ালবাবুর দৃষ্টি পড়ল তার হাতের নীল রঙের পাথরটার দিকে। এমনিতে দেখতে নীল—কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে একটা লালচে রঙের আভা চোখে পড়বে। রঙটা যে পাথরের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। শুধু শূন্যে আলোর বুকে তুলে ধরে পরীক্ষা করলেই লালচে রঙটা হঠাৎ ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাবে। আংটির পাথরটা বেশ বড় সাইজের। অন্তত ছ-সাত রতি হবে। দিন সাতেক হল দয়ালবাবু পাথরটা আংটিতে বসিয়ে ধারণ করেছেন। প্রথম কয়েকদিন ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। একটা কাপড়ে পাথরটি বেঁধে সেটি বাহুতে জড়িয়ে নিয়ে গিঁট দিয়ে রাখতেন। রাত্রে বালিশের নীচে রেখে শুতেন। অনেকে তাকে বারণ করেছিল। বুড়ো বয়সে রক্তমুখী নীলা ধারণের কী প্রয়োজন? নীলা সকলের সহ্য হয় না। রক্তমুখী নীলা অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। দয়ালবাবুর যে কোন বিপদ-আপদ হবে না তাই বা কে বলতে পারে?

কিন্তু দয়াল দত্ত ভীষণ জেদী আর একগুঁয়ে। একবার যখন ঠিক করেছেন নীলা পরবেন, তখন তা পরবেনই। কিছুতেই মত বদলাবে না। মাসখানেক আগে এক তান্ত্রিক সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা। লোকটি অদ্ভুত। খড়্গনাসা, তীক্ষ্ণ অর্ন্তভেদী দৃষ্টি। তার দিকে তাকিয়ে সে বিচিত্র হাসল। বলল—'মনমে বহুত দুখ আছে বাবুজি, হামি সব বুঝতে পারি। আপনি একঠো নীলা পরুন। সব, আচ্ছা হোবে। দুখ চলে যাবে....আনন্দমে রহেঙ্গে।'

—'নীলা? দয়ালবাবু একটু অবাক হলেন।'

—'হাঁ বাবুজী। রক্তমুখী নীলা। লেকিন দেখেশুনে কিনবেন। হামি সব বাতলে দিব। একটু হেসে ফের বলল—যে দূরমে চলিয়ে গেছে, সে ভি ফিরতে পারে। কেয়া বাবুজি, ঠিক বলেছি না?'

দয়ালবাবুর বুকটা ধক্ করে উঠল। লোকটা বলে কী? তিনি ফ্যালফ্যাল করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন।

তান্ত্রিক সাধু হেসে বলল—দুখ রাখবেন না বাবুজি। এসব করম্‌ফল। লেকিন তামাম জিন্দেগি এসব থাকবে না। বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটা ভেল্কিও জানে। হঠাৎ চমকে দিতে পারে। ফস করে মুখের ভিতর থেকে সে দশ-পনেরোটা ছুঁচ বের করে আনল। কালো রঙের তীক্ষ্ণ ছুঁচগুলি। দয়ালবাবু আশ্চর্য হয়ে দেখছিলেন। লোকটি অবলীলাক্রমে সেগুলি মুখের ভিতর ফেলে পান খাওয়ার মত চিবোতে শুরু করল।

তান্ত্রিক সাধু বলেছিল, ছোট পাথর হলে কাজ হবে না। যে পাথর সকলের সহ্য হয়নি তেমনি বড় পাথর চাই। দয়ালবাবু নাস্তিক নন, দৈবে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। পাথর-টাথরে এককালে রীতিমত বাতিক ছিল। হাতে গোমেদ পরেছেন, তারপর প্রবাল। কোনো কাজ হয়নি বলে সেগুলি একটাও রাখেননি। শেষকালে একটা পীত পোখরাজ পরেছিলেন। তাঁর ডান হাতের অনামিকায় হলদে পাথর কিছুদিন আগেও জ্বলজ্বল করত।

ঘরে দরজার কাছে কার ছায়া পড়তেই দয়ালবাবু মাথা তুলে দেখলেন। অন্য কেউ নয়—সারদা, সম্ভবত তাঁর জল-খাবার নিয়ে এসেছে। সারদার হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে দয়ালবাবু

নিশ্চিন্ত। সব দিকে ওর প্রখর দৃষ্টি। তার নাওয়া-খাওয়া, শোয়াওঠা সমস্ত সারদা লক্ষ্য করে। তিনি কাজ নিয়ে মেতে উঠলে সারদা রীতিমত বিরক্ত হয়। সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য অনুযোগ করে। কলকাতা থেকে বাইরে বেরোলে শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য পই-পই করে বলে। দয়ালবাবুর মনে হয় এক হিসেবে সারদা স্ত্রীর আসনটাই দখল করে নিয়েছে। বেঁচে থাকতে নিরুপমাও এমনি করে খবরদারি করত। তবে সে জোর খাটাত—হুকুমজারি করত। সারদা তা পারে না। সে অনুরোধ করে। দয়ালবাবু না শুনলে বড় জোর মুখ ভার করে ঘোরে। এর চেয়ে বেশি কিছু করবার জোর কোথায়?

জল-খাবারের প্লেটটা সামনে রেখে সারদা বলল—'দিলীপ একটু আগে ফোন করেছিল।'

দয়ালবাবু ফুলকো লুচির দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিলেন। কথাটা কানে যেতেই একটু চমকে উঠে বললেন—'ফোন করেছিল? কখন? আমি কোথায় ছিলাম?'

বাড়িতে একটাই ফোন এবং সেটা এ ঘরেই থাকে। সুতরাং ফোন এলে দয়ালবাবুই তা ধরবেন। সে কারণেই প্রশ্ন।

সারদা হেসে বলল—'আপনি তখন বাথরুমে ঢুকেছেন। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতেই আমি এসে ধরলাম। গলা শুনেই বুঝলাম দিলীপ। ছেলে তো ভীষণ অভিমান করে আছে। আপনি নাকি এ মাসে তাকে খরচের টাকা পাঠাননি?'

দয়ালবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—'টাকা পাঠাইনি সে কথা তো তুমি জানো। ফোন করে তোমার কাছে বুঝি দরবার করছিল?'

—'আজ্ঞে না। দিলীপ আমাকে ফোন করেনি। ও আপনাকেই খুঁজছিল। আপনি বাথরুমে আছেন শুনে দুঃখ করে এই সব বলছিল। সে নাকি হস্টেলে টাকা দিতে পারেনি। কাল পরশুর মধ্যে জমা না দিলে তার মিল বন্ধ হয়ে যাবে।'

হুম্। দয়ালবাবু গম্ভীর মুখ করে একটা ফুলকো লুচি হাতে তুলে নিলেন। বললেন—'আমি ইচ্ছে করেই ওকে টাকা পাঠাইনি সারদা। ছেলেটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। কিন্তু আমার মনে হয় গোপনে ওকে আরো কেউ টাকা জোগাচ্ছে। নইলে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ফুর্তি করবার মত টাকাকড়ি ও পাচ্ছে কোথায়?'

সারদা মুখ শুকনো করে বলল—'দিলীপ বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ফুর্তি করছে? টাকা ওড়াচ্ছে? আপনি কী বলছেন?'

—'ঠিকই বলছি সারদা, আমাদের অফিসের একজন লোক ওকে চেনে। সে আমার কাছে গল্প করছিল। দিলীপকে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় সে দু-তিন বার দেখেছে। চার-পাঁচ জন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ও মদ গিলছিল। খুব হইচই আর গুলতানি করছিল।'

'দিলীপ মদ খাচ্ছিল?' সারদা চোখ বড়ো করে তাকাল। 'তার কোনো ভুল হয়নি তো?'

—'ভুল হবার কথা নয়। কারণ দিলীপকে সে বহুবার দেখেছে। ভালো করে চেনে। কিন্তু তবুও আমি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখেছি, যা শুনেছি তা আরো কলঙ্কের কথা। ছেলেটা একেবারে অধঃপাতে গেছে।'

সারদা মুখ নিচু করে শুধোল—'কী শুনেছেন আমাকে বলুন।'

দয়ালবাবু একটু বেগুনভাজা মুখে দিয়ে বললেন—'একজন লোককে আমি ওর উপর লক্ষ্য রাখতে বলেছিলাম। সে আমাকে যা বলেছে তা মুখেও আনা যায় না। একটু থেমে তিনি আসল কথাটা ব্যক্ত করলেন—'শুধু মদ নয়। ছেলেটার অন্য দোষও হয়েছে। একটা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান

ছুঁড়ির সঙ্গে ও প্রায়ই ঘোরে, তার ফ্ল্যাটে যায়। হোটেলে মেয়েটাকে নিয়ে টুইস্ট পর্যন্ত নেচেছে। এরপর বল দিকি, অধঃপাতে যেতে আর কি কিছু বাকি আছে?'

সারদা খুব ব্যস্ত হয়ে বলল—'দিলীপ এমনিভাবে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে? আপনি এর একটা বিহিত করুন।'

—'আমি কী করতে পারি বলো? ভেবেছিলাম ছেলেটাকে মনের মত মানুষ করে তুলব। বি. এস-সি. পাশ করার পর ও বিলেত যাবে। যতদূর পড়তে চায় পড়বে। কোনোদিন না বলব না। আর যে স্বেচ্ছায় নিজের বাড়ি-ঘর, সুন্দরী স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছে সে যাক। তাকে আর কোনোদিন প্রয়োজন হবে বলে ভাবিনি। তার কথা মনেও হয়নি। ভেবেছিলাম আমার বিষয়সম্পত্তি, টাকা-কড়ি সব ভাগ করে দিয়ে যাব, বউমা আর দিলীপ দুজনেই সমান-সমান পাবে। বউমার আবর্তমানে তার সম্পত্তিও দিলীপের হবে। আর মণিরঞ্জন অল্পশিক্ষিত মানুষ। ব্যবসায় আমাকে সাহায্য করে। ওটা ওরই হবে। কিন্তু সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে সারদা, হিসেবে গরমিল হল বলে মনে হচ্ছে।'

সারদা ঠোঁট কামড়ে বলল—'দিলীপকে আপনি একটু শাসন করুন। আজ বিকেলে ও আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এই ছেলেটাও বিগড়ে গেলে আপনি কি সে ধাক্কা আর সামলাতে পারবেন?'

দয়ালবাবু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ নামিয়েই শুধোলেন—'দিলীপ আসবে বলেছে বুঝি? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

—'টেলিফোনে আমাকে তাই বলল।' একটু হেসে ফের যোগ করল—'না এসে উপায় কী বলুন? এমন কিছু লায়েক হয়ে যায়নি। দুধের ছেলে, সঙ্গদোষে বিগড়ে যেতে বসেছে। একটু দাবড়ে দিলেই শুধরে যাবে।'

দয়ালবাবু ম্লান হাসলেন। অনেকটা স্বগতোক্তির মত বললেন—'কেউ শুধরোয় না। কাউকে শোধরানো যায় না সারদা। দেখো তুমি চেষ্টা করে—আখেরে ওর ভাল হবে।'

সারদা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দয়ালবাবু তাকে শুধোলেন—'বউমা কোথায় বলতে পার?'

—'কোথায় আর থাকবে? ওর ঘরেই আছে।'

—'একটু পাঠিয়ে দাও তো আমার কাছে।'

সারদা খুব দ্রুত দয়ালবাবুর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। বলল—'এখনই ওকে গিয়ে বলছি। আপনি ডাকছেন শুনলেই দৌড়ে আসবে।'

জলখাবারের প্লেটটা তুলে নিয়ে সারদা চলে গেল। দয়ালবাবু চেয়ারে বসে তাঁর অফিসের একটা ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়লেন। আজ সারাদিন তিনি খুব ব্যস্ত থাকবেন। সন্ধের পর দিলীপের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে। রাত দশটা নাগাদ হরকান্ত আসবে। তার সঙ্গেও ফয়সালা হওয়া দরকার।

দরজার সামনে ফের কেউ এসেছে মনে হল। দয়াল দত্ত মুখ তুলে দেখলেন। তিনি ভেবেছিলেন শমিতা এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু না, শমিতা নয়। মণিরঞ্জন একটা কাগজ হাতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত কিছু বলতে চায়।

মণিরঞ্জন একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল—'উড়িষ্যায় যে মালটা পাঠানো হয়েছিল তা খারিজ হয়েছে। এইমাত্র চিঠি এল।'

দয়ালবাবু প্রায় চিৎকার করলেন—'সে কী? খারিজ হল কেন?'

মণিরঞ্জন মুখ নিচু করে জবাব দিল—'স্পেসিফিকেশন ঠিক হয়নি লিখেছে।'

'তার মানে? স্পেসিফিকেশন মিলিয়ে মাল জোগাড় করা হয়নি? ভুলচুক হল কেন?'

মণিরঞ্জন হাত কচলে জবাব দিল—'মেসিনারির পার্টস্গুলো নিয়েই গণ্ডগাল। এখানে যে কোম্পানিকে পার্টসগুলো তৈরি করতে দেওয়া হয়েছিল ভুল তারাও করেনি। সমস্ত মাল আমাদের অর্ডার মতই বানিয়েছে।

—'তাহলে?'

মণিরঞ্জন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর অপরাধীর মত মুখ কালো করে বলল—'ভুল আমাদেরই হয়েছে। স্পেসিফিকেশন পাঠাবার সময় আমরাই গণ্ডগোল করেছি।'

দয়ালবাবু ঠোঁট উল্টে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর প্রায় দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—'তুমি একটা অপদার্থ। এতগুলি টাকার মাল সব বুঝি বরবাদ হল। কত টাকা ক্ষতি হবে ভাবতে পার?'

মণিরঞ্জন নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

দয়ালবাবু খুব উত্তেজিতভাবে হাতের মুঠো ঘষছিলেন। তারপর কপালে হাত রেখে বললেন—'প্রায় চার হাজার টাকা লোকসান। এমনি ভাবে টাকা গচ্চা গেলে কোম্পানির আয়ু আর কদিন। মেসিনারি পার্টসগুলোর অর্ডার দেবার সময় তুমি কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?'

—'মণিরঞ্জন মুখ তুলে বলতে চেষ্টা করল—আজ্ঞে, ব্যাপারটা শুধু তাই নয়। আমি ঠিকই লিখেছিলাম। তবে টাইপ করার সময়—'

—'চুপ করো তুমি। দয়ালবাবু প্রায় গর্জে উঠলেন। 'যত সব দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক। আবার কৈফিয়ত দিচ্ছ আমার কাছে? গৌরী সেনের টাকা পেয়েছ। লোকসান-ক্ষতি হলে তোমাদের কী যায় আসে?'

মণিরঞ্জনকে এবার একটু শক্ত দেখাল। ঠোঁট দুটি বন্ধ হয়ে এল। চোখ দুটি ছোট। নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত। সে গম্ভীর মুখে বলল—'আজ্ঞে, আপনি আমার সব কথা শুনছেন না, ভুল-চুক হয়েছে সত্যি। কিন্তু তাই বলে এমনি করে—'

দয়ালবাবু এবার খেপে উঠলেন, —'কী বলছ তুমি? এতগুলো টাকা গচ্চা গেল, আর তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিচ্ছ?' একটু থেমে তিনি প্রায় ঘোষণা করলেন—'ঠিক আছে। তোমাকে আর দরকার নেই আমার। অফিসের কাগজপত্তর কাল সকালেই আমাকে বুঝিয়ে দিও। তোমাকে অনেক আশা করে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম এই ব্যবসা-পত্তর সব তুমিই দেখবে। তোমারই হবে। কিন্তু এখন দেখছি তুমি একটা ষাঁড়ের গোবর—অকর্মার ধাড়ি। যাও— আমার সামনে থেকে সরে যাও। তোমার মুখ দর্শন করতে চাইনে আমি। কাল সকাল দশটায় আমাকে অফিসে কাগজ-পত্তর বুঝিয়ে দিও। তারপর যেখানে ইচ্ছে যেতে পার।' মণিরঞ্জন চলে গেলে দয়াল দত্ত একটা গ্যাসশূন্য চুপসানো বেলুনের মত কতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। সমস্ত শরীরটা খুব ভারী, নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত আর অসহায় মনে হচ্ছিল তাঁর। অকস্মাৎ একটা প্রবল দমকা হাওয়ায় নিজের মন-গড়া সব স্বপ্নের প্রাচীর-টাচিরগুলি ঝুপ ঝুপ করে প্রায় নিঃশব্দে ভেঙে পড়ছে। আর তিনি এক অসহায় মূক প্রাণীর মত তাই চেয়ে দেখছেন।

হঠাৎ আঙুলের আংটিতে বসানো সেই রক্তমুখী নীলাটার দিকে দৃষ্টি পড়ল তাঁর। দয়ালবাবুর ভীষণ ভয় করল। তবে কি নীলাটাই তাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে? কিন্তু না। তান্ত্রিক সাধু যাবার আগে একটা কথা বলেছিল। বিপদ-আপদ দেখলে ডরালে চলবে না। কর্মফল যখন

শেষ হয়ে আসে, তখন ঝড়-ঝাপটা অশুভ ইঙ্গিত একটু বেশি হয়। কিন্তু ভয় থাকতে নয়। মনে রাখতে হবে, সামনে সুদিন। সাহসে বুক বাঁধতে হবে।

দয়াল দত্ত মুক্ত বায়ু প্রাণভরে টেনে নিলেন। হ্যাঁ, তার মনে হল তিনি সাহস ফিরে পাচ্ছেন। সাহসী তাঁকে হতেই হবে।

তিন

একটু পরেই শমিতা ঘরে এল।

বেশ বোঝা যায় অনেক বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েছে। এখনও চোখ-টোখ ফোলা, ঠোঁট শুকনো। চুল-টুল এদিক-ওদিক আলগা হয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি চিরুনি বুলিয়েছে, কিন্তু শিথিল খোঁপা স্বস্থানে ফেরেনি।

পুত্রবধূকে দেখেই দয়াল দত্ত ঠাণ্ডা জল। পরম স্নেহে সমাদর করে বললেন—'এস, মা এস। তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী। মুখ তুলে তোমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারিনে। তোমার সেবা যত্ন পর্যন্ত নিতে লজ্জা করে।'

শমিতা শ্বশুরের কাছে এসে বসল। অভিমান করে বলল—'আপনি তো আমাকে দূরেই রেখেছেন বাবা, কোনোদিন কাছে টেনে নিলেন না। এত কাছে থেকেও যে কত দূরে আছি, তা শুধু আমিই জানি।

দয়ালবাবু হেসে বললেন—'পাগলি মেয়ে। সারদাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার খোঁজখবর আমি দু'বেলা ওর কাছে নিই।' একটু থেমে ফের বললেন—'আমি মরমে মরে আছি মা। তোমাকে ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে এলাম। ভাবলাম তুমি সুখী হবে। সংসার আমার হেসে উঠবে। কিন্তু কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল, তোমার মুখে আর হাসি ফোটাতে পারলাম না।' কথা শেষ করে তিনি গভীর নিশ্বাস নিলেন।

শমিতা বলল—'পুরনো কথা থাক বাবা। এখন আমি বেশ আছি। প্রথম প্রথম কষ্ট হত ঠিকই। কিন্তু থাকতে থাকতে সব কেমন সয়ে গেছে। এখন আর কিছু মনে হয় না। আপনি মিছিমিছি এ নিয়ে চিন্তিত হবেন না।'

দয়ালবাবু মুখ নিচু করে বললেন—'কি জানো মা। তুমি গুণবতী মেয়ে। তাই এমন করে কথা বললে—নইলে তোমাকে এই ঘরে এনে আমি কী দিতে পেরেছি? তুমি যে আজও আমাব সংসারে আছ, এই ঢের। অন্য কোনো মেয়ে হলে কবে এই ঘরদোর ফেলে চলে যেত।' হাত বাড়িয়ে তিনি একটা খাম টেনে নিয়ে ফের বললেন—'জানো মা, এক এক সময় আমার মনে হয় যে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। প্রভঞ্জনের ব্যাপারটা নিশ্চয় আমার আগে জানা উচিত ছিল। তাহলে তোমার জীবনটা আজ এমন করে নষ্ট হত না।'

শমিতা সঙ্গে সঙ্গে বলল—'কী যে আপনি বলেন বাবা। আপনি কেন আমাকে ঠকাতে যাবেন? তাছাড়া বিদেশে ছেলে কোথায় কী করে বসে আছে, তা আপনার জানা সম্ভব নয়। আপনি নিষ্পাপ ভালমনে পুত্রবধূকে ঘরে এনেছিলেন। এতে আপনার দোষ কোথায়?'

দয়াল দত্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী দেখলেন। বললেন—'সারদা কোথায় জানো তুমি?'

শমিতা চিন্তা না করেই জবাব দিল—'বোধহয় রান্নাঘরে। আর কোথায় যাবে এখন।'

দয়ালবাবু একটু ঝুঁকে মুখ নামিয়ে বললেন—'শোনো বউমা, তোমার সঙ্গে আমার একটা

কথা আছে। একটু গোপনীয় কথা। তুমি এখনই কারো কাছে ভেঙো না। পরে অবশ্য সবাই জানবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি দু পা হাঁটলেন। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শমিতাকে বললেন—'বউমা, তুমি এদিকে এস তো।'

শমিতা খুব অবাক হয়ে শুধোল—'কী ব্যাপার বলুন তো বাবা? হঠাৎ দরজা বন্ধ করলেন যে—'

দয়ালবাবু ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে শমিতাকে বললেন—'খুব সাবধান বউমা। দেওয়ালেরও কান আছে জেনো।' হাতের খামটা শমিতাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—'এটা পড়ে দেখ বউমা। তুমি যদি রাজি হও, তাহলে আমি ভেবে দেখতে পারি।'

শমিতা খামটা খুলে পড়তে শুরু করল। দয়ালবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পড়া শেষ করে শমিতা খামটা ফিরিয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে সেটি নিয়ে দয়ালবাবু শুধোলেন—'কী মা, কিছু বললে না তো তুমি?'

শমিতা চোখ তুলে তাকাল না। মুখ নামিয়ে বলল—'আমি কী বলব বাবা? আপনি যা ভাল বুঝবেন'—কথা শেষ করেই সে আর দাঁড়াল না। ঘরের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরোতে গেল।

বাইরে পা দিয়েই শমিতার মনে হল, দরজার কাছে কেউ যেন এতক্ষণ আড়ি পেতে ছিল। খুব দ্রুত পা ফেলে কে যেন এখনই বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল। পায়ের শব্দ খুব হালকা নয়। বরং একটু ভারী। শমিতা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। এদিক ওদিক তাকাল। পায়ের শব্দটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে কোন দিকে গেল, সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারল না।

সন্ধের একটু আগেই দয়াল দত্ত ফিরে এলেন। বিকেল থেকে বেশ বর্ষণ নেমেছে। খুব প্রবল নয়, ছিপছিপে বৃষ্টি। আকাশের গা থেকে, ভেজা শাড়ির প্রান্ত বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের মতন বৃষ্টির ধারা ঝরছে তো ঝরছেই। দয়ালবাবু একটু ভিজেছেন। মাঝে মাঝে হাঁচছেনও। বলা যায় না, হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে। এরপর জ্বরজারি আরো কি না হতে পারে।

ঘরে ঢুকে বসতেই সারদা এসে বলল—'দিলীপ এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করবার সাহস নেই ছেলের। আমাকে বলছে—মাসিমা তুমি সঙ্গে করে নিয়ে চলো।' সারদা মুচকি হেসে ফের বলল—'ভীষণ ভয় পেয়েছে। আমি সব কথা ওকে বলেছি। শুনে লজ্জায় লাল। মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না। আমি বললাম কর্তা খুব রেগে গেছেন। তুমি কি সব কাণ্ড শুরু করেছ। দুধের ছেলে—এই বয়সে মদ গিলছ কোন আক্কেলে? শুনে মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু। বলছে—মাসিমা, যা করেছি সব বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। আর কোনোদিন করব না।'

দয়ালবাবু শুধু কথাগুলি শুনলেন। কোনো প্রতিবাদ করলেন না। বললেন—'আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবে তো?'

'আমি তো তাই বলছি।' সারদা সোৎসাহে শুরু করল—'ঘরের ছেলে। এতদিন পরে এল। একটা রাত্তির থাকবে না?' একটু থেমে সে লজ্জিত মুখে বলল—'আজ খিচুড়ি করব ভাবছি। ইলিশ মাছ ভাজা আর গরম খিচুড়ি। যা বাদলা করেছে, থামবে বলে মনে হয় না। তাই দিলীপকে থাকতে বলেছি। খিচুড়ি খেতে ও খুব ভালবাসে। মেস-হোটেলে থাকে। এ সব কি আর খেতে পায়?'

দয়ালবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন—'আধঘণ্টা পরে ওকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও। তার আগে একটু আদার রস মিশিয়ে এক কাপ চা পাঠাবে।'

সারদা ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

দয়ালবাবু জামাকাপড় বদলে বিছানায় খানিকক্ষণ শুয়ে রইলেন। তিনি গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন। সারদা চায়ের কাপ নিয়ে ফিরতেই বললেন—'আজ রাত্তিরে আসানসোল থেকে একজন লোক আসবে। এখানেই খাবে। মণিরঞ্জনের পাশের ঘরটা খালি আছে। রাতে ওখানে শোবার ব্যবস্থা করে দিও।'

সারদা মেয়েলি কৌতূহল প্রকাশ করে বলল—'কে আসবেন? সেই হরকান্তবাবু তো?'

'তুমি চেন নাকি?'

'নাম শুনেছি।' সারদা মুচকি হাসল। একটা গোপন রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে সে বলল—'আমি জানি উনি আসবেন। মণিরঞ্জন আমাকে বলেছে।'

দয়ালবাবু ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকালেন। তিনি ভাবছিলেন ব্যাপারটা মণিরঞ্জন কেমন করে জানল? গতকাল সন্ধের পর হরকান্তের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। তখন রাত আটটার মত হবে। ঘরে কেউ ছিল না। মণিরঞ্জন একতলায় থাকে। একেবারে কোণের দিকে তার ঘর। তবে কি টেলিফোন করবার সময় সে আড়ি পেতেছিল? গোপনে হরকান্তের সঙ্গে তার কথাবার্তা সব শুনেছে? তাঁর মনে কাঁটার ব্যথার মত একটা খটকা রয়ে গেল।

সারদা চলে যাবার খানিক পরেই দিলীপ এসে ঢুকল। তার দিকে এক নজর তাকিয়েই দয়ালবাবুর মেজাজ খিঁচড়ে উঠল। সারদা যা বলেছে সব ডাহা মিথ্যে। ছেলেটাকে দেখে মোটেই অনুতপ্ত বলে মনে হল না। চোঙা প্যান্ট পরনে। চেক-কাটা হাওয়াই শার্ট গায়ে। চুলগুলি ফোলা-ফাঁপা। পায়ে ছুঁচোলো জুতো। ঘরে ঢুকবার আগে দয়া করে যেন সেগুলি বাইরে ছেড়ে রেখেছে।

দিলীপের বয়স সতেরো আঠারো হবে। শরীর স্বাস্থ্য বেশ মজবুত। রীতিমত ভালোই বলা যায়। শক্ত চওড়া কব্জি। প্রশস্ত কাঁধ... দৃঢ় পুরুষালি গড়ন। এতক্ষণ সম্ভবত ও এক তলায় আড্ডা জমিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় দিলীপ শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজছিল। সস্তা হিন্দি গান। দয়ালবাবু স্বকর্ণে শুনেছেন।

দিলীপ টেবিলের কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না।

দয়ালবাবু বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন— 'কী চাও তুমি?'

'এমাসে হোস্টেলে টাকা দেওয়া হয়নি। কাল জমা দিতে না পারলে মিল বন্ধ হয়ে যাবে।' দিলীপ স্পষ্ট বলল।

'কেন টাকা পাওনি জেনেছ?'

দিলীপ কোনো জবাব দিল না। শক্ত, টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দয়ালবাবু ঠাণ্ডা অথচ ঝাঁঝালো গলায় শুধোলেন—'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়িটার সঙ্গে কতদিন মিশছ? রাত দুপুর পর্যন্ত হোটেল—রেস্টুরেন্টে হই-হল্লা করছ কবে থেকে?'

দিলীপ ঘাড় সোজা করেই উত্তর দিল—'ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নয়। আপনি ভুল শুনেছেন। আর হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেতে গেছি। হৈ-হল্লা করতে নয়।'

'হুম।' দয়ালবাবু ধারালো দৃষ্টিতে দিলীপকে জরিপ করলেন। বললেন—'মেয়েটা কী জাত হবে? বামুন-কায়েত নাকি? আর হোটেলে কী খেতে গিয়েছিলে? সুরা না অমৃত?' শেষের কথাগুলি তিনি ব্যঙ্গ করে বললেন।

দিলীপ ধীরে ধীরে বলল—'মেয়েটি জু। যাকে আমরা ইহুদী বলি। ওরা অনেকদিন ধরে কলকাতার বাসিন্দা। আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আছে। এই পর্যন্ত আপনাকে বলতে পারি। আর হোটেলে গিয়ে মাঝে-মধ্যে একটু ড্রিঙ্ক করলেই মানুষ অস্পৃশ্য হয়ে যায় না। আজকাল তো কত লোক যাচ্ছে। অন্য দেশে লোকে তো জলের বদলে বিয়ার খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেয়। আপনি

নিশ্চয়ই সব জানেন?'

কথা শুনে দয়ালবাবুর মেজাজ প্রায় সপ্তমে চড়ল। ছেলেটা কবে থেকে এমন বেহায়া হয়ে উঠল। অনায়াসে তার সামনে ছুঁড়িটার সপক্ষে ওকালতি করছে? আবার মদ খেয়ে বড়াই করতেও বাধছে না।

দয়াল দত্ত মুখ কুঁচকে বললেন—'তুমি উচ্ছন্নে গেছ। নইলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলতে পার? দূর হও—আমার সামনে থেকে এখনই দূর হয়ে যাও। এক কানাকড়িও তোমাকে দিচ্ছিনে। আশ্রমে উচ্ছিষ্ট খেয়ে মানুষ হচ্ছিলে। আমি মহামূর্খ—তাই তোমাকে সমাদর করে ঘরে এনেছিলাম। টাকা-পয়সা ব্যয় করে মানুষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। তোমার পরিচয় জানতে পেরে ভালই হল। আর একটা মহা ভুলের হাত থেকে রেহাই পেলাম।'

দয়ালবাবু তাকিয়ে দেখলেন দিলীপের দুই চোখে আক্রোশ আর জ্বালা। মুখখানা লোহার মত শক্ত—দয়া-মায়া হীন। সে চোখ ছোট করে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে গটগট করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। একবার ফিরেও চাইল না।

দিলীপ চলে যাবার খানিক পরেই সারদা প্রায় ঝড়ের মত এসে পৌঁছল। কোনো ভূমিকা না করেই সরাসরি বলল—'ছেলেটাকে কী বলেছেন আপনি? সে রাগারাগি করে এখনই চলে যাচ্ছিল। আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারিনি। শেষে বউমা অনেক বঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনমতে তাকে আটকে রেখেছে।'

দয়ালবাবু একবার সারদার দিকে তাকালেন। বললেন—'ও চলে যাবে আমি জানি। মিছিমিছি আটকাতে গেলে কেন? বউমারই বা এ কি রকম আক্কেল?'

'আটকাবে না?' সারদা প্রতিবাদ করল—'ঘরের ছেলে। না খেয়ে দেয়ে বিষ্টি বাদলের মধ্যে কোথায় যাবে? আপনি কি পাগল হলেন?'

দয়ালবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আমি পাগল হইনি সারদা। ঠিকই বলছি। দিলীপের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। কাল সকালে উঠেই ও যেন এ বাড়ি থেকে চলে যায়। তবে ওকে বলো, নিঃসম্বল অবস্থায় আমি কাউকে তাড়াই নে। যাবার আগে ও আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে যেতে পারে। তাতে অন্তত কিছুদিন ওর ভালভাবে চলে যাবে।'

দয়ালবাবু জবাবের জন্য অপেক্ষা করলেন না। একটু এগিয়ে দরজার বাইরে পা বাড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে বারান্দার একেবারে কোণে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলেন।

হরকান্ত দশটার আগেই এসে পৌঁছল। তার হাতে একটি ছোট সুটকেস। পরনে ধুতি, একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। সেগুলি জলে সামান্য ভিজেছে বলে মনে হল। সে দয়ালবাবুর সঙ্গে দেখা করেই বলল—'হঠাৎ ডেকে পাঠালেন যে? বিষ্টিবাদলায় আসার যা ঝক্কি।'

দয়ালবাবু কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন—'তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে খাওয়া দাওয়া করো। তারপর একবার আমার ঘরে আসবে।'

হরকান্তকে নিয়ে মণিরঞ্জন গেল তার ঘরটা দেখিয়ে দিতে। দয়ালবাবুর মনে হল মণিরঞ্জন যেন হরকান্তের সঙ্গে ফিসফিস করে কী কথাবার্তা বলছে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগল। হরকান্ত ওর পাশের কামরাতেই থাকবে। ইচ্ছে করলে দুজনে সারারাত্তির গল্প করতে পারে। এখনই গুজগুজ ফুসফুস করবার কারণ কী?

সারদা এসে ঘরে ঢুকল। মাথার শিয়রে ছোট তেপায়া টেবিলটার উপর এক গ্লাস জল ঢাকা দিয়ে রাখল। বলল—'আপনি শুয়ে পড়লে আমি মশারিটা গুঁজে দিয়ে যেতাম।'

দয়ালবাবু বললেন—'তুমি শুয়ে পড়োগে। আমার আজ বিছানায় যেতে দেরি হবে। হরকান্তের

সঙ্গে অনেক কথাবার্তা আছে।'

'আমি তাহলে জেগে থাকি।' সারদা জানাল। 'আপনার কথাবার্তা শেষ হলে আমায় ডাকবেন। মশারিটা গুঁজে দিয়ে যাব।'

দয়ালবাবু প্রথমে বললেন—'কী দরকার? আমি গুঁজে নেব।' পরে নিজের অনভ্যাস এবং অক্ষমতার কথা স্মরণ করে আত্মসমর্পণ করলেন। সারদাকে বললেন—'ঠিক আছে। আমি ডাকলেই তুমি এসো।'

সারদা চলে যাবার একটু পরেই হরকান্ত এল। দয়ালবাবু দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। প্রথমে ব্যবসাপত্তর নিয়ে ছোটখাটো আলোচনা হল। টুকিটাকি কথাবার্তা। তারপর দয়ালবাবু আসল বক্তব্যে এলেন। বললেন—'মেসিন বিক্রির তেত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র পঁচিশ হাজার অফিসে এসে পৌঁছেছে। বাকিটা কোথায়?'

হরকান্ত তাকে ডেকে পাঠাবার কারণটা বুঝতে পেরেই সতর্ক হল। সে জবাব দিল—'টাকাটা এখনও ওরা দেয়নি।'

'কবে দেবে বলেছে?'

'তাও এখন ঠিক জানায়নি। মনে হয় শিগ্‌গির দেবে।'

'দিলেই তুমি নিশ্চয় অফিসে পাঠাবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে আর বলতে'—হরকান্ত সবিনয়ে নিবেদন করল।

'মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর।' দয়ালবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। আমার সামনে বসে এইভাবে একটার পর একটা মিথ্যে কথা বলতে তোমার এতটুকু বাধছে না?'

হরকান্ত সোজা হয়ে বসল। 'আপনি এসব কী বলছেন?' সে একটু কড়া হতে চাইল।

দয়ালবাবু আগের মতই খাপ্পা রইলেন। 'ঠিকই বলছি। আমি খবর পেয়েছি টাকাটা তুমি নিয়ে এসেছ। একবার নয়, দুই খেপে। তারপর সেটা কীভাবে ব্যবহার করেছ তা তুমিই ভাল করে জানো। অবশ্য আমিও কিছু কিছু শুনেছি।'

হরকান্ত ধরা পড়ে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠল। যে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল—'আপনি বললেই হল আমি টাকাটা নিয়ে এসেছি? কোম্পানি বলে আর উপুড় হস্ত করবার নামটি করছে না। আর টাকাটা নিয়ে আমি নিজেই কাজে ব্যবহার করছি? আপনি দেখছি দিব্যি লোকের নামে যা-তা বলে বেড়াতে পারেন।'

দয়ালবাবু এবার রাগে ফেটে পড়লেন। 'কী বললে তুমি? আমি মিথ্যে করে তোমার নামে এসব কথা বলছি? আট হাজার টাকা তুমি কোম্পানির ঘর থেকে নিয়ে আসনি? আসানসোলে বেনামে সাপ্লাইয়ের কারবার শুরু করোনি তুমি? টাকাটা কেন তোমার প্রয়োজন হয়েছে তা বুঝতে আমার বাকি নেই হরকান্ত।' কথা শেষ করে তিনি একটু দম নিলেন। তারপর বললেন—'পরশু সকাল দশটার মধ্যে আট হাজার টাকা আর অফিসের কাগজপত্তর আমাকে সমঝে দিয়ে যাবে। আসানসোল অফিসে পরশু থেকেই অন্য লোক বসবে। তোমার মত অংশীদারে আমার প্রয়োজন নেই। অবশ্য তোমার পাওনা কড়ি যা আছে সব পরশুই পেয়ে যাবে। আর এই কথার যদি হেরফের হয়, তাহলে তোমার নামে আমি মামলা আনব। তহবিল তছরুপ আর বিশ্বাসভঙ্গের মামলা—ক্রিমিন্যাল কেসে ফেলে তোমাকে কেমন করে জব্দ করতে হয় সে আমি জানি।'

হরকান্তের মুখ দেখে মনে হল সে একটু ভয় পেয়েছে। কিন্তু কথায় তা ভাঙল না। চেয়ার ছেড়ে সে এক সেকেন্ডে ঘোড়ার মত খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বলল—'আপনার যা খুশি করবেন, কারো তোয়াক্কা রাখিনে। আমি হরকান্ত বিশ্বাস, আমার পদবির একটা অর্থ আছে। ভুল অর্থ করলেই অনর্থ হবে জানবেন। তারপর কে জেতে কে হারে সে পরে দেখা যাবে।'

দয়ালবাবুর ইচ্ছে করছিল টেবিলের উপর থেকে পেপার ওয়েটটা তুলে হরকান্তের মুখে ছুড়ে মারেন। কিন্তু হাত নিসপিস করলেও উঠল না। হাজার হোক অতিথি। একটা রাত মাত্র কাটাবে। প্রায় নিশীথে বৃষ্টি বাদলায় তাকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দিলে যে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি হয়। দয়ালবাবুর নিভৃত অন্তরবাসী ভদ্র গৃহস্থ মন তার বাইরের কুপিত বন্য রূপকে প্রায় জোর করেই শাসনে আনল।

হরকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সারদা এসে ঘরে ঢুকল। একরকম ধমক দিয়েই সে বলল—'রাত দুপুরে আপনি কী শুরু করেছেন বলুন তো? আজ কি কারো সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন না বলে ঠিক করেছেন? সকাল থেকে কী মতি হয়েছে আপনার? ঝি-চাকর, লোকজন সবাই যে ছি ছি করছে।'

দয়ালবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—'তোমাকে কে আসতে বলেছে? এখনও শুতে যাওনি কেন?'

সারদা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'বারে! আপনিই তো আমাকে জেগে থাকতে বললেন। বিছানায় উঠলে পর মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিতে হবে না? কবে আর নিজে মশারি ঠিকঠাক করে নিয়েছেন।'

'আজ আমি নিজেই মশারি গুঁজে নেব। তুমি শুয়ে পড়ো গে।' দয়ালবাবু হুকুম করলেন।

কিন্তু শুধু মশারি নয়। রাত্তিরে বিছানা যাবার আগে তিনি একটা ওষুধ খান। দুটো করে ট্যাবলেট। ডাক্তারের নির্দেশ। আজ উত্তেজনায় তাও ভুলে গেছলেন। সারদাই সে কথা মনে করিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি ট্যাবলেট দুটো তার হাতে এনে দিল। বেশ খানিকটা জল মুখে নিয়ে দয়ালবাবু বড়ি দুটো মুখের মধ্যে ফেলে দিলেন। তারপর ঢকঢক করে আরো কিছুটা জল খেয়ে বাথরুমের দিকে এগোলেন।

দয়ালবাবু লক্ষ্য করেননি। নইলে দেখতে পেতেন অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সারদা তাঁকে লক্ষ্য করছে। শুধু সারদা নয়। চেঁচামেচিতে শমিতাও সজাগ হয়েছিল। এত রাত্তিরেও তার চোখে ঘুম আসেনি। আজ সন্ধেয় ফের একখানা চিঠি সে পেয়েছে। অন্ধকারে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শ্বশুরকে শমিতা দেখছিল। হঠাৎ চিঠিখানার কথা ভেবে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সমস্ত রাত্তির ধরে টুপ টুপ বৃষ্টি ঝরছে। ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। কাঁদুনি খুকির মত সারারাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। তার সঙ্গে হু-হু পুবে হাওয়া। মেঘের ডাক...বিদ্যুতের ঝলকানি। মাঝ রাতে প্রচণ্ড শব্দে বার দুই বাজ পড়েছিল।

সকালে কর্তার ঘরে ঝাঁট দিতে ঢুকে বাড়ির ঝি মেয়েটা একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠল। ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, অল্প একটু ফাঁক বাইরে থেকেই তার চোখে পড়ে। অন্যদিন দরজাটা খোলাই থাকে। দয়ালবাবু নীচে নেমে বাগানে পায়চারি করেন। কোনোদিন গেট পেরিয়ে রাস্তা ধরে কিছুটা হাঁটেন। সেদিন দরজা খোলাই থাকে। তবু ঝি মেয়েটা ভেবেছিল কর্তা সকালে উঠেই বেরিয়েছেন। ভুল করে কেউ কিংবা হয়তো কর্তা নিজেই দরজাটা বন্ধ করে রেখে গিয়েছেন। তাই সে সাহস করে ভেজানো দ্বার ঠেলে ভিতরে ঢুকেছিল। ভেবেছিল ঝাঁটপাট সেরে ফের দরজাটা অমনি ভেজিয়ে রেখে চলে আসবে।

মেয়েটার চিৎকারে আর গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় সবাই ছুটে এল। সারদা, শমিতা, মণিরঞ্জন, দিলীপ, চাকর-বাকর প্রায় কেউই বাদ রইল না। শুধু হরকান্ত ছাড়া। চেঁচামেচি হই-হট্টগোল শুনেও সে উঠে আসেনি। মণিরঞ্জন আসবার সময় দেখেছে তার ঘরের দরজাটা বন্ধ। সম্ভবত ভিতরে সে এখনও ঘুমে অচেতন।

দৃশ্য দেখে সারদা করতলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। শমিতা একবার তাকিয়েই হাউমাউ করে

কেঁদে উঠল। মণিরঞ্জন বিছানার দিকে এক পা বাড়িয়েছিল। কর্তার অবস্থা দেখে সে শিউরে উঠে ফের কিছুটা গম্ভীর মুখে মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করল—'উনি কি তাহলে আত্মহত্যা করলেন?'... গলায় বড় বড় দুটো কাটা দাগ, বিশ্রী অকল্পনীয় ক্ষত। ঠিক রাক্ষসের হাঁ মুখের মত ভয়ঙ্কর। অথচ মুখের দিকে তাকালে মনে হবে মানুষটা এখন ঘুমোচ্ছে। আধবোজা চোখ অল্প একটু ফাঁক করা দুটি ঠোঁট। মাথার চুলগুলি ঝড়ে তছনছ ধানক্ষেতের মত এপাশে ওপাশে ছড়ানো। শুধু ডান হাতের দিকে তাকালেই সব রহস্যের অবসান। একটা ক্ষুর হাতের মুঠোয় ধরা আছে। চকচকে ধারালো ক্ষুরটা। এই অস্ত্রটার সাহায্যেই দয়ালবাবু নিজের গলা কেটেছেন সম্ভবত প্রচুর রক্তপাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

মণিরঞ্জন দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'কি সাংঘাতিক ব্যাপার। এখনই পুলিশে একটা খবর দিতে হয়।'

দিলীপ কোনো কথা না বলে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ডায়াল করে বলল—'হ্যালো, পুলিশ স্টেশন—'

চার

আধঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ এসে পৌঁছল।

জিপের শব্দ শোনা যেতেই সকলে উৎকর্ণ হয়েছিল। চাকর-বাকর সবাই তখন বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। শমিতা একটা চেয়ারে বসে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সারদা কাঁদেনি। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকানো যায় না। শূন্য দৃষ্টি। ঠোঁট দুটি মাঝে মাঝে থর থর করে কাঁপছে। দিলীপ একটা চেয়ারে চুপ করে বসেছিল। মণিরঞ্জন স্থির থাকতে পারছিল না। শুধু পায়চারি করছিল আর মাঝে মাঝে স্বগতোক্তির মত বলছিল—মামা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন।

জিপ থেকে নেমেই রাজীব বলল—'মিছিমিছি আমাকে টেনে নিয়ে এলে সুব্রত। ভদ্রলোক ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করেছেন। তুমি থানার দারোগা—প্রাথমিক পরীক্ষা করে ডেড্‌বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দেবে। এতে আর কী করবার আছে?

সুব্রত প্রতিবাদ করে বলল—'না রাজীবদা। সুইসাইড কেসগুলোকে আমি সাদামাটা চোখে দেখতে চাইনে। ওগুলো অত সহজ সরল নয়। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে। কোনটা যে সুইসাইড আর কোনটা যে হোমিসাইড তা এক বিধাতা পুরুষ আর হয়তো আপনি বলতে পারবেন। আমি তদন্ত করে কিছুতেই ধরতে পারিনে।'

রাজীব হেসে বলল—'আস্তে আস্তে ঠিকই চিনতে পারবে। কিছু অভিজ্ঞতা দরকার সুব্রত। অভিজ্ঞতা না হলে কেমন করে রোগ ধরবে? শুধু পুঁথি পড়া বিদ্যেয় কি কাজ হয়?

পুলিশ দেখে মণিরঞ্জন প্রথম এগিয়ে এল। বলল—'আসুন। বাড়িতে সবাই বড় কান্নাকাটি করছে। মামা হঠাৎ আত্মহত্যা করবেন বলে কেউ ভাবতে পারেনি।'

রাজীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মণিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দেখলেই মনে হয় লোকটা বেশ চিন্তিত। হঠাৎ যেন বড় ভাবনায় পড়েছে।

সুব্রত শুধোল—'মৃতদেহটা কোথায়?'

'মামার শোবার ঘরে। বিছানায় শুয়েই মামা গলায় ক্ষুর বসিয়েছেন। দেখলে মনে হবে বালিশে

মাথা দিয়ে মামা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। শুধু গলার কাটা দাগ দুটো দেখলেই হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে আসে'।

'গলায় কটা দাগ বললেন?' রাজীব প্রশ্ন করল।

'আজ্ঞে দুটো ক্ষত। মরবার জন্য বাবা কি গভীরভাবে নিজের হাতে গলা কেটেছেন। দুটো দাগই বেশ ডিপ— দেখলে শিউরে উঠবেন।'

রাজীব এক মুহূর্ত চিন্তা করল। বলল—'চল সুব্রত। ডেডবডিটা আগে দেখে আসি। নইলে কিছুই বলা যাবে না।'

একটু এগোতেই দিলীপের সঙ্গে দেখা হল। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

সুব্রত শুধোল—'আপনিও কি এই বাড়িতে থাকেন?'

দিলীপ কিছু জবাব দেবার আগেই মণিরঞ্জন বলল—'আজ্ঞে মামা ওকে খুব ছোটবেলা থেকে এনে মানুষ করেছেন। তবে দিলীপ হস্টেলেই বড় হয়েছে। সেখানেই থাকে। কাল সন্ধের একটু আগে মামার সঙ্গে দেখা করবে বলে এসেছিল। তবু ভাগ্যিস এল, তাই মামার সঙ্গে শেষ দেখাটা হল।' শেষের কথাগুলি সে সখেদে ব্যক্ত করল।

রাজীব বাধা দিয়ে বলল—'জিজ্ঞাসাবাদ পরে হবে সুব্রত। আগে মৃতদেহটা দেখি চলো। যদি সুইসাইড সাব্যস্ত হয়, তাহলে আর মুখ নষ্ট করে লাভ কী?' পরে মণিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল—'চলুন আপনারা। আগে মৃতদেহ ইন্সপেকশন করে আসি। কোন ঘরটায় ডেডবডি রয়েছে দেখাবেন চলুন।'

সকাল সাতটার মত। এখনও আকাশে মেঘ ঘুরছে। টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে ইলিশ মাছের রঙের ঝলমলে রোদ্দুর দুষ্টু ছেলের মত জননী ধরিত্রীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। মাঝে মাঝে ধরা দিচ্ছে। ফের লুকোচ্ছে...আবার হেসে হুটোপাটি করে মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ছে।

ঘরটার মধ্যে ঢুকেই রাজীবের কেমন দম ফুরিয়ে আসছে বলে মনে হল। কাল বিষ্টি বাদলার জন্য জানালা কপাট সব বন্ধ ছিল। নইলে রাত্রে জলের ছাঁটে ঘর দোর সব ভেসে যেত। বন্ধ জানালা এখনও খোলা হয়নি। তাই ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসা, স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ। বাতাসটা ভারী মনে হয়।

রাজীব বলল—'জানালাগুলো কেউ খুলে দিন। আলো না ঢুকলে ডেড্‌বডিটা ভালো করে দেখা হবে না।'

দিলীপ ইঙ্গিত করতেই একটা চাকর জানালাগুলো তাড়াতাড়ি খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আলোর বন্যায় ঘরটা যেন হেসে উঠল।

বিছানার মশারিটা এখনও গোঁজা। বালিশের উপর মাথা দিয়ে ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন। কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্নমাত্র নেই। গলায় দুটো ক্ষতের দাগ। ডান দিক থেকে সামান্য একটু বাঁকাভাবে নেমে বাঁ দিকে গেছে। ক্ষতের দু দিকেই গভীরতা কম বেশি একই। ডান হাতের মুঠোয় ক্ষুরটা ধরা আছে।

সুব্রতের কানের কাছে মুখ নামিয়ে রাজীব বলল—'ভালো করে লক্ষ্য করো দেখি। ক্ষুরটা কি শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরা আছে বলে মনে হয়?'

কিছুক্ষণ দেখে সুব্রত বলল—'শক্ত করে বোধহয় নেই। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?'

কোনো উত্তর না দিয়ে রাজীব একটু হাসল।

বালিশের নীচে বই মতন কি একটা উঁকি দিচ্ছে। রাজীব কৌতূহলি হয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেল। সমস্ত বিছানাটা রক্তে ভিজে লাল। বালিশেও রক্তের দাগ। খুব সন্তর্পণে মশারিটা একটু তুলে রাজীব বই গোছের জিনিসটি টেনে বের করল। খুলে দেখতেই বোঝা গেল ওটি বই নয়।

ডায়েরি—ঠিক রোজনামচাও বলা যায় না। কারণ প্রতিদিন নিয়মিত ওটি লেখা হয়নি। মাঝে মাঝে লিখেছেন। কখনও তিন—চার দিন বাদে, কখনও বা পক্ষকালের ব্যবধান রয়েছে। রাজীব মনে করল গতকাল রাত্রেই ওটি শেষ লেখা হয়েছে দেখবে। কিন্তু না—ডায়েরিতে সর্বশেষ তারিখ হল ঠিক আগের দিনের। রাজীব ভাবছিল হঠাৎ ডায়েরিটা বালিশের তলায় এল কেমন করে? তবে কি বিছানায় শুয়ে নিজের লেখা ডায়েরির পাতা ওল্টানো অভ্যেস ছিল দয়ালবাবুর?

হঠাৎ ডায়েরির একটা পাতা খুলে রাজীবের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ইঙ্গিতে সুব্রতকে সে কাছে ডাকল। বলল—'এখানটা পড়ে দেখ। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হবে।'

সুব্রত তাড়াতাড়ি ডায়েরির পাতার উপর ঝুঁকে পড়ল।

উনিশে আগস্ট

...গতকাল নীলাটা আনুষ্ঠানিক ভাবে ধারণ করেছি। এই কদিন ওটা কাপড়ে বেঁধে হাতে জড়িয়ে রাখতাম। রাত্তিরে বালিশের নীচে থাকত। তান্ত্রিক বলেছিল পাথরটাকে এইভাবে যাচাই করে নিতে। যদি সহ্য হয়, তাহলে যেন সোনার আংটিতে বাঁধিয়ে নিয়ে পরি। রক্তমুখী নীলাটা জোগাড় করতে রীতিমত হিমশিম খেয়েছি। কলকাতার অনেক দোকানে যেতে হল। শুধু নীলা হলেই তো চলবে না। বেশ বড় সাইজের পাথর হওয়া চাই। আর সেটি যদি অন্য লোকের সহ্য না হয়ে থাকে, তাহলে সব চেয়ে ভাল ফল হবে। মনের দুঃখ চলে যাবে। যে ঘর ছেড়ে চলে গেছে, সে আবার বাড়িতে ফিরে আসবে। কিন্তু আমার কেমন বিশ্বাস হয় না। একটা পাথর পরলেই কি এই সব অঘটন সত্যি হতে পারে? প্রভঞ্জন আবার বাড়িতে ফিরে আসবে? তাই কি কখনও সম্ভব?

পুনরায় তিনদিন পরে ডায়েরিতে কালির আঁচড় পড়েছে।

তেইশে আগস্ট

... পরাশর জুয়েলার্সের মালিক ঠিকই বলেছিলেন। পাথরটা সাংঘাতিক। অনেকের সহ্য হয়নি। কারো বা সর্বনাশ করেছে। এক ভদ্রলোক নীলাটা ধারণ করবার পরই তার ডান হাতটা পঙ্গু হয়ে যায়। আর কোনোদিন সে হাত তুলতে পারেনি। অন্য এক ভদ্রলোক নীলাটি নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি থাকতেন দার্জিলিঙের কাছে। একদিন ঘোড়ায় চেপে যাবার সময় সামনে একটা ছোট নালা পড়ে। অনায়াসে সেই ছোট নালা ডিঙিয়ে যাবার কথা। কিন্তু ঘোড়াটা পা হড়কে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে তিনিও। যে হাতে আংটি পরেছিলেন সেই হাতটা গেল ভেঙে। আশ্চর্য! আর কোনোদিন সে হাত ঠিক হল না। চিরকাল অকেজো হয়ে রইল। এতসব কথা মনে হচ্ছে নানা কারণে। পরশুর আগের দিন রাতে এবং গতকালও আমি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি। অন্য কেউ হলে নিশ্চয় খুব ভয় পেত। অবশ্য ভয় আমিও পেয়েছি, কিন্তু তাই বলে পিছু হটব না। শেষ পর্যন্ত দেখব। প্রথম রাত্তিরের কথাই বলি। কত রাত আমার ঠিক মনে নেই। বিছানায় শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। মনে হল এক ভীষণ দর্শন ঘোর নীলবর্ণ পুরুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। মুখের দিকে একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে। আমি বললাম—কে তুমি? কী চাও? সে গম্ভীর গলায় বলল—তোর গলাটা কেটে ফেল। এই নে ক্ষুর। আমি প্রতিবাদ করে বললাম—কেন? কেন আমি গলা কাটতে যাব? তখনই সে হো হো করে হেসে কোথায় মিলিয়ে গেল। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। সেই মুহূর্তেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে দেখি কলকল করে ঘেমেছি। চাদরটা ভিজে জবজবে... ফের কাল রাত্তিরেও একই স্বপ্ন দেখলাম। সেই ভয়ঙ্কর নীলবর্ণ পুরুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই সে বলল—এখনও গলা কাটিসনি? আয় আমিই ওটা কেটে দিচ্ছি। এই বলে সে ধারালো চকচকে একটা ক্ষুর হাতে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি একটা আর্তনাদ করে জেগে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি ভয়ে, অবসাদে, আমি আগের মতই ঘেমে নেয়ে উঠেছি—

রাজীব পাশে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল—'পরের পাতাটাও একটু দেখো সুব্রত। এই কথাগুলিও বিশেষ অর্থবহ মনে হয়।'

সুব্রত পাতা উল্টে ফের পড়া শুরু করল।

চব্বিশে আগস্ট—

তান্ত্রিক সাধুর কথা কি সত্যি হবে? খুব আশ্চর্য হচ্ছি। কালই সে চিঠি লিখেছে। কিন্তু এখন আমার কি কর্তব্য? আমি যে অন্যভাবে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। অবশ্য সবই এখনও পাল্টানো যায়। সবই করা সম্ভব—

রাজীবের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল—'মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের একটা মানসিক রোগ-টোগ হয়েছিল। নইলে এমন উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখতেন কেন? শেষ পর্যন্ত বোধহয় ওর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে ওকে ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতেই হবে। ব্যাপারটা একজন সাইকোলজিস্টের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার রাজীবদা। দয়ালবাবুর আত্মহত্যা করবার পিছনে মনের উপর কোনো প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় কাজ করেছে।'

মৃতদেহের উপর একবার চোখ বুলিয়ে রাজীব বলল—'দয়ালবাবু সুইসাইড করেছেন বলেই তোমার ধারণা, তাই না সুব্রত?'

'আমার তো তাই মনে হয় রাজীবদা। বিশেষ করে ডায়েরির এই পাতাগুলি পড়বার পর। ভদ্রলোক সম্ভবত খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং সম্ভবত মেলানকলিয়া গোছের কোনো মনের রোগে ভুগছিলেন। শেষটা আর যুঝতে পারেননি। আত্মহত্যা করে যন্ত্রণামুক্ত হতে চেয়েছিলেন।'

রাজীব একটু হেসে বলল—'ঠিক আছে। আলোচনা পরে হবে, আগে তুমি পুলিশের ফটোগ্রাফারকে ডেকে পাঠাও। এই অবস্থায় মৃতদেহের কয়েকটা ছবি নিক। বিভিন্ন অ্যাঙ্গল থেকে ছবিগুলি নিলে ভাল হয়।'

'তারপর? ডেড-বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠালেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। রিপোর্ট পাওয়া গেলেই আত্মীয়-স্বজনদের মৃতদেহ দেওয়া যাবে, কী বলেন আপনি?'

রাজীব আগের মতই হাসল। বলল—'তা ঠিক। তবে শুধু পোস্টমর্টেম করলেই হবে না। ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে ভিসেরা পাঠাতে হবে। সেটাও পরীক্ষা করা দরকার। আর তারপর—সে ইচ্ছে করেই কথাটা অসমাপ্ত রাখল।

'আবার তারপর কী?' সুব্রত একটু অবাক হয়ে শুধোল।

'তারপরই তো আসল কাজ। তদন্ত শুরু করতে হবে না?'

সুব্রত বিস্মিত হয়েছে মনে হল। সে একটু ধীরে ধীরে বলল—'আবার তদন্ত কীসের রাজীবদা? দয়ালবাবু সুইসাইড করেছেন। মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নিজের গলা কেটে ভদ্রলোক যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। এতে তদন্ত করবার কী আছে?'

রাজীব দৃঢ়কণ্ঠে বলল—'তুমি ভুল করেছ সুব্রত। ওটা সুইসাইডের কেস নয়—ইট ইজ এ কেস অফ কালপেবল হোমিসাইড অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার।'

সুব্রত একটু জোরেই বলে উঠল—'মার্ডার! কী বলছেন রাজীবদা?'

'ঠিকই বলছি। আমার যুক্তিগুলো শোনো। প্রথমত, ক্ষুরটা রয়েছে ডান হাতে। মরবার আগে যদি ক্ষুরটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরা হত, তাহলে ওটা অমন আলগা হয়ে থাকত না। শক্ত হয়ে রইত। এর থেকেই মনে হয় যে খুনী তার কাজ সেরে ক্ষুরটা দয়ালবাবুর ডান হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিয়ে গেছে। আমার দ্বিতীয় যুক্তি হল, ডান হাতে ক্ষুর ধরে কেউ যদি গলা কাটতে যায় তাহলে ক্ষতটা গলার বাঁ দিক থেকে শুরু হয়ে ক্রমে বাঁকা ভাবে ডান দিকে নেমে আসবে।

কিন্তু এই কেসে ঠিক উল্টোটাই দেখবে। ক্ষতের মুখ গলার ডান দিকে। খুব একটা বাঁকা ভাবে নয়—বরং এড়োভাবেই তা ক্রমে বাঁ দিকে গেছে। সুইসাইডের কেসে ক্ষত কখনও এড়ো হয় না, হতে পারে না। উপর দিক থেকে তা নীচের দিকে নেমে আসবেই। তৃতীয় কারণ, ক্ষতের দু'দিকেই গভীরতা কম-বেশি একই। আত্মহত্যার কেস হলে কখনও এমন হয় না। নিজের হাতে যে গলায় ক্ষুর বসিয়ে দেয়, উত্তেজনার ঝোঁকে সে প্রথমেই একটা ক্ষতের সৃষ্টি করে। কিন্তু রক্তমাংসের দেহে উত্তেজনার চেয়ে যন্ত্রণা অনেক পরাক্রমশালী। ফলে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠলেই তার হাত অবশ হয়ে আসে। ক্ষুরটা আর গভীরে প্রবেশ করে না'। সব শেষে রাজীব বলল—'আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। আত্মহত্যা করতে গিয়ে এমন গভীরভাবে দুটো ক্ষত সৃষ্টি করা অসম্ভব। কোর্টের বিচারেও তা স্বীকৃত হয়েছে। কম-বেশি সমান গভীর দুটো বড় বড় কাটা দাগ টানা একমাত্র খুনীর পক্ষেই সম্ভব। নিজের গলায় তা করা যায় না। আত্মহত্যার ইচ্ছে যত প্রবলই থাকুক—'

সুব্রত একটু চিন্তিতভাবে বলল—'তাহলে খুনী কে রাজীবদা? দয়ালবাবুকে সে খুন করলই বা কেন?'

'দুটোই আমাদের সামনে প্রশ্ন হয়ে ঝুলছে সুব্রত। এবং এর উত্তর বা সমাধান করাই এখন কাজ।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল—'চলো, আর দেরি করে লাভ নেই। তুমি অন্য কাজগুলো সেরে ফেলো। আমি এবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি।'

ঘর থেকে বেরিয়েই রাজীব মণিরঞ্জনকে শুধোল—'এ বাড়িতে আপনারা কে কে আছেন? সবাইকে আমার সামনে ডেকে পাঠান।'

'সবাই মানে? যাঁরা এখানেই থাকেন?'

রাজীব মাথা নাড়ল। বলল—'গতকাল রাত্রে যারা এই বাড়িতে থেকেছেন তাঁদের সবাইকে আমার প্রয়োজন। মেয়ে-পুরুষ সকলকেই দরকার। তবে কেউ যদি গতকাল বা দু-চারদিনের মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার নামটা চাই। প্রয়োজন মনে করলে তাঁর সঙ্গে আমরা পরে দেখা করব।'

'তেমন কেউ নেই।' মণিরঞ্জন স্পষ্ট বলল,—'কেউ চলে যায়নি, বরং কাল দুজন এসেছে।'

'তাই নাকি?' রাজীব কৌতূহলি হয়েছে মনে হল। 'কে কে এসেছে বলুন তো? তারা কারা?'

মণিরঞ্জন একটু চিন্তা না করেই জবাব দিল, —'একজন তো দিলীপ, তার কথা আপনাকে আগেই বলেছি। সন্ধের একটু আগেই সে এল। রাত্তিরে ও থাকতে চায়নি। কর্তার সঙ্গে কী সব কথা কাটাকাটি। তারপর চলেই যাচ্ছিল। শেষে সারদাই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে দেয়। এই অঘটন না হলে আজ সকালে উঠেই ও চলে যেত।'

'আর একজন তাহলে কে? সে কখন এসেছিল?'

মণিরঞ্জন বলল—'তার নাম হরকান্ত—হরকান্ত বিশ্বাস। মামার ব্যবসার পার্টনার। অবশ্য নামেই অংশীদার—কারবারে তেমন টাকাকড়ি ফেলেনি। কাল রাত দশটার সময় আসানসোল থেকে ও এসেছিল। মামাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাত দুপুরে মামার সঙ্গে তার ধুন্ধুমার ঝগড়া, রেগে মেগে এসে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে সেই যে শুয়ে পড়ল, এখনও ওঠেনি।'

রাজীবের কপালে কয়েকটি চিন্তার রেখা পড়ল। ছোট ছোট কোঁচকানো রেখা। সেগুলি ললাট বেয়ে উঠে ফের মিলিয়ে গেল। সহজভাবেই সে বলল—'কই, সবাইকে ডেকে পাঠান তাহলে। চাকর-বাকর কাউকে বাদ দেবেন না।'

এক এক করে সবাই সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথমে শমিতা তারপর সারদা এবং সবশেষে দিলীপ। দুজন চাকর, একজন ঝি এবং রান্নাঘরের ঠাকুরও এল। নিরঞ্জন আগেই এসেছে। এল না শুধু

হরকান্ত। সে অনুপস্থিত রইল।

রাজীব অবাক হয়ে শুধোল—'হরকান্তবাবু কোথায়? তিনি এলেন না?'

বুড়ো চাকর পরমেশ্বর বলল—'এজ্ঞে আমি তাঁকে ডাকতে গিয়েছিনু। দরজা এখনও বন্ধ—ঘুম থেকে ওঠেননি বলে মনে হচ্ছে।'

মণিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলল—'ঘুমোলে তো আর চলবে না। যান আপনি, হরকান্তবাবুকে ডেকে নিয়ে আসুন। বলুন, বাড়িতে একটা খুন হয়েছে, তদন্তের জন্য পুলিশ এসে হাজির।'

মণিরঞ্জন তখনই দৌড়ুল এবং দু-তিন মিনিট পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরল।

রাজীব প্রশ্ন করল—'কই মশায়? হরকান্তবাবু কোথায়?'

মণিরঞ্জন শুকনো মুখ নিয়ে দাঁড়াল। বলল—'হরকান্ত নেই স্যর। দরজা স্রেফ ভেজানো ছিল। জোরে ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরের মধ্যে তার সুটকেসটাও নেই। মনে হয়, সে পালিয়েছে।'

পাঁচ

ঘরশুদ্ধ সবাই নির্বাক। অনেকক্ষণ কেউ একটি কথা বলল না। তারপর সুব্রতই মুখ খুলল—'এখন ব্যাপারটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন রাজীবদা? কাণ্ডটি কার? কাল রাতে হরকান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে দয়ালবাবুর তুলকালাম ঝগড়া। সেই হরকান্ত আবার ভোর না হতেই চম্পট দিয়েছে। কাউকে কিছু বলে যায়নি। এদিকে বিষ্টি-বাদলার রাতে বাড়ির কর্তা ঘরের মধ্যে খুন হয়ে পড়ে রইলেন। এখন দুটি ঘটনাকে যুক্ত করে দেখলেই মানেটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।'

সারদা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। পুলিশ আসবার পর থেকে একটি বাক্য ব্যয় করেনি। অনুমতি প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে বলল—'আমি একটা কথা বলতে পারি দারোগাবাবু?'

সুব্রত এক পলক ওর মুখের দিকে তাকাল। একটু হেসে উত্তর দিল—'কেন বলবেন না? নিশ্চয় বলবেন। তবে আমাকে নয়।' ইঙ্গিতে রাজীবকে দেখিয়ে সে যোগ করল—'যা বলবার ওঁর কাছেই বলুন। উনি মিঃ রাজীব সান্যাল—বিখ্যাত সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর। এই কেসটা এখন ওঁরই হাতে জানবেন।'

সারদা রাজীবকে আগেই দেখেছিল। এখন পুনরায় তাকে অপাঙ্গে লক্ষ্য করল। বলল—'কাল রাত্রে হরকান্ত কর্তাকে শাসিয়ে ছিল ইন্সপেক্টরবাবু।' সে মুখ নামিয়ে ফের ভাবতে শুরু করল। রাজীবের মনে হল, মেয়েটি আরো কিছু বলতে চায়। কিন্তু ইতস্তত করছে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'আমার সঙ্গে একটু অন্য ঘরে চলুন। আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে চাই।'

সারদা সঙ্গে সঙ্গে উঠল। একটু এগিয়ে সে পিছন ফিরে এক বার চাইল। কাছেই একটা বসবার ঘর। তাতে চেয়ার টেবিল সবই রয়েছে। সারদা ঘরে ঢুকে পাখাটা ফুলফোর্সে চালিয়ে দিল। রাজীব আসতেই বলল—'আপনি চেয়ারটায় বসুন।'

এতক্ষণ গরম লাগছিল। পাখার তলায় এসে বসতেই রাজীবের বেশ আরাম মনে হল। রুমাল বার করে সে ভালো করে মুখ মুছল। সারদাকে আড়চোখে দু-তিনবার খুঁটিয়ে দেখল। মেয়েটি বিধবা। বয়স চল্লিশের ধারে কাছে। শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালো, একটু মোটা, কিন্তু ঢিপসী নয়, হাতে পায়ে ক্ষমতা আছে বলেই মনে হয়।

রাজীব শুধোল—'এ বাড়িতে আপনি কতদিন আছেন?'

সারদা একটু চিন্তা করে বলল—'তা বারো-তেরো বছর হবে। গিন্নিমা মারা যাওয়ার পর কর্তা একজন রান্নাবান্না করার উপযুক্ত সর্বক্ষণের লোক খুঁজছিলেন। আমি তখন কেষ্টনগরে থাকি কর্তার এক বন্ধু উমেশবাবু সেখানে থাকতেন। তিনি আমাকে চিঠি দিয়ে এ বাড়িতে পাঠিয়ে ছিলেন। সেইদিন থেকেই কাজে বহাল হয়েছি।'

'আচ্ছা দয়ালবাবুর ছেলে মেয়ে কটি? তারা সব কোথায়?'

সারদা একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে বলল—'একটিই ছেলে, মেয়েটেয়ে নেই। কিন্তু কর্তার কপাল—ছেলে থাকতেও নেই বলতে পারেন।'

'তার মানে?' রাজীব জানতে চাইল।

সারদা কাহিনি শুরু করার আগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কাপড়টা কাঁধের উপর থেকে একটু সরে গিয়েছিল। সেটি গুছিয়ে ঠিক করল। বলল—'কর্তার ছেলের নাম প্রভঞ্জন। বেশ ভালো ছেলে। দেখতে শুনতে চমৎকার। বাপের গরব করার মতো। এম. এ. পাস করার পর ছেলে বোম্বাইয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেল। কর্তা নাকি মানা করেছিলেন। কিন্তু আজকালকার ছেলে। বাপ-মায়ের দুঃখু কি তারা বুঝতে চায়? তারপর কি হল জানেন?' সারদা শ্রোতার মুখের দিকে এক নজর তাকাল।

রাজীব বলল—'বলে যান আপনি। আমি ঠিক শুনছি।'

সারদা ফের শুরু করল—'বোম্বাইয়ে থাকতে প্রভঞ্জন একটা মেয়ের খপ্পরে পড়ে। কী জাতের ছুঁড়ি জানি না, তবে বউমা বলেছিল মেয়েটার গোয়ার কাছে বাড়ি। হবে খেরস্তান কিংবা অমনি কিছু। বিয়ের সময় প্রভঞ্জন এসব ব্যাপার চেপে গেল। একটি কথাও ভাঙল না। কিন্তু অষ্টমঙ্গলার পর ছেলে যে সেই বোম্বাই গেল আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বউকে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখল না। কর্তা চিঠিচাপাটি করলেন, কিন্তু প্রভঞ্জন গ্রাহ্য করল না। মা কাঁদাকাটি করে পত্র দিল, তবু ছেলে নরম হল না। মাস ছয়েক পরে জানাল, মা-বাপকে সুখী করতে সে বিয়ের মন্ত্র পড়েছে, এই পর্যন্ত ঢের। এর বেশি আর কিছু পারবে না। কর্তা বোম্বাইয়ে লোক পাঠালেন। সে যা খবর নিয়ে এল তাই শুনে তিনি গুম হয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বললেন না। লোকটা বলল প্রভঞ্জন এখন বোম্বাইয়ে সেই ছুঁড়িটার সঙ্গেই থাকে। দুজন বিয়ে করেছে কি না তা অবশ্য সে জানতে পারেনি।'

রাজীব শুধোল—'তারপর? কর্তা কী করলেন?'

'কী আর করবেন বলুন? দুঃখে, মনের কষ্টে গিন্নিমা চলে গেলেন। কর্তা কিন্তু ভাঙলেন না। তেমনি শক্ত, সোজা হয়ে রইলেন। শুধু বললেন—যে হতভাগা স্বেচ্ছায় চলে গেছে, সে যাক। তার জন্য মন খারাপ করিনে। কিন্তু পরের মেয়ের কেন এই সর্বনাশ করল? তার কী দোষ? বাসি ফুলের মালার মত বিয়ের পরই মেয়েটাকে ত্যাগ করে গেল?' সারদা দম নেবার জন্য এক সেকেন্ড থামল। তারপর চোখ ঘুরিয়ে বেশ মেয়েলি ভঙ্গি করে বলল—'তবে হ্যাঁ। কর্তার অসীম মনের জোর। গিন্নিমা মারা যাওয়ার পর থেকে তো দেখছি। ছেলের কথা দূরে যাক—একটি দিনের জন্য তার নাম পর্যন্ত মুখে শুনিনি। অথচ দিব্যি আছেন। রিটায়ার করার পর নতুন ব্যবসা শুরু করলেন। তাই নিয়ে বেশ মেতে আছেন। মনের কোনো দুঃখ আছে বলে বোঝা যায় না।'

রাজীব শুধোল—'ছেলেকে কি কর্তা ত্যাগ করেছেন? মানে বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?'

সারদা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। বলল—'ঠিক বলতে পারছিনে। তবে শুনেছি কর্তার সেই রকম মনের ইচ্ছে ছিল।'

'একথা কার কাছে শুনেছিলেন? কর্তা নিজে বলেছিলেন নাকি?'

সারদাকে একটু বিব্রত মনে হল। সে বলল—'আজ্ঞে না। কর্তা কিছু বলেননি। কথাটা এমনি কানাঘুষোয় শুনেছি।'

রাজীব শুধোল—'আচ্ছা ঐ যে ফর্সাপানা সুন্দর ছেলেটিকে দেখলাম ও কে?'

সারদা হেসে জবাব দিল—'আপনি দিলীপের কথা বলছেন? ওকে খুব ছোটবেলায় কর্তা মানুষ করবেন বলে নিয়ে আসেন। প্রভঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্ক উঠে যাবার দু-এক বছর পরই দিলীপ এল। তখন গিন্নিমা গত হয়েছেন। আমি কিছুদিন এ বাড়িতে এসেছি। সেই থেকে দিলীপকে উনি মানুষ করেছেন। কর্তার ইচ্ছে ছিল এখানকার পড়া শেষ হলে ওকে বিলেত পাঠাবেন।'

রাজীব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর অন্যমনস্কের মত মন্তব্য করল—'ছেলেটি তাহলে পুষ্যিপুত্তুর? দয়ালবাবু বোধহয় ওকেই সব বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন? কারণ ছেলের সঙ্গে তো কোনো সম্পর্কই ছিল না।'

সারদা ঢোক গিলে বলল—'কি জানি ইন্সপেক্টর বাবু। ওসব উইল-টুইলের কথা আমি কিছু শুনিনি।'

রাজীব একটু চড়া গলায় প্রশ্ন করল—'উইলের কথা কী বলছিলেন? দয়ালবাবুর কোনো উইল ছিল নাকি?'

'উইল?' সারদা অনাবশ্যকভাবে কথাটা টেনে টেনে বলল। তারপর প্রায় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে শোনাল—'উইলের কথা আমি কী করে জানব বলুন? সে খবর কর্তার বন্ধু-বান্ধবরা বলতে পারবে। আমি কাজকর্ম করার লোক। এসব বড় খবর কি আমাদের জানবার কথা?'

রাজীব ফের শুধোল—'আচ্ছা কালো মতন ঐ লোকটি কে? দয়ালবাবুর কোনো আত্মীয় নাকি?'

সারদা একটুও চিন্তা করল না। বলল—'আপনি কি মণিরঞ্জনের কথা বলছেন? ও হল কর্তার ভাগনে। তবে দূর সম্পর্কের। কর্তা ওকে ব্যবসায় লাগিয়েছেন।'

'কতদিন এখানে আছে?'

'তা প্রায় এক-দেড় বছর হবে। ইদানীং কর্তা ওকে খুব পছন্দ করতেন না। বলতেন মণিটা হাঁদা-ভোঁদা—বুদ্ধি-শুদ্ধি বড় কম। প্রায়ই তো ধমক-ধামক দিতেন। মাঝে মাঝে খুব রেগে উঠলে ওকে নিজের পথ দেখতে পর্যন্ত বলেছেন।'

'হুম।' রাজীব কী যেন ভাবল। পরে শুধোল—'আচ্ছা হরকান্ত বিশ্বাস কাল কেন এসেছিল জানেন? দয়ালবাবুর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি বা হল কেন?'

সারদাকে একটু উৎসাহিত দেখাল। একটা গোপন কথা ফাঁস করবার আগে মেয়েদের মুখ চোখ যেমন চকচকে রহস্যময় হয়, তেমনি মনে হল। গলা নামিয়ে সে বলল—'কথাটা তো আপনাকে তখন থেকেই বলব ভাবছি। হরকান্ত বিশ্বাস আসানসোলে থাকে। কর্তার কারবারের লোক। পরশুদিন রাত্রে কর্তা ওকে টেলিফোনে আসতে বলেছিলেন। তখন কি ছাই ব্যাপারটা জানি। কাল রাত্রেই তো সব শুনলাম। কোন কোম্পানির কাছ থেকে হরকান্ত কর্তার পাওনা সব টাকা নিয়ে এসেছে। অথচ সে টাকা কলকাতায় পাঠায়নি।'

রাজীব ভ্রূ কোঁচকাল। 'কত টাকা জানেন?'

'জানি ইন্সপেক্টরবাবু। আড়াল থেকে সব শুনেছি। অল্প টাকার ব্যাপার নয়। আট হাজার টাকা। কর্তা বলছিলেন ওকে পুলিশে দেবেন। পরশু সকাল দশটার মধ্যে টাকা না পেলে ফৌজদারি মামলা দায়ের হবে।'

'হরকান্ত শুনে কী বলল?'

'প্রথমে কিছু বলেনি। কিন্তু শেষকালে খুব তড়পাচ্ছিল। কর্তার মুখের উপর বলে দিল—আপনার

যা খুশি করবেন। আমার পদবির একটা অর্থ আছে। তার ভুল মানে করলেই অনর্থ হবে জানবেন। এই বলে সে দুম দুম করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।'

রাজীব প্রশ্ন করল—'আচ্ছা দিলীপ ছেলেটি কেমন বলতে পারেন?'

'কেমন মানে?' সারদা যেন কথাটার অর্থ জানতে চাইল।

'মানে স্বভাব-চরিত্র, ব্যবহার সব মিলিয়ে একজন ইয়ংম্যানের সম্বন্ধে যা বলা যায়। বদমেজাজী কিনা তাও জানা দরকার।'

সারদা ব্যাপারটা লঘু করতে চেষ্টা করল। সে বলল—'ওর সম্বন্ধে কী বলব বলুন? ওই তো পুঁচকে ছেলে। এতটুকু বয়স থেকে ওকে দেখে আসছি। তবে হস্টেলেই মানুষ—এখানে ও কমই আসে। কর্তার কাছে শুনেছি, স্কুল-কলেজে সবাই ওর খুব প্রশংসা করে। মাস্টারমশাইরা ভালোবাসেন। পড়াশুনোতেও ভালো দিলীপ। কখনও পরীক্ষা-টরীক্ষায় ফেল করেনি ইন্সপেক্টরবাবু।'

রাজীব একটা সিগারেট ধরিয়ে সারদার মুখের দিকে তাকাল। একটু হেসে মন্তব্য করল—'আপনি দিলীপকে খুব ভালোবাসেন।'

সারদা বেশ লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে সে বলল—'ছোটবেলা থেকে ওকে দেখছি। একটা মায়া পড়ে গেছে। তবে শুধু আমি নয়। বউমারও দিলীপকে খুব পছন্দ। আপন দেওরের মত মনে করে।'

খানিকটা ধোঁয়া গিলে রাজীব নাক মুখ দিয়ে ফের তা বের করল। সারদার মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে শুধোল—'আচ্ছা কাল রাত্রে আপনি কোনো শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন? মানে বারান্দায় কোনো হাঁটাহাঁটির শব্দ, কোনো চাপা চিৎকার কি কানে এসেছিল?'

সারদা এক মুহূর্ত ভাবল। বলল—'না, কোনো শব্দ কানে আসেনি। আর কাল সারারাত যা বৃষ্টি-বাদল। তবে'—একটু থেমে সে যোগ করল—'না থাক। সে কথা আপনাকে বলতে চাইনে।'

'কী কথা?' রাজীব একটু এগিয়ে বসল। 'তদন্তের সময় কোনো কথা গোপন করতে নেই জানবেন। এটা খুনের কেস আর পুলিশের লোকে ভূতে বিশ্বাস করে না। নইলে বলতে পারতেন রাতদুপুরে ভূত এসে দয়ালবাবুর গলা কেটে দিয়ে গেছে।' গম্ভীর গলায় সে ফের বলল—'খুনী আপনাদের মধ্যেই রয়েছে জানবেন। তাকে শনাক্ত করাই আমাদের কাজ। আপনি যদি কিছু গোপন করেন, তাহলে উল্টে আপনাকেই হয়তো আমরা সন্দেহ করব।'

সারদা তাড়াতাড়ি জবাব দিল—'অমন করে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? বিশ্বাস করুন—কোনো কথা গোপন করবার মত বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু এ যে ঘরের কুৎসা। ঢাকঢোল পিটিয়ে দশজনের কাছে গল্প করলে নিজেদের গায়ে থুতু লাগবে। কর্তা বেঁচে থাকলে আজ সকালে উঠে তাকেই বলতাম। একটি বর্ণ গোপন করতাম না। কিন্তু এই কলঙ্কের কথা কাকে বলব? তাই তো বলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছি।'

'কলঙ্কের কথা?' রাজীব ভ্রূ কুঁচকে তাকাল—'আপনি নিশ্চিন্তে সব খুলে বলুন। আমি কারো কাছে আপনার নাম ফাঁস করব না।'

সারদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল—'জানেন, কাল রাত দুটো আড়াইটের সময় একটা ফিস ফিস শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন বিষ্টি কম...টিপ টিপ পড়ছে। মনে হল বউমার ঘরের ভিতরে কে যেন খুব চাপা গলায় কথা বলছে। পুরুষ মানুষের গলা। বউমাও ফিস ফিস করে কথার জবাব দিচ্ছেন। বললে বিশ্বাস করবেন না ইন্সপেক্টরবাবু, আমার বুকের ভিতরটা ভয়ে টিপ টিপ করে উঠল। এ কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড। কতদিন ধরে এই কারবার চলছে কে জানে? রাতদুপুরে বউয়ের ঘরে পরপুরুষ! জানতে পারলে কর্তা যে দুজনকেই কেটে ফেলবেন। তাঁর রাগ তো আমি জানি। মাথায় রক্ত চড়লেই খ্যাপা জন্তু-জানোয়ারের মত একরোখা হয়ে যান।

জ্ঞানগম্যি বলতে কিছুই থাকে না।'

রাজীব শুধোল—'ওরা কী কথা বলছিল জানেন?'

সারদা মাথা নেড়ে বলল—'কথা শুনতে পেলেও ঠিক বোঝা যায়নি। ভয়ে আমি দরজা খুলে বেরোলাম না ইন্সপেক্টরবাবু। দেখতে পেয়ে যদি আমার গলাটাই টিপে ধরে। তাহলেই বা নিজে কেমন করে বাঁচব?'

'দুজনের কথাবার্তা কতক্ষণ ধরে চলল?'

'বেশিক্ষণ নয়। বড়জোর মিনিট দশেক। তারপর সব চুপচাপ হয়ে এল। আমার মনে হল লোকটা পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজা খোলা বা বন্ধ হওয়ার একটা খুট করে শব্দ কানে এল আমার। তারপর আর কোনো সাড়া নেই...বউমা বোধহয় ফের শুয়ে পড়লেন।'

রাজীব সিগারেটে একটা লম্বা টান নিয়ে বলল,—'আচ্ছা দয়ালবাবু কেন খুন হলেন বলতে পারেন? মানে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

সারদা অল্পক্ষণ ভাবল। বলল—'আজ্ঞে না। আমি মেয়েমানুষ, এসব প্রশ্নের কেমন করে জবাব দেব?'

রাজীব আর কোনো প্রশ্ন করল না। বলল—'ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন।'

ছয়

সারদা চলে যাবার পরই সে দিলীপকে ডেকে পাঠাল। পরনে চোঙা প্যান্ট, গায়ে লতা-পাতা আঁকা আঁটোসাঁটো জামা। কোমরে একটা বেল্টও রয়েছে। চুলগুলি ফোলা ফাঁপা—এছাড়া প্রায় চোয়াল পর্যন্ত নেমে আসা বাহারি জুলপি। ছোকরার মুখের দিকে রাজীব কয়েক সেকেন্ড যেন ইচ্ছে করেই তাকিয়ে রইল।

দিলীপ অস্বস্তি বোধ করছিল। এবং মনে কিছুটা বিরক্তও। তার চোখে-মুখে একটা অখুশি ভাব ছড়িয়ে পড়ল।

ভণিতা না করে রাজীব বলল—'আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না দিলীপবাবু। আমার তিন-চারটে প্রশ্নের উত্তর দিন। তারপর আপনি যেখানে খুশি যান। পুলিশের তাতে মাথাব্যথা নেই।'

'কী প্রশ্ন বলুন?' দিলীপ মুখ গম্ভীর করে শুধোল।

'কাল রাতে দয়ালবাবুর সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি হয়েছিল কেন? হঠাৎ তার চটে উঠবার কারণই বা কী?'

দিলীপ ভুরু কুঁচকে বলল,—'এসব কথা জানবার কি প্রয়োজন আছে? এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

প্রশ্ন শুনে রাজীব একটু হাসল। আজকালকার ছেলে, পুলিশের নামেই মোরগের মত ঘাড় ফুলোয়। প্রশ্ন-টশ্ন করলেই তেরিয়া ভঙ্গি। আমল দিতে নারাজ মনে হয়। তাই সে ইচ্ছে করেই নরম হল। বলল—'অনেক সময় ব্যক্তিগত ব্যাপার এক-আধটু জানবার প্রয়োজন হয় দিলীপবাবু। বিশেষ করে যেখানে ব্যক্তিকে নিয়ে সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয় জানেন, যার সঙ্গে গতকাল সন্ধের পর আপনার কথা কাটাকাটি হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাত্তিরেই নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। আততায়ী ক্ষুর দিয়ে তাঁর গলা কাটে। এবং তারপর খোলা ক্ষুরখানা নিহত দয়ালবাবুর হাতের

মুঠোয় গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যায়।'

দিলীপ তেমনি ঘাড় শক্ত করেই জবাব দিল—'উনি যে খুন হয়েছেন তা কি নিশ্চয়ই করে বলা যায়? আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে।'

রাজীব চটল না। ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে হাসি। বলল—'তা ঠিক। তবে পোস্টমর্টেম হলেই ডাক্তারের মতামত জানা যাবে। এবং আমার ধারণা মেডিক্যাল রিপোর্টে এই কথাই লেখা থাকবে। অবশ্য একটু তলিয়ে দেখলেই সন্দেহ আপনার দূর হতে পারে দিলীপবাবু।'

'কী রকম?'

রাজীব একটু কেশে গলা শুধরে নিল। 'যেমন ধরুন দাড়ি কামানোর জন্য আপনি কি ব্যবহার করেন? সেফ্‌টি রেজার?'

দিলীপ একটু আমতা আমতা করে জবাব দিল—'ইয়ে মানে, আমি সেফটি রেজারে কামাই না।'

'তাহলে?' রাজীব মুচকি হাসল—'সেলুনে যান নাকি রোজ?'

দিলীপকে একটু নার্ভাস মনে হল। সে বলল—'আজ্ঞে না। মানে আমি একটা ক্ষুর ব্যবহার করি।'

'ক্ষুর? ওহো—তাই বলুন।' রাজীব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'তাহলে তো ব্যাপারটা আপনার কাছে এ-বি-সি-ডির মত প্রাঞ্জল মনে হবে। আচ্ছা ডান হাতে ক্ষুর ধরে প্রথমে কোন গালে টানবেন বলুন তো?'

দিলীপ কোনো উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।

রাজীব ফের বলল—'বেশ, গাল বাদ দিলাম। গলা নিয়েই ভেবে দেখুন। ডান হাতে ক্ষুর ধরে নিজের গলার উপরে চেপে ধরলে ক্ষুরের মুখটা নিশ্চয় ডান দিকে থাকে না?'

দিলীপ চিন্তিতভাবে বলল—'তা কেমন করে থাকবে?'

'কিন্তু দয়ালবাবুর গলায় ক্ষুরের পোঁচটা ডান দিক থেকেই শুরু হয়েছে। এর কী মানে হয় জানেন?'

দিলীপ বিড়বিড় করে বলল—'মানে, কী মানে হয়?'

'এই অর্থ হয় যে ক্ষুরটা দয়ালবাবু ধরেননি। সেটি অন্য কারো হাতে ছিল। অস্ত্রটা অপরের হাতে থাকলেই আক্রান্ত ব্যক্তির গলার ডানদিকে ক্ষুরের মুখটা চেপে বসবে।'

'তাহলে আপনি সিওর যে উনি মার্ডার হয়েছেন?' দিলীপ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

'সিওর কী বলছেন? আমি কক্‌-সিওর দিলীপবাবু। অ্যান্ড নাউ উই আর টু ফাইন্ড আউট দি মার্ডারার। বাট হু ইজ দি কালপ্রিট? রাজীব ডান হাতের তর্জনীটা নাচাতে নাচাতে অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল—হরকান্ত? না মণিরঞ্জন? অথবা আপনাকেই সাসপেক্ট বলে ধরব দিলীপবাবু?'

'আমাকে?' দিলীপ প্রায় বেহালার করুণ সুরের মত আর্তনাদ করে উঠল। 'বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টরবাবু, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। বাদলার রাতে খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা খেয়ে মড়ার মত ঘুমিয়েছি। ভোরবেলায় চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি এই কাণ্ড।

সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে রাজীব বলল—'আই সি। আপনি তাহলে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করছেন?' একটু থেমে সে ফের যোগ করল—'কী জানেন দিলীপবাবু? ডাক্তারের কাছে রোগ-ব্যাধির জন্য এসে দাঁড়ালে সাধু তপস্বীরও রক্ত পরীক্ষার দরকার হয়। অপরাধ তদন্তে পুলিশের ভূমিকাও অনেকটা তাই। ভালো করে পরীক্ষা হলে পর সন্দেহমুক্ত বলা যায়। শুধু

মুখের কথায় কি কাজ হয়?'

দিলীপ পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ওর কাছে গিয়ে রাজীব বলল—'চেয়ারে বসুন দিলীপবাবু। দাঁড়িয়ে কতক্ষণ রইবেন।'

দিলীপ একবার এদিক-ওদিক দেখল। তারপর একটা ভারী বস্তুর পতনের মত চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে পড়ল।

রাজীব ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল—'এবার পরিষ্কার করে বলুন তো, দয়ালবাবুর সঙ্গে গতকাল এত বচসা হল কেন?'

দিলীপ মুখ নামিয়ে জবাব দিল—'উনি আমাকে যা-তা বলেছিলেন ইন্সপেক্টরবাবু। যা নয় তাই শুনিয়েছেন। এ মাসে হস্টেলে আমার টাকা পর্যন্ত দেননি। ভাগ্যিস সারদা মাসি লুকিয়ে আমায় গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়েছিল। নইলে মাসের এই কটা দিন কি চলত আমার?'

রাজীব হিসেব করে বলল—'আজ দশ তারিখ, ফি-মাসে টাকা কি দয়ালবাবু এর আগেই পাঠাতেন?'

'অনেক আগে।' দিলীপ তার ঘাড়ের উপর বাঁ হাতের করতল চেপে ধরে জবাব দিল। তারপর কিছুটা গজগজ করতে করতে বলল—'কোথা থেকে কী শুনেছিলেন জানি না, আমায় দেখে রেগে টং। টাকা-পয়সা আর দেবেন না বলে খুব দাবড়ে দিলেন।'

রাজীব ভুরু কুঁচকে কী চিন্তা করল। প্রায় দগ্ধ সিগারেটটুকু জানালা গলিয়ে বাইরে ছুড়ে দিয়ে বলল—'আচ্ছা দয়ালবাবুর বিষয়-সম্পত্তি অনেক—তাই না?'

'বিষয়-সম্পত্তি?' দিলীপ চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। বলল—'হ্যাঁ, লোকে তো তাই বলে। ঢের সম্পত্তি, তবে আমি তার হিসেব বলতে পারব না ইন্সপেক্টরবাবু।'

'ব্যাঙ্কে টাকা-কড়ি কি রকম আছে জানেন? সরকারী কাগজ—শেয়ার-টেয়ার?'

দিলীপ বোকার মত হাসল—'আজ্ঞে না। ওসব কিচ্ছু জানিনে। আপনি বরং মণিদাকে শুধোন। ওর হয়ত জানা থাকতে পারে।

'উনি কেমন করে জানবেন?' রাজীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

দিলীপ একটুও চিন্তা করল না। বলল—'কথাটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল ইন্সপেক্টরবাবু। দিন কয়েক আগে মণিদা আমাকে এই কথাটাই বলছিল।'

'কী কথা?' রাজীব সাগ্রহে তাকাল।

বলছিল—'তোমার আর কী ভাবনা বলো দিলীপবাবু। মামা গত হলে বিষয় সম্পত্তি, টাকা-কড়ি সবই তোমার হবে। তখন তুমিই আমার মানব। দেখো, চটে গিয়ে বরখাস্ত করে দিও না।'

রাজীব ভুরু কুঁচকে শুধোল—'তাহলে দয়ালবাবু খুন হতে আপনারই কপাল খুলল দিলীপবাবু। ফি মাসে আর টাকার জন্যে এসে হাত পাততে হবে না।'

দিলীপ মুখখানা শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো জবাব দিল না।

রাজীব একটু হেসে ওর কাঁধ চাপড়ে বলল—'ঠিক আছে। আপনি এখন যান। বরং মণিরঞ্জনবাবুকে একটু ডেকে দিন। তার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।'

মণিরঞ্জন বেশ সহজভাবে এসে দাঁড়াল। চোখমুখ পরিষ্কার—কোনো ভয়ের ছায়া নেই। শুধু ফটফটে নীল আকাশের এক কোণে ছোট্ট এক টুকরো কালো মেঘের মত একটা ব্যথার ইঙ্গিত রয়েছে।

রাজীব ফের একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে শুরু করল—'আচ্ছা মণিরঞ্জনবাবু এ বাড়িতে আপনি কতদিন আছেন?'

'বেশিদিন নয়।' মণিরঞ্জন আস্তে আস্তে জবাব দিল। 'বড়জোর বছর দেড়েক হতে পারে।

মামা গত বছর রিটায়ার করে এই কারবারে নেমে পড়লেন। আমায় খবর দিলেন চলে আসতে। সেই থেকে এখানে আছি।'

'দয়ালবাবু আপনার কি রকম মামা হন? খুব নিকট আত্মীয়?'

'আজ্ঞে খুব নিকট না হলেও সম্পর্কটা ঠিক লতায়-পাতায় জড়ানো নয়। উনি আমার মার পিসতুতো দাদা—অবশ্য আপন পিসীমার ছেলে নয়। আমার দাদামশায়ের খুড়তুতো বোনের ছেলে।'

রাজীব একটু ভেবে বলল—'তারপর?'

'এখানে আসার আগে মামার সঙ্গে সম্পর্ক বলতে কিছুই ছিল না। উনি অমন বড়লোক মানুষ—তারপর বছর তিন-চার হল মা গত হয়েছেন। কার সম্পর্ক ধরে আত্মীয়তা বজায় থাকবে বলুন?'

'তাহলে যোগাযোগ হল কেমন করে?'

'সে আমার জন্যেই বলতে পারেন। বছর দুয়েক আগে আমি একদিন ওঁর সঙ্গে অফিসে দেখা করি। তখন উনি কোম্পানির পারচেজ অফিসার। আমি বেকার-বাউণ্ডুলে মানুষ, টো-টো করে ঘুরি। ভাবলাম মামার সঙ্গে একবার দেখা করেই আসি। যদি অফিসে কোন ভেকেন্সি-টেকেন্সিতে ঢুকিয়ে নেন।' মণিরঞ্জন জিভটা একবার ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নিয়ে সেটি সচল করতে চাইল। ফের বলল—'মামা খুব সমাদর করলেন না বটে। তবে অনাদরও করেননি। এক কাপ চা খাওয়ালেন...মার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বাড়ির আর সকলে কে কেমন আছে তা জানতে চাইলেন। শেষকালে একটা কথা অবশ্য স্পষ্টই বললেন। কোম্পানিতে চাকরি হওয়া অসম্ভব। সুযোগ পেলে কোম্পানি দু-একজনকে বরং ছাঁটাই করে। নতুন লোক কিছুতেই নেবে না।'

রাজীব সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে বলল—'আচ্ছা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাক। আপনি অন্য সম্পর্কের কথা বলুন। ইদানীং মামা আপনার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতেন? পছন্দ করতেন মনে হয়?'

মণিরঞ্জন এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর একটু ঢোক গিলবার চেষ্টা করে উত্তর দিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ, পছন্দ করবেন না কেন? ভাল ব্যবহারই তো পেয়েছি।'

রাজীব এবার ধমক দিয়ে বলল—'মণিরঞ্জনবাবু, আপনি সত্যকে গোপন করছেন। আমি জানি দয়ালবাবু ইদানীং আপনাকে পছন্দ করতেন না। একদিন তো আপনাকে নিজের পথ দেখতে পর্যন্ত বলেছেন।'

মণিরঞ্জন ভয় পেয়ে বলল—আপনি কেমন করে জানলেন স্যর?'

'আমি জানি।' রাজীব দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল। 'কিন্তু আপনি লুকোবার চেষ্টা করলেই বিপদে পড়বেন মণিরঞ্জনবাবু। দয়ালবাবু খুন হয়েছেন জানেন তো? তার সঙ্গে সম্পর্কের কার কতদূর অবনতি হয়েছিল তা আমাদের চুলচেরা বিচার করতে হবে।'

'আমি বলব স্যর! নিশ্চয় বলব।' মণিরঞ্জন শুকনো মুখে তাকাল।

'তাহলে শুরু করুন।' রাজীব সিগারেটটা ঠোঁটে তুলে নিল।

মণিরঞ্জন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—'আজ্ঞে কাল সকালে উনি আমাকে খুব বকেছিলেন।'

'কারণটা বলুন।'

'একটা অর্ডারের মাল ফেরত এসেছে শুনে মামা রেগে কাঁই। অবশ্য দোষ তাদের নয়—আমাদেরই ত্রুটি। এখানে মালটা তৈরি করানোর সময় ভুল স্পেসিফিকেশন দিয়েছিলাম। সে মাল ওরা নেবে কেন? সব ফেরত দিয়েছে। ফালতু ক'হাজার টাকা মামার লোকসান গেল।'

'হুম।' রাজীব সিগারেটের মুখের ছাইটুকু আস্তে টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলল। শুধোল—'মামার ধমক-ধামক আপনি নিঃশব্দে হজম করলেন তো? না তেড়ে-ফুঁড়ে দু-কথা শুনিয়ে দিলেন?'

মণিরঞ্জন বলল—'বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টরবাবু, প্রথম দিকে একটি কথারও উত্তর দিইনি। সব মাথা পেতে নিয়েছি। আর উত্তর দেবই বা কোন মুখে? দোষ-ত্রুটি, ভুল-টুল সবই তো আমাদের। আর মামাই বা চুপ করে থাকবেন কেন? এতগুলো টাকা নষ্ট হলে কার মাথার ঠিক থাকে বলুন?'

'তাহলে শেষ দিকে আপনিও চোটপাট করলেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মামা আমাকে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টরবাবু। বললেন, নিজের পথ দেখে নিতে। আমার মত অপদার্থকে তার প্রয়োজন নেই। একবারও ভাবলেন না যে ভুলটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আর মানুষ মাত্রেই তো ভুল করে।'

রাজীব বাঁকা হেসে মন্তব্য করল—'তাহলে ব্যাপারটা গভীর মনস্তাপের কারণ, কী বলেন?'

মণিরঞ্জন খোঁচাটুকু নিঃশব্দে হজম করল। সে বলল—'অথচ প্রথম প্রথম মামা আমাকে ভালবাসতেন ইন্সপেক্টরবাবু। একদিন আমাকে বললেন—মণি, ব্যবসাটার পিছনে কোমর বেঁধে লেগে পড়ো। কারবার যদি দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে একদিন এসব তোমারই হবে। আমি আর কদিন আছি বলো? দিলীপ সাহেবী স্কুলে মানুষ—কলেজের পড়া শেষ করে এক চক্কর বিলেতে ঘুরে আসবে। ও কি আর ব্যবসাপত্তর দেখবে? কাজেই এটা তোমারই জিনিস। দেখ যদি চেষ্টা-চরিত্র করে এটাকে ঠিক মত চালাতে পার।'

রাজীব চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

মণিরঞ্জন ফের বলল—'মামার কী ইচ্ছে ছিল জানেন? এই ব্যবসাটা আমাকে দিয়ে যাবেন। বাড়ি-ঘর, ব্যাঙ্কের টাকা কড়ি, কোম্পানির কাগজপত্র সব দিলীপ আর বউমাকে ভাগ করে দেবেন। বউমার অবর্তমানে দিলীপই মালিক হবে।'

'এসব কথা আপনি কেমন করে জানলেন?' রাজীব গম্ভীর মুখ করে শুধোল।

'আড়াল থেকে শুনেছি। মামা একদিন অফিসে বসে গোপালবাবুকে এই সব কথা বলছিলেন।'

'গোপালবাবু?' রাজীব ভ্রূ কুঁচকে তাকাল—'তিনি আবার কে?'

'মামার বন্ধু বললে ভুল বলা হবে। উনি মামার উকিলও। কোম্পানির মামলা-পত্তর, মামার নিজের কোর্ট-কাছারির কাজকর্ম সব গোপালবাবু দেখেন।'

রাজীব শুধোল—'গোপালবাবুর পুরো নাম আর ঠিকানাটা দিন তো। দয়ালবাবু খুন হয়েছেন, এ খবরটা তাকে দেননি?'

'আজ্ঞে না। মামাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমাদের মুখে রা সরেনি। প্রথমে তো ভেবেছিলাম, মামা আত্মহত্যা করেছেন। বুদ্ধি করে দিলীপই থানায় ফোন করল। আর তারপর থেকে ঘরশুদ্ধু লোক আপনাদের নজরবন্দি হয়ে আছি।'

'চুপ করুন।' রাজীব বেশ জোরে কথা কইল—'কে আপনাকে নজরবন্দি করে রেখেছে? ফোন করে গোপালবাবুকে আপনি এখুনি খবর দিন। তাঁকে আমাদের দরকার হবে।'

মণিরঞ্জন উঠি উঠি করছিল। রাজীব বলল—'আর একটু বসুন। দুটো কথার জবাব দিন তো। ভেবে চিন্তে উত্তর দেবেন কিন্তু—'

'কী কথা বলুন?'

রাজীব বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে শুধোল—'আচ্ছা দয়ালবাবু কেন খুন হলেন আন্দাজ করতে পারেন? আপনার কিছু মনে হয়?'

মণিরঞ্জন যেন আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করল। পরে বলল—'আজ্ঞে না। এর উত্তর আমি কেমন করে দেব?'

'আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা অবশ্য একটু সোজা। আপনি ইচ্ছে করলে অনায়াসে উত্তর দিতে পারেন।' রাজীব উকিলবাবুদের আসামীকে জেরা করার ভঙ্গিতে কথা কইল।

মণিরঞ্জন উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

'আচ্ছা এই মার্ডার কেসে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

'আমার?' মণিরঞ্জনকে তেমনি চিন্তিত দেখাল। বলল—'কাকে করব? তবে হরকান্তর ব্যাপারটা যেন আমার কেমন লাগছে ইন্সপেক্টরবাবু। সাত-সকালে হরকান্ত কাউকে কিছু না বলে অমন কেটে পড়ল কেন?' একটু থেমে সে বলল—'রাত্তিরে হরকান্ত আসবে আমি জানতাম। মামা অফিসে এসে গোপালবাবুকে কী সব বলছিলেন। কিছু একটা গণ্ডগোল সে করেছিল। টেলিফোনে মামা অনেক কথা বললেন। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে তিনি হরকান্তকে শ্রীঘরে পাঠাতে কসুর করবেন না। গোপালবাবুকে একবার তাড়াতাড়ি আসতে বললেন।'

'তারপর?'

'আর কিছু জানি না। আমি চলে গেলাম একটা পার্টির কাছে বিল দিতে। সেখানে অনেক দেরি হল। তাই আর অফিসে না গিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এলাম।'

রাজীব কিছু বলার আগেই সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল। তার ব্যস্ত ভঙ্গি...ঘন ঘন নিশ্বাস। উত্তেজনায় চোখ দুটি পর্যন্ত ডাগর, দেখাচ্ছে।

রাজীব হেসে বলল—'কী হল সুব্রত? নতুন কোনো সংবাদ আছে নাকি?'

সুব্রত প্রায় বোমা ফাটানোর মত জোরগলায় খবরটা পরিবেশন করল—'হরকান্ত বিশ্বাস ধরা পড়েছে রাজীবদা।'

'কোথায়? কেমন করে পেলে ওকে?'

'হাওড়া স্টেশনে। আমি জি. আর. পি কে কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিলাম। ইস্টিশনে ওরা যেন নজর রাখে। লোকটা আসানসোলে ফিরে যাবে বলে মনে হয়। চাকরবাকরদের মুখ থেকে শুনে চেহারার একটু বর্ণনাও জুড়ে দিলাম। কিন্তু আমার মন্তরে কাজ হয়েছে রাজীবদা।' সুব্রত সগর্বে জানাল।

মণিরঞ্জন হাঁ করে শুনছিল। সে বলল—'হরকান্ত তাহলে ধরা পড়ে গেল ইন্সপেক্টরবাবু?'

রাজীব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে সে স্বগতোক্তির মত বলল—'হরকান্ত ধরা পড়েছে ঠিকই। কিন্তু তাতে কী হবে মণিরঞ্জনবাবু? উই ওয়ান্ট দি মার্ডারার—আমাদের অপরাধীকে প্রয়োজন।'

সুব্রত বলল—'আপনি কোথায় চললেন রাজীবদা?'

'হাওড়া স্টেশনে। জি. আর. পি. অফিসে—'

'হরকান্তকে এখানে নিয়ে এলে হত না?'

'না।' রাজীব দৃঢ় গলায় জবাব দিল। ফের শুধোল—ডেডবডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়েছ তো?'

সুব্রত বলল—'অনেকক্ষণ। হয়তো পোস্টমর্টেম শুরু হয়ে গেছে।'

'ভালো।' রাজীব চিন্তিত মুখে মন্তব্য করল। পরে বলল—'তুমি এখানেই থাকো সুব্রত। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব। কাউকে যেতে দিও না। আমার জিজ্ঞাসাবাদ এখনও শেষ হয়নি।'

মণিরঞ্জন প্রশ্ন করল—'গোপালবাবুকে তাহলে ফোন করে দিই?'

'না।' রাজীব ঘাড় নাড়ল—'বরং ওর ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা আমায় দিন।'

সাত

হরকান্ত বেশ মেজাজ দেখিয়ে বলল—'আমাকে এখানে আটক করে রাখবার অর্থ কী মশায়? দয়ালবাবু আপনাদের কাছে কি নালিশ করেছেন?'

রাজীবের মুখে হাসি ফুটে উঠল,—রহস্যময় হাসি। সে বলল—'যথা সময়ে সবই জানবেন হরকান্তবাবু। এখন আমায় বলুন দিকি অত ভোরে উঠে কাউকে কিছু না বলে চুপিচুপি পালাচ্ছিলেন কেন?'

হরকান্ত ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বলল—'পালাব না মশায়? ওই চামারটার বাড়িতে কোনো ভদ্দরলোক থাকে? রাত দুপুরে উনি ঘরের অতিথিকে শাসিয়ে বললেন যে পরশু তারিখের মধ্যে টাকার হিসেব-নিকেশ কড়ায়-গণ্ডায় না বুঝিয়ে দিলে বিশ্বাসভঙ্গ আর তহবিল তছরুপের মামলা আনবেন। আরে মশায়, আমার অপরাধটা কি খুব সাংঘাতিক? আমিও কোম্পানির একজন পার্টনার। না হয় কিছু টাকা অফিসে জমা দেবার আগে একটু নাড়াচাড়া করেছি। তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বাড়িতে ডেকে এনে এমনি হেনস্তা—অপমান করবে? কাল রাত্তিরেই আমি চলে যাব ভেবেছিলাম। নেহাৎ অমনি বৃষ্টি-বাদল। তাই মুখ বুজে রাত্তিরটা কাটিয়েছি।'

রাজীব চোখ ঘুরিয়ে বেশ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে বলল—'কতগুলি টাকা হেরফের করেছেন?'

'তার মানে?' হরকান্ত যেন গর্জে উঠল—'আপনি কি বলতে চান আট হাজার টাকা আমি লোপাট করে দিয়েছি?'

'আট হাজার টাকা!' রাজীব চোখ বড়ো করে তাকাল। এতগুলি টাকা আপনি কি ভাবে নাড়াচাড়া করলেন মশায়? একটু খুলে বলবেন?'

হরকান্ত তাচ্ছিল্য করে উত্তর দিল—'আমার দায় পড়েছে আপনাকে এর ফিরিস্তি দিতে। যাই হোক, দয়ালবাবুকে বলবেন যে তার টাকাটা আমি কাল সকালে ঠিক দশটার সময় অফিসে পৌঁছে দেব। এখন দয়া করে আমায় যেতে দিন।'

রাজীব বাধা দিয়ে বলল—'তা হয় না হরকান্তবাবু। আপনি চেয়ারে বসুন। আমাদের আরো কিছু কথা আছে।'

'চুলোয় যাকগে কথা আপনার। এখন এই ট্রেনটা আমায় ধরতে দিন। নইলে দয়াল দত্তকে কাল সকালে টাকা পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর তাহলে রক্ষা নেই মশায়। বুড়ো ঠিক আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে হাজির করবে।'

রাজীব হেসে বলল—'তার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই হরকান্তবাবু। টাকাটা কাল সকালে না দিলেও হয়ত চলবে।'

'চলবে অমনি বললেই হলো? বুড়োকে আপনি চেনেন না ইন্সপেক্টরবাবু। আসলে ও একটি যক্ষি। যদি আজ মরে যায়, তাহলেও আমায় রেহাই দেবে না। পিশাচ হয়ে আমার পিছু নেবে।'

রাজীব এক মুহূর্ত কী ভাবল। পরে গম্ভীর গলায় বলল—'আপনি শেষকালে যা বললেন, তাই হয়তো সত্যি হতে চলেছে হরকান্তবাবু।'

'কী বললেন?' হরকান্ত চমকে উঠে শুধোল—'দয়ালবাবু কি মারা গেছেন নাকি?'

'মারা গেছেন বললে একটু কম বলা হবে হরকান্তবাবু।' একটু থেমে রাজীব যোগ করল—'উনি গতকাল রাত্রে খুন হয়েছেন।'

'খুন হয়েছেন!' হরকান্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রাজীব বলল—'হ্যাঁ। আট হাজার টাকার জন্য এখনই আপনার দুশ্চিন্তা করবার প্রয়োজন

নেই। ভবিষ্যতেও টাকাটা আপনাকে দিতে হবে কি না, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' বাঁকা হেসে রাজীব শেষে মন্তব্য করল—'বুড়ো মরে আপনার লাভই হল হরকান্তবাবু।

'আপনি কী বলতে চাইছেন মশায়?' হরকান্ত প্রতিবাদ জানাল।

রাজীব গম্ভীর গলায় উত্তর দিল—'আপনি এখন পুলিশের কাছেই থাকবেন হরকান্তবাবু। আজ আর আপনার আসানসোল যাওয়া হবে না।'

'তার মানে?' হরকান্ত এবার ভয় পেয়েছে মনে হল।

মানে অতি প্রাঞ্জল। যদি স্বেচ্ছায় যাবেন তো ভালই, নইলে আমরা আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব। রাজীব বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করল।

খবরটা শুনেই গোপাল হোড় রীতিমত মুষড়ে পড়লেন। টেবিলের উপর দুই বাহু রেখে তিনি বললেন—'এ যে সাংঘাতিক খবর মশায়। অবিশ্বাস্য সংবাদ। কাল বিকেলেও দয়ালের সঙ্গে অন্তত ঘন্টা দুই কাটিয়েছি। অনেক কথা বলল। মনটাও বেশ ভাল দেখলাম। একটা বিশেষ কাজ ছিল। খেটেখুটে তাও করে দিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ এ যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।'

রাজীব শুধোল—'আচ্ছা দয়ালবাবুর উইলের সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

'জানি বৈকি।' গোপালবাবু সগর্বে বললেন—'উইলের খসড়া তো আমিই তৈরি করেছি।'

'উইলে কী লেখা আছে বলবেন?'

'বলা অবশ্য উচিত নয়।' গোপাল হোড় ব্যবসায়ী চালে কথা কইলেন। পরে বললেন—'উকিল ডাক্তারদের পেশাই এমনি মশায়। কার কি গোপন ব্যাধি আছে, তা ডাক্তার জানে। কিন্তু সে কথা কি ফাঁস করলে চলে? উকিলদেরও অবস্থা তেমনি। মামলা-মোকদ্দমা আর নথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে কত যে কেচ্ছা-কাহিনি বেরিয়ে আসে। তা কেবল আমরাই জানি। কিন্তু এক মক্কেলের গোপন কথা কখনও আর একজনের কাছে গল্প করিনে।'

রাজীব অনুরোধ জানিয়ে বলল—'খুনের তদন্ত করতে গিয়ে উইলের ব্যাপারটা ভালো করো জানবার প্রয়োজন হয়েছে গোপালবাবু। দয়া করে আপনি এই সাহায্যটুকু করুন।'

গোপাল হোড় গম্ভীর মুখে বললেন—'উইলের ব্যাপার একটা নয় মশায়। দুটো—'

'দুটো?' রাজীব বিস্ময়ে তাকাল।

'হ্যাঁ ইন্সপেক্টরবাবু। দয়ালবাবুর বড় ছেলে প্রভঞ্জনের ব্যাপারটা শুনেছেন তো? নিজের বিয়ে-করা বউকে একরকম সে ত্যাগই করে। আইন মতে অবশ্য ডিভোর্স-টিভোর্স হয়নি।'

রাজীব শুধোল—'প্রভঞ্জনের সঙ্গে দয়ালবাবুর কি কোনো সম্পর্কই ছিল না?'

কোনো সম্পর্কই না। দয়াল ভীষণ একগুঁয়ে আর জেদী ছিল। তাকে সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো পাহাড় সরানোর মতই অসম্ভব ব্যাপার। অবশ্য শেষ পর্যন্ত'—গোপালবাবু হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন।

রাজীব ফের বলল—'উইলের ব্যাপারটা আপনি একটু খুলে বলুন গোপালবাবু।'

'সবই বলছি। দয়াল যখন বেঁচে নেই, তখন উইলের খবর আর গোপন করবার মানে হয় না। এখন সকলেরই এটা জানা দরকার। গোপালবাবু কয়েক সেকেন্ড থেমে ধীরে ধীরে উইলের উদ্দেশ্য, বিষয়, এমন কি ভাষা, বয়ান পর্যন্ত কিছু কিছু বলে গেলেন।'

সমস্ত কিছু শুনবার পর রাজীব বলল—'হুম্। আমিও এমনি একটা আঁচ করেছিলাম। কিন্তু শুধু এই নয়—এর মধ্যে আরো একটা প্যাঁচ রয়েছে গোপালবাবু। সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। তাই অন্ধকার কাটছে না।'

দয়াল দত্তের বাড়ির কাছে এসে রাজীব দেখল সুব্রত ব্যস্তভাবে পায়চারি করছে। গাড়িটা

খুব নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। সুব্রত তাই টের পায়নি। মৃদুভাবে একবার হর্ন টিপতেই সে মুহূর্তে উৎকর্ণ হল। তারপর প্রায় দৌড়েই গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল।

রাজীব হেসে শুধোল—'কী বার্তা সুব্রত?'

'পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পেয়েছি রাজীবদা। কেমিক্যাল এগ্‌জামিনেশনের রেজাল্টও ডাক্তার জানিয়েছে। এখন দেখবেন নাকি?'

'নিশ্চয়।' রাজীব সাগ্রহে হাত বাড়াল।

রিপোর্ট দুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রাজীব। বলল—'দেখেছ সুব্রত? ব্লাডে কী পাওয়া গেছে? আমার ঠিক সন্দেহ হয়, রাত দুপুরে মানুষটা প্রায় অচেতন ছিল। নইলে আর একজন তার বুকের উপর বসে ক্ষুর দিয়ে গলা কাটল। অথচ সে কোনো বাধা দিল না। ধস্তাধস্তি করল না। এমন কি সম্ভব?' একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করল—'ক্ষুরটা ফিংগার প্রিন্ট ব্যুরোতে পাঠিয়েছ তো?'

'অনেকক্ষণ রাজীবদা। কিন্তু সাসপেক্টের আঙুলের ছাপ তো পাঠানো হল না। ওরা মেলাবে কেমন করে?'

রাজীব বলল—'এইবার পাঠাব সুব্রত। কিন্তু আর একটু তলিয়ে দেখি।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে রাজীব প্রায় ঘোষণা করল—'হরকান্ত বিশ্বাসকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। লোকটা পালাতে পারেনি। এখন সে পুলিশ হেফাজতেই আছে।'

সারদা একপাশে বসে ঢুলছিল। কথা শুনে সে ঘাড় উঁচু করে বলল—'হতচ্ছাড়া শয়তানকে তাহলে ধরেছেন ইন্সপেক্টরবাবু? কি বজ্জাত লোক গো। রাত দুপুরে কর্তার টুঁটি কেটে দিয়ে ভোর সকালে দিব্যি পালিয়ে গেল।'

রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। সে ফের ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসল। সুব্রতকে বলল—'তুমি শমিতা দেবীকে পাঠিয়ে দাও।'

মিনিট খানেক পরেই শমিতা দত্ত ঘরে এসে ঢুকল। রাজীব তাকিয়ে দেখল। শান্ত, মিষ্টি ঢলঢলে মুখখানি। বয়স বেশি হবে না, ত্রিশের আনাচে-কানাচে। রং ফর্সা। কালো, কোঁকড়ানো চুল। দেহে নদীর জোয়ারের মত ভরা যৌবন।

রাজীবের মনে হল কলেজে পড়বার সময় কোথায় যেন সে কথাটা দেখেছে। মানুষের মুখ দেখে মনের ছবি জানবার কোনো উপায় পৃথিবীতে নেই। শমিতাকে একবার দেখেই রাজীবের সেই কথাটা আগে মনে পড়ল। আশ্চর্য! এখন ওর মুখ দেখে কে বলবে যে কাল রাতদুপুরে ওর শোবার ঘরে পুরুষ মানুষের কথাবার্তা শোনা গেছে?

রাজীব বলল—'বসুন শমিতা দেবী। আপনাকে অল্প কয়েকটি প্রশ্ন করব। কোন কথা গোপন করবার চেষ্টা করবেন না। যা জানেন, সত্য বলে বিশ্বাস করেন, তা অকপটে বলবেন, কেমন?'

শমিতা মাথা হেলিয়ে উত্তর দিল—'আপনি জিজ্ঞেস করুন। আমি সাধ্যমত জবাব দেব।'

রাজীব সিগারেটটা নিভিয়ে রাখল। বলল—'আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন?' সে মুখ না তুলেই প্রশ্ন করল।

অন্য মেয়ে হলে হয়তো একটু আরক্ত হত। কিন্তু রাজীব আড়চোখে দেখল শমিতা প্রশ্নটা সহজভাবেই নিয়েছে। সে ম্লান হাসল। বলল—'কবে আমার বিয়ে হয়েছিল তা আমি নিজেই ভুলতে বসেছিলাম। আপনি ফের মনে করিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টরবাবু।'

রাজীব হেসে বলল—'আমি দুঃখিত শমিতা দেবী। প্রশ্নগুলো নেহাৎই ব্যক্তিগত। খুব আবশ্যক না হলে কখনও আপনাকে বিব্রত করতাম না। যাই হোক, এ প্রশ্নটা থাক। আপনি বরং পরের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।'

'বলুন।' শমিতা মুখ তুলে তাকাল।

'বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই না?'

শমিতা ফের হাসল। বলল,—'আপনি তো সবই জানেন ইন্সপেক্টরবাবু। তবে কেন কথাগুলো আমার মুখ থেকে আবার শুনবেন?'

'তা হোক, আপনি বলুন শমিতা দেবী। ধরুন এরও প্রয়োজন আছে।'

'বেশ, তাই বলছি। তাহলে গোড়া থেকেই শুনুন।' শমিতা বলল—'বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলা সেরে আমার স্বামী বোম্বে চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর আমিও দুরু দুরু বক্ষে স্বামীর প্রথম চিঠির আশায় রইলাম। বিশ্বাস করুন, মনের মধ্যে আমার কোনো ভয় বা সংশয় ছিল না। কদিনের মাত্র পরিচয়। তবু আচার-আচরণে আমি একদিনের জন্যও বুঝতে পারিনি যে চোখের অদর্শন হবার পর মুহূর্তেই তিনি আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবেন। কিন্তু আমি যা ভাবতেও পারিনি তা নিদারুণ হলেও সত্যি হল ইন্সপেক্টরবাবু। স্বামী আমাকে কোনো পত্র দিলেন না। রোজ সকালে পিওন এসে ডাক দিয়ে যেত। আমি ভাবতাম শাশুড়ি এখনই আমাকে ডাকবেন। স্বামীর চিঠিখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলবেন—বউমা, এই নাও তোমার চিঠি। কিন্তু মনের কল্পনা আর সত্যি হল না ইন্সপেক্টরবাবু। সে চিঠি আমার স্বপ্নেই রয়ে গেল। বাস্তবে ঘটল না।'

রাজীব প্রশ্ন করল—'আচ্ছা, ছেলের এই ব্যবহারে দয়ালবাবু খুব শক পেলেন?'

'নিশ্চয়। তবে কি জানেন, আমার শ্বশুরের অসীম মনের জোর ছিল। আঘাত পেলেও তিনি সামলে নিলেন। কিন্তু আমার শাশুড়ি সে আঘাত সইতে পারলেন না। ছেলে একটা গোয়ানিজ মেয়েকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করছে জানবার পর তিনি সেই যে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না।'

'সারদা বলে মেয়েটি এ বাড়িতে কতদিন আছে?'

'অনেকদিন। আমার শাশুড়ি মারা যাবার পরই সারদা মাসি এ বাড়িতে এল। তখন একজন কাজের লোকের অভাবে সংসার অচল। সারদা মাসিকে পেয়ে সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।'

'আর দিলীপ? মানে আপনার শ্বশুরের ঐ পুষ্যি ছেলেটি?'

'ও দিলীপ? বাবা ওকে কিছুদিন পরেই তো নিয়ে এলেন। সারদা মাসি বাবাকে দিলীপের কথা প্রায়ই বলত। তখন বাবার মনের ভিতরটা নির্বান্ধব পুরীর মত শূন্যি। আমার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ হয়েছে। বাবা ভাবলেন একটা ছেলেকে কাছে এনে মানুষ করলে মনের ভিতরটা পূর্ণ হতে পারে। পরে খোঁজ নিয়ে উনি দেখলেন, দিলীপের বাবার সঙ্গে এক সময় ওঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক আর বেঁচে নেই। তাই শুনে আমার শ্বশুরের মনে দয়া হল। একদিন উনি আশ্রমে গিয়ে দিলীপকে দেখে এলেন, সারদা মাসিও সঙ্গে গিয়েছিল। দিলীপকে দেখেই বাবার পছন্দ হয়ে গেল। ব্যস, আশ্রমের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে উনি ফিরলেন।'

রাজীব টেবিলের উপর হাত ছড়িয়ে শুধোল—'আচ্ছা আপনার শ্বশুরের কোন উইল-টুইল ছিল বলে জানতেন?'

'প্রথমে জানতাম না। পরে তা জেনেছিলাম—'

'উইলে কী লেখা ছিল বলে শুনেছেন?'

'আমার শ্বশুরের অবর্তমানে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি আমি এবং দিলীপ সমানভাগে পাব। তবে নিজের অংশের সম্পত্তি হস্তান্তর করবার ক্ষমতা আমার থাকবে না। আমার মৃত্যুর পর দিলীপই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির মালিক হবে।'

'তাহলে উইলে আপনার স্বামীকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর জন্য আপনার মনে দুঃখ বা ক্ষোভ হয়নি?'

শমিতা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। পরে বলল—'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

'বেশ তো। ইচ্ছে না হলে বলবেন না।' রাজীব মুচকি হেসে শমিতার মুখের দিকে তাকাল। বলল—'কিন্তু উইলের কথা আপনি কবে জানলেন? দয়ালবাবু নিশ্চয় আপনাকে তার উইলের কথা বলেননি?'

শমিতা এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল—'এসব প্রশ্ন আপনি কেন জানতে চাইছেন বলুন তো? কী দরকার আপনার?'

রাজীব হেসে বলল—'অত উত্তেজিত হবেন না শমিতা দেবী। মনে রাখবেন এ বাড়িতে একজন মানুষ খুন হয়েছে। এবং সেই খুনের পিছনে একটা গোপন চক্রান্ত আছে বলেই আমার বিশ্বাস। সমস্ত কথা না জানলে খুনী ধরা পড়বে কেমন করে?'

শমিতা একটু শান্ত হল বটে। কিন্তু নুইল না। সে বলল—'কিন্তু যা অনাবশ্যক, তা আপনি জানতে চাইছেন কেন?'

'অনাবশ্যক?' রাজীব ব্যঙ্গ করে হাসল। বলল—'শমিতা দেবী, আমি যদি শুধোই কাল রাত্রে আপনি কেন ঘুমোতে পারেননি তাহলে কি সেটা অনাবশ্যক প্রশ্ন হবে?'

শমিতা রেগে বলল—'কে বলেছে আপনাকে যে কাল রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি?'

রাজীব ফের হাসল—'রাতে ঘুম না হলে চোখমুখই তা বলে বেড়ায়। কিন্তু আমি বলি কি শোবার আগে আপনি একটা ঘুমের বড়ি খেতে পারতেন।'

'আমি স্লিপিং পিল ব্যবহার করি না। এ বাড়িতে সারদা মাসি কেবল মাঝে-মধ্যে ঘুমের বড়ি খায়।'

'কেন, আপনার শ্বশুরমশায় খেতেন না?'

'না।' শমিতা পরিষ্কার জানাল—'বাবা ঘুমের বড়ি-টড়ি খাওয়া ভীষণ অপছন্দ করতেন। ওষুধ-টসুদই খেতে চাইতেন না। কেবল ডাক্তারের তাগিদে শোবার আগে দুটো ট্যাবলেট খেতেন। কী যেন নাম ওষুধটার। বাবার ঘরে আলমারির মধ্যে রয়েছে।'

'হুম।' রাজীব কী যেন চিন্তা করল। তারপর শমিতার মুখের উপর চোখ রেখে শুধোল—'আচ্ছা আপনার শ্বশুর কেন খুন হলেন বলতে পারেন? কাউকে সন্দেহ হয়?'

'কেন খুন হলেন? শমিতা স্বগতোক্তির মত কথাগুলি অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল। পরে বলল—'না ইন্সপেক্টরবাবু। এর উত্তরও আমার জানা নেই।'

রাজীব গম্ভীর গলায় বলল—'আমার কিন্তু আপনাকেই সন্দেহ হয় শমিতা দেবী। এই হত্যাকাণ্ডে আপনার একটা ভূমিকা আছে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'আমাকে সন্দেহ করছেন?' শমিতা একটু নার্ভাস হয়ে উত্তর দিল—'কিন্তু কেন? কী প্রমাণ আছে আপনার হাতে? যা মনে আসে অমনি বললেই হল?'

রাজীব বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে একটু গলা নামিয়ে শুধোল—'কাল রাত্রে আপনার ঘরে যে ভ্রমরটি উড়ে এসেছিল, দয়া করে তার নামটি এবার বলুন।'

শমিতার মুখটা ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য দেখাল। তবু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ জানাল—'আমার ঘরে লোক এসেছিল? কী আজে বাজে কথা বলছেন?'

রাজীব ঠোঁটের ফাঁকে অল্প হাসল। ঘটনাটা সত্যি বলেই প্রতিবাদের সুরটা কি নরম? সে তেমনি খলনায়কের ভঙ্গিতে টেনে টেনে কথা কইল—'শমিতা দেবী, রাতে যিনি আপনার ঘরে কিছুক্ষণের জন অতিথি হয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা জানি। মিছিমিছি আপনি লুকোবার চেষ্টা করছেন।'

তবু শমিতা না দমে বলল—'বেশ তো, যদি জানেন তাহলে ফের আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'বলেছি তো। এরও প্রয়োজন আছে।' কিন্তু আপনি জবাব দিতে না চাইলে, এরপর আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।'

শমিতা এবার ভেঙে পড়ল। সে বলল—'দোহাই আপনার ইন্সপেক্টরবাবু। আমার সব কথা শুনুন। বিশ্বাস করুন, এই খুনের সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই আমার। আমি কেন নিজেকে জড়াতে যাব? আর কাল রাত্রে যে আমার ঘরে এসেছিল, সে মানুষটা সম্পূর্ণ নির্দোষ। সে আর যাই করুক, আমার শ্বশুরকে কখনও খুন করাতে পারে না। পশ্চিমে সূর্যি ওঠার মতই তা অসম্ভব।'

রাজীব হেসে বলল—'বেশ তো, আপনি সব কথা খুলে বলুন। তা হলে হয়তো আপনাকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি।'

শমিতা ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

রাজীব চুপ করে শুনল। তারপর মাথার চুলে হাত বুলোতে শুরু করল, বলল—'দয়ালবাবুর সঙ্গে আপনার কথা হল কখন?'

'কাল সকালে। আমি বুঝতে পারিনি উনি আমাকে এই প্রশ্ন করবেন।'

'হুম।' রাজীব ভ্রূ কুঁচকে অল্পক্ষণ ভাবল। পরে শুধোল—'আচ্ছা আপনার শ্বশুরের হাতের মুঠোয় যে ক্ষুরখানা দেখলেন ওটা আগে কোনদিন দেখেছেন বলে মনে হয়?'

'হ্যাঁ।' শমিতা ফিস ফিস করে কথা বলল—'ওটা আপনাকে বলব ভেবেছিলাম। মাসখানেক আগে মণিদা একদিন ক্ষুরটা কিনে আনলেন। আমার শ্বশুরের খেয়াল হয়েছিল নিজের হাতে ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাবেন। দু-একদিন চেষ্টাও করলেন। কিন্তু বেশিদিন না। ফের নাপিতের ডাক পড়ল। তারপর থেকে সে এসেই দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যেত। ক্ষুরটা যেমন তোলা ছিল, তেমনি রইল।'

রাজীব ডান হাতের করতলের সাহায্যে নিজের ঘাড়ের উপর একটু চাপ দিল। তারপর হাতটা ফের শিথিল করে বলল—'ঠিক আছে। আপনি এখন যেতে পারেন শমিতা দেবী।' রাজীব এবার চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে ধূমপানের আয়োজন করল।

শমিতা চলে যেতেই সুব্রত এসে টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল। রাজীব চোখ বুজে বেশ আয়েস করে সিগারেটে একটা টান দিয়েছিল। সুব্রতের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ফের চোখ খুলল।

সুব্রত বলল—'ব্যাপার কি রাজীবদা? আপনি তো সকলকেই খুনী বলে সন্দেহ করছেন। দিলীপ, হরকান্ত, মণিরঞ্জন, সারদা, এমন কি শমিতা দেবীকে পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এক রকম জানিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল? খুনী তাহলে কে? অপরাধী কৌন?'

রাজীব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শুধোল—'তোমার কাকে খুনী বলে মনে হয়?'

'আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রাজীবদা। প্রথমে হরকান্তকে খুব সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু পরে মনে হল, হরকান্ত যদি খুনই করবে তাহলে সে ভোর সকালে অমন চুপি চুপি পালাবে কেন? এতে লোক তাকে আরো বেশি সন্দেহ করবে। খুনী বলে ভাববে। তাই মনে হল হরকান্ত নয়। বোধহয় মণিরঞ্জনই এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। দয়ালবাবু তাকে বরখাস্ত করেছিলেন অথচ বুড়োর মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটা মণিরঞ্জনকেই দিয়ে যাবেন। সুতরাং মামার অবর্তমানে মণিরঞ্জনই কোম্পানির মালিক হবে। কাজেই বরখাস্ত হবার আদেশ পেয়ে মণিরঞ্জনের পক্ষে মামাকে খতম করা অসম্ভব নয়।'

রাজীব সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে প্রশ্ন করল—'কিন্তু খুনের মোটিভ যদি তাই হয়, তাহলে গোপন উইলের কথা মণিরঞ্জন কি আমার কাছে ফাঁস করত? মামার অবর্তমানে সেই যে কোম্পানির কর্তা হবে, একথা জানলে ও পুলিশের কাছে কখনই তা ভাঙত না।'

সুব্রত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল—'তাহলে দিলীপকেই আপনি সন্দেহ করছেন রাজীবদা? দয়াল দত্ত তাকে হস্টেল খরচের টাকা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। নিজের পথ দেখতে বলেছিলেন। অথচ

উইলে বিষয়-সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দিলীপকেই তিনি দিয়ে গেছেন। সুতরাং দয়ালবাবুকে এই পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলে দিলীপের ষোলো আনা লাভ। কাজেই এই হত্যাকাণ্ডে তার ভূমিকাই প্রধান বলে চিন্তা করা কি খুব অন্যায় হবে রাজীবদা?'

রাজীব একটু হেসে বলল—'কিন্তু দিলীপ কি উইলের কথা জানত? মণিরঞ্জন অবশ্য তাকে এইরকম একটা আভাস দিয়েছিল। তবে দিলীপ বোধহয় তাই নিয়ে মাথা ঘামায়নি। মনে হয় ব্যাপারটা সে কথার কথা বলে ধরে নিয়েছিল। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ সুব্রত, দয়ালবাবুর বিষয়-সম্পত্তি কি আছে ছোকরা তাও বলতে পারল না।'

সুব্রত হতাশ ভঙ্গি করে বলল—'তাহলে রাজীবদা? আপনি কি সারদাকে খুনী বলে ভাবছেন? কিন্তু তার কি মোটিভ? সে কেন দয়াল দত্তকে খুন করবে বলুন?'

রাজীব কোনো উত্তর দিল না।

সুব্রত ফের বলল—'কেসটা খুব জটিল হয়ে দাঁড়াল রাজীবদা। খুনের সঙ্গে শমিতা দেবীর যোগসাজশ আছে, তাও মনে করা কষ্টকর। দয়ালবাবুর উইলের কথা উনি জানতেন। সম্পত্তির অর্ধেক উনি পাবেন। তাছাড়া শেষ দিকে তো দয়ালবাবু অন্য রকমও ভাবছিলেন। সুতরাং শমিতা দেবীর কোনো মোটিভই থাকতে পারে না।'

রাজীব সিগারেটে একটা টান দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বলল—'খুনী কে তা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি সুব্রত। শুধু মোটিভটাই মেলাতে পারছি নে।' একটু পরে সে হেসে মন্তব্য করল—'এক ধরনের অঙ্ক আছে জানো? তার উত্তরটা বলা সহজ। কিন্তু প্রসেসটা বাতলানো কঠিন। ফলে কাউকে বোঝানো শক্ত।'

সুব্রত একটা দুর্বল ভঙ্গি করে বলল—'তাহলে উপায় রাজীবদা।'

'উপায় নিশ্চয় হবে। তুমি ঘাবড়াও কেন? আগে চলো, দয়ালবাবুর ঘরটা সার্চ করে তাঁর উইলটা খুঁজে বের করি। আর সেই সঙ্গে গোপালবাবুকে একটা টেলিফোন করে এখানে আসতে অনুরোধ কর।'

সুব্রত ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল—'এখুনি ফোন করছি রাজীবদা।'

'হরকান্তকেও এখানে নিয়ে এস সুব্রত। জি, আর, পিতে একটা ফোন করে দিও। তাহলেই হবে।' রাজীব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আট

ঘরের মধ্যে সবাই উপস্থিত। সারদা, দিলীপ, হরকান্ত, মণিরঞ্জন এবং শমিতাও এসে হাজির।

সুব্রত দেখল সারদা আড়চোখে হরকান্তকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছে। মণিরঞ্জন এবং আর সবাই স্থির।

নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। একটি ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ টের পাওয়া যাবে। সকলেই কিছু শুনবার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই রাজীব বলল—'দেখুন কিছুদিন আগে দয়ালবাবু একটি উইল করেছিলেন। তা প্রায় মাস ছয়েক আগে এটিতে তিনি স্বাক্ষর করেন। তার বন্ধু গোপালবাবু এবং ঋষিকেশবাবু এই উইলের এক্‌জিকিউটর এবং সাক্ষী। আমি প্রথমেই আপনাদের উইলপত্রটি পড়ে শোনাতে চাই।' পকেট থেকে রুমাল বের করে রাজীব মুখ মুছল। তারপর উইলপত্রটি পড়তে শুরু করল—লিখিতং শ্রীদয়ালচন্দ্র দত্ত পিতার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, জাতি হিন্দু, পেশা ব্যবসা, সাং কলিকাতা। কস্য উইল পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে—এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে ও গত

দুই বৎসর যাবৎ নানারূপ রোগে কষ্ট পাইতেছি। যেরূপ মনের অবস্থা তাহাতে আমার অধিক দিন বাঁচিবার আশা খুব কম। এজন্য এই উইলপত্র দ্বারা আমার বিষয়াদি বন্দোবস্তের জন্য নিজের লিখিত মত উইল করিলাম।

১। শহর কলিকাতায় আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত যে সকল বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচা, পুষ্করিণী ও তৈজসপত্র ইত্যাদি বিষয়বস্তু আছে, আমার জীবনান্তে ঐ সকল সম্পত্তির।০ অংশ আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী শমিতা দত্ত পাইবেন। বাকি ॥০ অংশ আমার পালিত পুত্রপ্রতিম শ্রীমান দিলীপ সরকার পাইবেন।

২। আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী শমিতা দত্ত তাহার জীবদ্দশায় এই সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা কোনরূপ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। তাহার মৃত্যুর পর সমুদয় বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পালিত পুত্রপ্রতিম শ্রীমান দিলীপ সরকারের স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে।

৩। আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সকল দায় স্বত্ব, আমার ভাগিনেয় শ্রীমণিরঞ্জন ঘোষ লাভ করিবেন। ইহাতে অপর কাহারও অধিকার থাকিবে না।

৪। আমার নিজ নামের ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ি, সরকারি কাগজপত্র ইত্যাদি আমার পুত্রবধূ এবং শ্রীমান দিলীপ সমানভাগে লাভ করিবেন।

৫। আমার বন্ধু শ্রীগোপাল হোড় ও শ্রীঋষিকেশ দাসকে এই উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলাম। এক্‌জিকিউটররা এই উইলের রীতিমত প্রবেট গ্রহণে উইলের লিখিত বিধান মত কার্য করিবেন।

এতদর্থে অন্যের বিনানুরোধে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ও স্থিরচিত্তে এই উইলপত্র লিখিয়া দিলাম। উইলকর্তা অত্র উইলের মর্ম অবগত হইয়া স্ব-ইচ্ছায় আমাদিগের সমক্ষে দস্তখত করিলেন।

শ্রীগোপাল হোড়
শ্রীঋষিকেশ দাস
(সাক্ষীগণ)

শ্রীদয়ালচন্দ্র দত্ত
(উইল কর্তার দস্তখত)

পড়া শেষ করে রাজীব শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকাল। সারদার মুখখানা খুব চক্‌চকে দেখাচ্ছিল। উইলের নির্দেশ শুনে সে তখনই বলল—'আমি জানি। মুখে যাই বলুন কর্তা দিলীপকে ছেলের মতই ভালবাসতেন। ওকে মানুষ করে তুলবেন বলেই এত বকাঝকা করেছেন। নইলে কখনও এত বিষয় সম্পত্তি ওকে দিয়ে যান? ছেলেটা অভিমানী। তাই কর্তাকে ভুল বুঝেছিল।'

সুব্রত পিছন থেকে বলল—'এর নাম কপাল। দিলীপবাবু ভাগ্যে আছে তাই অল্পবয়সে এত বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলেন।'

সারদা ফের বলল—'শুধু দিলীপ কেন বলছেন? কর্তা কাউকে বঞ্চিত করে যাননি। বউমাকে, মণিকে, যার যা পাওয়া উচিত তাই দিয়ে গেছেন। কেবল নিজের ছেলেকে কিছু দেননি। তা ছেলের যেমন কর্ম, তেমনি তার ফল। মা আর বাপ দুজনকেই তো দগ্ধে-দগ্ধে মারল। আর শুধু মা-বাবাই বা বলি কেন? অমন সোনার প্রতিমা সুন্দরী বউটার দিকে একবার ফিরেও চাইল না। ওর এ জনমের রূপ-যৌবন সব ব্যর্থ হল গা।'

শমিতার কর্ণমূল রাঙা হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বলল—'কী সব কথা বলছ মাসি। চুপ করো দেখি—'

মণিরঞ্জন বলল—'আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না ইন্সপেক্টরবাবু। মামা খুন হলেন আর আমি তার বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলাম, এ দুটোই আমার কাছে সমান কষ্টের বলে মনে হচ্ছে।'

সুব্রত মুখ আড়াল করে একটু হাসল।

রাজীব বলল—'তা সারদা দেবী খুশি হতে পারেন বৈকি। দিলীপকে কতদিন থেকে জানেন। এ বাড়িতে দিলীপ আসবার আগে থেকে উনি ওকে চিনতেন। সেই দিলীপ এত বিষয়-সম্পত্তির মালিক হল। তাই আনন্দে উনি আটখানা।'

সারদা মুখ গম্ভীর করে শুধোল—'দিলীপকে আমি আগে থেকে চিনতাম? এ কথা আপনাকে কে বলতে গেল?'

'যেই বলুক, কথাটা সত্যি তো?'

সারদা জবাব দিল না। চোখ দুটি কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল।

রাজীব বলল—'উত্তেজনায় অনেক সময় ঘুম হয় না। আজ রাত্রে হয়তো আপনাকে স্লিপিং পিলও খেতে হবে।'

এবারও সারদা কোনো মন্তব্য করল না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

রাজীব বলল—'সুব্রত, এদের ফিংগার প্রিন্ট নেবার ব্যবস্থা কর। আজই সেটা ব্যুরোতে পাঠিয়ে দিও। ক্ষুরটার গায়ে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ওরা মিলিয়ে দেখবে।'

হরকান্ত শুধোল—'ফিংগার প্রিন্ট? ফিংগার প্রিন্ট দিয়ে কী করবেন মশায়।'

'বললাম তো এখনই।' রাজীব সকলকে উদ্দেশ করে কথাটা শোনাল। ফের বলল—'ফিংগার প্রিন্ট যদি না মেলে তাহলে কাল সকালে আপনি যেখানে খুশি যেতে পারবেন।'

হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দ শুনে সকলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অন্য কেউ নয়। দয়ালবাবুর বন্ধু গোপাল হোড়।

রাজীব বলল—'আসুন গোপালবাবু। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।' চাপা হাসি গোপন করার চেষ্টা করে সে যোগ করল—'কাল বিকেলে তো দয়ালবাবু আপনার কাছে গিয়েছিলেন? কিন্তু কেন বলুন তো?'

'বলছি মশায়।' গোপালবাবু জবাব দিলেন। 'সেই কথা সকলকে শোনাব বলেই তো এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম।'

সুব্রত দেখল কথা শুনবার জন্য সকলেই উৎসুক। প্রত্যেকেই গোপালবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। পকেট থেকে নীলচে রঙের একটা বড় কাগজ বের করে গোপালবাবু বললেন—'কাল বিকেলে দয়াল ফের একটা উইল করেছে।'

'আবার কী উইল?' সারদা রুদ্ধকণ্ঠে শুধোল।

'হ্যাঁ, নতুন একটা উইল। পুরাতন উইলটা বাতিল করে এই উইলে সে স্বাক্ষর করে গেছে।'

মণিরঞ্জন প্রশ্ন করল—'নতুন উইলে কী আছে গোপালবাবু?'

'বলছি।' গোপালবাবু অন্য পকেট থেকে চশমাটা বের করলেন। তারপর কাগজটার উপর এক নজর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'দয়াল তার বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু তার ছেলে প্রভঞ্জন এবং পুত্রবধূ শমিতার মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছে। দিলীপ আর মণিরঞ্জন দুজনে প্রত্যেকেই পাঁচ হাজার টাকা করে পাবে।'

'এ দলিল মিথ্যে। কর্তা কখনও এ রকম করতে পারেন না।' সারদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

গোপাল হোড় হেসে বললেন—'মিথ্যে না সত্যি তা আদালতই বলবে। আমাদের তর্ক করে লাভ নেই।'

সুব্রত বলল—'আমি আগেই বলেছিলাম রাজীবদা, এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক দিলীপ। ছোকরা জানতে পেরেছিল দয়ালবাবু তাকে বিষয় সম্পত্তি হতে ফের বঞ্চিত করেছেন। তাই গায়ের ঝাল মেটাতে রাতদুপুরে বুড়ো মানুষটাকে সে হত্যা করে।'

দিলীপ প্রতিবাদ জানাল—'কখনও না। এ মিথ্যে আজগুবি কল্পনা। আমি নির্দোষ—এই খুনের বিন্দুবিসর্গ জানি না।'

মধ্যস্থতা করে রাজীব বলল—'চেঁচামেচি করে লাভ নেই। কাল সকালেই ফিংগার প্রিন্ট ব্যুরোর রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তখন খুনী কে তা জানতে আর বাকি থাকবে না।'

টেলিফোনের ঝঙ্কার শুনে রাজীবের ঘুম ভাঙল। হাতল ধরতেই সুব্রতর গলা কানের কাছে এসে পৌঁছল।

'কী ব্যাপার সুব্রত? এত সকালে আবার ডাকাডাকি কেন?'

'এ বাড়িতে আবার একজন মারা গেলেন রাজীবদা।'

'বল কী? ফের খুন?'

'না রাজীবদা, খুন নয়—এটা সুইসাইড। উনি আত্মহত্যা করলেন।' টেলিফোনের তারে কথা ভেসে এল।

'তুমি কি এবারে সিওর? সুইসাইডের কেস পরে হোমিসাইডে দাঁড়াবে না তো?' রাজীব সন্দেহ প্রকাশ করল।

'অসম্ভব। আমি অভ্রান্ত জানবেন। আপনি এক্ষুনি চলে আসুন।' অপর প্রান্ত থেকে সুব্রত অনুরোধ জানাল।

তেমনি মিষ্টি সকাল। গাছের পাতায়, মাঠে, বাগানে রুপোলি রোদ্দুর। আগের দিনের মতই জিপে এসে গেটের কাছে দাঁড়াল। রাজীব জিপ থেকে নামতেই সুব্রত তাকে সোজা উপরে নিয়ে গেল।

নিজের ঘরে খাটের উপর সারদা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশ বালিশের উপর বাঁ হাতটা শিথিল করে রাখা। ঠোঁট দুটি বোজা। সমস্ত রাত্তিরের গুমোট গরমে মুখটা ভিজে জবজবে দেখাচ্ছে।

বিছানার পাশেই টেবিলটার উপর নজর পড়তে রাজীব থমকে দাঁড়াল। স্লিপিং পিলের খালি শিশিটা পথের ক্রসিঙের লাল আলোর মত তার দিকেই যেন সংকেত করছে।

কাছে এসে সুব্রত বলল—'এই চিঠিখানা রাজীবদা—'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ পড়ে দেখুন—সারদা আপনাকেই লিখছে।'

পত্রের কালো কালো অক্ষরের উপর রাজীব তখনই চোখ নামাল।

ইন্সপেক্টরবাবু,

এখন কত রাত জানি না। খোঁজ নেবার ইচ্ছেও নেই। কারণ সময়ের হিসেবটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নেহাৎই গৌণ। জানি, চিঠি লেখা শেষ করেই আমি ঘুমোতে যাব। এই দীর্ঘ নিদ্রা। সে ঘুম আর ভাঙবে না। কারো ভাঙেনি—আমারও কখনও ভাঙবে না।

এখনই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু চিঠিটা শেষ করতেই হবে। নইলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

ইন্সপেক্টরবাবু, আমি অপরাধ স্বীকার করছি। হ্যাঁ অকপটে তা মানছি। বিশ্বাস করুন, দিলীপ নির্দোষ। সে নিষ্পাপ। এই জঘন্য কাণ্ডের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। গতকাল গভীর রাতে কর্তাকে আমি খুন করেছিলাম। ধারালো ক্ষুর দিয়ে নিজের হাতে তার গলা কেটেছি। কর্তা বাধা দিতে পারেননি। প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে তিনি দুটো বড়ি খেয়ে ঘুমোতেন। কী ওষুধ আমি জানি না। কিন্তু কাল রাতে আমি কৌশলে তার হাতে দুটো ঘুমের বড়ি তুলে দিই। আমি জানতাম এই বড়ি খেলেই কর্তা গাঢ় নিদ্রায় ঢলে পড়বেন। এবং ফলে আমার কাজ অনেক সহজ হবে।

ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি নিশ্চয় ভাবছেন কেন আমি এই ঘৃণ্য অপরাধ করতে গেলাম? আশ্রয়দাতাকে হত্যা করে কেন মহাপাপী হলাম? আমি সব বলছি ইন্সপেক্টরবাবু। ভাগ্যই মানুষকে

নিয়ন্ত্রণ করে। কপালের লিখন এড়িয়ে যাবার সাধ্য নেই। আপনাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমার অনেক কথা আছে। এক সুদীর্ঘ কাহিনি। সব কথা শুনলে হয়তো পোড়াকপালী বলে আমার জন্য একটু সমবেদনা জানাবেন।

আজ থেকে কুড়ি বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। তার ঠিক দু-বৎসর পরেই আমার কোল আলো করে একটি ছেলে হয়। বেশ ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান শিশু। ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি ভাবছেন বিয়ের পর ঘর-সংসার নিয়ে আমি বেশ সুখী ছিলাম? কিন্তু আর সব মেয়ের ভাগ্যে যা সাধারণত হয়, আমার কপালে বিধাতাপুরুষ তা লেখেননি। একটা কথা আপনার কাছে স্বীকার করি। বিয়ের রাতেই স্বামীকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি। সে ছিল ব্যক্তিত্বহীন একটা মিনমিনে পুরুষ। স্ত্রীর তাঁবেদার হয়ে জীবন কাটাতে সে পৃথিবীতে এসেছিল।

খোকনের যখন বছরখানেক বয়স, তখন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আমার স্বামীর বন্ধু। তার নাম নীরেন। বেশ সুন্দর, স্বাস্থ্যবান চেহারা। গায়ের রং এত ফর্সা যে মেয়েরা হার মানে। নীরেন অসুস্থ হবার পর আমার স্বামী তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। বিদেশ বিভুঁয়ে মানুষটাকে কে দেখে তাই আমার উপর ভার পড়ল অসুস্থ মানুষটার সেবা পরিচর্যার। তারপর কেমন করে কী হল আমি বিস্তারিত বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু শুনুন। বন্যার জল যেমন করে ফুলে ফুলে উঠে অসহায় তীরের মাটিকে গ্রাস করে, নীরেনও ঠিক তেমনিভাবে অকস্মাৎ এক অশান্ত দুপুরে আমাকে অধিকার করল। আমি ওকে বাধা দিতে পারিনি। হয়তো বাধা দিতে চাইনি। আপনি গোয়েন্দা মানুষ, মনের নানা চোরাগলির খবর রাখেন। নিশ্চয় বলবেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো মেয়েকে দখল করা কি একজন পুরুষের পক্ষে সম্ভব?

যাই হোক, আপনাকে পরের কথা বলি। দিন পনেরো বাদেই নীরেনের হাত ধরে আমি ঘর ছাড়লাম। আমার খোকাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম ইন্সপেক্টরবাবু। কিন্তু নীরেন নিষ্ঠুর, সে রাজি হল না। বলল—আজ থেকে আমাদের নতুন জীবন শুরু হল সারদা। পিছনের দিনগুলোর কথা ভুলে যাও। আমার ভয় হল জোর করলে নীরেন যদি বিগড়ে যায়। আমাকে ফেলেই চলে যায়।

অবশ্য নীরেনের সঙ্গে আমার বনল না। মোটে বছরখানেক তার সঙ্গে ছিলাম। তারপর একদিন সে নিজেই কোথায় চলে গেল। আমাকে বলেও যায়নি। আমি আবার এই কলকাতায় ফিরে এলাম ইন্সপেক্টরবাবু। স্বামীর খোঁজখবর নিয়ে তার ঠিকানায় চিঠি দিলাম। আমি আবার ফিরে আসতে চাই। সে কি আমায় গ্রহণ করবে? তার চরণে ক্ষমাও চাইলাম। স্বামীকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল ওই মেনীমুখো পুরুষটা আমার চিঠি পেয়েই হাতে স্বর্গ পাবে। কিন্তু আমি যা ভাবিনি তাই সত্যি হল। সে আমাকে পরিষ্কার লিখল, আমার প্রস্তাব অবাস্তব, বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া খোকা জানে, তার মা বহুদিন হল স্বর্গে গিয়েছেন। সুতরাং পথ রুদ্ধ—আর খুলবে না।

ভাসতে ভাসতে বছর দুয়েক পরে আমি কর্তার সংসারে এসে উঠলাম। এখানে আমার ভাল লাগল। সমস্ত সংসারটার আমি কর্ত্রী। মেয়েরা তো এই চায়। বিশ্বাস করুন, মনে মনে কর্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

ক্রমে ক্রমে আমি সব জানলাম। ছেলের সঙ্গে কর্তার সম্পর্ক চুকে গেছে। এত বিষয়-সম্পত্তির উপযুক্ত ওয়ারিশ নেই। সুযোগ বুঝে কর্তার কাছে আমি দিলীপের কথা পাড়লাম। ছেলেটাকে যদি তিনি পুষ্যি নেন। আমার স্বামী ততদিন গত হয়েছেন। দিলীপ একটা আশ্রমে মানুষ হচ্ছিল। ওর বাবার নাম শুনে কর্তা একটু নরম হলেন। মানুষটাকে তিনি চিনতেন। নম্র, ধীর স্বভাব। তার ছেলেও নিশ্চয় বিনয়ী, শান্ত হবে। দিলীপকে দেখে কর্তার অপছন্দ হল না। ছেলেটাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

ইন্সপেক্টরবাবু, কেউ জানল না, দিলীপ আমারই সন্তান। এতদিন কাউকে বলিনি। উইলের

কথা আমি জানতাম। দিলীপ বিষয় সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম কিন্তু সেই কথাটা জানেন তো আপনি? জলের চেয়ে রক্ত চিরকালই ঘন আর গাঢ়। কর্তা যতই শক্ত হন, কথাটা তার বেলাতেও সত্যি। প্রভঞ্জনকে উনি ভুলতে পারেননি। ছেলেকে কি অত সহজে ভোলা যায়?

দিন পনেরো আগে হঠাৎ একটা ব্যাপারে আমার টনক নড়ল। রাত দুপুরে বউমার ঘরে কার ফিসফিসানি শুনলাম। অপরিচিত গলা। অন্ধকারে মানুষটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারিনি কয়েকদিন পরে ফের সেই গলা কানে এল। মনে হল কর্তাকে সব খুলে বলি। বাড়ির বউয়ের এই কলঙ্ক কদিন চাপা থাকবে? হয়তো কর্তাকে সব বলতাম। কিন্তু দুদিন আগে কর্তার ঘরে একটা চিঠি দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। প্রভঞ্জন বাপকে চিঠি দিয়েছে। সে আবার ফিরে আসতে চায়। কর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে যে পত্র দিয়েছে তা মিনতি আর অনুতপ্ত হৃদয়ের ভাব-ভাষায় ভরা।

ইন্সপেক্টরবাবু, আমি জানতাম বরফ এবার গলবে। কর্তা দ্রব হবেন। আর ঠিক তাই হল পরশুদিন সকালে বউমাকে সব কথা উনি খুলে বললেন। আমি আড়াল থেকে শুনলাম। কর্তা বলছিলেন, বউমা রাজি হলে উনি সমস্ত বিষয়টি ফের ভেবে দেখবেন। আমি স্পষ্টই বুঝলাম, দিলীপের ভাগ্য মন্দ। কর্তা তার উইল পাল্টাবেন, প্রভঞ্জনকে তিনি আবার গ্রহণ করবেন। কারণ বউমা স্বামীকে গ্রহণ করতে কখনও অরাজি হবেন না।

আমি তখনই মনঃস্থির করলাম। আর দেরি হলে সব নষ্ট। বিকেলে দেখলাম কর্তার ড্রয়ারে তার সই করা উইলটা অটুট রয়েছে সুতরাং আজ রাতেই কেল্লা ফতে করা চাই। বিলম্বে অনর্থ অনিবার্য।

...রাত দুপুরে বৌমার ঘরে ফের ফিসফিসানি শুনলাম। কান পেতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। স্তব্ধ রাত। তাই অস্পষ্ট শব্দও আমার কানে ভেসে এল। কর্তার নাম করে বউমা বললেন, উনি রাজি হয়েছেন। হয়ত উইলও বদলানো হবে। শুনে প্রভঞ্জন হেসে উঠল।

ইন্সপেক্টরবাবু, ঠিক তখনই আমি ক্ষিপ্ত বাঘিনী হয়ে উঠলাম। দিলীপকে এভাবে বঞ্চিত হতে দেব না। সেই মুহূর্তে আমি প্রায় উন্মত্ত। ক্ষুরটা কোথায় আছে তা জানতাম। মনে মনে আগে থেকেই তৈরি। আপনি ভাবছেন, মেয়ে হয়ে কেমন করে এই কাজ করলাম? কেন স্যর, মেয়েরা কি ধারালো বঁটিতে রেখে জ্যান্ত মাছের গলা কাটে না?

সব কিছু শেষ হলে ক্ষুরের বাঁটটা কর্তার মুঠোতেই গুঁজে দিলাম। তারপর আমার মনে হল ডায়েরিতে ক্ষুরের সাহায্যে গলা কাটার ব্যাপারটা লেখা আছে না? তাই ডায়েরিটা এনে বিছানাতেই রেখে দিলাম। সবাই ভাববে কর্তা আত্মহত্যা করেছেন।

ইন্সপেক্টরবাবু, চিঠি শেষ করার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করব। দিলীপকে বলবেন তার মা স্বর্গে যায়নি। কোনোদিন যাবে না। তার অদৃষ্টে নরক—অনন্ত নরকবাস অনিবার্য। তবু আপনার মাধ্যমে খোকাকে আমি শেষ অনুরোধ জানাচ্ছি—

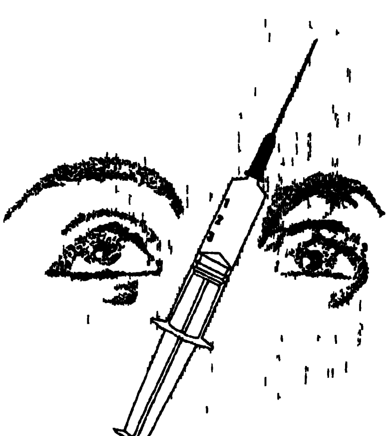
...বিপথগামিনী জননীকে ক্ষমা করে সে যেন তার মুখাগ্নি করে। অভিমান করে দূরে না চলে যায়।

আমি জানি, আমার খোকন, সোনামণি, তার দুঃখিনী মায়ের এই শেষ প্রার্থনাটুকু নিশ্চয় পূরণ করবে।

ইতি —
সারদা

অন্ধকারের মুখ

রাত দুপুরে বাড়িতে ঢিল পড়ত। মাঝে মাঝে। তারপর সুন্দরী নীপা রায় হঠাৎ আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যে বলল মিসেস রায়ের বাঁ পায়ের গোড়ালির একটু ওপরে একটা কালো দাগ পাওয়া গেছে। ফরেনসিক রিপোর্টে জানা গেল ওই কালচে দাগটা শরীরে কিছু পুশ্ করার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মিসেস রায়কে কে খুন করল? তার ডাক্তার স্বামী, অধ্যাপক দত্ত, নীলাদ্রি, নায়ক দেবরাজ মিত্র, মনোহর, নীপার কাকা। তারপর চন্দ্রবদন? ট্রেনের কামরায় ডাক্তারের বউকে সে কী অবস্থায় দেখেছিল?



ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত।

কিছুদিন ধরে ঢিল পড়ছে বাড়িতে। দিনমানে নয়, রাত-দুপুরে।

মাস তিনেক হল ব্যাপারটা চলছে। তাও একটানা নয়, কিংবা ঘন-ঘনও নয়। প্রথমে ঢিল পড়ল হঠাৎ এক নিশীথে। রাত-দুপুরে উঠে হইচই, চিল-চিৎকার। তারপর বেশ কিছুদিন চুপচাপ। দ্বিতীয়বার ঢিল পড়ল প্রায় মাসখানেক পরে। তিন দিনের ব্যবধানে দুবার। কিন্তু তারপরই দীর্ঘ বিরতি। আবার ঢিল পড়তে শুরু করেছে গত হপ্তা থেকে। আট-ন দিনের ব্যবধানে তিনবার ঢিল পড়ল বাড়িতে।

ঢিল পড়ার ধরনটা কিন্তু একই রকম।

প্রথমে ছোট সাইজের একটা টুকরো ঢিল। তারপর বড় বড় দুটো। নীপা ঘুম-চোখেই স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। অবশ্যই আবেগে নয়,......ভীত, কম্পিত হৃদয়ে, বুকের ভিতর রীতিমত ঢিপঢিপানি শুরু হয়েছে তার।

অম্বরেরও ঘুম গাঢ় নয়। বেশ পাতলা। প্রথম ঢিলটা পড়তেই অম্বর সজাগ হল। কিন্তু ব্যস্ত হল না। দ্বিতীয় ঢিল পড়ার পর সে চোখ খুলল।

কানের কাছে ফিস-ফিস করে নীপা বলল—'ওগো, আমার ভীষণ ভয় কবছে।'

তৃতীয় ঢিলের শব্দ কানে যেতেই অম্বর বিছানা থেকে নামল। দ্রুত হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল। টেবিল থেকে টর্চটা তুলে দরজা খুলতে গেল।

ততক্ষণে নীপাও খাট থেকে নেমেছে। অম্বর বাইরে যাচ্ছে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলল,—'অমন করে একলা বেরিও না। কেউ যদি অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে।'

অম্বর একটু হাসল। নীপা ভীতু-গোছের মেয়ে নয়। বরং ওর ভয়-ডর কম। কিন্তু রাত দুপুরে বাড়িতে ঢিল পড়লেই নীপা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। স্ত্রীর মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে অম্বরের মায়া হল। কেমন যেন আতঙ্কের ছায়া। ঠোঁট দুটি রক্তশূন্য। বেচারি।

দরজা খুলে অম্বর উঠোনে এসে দাঁড়াল। কেউ কোথাও নেই। টর্চের আলো ফেলে এদিকে ওদিকে দেখল। ভাঙা ইটের টুকরোগুলি উঠোনময় ছড়িয়ে। অম্বর একটা টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করল। রাত-দুপুরে পাড়া-পড়শিকে জাগিয়ে হইচই করা নিরর্থক। ব্যাপারটা সবাই জানে। সুতরাং অম্বর ঘরে ঢুকল। দরজায় খিল তুলে আলো নিভিয়ে দিল। রাতে আর ঢিল পড়ল না।

...... শেষ ঢিল পড়ল বুধবারে। একই ব্যাপার। প্রথমে ছোট একটা ঢিল। তারপর বড় সাইজের দুটো,—

অম্বর আলো জ্বালিয়ে-বাইরে এল। টর্চের আলো ফেলে উঠোনটা দেখল। ইটের টুকরোগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। অম্বর দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল।

সেদিন রাতেও আর ঢিল পড়ল না।

বৃহস্পতিবারের কথা।

টাউন ক্লাবে নাটকের মহলা সেরে নীপা বাড়ি ফিরছিল। ঘড়িতে সাতটার বেশি। ছটার সময় অম্বরের ডিউটি থেকে ফেরার কথা। এক ঘন্টারও বেশি সে একলা রয়েছে ভেবে নীপা একটু ব্যস্ত হল। অথচ আজ রিহার্সাল-ঘরে যাবার সময় এত দেরি হবে সে ভাবেনি। নীপার ধারণা

ছিল বড় জোর ঘন্টা দেড়েক মহলা চলতে পারে। কলেজের ছুটি হয়েছে চারটেয়। নীপা মনে মনে একটা হিসেব রেখেছিল। অম্বর ডিউটি থেকে ফেরার আগেই সে ঘরে পৌঁছবে। ভালো করে গা ধোবে ... আয়নার সামনে বসে টুকিটাকি প্রসাধন করবে। ছাত্রীর বেশ-বাস বদলে পুরোপুরি গৃহিণীর সাজে ঘর-সংসারে মন দেবে। অম্বর এসে দরজায় কড়া নাড়লেই এক মুখে হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে।

মাথার উপর বেয়াড়া সাইজের একটা কালো সামিয়ানার মত মেঘলা আকাশ। শেষ-শ্রাবণের মেঘ-থমকানো সন্ধ্যা। কৃষ্ণপক্ষের রাত, এমনিতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালো মেঘের ছায়া সেই অন্ধকারকে আগে এক পোঁচ রঙ লেপে দেওয়ার মত গাঢ় করেছে। শনশনে হাওয়া বইয়ের ঝোড়ো হাওয়া, রাত বাড়লে হাওয়ার গতি সম্ভবত তীব্র হবে। নীপা মাথা তুলে আকাশের বুকে দুটি একটি তারা খুঁজবার চেষ্টা করল। যদি কাটা কাটা মেঘের ফাঁকে এক-আধটা তারা হঠাৎ নজরে পড়ে যায়। ফিকে আকাশে এখন কালো মেঘের জমজমাট আসর। তারাগুলি ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা।

পিছন ফিরে রিহার্সাল-ঘরটার দিকে নীপা তাকাল। আলকাতরার মত ঘন অন্ধকারের বুকে রিহার্সাল-রুমটা ঠিক যেন কালো জলের জেগে-উঠা একটা দ্বীপ। ওই দ্বীপের বাসিন্দাদের টুকরো টুকরো সংলাপ, হাসি-কলরব এখন নীপার কানে বাজছে। রিহার্সাল-রুমে ঢোকার পর তিন ঘণ্টা সময় যেন হুস করে ফুরিয়ে গেল। ছটা বাজার পর নীপার অবশ্য একবার সময়ের খেয়াল হয়েছিল। বাড়ি ফেরার জন্য সে উসখুস করল। কিন্তু নীলাদ্রি নাছোড়বান্দা। নায়ক-নায়িকার সমস্ত দৃশ্য অন্তত একবার অভিনয় না হলে সে নীপাকে ছুটি দিতে রাজি নয়।

এখন চৈতি গান করছে। কান পেতে গানের কলি শুনতে নীপা চেষ্টা করল। এলোমেলো বাতাস। সুর ভেসে এলেও গানের কথাগুলি বোঝা গেল না। নাটকে দুটো গান গাছে চৈতির। মেয়েটার গলা মন্দ নয়। নীপা তা স্বীকার করে। কিন্তু ভীষণ হিংসুটে মন। সন্দেহবাতিক স্বভাব। নীপা কোনো ছেলের সঙ্গে হেসে কথা বললেই মেয়েটার চোখ দুটো কেমন দেখায়। ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। অক্ষিগোলক থেকে যেন জ্বালা নিঃসৃত হয়। বিশেষ করে নাটকের নায়ক দেবরাজ মিত্রের সঙ্গে কথা বললে তো আর রক্ষা নেই। চৈতি তখন সর্পিনীর মত ফুঁসবে। সম্ভবত মনে মনে দেবরাজকে প্রেম নিবেদন করে বসে আছে মেয়েটা। ব্যাপারটা নিতান্তই একতরফা বলে নীপার ধারণা। দেবরাজের কন্দর্পতুল্য কান্তি। সুপুরুষ চেহারা। চৈতির মত একটি সাধারণ কালো মেয়ের প্রেমে সে পড়তে যাবে কেন? মেয়েটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নীপা মজা অনুভব করে। গায়ে পড়ে দেবরাজের সঙ্গে দুটো বেশি কথা বলে। সময় বুঝে এক-আধটা পরিহাসও বাদ দেয় না।

চৌকো সাইজের মাঠটা পেরোতেই চওড়া পিচের রাস্তা। নীপাদের বাড়িটা আট-দশ মিনিটের পথ। তবু হাতের কাছে একটা রিক্‌শ পেলে নীপা উঠে বসত। সময়টা যদি আর একটু সংক্ষেপ করা যায়, দশ মিনিটের পথ যদি দু মিনিটে ফুরিয়ে আসে।

রাস্তায় উঠে নীপা এদিকে-ওদিকে তাকাল। একচক্ষু রিকশর আলো কোনো দিক থেকেই আসছে না। এদিকটা শহরের প্রান্তে। কোর্ট-কাছারি, সরকারি অফিসারদের ঘর-বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। বাজার-হাট, কেনাবেচা সব শহরের অন্যদিকে।

শন-শন বাতাসে শাড়িটি প্রায় উড়ছে। কাঁধের উপর ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা নীপা ঠিক করল। হাতের উপর সাজানো বই-খাতাগুলো গুছিয়ে নিল, এলোমেলো থাকলে হঠাৎ ফস্কে গিয়ে হাতের ফাঁকে খাতা-বই গলে যাওয়া বিচিত্র নয়। একবার পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। কাদা আর জল মেখে চিত্র-বিচিত্র অপরূপ বস্তু হয়ে উঠবে।

রাস্তার উপরেই মস্ত ছাতিমগাছ। আর কিছুদিন পরেই ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে এখানে নৈশ বাতাস মদির হয়ে উঠবে। ছাতিমফুলের গন্ধ নীপার ভাল লাগে না। কেমন নেশা-ধরানো গন্ধটা—মাথার ভিতরে ঝিম-ঝিম করে।

অন্ধকারে দৃষ্টি সরে না। তবু নীপার কেমন সন্দেহ হল। ছাতিমগাছের নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে। সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি স্পষ্ট। লোকটা নীপাকে লক্ষ্য করছে কি না বোঝা গেল না। তবু দ্রুত নীপার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল। কী মতলব ওর? অন্ধকারে অমন আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে কেন?

আশ্চর্য! লোকটা ছাতিমগাছের তলা থেকে রাস্তায় উঠে এল। নীপার বুকের রক্তে একটা অব্যক্ত আলোড়ন শুরু হল। তবে কি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা তার দিকে এগোচ্ছে? আত্মরক্ষার জন্য নীপা শক্ত হল। রিহার্সাল-রুমটা দূরে নয়। নীপা চীৎকার করলে লোকজন ছুটে আসবে।

লোকটার গায়ের রঙ এখন রোদে-পোড়া, তামাটে। অথচ এককালে ও রীতিমত ফর্সা ছিল। অযত্নবর্ধিত একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের চাউনিটা অস্বস্তিকর। ওকে চেনা যায়।

নীপা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—'তুমি এখানে? গাছের নীচে এমন ভূতের মত দাঁড়িয়ে কেন?'

লোকটা হি-হি করে হাসল। বলল,—'ভূতের মত কেন বলছ? তোমার কাছে আমি ভূতই তো। ভূত অর্থাৎ অতীত।'

বাধা দিয়ে নীপা বলল,—'আস্তে কথা বল। রিহার্সাল-ঘরটা কিছু দূরে নয়। আর আওতি-যাওতি লোকের মধ্যে চেনা-জানা মানুষ থাকতে পারে। তারা কী ভাববে?'

লোকটা আগের মতই হি-হি করে হাসল। বলল,—'তা সত্যি। তুমি এখন অফিসার-গিন্নি, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আড়ালে-আবডালে আমার মত মানুষের সঙ্গে কি কথা বলতে পার?'

—'কী বলবে বলো', নীপা ব্যস্ততা প্রকাশ করল। একটু টেনে টেনে বলল,—'আমার কাজ আছে।'

মুখের সিগারেটটা কখন নিভে গিয়ে থাকবে। লোকটা ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে করতলের আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—'গাছের তলায় একটু আগে এসে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ তোমার থিয়েটার দেখছিলাম মাইরি। কেমন সুন্দর ঢঙ-ঢাঙ দেখাচ্ছিলে। আর ইয়ে তোমার ঐ নায়কটি। ফার্স্ট ক্লাস অভিনয় করে ছোকরা। চেহারাটাও জব্বর। কথা বলার সময় তোমার দিকে এমন তাকাচ্ছিল—চোখ নাচিয়ে লোকটা ফের বলল—'তখন কিন্তু তোমার কাজের তাড়া আছে বলে মনে হয়নি।'

কথার পিছনে বোলতার হুল। নীপা রীতিমত বিরক্ত হল। কিন্তু উপায় নেই। লোকটা তাকে ছাড়বে না। বাক্যবাণ তাকে সইতেই হবে।

ভণিতা ছেড়ে লোকটা এবার আসল বক্তব্যে এল। বলল,—'নদীর ধারে একদিনও এলে না যে?'

নীপা যেন তৈরি হয়েই ছিল। বলল, 'টাকা জোগাড় করতে পারিনি। শুধু হাতে গেলে তুমি নিশ্চয় খুশি হতে না।?'

লোকটা ব্যঙ্গ করে বলল,—'তোমার কাছে টাকা নেই, তাই না? মাইরি, তারপর কী বললে? সুন্দরী শুধু হাতে এলে আমি খুশি হতাম না।'

ওর কথা গায়ে না মেখেই নীপা পা বাড়াল। 'পথ ছাড়ো। আমার কাজ আছে।' সে স্পষ্ট বলল।

লোকটা দু হাত বাড়িয়ে একটা নাটকীয় মুর্হূত রচনা করল। বলল,—'বা, বেশ মজা মাইরি!

আমার টাকাটা না দিয়েই পালাচ্ছ যে।'

হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে গেলে মানুষ যেমন অসহায় বোধ করে, নীপার মুখ-চোখ তেমনি দেখাল। অন্য পরিস্থিতি হলে নীপা রাগে ফেটে পড়ত। কিন্তু এখানে সে নিরুপায়। লোকটার কাছে তার বাঘ-বন্দি অবস্থা।

ভ্রূ কুঁচকে নীপা বলল—'টাকা কি আমার সঙ্গে আছে?'

লোকটা রাগল না। বলল,—'বেশ তো। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, চলো। বাড়ি গিয়ে টাকাটা দেবে।'

—'অসম্ভব।' নীপা প্রায় গর্জে উঠল। 'বাড়িতে এখন আমার স্বামী রয়েছেন।'

আশ্চর্য! লোকটা এবার হাসল না, রাগলও না। বরং দৃঢ় হল। শক্ত ভঙ্গিতে বলল,—'টাকা না পেলে আমাকে তোমার স্বামীর কাছেই যেতে হবে।' ক্রূর হেসে সে বলল,—'আমরা সেই ডাকবাংলোতে একটা ছবি তুলিয়েছিলাম, মনে আছে নীপা? তোমার গলায় মালা, আমার গলায় মালা। ঠিক যেন বর-বউ।' লোকটা হি-হি করে হাসল।

নীপা প্রায় চমকে উঠল। মানুষটা সাঙ্ঘাতিক। এতদিন পরে সেই ছবিখানা ও বের করতে চায় নাকি? তাহলে নীপার সর্বনাশ হতে আর কী বাকি থাকবে? সাত-আট বছর আগের সেই দিনটার কথা ভেবে নীপার আঙুলে কামড়ে মরতে ইচ্ছা করল।

লোকটা এবার ধমক দিল। 'চালাকি ছাড়ো। টাকাটা রবিবার সন্ধেয় আমার চাই। নদীর ধারের সেই গাছতলায় আমি অপেক্ষা করব। কথাটা মনে রেখো।'

রিহার্সাল-ঘর থেকে সম্ভবত আরো কেউ বেরোল। তাদের কণ্ঠস্বর, টুকরো কথাবার্তা বাতাসে ভেসে এল। ঘাড় বেঁকিয়ে নীপা ওদের চিনতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার। দৃষ্টি সরল না।

ইতিমধ্যে লোকটা অন্ধকারে ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে। নীপা সামনের দিকে তাকিয়ে ওকে আর দেখতে পেল না। হয়ত রিহার্সাল-ঘর থেকে লোকজন বেরোতে ও লক্ষ্য করে থাকবে। কিংবা ওর কোনো তাড়া আছে। তাই কাজের কথা শেষ করে সরে পড়তে দেরি করেনি।

লোকটা চলে যেতেই নীপা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ যেন দম-বন্ধ করা একটা বন্ধ খুপরীতে নীপা খাবি খাচ্ছিল। এই মাত্র দরজা খুলে সে মুক্ত বায়ুর স্পর্শে চাঙা অনুভব করছে।

দরজায় তালা ঝুলছে।

এক নজরে সেদিকে তাকিয়ে নীপা রীতিমত বিস্মিত হল। অম্বর কোথায়? হাসপাতাল থেকে ফিরে তার তো বাড়িতেই থাকার কথা। নীপার অবশ্য ফিরতে দেরি হয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে রীতিমত লজ্জা অনুভব করল। প্রায় আটটার মত। নিশ্চয় তার জন্য বেশ কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করে অম্বর কোথাও বেরিয়েছে।

শোবার ঘরে ঢুকে নীপা খাটের উপর ভেঙে পড়ল। কখন সকাল দশটায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে সে বেরিয়েছিল। কলেজে ছটা ক্লাশ করতে হয়েছে। টিউটোরিয়াল নিয়ে তিনটে অনার্সের ক্লাস। পড়ার চাপে দেহ-মন বিকল হবার অবস্থা। কিন্তু শুয়ে থাকার উপায় নেই। এখনি নীপাকে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে। সংসারে দুটি মাত্র প্রাণী, তাই রান্নার জন্য কোনো লোক এতদিন ছিল না। কিন্তু কলেজে ঢুকে নীপার সময়ের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। একবার কলেজে বেরোলেই এদিক-ওদিক করে অনেকখানি সময় চলে যায়। তারপর পড়াশুনো আছে। পাশকোর্সে ঢুকলে হয়ত এতখানি টানাপোড়েন হত না। অনার্স নিয়েই হয়েছে ফ্যাসাদ। খাতাপত্র আর বইয়ের স্তূপ

ঠিক পাহাড়-প্রমাণ বোঝা। কেমন করে পাশ করবে তাই ভেবে নীপা কূল পায় না।

ছোকরা চাকরটা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। নীপা কলেজে ভর্তি হবার পর অম্বর কোথা থেকে আনল ছেলেটাকে। মাইল দশ-বারো দূরে কোন্ গ্রামে বাড়ি। বাপের জমি-জেরাত নেই। তাই কাজ খুঁজতে শহরে এসেছিল। অম্বরের লোকের প্রয়োজন। জানাশুনো কেউ ছেলেটাকে হাজির করল অম্বরের সামনে। কালো ছিপছিপে গড়ন, নাকের নীচে গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাম জিজ্ঞেস করতে কলল,—দুখু। তার নাম দুঃখহরণ মহাপাত্র।

মাস ছয়েক কাজ করছে ছেলেটা। এই ক'মাসে অবশ্য অবিশ্বাস্য রকম উন্নতি হয়েছে ওর। পুরনো ঘরবাড়ি মেরামতির মত দেহটা যেন ভেঙে-চুরে তৈরি হল। হিল-হিলে গড়নের পরিবর্তে শক্তসমর্থ জোয়ান চেহারা। নাকের নীচের সেই অল্প অল্প গোঁফের রেখা আর নেই। কামানো, পরিষ্কার চকচকে মুখ। নীপার ধারণা দু-একদিন অন্তরই ছোকরা লুকিয়ে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে আসে। বিড়ি-সিগারেট নিশ্চয়ই খায়,—বাজারের হিসাবে ছোটখাটো গরমিল নিত্যদিন লেগে আছে।

আলসেমির সুখটুকু ঝেড়ে ফেলে নীপা উঠল। বিছানার পাশেই প্রমাণমাপের আয়না। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল নীপা। এই আষাঢ়ে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তার। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এতখানি বয়স আন্দাজ করাও কঠিন। বড় জোর কুড়ি-একুশ। বেশি ভাবলে বাইশ পর্যন্ত। আর এগোতে সম্ভবত কেউ চাইবে না।

পানের পাতার মত মুখের ডৌল। বাঁ দিকের গালে ছোট্ট একটি কালো তিল। ঝিকিমিকি সাদা একসার দাঁত। ঘন কৃষ্ণ বঙ্কিম ভুরু। বড় বড় চোখ, ঈষৎ লালচে রঙের পাতলা ঠোঁট। রূপমুগ্ধ প্রেমিকের মত নিজের রূপ সৌন্দর্যকে নীপা অপাঙ্গে দেখছিল।

বিছানার এককোণে কলেজের বই-টই সব গাদাগাদি করে পড়ে। দ্রুতহাতে সেগুলি তুলে নিয়ে নীপা তার পড়ার ঘরের দিকে এগোল। বইখাতাগুলি টেবিলে ঠিকমত গুছিয়ে না রাখলে কাজের সময় আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিক-ওদিক হাতড়ে পড়ার মেজাজটুকুই নষ্ট হওয়া সার।

আজ কলেজে নীলাদ্রির কাছ থেকে একখানা বই এনেছে নীপা। বইখানা তার খুব প্রয়োজন ছিল না। বাংলা-সাহিত্যের উপর আলোচনার বই। নীপা ইতিহাসে অনার্স নিয়েছে। অনার্সের নোটগুলি ঠিকমত তৈরি করতেই সে নাকাল। বাংলা পড়তে তার সময় কোথায়? পরীক্ষার দু চারদিন আগে চোখ বুলিয়ে নেবে। এইটুকুই ভরসা। নিজে খেটেখুটে বাংলার নোট তৈরি করতে মজুরি পোষাবে না। কিন্তু নীলাদ্রি সেনের গরজ তার চেয়েও বেশি। সাফল্যের উপযোগী বইটই নীপার হাতে তুলে দিতে তার উৎসাহের কমতি নেই। বাংলার পেপারে নীপা বেশি নম্বর পেলে নীলাদ্রির ছাতিখানি বুঝি দ্বিগুণ ফুলে উঠবে!

নীলাদ্রি সেন পলাশপুর কলেজের বাংলার অধ্যাপক। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি না। এখনও ব্যাচেলর। সাহিত্য ছাড়াও আর একটি বিষয়ে নীলাদ্রির গভীর অনুরাগ। সেটি হল নাট্যকলার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ। কলকাতায় থাকতে শৌখিন অপেশাদার একটি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল নীলাদ্রি। মহানগরীর বিভিন্ন হলে তাদের দলের অভিনয় একসময় রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। কলকাতার সেই নাট্য-প্রেমীদের কাছে নীলাদ্রির হাতেখড়ি। কিন্তু গলার স্বরটা ভালো নয় বলে অভিনয়ে তার সুবিধে হয়নি। অভিনেতা হবার আশা ছেড়ে নীলাদ্রি তখন পরিচালক এবং নাট্যকার হতে চেষ্টা করল। কিন্তু পরিচালক হবার সৌভাগ্য কলকাতায় তার অদৃষ্টে জোটেনি। তবে গোটা দুই রেডিওর উপযোগী নাটক লিখে নীলাদ্রি কিছুটা সফল হল। বেতারে নাটক দুটি অভিনীত

হবার পর তার ভাগ্যে কিছু প্রশংসা জুটল।

পলাশপুরে এসে নীলাদ্রি সেনের স্বপ্ন সার্থক। এখানকার সে অবিসম্বাদী পরিচালক। কলকাতার নাম-করা নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নীলাদ্রি। বেতারে তার নাটক অভিনীত হয়েছে। সুতরাং পলাশপুরে নীলাদ্রির প্রতিযোগী হতে শক্তি কার? বিশেষ করে কলেজের নাট্যানুষ্ঠানে—সেখানে তার প্রভাব প্রতিপত্তি সর্বাধিক। এখন অবশ্য পলাশপুরের যে কোন ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠানে নীলাদ্রির আহ্বান আসে। বলাবাহুল্য প্রস্তুতি পর্ব থেকেই তার দায়-দায়িত্ব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটক পরিচালনার ভারটা তার। অন্যথায় প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তার নাম বিজ্ঞাপনে ঘোষিত। পরিচালনা ছাড়াও আরো অনেক কাজ নীলাদ্রির। কলকাতার জানাশুনো নাট্যগোষ্ঠী থেকে বইয়ের নায়িকা সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে তাকে। খুব কম খরচে ভালো হিরোইন জোগাড় করে পলাশপুরের ছেলেদের কাছে রীতিমত প্রিয় পাত্র হয়েছে নীলাদ্রি।...

পলাশপুরে এসে নীলাদ্রির সঙ্গে তার দ্বিতীয় দর্শন। ব্যাপারটা সম্ভবত কেউ জানে না। আর কারো জানবার নয়। কলেজের ছেলেমেয়েরা তো নয়ই,—এমন কি তার স্বামীও নীলাদ্রিকে চিনবে না। অবশ্য চিনতে পারার কারণ নেই। তাদের আরপুলি লেনের বাড়িতে নীলাদ্রি কোনোদিন আসেনি। ভগবানের অসীম করুণা। তার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে নীলাদ্রি যদি বাড়িতে এসে খোঁজ করত, তাহলে নিশ্চয়ই ভীষণ একটা কাণ্ড হত। নীপার বাবা তাকে ছেড়ে কথা কইতেন না। গোকুলনগর থেকে পালিয়ে এসে বাবা একেবারে অন্য মানুষ। কথায় কথায় রাগমূর্তি। কারণে অকারণে অসন্তোষ আর উত্তেজনায় ফেটে পড়েন।

সেদিনকার কথা ভাবলে নীপার এখন প্রচণ্ড দুঃখ হয়। কী যে দুর্মতি হয়েছিল তার। গোকুলনগর ছেড়ে আসার সময় বাবা কারো সঙ্গে দেখা করেননি। কাউকে ঠিকানা পর্যন্ত দিলেন না। রণক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী সৈন্যদের মত তারা সবাই নিঃশব্দে গোকুলনগর ত্যাগ করল। গভীর নিশীথে যখন ট্রেন ছাড়ল, তখন শহরটা মৃতের মত শান্ত।

কলকাতায় এসে প্রথম কয়েক মাস আত্মগোপন। প্রায় বন্দিদশা। ঘরের মধ্যে মুখ বুজে পড়ে থাকা। বাবার কড়া হুকুম,—দরজার বাইরে পা দেওয়া চলবে না। দিনগুলো মন্থর আর খুব ভারী মনে হত নীপার। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হয়, দোতলার কোণের ঘরটায় বসে সে দেখত। গলির পথে মানুষজন হাঁটছে, আসা-যাওয়া করছে। তার মত সব তরুণীর দল কলরব করে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে।

তিন-চার মাস পরে বাবা একটু নরম হলেন। তখন কলেজে ভর্তি হবার মরসুম। কি ভেবে বাবা তাকে কলেজে পাঠালেন। প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসে ভর্তি হল নীপা। সকালবেলায় মেয়েদের কলেজ। বাড়ি থেকে দশ মিনিটের পথও নয়। প্রথম কিছুদিন বাবা তাকে কলেজে পৌঁছে দিতেন। ছুটির সময় একটা ঝি গিয়ে নিয়ে আসত। ব্যবস্থাটা অল্প কয়েকদিনের। কলেজের ছুটির কোনো স্থিরতা নেই। প্রফেসর না এলে দু-এক পিরিয়ড আগেই ছুটি হয়। নীপা তখন একাই বাড়ি ফিরে আসে। সুতরাং সহচরি-পরিবৃতা হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থাটা বাতিল হতে দেরি হল না।

নীলাদ্রির সঙ্গে পরিচয়টা আকস্মিক। কলেজ থেকে বেরিয়ে তার এক বন্ধুর সঙ্গে পথ হাঁটছিল নীপা। মেয়েটার নাম মনে আছে তার, বাণী—বাণী গুহ। আমহার্স্ট স্ট্রিটে ওদের বাড়ি। পার্কটার কাছে বাণী আমহার্স্ট স্ট্রিটে ঢুকবে,—নীপা এগিয়ে যাবে গোলদিঘির দিকে।

হঠাৎ কোথা থেকে নীলাদ্রি এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। নীপার বিব্রত ভঙ্গি থেকে বাণী বলল,—'আয় আলাপ করিয়ে দিই তোর সঙ্গে। আমার পিসতুতো দাদা নীলাদ্রি সেন। বাংলায় এম.এ. পড়ছে।'

নীলাদ্রি হাত তুলে নমস্কার জানাল।

নীপার আরক্ত কর্ণমূল, আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে বাণী হাসল।

বলল—'উদয়ন নাট্য গ্রুপের নাম শুনেছিস? নীলুদা ঐ গ্রুপের মেম্বার। থিয়েটার দেখতে চাস তো বল,—নীলুদা তোকে ফ্রি পাস দিতে পারে।

নীলাদ্রি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করল। চট করে সে অন্য এক প্রস্তাব করে বসল,—'নাটক দেখতে চান, নিশ্চয় ফ্রি-পাস দেব। কিন্তু শুধু দেখবেন কেন? আপনি আমাদের গ্রুপে আসুন না?' একটু হেসে সে ফের বলল,—'অভিনয় করতে ভালোবাসেন না আপনি?'

নীপা কিছু বলবার আগেই বাণী খিলখিল করে হাসল। মেয়েটা বিষম ফাজিল। মুখের আগল বলতে কিছু নেই, যা কিছু মনে আসে তাই বমির মত উগরে ফেলে।

বাণী বলল—'বুঝতে পেরেছিস এবার? নীলুদার তোকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে। দলে নিতে চায়—'

নীপার ফর্সা মুখ টম্যাটোর মত লাল হয়ে উঠল।

বাণী হেসে বলল,—'তুমি পাগল হয়েছ নীলুদা? ও যাবে থিয়েটার করতে? ওর বাবা তাহলে আস্ত রাখবেন না। কলেজ ছাড়া অন্য কোথাও যাবার পারমিশন নেই ওর।'

নীলাদ্রি ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি করল। ঠিক সিনেমা-থিয়েটারের নায়কের ঢঙ। বলল,—'আই অ্যাম সো সরি, কিছু মনে করবেন না। বাড়িতে অমত থাকলে আসবেন কেন? নিশ্চয়—'

পরদিন কলেজে এসে বাণী বলল,—'নীলুদা কী বলছিল জানিস? তোকে নাকি নায়িকার রোলে চমৎকার মানাবে। ভেবে দ্যাখ, রাজি আছিস কি না—'

নীপা মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলল,—'তুই ক্ষেপেছিস! অভিনয়ের আমি কী জানি? আর অমন নামী দলে—'

—'নীলুদা বলেছে অভিনয় ওরা শিখিয়ে নেবে। একদিনেই কেউ কি নাম করে?'

নীপা হাসল। কোনো উত্তর দিল না।

নীলাদ্রির সঙ্গে আবার দেখা হল।

দিন সাতেক পর। কলেজ থেকে নীপা একাই বেরিয়েছে। বাণী ক্লাসে আসেনি। সম্ভবত জ্বর-টর, কিংবা অন্য কোথাও গিয়েছে।

রাস্তার উপর নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় কারো জন্য অপেক্ষা করছে।

নীপা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই নীলাদ্রি বলল,—'আরে! আমাকে চিনতেই পারলেন না যে—'

বাধ্য হয়ে নীপা মুখ তুলল। একটু বিব্রত ভঙ্গিতে বলল,—'বাণী আজ আসেনি।'

'তা জানি!' নীলাদ্রি হেসে বলল।—'আমি তো আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।'

—'আমার জন্যে?' নীপা বিস্মিত হল। নীলাদ্রি অর্থপূর্ণ হাসল। 'বাণী একটা বই পাঠিয়েছে আপনাকে দিতে।' একটু থেমে বলল,—'আমাদের গ্রুপে আসার কথা ভেবেছেন নাকি?'

অদ্ভুত সাহস নীলাদ্রির। বইয়ের মধ্যে একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছে সে। সাদা খামখানা। নীপা ভেবেছিল বাণী কিছু লিখেছে তাকে। চিঠিখানা খুলে তার রীতিমত বেকায়দায় পড়ার অবস্থা। এপাশে-ওপাশে মেয়েদের ভিড়। কৌতূহলি দৃষ্টিতে কেউ কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। তার মুখভাবের পরিবর্তন নিশ্চয় অনেকের নজর এড়ায়নি।

নীপা মুখ তুলে দেখল নীলাদ্রি সামনে নেই। কখন মোমের মত নিঃশব্দে সে ভিড়ের মধ্যে গলে পড়েছে।

দীর্ঘ চিঠিখানা। উনুনে সেটিকে নিশ্চিহ্ন করে নীপা স্বস্তি পেল।

পরদিন কলেজ থেকে বেরোতেই নীলাদ্রির মুখোমুখি হল সে। কিন্তু নীপা আশ্চর্য হল না। সে জানত নীলাদ্রি আসবে, তার সামনে দাঁড়াবে।

একদিনেই বদলে গেছে নীপা। আজ সে সহজ, কোনো আড়ষ্টতা অনুভব করছে না। নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'কি, আজও বই-টই এনেছেন নাকি?' নিজের কানেই তার কণ্ঠস্বর পরিহাস-তরল শোনাল।

নীলাদ্রি স্পষ্ট উত্তর দিল,—'না, আজ বইটা ফেরত নিতে এসেছি।'

নীপা ফিক করে হাসল। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'বইটা বাণীকেই ফেরত দেব। দুশ্চিন্তা করবেন না।'

শক্তিশালী কোনো গ্রহের মত নীলাদ্রির আকর্ষণ। ওর সঙ্গে নীপা সেদিন অনেকখানি পথ হাঁটল। নীলাদ্রি তাকে এনে তুলল মাঝারি ধরনের একটা রেস্তোরাঁয়। লতা-পাতা আঁকা পর্দা-ঢাকা কেবিনের মধ্যে কেমন স্বচ্ছন্দে এসে বসল সে।

একসময় নীলাদ্রি ওর বাঁ হাতটা স্পর্শ করল। আঙুলগুলি নিজের দুই করতলের মধ্যে চেপে ধরল। নীপা তাতে বাধা দিল না।

দরজায় খুট-খুট শব্দ। নীপার ভাবনা-চিন্তা সত্বর ফিরে এল। নিশ্চয় অম্বর এসেছে। রান্নাঘরে এখনও যেতে পারেনি ভেবে নীপার মনটা বিক্ষুব্ধ হল।

দরজা খুলে নীপা বলল,—'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

অম্বরের গম্ভীর মুখ। কী যেন ভাবছে সে।

নীপা ব্যগ্র হল। 'ওমা তুমি অমন চুপ করে কেন?'

—'থানায় গিয়েছিলাম একবার।'

—'থানায়? কেন বলো তো?'

—'রাত-দুপুরে বাড়িতে ঢিল পড়ছে। ব্যাপারটা কেমন ঠেকছে আমার। পুলিশকে জানিয়ে রাখা ভালো।'

—'পুলিশ কী বলছে?'

অম্বরের কপালে কুঞ্চিত রেখা। ভয়-ভাবনার মিশ্র তরঙ্গে তার মনটা বিক্ষিপ্ত বোঝা যায়। 'বড় দারোগা বলল, দুষ্টু লোক কিংবা বার্গলারদের কাণ্ড হতে পারে। কিন্তু এতদিন ধরে তারা ঢিল ফেলে না।'

—'তবে?'

অম্বর খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল,—'কথাটা তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম, মিথ্যে ভয় পাবে?'

—'কী কথা?' নীপা বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল।

—'ও-সি'র কাছে একটা ঘটনা শুনে এলাম। বছর তিন-চার আগে নতুনবাজারে একটা বাড়িতে এমনি ঢিল পড়ত। প্রায় প্রতি রাতেই। কোনদিক থেকে যে ঢিল আসত কেউ বুঝতে পারেনি।'

—'তারপর?' নীপা জানতে চাইল—

—'ব্যাপারটার নিবৃত্তি হল একটা দুর্ঘটনার পর। বাড়ির বড় মেয়েটি হঠাৎ আত্মহত্যা করল।

—'বল কী!' নীপার কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত শোনাল।

অম্বর গম্ভীর মুখে বলল,—'হ্যাঁ। তারপর থেকেই রাতদুপুরে ঢিল পড়া বন্ধ হল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কিছু পড়ল উঠোনে। আলো জ্বালিয়ে অম্বর দ্রুত এল। অন্য কোনো বস্তু নয়। একটা ভাঙা ইট। সজোরে মাটিতে পড়ে সেটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

দুই

খুব ভোরে নীপার ঘুম ভাঙল।

বাইরে টিপ-টিপ বৃষ্টি। জলে ভেজা কাক-পক্ষীর কর্কশ চিৎকার। জানালার পর্দাটা বাতাসে পত্‌পত্‌ উড়ছে। একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস নীপার চোখে-মুখে এসে লাগল।

মাথা তুলে আকাশটাকে নীপা লক্ষ্য করল। গুরুভার কালো মেঘের এখন জীর্ণ বসনের দশা। এখানে ওখানে ছিঁড়েছে। ফুটিফাটা মেঘের ফাঁকে নীল আকাশের উঁকি ঝুঁকি।

বিছানা ছেড়ে নীপা নামল, হাত তিন-চার ব্যবধানে দুটি খাট। অন্যটিতে অম্বর শুয়ে। মানুষটা এখন ঘুমে অচেতন। সাতটার আগে অম্বরের ঘুম ভাঙে না। ভাঙবার প্রয়োজনও নেই। সকাল নটায় ওর হাসপাতালে হাজির থাকার কথা। স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিতে ঘণ্টা-দুই সময় যথেষ্ট পর্যাপ্ত।

হাত ধুয়ে নীপা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গতকাল রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়ে। এখানে সেখানে জল জমে। দমকা বাতাসে ধিঙ্গি মেয়ের মত হিলিলি গাছ-গাছালি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। শেষ রাত্তিরে ব্যাঙের চিৎকার, ঝিঁঝিঁর ডাক—সব মিলিয়ে ভুতুড়ে ঐক্যতান। শুনলে গান ছম্‌-ছম্‌ করে।

চায়ের পাট আরো দেরিতে। অম্বর ঘুম থেকে না উঠলে নিজের জন্য ঝামেলা করতে সে নারাজ। ভোরের দিকটা বেশ নিরিবিলি, নীপা ঘণ্টাখানেক সময় সুন্দর পড়াশুনো করে। ক্লাসের নোটগুলি গোটা গোটা অক্ষরে ভালো করে লেখে। লাইব্রেরি কিংবা প্রফেসরদের কাছ থেকে চেয়ে আনা বইগুলি পড়ে। প্রয়োজনমত অংশবিশেষ নোট করে রাখে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীপা দেখল প্রফেসর অনিমেষ দত্ত হেঁটে ফিরছেন। পরনে পাতলুন এবং গেরুয়া রঙ-এর হাঁটুঝুল পাঞ্জাবী। বৃষ্টি থেমেছে বলে হাতের ছাতাটা আম্রবৃক্ষের আকার নেয়নি। এত সকালে কোথায় গিয়েছিলেন উনি? হাতে কোনো জিনিসপত্র না দেখে নীপার মেয়েলি কৌতূহল কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার মত মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল।

ওকে দেখে অনিমেষ দত্ত থামলেন। নীপা বলল,—'এত সকালে কোথায় গিয়েছিলেন স্যর?'

—'মর্নিং ওয়াকে'। প্রফেসর দত্ত ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আবার বললেন,—'খুব ভোরে উঠে বেড়িয়ে আসা আমার অভ্যেস। বৃষ্টির জন্য আজ বেরোতে দেরি হল।' সামনের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর দত্ত আবার হাঁটতে শুরু করবেন কি না ভাবছেন।

নীপা একমুখ হাসি নিয়ে বলল,—'আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ছিনে স্যর। অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্য বসে যেতে হবে। এখানেই এক কাপ চা খেয়ে নিন।'

প্রফেসর দত্ত হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রীতিমত ব্যস্ত হলেন। বললেন,—'ভীষণ দেরি হয়ে গেছে আজ। আর বসব না, অন্য একদিন বরং আসব, কেমন?'

নীপা ক্ষুণ্ণ হল। কণ্ঠস্বরে মেয়েলি অভিমান মিশিয়ে সে বলল,—'আজ বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখা হল, তাও বাড়িতে ঢুকলেন না। অন্যদিন কি আর আপনি আসবেন স্যর?'

অনিমেষ দত্ত ছাত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন। 'কেন আসব না? নিশ্চয় আসব একদিন। আর তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে তো আমি প্রায়ই যাই। খুব ভোরে, তখন তোমরা ঘুমিয়ে থাক।'

দু-চার পা এগিয়ে অনিমেষ আবার ফিরলেন। নীপা বললেন,—'আজ বিকেলে তুমি আসছ তো? মৌর্য সম্রাট অশোকের পিতৃসুলভ রাজধর্মের বিষয় সেদিন আলোচনা করলাম। আজ একটা ভালো নোট দেব তোমাকে, নিশ্চয় কাজে লাগবে তোমার।' শেষের কথাকটি প্রফেসর স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করলেন।

নীপার মনে পড়ল দিনটা শুক্রবার। অনিমেষ দত্তের কাছে তার পড়তে যাবার কথা। হপ্তায় দুদিন প্রফেসর দত্ত তাকে পড়ান। ইতিহাসের অধ্যাপক অনিমেষ দত্তের অধ্যাপনায় যথেষ্ট সুনাম বিশেষ করে অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। তাঁর নোটগুলি সাফল্যের নিশ্চিত সহায়ক। অধ্যাপক দত্তের ক্লাসগুলি ভালো ছেলেরা কখনও মিস করে না।

খুব নির্বিরোধী এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ প্রফেসর দত্ত। লম্বায় প্রায় পৌনে ছ'ফুট, মেদহীন শক্ত দেহ। বয়স চল্লিশের বেশি।

মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। ছোট ছোট চিন্তিত চোখ। উপরের পাটির সামনের দাঁত দুটি নেই কোনো দুর্ঘটনায় ভেঙে থাকবে। এখন সোনা বাঁধানো দন্তযুগল হাসলেই ঝিকমিক করে।

নীপাদের বাড়ি থেকে খানিকটা এগিয়ে রাস্তাটা বেঁকেছে, এদিকটায় একচাপে বসতি নেই ঘর-বাড়িগুলো ঠিক পাশাপাশি নয়। দুটি বাড়ির মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান। পথচলতি মানুষজনের সংখ্যা কম। দুপাশে ঝোপঝাড়, কোথাও আগাছার জঙ্গল। খানিকটা এগোলেই মস্ত একটা ঘোড়ানিমগাছের স্নিগ্ধছায়া।

পথের বাঁকে অনিমেষ দত্ত অদৃশ্য হতেই নীপা ঠোঁট উল্টিয়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল। মানুষটা কেমন যেন। সবসময় নিজেকে আড়াল করে থাকতে ভালবাসেন। কর্মস্থলে খুব গম্ভীর আর চুপচাপ ভদ্রলোক। কারো সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব বা মেলামেশা নেই। ক্লাস নেওয়া শেষ হলে একটি মিনিটও কলেজে নষ্ট করেন না। সভা-সমিতি কিংবা কোন ফাংশনে কদাচিৎ উপস্থিত হন। অধ্যাপক এবং সাধারণ ছাত্র-মহলে অসামাজিক বলে যথেষ্ট অখ্যাতি। আড়ালে কেউ কেউ ঘরকুনো পেঁচা বলেও বক্রোক্তি করে।

কিন্তু অনিমেষ দত্ত অবিচল, মেলামেশার ব্যাপারে উনি এতটুকু আগ্রহী নন। পেচকের মত কোটরে লুকিয়ে থাকতেই তাঁর অভিলাষ। কেউ মিশতে চাইলে, ওর সেই কাঠ-কাঠ, শক্ত-শক্ত ভঙ্গিটা আরো দৃঢ় হয়। শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নেন ভদ্রলোক। কলেজের ছেলেরা প্রয়োজনে তাঁর বাড়িতে হানা দিলে রীতিমত বিব্রত বোধ করেছেন অনিমেষ দত্ত।

মাস তিন হল নীপা ওর কাছে পড়ছে। প্রথম দিনের কথা নীপার মনে এল। টিউশনির প্রস্তাব শুনে কিরকম অদ্ভুত বেঁকে বসলেন ভদ্রলোক। ওজর-আপত্তি আর নানা অজুহাত। টিউশনি মানে যেন কোনো গর্হিত কাজ। এতে লিপ্ত হওয়া চলে না। ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে অম্বরকে সঙ্গে নিয়েছিল নীপা। নইলে একা মেয়েমানুষ, কিছুতেই সে অনিমেষ দত্তকে রাজি করাতে পারত না।

স্ত্রীর সপক্ষে অম্বর ওকালতি করল, 'কি জানেন স্যার, এটা হল ওর কেঁচেগণ্ডুষ করা। সাত-আট বৎসর মা-সরস্বতীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। হঠাৎ খেয়াল চেপেছে পড়াশোনা করবার। তাও পাস-কোর্সে নয়, অনার্সে পড়তে শখ। তেমন কোনো সাহায্য না পেলে কিছুতেই উতরোতে পারবে না।'

অনিমেষ দত্ত তবুও বিমুখ। 'আর কাউকে দেখুন না। আমি এখানে কোনো টিউশনি করিনি. জিজ্ঞেস করে দেখবেন, এর আগে বেশ কয়েকজনকে রিফিউজ করেছি।'

মন গলাতে অম্বর ওস্তাদ। তার কথাগুলি যেন ক্ষতের প্রলেপ। উপরওয়ালারা সেকারণেই সন্তুষ্ট। কথা বলার কিছু কৌশল জানে অম্বর। খুব আপত্তি থাকলেও তাকে এড়ানো কঠিন।

অম্বর বলল,—'আমি জানি স্যার। টাকা-পয়সার উপর আপনার কোনো আসক্তি নেই। নইলে টিউশনি করতে চাইলে এই দরজার সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের কিউ পড়ত। কিন্তু আমার স্ত্রীর ব্যাপারটা একটু আলাদা। পড়া-শুনো কবে ছেড়ে দিয়েছিল, এতদিন ঘর-সংসার করে আবার কলেজে পড়ার শখ। আপনি সাহায্য না করলে ওর পক্ষে পরীক্ষা-বৈতরণী পার হওয়া অসম্ভব।' শেষকালে মোক্ষম

কথাটি যোগ করল অম্বর। স্ত্রীর দিকে বাঁকা-চোখে তাকিয়ে বলল,—'ওর মতে, ইতিহাসে আপনার মতন দখল কলেজে আর কারো নেই।'

নীপার মুখমণ্ডল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্রুত জরিপ করে নিলেন অনিমেষ দত্ত। ঈষৎ চিন্তা করে বললেন—'ঠিক আছে, আপনি আসবেন। বিকলের দিকে ঘন্টাখানেক সময় আমি দিতে পারি। কিন্তু হপ্তায় দু'দিন—তার বেশি নয়।'

রিকশতে করে ফিরল ওরা। পথে স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নীপা বলল,—'তুমি কিন্তু সব পারো। গররাজি মানুষটাকে মত করিয়ে ছাড়লে।'

অম্বর গম্ভীর মুখ করে বলল,—'আমার কথায় কিন্তু রাজি হননি ভদ্রলোক।'

'তাহলে? মত দিলেন যে শেষে—'

অম্বর মন্তব্য করল,—'রাজি হলেন তোমার মুখপদ্ম দেখে।'

—'তার মানে?' নীপাকে এবার সন্দিগ্ধ দেখাল।

—'আহা! তুমি রাগ করছ কেন?' অম্বর হাসতে হাসতে বলল, 'অমন ঢলঢলে মুখ, ছলছল চাউনি, হপ্তায় দু'দিন এই সান্নিধ্যটুকু মন্দ কী?'

নীপা ছোট্ট একটা ঠ্যালা দিল স্বামীকে। কিন্তু অম্বর সামলে নিল। রিকশতে আর একটু চেপে আয়েস করে বসল।

—'যা কথার ছিরি হচ্ছে তোমার দিন-দিন। কোনো আগল নেই মুখের।'

অম্বর আগের মতই গম্ভীর হল। বলল,—'কথাটা কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। শুনলে তো, ভদ্রলোক একা থাকেন, গৃহভৃত্যের উপর নির্ভর। বিপত্নীক না ব্যাচেলর তা অবশ্য খুলে বলেননি। আর স্ত্রী থাকলেও তিনি কোন মুল্লুকে পড়ে আছেন কে জানে।'

নীপা মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। বলল,—'অতই যদি সন্দেহ তোমার, তাহলে এই ওকালতিটুকু করবার কি প্রয়োজন ছিল? উনি তো পড়াতে চাননি।'

—'বারে! তুমি উকিল সাজিয়ে নিয়ে গেছ,—আর আমি কেস হারতে পারি?' অম্বর এবার নিজেকেই যেন তারিফ করল।

বারান্দা থেকে নীপা পড়ার ঘরে এল, বিকেলে প্রফেসর দত্তের বাড়িতে যেতে হলে প্রস্তুতির প্রয়োজন। দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখে নিয়ে যেতে বলেছেন অনিমেষবাবু। কিন্তু নীপার একেবারে খেয়াল ছিল না। অবশ্য মনে থাকবার কথাও নয়। কলেজের ক্লাস, নাটকের রিহার্সাল, বন্ধুজনের সঙ্গে গল্প-পরিহাস,—এর মধ্যে উত্তর লিখবার কথা স্মরণ ছিল না। তার উপর এই ক'দিন ধরে সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে সমানে। কলেজে পড়ার শখ মেটাতে নীপার ঠিক নাভিশ্বাস উঠবার জোগাড়।

চেয়ারের উপর ভালো করে বসল নীপা টেবিলের রেক্সিনে একটা কনুই রেখে ঝুঁকে পড়া শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করল। ঠিক মেয়ে-পাখির ডিমে বসবার ভঙ্গি। নীলাদ্রির সমালোচনায় বইটা সামনে। হাত বাড়িয়ে নীপা সেটা টেনে নিল। অন্যমনস্কের মতো দু'চার পাতা খুলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। ঠোঁট কামড়ে নীপা কিছু চিন্তা করল। আশ্চর্য! নীলাদ্রির পুরানো অভ্যেসটা এখনও গেল না। সব ব্যাপারেই তার নাটুকেপনা। বলে কয়ে কাজ করার চেয়ে সে সারপ্রাইজ দিতে বেশি ভালোবাসে। নইলে বইয়ের মধ্যে চিঠি গুঁজে দেওয়ার বদলে কথাটা নীপাকে খুলে বলতে পারত। অবশ্য গতকালের কথা একটু আলাদা। সমস্ত দিন ভীষণ ব্যস্ত ছিল নীপা। নীলাদ্রির সঙ্গে আড়ালে দু'টো কথা বলবার তেমন সুযোগ আর সুবিধে ছিল কোথায়?

খামটা জামার মধ্যে লুকিয়ে নীপা বাথরুমে ঢুকল। পড়ার টেবিলে বসে পর-পুরুষের চিঠি পড়া বোকামির পরিচয়। ঘুম ভেঙে উঠে অম্বর যদি হঠাৎ পিছনে এসে দাঁড়ায়। নীপা কিছুতেই

ঝক্কি নিতে রাজি নয়।

সাদা খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করল নীপা। বাথরুমের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সেটি পড়ল বড় নয়—ছোট চিঠি। নীলাদ্রি লিখেছে,—

নীপা,—

শনিবার সন্ধেয় রূপমহল থিয়েটারে উদয়ন নাট্যগোষ্ঠীর বার্ষিকী উৎসব। আমি আজই সকালে চিঠি পেয়েছি। মনোহরদা তোমার কথা বিশেষ করে লিখেছেন। আমারও খুব ইচ্ছে বার্ষিকী উৎসবে তুমি উপস্থিত থাক। একদিন তো তুমি উদয়নের সভ্যা ছিলে। সেই দিনগুলি নিশ্চয় ভোলোনি সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে কত না অজুহাত সৃষ্টি করতে হত তোমাকে।

শিমুলপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমি উপেক্ষা করব। দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে। তুমি নিশ্চয়ই এসো—প্লিজ্।

ইতি

নীলাদ্রি

চিঠি পড়া শেষ করে নীপা চিন্তিত হল। শনিবার কলকাতা যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। অম্বরকে কী বলবে সে? কোন অজুহাতে কলকাতা যাবে? হাজার হলেও সে বউ-মানুষ। দুম করে অমনি কলকাতা গেলেই হল!

থিয়েটারে পার্ট নেবার ব্যাপারে অম্বরের সঙ্গে তার প্রবল কথা কাটাকাটি। মতান্তর থেকে মনান্তর হবার উপক্রম। টাউন ক্লাবের থিয়েটারে অংশ নিতে অম্বর আপত্তি করেছিল। আজে-বাজে ছেলে-ছোকরার সঙ্গে হই-হুল্লোড়। এর কোনো মানে হয় না। বন্ধুবান্ধব, অফিসার মহলে একটা গুঞ্জন শুরু হতে পারে।

কিন্তু নীপা তার কথা শোনেনি। থিয়েটার করা দোষের কেন হবে? আর অভিনয় তো কিছু সত্যি নয়। তাছাড়া নীপা একা নামেনি। শহরের আরো অনেক মেয়ে টাউন ক্লাবের থিয়েটারে ভিড় করেছে।

পুরো দুদিন অম্বর তার সঙ্গে কথা বলেনি। নীপারও ভীষণ জিদ। সে ভাঙবে, তবু মচকাবে না। কেমন করে আবার ভাব হল, নীপার ঠিক মনে নেই। তবে সে জানত অম্বর কথা বলবে। পুরুষ মানুষ। কদিন দূরে দূরে থাকতে পারে।

চিঠিটা জামার মধ্যে গলিয়ে নীপা বাথরুম থেকে বেরোল। কখন বিছানা থেকে উঠে অম্বর চায়ের টেবিলে এসে বসেছে। নিশ্চয় মুখ-টুখ ধোয়নি। সম্ভবত এখুনি সে বাথরুমে ঢুকবে।

ঘাড় তুলে অম্বর বলল,—'কাল একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। আজেবাজে চিন্তায় ভুলে গেলাম বলতে।'

—'কী কথা?' নীপা কৌতূহল প্রকাশ করল।

—'তোমার কাকা একটা চিঠি দিয়েছেন। গত মাসের ভাড়া আদায় করে দেড়শো টাকাও পাঠিয়েছেন। উনি লিখেছেন বাড়িটা কিনবার জন্য অনেক আগ্রহী লোক আসছে। তুমি যদি রাজি থাক, তাহলে উনি কথাবার্তা বলবেন।'

কথাটা নীপার মনে পড়ল। বাড়ি-বিক্রির কথা একবার হয়েছিল তাদের। গতমাসে কাকা যখন পলাশপুরে বেড়িয়ে গেলেন, তখন অম্বরই কথাটা তুলল। গলি-ঘুঁজির মধ্যে অমন বাড়ি থাকা কোনো কাজের নয়। কে দেখাশুনো করে? ভাড়াটেরা কোনোদিন বাড়ি ছাড়বে বলে তার মনে হয় না। সুতরাং ও-বাড়ি প্রায় বেদখলে। বরং বাড়ি বেচে দক্ষিণ কলকাতার দিকে একটু জায়গা কিনে রাখা ভালো। পরে বাড়ি করে নেওয়া যাবে।

নীপা বলল,—'চিঠিখানা কোথায়?'

—'টাকা আর চিঠি সব আমার পকেটে রয়েছে।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে চিঠি আর টাকা নীপা খুঁজে বের করল। অম্বর যা বলেছে ঠিক। বাড়ি বিক্রির কথা কাকা তাকে লিখেছেন। নীপা যদি রাজি হয়, তাহলে ভালো খরিদ্দার পেতে খুব অসুবিধে হবে না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে নীপা বলল,—'কাল দুপুরে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।'

—'হঠাৎ কলকাতা?' অম্বর প্রশ্ন করল।

—'কাকার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। কী রকম টাকাকড়ি মিলবে, তার একটা আঁচ পাওয়া দরকার। চিঠিপত্রে এসব হয় না।'

—'কখন যাবে?'

—'কাল দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ব। পরশু সকালেই অবশ্য ফিরতে হবে। দুটোর পর আবার টাউন ক্লাবের ফুল রিহার্সাল।'

চা-পর্ব শেষ করে অম্বর ডাক্তারের বেশবাস পরল। জুতোর ফিতে বাঁধতে বসে নীপাকে বলল,—'আজও তোমার রিহার্সাল আছে নাকি?'

নীপা একটু হাসল। 'রোজ রোজ মহলা দিতে আমার সময় কোথায়? তা ছাড়া পড়াশুনো নেই? আজ বিকেলে তো প্রফেসর দত্তের কাছে যাবার কথা।'

—'ও!' অম্বর একটু উদাসীন সাজবার চেষ্টা করল।

নীপা এবার রান্নাঘরে ঢুকল। তার ক্লাস বারোটায়। নটা এখনও বাজেনি। কয়েক মিনিট দেরি এবার কোমর বেঁধে নামতে হয়। নইলে ইংরেজির ক্লাসটা ফস্কে যাবে।

দরজায় ঠক-ঠক শব্দ। নীপা উৎকর্ণ হল। কে আবার জ্বালাতে এল এখন? বিরক্তির কয়েকটি রেখা দ্রুত ফুটে উঠল তার মুখে। কলেজের ক্লাসগুলি বুঝি বরবাদ হল।

দরজা খুলে রীতিমত বিস্ময়। নায়ক দেবরাজ মিত্র দাঁড়িয়ে। পৌরাণিক যুগের কোনো অপ্সরার মত নীপা সাদর সম্ভাষণ জানাল,—'এ-কি! স্বয়ং দেবরাজ যে, আসুন—'

দেবরাজ একা নয়, তার পিছনে আর একজন ভদ্রলোক। নীপা লোকটিকে দেখল। গায়ের রঙ বেজায় কালো, ঠোঁট দুটো চ্যাপ্টা। চোখের উপর মোটা বাদামি ফ্রেমের চশমা, পরনে সাদা ফুলপ্যান্ট আর শার্ট। সেগুলি সুতীর নয়, টেরিকটন কিংবা ঐ গোছের কিছু। গলায় বাঁধা সুদৃশ্য হাল্কা রঙের টাইটার উপর দু-তিন সেকেন্ডের জন্য তার দৃষ্টিনিবদ্ধ হল।

দেবরাজ হাত তুলে নমস্কার করল। বলল,—'ইনি আমার ফ্রেন্ড অবিনাশ সমাদ্দার। কলকাতার লোক,—নিশ্চয় নাম শুনেছেন?'

নীপা কিছুক্ষণ নামটা মনে করবার চেষ্টা করল। ঈষৎ হেসে বলল,—'কই ঠিক মনে আসছে না।'

অবিনাশ সমাদ্দার নিজেই মধ্যস্থতা করল। বলল,—'দেবরাজের এটা বাড়াবাড়ি মিসেস রায়। আমি এমন কিছু কেউ-কেটা নই, যে নাম শুনলেই চিনতে পারবেন।'

দেবরাজ বলল,—'হরিমতীর ঘর বইটা দেখেছেন তো? খুব হিট বই। পলাশপুরেও দু' সপ্তাহের বেশি ছিল। অবিনাশ বইটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।'

—'তাই বুঝি?' নীপা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল. বলল,—'তাহলে আপনি তো বিখ্যাত নিশ্চয়ই।'

বাইরের ঘরে নীপা ওদের বসাল। সোফা. কৌচ সবই আছে তার। কিন্তু ঘরটা আর একটু পরিষ্কার ছিমছাম থাকলে নীপার ভালো লাগত। আসলে সময়াভাব। ঘরদোরের পিছনে নজর দিতে নীপার সময় নেই।

দেবরাজ বলল,—'কাল অবিনাশ আমাদের রিহার্সাল-রুমে ছিল। আপনার অভিনয় দেখে ও

একেবারে চার্মড। আমার কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল।'

—'সত্যি মিসেস রায়!' অবিনাশ তারিফ করার সুরে বলল,—'আপনার মুখের এক্সপ্রেশন সংলাপ বলার ভঙ্গি, মুভমেন্ট, সব কিছু মার্ভেলাস।'

প্রশংসা মানেই আলোর ছটা। সেই আলোতে নীপাকে উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল,—'আপনারা বসুন একটু। আমি দু-কাপ চা করে আনি।'

বাধা দিয়ে অবিনাশ বলল,—'আবার চা কেন? খামোকা আপনার কষ্ট।'

—'কষ্ট কীসের?' নীপা মিষ্টি হাসল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা হয়ে যাবে।'

চায়ের সরঞ্জাম গোছাতে নীপা রান্নাঘরে ঢুকল।

চোখ মটকে বন্ধুকে বলল দেবরাজ,—'কী রকম বুঝছ অবিনাশ, মেয়েটা টোপ গিলবে তো?'

—'আস্তে কথা বলো।' অবিনাশ ওকে সাবধান করল। গলা নামিয়ে সে বলল,—'চেহারাখানা গ্র্যান্ড মাইরি। কাল সন্ধেয় একটু ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগছিল, এখন ঠিক তাজা রজনীগন্ধা।'

দেবরারজের চোখদুটো লোভী শৃগালের মত জ্বলছিল। সে বলল,—'মেয়েটা কিন্তু খেলোয়াড়। পলাশপুরেই ওর পিরীতির লোক আছে। সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি।'

—'অমন সুন্দরীর পিছনে দু-একটা ভ্রমর উড়বেই। সে থাকুক। কিন্তু তোমার মত লেডি-কিলারও তো রয়েছে চাঁদ। ওর রেহাই নেই। ফাঁদে পড়তেই হবে।'

চা নিয়ে নীপা ফিরল।

দেবরাজ ঈষৎ হেসে বলল,—'অবিনাশ কিন্তু একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে মিসেস রায়। অবশ্য এখনই আপনার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

—'কী প্রস্তাব আবার?'

দেবরাজ কথাটা খুলে বলল। নায়িকা-সংহার বইখানা ফিল্মে করার ইচ্ছে অবিনাশের। ঘনশ্যাম পিকচার্সের সিনিয়র পার্টনার বদ্রীদাসবাবু বই করতে রাজি। অবিনাশের ইচ্ছে নীপা রায় এতে নায়িকার রোলে থাকবেন।

প্রস্তাবটা নীপার কাছে লটারি প্রাপ্তির মত বিস্ময়কর। সে ফিল্মের হিরোইন হবে! রূপালি পর্দায় তার ছবি? অগণিত লোকে মুগ্ধ হয়ে তার অভিনয় দেখবে?

বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে নীপা বলল,—'আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন অবিনাশবাবু। ফিল্মের হিরোইনের কাজ কি আমাকে দিয়ে চলবে?'

অবিনাশ শব্দ করে হাসল। 'আপনি অবাক করলেন মিসেস রায়। কাল অভিনয় তো দেখলাম। আমার ধারণা ফিল্মে আপনি নামী চিত্র-তারকা হবেন।'

নীপা নিরুত্তর।

অবিনাশ আবার বলল,—'সামনের সপ্তাহে একদিন কলকাতায় চলুন। বদ্রীদাসবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। অমন ধনী লোক, কিন্তু কি ফাইন জেন্টলম্যান দেখবেন।'

নীপা কী যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কের মত সে বলল,—'আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি অবিনাশবাবু। পরে আপনাকে জানাব।'

দেবরাজ এগিয়ে এসে বলল,—'নিশ্চয় চিন্তা করবেন। মিস্টার রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, তবে একটা কথা নীপা দেবী।' একটু থেমে সে তার বক্তব্য রাখল,—'সুযোগ এলে তা পায়ে ঠেলতে নেই।'

প্রফেসরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীপা যখন ঘরমুখো হলো, তখন সন্ধে উত্‌রে গেছে। পথের দু'পাশে জমাট অন্ধকার। গাছ-গাছালি আর ঝোপের চারপাশে জোনাকি দলের উদ্দেশ্যহীন পথ-পরিক্রমা। আকাশে মেঘ-টেঘ সম্ভবত নেই। থাকলেও খুব কম। পোখরাজ পাথরের মত

উজ্জ্বল কয়েকটি তারা নীপার চোখে পড়ল।

সমস্ত দিন মনটা খুব বিক্ষিপ্ত তার। এক একটা দিন এমনি আসে। সাগরের ঢেউয়ের মত বিস্ময়ের পর বিস্ময়। নীলাদ্রির চিঠিখানা, কলকাতায় বাড়ি বিক্রির কথাবার্তা এবং সবশেষে ফিল্ম-ডিরেক্টর অবিনাশ সমাদ্দারের সাড়া-জাগানো প্রস্তাব। নীপা কি রূপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে রাজি?

দরজায় তালা ঝুলছে। অর্থাৎ অম্বর বাড়ি ফেরেনি। কখন ফিরবে তা নীপাও বলতে পারে না।

তবু সু-খবর সামনে।

নীপা একগাল হেসে এগিয়ে গেল। রঙ-চটা সুটকেশটা কোলে নিয়ে শ্রীমান সিঁড়ির উপর চুপচাপ বসে। অন্য কেউ নয়, পলাতক গৃহভৃত্যটি। দুঃখহরণ এতদিনে আবার তার দুঃখ হরণ করতে এসেছে।

—'তিন দিনের ছুটি নিয়ে সাতদিন কাটিয়ে এলিরে?' নীপা সখেদে বলল।

দুঃখহরণ জবাব দিল না। মাথা নুইয়ে সব অপরাধ শির পেতে নেবার ভঙ্গি করল।

চাবি খুলে নীপা বলল,—'এই ক'দিনে আমার দুর্দশার একশেষ। ঘরদোরের অবস্থা দ্যাখ—ঝাঁটপাটও ভালো করে পড়েনি। কিছু খেয়ে আগে ধুলো-আবর্জনা মুক্ত কর দিকি।'

অনেক রাতে ঘরের মধ্যে একটা অব্যক্ত আওয়াজ শুনে অম্বরের ঘুম ভেঙে গেল। টর্চ হাতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল সে। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠল। অম্বর দেখল উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নীপা শুয়ে আছে। ভয়ার্ত পাখির মত শরীরটা অল্প-অল্প কাঁপছে।

মিনিট দুই-তিন পরে নীপা স্বাভাবিক হল। চোখের দৃষ্টি অনেকটা সহজ, রক্তশূন্য মুখখানা আবার জীবন্ত মনে হচ্ছে।

অম্বর বলল,—'কী হয়েছিল তোমার? হঠাৎ ভয় পেলে কেন? বাড়িতে ঢিল পড়ছে বলে মনে হল নাকি?'

নীপা মাথা নাড়ল।

জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল,—'রাস্তার ওপারে ঝোপ-জঙ্গলের কাছে আমি যেন কাউকে দেখলাম। দৈত্যের মত লম্বা-চওড়া একটা লোক। ছায়া-ছায়া শরীর। হঠাৎ কেন জানি না আমার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট দেখলাম, বুঝলে?'

অম্বর হেসে বলল,—'তোমার চোখের ভুল নীপা,—কিংবা কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ।'

চুমুক দিয়ে অল্প একটু জল খেল নীপা। তার মুখে মৃত অতীতের চিন্তা। সে বলল,—'তুমি জানো না, ঠিক এইরকম একটা ছায়ামূর্তি অনেকদিন আগে একবার দেখেছি।'

—'কবে দেখেছ আবার?' অম্বর হাল্কা সুরে প্রশ্ন করল।

নীপা গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করল। স্মৃতিবোঝাই পাতালপুরীর রুদ্ধ কক্ষে হাতড়ে ফিরছিল সে। অনেকক্ষণ পরে বলল,—'আমার ছোট ভাই হীরেনকে তুমি দেখোনি। মোটে দু'বছরের ছোট ছিল আমার চেয়ে। তেরো বছর বয়সে হীরেন আত্মহত্যা করল। রাত-দুপুরে গলায় দড়ি দিয়েছিল সে—'

অম্বর অস্পষ্ট ভাবে বলল,—'হ্যাঁ, সে কথা আমি শুনেছি।'

—'তার ঠিক দু'দিন আগে শেষ রাতে আমি এমনি একটা ছায়ামূর্তি দেখেছিলাম। মিশমিশে কালো, ষণ্ডামার্কা চেহারা। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা উঁচু তিনতলা বাড়ির ছাদের উপরে মূর্তিটা স্থির দাঁড়িয়েছিল।'

খোলা জানালার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। নিঃশব্দ নৈশ প্রকৃতি। আকাশে দেদীপ্যমান তারাদলের বোবা দৃষ্টি। শনশনে বাতাস যেন কোনো প্রেতাত্মার হাহাকার—

হঠাৎ রাস্তার ওদিকে ঝোপ-জঙ্গলের উপর টর্চের আলো ফেলল অম্বর। তিন ব্যাটারির শক্তিশালী টর্চ। ডানা ঝটপট করে একটা পাখি কোথায় শূন্যে উধাও হল। তার পরই আবার নিঃস্তব্ধতা—কারো উপস্থিতি নজরে আসে না।

তিন

স্টেশনে নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে টগরফুলের একটা গাছ আছে। তারই নীচে নীলাদ্রি অপেক্ষা করছিল।

শিমুলপুর বড় স্টেশন,—জংশন। ফিরিওলা, হকারদের ব্যস্ত আনাগোনা। বেশ কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম। লোকজন, মানুষের ভিড়। সদাসর্বদা প্রবাহমান যাত্রী-স্রোত।

পলাশপুর এখান থেকে দূরে নয়। মাইল দশ-বারো পথ। শিমুলপুর থেকে একটা লাইন পলাশপুরের উপর দিয়ে অন্য দিকে গেছে। লোকাল ট্রেনে স্বচ্ছন্দে শিমুলপুর থেকে পলাশপুরে যাওয়া চলে। কিন্তু যাত্রীদের ট্রেনের দিকে নজর কম। শিমুলপুরে নেমে সকলেই বাসের জন্য ছোটে। পলাশপুর আর শিমুলপুরের মধ্যে ঘন ঘন বাসের সংযোগ। টাউন বাস,—বড় জোর পৌনে এক ঘন্টার রাস্তা। কয়েকটা দ্রুতগতি বাসও আছে। সেগুলি দূরদূরান্ত থেকে আসে। শিমুলপুর ছেড়ে আর কোথাও থামবে না। সোজা পলাশপুর যাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল—'এত দেরি করলে কেন? ভাগ্যিস ট্রেন আধ ঘন্টা লেট। নইলে স্টেশনে এসে পস্তাতে হত।'

কোমরে গোঁজা রুমালটা হাতে নিয়ে নীপা মুখ মুছল। দুপুরে বেজায় গরম। শরীরটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। জামাটা পিঠের সঙ্গে লেপটে আছে। ভ্যাপসা গরমে সকলেরই প্রায় এই অবস্থা। হয়ত সন্ধের দিকে কিংবা রাতে বৃষ্টি নামবে।

মুখ মোছা শেষ করে নীপা বলল—'দেরি আমার জন্যে নয় মশায়। শহরে ঢুকবার আগে লেভেল ক্রশিংটার কাছে বাসটা পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। শেষে একটা মালগাড়ি পেরোবার পর আবার বাস ছাড়ল। নইলে কোন্‌কালে পৌঁছে যেতাম।' একটু থেমে নীপা ফের বলল—'আমার কিন্তু টিকিট করা হয়নি।'

কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে নীলাদ্রি জবাব দিল—'চিন্তা কোরো না। টিকিট আমি করে রেখেছি।'

অন্যবারেও নীলাদ্রিই টিকিট কেটে রাখে। ব্যাপারটা জানা। তবু আশ্বাস পেয়ে নীপা একটু হাসল। বলল—'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু এখানে বসবার জায়গা কই? দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে নাকি? যা গরম বাবা—'

'ওয়েটিং রুমে যেতে চাও?'

এদিক-ওদিক চেয়ে নীপা মাথা নাড়ল। 'দরকার নেই, চেনা-জানা লোকের সঙ্গে দেখা হতে পারে। পলাশপুরের কত লোকই তো শিমুলপুরে আসছে। বরং এদিকটাই ভালো, বেশ নির্জন।'

প্ল্যাটফর্মের উপর নীপা কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াল। নীলাদ্রি সেই টগরগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। পিছন ফিরে একবার দেখল নীপা। নীলাদ্রি কী যেন চিন্তা করছে। কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এল নীপা। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নীলাদ্রির

কাছ থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো। পরিচয়ের গন্ডিটা নিত্যদিন বাড়ছে। কত লোক তাকে জানে। কলেজের ছেলেমেয়েরা তো একনজরে চিনবে। টাউন ক্লাবের থিয়েটারে হিরোইনের পার্ট নেবার পর থেকেই নীপা আরো বেশি পপুলার। শহরের ছেলে ছোকরা, মা-মেয়ে অনেকেই তার সম্বন্ধে কৌতূহলি।

সাপের মত হিস-হিস শব্দ তুলে এক্সপ্রেস ট্রেন স্টেশনে ঢুকল।

নীলাদ্রি পিছন থেকে বলল—'সামনের দিকে একটু এগিয়ে চল। ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলো ঠিক মাঝখানে থাকে।'

ভ্রূ-শাসন করে নীপা তাকাল। 'ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটতে তোমাকে কে বলল? মিছিমিছি খরচ। বিয়ে না করলে পুরুষ-মানুষগুলো এমনি বেহিসেবী হয়।'

নীলাদ্রি হাসতে হাসতে বলল। 'আগে তো গাড়িতে ওঠো। হিসেব-নিকেষ পরে করবে।'

একটু এগিয়েই একটা প্রথম শ্রেণির কামরা পাওয়া গেল। ছোট কামরা,—দু-তিনজন যাত্রী শিমুলপুরে নামল। নীলাদ্রি আর নীপা ছাড়া আর কেউ উঠল না।

মিনিট পনেরো থেমে ট্রেনটা আবার গতি নিল। শিমুলপুরের পর আর কোনো স্টেশনে গাড়ি থামবে না। এক্সপ্রেস ট্রেন সোজা ছুটবে। ঘন্টা দুই ফুরোবার আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার কথা।

কামরাতে আর একজন মোটে যাত্রী। লোকটা গুজরাতি কিংবা মাড়োয়ারিও হতে পারে। বয়স পঞ্চাশের ওপর। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। নিশ্চয় কোনো কারবার-টারবার আছে। মুখ দেখেই একথা হলপ করে বলা চলে।

গলা নামিয়ে নীলাদ্রি বলল—'এ ব্যাটা নেমে গেলে কামরাটা ঠিক ঘর হত, তাই না?'

ট্রেনের জানালা দিয়ে নীপা ঘর-বাড়ি, মাঠ, লোকজন দেখছিল। দূরে, বহুদূরে দিগন্তের নীল বনরেখা।

মুখ না ফিরিয়েই সে বলল—'তা হত। কিন্তু ও থাকলেই বা ক্ষতি কীসের? আমাদের কোনো ডিসটার্ব করছে না।'

নীলাদ্রি বলল—'ঠিক সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। তুমি সাড়ে ছটার মধ্যে আসতে পারবে তো?'

'—দেখি, এখনও তো পৌঁছলামই না।'

—'তোমার কাকার বাড়িতেই তো উঠবে?'

—'আর কোথায় উঠব?' নীপা অল্প একটু হাসল। বলল—'কলকাতায় আমার নিকট আত্মীয়-স্বজন আর কেউ নেই। তাছাড়া কাকার সঙ্গে আমার একটু দরকারও আছে।'

সেই গুজরাতি লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। সম্ভবত তাদের সম্বন্ধে ওর কোনো উৎসাহ নেই। আড়চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি, একটু সরে বসল। নীপার কাছে ঘেঁষে। তারপর ওর বাঁ-হাতের আঙুলগুলি নিজের করতলে টেনে আনল নীলাদ্রি। আলতোভাবে চাপ দিল।

কৌশলে চোখ ঘুরিয়ে কামরার অন্য যাত্রীটিকে দেখল নীপা। লোকটা নির্বিকার। একজোড়া যুবক-যুবতীর ফিস-ফিস কথাবার্তা, ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে বসা, হাতে হাত রেখে মিলনের ভঙ্গি, সব কিছুতেই ও রীতিমত উদাসীন। মনে মনে একটু আহত হল নীপা। তার মত একজন সুন্দরীর উপস্থিতিতেও ওর কোনো চাঞ্চল্য নেই। একবারের জন্যও লোকটা তেরছা নয়নে তার দিকে তাকায়নি। একসময় নীপাকে বেশ হতাশ দেখাল।

গাঢ়স্বরে নীলাদ্রি বলল—'আমার সেই কথাটা ভেবেছ নীপা?'

কথা মানে একটা প্ল্যান—ফন্দিও বলা যায়। কিন্তু নীপা কোনো উত্তর দিল না।

নীলাদ্রি আবার বলল—'লুকিয়ে-চুরিয়ে এভাবে কতদিন চলবে? শেষ পর্যন্ত আমরা না ধরা পড়ে যাই। তার চেয়ে—'

কথাটা নীপাও জানে। শহরটা ছোট। মানুষজনের চাল-চলন গতিবিধির উপর অনেকের গোয়েন্দা-নজর। বিশেষ করে মেয়েদের পিছনে ছেলে-ছোকরার অভাব নেই। তলে তলে কে কোথায় স্পাইগিরি করছে কেউ জানতে পারবে না। একবার জানাজানি হলে আর রক্ষে নেই। সমস্ত শহরে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। ছাত্রী আর মাস্টারের এই রসালো কেচ্ছা-কাহিনি মেয়ে-পুরুষের মুখে মুখে চাউর হবে।

অন্যদিকে তাকিয়ে নীপা বলল—'ওভাবে পালিয়ে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। ধর, ও যদি মামলা করে। সে খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

—'মামলা?'

—'বারে! ও তো স্বচ্ছন্দে অভিযোগ করতে পারে।' মুচকি হেসে নীপা বলল—'তুমি ওর বউকে ফুসলিয়ে বের করেছ। কিংবা ব্যভিচারের মামলাও তো হয়, তাই না?'

একটু চিন্তা করে নীলাদ্রি বলল—'মামলা হতে পারে। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে তাদের পাচ্ছে কোথায়? তারা তখন হাজার মাইল দূরে। চট করে কি আমাদের নাগাল পাবে?'

নীপা হেসে বলল—'দিল্লির সেই চাকরিটা এখনও তোমার হাতে?'

—'এখনও আছে। এই মাসটা থাকবে, তারপর অবশ্য অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বাতিল হয়ে যাবে।' নীলাদ্রি ধীরে ধীরে বলল।

ভ্রূ কুঁচকে নীপা কিছু ভাবল। 'আর কটা দিন থাক নীলাদ্রি। একটু সময় দাও আমাকে।' কয়েক সেকেন্ড পরে সে আবার বলল—'ভীষণ দোটানা। অম্বরের সঙ্গে সমস্ত জীবন কাটানো যে কোনো মেয়ের পক্ষেই অসম্ভব। বিশেষ করে যদি তার জীবনে অন্য কোনো অবলম্বন না থাকে।'

—'বেশি ভাবলেই কিন্তু মুশকিল নীপা।' নীলাদ্রি মাস্টারি শুরু করল। 'খুব তলিয়ে চিন্তা করতে গেলেই খেই হারিয়ে ফেলবে। সব ব্যাপারে কি অঙ্ক কষে এগোনো যায়?'

নীপা একটু হাসল। নীলাদ্রির সুবিধে,—তার পিছন দিকে না তাকালেও চলে। কিন্তু নীপার একটা পিছুটান আছে। ঘর-সংসার, একজন স্বামী। সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে নীলাদ্রির সঙ্গে স্রোতে ভাসতে পারা কি সম্ভব?

গাড়িতে বসে দেবরাজকে মনে পড়ল নীপার। ভারি মিষ্টি আর সুন্দর চেহারা ওর। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া কুচকুচে কালো চুল। সাহেব-সুবোর মত ফর্সা গায়ের রঙ। আয়ত কালো চোখ। চোখাচোখি হলেই, তার বুকের ভিতরটা কেমন শির-শির করে। বয়স কম হলে ওর প্রেমে নীপা হাবুডুবু খেত। নেহাৎ সে পোড়-খাওয়া, অভিজ্ঞ। নইলে দেবরাজের সংস্পর্শে এসে তার আকর্ষণমুক্ত হয়ে থাকা যে কোনো মেয়ের পক্ষেই খুব কঠিন।

নীপার বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে অত কি ভাবে দেবরাজ? সে জানে দেবরাজ কিছু বলতে চায় তাকে। কিন্তু কী বলতে চায়? কোন কথা—

দেবরাজ আবার আসবে। ওর সেই বন্ধুকে নিয়ে। কী যেন নাম ভদ্রলোকের? অবিনাশ সমাদ্দার। কেমন থ্যাবড়া-গোছের মুখ। বিশ্রী,—ঠিক যেন অসুর।

কিন্তু অবিনাশকে নীপা কী জবাব দেবে? ফিল্মের নায়িকা হতে সে রাজি? কন্ট্রাক্ট ফর্ম এগিয়ে দিলে নীপা তাতে খসখস করে সই করবে। অথচ অম্বরের কাছে এখনও কথাটা সে ভাঙেনি। স্বামীকে বলা মিছে। নীপা তা জানে। ঘরের বৌকে ফিল্মে নামতে দিতে অম্বর কিছুতেই রাজি হবে না। জেদাজেদি করলে বিপরীত ফল। হয়ত কুরুক্ষেত্তর করে ছাড়বে। সামান্য টাউন ক্লাবের থিয়েটার করা নিয়ে বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড। শেষে অবশ্য স্বামীর সম্পূর্ণ অমতেই নীপা নাটকে

যোগ দিয়েছে।

ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল নীলাদ্রি। সে বলল—'তোমাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে নীপা। মনে হচ্ছে কী যেন ভাবছ।'

তাড়াতাড়ি নীপা বলল. 'ওমা! ভাবব আবার কী? এমনি অনেকগুলো কথা মনে এল, তাই—'

নীলাদ্রি ওকে সাহস জোগাল। 'মামলার কথা চিন্তা করে তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ নীপা। কেস-টেস কিছু হবে না। বউ পালিয়ে গেলে ভদ্রলোক কি মামলা করতে ছোটে?'

কথা শুনে নীপা ফিক করে হাসল। 'মামলা করতে যায় না বুঝি? তুমি কেমন করে জানলে—'

—'ও আমি জানি', নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ঘরের বউ হল খাঁচার ময়না। উড়ে গেলে বুকে বাজে বৈকি। শূন্য খাঁচার দিকে তাকালে মনটাও শূন্য হয়ে আসে। কিন্তু তার বেশি নয়। দু-চারদিন পর সব সয়ে যায়। তাই বলে ঘরের কেলেঙ্কারি নিয়ে কি কোর্ট-কাছারি করা চলে?'

হঠাৎ কামরার সেই গুজরাতি লোকটি নড়েচড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি একটু সরে বসল। নীপা ফিস-ফিস করে বলল—'তুমি অমন ভয় পাচ্ছ কেন? ও আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলেই ধরে নিয়েছে। সুতরাং আমাদের সম্পর্কও নিবিড়।'

আসন ছেড়ে লোকটি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না। সামনে দিয়ে হেঁটে সোজা বাথরুমে ঢুকল।

বিদ্রূপ করে নীপা বলল,—'তুমি ভারি ভীতু। লোকটা উঠে দাঁড়াতেই অমন আড়ষ্ট হয়ে সরে গেলে কেন?'

—'আমি ভীতু?' নীলাদ্রি একবার শুধু বলল। পরমুহূর্তেই সে একটা কাণ্ড করে বসল। সবলে নীপাকে টেনে আনল নিজের বুকের কাছে। নির্লজ্জের মত ওর ঠোঁটে গালে, গলার নরম সাদা চামড়ায় এবং বুকের অনাবৃত অংশে কয়েকবার চুমু খেল।

অসহায় পাখির ডানা ঝটপটানির মত নীপা আত্মরক্ষার অক্ষম চেষ্টা করল। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—'কী হচ্ছে? ছেড়ে দাও শিগগির।'

নীলাদ্রি অবশ্য তখনই ছেড়ে দিল তাকে। বলল—'এবার, হয়েছে তো?'

চোখ পাকিয়ে নীপা বলল—'এই জন্যই বুঝি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিলে? এতক্ষণ আমি বুঝতেই পারিনি।'

কোনো জবাব দিল না নীলাদ্রি। ঈষৎ হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে আয়েস করে টানতে লাগল।

বাইরে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠে অপরাহ্নের ঘন ছায়া। বৃষ্টির জলে ধোয়া আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল। রেল লাইনের দুপাশে ধানের ক্ষেত। সবুজ ধানের চারা হিলহিল করে দুলছে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এল। প্ল্যাটফর্মের উপর লাল জামা পরা কুলির দল টেলিগ্রাফের পোস্টের মত সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থেকে নেমে নীলাদ্রি বলল—'সাড়ে চারটে বাজল। তাড়াতাড়ি চলো। ট্যাক্সির জন্য আবার হা-পিত্যেশ করে লাইন দিতে না হয়।'

ভাগ্য ভালো। স্টেশন্ থেকে বেরিয়েই খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। নীপা বলল—আমাকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিতে হবে না। গোলদিঘির কাছে নামিয়ে দিলেই চলবে। ওটুকু পথ আমি হেঁটে যেতে পারব।

নীলাদ্রি হাসল। তাকে ভীতু বললে কী হবে? ভয় নীপার মনেও কিছু কম নেই। নীলাদ্রির সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছে, এই কথাটি সম্ভবত সে গোপন রাখতে চায়। আরপুলি লেনের বাড়ির দরজায় গিয়ে নামলে ব্যাপারটা জানাজানি হবার আশঙ্কা আছে।

কলেজ স্ট্রিটে নেমে নীপা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। অপরাহ্ণের ফুরফুরে তাজা বাতাস। ফুটপাতের ধারে জামা-কাপড়, খেলনা-পাতি এবং নানা পণ্যের পসরা সাজিয়ে দোকানিরা বসে। কেউ কেনাকাটা করছে, কেউ বা পথে যেতে যেতে বস্তুগুলি চেয়ে দেখছে। চটুল হাসিতে সমস্ত পথটা ভরিয়ে দিয়ে দু-তিনটি যুবতী মেয়ে কফি হাউসের দিকে হেঁটে গেল। ফুটপাতের উল্টোদিকে একটা চোঙা প্যান্ট পরা ছেলে বাস-স্টপে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েগুলোর খিলখিল হাসি শুনে সে আপত্তিকর একটা মন্তব্য করল।

নীপার কিছু কেনা-কাটা করবার ছিল। কিন্তু হাতে সময় নেই। সকালে নটার এক্সপ্রেসটা ধরার ইচ্ছে তার। নীলাদ্রিও ওই ট্রেনে যাবে। তাছাড়া কাল রবিবার, দোকান-পাট বন্ধ। কেনাকাটা সারতে এই বিকেলটুকু সম্বল। কিন্তু এখনই বা হাতে সময় কই তার? সাতটার ফাংশন। অন্তত সাড়ে ছটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে না পারলে সময়ে হাজির হওয়া কঠিন।

ফুটপাতটা পেরোলেই বাঁ-দিকে একটা বড় দোকান। নীপা ভাবল ওখানেই একবার চক্কর দিয়ে যাবে। দু-চারটে দরকারি জিনিসের সওদা সেরে বাড়িতে ঢুকবে। উত্তর দিক থেকে দ্রুতগতি একটা দোতলা বাস আসছিল। নীপা থমকে দাঁড়াল। বাসটা চলে গেলে সে রাস্তা অতিক্রম করবে। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে নীপা অবাক হল। খানিকটা দূরে এক ভদ্রলোক অন্যমনস্কের মত দাঁড়িয়ে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, হাতে ফোলিও ব্যাগ। মুখে পরিচিত ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। প্রফেসর অনিমেষ দত্ত সম্ভবত কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। নীপার মনে পড়ল আজ কলেজে অধ্যাপক দত্তকে সে দেখেনি। হয়তো সকালেই কোনো ট্রেন ধরে উনি কলকাতায় এসেছেন।

হুড়মুড় করে দোতলা বাসটা প্রায় তার সামনেই থামল। দু-তিনজন নামল, কেউ কেউ উঠল। বাস থেকে নেমে একটা লোক এদিক-ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজল। নীপা স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল। লোকটা ধীরে ধীরে পা ফেলে অনিমেষ দত্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নীপার চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় দেখাল। অনিমেষ দত্তের সঙ্গে এই লোকটার আলাপ পরিচয় আছে নাকি? কে জানে, হবেও বা। দুনিয়াতে জানা-শুনো হতে বাধা কোথায়? নীপা অবাক হয়ে ভাবছিল। এমন একটা খবর সে এতদিন রাখেনি।

ঘরে ঢুকতেই কাকা সমাদর করে বললেন,—'এসে গিয়েছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমি ভাবছিলাম নিজেই একবার পলাশপুর যাব।'

একগাল হেসে নীপা বলল—'হঠাৎ আসতে হল কাকা। সন্ধেয় একটা ফাংশন আছে। আমাদের কলেজের তিন-চারজন ছেলেমেয়ে এসেছি। সাতটায় ফাংশন শুরু।'

—'বেশ তো ফাংশন শুনে আয়।' অভিভাবকের মত কাকা অনুমতি দিলেন। বললেন—'রাত্তিরে কথা হবে'খন।'

কাকি সংসারেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল। এবার বেরিয়ে এসে বলল—'বেশ আছিস নীপা। কেমন ঝাড়া হাত-পা। কোলে-কাঁখে একটা থাকলে বুঝতিস কি বিষম জ্বালা। হাত-পা একেবারে বাঁধা।' কাকি মুখটা বিকৃত করে সম্ভবত নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিল।

বেশ জমজমাট বার্ষিকী উৎসব। ফুলের মালা দিয়ে সাজানো গেট। লাল-রঙা কাপড়ের উপর উদয়ন নাট্যগোষ্ঠীর নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা।

হলে ঢুকবার আগেই মনোহরদার সঙ্গে দেখা। মনোহর বরাট,—উদয়নের কর্ণধার।

নীপা হেসে বলল—'ভালো আছেন মনোহরদা?'

মনোহর সোল্লাসে প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'আরে, নীপা এসেছ নাকি? তোমার কথা নীলাদ্রির কাছে শুনি। আবার কলেজে ভর্তি হয়েছ তাও জেনেছি।'

—'আপনি দেখছি আমার সব খবরই রাখেন।' নীপা ধীরে ধীরে বলল।

মনোহর শব্দ করে হাসল। 'আমি সব খবর রাখি তোমার। ভালো করে বি-এ পাস করতে পারলে এম-এ পড়তে কলকাতায় আসবে, তাও জানি। তখন কিন্তু উদয়নে আবার ফিরে এসো। তোমার পার্টস ছিল নীপা। হয়ত এ লাইনে নাম করতে।'

নীপা চুপ করে শুনল। কোনো কথা বলল না।

অনুষ্ঠান শেষ হবার খানিক আগেই নীলাদ্রি ওকে খুঁজে বার করল। ফিস-ফিস করে বলল—'পালিয়ে যেও না একা। যাবার পথে আমি তোমাকে কলেজ স্ট্রিটে নামিয়ে দেব'খন।'

'কি দরকার?' নীপা ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

—'আমার দরকার আছে।' নীলাদ্রি দাবি জানাল।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই নীপা বেরিয়ে পড়ল। পিছু পিছু নীলাদ্রিও। অত রাতে খালি গাড়ি পাওয়া সহজ। হাত বাড়িয়ে নীলাদ্রি একটা ট্যাক্সিকে থামাল।

গাড়িতে উঠে নীপা বলল—'কী দরকার ছিল তোমার বললে না?'

নীলাদ্রি হেসে ফেলল। 'কাল কোন ট্রেনে যাচ্ছ?'

—'দেখি, এখনও ঠিক করিনি।' নীপা ঠোঁট টিপে রহস্য করল।

—'রঙ্গ রাখ।' নীলাদ্রি বলল। 'আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না আমার। সকালের এক্সপ্রেসটাতেই যাচ্ছ তো? দুটোর সময় আবার ফুল রিহার্সাল।'

—'এক্সপ্রেসটাতেই যাব বলে ভেবেছি। তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? প্ল্যাটফর্মে—'

—'উঁহু—' নীলাদ্রি ঘাড় নাড়ল। 'স্টেশনে বইয়ের দোকানটার কাছে থাকব আমি। তুমি সাড়ে আটটার মধ্যে এসো।'

রাত্তিরে কাকার সঙ্গে কথা বলল নীপা। অবিনাশ কবিরাজ লেনের বাড়িটা বিক্রি করতে তার আপত্তি নেই। পুরানো বাড়ি। রঙচটা নোনাধরা দেওয়াল। কতদিন চুনকাম হয়নি। ঝোঁকের মাথায় বাবা বাড়িটা কিনেছিলেন। এখন হুট করে ঢোকা দায়। ভাড়াটেদের একপাল ছেলেমেয়ে দিনমানে সারাক্ষণ নরক গুলজার করে রেখেছে।

কাকা বললেন—'একজন খদ্দের পেয়েছি বাড়ির। লোকটা ভালো। ব্যবসাপাতি করে দু' পয়সা কামিয়েছে।'

—'কী রকম দাম দিতে চায়?' নীপা জানতে চাইল।

—'হাজার পঞ্চাশেক পর্যন্ত উঠতে পারে। বাড়ি তো পুরানো। তারপর অতগুলি ভাড়াটে। ওগুলিকে তাড়াতে কম-সে-কম হাজার দশ টাকা কড়কড়ে বেরিয়ে যাবে। তাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।'

একটু ভেবে নীপা বলল—'আমার তেমন আপত্তি নেই কাকা। তুমি একবার পলাশপুরে চলো না। ওর সঙ্গে একটু কথা বলবে। কাল যাবে আমার সঙ্গে?'

—'কাল?' কাকা চিন্তা করে জবাব দিলেন। 'কাল তো হয় না। আমি মঙ্গলবার যেতে পারি তোর ওখানে। বিকেলের দিকে রওনা হলে সন্ধের পর পৌঁছে যাব—। বলিস তো চন্দ্রবদনকে সঙ্গে নিয়ে যাই।'

—'সে তুমি যা ভালো বুঝবে', নীপা খুশি মনে বলল।

—'তিনজনে মিলে যা হয় করা যাবে। তুমি মঙ্গলবার তাহলে এসো, কেমন?'

গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা হল।

কাকি বলল—'বাড়ি বিক্রি হলে সেই চাঁদবদন লোকটা তোমাকে কত টাকা দেবে?'

—'সে খোঁজে তোমার দরকার কী?' কাকা দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিলেন।

—'আহা, বলোই না। আমি কি পাঁচজনকে বলে বেড়াচ্ছি?'

—'দশ হাজার।' কাকা দাঁতে দাঁত চিপে উচ্চারণ করলেন।

—'মোটে?' কাকি ঠোঁট উল্টিয়ে মনের বিরক্তি প্রকাশ করল।

'গোটা বাড়িটাও তো আমাদের হতে পারত।'

—'চুপ, আর একটি কথাও নয়। মনে রেখ, মেয়েটা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া দেওয়ালেরও কান আছে।'

স্টেশনে নীলাদ্রি এল পৌনে নটার সময়। ছটফটে ব্যস্তভাবে, ঘামে জবজবে মুখ। অপরাধীর মত সে বলল—'ভীষণ দেরি হয়ে গেল আমার। তুমি কতক্ষণ এসেছ?'

—'সওয়া আটটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। আর দু-এক মিনিট পরেই গাড়িতে উঠে যেতাম।'

—'ভেরি সরি।' নীলাদ্রি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'পথের মধ্যে গাড়ি ব্রেকডাউন হলো। আর কোনো ট্যাক্সিও পেলাম না। অনেক কসরত করে একটা বাসের হাতল ধরে এসেছি।'

—'খুব হয়েছে। আর কৈফিয়তে কাজ নেই।' নীপা পরিহাস করল।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে নীলাদ্রি বলল—'এখনও কিন্তু টিকিট কাটা হয়নি। একটু দাঁড়াও, চট করে দুটো টিকিট করে আনি।'

বাধা দিয়ে নীপা বলল—'থাক, আর ব্যস্ত হতে হবে না। আমি টিকিট কেটেছি।'

—'সত্যি?' নীলাদ্রি মুখ উজ্জ্বল করে বলল।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে খুঁজে বেব করল নীপা। হলদে রঙের দুখানি টিকিট। একনজরে তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল,—'ইস! থার্ড ক্লাস কাটলে নাকি?'

নীপার চোখে দুষ্টু হাসি। সে বলল—'কেমন মশায়? আসার সময় ভীষণ জ্বালাতন করেছ। এবার ঠিক জব্দ করেছি তোমাকে!'...

শিমুলপুর স্টেশনে ঠিক সময়ে গাড়ি এল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীপা সময় দেখল। এগারোটা প্রায় বাজে। পলাশপুরে পৌঁছাতে বারোটা তো নির্ঘাৎ।

নীলাদ্রি বলল,—'একটা ট্যাক্সি করি চলো। মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যে পৌঁছে যাব তাহলে।'

—'পাগল হয়েছ নাকি?' নীলা প্রায় শাসন করল ওকে। 'দুজনকে একই ট্যাক্সিতে ফিরতে দেখলে আর কলেজে পড়াতে পারবে?' একটু থেমে নীপা বলল,—প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে আমি কিন্তু তোমাকে আর চিনতেও চাইব না।'

কিন্তু গাড়ি থেকে নেমেই নীপাকে থমকে দাঁড়াতে হল। আচমকা শিরে সর্পাঘাত। প্ল্যাটফর্মে পাথরের মূর্তির মত অম্বর দাঁড়িয়ে। আড়চোখে দেখল নীপা। নীলাদ্রি ঠিক পিছনে। তার ছোট ব্যাগটা নীলাদ্রির হাতে—

নীপা বুঝতে পারল অবস্থাটা আদৌ স্বাভাবিক নয়। চোখ-মুখ হাতে-নাতে ধরা পড়া চোরের মত। এখন কথা বলতে গেলে তার গলার স্বর কাঁপা কাঁপা শোনাবে।

কয়েকটি মৌন মুহূর্ত নিঃশেষ হল।

অস্বস্তিকর অবস্থাটা অম্বরই দূর করল। নীপার দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'শিমুলপুরে একটা কলে এসেছিলাম। মনে হল, এই ট্রেনটায় তুমি আসবে। তাই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম।'

এবার নীপা সহজভাবে কথা বলল, 'মানে আমিও খুব অবাক হয়েছি তোমাকে দেখে। হঠাৎ শিমুলপুরে তুমি এলে কেন? ভাবলাম এই ট্রেনেই কোথাও যাবে বুঝি—'

নীলাদ্রির হাত থেকে স্ত্রীর ব্যাগটা নিল অম্বর। বলল,—'আপনার সঙ্গে পরিচয় অবশ্য আমার নেই। কিন্তু শহরে আপনাকে অনেকবার দেখেছি।'

নীপা ঈষৎ হাসল। 'এর পরিচয় আমার আগেই দেওয়া উচিত ছিল। ইনি নীলাদ্রি সেন, —আমাদের কলেজে বাংলা পড়ান। আর টাউন ক্লাবের যে থিয়েটার হচ্ছে, উনি তার ডিরেক্টর।'

অম্বর হাত তুলে নমস্কার করল। মুখে বলল,—'ভারি খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। একদিন আসবেন,—গল্পগুজব করা যাবে।'

বাড়ি ফেরার একটু পরেই দুঃখহরণ বলল,—'বৌদি, কাল দুজন ভদ্দরলোক এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

—'কখন বল দিকি?' নীপা জানতে চাইল।

—'সন্ধের পর।'

—'কী রকম দেখতে বলতো?' নীপা চিন্তিত মুখে তাকাল।

দুঃখহরণ সোজাসুজি বলল,—'একজন ফর্সাপানা, বেশ সোন্দর। আর একজন দেখতে ভালো নয়।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে নীপা বলল,—'তোর বাবুকে বলেছিস?'

—'হুই! বাবুকে বলতে হবেক কেন? তারা তো বাবুর সঙ্গেই কথাবার্তা বলল।'

নীপার মুখের উপর একটা ছায়া পড়ল। চোখ দুটি ছোট হয়ে এল। কপালে চিন্তার রেখা, এখন অনেক কিছু ভাবছে নীপা। আশ্চর্য। অম্বর তো একথা তাকে একবারও বলল না।

পা টিপে টিপে বৈঠকখানা ঘরের দরজার কাছে নীপা এল। ফুলফোর্সে পাখা ঘুরিয়ে অম্বর বসে। মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। সেও কিছু ভাবছে,—কপালে চিন্তার ছোট ছোট রেখা।

স্বামীর চাউনিটা কেমন যেন,—একটা সন্দেহকুটিল দৃষ্টি।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে সাহস হল না নীপার। তার মুখটা খুব শুকনো এখন।

বুকের ভিতরটা টিপ-টিপ করছে।

চার

রিহার্সাল দেবার ঘরটা ছোট নয়—বড়ই। মেয়ে-পুরুষে ভর্তি। ফুল-রিহার্সাল বলে সকলেই প্রায় এসেছে। শুধু নাটকের কুশীলবরাই নয়, আগন্তুকদের মধ্যে তাদের অনুরাগী বন্ধুজনের সংখ্যাও অনেক। মশা-মাছির ভনভনানির মত একটা চাপা গুঞ্জন সারাক্ষণ উঠছে। মাঝে মাঝে তা কলরব হচ্ছে, কখনও হই-হট্টগোলের আকার নিচ্ছে। সেতারের রিনরিনে মিষ্টি বাজনার মত মেয়েদের খিলখিল হাসি, জানালা দিয়ে ভেসে আসছে।

ক্লাবঘরের বারান্দার এক কোণে দেবরাজ দাঁড়িয়ে। ছাই রঙের প্যান্ট আর চাঁপাফুল রঙের হাওয়াই শার্ট ওর গায়ে। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট আঙুলের টোকা দিয়ে ছাই ঝেড়ে দেবরাজ সিগারেটটা মুখে নিল। ঘরের মধ্যে হইচই, চেঁচামেচি। ভিড় বাঁচিয়ে নিরিবিলি একটু দম দিতে বারান্দায় কোণটাকেই আশ্রয় করেছে বেচারী।

ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই নীপা একটু হাসল। ইঙ্গিতে দেবরাজ ওকে ডাকল। রিহার্সাল ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল,—'ওখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই,—ওয়ান রুম ম্যান', সে ঈষৎ হাসল।

রসিকতার অর্থ বুঝতে নীপার দেরি হল, 'কী বললেন যেন? ওয়ান রুম ম্যান—ওহো!' এবার নীপা হেসে ফেলল, 'একঘর মানুষ, তাই বলুন!'

দেবরাজ সিগারেটে আর একটি টান দিয়ে সেটি অনাবশ্যক বস্তুর মত ফেলে দিল। নাক-মুখ দিয়ে কিছু ধোঁয়া বেরুল। গলা কেশে সহজ হতে চাইল দেবরাজ। বলল,—'কাল বাড়িতে ছিলেন না, কোথায় গিয়েছিলেন?'

—'কলকাতায়', নীপা ছোট্ট উত্তর দিল।

'আমরা কাল সন্ধেয় গিয়েছিলাম আপনার ওখানে। উনি বলেছেন নিশ্চয়?'

উনি অর্থাৎ নীপার স্বামী। কথাটা তার বোধগম্য হল।

দেবরাজ বলল,—'কাল আপনার কর্তার সঙ্গে আলাপ করে এলাম। ভীষণ গম্ভীর ভদ্রলোক, কথাবার্তা কম বলেন। আমার তো রীতিমত ভয় করছিল।

—'তাই বুঝি?' নীপা কৌতুক অনুভব করল।

—'অবিনাশ নিজেই বকবক করল। পাঁচ রকম আলোচনা জুড়তে ও একটি ওস্তাদ।' গলা খাটো করে দেবরাজ শেষে বলল,—'ওর নতুন বইয়ে আপনাকে নায়িকা করতে চায়, সে-কথাও হয়েছে।'

নীপাকে কৌতূহলি দেখাল। কিন্তু হাবভাবে সে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। শুধু হেসে বলল—'আপনারা তো সাঙ্ঘাতিক লোক। আমাকে বলেই নিশ্চিন্ত নন। খোদ কর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে এলেন।'

—'অনুমতি অবশ্য এখনও পাইনি', দেবরাজ স্বীকার করল। 'তবে অবিনাশ নাছোড়বান্দা লোক। ও যখন একবার বলেছে, রাজি না করিয়ে ছাড়বে না। দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরেও মত আদায় করবে।'

—'কি সর্বনাশ!' নীপা ছদ্ম আতঙ্ক প্রকাশ করল। এমন মানুষের পাল্লায় পড়লাম নাকি? একে তো কিছুতেই এড়ানো যাবে না।'

পিছনে পায়ের শব্দ। নীপা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অন্য কেউ নয়—চৈতি। সম্ভবত তাদের খোঁজ করতেই ও রিহার্সাল ঘর থেকে বেরিয়েছে।

চৈতির সাজগোজ খুব। পরনে হাল্কা সবুজ রঙের একটা শাড়ি। গায়ে ম্যাচ-করা জামা। স্লিভলেস বলে সুগোল দুটি ভুজ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গলায় ওর সেই পেন্ডেন্টওলা সোনার হারটা পরেনি চৈতি। সবুজ পাথরের একটা মালা গলায় ঝুলছে। কানেও সবুজ রঙের পাথর বসানো দুল। রীতিমত আকর্ষক বেশবাস।

ওদের দুজনকে নিরিবিলি গল্প করতে দেখে চৈতির মুখভাব বদলাল। ভ্রূ কুঁচকে সে তাকাল। অপ্রসন্ন দৃষ্টি। মুখের উপর অলক্ষ্যে একটা প্রশ্নের চিহ্ন কখন আঁকা হয়ে গেছে।

ঠোঁট উল্টিয়ে চৈতি একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল। 'ও বাবা! নায়ক-নায়িকা দুটিতে এইখানে!'

নীপা হেসে বলল,—'রিহার্সাল শুরু হচ্ছে নাকি?'

চৈতির দু' চোখে জ্বালা। ওর মুখভাবে একটা আহত ভঙ্গি প্রকাশ পেল। শক্ত মুখ করে চৈতি বলল,—'তবু ভালো। রিহার্সালের কথা মনে পড়ল নীপাদির। আমি ভাবলাম এখানেই দাঁড়িয়ে নাটকের সংলাপ বলছিলে।'

দেবরাজ হেসে বলল,—'চৈতি ভীষণ চটে গেছে মিসেস রায়। একেবারে কালনাগিনীর মূর্তি।'

নীপা রীতিমত বিরক্ত হয়েছিল। তাই খোঁচা দেবার এমন একটা মোক্ষম সুযোগ সে ছাড়ল না। তির্যক চোখে চৈতির দিকে তাকিয়ে নীপা বলল,—'এ আপনার ভারি অন্যায় দেবরাজবাবু। চৈতি এমন কিছু কালো নয় যে, ওকে আপনি কালনাগিনীর সঙ্গে তুলনা করবেন।'

চৈতি প্রায় ফুঁসছিল। রিহার্সালে আসার আগে প্রসাধনে তার অনেকখানি সময় গেছে। মুখের উপর দু-তিন পোঁচ স্নো-পাউডারের চিহ্ন স্পষ্ট। পুরানো বাসনকে মেজে ঘষে চকচকে, ঝকঝকে

করে তোলার মত তার রূপচর্চায় নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু নীপার কাটা কাটা মন্তব্য তার মুখখানা কালো করে তুলল। ধরা গলায় চৈতি বলল,—'রূপের অত দেমাক ভালো নয় নীপাদি। মেয়েমানুষের রূপই তার সর্বনাশ ডেকে আনে।'

নীপা বিজয়িনীর মত খিলখিল করে হেসে উঠল। জলতরঙ্গের টুংটাং বাজনার মত হাসি। বলল,—'চৈতি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে কিন্তু, আপনি সাক্ষী রইলেন দেবরাজবাবু।'

চৈতির কাঁদ-কাঁদ মুখ। গলার স্বর প্রায় ভিজে। তবু আঘাত করতে সে শেষ চেষ্টা করল। 'শহরশুদ্ধ লোক সবাই জানে নীপাদি। রূপের গরবে তোমার কাউকে মনে ধরে না। এমন কি স্বামীকেও নয়।'

দেবরাজ বাধা দিয়ে বলল,—'কী সব বকছ চৈতি। তোমার মাথা খারাপ হল নাকি?'

চৈতির কথা নীপা গায়ে মাখল না। আগের মতই সশব্দে হেসে উঠল। গরবিনী নায়িকার মত হেলেদুলে বলল,—'চললাম দেবরাজবাবু। কালনাগিনীকে আপনিই সামলান।'

অবিনাশ এসে পৌঁছাল আরো খানিকটা পর। রোদ লেগে মুখটা বেশ কালো দেখাচ্ছে। চোখটাও সামান্য লাল। রিহার্সাল তখন পুরোদমে চলছে। মাঝে পর পর দুটো সিন দেবরাজ অনাবশ্যক। সে একপাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখছিল।

অবিনাশ ওকে ইশারা করে ডাকল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেবরাজ বলল,—'কতক্ষণ এসেছ? এত দেরি হল কেন?'

ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অবিনাশ। কোণের দিকের ঘরটা বেশ নিরিবিলি। সুইচ টিপে পাখাটা চালু করে দিয়ে অবিনাশ বসল।

দেবরাজ ছটফট করছিল। সে বলল,—'পরের সিনেই কিন্তু আমার পার্ট। কথাবার্তা চটপট সেরে ফেল।'

অবিনাশ মুচকি হাসল। চোখ নাচিয়ে বলল,—'মাইরি কার্তিক, পরের সিনটা আমি জানি। নায়িকাকে বুকে টেনে নিতে হবে, তাই বুঝি আর তর সইছে না?' হি-হি করে হাসল অবিনাশ।

—'বাজে কথা রাখ।' দেবরাজ মৃদু আপত্তি করল।

—'বেশ তো, কাজের কথাই বলছি বাবা।' অবিনাশ খলনায়কের মত একটা চোখ ছোট করল। 'সব খবর নিয়ে এসেছি ইয়ার। মেয়েটাকে বাগানো কিছু কঠিন নয়। বিশ্লেষ করে তোমার মত কন্দর্পের পক্ষে।'

—'কী খবর পেয়েছ?'

ধারেকাছে কেউ ছিল না। তবু অবিনাশ সতর্ক হল। গলা খাটো করে বলল,—'মেয়েটা একখানি চীজ্। ডুবে ডুবে জল খেতে ওস্তাদ। তোমাদের নাটকের ডিরেক্টর নীলাদ্রির সঙ্গে ওর গোপন পিরীত। কলেজের প্রফেসর হবার আগে ছোকরা নিশ্চয় ওর লাভার ছিল।'

—'সে সন্দেহ কিন্তু আমার হয়েছে।' দেবরাজ ফিস ফিস করে বলল।

—'আরো শোনো।' অবিনাশ তার গোপন সংবাদের থলি উজাড় করতে চাইল। গিন্নীকে থিয়েটারে নামতে দিতে অম্বর রায় মত দেয়নি। একদিন রাত্তিরে স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় মারমার-কাটকাট হবার জোগাড়। চিৎকার, চেঁচামেচি—লোকজন ছুটে আসে এমন অবস্থা। স্বামীর আপত্তি মেয়েটা কিন্তু গ্রাহ্য করল না। প্রেমের টান গ্রহের টান। নায়িকার রোলে সে নামবে, কারো আপত্তি শুনবে না। এ-কথা নীপা জোর করে বলল। রেগেমেগে অম্বর রায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সমস্ত রাত বাড়ি ফেরেনি।'

—'এসব খবর কোথা থেকে পেলে মাইরি?'

অবিনাশের মুখটা আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল,—'খবর আরো দিতে পারি। কিন্তু তোমার সময় হবে তো?' রিহার্সাল-ঘরের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ কী যেন ইঙ্গিত করল।

—'হবে, হবে।' দেবরাজের চোখদুটো উৎসাহে জ্বলজ্বল করছিল। 'তুমি একটু সংক্ষেপে বলে যাও।'

অবিনাশ বলল,—'ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাব-ভালোবাসা বলতে নেই। নিত্যদিন কলহ, খিটিমিটি! পাঁচ-ছ' বছরের উপর ঘর করছে দুজনে। কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি। মনের শূন্যতা দূর করতে নীপা রায় অবলম্বন খুঁজছে। কলেজে ঢুকেছে, থিয়েটার করছে। মনে হয় ফিল্মে নামতেও তার আপত্তি নেই।'

—'সত্যি?' দেবরাজ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল। 'তাহলে একটা চান্স নিতে হয় অবিনাশ।'

—'নিশ্চয়। আমার মনে হয় মেয়েটা তোমার সম্বন্ধে ইনটারেস্টেড।'

—'কেমন করে বুঝলে?'

অবিনাশ একটু হাসল। বলল,—'ওটা সিকস্‌থ সেন্সের ব্যাপার। কিন্তু আমার অনুমান খুব সম্ভব অভ্রান্ত। আমি সেদিনও লক্ষ্য করেছি, আজও দেখলাম। নীপা রায় তোমার মুখের ওপর ঘন ঘন চোখ বুলোচ্ছিল। কেমন ইতি-উতি চাউনি। তুমি কথা বললেই ও নিবিষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুই আমার নজর এড়ায়নি।'

একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে দেবরাজ বলল,—'আজ রিহার্সাল শুরু হবার আগে মিসেস রায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। ওই আড়াল মত জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু চৈতি এসে হঠাৎ এমন হইচই শুরু করল মিসেস রায় কী ভাবলেন কে জানে।'

দেবরাজের পিঠে একটা ছোট্ট চাপড় মারল অবিনাশ। প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'শাবাশ হিরো। এই না হলে দেবরাজ।' পরে গলা খাটো করে সে যোগ করল,—'গল্প-গুজবের মধ্যে এক-আধটু প্রেম-ট্রেমও তো হল দোস্ত?

দেবরাজ ঈষৎ হাসল, 'চৈতিটা এমন হিংসুটে মেয়ে জানো? গায়ে পড়ে মিসেস রায়ের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া করে গেল।'

—'আহা-হা!' অবিনাশ জিভের সাহায্যে একটা চুকচুক শব্দ করল। 'চৈতি মানে সেই কালো মেয়েটি তো? তা হিংসে একটু হতেই পারে ব্রাদার। আমার তো মনে হয় চৈতিও তোমার পিছনেই ঘুরঘুর করছে। তাই ওর এত গা জ্বালা, কিন্তু নীপা রায়ের জন্য এত দুর্বলতা তো ভালো নয় দেবরাজ।' অবিনাশ অর্থপূর্ণ হাসল।

বারান্দায় হাল্কা চটির শব্দ পাওয়া গেল।

দেবরাজ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। চৈতি আবার তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু এখন ওর প্রসন্ন মুখ। মেঘমুক্ত নীল আকাশের মত উজ্জ্বল হাসি।

একগাল হেসে চৈতি বলল, 'ও বাবা। তুমি এইখানে দেবরাজদা। আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।' হঠাৎ অবিনাশের দিকে চোখ পড়তেই চৈতি চুপ করল।

দেবরাজ হেসে বলল, 'ইনি কে জানো চৈতি? সিনেমার ডিরেক্টর, ইচ্ছে করলে তোমাকে ওর বইতে প্লে-ব্যাক করার সুযোগ দিতে পারেন। কিংবা কোন রোলে,—'

চৈতি লজ্জা পেল। ওর কানের কাছটা বেগুনি দেখাল। 'আমি কি তেমন ভালো গাইতে পারি, যে ফিল্মে গাইব? ওসব অন্যদের জন্য।' লাজুক মেয়ের মত সে হাসল।

অবিনাশ সান্ত্বনা দিল। 'গলা তো আপনার খারাপ নয়, বরং বেশ ভালোই। রেডিওতে কেন চেষ্টা করছেন না।'

—'কে চেষ্টা করবে বলুন? একা মেয়েছেলে তো কলকাতায় গিয়ে যোগাযোগ করতে পারি

না। এই মহাপ্রভুকে কতদিন খোসামোদ করেছি। কিন্তু ইনি নির্বিকার।' দেবরাজের দিকে লক্ষ করে চৈতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করল।

অবিনাশ হাসল। মেয়েটা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। দেবরাজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে ওর ডুবু জল। পৌঁছাতে না পেরে চৈতি শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে।

দেবরাজ বলল, 'তুমি অপেক্ষা করো অবিনাশ। ডিরেক্টর সাহেব এত্তেলা পাঠিয়েছেন। না গেলেই বিপত্তি।'

দেবরাজ চলে গেলেও চৈতি কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। অবিনাশ ব্যাপারটা বুঝল। মেয়েটা তার কাছে তদ্বির করতে চায়। হয়তো আব্দারও।

নিরিবিলি ঘরে চৈতিকে একলা পেয়ে অবিনাশের মনে দুষ্টবুদ্ধি জন্মাল। মেয়েটার সঙ্গে একটু ফষ্টি-নষ্টি করবার ইচ্ছে হল তার। এক নজরে ওকে দেখল অবিনাশ। রঙটা কালো হলেও ওর ছিরিছাঁদ মন্দ নয়। চোখ দুটি বড়, জোড়া ভ্রূ। ঠোঁট পাতলা, টিয়াপাখির ঠোঁটের মত বঙ্কিম নাসিকা। ডিমালো মুখ বলে চেহারার একটা চটকও আছে। মিথ্যে দেবরাজের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে মেয়েটা। চোখের সামনে নীপারানী থাকতে দেবরাজ ওদিকে ফিরেও চাইবে না।

অবিনাশ বলল, রেডিওতে গান করবার ইচ্ছে আছে আপনার?'

'কেন থাকবে না?' চৈতি ফিক করে হাসল। দিন না একটা চান্স জোগাড় করে। আমি শুনেছি তদ্বির তদারক করবার লোক না থাকলে ওখানে সুবিধে হয় না।'

অবিনাশ ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। ভরসা দিয়ে বলল, 'সে ভাবনা আমার। আপনি নিজেকে তৈরি করুন। খুব শিগ্‌গির অডিশনের একটা ব্যবস্থা হবে।'

চৈতি খুশিতে ডগমগ। জোয়ারের মুখে ভরা নৌকোর মত চঞ্চল। চোখের একটা ভঙ্গি করে সে বলল, 'সত্যি বলছেন তো?' প্রগলভ যুবকের মত অবিনাশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, 'ইয়েস ম্যাডাম।'

চৈতির চোখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশের নেশা লাগছিল। মেয়েটা মরা মাছের মত ঠাণ্ডা বা শক্ত নয়। বরং একটু বেশি জীবন্ত। ছলাকলা জানে। ওর সঙ্গ পেলে সুখ। নীপার মত সুন্দরী না হলেও মেয়েটার মধ্যে লাইফ আছে। অবিনাশ তাই চায়।

চৈতির মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ প্রশ্ন করল, 'মিসেস রায়ের অভিনয় আপনার কেমন লাগছে?'

'ছাই অভিনয় হচ্ছে নীপাদির' চৈতি বিরক্তি প্রকাশ করল। 'অবশ্য আপনাদের কেমন লাগছে কে জানে।'

অবিনাশ চিন্তা করতে চেষ্টা করল। 'দেখুন, আমারও খুব একটা ভালো লাগছে না। তবে আমি মাত্র একদিন অভিনয় দেখেছি।' সে আড়চোখে চৈতির দিকে তাকাল।

—'নীপাদির বড্ড গুমোর, বুঝলেন? একটু সুন্দরী বলে মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু বাংলাদেশে কি সুন্দরীর কিছু অভাব আছে? তবে শুধু রূপের গরব নয়, নীপাদির মনেও বিষ।'

—'সে আবার কী?' অবিনাশ কৌতূহল প্রকাশ করল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে চৈতি একটু সাবধান হতে চাইল। চিন্তিতমুখে বলল,—'রিহার্সালের শুরু থেকে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। দেবরাজের উপর নীপাদির নজর পড়েছে। কি কাণ্ড দেখুন?—তুমি ঘরের বউ, না হয় দশজনের সঙ্গে থিয়েটার করছ। তাই বলে সুন্দর পুরুষ দেখলেই তাকে নজরবন্দী করতে চাইবে।'

নজরবন্দী কথাটা শুনেই অবিনাশের হাসি পেল। হি-হি করে হেসে সে বলল, 'নীপাদেবী মন্তর-টন্তর জানেন নাকি? দেবরাজকে উনি বশ করে ফেলেছেন বলে আপনার মনে হয়?'

—'কি জানি! তবে নীপাদি একটা সাঙ্ঘাতিক মেয়ে। ওর ফাঁদে পা দিলে আর নিস্তার নেই।' চৈতি মন্তব্য করল।

ঘরের বাইরে ভারী পায়ের শব্দ শুনে অবিনাশ তাকাল। মস্তান গোছের এক ছোকরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এক মাথা চুল, কানের লতি পর্যন্ত জুলপির বাহার। চোখ দুটি ঈষৎ লাল। মণিবন্ধে চওড়া কালো ব্যান্ড লাগানো ঘড়ি।

ওকে দেখে চৈতি সহাস্যে বলল,—'কেয়া খবর হরিপ্রকাশ? রিহার্সাল দেখতে ভালো লাগল না?'

অবিনাশ বুঝতে পারল লোকটা অবাঙালি। চৈতির সঙ্গে জানাশুনো এবং সেই সুবাদেই টাউন ক্লাবে নাটকের মহলা শুনতে এসেছে। কিন্তু তার দিকে ছোকরা অমন কটমট করে তাকিয়ে কেন?

হরিপ্রকাশ সম্ভবত বাংলা বোঝে এবং মোটামুটি বলতেও পারে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, —'হামি যাই। রাতমে ফিন ডিউটি আছে।'

চৈতি হাত বাড়িয়ে ওকে থামাল। 'দাঁড়াও আমিও যাব তোমার সঙ্গে। নীলাদ্রিবাবু বলেছেন আজ শুধু অভিনয়। গানটান হবে না।'

অবিনাশের দিকে ফিরে চৈতি হাত তুলে নমস্কার করল।

'পরে নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে।' অবিনাশ হাসতে হাসতে বলল।

সে ভাবছিল রাস্তা পর্যন্ত চৈতিকে এগিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু হরিপ্রকাশ ওর পাশে হাঁটছে। ছোকরার চওড়া কাঁধ, বেশ ভারী পা আর শক্ত দুটি হাত। একটু আগে ছোকরা তার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল। অবিনাশ আর পা বাড়াতে সাহস করল না।

সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি হতেই নীপা উঠল। রিহার্সালও এবার ফুরোতে চলল। শেষের কটা দৃশ্যে নীপার ভূমিকা নেই। নাটকের প্রায় মাঝামাঝি তার অভিনয়ের ইতি—।

নীলাদ্রির দিকে একটু ঝুঁকে নীপা ফিস ফিস করে বলল। রিহার্সালের মাঝখানে উঠে যেত হলে ডিরেক্টরের অনুমতি নেওয়া নিয়ম। নীলাদ্রি মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিতেই নীপা উঠল।

বারান্দাটা ফাঁকা। রিহার্সাল দেখতে যারা এসেছিল তাদের অনেকে চলে গেছে। যারা যায়নি তারা এখনও ভিড় করে নাটকের মহলা দেখছে। শেষ হবার আগে আর কেউ উঠবে বলে নীপার মনে হল না।

বারান্দা থেকে নামলেই গালিচার মত সবুজ মাঠ। বর্ষার জলহাওয়া পেয়ে আগাছার জঙ্গল, এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে। বিকেলের আকাশ ফটফটে নীল। মুখ উঁচু করে নীপা দেখল, বেলা প্রায় গেছে। সূর্য ডুবতে আর বাকি নেই। দূরে একটা তেঁতুল গাছের মগডালে পাত্রের তলানির মত এক চটকা রোদ্দুর।

নীপা দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। ভয় পেলে মানুষ যেমন জোরে হাঁটে, সে তেমনি লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করল। উৎকট সেই ভয় এবং চিন্তাটা এখন তার মনের মধ্যে ঈশান কোণের মেঘের মত জোর কদমে বাড়ছে। ছেলেবেলায় ভূতের গল্প শুনলে ঠিক এমনি অবস্থা হত। কয়েকদিন ধরে একটা ভয়ভাবনা তার মনে ফুলত, ফাঁপত। দিনমানে সে ডাকাবুকো। কোনো ভয়ডর ছিল না। কিন্তু সন্ধে হবার সময় তার বুকটা কেঁপে উঠত। গল্পের সেই ভূতপ্রেতগুলো অন্ধকারে জন্ম নিত। মনের মধ্যে ভয়টা চেপে বসত, কিছুতেই সরত না। আজও নীপার অবস্থাটা তেমনি। সারাদিন সে বেশ ছিল। ভয়ভাবনা বা দুশ্চিন্তার ছায়ামাত্র নেই। কিন্তু বিকেল ফুরিয়ে আসছে দেখেই তার মনের মধ্যে সেই অস্বস্তিটা সদ্যফোটা একটা ব্যথার মত টনটন করে উঠল।

বাড়িতে ঢুকে নীপা একমুহূর্তও দেরি করল না। অম্বর এখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেনি।

দুঃখহরণ এইমাত্র কয়লা ভেঙে উনুনে আঁচ দেবার উদ্যোগ করছে।

নীপাকে দেখে সে বলল,—'দিদিমণি, চা খাবেন নাকি? এক কাপ জল বসিয়ে দিই স্টোভটায়।'

—'চা করবার এখন দরকার নেই।' নীপা মাথা নেড়ে জবাব দিল। 'আমি আবার বেরুব একটু। আধ ঘন্টাটাক পরে ফিরছি। তুই ততক্ষণ আঁচ দিয়ে অন্য কাজগুলো সেরে রাখ।'

আলমারির চাবি ঘুরিয়ে নীপা ওর ক্যাশ-বাক্সটা বের করল। পাঁচ-সাতটা খোপ আছে বাক্সটায়। দু-তিনটে খোপে তার কিছু গয়নাগাঁটি, একটা খোপে উজ্জ্বল চকচকে সিকি, আধুলি এবং কয়েকটা রুপোর টাকা। একদিকে বান্ডিল করে রাখা কতকগুলি নোট। নীপা গুনে গুনে দেড়শো টাকা তুলে তার ব্যাগে ভরল। বাক্সটা বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে নীপা কিছু ভাবল। রক্তচোষা জোঁকের মত লোকটা ফি মাসে তার কাছ থেকে একগাদা টাকা নিয়ে যাচ্ছে। শত্রুর কাছে মুখ বুঁজে মার খেয়ে মানুষ যেমন গালিগালাজ, অভিসম্পাত করে, নীপা তেমনি মনে মনে লোকটার সর্বনাশ কামনা করল।

নদীটা শহরের পিছন দিকে। নীপাদের বাড়ি থেকে দূরে নয়,—বড় জোর পাঁচ মিনিটের পথ। এদিকটা নির্জন, লোকজন কম। একটা পুকুরের পাড় বেয়ে রাস্তাটা নীচে নেমেছে। তারপরই রেলের একটা লেভেল-ক্রসিং। সেটা পেরোলেই দুপাশে ঝোপঝাড়, চেনা-অচেনা গাছপালা। কিছু দূরে একটা রাইস মিলের চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া উড়ছে। অনেকটা পিঠের উপর ছড়ানো মেয়েদের এলোচুলের মত ধোঁয়াটা বাতাসে ভাসছে?

নির্দিষ্ট সেই গাছটার নীচে এসে নীপা আশ্চর্য হল। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু মানুষটার তো এখানেই অপেক্ষা করার কথা। তবে কি সে অন্য কাজে আটকা পড়ল?

গাছের নীচে প্রায় অন্ধকার। চারপাশ নির্জন, নিস্তব্ধ। একটা পাতা নড়ার শব্দও কানে এল না। অনেক কষ্টে নীপা তার হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে ছটার মত। আর কতক্ষণ সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? অন্ধকারে ভূতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা কি কোনো মেয়ের পক্ষে সম্ভব?

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। নীপার গলা থেকে হুইসিলের কাঁপা আর্তনাদের মত একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বেরোতেই তার কানের কাছে সে বলল,—'ভয় পেয়ো না, আমি।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুটি তপ্ত ওষ্ঠ তার ঘাড়ের কাছের নরম চামড়াটা স্পর্শ করল। নীপা বুঝতে পারল, লোকটা তাকে চুমু খেতে চায়।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলল,—'এসব কী হচ্ছে? তোমার যা প্রয়োজন তাই নিয়ে বিদেয় হও—'

হি-হি করে লোকটা হাসল। বলল,—'মেজাজ দেখিও না মাইরি। আমি শালা এমনিতে ভালোমানুষ। কিন্তু মেজাজ দেখালেই বাপের কু-পুত্তুর।' একটু থেমে লোকটা বলল—'টাকাটা এনেছ তো?'

নীপা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু লোকটাকে তা জানতে দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'কিন্তু এভাবে ফি-মাসে টাকা জোগানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘুষ দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ রাখতে আমি পারব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো—'

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে নীপা টাকাগুলো বের করল। পুরো দেড়শো টাকা। হাত বাড়িয়ে লোকটা তাই নিল। সেগুলি পকেটে ভরে বলল,—'এক থোকে যদি আমাকে কিছু টাকা দাও, তাহলে তোমার কাছে আর নাও আসতে পারি।'

—'তোমাকে বিশ্বাস কী? এর আগেও তো কত টাকা নিয়েছ। প্রতিবারেই তোমার এক কথা—সামনের মাস থেকে আর নয়। কিন্তু আবার সেই উৎপাত। নীপা সন্দিগ্ধচোখে তাকাল।

লোকটা রাগল না, বরং হাসল। বলল,—'আর একবার না হয় পরীক্ষা করে দেখো।'

—'কত টাকা চাই?' নীপা নাক উঁচু করে প্রশ্ন করল।

—'জ্যাকসন লেনে একটা দোকানঘর বিক্রি হবে। এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে কারবার করব ভাবছি। কিন্তু হাজার দুই টাকার কমে অংশীদার হওয়া যাবে না।'

—'দু' হাজার? অত টাকা আমি কোথায় পাব—' চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠল তার।

লোকটা দৃঢ়কণ্ঠে বলল,—'তুমি সরকারি ডাক্তারের বউ। দু'হাজার টাকা তোমার কাছে বেশি, একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?'

নীপা হতাশ ভঙ্গি করল। 'অসম্ভব। দু হাজার টাকা বের করা আমার কম্মো নয়।' নীপা স্পষ্ট জানাল।

কথা বলতে বলতে ওর সঙ্গেই নীপা হাঁটছিল। বেশ ঘুটঘুটে, গা-ছমছম করা অন্ধকার। পাশে একটা মানুষ থাকলে তবু খানিকটা সাহস। নির্জন অন্ধকার পথে একলা মেয়েমানুষের বিপদ হতে কতক্ষণ?

লেভেল ক্রশিংটার কাছে আসতেই শক্তিশালী একটা টর্চের আলো তার মুখে পড়ল। ভয় পেয়ে নীপা প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'কে ওখানে? মুখের উপর টর্চের আলো ফেলছেন কেন? আচ্ছা অসভ্য লোক তো—' টর্চ নিভিয়ে সে এগিয়ে এল। মানুষটাকে দেখে নীপা লজ্জা এবং বিস্ময়ে থ। অন্য কেউ নয়,—প্রফেসর অনিমেষ দত্ত।

জিভ কামড়ে নীপা বলল,—'স্যর, আপনি?'

একটা অস্বস্তিকর বেকায়দা অবস্থা। সম্ভবত প্রফেসর দত্ত তা বুঝতে পেরেই ব্যস্ত হয়ে বললেন—'এদিক এসেছিলাম একটু দরকারে। রাইস মিলে কিছু টাকা দিতে বাকি ছিল। আচ্ছা চলি এখন।' প্রফেসর দত্ত টর্চের আলো ফেলে লেভেল-ক্রশিংটা পেরোলেন। পুব দিকের রাস্তা ধরে আলোটা শহরের দিকে এগোল।

অন্ধকারের মধ্যেও নীপা লক্ষ্য করল। প্রফেসর দত্তের মুখটা কেমন যেন,—ভ্যাবাচাকা, বিচলিত ভঙ্গি। সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকারে তার ছাত্রীকে একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আবিষ্কার করে অনিমেষ দত্ত কি নিজেকেই অপরাধী মনে করলেন? কিন্তু তাদের দেখে অমন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কেন? লজ্জা পেয়ে ভদ্রলোক কি পালিয়ে গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন?

মাথা তুলে সঙ্গীকে নীপা বলল,—'উনি আমাদের কলেজের প্রফেসর। কী ভাবলেন কে জানে। তুমি তো চেনো—'

লোকটা কখন সিগারেট ধরিয়েছে। লম্বা একটা টান দিয়ে সে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, —'চিনি বৈকি,—বিলক্ষণ চিনি। কিন্তু তোমাকে দেখে মাস্টারমশায় অমন বমকে পালালেন কেন?'

পাঁচ

পাশাপাশি ওরা হাঁটছিল।

লেভেল ক্রশিংটা পেরিয়ে মিনিট চার-পাঁচ গেলেই ঘর-বাড়ি দোকানপাটের শুরু। তে-মাথার মোড়ে ঝাঁকা মাথায় মুটে-মজুরের মত এক ডালপালা ছড়ানো গাছ। ছাই-রঙের একটা রাত-জাগা পাখি কর্কশ চিৎকার করে গাছটার আশ্রয় ছেড়ে অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হল। ডালপালা আর পাতার ফাঁকে জোনাকির দল ঘুরছে। বিন্দু বিন্দু আলো, নকশার কাজের মত বিচিত্র কত আঁকিবুকি। তৈরি হয়ে আবার তা মুছে যাচ্ছে। অন্ধকার রাতে জোনাকির ঝিলমিল কি সুন্দর,—ঠিক যেন এক রূপকথার রাজ্যের ইশারা।

চলতে চলতে নীপা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

লোকটা বলল,—'কী ব্যাপার, থামলে যে?'

—'তুমি এবার যাও। আর পাশাপাশি হাঁটা উচিত হবে না।' নীপা সামনের দিকে চেয়ে পরিষ্কার জানাল।

লোকটা ঈষৎ হাসল। বলল,—'তোমাদের মেয়ে-জাতের মাইরি কাণ্ডজ্ঞানটা সবসময় টনটনে। এতক্ষণ অন্ধকারে কলকল কথা কইলে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস হাসলে। কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিলে। এখন সামনে আলো আর লোকজন দেখে বিলকুল সব ভুলে যাচ্ছ।' একটু থেমে সে ফের বলল,—'অবশ্য সমাজে মুখ রাখতে হলে এই উপায়। নইলে সরকারি ডাক্তারের সুন্দরী বউয়ের নামে বদনাম ছড়াবে যে।'

ওর কথা মানেই বোলতার হুল। নীপা তা জানে। ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। কিছু বলল না।

লোকটা হি-হি করে হাসছিল। 'সুন্দরীর সঙ্গ চাইনে বাবা, আমার মালকড়ি পেলেই হল।' চোখ মটকে সে বলল, 'টাকাটা কিন্তু আমার দু-তিন দিনের মধ্যেই দরকার। নইলে জ্যাকসন লেনের সেই দোকানটা ফস্কে গিয়ে অন্য কারো কপালে উঠবে।'

—'অতগুলো টাকা! হুট করে আমি কোথায় পাবো?' নীপা যেন আঁতকে উঠল।

নেশাখোর মানুষের মত সে চোখ ঘুরিয়ে হাসল। বলল—'পাবে বৈকি। সরকারি ডাক্তারের বউয়ের কাছে দু-হাজার টাকা তো খোলামকুচি। কেন ছলনা করছ মাইরি!'

—'অসম্ভব। দু-হাজার টাকা কি চাট্টিখানি কথা?' নীপা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল।

বাঁ-চোখটা ঈষৎ ছোট করে লোকটা তাকাল। 'তোমার টাকার অভাব! একখানা গয়না মানেই তো হাজার টাকা—' গলার হারটার দিকে ইঙ্গিত করে সে কথা শেষ করল।

নীপা ভয় পেল। লোকটা বলে কী? টাকা না পেলে গয়না-টয়নার দিকেও হাত বাড়াবে নাকি? আড়ালে আবডালে ওর সঙ্গে দেখা করা উচিত হয়নি তার। মানুষের মন না মতি। নির্জন জায়গায় ওকে একলা পেয়ে লোকটা যদি ওর মুখ চেপে ধরত।

—'গয়নাগাঁটি আমার নয়। ওগুলো আমার স্বামীর,—আমি শুধু অঙ্গে পরি।' নীপা মুখ গম্ভীর করে বলল।

—'আহা-হা! কি শোনালে মাইরি।' লোকটা হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটল। 'সব ধন হল তোমার, চাবিকাঠিটি রইল আমার। তা বেশ, গয়নার মালিকের কাছেই টাকাটা চাইব।'

—'তার মানে?' নীপা জবাব চাইল।

লোকটা হেসে বলল—'স্ত্রীর কলঙ্ক বলে কথা। পাঁচ কান হলে শহুরে মান-ইজ্জত সব ডুববে। আমার তো মনে হয় দু-হাজার টাকা ডাক্তারবাবু নিশ্চয় দেবেন। ভদ্দরলোকের তাই উচিত কাজ হবে।'

মরীয়া হয়ে নীপা বলল,—কী ভেবেছ তুমি? তোমার জন্য কি শেষে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে?'

লোকটা মূর্তিমান শয়তান। এক চটকা ব্যঙ্গ হেসে সে বলল,—'আত্মঘাতী হবে? কী যে বল মাইরি! এমন সুন্দর ফিল্মস্টারের মত ঢলঢলে মুখখানা। স্ত্রী আত্মঘাতী হলে ডাক্তারবাবুর কী দশা হবে ভেবেছ?'

কথা নয়—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীপা বলল,— 'আত্মহত্যা করলে আর কিছু না হোক, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

লোকটা এবার এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। ক্রূর একটা ভঙ্গি করে বলল—'ওসব মরবার

ভয়-টয় সোয়ামীকে দেখিও। আমার টাকা নিয়ে কথা। তোমাকে দুদিন সময় দিলাম। সোম আর মঙ্গল, দুদিন পরে আবার আসছি।'

—'কোথায় আসবে?' খুব অসহায় মুখ করে নীপা তাকাল।

—'তোমার বাড়িতে। টাকাটা জোগাড় করে রাখলে ভালো করবে।'

—'অসম্ভব!' নীপা প্রতিধ্বনির মত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল। 'অত টাকা আমার নেই। তোমার এসে কোনো লাভ হবে না।'

অন্ধকারে অদৃশ্য হবার আগে লোকটা শুধু বলল, 'লাভ-লোকসানের কথা এখন থাক। বুধবার রাত্তিরে তার হিসেব হবে।'

হতভম্বের মত নীপা দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথাটা বনবন করে ঘুরছিল। পা টলছিল। মনে হল এক্ষুণি সে পড়ে যাবে। একপায়ে তালগাছের মত নিশ্চল হয়ে সে কতক্ষণ রইল। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে নীপা পা বাড়াল। রাত বেশি নয়। এখনও রেডিওতে খবর পড়া শুরু হয়নি। কাছেই একটা চায়ের দোকানে একদল উঠতি যুবা জটলা করছে। তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে ওরা কি বলাবলি শুরু করল। নীপা একটু এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে কে একজন হিরোইন, হিরোইন বলে দুবার চেঁচিয়ে উঠল। অন্য একটি ছেলে—অ্যাই, অ্যাই কী হচ্ছে বলে তাকে ধমক দিল। কিন্তু সে দমল না। মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে সজোরে সিটি মারল।

বাড়ির কাছে এসে নীপা দেখল বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ভিতরটা অন্ধকার। রান্নাঘরের বাতিটা কম পাওয়ারের। শোবার ঘরের আড়াল বলে রান্নাঘরের আলোটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। কে একজন ভদ্রলোক খবরের কাগজ মুখের উপর ফেলে চুপচাপ বসে। নীপা ভালো করে দেখল। অম্বর নয়, খবরের কাগজ আড়াল বলে মানুষটাকে ঠিক চেনা যায় না। নীপা ঘরে ঢুকতেই লোকটা মুখের উপর থেকে কাগজটা সরাল।

অবিনাশ সমাদ্দার একমুখ হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। 'কোথায় গিয়েছিলেন আবার?'

—'কাছেই।' নীপা হাসবার চেষ্টা করল। 'আপনি কতক্ষণ এসেছেন?'

—'আধঘন্টাব মত হবে। এতক্ষণ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

নীপা অবাক হল। বলল—'উনি এসেছেন নাকি?'

—'আমি এসে দেখলাম উনি বাড়িতেই আছেন। এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। হাসপাতালে কি কাজ রয়েছে। আমাকে বললেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে।' অবিনাশ একটু থামল। নীপার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'অপেক্ষা করে অবশ্য ভালোই হয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা হল।'

নীপাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। তার মনের ভিতর সেই খট্‌কাটা খোঁচার মত বিঁধছিল। অম্বর হঠাৎ এত উদার কেন? অবিনাশ তার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জেনেও সে উত্তপ্ত হয়নি। স্ত্রী অনুপস্থিত। সুতরাং দরজা থেকেই মানুষটাকে সুন্দর বিদায় করতে পারত। কিন্তু অম্বর তা করেনি। অবিনাশের সঙ্গে গল্প-গুজব করেছে। নিজে কাজের অছিলায় বেরোলেও অতিথিকে সে বসিয়ে রেখে গেল। বউ ফিরে এলে অবিনাশ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।

নীপা ক্লান্ত বোধ করছিল। সকালে ট্রেন-জার্নি, দুপুরে রিহার্সাল, আর সন্ধেবেলা অতখানি পথ হাঁটা। লোকটার ভয় দেখানো হুমকি আর কথা কাটাকাটি। মনটা জং ধরা লোহার মত অকেজো হয়ে আছে।

কিন্তু অবিনাশ তারই জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীপাকে বসতে হল। তারও দুটো কথা আছে ওকে বলবার।

—'রিহার্সাল থেকে কখন যে উঠে এলেন। আমি আর দেবরাজ আপনাকে খুঁজে হয়রান—'

—'তাই নাকি—' নীপা কানের কাছের চুলগুলি যত্ন করল। রহস্য করে বলল—'নাটকের নাম তো জানেন—নায়িকা সংহার। শেষদৃশ্যের অনেক আগেই নায়িকার মৃত্যু। অক্কা পেয়ে শেষ পর্যন্ত সে থাকবে কেমন করে?' নীপা ফিক করে একটু হাসল।

অবিনাশ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় মেয়েটাকে। ঝকঝকে সাদা একসার দাঁত...মরালীর মত লম্বা গ্রীবা...গালে সুন্দর টোল পড়ে। অম্বর রায়ের স্ত্রী-ভাগ্যকে ঈর্ষা না করে উপায় নেই।

—'হুট করে কলকাতা চলে গেলেন। আমি জানতেই পারলাম না।' অবিনাশ সখেদে বলল।

—'জানতে পারলে কী করতেন?'

—'কলকাতা যেতাম আপনার সঙ্গে। ঘনশ্যাম পিকচার্সের অফিস টালিগঞ্জে,—সেখানে একবার গেলেই বদ্রীদাসবাবুর সঙ্গে দেখা হত।'

'বদ্রীদাসবাবু মানে—'

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলল—উনিই তো ঘনশ্যাম পিকচার্সের সিনিয়র পার্টনার। বলতে গেলে বদ্রীদাসবাবুই বইয়ের প্রোডিউসার।' একটু থেমে সে মোক্ষম কথাটি ছাড়ল,—'আপনাকে চাক্ষুষ দেখলে বদ্রীদাসবাবু এক কথায় বই করতে রাজি হবেন।'

চপল বালিকার মত নীপা হেসে উঠল। 'বেশ কথা বলেন আপনি। কিন্তু ফিল্মে নামব কি না তাই যে এখনও ঠিক করতে পারিনি।'

অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'বলেন কি মিসেস রায়। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ডিসাইড করে ফেলেছেন। ডাক্তারবাবুকেও গররাজি বলে মনে হল না।'

—'তার মানে? উনি মত দিয়েছেন নাকি?'

—'না-না। মতামত কিছু দেননি। কিন্তু আপত্তিও করলেন না। বোধহয় আপনি যা বলবেন, তাই ওর মত।'

—'ইস।' নীপা একটা মেয়েলি ভঙ্গি করল। স্বামীরা কি স্ত্রীর বশ বলে মনে করেন নাকি?'

—'কি জানি।' অবিনাশ উদাসীন ভঙ্গি করল। একটু হেসে সে বলল,—'একটা কথা বলব মিসেস রায়? সাহিত্য-সঙ্গীত-নাট্যকলা-রাজনীতি যাই করুন, সিনেমার মত তাড়াতাড়ি কোনো লাইনে পপুলারিটি পাবেন না। রাতারাতি আপনি ফেমাস হবেন। অগুনতি লোকের মনের আকাশে শুকতারার মত আপনার নামটি জ্বলজ্বল করবে। ভক্তের দল আকাশের দিকে চেয়ে ধ্রুবতারাকে ভুল করতে পারে। কিন্তু প্রিয় চিত্রতারকার মুখটি কেউ ভুল করবে না।'

—'উঃ। আপনি দেখছি সাঙ্ঘাতিক লোক।' নীপা খিলখিল শব্দ করে হাসল। 'সিনেমায় না এসে আপনার উকিল হওয়া উচিত ছিল। ফিল্মে দেখছি আমাকে নামাবেনই।'

প্রসঙ্গ পালটে অবিনাশ শুরু করল,—'আপনার অভিনয় বলতে দেবরাজ তো অজ্ঞান। ও বলে ফার্স্ট বইতেই আপনি সুপারহিট করবেন।'

নীপাকে সন্তুষ্ট দেখাল।

—'দেবরাজবাবু কোথায়? আজ এলেন না কেন আপনার সঙ্গে?

অবিনাশ এদিক-ওদিক তাকাল। গলা খাটো করে বলল,—'আসবার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু সেই গায়ে-পড়া মেয়েটা গিয়ে হাজির। আপনি তো চেনেন ওকে,—চৈতি না কী যেন নাম। সব সময় দেবরাজের পিছনে ছিনে-জোঁকের মত মেয়েটা লেগে আছে।' কথা শেষ করে অবিনাশ দেখল নীপার মুখের রঙ বদলেছে। চোখ দু'টি অল্প ছোট, ঈষৎ কুঞ্চিত, ভ্রূ,—মেয়েলি ঈর্ষা প্রকাশ পাচ্ছে।

'দেবরাজবাবু ওকে আমল না দিলেই পারেন?' নীপা মন্তব্য করল।

অবিনাশ হাসল। 'তাই অবশ্য উচিত। কিন্তু দেবরাজকে তো জানি। ওর মনটা মাখনের মত নরম। কাউকে আঘাত করতে পারে না।'

নীপা কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ সে বলল,—'আচ্ছা অবিনাশবাবু, আপনার প্রস্তাবে রাজি হলে আমাকে নিশ্চয় কন্ট্র্যাক্টে সই করতে হবে।'

অবিনাশ এগিয়ে বসল। 'কন্ট্র্যাক্ট-ফর্মে সই না করলে জিনিসটা তো পাকা হবে না। কাজেই'—কথাটা সে অসমাপ্ত রাখল।

নীপা বলল,—'চুক্তিতে সই করবার সময় কিছু টাকা নিশ্চয় অ্যাডভান্স পাওয়া যায়?'

—'অবশ্যই' অবিনাশ জোর করে বলল। 'কত টাকা আপনার দরকার বলুন না মিসেস রায়? বদ্রীদাসবাবুকে আমি কালই লিখে দিচ্ছি। সামনের শনিবারেই কন্ট্র্যাক্টে সই করবেন বলুন।' টাকার কথা বলতে নীপা লজ্জা পাচ্ছিল। একটু পরে সে বলল,—'বেশি নয়। হাজার দুই টাকার খুব দরকার আমার। একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভালো হয়। কিন্তু একটা কথা—'

অবিনাশ স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত ঘাড় বাড়িয়ে উৎকর্ণ হল। খুব আস্তে-আস্তে নীপা বলল, —'টাকার কথাটা এখনই কাউকে জানাবেন না। আমার স্বামীকে তো নয়ই,—এমনকি দেবরাজবাবুকে পর্যন্ত না। দেখবেন কিন্তু,—আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি।'

অবিনাশ জিভ কামড়ে কসম খেল। 'আরে ছি-ছি। কী যে বলেন মিসেস রায়। একথা কাক-পক্ষীতে টের পাবে না। শুধু আপনি বললেন, আমি শুনলাম আর জানবেন বদ্রীদাসবাবু। এ লাইনে একবার আসুন,—দেখবেন অবিনাশ সমাদ্দার সিক্রেট-নিউজের একটি আয়রন-সেফ। তার পেট থেকে খবর বের করতে হলে ছুরি-কাঁচি ধরতে হবে।'

ঘড়িতে সাড়ে আটটার মত। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবিনাশ উঠল। 'আপনি চিন্তা করবেন না। তলে-তলে আমি সব কাজ সেরে রাখছি। টাকাটা খুব শিগ্‌গির যাতে পান সেই ব্যবস্থা করব।'

খাটের উপর রোদে-শুকোনো গাছের গুঁড়ির মত নীপা টান-টান হয়ে শুয়েছিল। ঘরের মধ্যে জাল-বিছানো ছায়া-ছায়া অন্ধকার। খোলা জানালার ফাঁকে চার-পাঁচটি তারা চোখে পড়ে। রাস্তার আলোটা জ্বলেনি,—বাইরের নিমগাছের মস্ত ছায়াটার দিকে তাকালে কেমন ছমছমে আতঙ্ক লাগে।

অন্ধকার ঘরে নীপা চিন্তার স্রোতে ডুবছিল, ভাসছিল। নির্লজ্জ অমানুষটাকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। দুটি হাজার টাকা হাতে না পেলে সে ঠিক অম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। হি-হি করে হাসতে-হাসতে দ্বিগুণ কিম্বা তিনগুণ বাড়িয়ে তার কুৎসার কথা বলবে। তারপর শয়তানের নোংরা হাত বের করে লোকটা নীপার স্বামীর কাছ থেকে দু হাজার টাকা দাবি করবে। ঘুষ না পেলে কলঙ্কের কাহিনি ফাঁস করে দিতে সে দ্বিধা করবে না।

নীপা ভাবছিল অম্বরকে সব কথা বলবে। তার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ,—অনেক দিন আগেই স্বামীকে সব কিছু খুলে বলা তার উচিত ছিল। এতদিন গোপন রেখে নীপা ভীষণ একটা অন্যায় করেছে। শুধু স্বামী নয়,—মানুষ হিসাবে অম্বর যেন তার বিচার করে। জীবনে এমন ভুল তো কত মেয়ের হয়। ভালো ঘাট ভেবে চান করতে নেমে পাঁকে পা পড়ল। ভড়ভড়ে পাঁক,—দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে আসে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারলে কেউ কি আর পাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে? পায়ের কাদা ধুয়ে-মুছে সেই মেয়েই আবার ভালো ঘাট খুঁজে নেয়,—স্বচ্ছন্দ মরালীর মত হৃষ্টচিত্তে জলে নামে।

সব কথা মন দিয়ে শুনলে অম্বর নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবে। মনে-মনে নীপা বলছিল, স্বামীর কথা সে কোনোদিন ঠেলবে না। স্বামীর মতে চলবে, কোনোদিন অবাধ্য হবে না। সিনেমা-থিয়েটার, হই-হুল্লোড় কিছুতেই সে থাকবে না। অম্বর বললে সে কলেজ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারে। কি হবে ছাই পড়াশুনো করে? তারচেয়ে ঘর-সংসারে ডুবে থাকা অনেক সুখের। কনে-বৌয়ের মত

নীপা শুধু ঘরেই থাকবে।

চট করে অবিনাশ সমাদ্দারকে তার মনে পড়ল। লোকটা তাকে দু-হাজার টাকা অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করবে বলেছে। কিন্তু হাত পেতে অর্থ গ্রহণ করতে নীপার মন সায় দিচ্ছে না। ওর কাছ থেকে টাকা নেওয়া মানেই ফ্যাসাদ। চুক্তির কাগজে সই,—সিনেমায় নামতে অঙ্গীকার করা। তার মানেই জালে-বন্দী মাছের মত সম্পূর্ণ ফেঁসে যাওয়া। বউকে সিনেমায় নামতে দিতে অম্বর কিছুতেই রাজি হবে না। জেদ করলেই কুরুক্ষেত্র। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে তা নীপাও জানে না। রাগ চাপলে লোকটার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। হয়ত জোর করে মাথার সিঁদুর মুছে দিয়ে নীপাকে গলাধাক্কা দেবে। বলবে,—'দূর হও আমার সামনে থেকে। কোনোদিন এখানে মুখ দেখিও না।'

রাত্তিরে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে নীপা একটা কাণ্ড করল।......

অম্বর মরা মাছের মত শক্ত হয়ে পড়েছিল। পাশে শুয়ে নীপা খানিকক্ষণ উশখুশ করল। পা দুটো ঘষল। হাত দুটো টেনে হাই তুলল। ইচ্ছে করে একটা হাত স্বামীর বুকের উপর মেলে রাখল। কিন্তু অম্বর সাড়াশব্দ দিল না। নীপা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মানুষটা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। একটু সরে হাত দুটো দিয়ে গভীর আবেগে সে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। অম্বরের ঠোঁটে গালে পাগলের মত অজস্র চুমু খেতে লাগল।

স্ত্রীর আদরে-সোহাগে, উষ্ণ আলিঙ্গনে অম্বর কিন্তু গলল না। পাতলা ঠোঁটের স্বাদ পেয়ে তার বাঘের মত জেগে ওঠার কথা। কিন্তু অম্বর নিরুত্তাপ,—তেমনি চুপচাপ শুয়ে রইল।

স্ত্রী ক্ষান্ত হলে পর অম্বর চোখ খুলল। কোমল দুটি হাত সন্তর্পণে গলা থেকে সে নামিয়ে রাখল। বলল,—'ব্যাপার কী? খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছে তোমায়?'

চোখ নামিয়ে নীপা জবাব দিল,—'কে আমায় খুশি করবে? তুমি ছাড়া—'

—'তোমাকে খুশি করবার মত অনেক লোক আছে। আমার প্রয়োজন নেই।' অম্বর ব্যঙ্গ করে বলল।

—'ছাই জানো তুমি।' নীপা সুন্দর একটি ভ্রূ ভঙ্গি করল। 'মেয়ে-মানুষকে স্বামী ছাড়া আর কেউ খুশি করতে পারে না। আব পাঁচজন পুরুষ খুশি করে না, স্তুতি করে। ও হল ঝুটো পাথর। অবশ্য আসল পাথর না পেলে ঝুটো পাথরের দিকেই মন ঝুঁকবে।' নীপা আবার স্বামীর দিকে তাকাল।

—'ভনিতা রাখো।' অম্বর প্রাঞ্জল হতে চাইল। 'আসল কথা বলো। এত আদর-সোহাগ, ছল-চাতুরী কেন? সিনেমায় নামবার অনুমতি চাও, এই তো?'

কথার মধ্যে বুনো গাছ-গাছালির মত একটা কটু ঝাঁজ। বিরক্ত হলেও নীপা তা প্রকাশ করল না। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুধু হাসল। রহস্য করে বলল,—'ধরো, যদি নামতে চাই? তুমি মত দেবে তো?—'

অম্বর রাগের সঙ্গে বলল,—'ঘর-সংসার ছেড়ে বউ সিনেমা-থিয়েটার আমোদ-স্ফূর্তি করবে। ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে হই-হুল্লোড় করে বেড়াবে। আর স্বামী তাতে মদত দেবে, এই তুমি বিশ্বাস করো?'

—'সিনেমা-থিয়েটার মানে অভিনয়, আমোদ-ফূর্তি করা নয়। দশজনের সঙ্গে ঘুরলে-ফিরলেই কি দোষের হয়?' নীপা প্রতিবাদ করে বলল।

—'দোষ হয় কিনা তা পাঁচজনকে বরং জিজ্ঞাসা কোরো?' অম্বর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল। 'সিনেমার ওই আড়কাঠিটিকে এবার ঘরে ঢুকতে দেখলে আমি কিন্তু গলাধাক্কা দেব।'

আলোচনাটা অন্য খাতে বইছে দেখে নীপা শঙ্কিত হল। কিন্তু উপায় নেই। কয়েক দিন ধরেই

ছাই-চাপা আগুনের মত অম্বর অন্তরে জ্বলছিল। এখন মুখোমুখি হতেই সে মরীয়া। কথার মোড় ঘোরাতে নীপাও অপারগ।

বিছানার উপর উঠে বসল অম্বর। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। প্রায় ধমক দিয়ে সে বলল,—'তোমাকে আমি সাফ কথা বলে দিচ্ছি নীপা। সিনেমা-থিয়েটারে নেমে ধিঙ্গিপনা করা আমি বরদাস্ত করব না। যা করেছ এই ঢের,—কিন্তু আর নয়। এইবার থাম, ঘর-সংসারে মন দাও।'

বিশ্রী কথার ঢঙ। নীপার গা জ্বলে উঠল। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে সেও তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে বসল। 'তুমি ভেবেছো কী? স্বামী হয়েছ বলে যা খুশি তাই হুকুম করবে। আজেবাজে কথা বলে অপমান করতে চাও? ধিঙ্গিপনা কীসের দেখলে? দিন দশ-পনেরো মোটে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি,—তাইতেই তুমি ভাবছো যে বউ একেবারে রসাতলে গেল।'

—'হ্যাঁ, তাই ভাবছি!' অম্বর দাঁতে-দাঁত চেপে বলল। 'তোমাকে সিনেমা-থিয়েটারের হিরোইন করব বলে আমি বিয়ে করিনি। আর পাঁচটা পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে ঢলানি করে বেড়াবে তাও ভাবিনি। থিয়েটারের ডিরেক্টর তোমার বিশেষ বন্ধু। এক ট্রেনে দুজনের কলকাতা যাওয়া-আসা। এসব কি ভদ্রঘরের বউ মানুষের কাজ? আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ?'

—'চুপ করো।' নীপা মুখ কুঁচকে তাকাল। 'তোমার নোংরা ছোট মন। ইতর ছোটলোকের মত কথা। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এমন অসভ্য ভাষা কেউ উচ্চারণ করে না।'

—'কী বললে?' অম্বর চেঁচিয়ে উঠল।

—'ঠিকই বলছি।' নীপা জবাব দিল। 'রাত দুপুরে আর গলাবাজি করো না। পাড়ার লোকে জেগে উঠলে তোমাকেও ছেড়ে কথা বলবে না' একটু থামল নীপা। জেদি ঘোড়ার মত ঘাড় শক্ত করে ফের বলল,—'আমার কথাও তুমি জেনে রাখো। অবিনাশবাবুকে আমি কথা দিয়েছি। তাঁর বইতে আমি অভিনয় করব। সামনের শনিবারেই কন্ট্র্যাক্টে সই হবে।'

বউয়ের স্পর্ধা দেখে অম্বরের রাগে ফেটে পড়ার কথা। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সে সংযত করল। বিষধরের হিসহিসানির মত তার ভারী নিশ্বাস পড়ল। চোখের ভাষা ক্রূর, নাসিকার অগ্রভাগ ঈষৎ স্ফীত দেখাল। চোখ দুটো প্রায় কপাল পর্যন্ত তুলে সে বলল,—'তোমার মত শয়তানিকে আমি জব্দ করতে জানি। সিনেমায় নামা বের করছি দাঁড়াও। দরকার হলে তোমাকে',—অম্বর দাঁতে-দাঁত ঘষল।

—'কী করবে বলে ফেলো।' নীপা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করল। 'বউকে মারধোর করবে, তাকে খুন করতে চাও?'

অম্বর শক্ত হয়ে রইল। কোনো জবাব দিল না।

নীপা প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'তোমার যা খুশি করতে পারো। আমি পরোয়া করি না। পরশু কাকা এলেই আমি বাড়ি বিক্রির ফাইনাল করব। তারপর ওর সঙ্গেই কলকাতা চলে যাব। তুমি আইন-আদালত যা খুশি করতে পার। দেখি, আমাকে কেমন করে আটকাও।'

সকালে চায়ের টেবিলে বসে অবিনাশ বলল,—'সুরপতি, একটা নিবেদন ছিল আমার।'

সম্বোধন শুনে দেবরাজ হাসল। 'ব্যাপার কী হে? সাত-সকালেই এমন তেলতেলে ভাষা। ভনিতা ছেড়ে আসল কথা বলো।'

অবিনাশ বুঝল ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। কাজ কতদূর এগোল দেবরাজ তাই জানতে চায়। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সে বলল,—'কিছু মালকড়ি দরকার ছিল ব্রাদার।'

ভ্রূ কুঁচকে দেবরাজ তাকাল। 'কত টাকা চাই?' সে স্পষ্ট জানতে চাইল।

—'আড়াই হাজার।' অবিনাশ ফস করে বলে ফেলল। শ'পাঁচেক টাকা সে হাতে রাখতে চায়।

—'এত টাকা হঠাৎ?'

—'ময়না কথা বলেছে যে। কন্ট্র্যাক্টে সই করতে রাজি। তবে এই টাকাটা অ্যাডভান্স চায়।'

—'এতগুলো টাকা? দেবরাজ বিড়বিড় করে বলল, 'হঠাৎ অগ্রিম নেবার তাড়া কেন ওর?'

'কি জানি।' অবিনাশ টেবিলের উপর হাত দুটো প্রসারিত করে বলল। —'মনে হল টাকাটা ওর খুব দরকার। তবে মেয়েটা ভীষণ চাপা। কে জানে কোথায় ফেঁসে আছে ছুঁড়ি।'

দেবরাজকে চিন্তিত দেখাল। দোমনা খদ্দেরের মত ইতস্তত ভাব। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল,—'বড্ড বেশি দাম লাগছে না অবিনাশ।'

—'কী করবে বলো ইয়ার। এ হল তোমার গেরস্থ ঘরের কুলবধূ,—যাকে বলে সোনার পাখি ময়না। কিনতে হলে মোটা কিছু খসবে বৈকি। তবে তোমার ভয় নেই। কোম্পানিতে তুমি যে টাকাটা ঢালবে বলেছ, এটা তার সঙ্গেই খাইয়ে দেব।'

—'তা ঠিক।' দেবরাজ হেসে বলল, 'কিন্তু দেখো, শিকলি কেটে পাখি যেন না উড়ে যায় আবার।'

—'খেপেছ তুমি। আমার একেবারে আঁটঘাট বেঁধে কাজ। অবিনাশ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল,—'তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি শোনো। মঙ্গলবার থেকে অম্বর রায় রাত্তিরে বাড়ি থাকছে না। সুন্দরীকে একলা শয্যায় নিশিযাপন করতে হবে।'

—'মাইরি? এ খবর তুমি কোথায় পেলে—' দেবরাজ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

—'ঘোড়ার মুখের খবর নয় হে। একেবারে হিজ ম্যাজেস্টিস ভয়েস। অম্বর রায় আমাকে নিজে বলেছে। হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে সাত দিন তার নাইট ডিউটি। দুজন ডাক্তার নাকি একসঙ্গে ডুব দিয়েছে। রাত দুপুরে হঠাৎ কেস এলে কিম্বা হাসপাতালে কোনো রোগীর দরকার হলে একজন পাকাপোক্ত ডাক্তার তো চাই।'

দেবরাজ এবার নিশ্চিন্ত হল। 'তাহলে তো পাকা খবর।'

অবিনাশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করল। মুচকি হেসে বলল,—'কাল রাত্তিরে নীপা রায় তোমার খোঁজ নিচ্ছিল দেবরাজ।'

—'মাইরি অবিনাশ? তুমি সত্যি বলছ? —উৎসাহে দেবরাজের চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল।

—'সত্যি নয় মানে? একেবারে বর্ণে-বর্ণে সত্যি। উনি আমাকে বললেন দেবরাজবাবু এলেন না কেন? তা আমি আর কথাটা গোপন করলাম না। বললাম দেবরাজের ইচ্ছে ছিল আসবার। কিন্তু ওই গায়ে-পড়া মেয়েটা গিয়ে হাজির। সব প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিল।'

বিরক্ত মুখ করে দেবরাজ বলল,—'যা বলেছ। চৈতি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। কবে ওর সঙ্গে দুটো কথা বলেছি। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সামান্য এদিক-ওদিক গেছি। আর ও ভেবেছে ছুঁড়ির প্রেমে আমি চক্কর খাচ্ছি। যত সব বোগাস আইডিয়া।'

—'কী করবে আর। মেয়েটাকে নাই দিয়েছো,—ঠ্যালা সামলাও এখন।'

দেবরাজ মুঠো পাকিয়ে বলল,—'আর নয়। এবার ওকে দাওয়াই দিতে হচ্ছে। নইলে ছিনে-জোঁকের মত ও ঠিক লেগে থাকবে। গলাধাক্কা দিলেও দূর হবে না।' কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ চিন্তা করল দেবরাজ। পরে কিছুটা স্বগতোক্তির মত বলল,—'হাতের কাছে তেমন কেউ ছিল না বলে কদিন ওকেই একটু নেড়েচেড়ে দেখলাম। কিন্তু দূর,—ও একটি পানসে চিজ। মাইরি বলছি অবিনাশ, চান্স পেয়েও ওকে কোনোদিন আমি ঠুকরে দেখিনি।'

—'আবে ধুত্তোর। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কদিন একটু আলগা দাও, মুখ ফিরিয়ে থাকো। তাহলেই ও কেটে পড়বে। ওর চোখ দুটো শুধু তোমার উপরই নেই বন্ধু,—আরো লোক আছে।'

চেয়ার থেকে উঠে দেবরাজ বলল,—'আমি ভাবছি একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

অবিনাশ হাসল। দেবরাজ কোথায় যাবে তা সে জানে। নির্ভুল অঙ্ক কষার মত বলে দিতে পারে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে সময়টা দেখল। নটার কাছাকাছি। বলল,—'ভালো সময় হে। ডাক্তার হাসপাতালে গেছে। তুমি নির্ভাবনায় শ্রীরাধিকার কুঞ্জে চলে যাও। তবে সাবধান,—যা বলেছি তা যেন ফাঁস করো না। তাহলে কিন্তু সব গুবলেট হয়ে যাবে।'

বাড়ির লাগোয়া গ্যারেজ। দেবরাজ ওর ছোট গাড়িখানা বের করল। অল্প একটুখানি পথ। গাড়ির তেমন প্রয়োজন নেই। স্বচ্ছন্দে পায়ে হেঁটে বা রিকশতে যাওয়া চলে। কিন্তু দেবরাজের মনে হল জামা, প্যান্ট, পায়ের জুতোর মত গাড়িটাও একটা সাজ। তার মর্যাদার স্বাক্ষর। সুতরাং নিয়ে যেতে হয়।

পথে লোকজন......মফঃস্বল শহরের অপরিসর রাস্তাঘাট। দেবরাজ মন্দগতিতে ড্রাইভ করছিল। হঠাৎ কে যেন পাশ থেকে তার নাম ধরে ডাকল। নারীকণ্ঠ। গাড়ি থামিয়ে পিছনে তাকাতেই দেবরাজ দেখতে পেল। চৈতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

—'কোথায় যাচ্ছ দেবরাজদা?' চৈতি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

সিটে বসেই দেবরাজ বলল,—'দরকার আছে এক জায়গায়। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

—'গানের মাস্টারমশায়ের বাড়ি।' চোখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে চৈতি বলল,—'অনেকটা পথ। তুমি আমায় একটু লিফ্‌ট্ দাও না দেবরাজদা।'

দেবরাজ মাথা নাড়ল। 'উহুঁ আমি অন্য দিকে যাব। ওদিকে নয়।'

—'কোথায় যাবে? আমাকে নামিয়ে দিয়ে না হয় একটু ঘুরেই গেলে। কত আর তেল পুড়বে তোমার—' চৈতি মুখখানা করুণ করে তাকাল।

এবার ইচ্ছে করেই ওকে আঘাত করল দেবরাজ। 'মিসেস রায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বিশেষ দরকার। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে চৈতি—' দেবরাজ গাড়িতে স্টার্ট দিল।

চৈতি মুখখানা কালো করে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তা দিয়ে একটা রিকশা যাচ্ছিল। চৈতিকে দেখে গাড়িটা প্রায় থামল। রিকশার দিকে একবার তাকিয়েই সে উঠে বসল। চালককে গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দিল।

গানের মাস্টারের বাড়ি নয়,—চৈতি এল হরিপ্রকাশের কোয়ার্টার্সে। পলাশপুরে মেডিক্যাল কলেজ আছে,—হরিপ্রকাশ সেখানেই জুনিয়র হাউস-সার্জন।

ইনজেকশনের একটা অ্যামপিউল ভেঙে সিরিঞ্জে ভরছিল হরিপ্রকাশ। কাছেই একটা আধবুড়ো লোক বসে। সম্ভবত তাকেই দেবে।

চৈতির মুখের দিকে তাকিয়ে হরিপ্রকাশের খটকা লাগল। কেমন গোমড়া, থমথমে মুখ। হরিপ্রকাশ দেখল ইনজেকশনের সিরিঞ্জটার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চৈতি। নিবিষ্ট মনে কিছু ভাবছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই সে মুখ তুলে তাকাল। চোখের ইঙ্গিতে ওকে কাছে ডাকল। বলল,—'তোমার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে হরিপ্রকাশ।'

ছয়

ফার্স্ট পিরিয়ডে নীলাদ্রির ক্লাস।

ঘড়িতে মোটে সাড়ে নটা। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই আসেনি। ক্লাস অবশ্য দশটায়। আর এই আধঘন্টা ঢের সময়। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ার মত এখনই দু-একজন ছাত্র আসতে শুরু করেছে। আর একটু পরেই বড় বড় ফোঁটা,—অর্থাৎ তখন ওরা দলে দলে কলেজে ঢুকবে। অধিকাংশ পায়ে হেঁটে, কেউ বা সাইকেলে। অধ্যাপক এবং ছাত্রীদের অনেকের সঙ্গে সাইকেল-রিকশার বন্দোবস্ত আছে। মাসকাবারে চুক্তি করা টাকা দেওয়া নিয়ম। কলেজের গেটের কাছে তাদের নামিয়ে দিয়ে রিকশাগুলি আবার নতুন যাত্রীর খোঁজে দ্রুতগতিতে ছোটে।

কমনরুমে ঢুকে নীলাদ্রি কাউকে দেখতে পেল না। বারান্দার এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে হলধরের সন্ধান করল। হলধর কলেজের বেয়ারা এবং সাধারণত প্রফেসরদের বিশ্রাম-ঘরেই তার থাকবার কথা। নীলাদ্রির ইচ্ছে করছিল এক গ্লাস জল খায়। সকাল থেকে কেমন ভ্যাপসা গরম। এই পথটুকু হেঁটে আসতে সে বেশ ঘেমে উঠেছে। এখন নিজেকে রীতিমত তৃষ্ণার্ত মনে হচ্ছে তার। এক গ্লাস জল পেলে কিছুটা অবসাদ কাটত। কিন্তু হলধর অনুপস্থিত। সুতরাং কলসীতে সম্ভবত জল ভর্তি করা হয়নি। হয়ত গতকালের জল কিছুটা পড়ে থাকবে। কিন্তু নীলাদ্রি বাসি জল খেতে রাজি নয়। টাটকা জল না পেলে, সে বরং তৃষ্ণা সইতে পারবে।

ফুলফোর্সে পাখা ঘুরিয়ে দিয়ে নীলাদ্রি একটু জিরিয়ে নিল। হাত-পা ছড়িয়ে বসে মিনিট দুই-তিন আয়েস করল। কিন্তু তারপরই সে উঠল। ঘরে কেউ নেই,—কমনরুমের জানালা দিয়ে নীলাদ্রি বাইরে তাকাল। প্রকাণ্ড কম্পাউন্ড, সবুজ মাঠ জুড়ে ঝলমলে রোদের আসর। এখানে-সেখানে গাছের স্নিগ্ধ ছায়া। মাথা উঁচু দেবদারু......খোলা ছাতার মত আমগাছের আকৃতি। পথের পাশে কোথাও পাতাবাহারের বিচিত্র সাজসজ্জা। মাঝে মাঝে দু-একটা সুদৃশ্য কৃষ্ণচূড়াও চোখে পড়ে। বর্ষার জল-হাওয়া পেয়ে বোগেনভিলিয়ার ঝাড়টা জীবনের লাবণ্যে সতেজে বেড়ে উঠেছে।

নীলাদ্রি কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না। তার দৃষ্টি পথের উপর। কলেজের গেট পেরিয়ে ছেলেমেয়ে ঢুকছে। মাঠের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটছে ওরা,...এগিয়ে আসছে। ছেলেদের ক্ষিপ্র এবং দীর্ঘ পদক্ষেপ,...মেয়েদের গতি ছন্দোময়, সুন্দর। নীলাদ্রির দু'টি চোখ নীপাকে খুঁজছিল। ফার্স্ট পিরিয়ডে নীপারও ক্লাস, নীলাদ্রি তা জানে। ওর রুটিনটা প্রায় মুখস্থ তার। সোমবার প্রথমেই নীপার অনার্সের ক্লাস। মঙ্গলবারে ইংরেজি...বুধবারেও তাই। আর সব দিনগুলো অনার্স দিয়ে শুরু। সুতরাং নীপাকে আসতেই হবে। অনার্সের ক্লাস ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ মিস করতে চায় না।

পথের উপর দেখা না পেলেও, নীপার মুখটা অ্যাকোয়ারিয়ামের লাল-নীল রঙের মাছের মত ওর মনের পর্দায় কতক্ষণ ভেসে বেড়াল। হাসি-খুশি, চকচকে উজ্জ্বল দৃষ্টি। নীলাদ্রি চিন্তা করছিল। স্বামীর সংসার, গেরস্থালি ছাড়তে নীপা কি ভয় পাচ্ছে? নইলে তার সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধতে ওর এত ভাবনা কীসের? আর আসলে স্বামী মানেই তো একটি পুরুষ। তার সান্নিধ্যে এলেই স্নিগ্ধ ছায়ার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কিন্তু সেই আশ্রয়ই যদি উত্তপ্ত, রৌদ্রময় হয়ে ওঠে তবে সেখানে থেকে আর লাভ কী? ছায়াটুকু সরে গেলে আশ্রয়ের আর কী বাকি রইল? নীলাদ্রির মনে হল নীপা একটু বাড়াবাড়ি করছে। তার সঙ্গে অনেকদূর এগিয়েছে নীপা,—অনেকখানি পথ গেছে। তাদের কলকাতার আলাপ-পরিচয়ও এতদূর গড়ায়নি। এখন এই দোমনা-ভাবের কোনো অর্থ হয় না।

এই পলাশপুরে এসে ওকে নতুন করে পেল নীলাদ্রি। প্রথমে কলেজের করিডরে দেখাশোনা, অল্প একটু কুশল বিনিময়। তারপর সাহস করে নীলাদ্রিই এগিয়ে গেল। বিয়ের পরেও নীপা

যে এমন অসুখী, নীলাদ্রি ওর চোখ-মুখ দেখে এতটুকু আন্দাজ করতে পারেনি। ফলে অগ্রসর হতে, তাকে একবারও হোঁচট খেতে হল না। একদিন চোখাচোখি হতেই নীপা তার দিকে চেয়ে ফিক করে হাসল। এবং সাড়া দিতেও দেরি করল না।

মিনিট পনেরো সময় একভাবে কাটিয়ে নীলাদ্রি বেশ অধৈর্য হল। ভিড় করে পড়ুয়ারা আসছে। কত মেয়ে, ...ডিমালো, গোল এবং লম্বাটে ধরনের মুখ। কারো পরনে রঙবাহার শাড়ি, চিত্তাকর্ষক সাজগোজ। নীলাদ্রি মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। তবে কি নীপা আজ ডুব দিয়ে রইল? কিংবা তাড়াহুড়োতে ফার্স্ট পিরিয়ডের জন্য সে তৈরি হতে পারেনি?

ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনে নীলাদ্রি পিছন ফিরল। সে ভেবেছিল অধ্যাপকেরা কেউ এসেছেন। নাহলে হলধর তো নির্ঘাত। বড়জোর কোনো উৎসাহী ছাত্র। প্রফেসরদের বিশ্রাম ঘরে আর কে হানা দিচ্ছে?

কিন্তু সামনে তাকিয়ে নীলাদ্রি প্রায় চমকাল। খোদ প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বেয়ারা বিষ্টুচরণ। নিশ্চয়ই তাকে কিছু বলতে চায়। সাত সকালে প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ তাকে তলব করতে গেলেন কেন?

নীলাদ্রি বলল,—'কী খবর বিষ্টুচরণ? প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ডেকেছেন বুঝি?'

—'আজ্ঞে না', বিষ্টুচরণ মাথা নেড়ে জবাব দিল। 'আপনার টেলিফোন এসেছে। একটু তাড়াতাড়ি যান।'

—'টেলিফোন!' নীলাদ্রি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। কে তাকে টেলিফোন করবে এখানে? হতে পারে, শিমুলপুর স্টেশনে নেমে বন্ধু-বান্ধবরা কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। কিংবা কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল, অথবা নাটকের উদ্যোক্তরা কেউ কথা বলতে চায়। নীলাদ্রি আর দেরি না করে বিষ্টুচরণের পিছু নিল।

টেলিফোনটা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। ভাগ্য ভালো বলতে হয়, ঘরের মালিক অনুপস্থিত। এখনও প্রিন্সিপ্যাল এসে পৌঁছোননি। নইলে অন্যের ঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরা মানেই তো এক ঝকমারি। মনের কথা প্রকাশ করার উপায় নেই,—কোনোমতে হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ সারতে হবে। একটু অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে গেলেই তৃতীয় ব্যক্তির কানে তা নিঃশব্দে প্রবিষ্ট হবে। গোপনীয় বলতে কিছুই থাকবে না।

টেলিফোন তুলে নীলাদ্রি পরিষ্কার বলল,—'হ্যালো, কে বলছেন?'

অপর প্রান্ত থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠ ভেসে এল,—'আপনি কি নীলাদ্রি সেন?'

—'হ্যাঁ, আমি নীলাদ্রি বলছি। কিন্তু আপনি কে?'

—'আমি?' অল্প একটু থেমে সে খিলখিল করে হেসে উঠল। নীলাদ্রি খুব অবাক হল। কে তাকে টেলিফোন করছে? নিজের নাম বলতে গিয়ে ও অমন হেসে উঠল কেন?

টেলিফোনের অন্য দিক থেকে সে বলল,—'নীলাদ্রিবাবু, আপনি তো নীপা রায়কে চেনেন?'

নীলাদ্রি একটু লজ্জিত হয়ে বলল,—'হ্যাঁ, চিনি বই কি। কিন্তু কেন বলুন তো?' নীলাদ্রি একটু সজাগ হল।

—'উনি আপনাকে এখুনি একবার যেতে বললেন। বিশেষ দরকার আছে।' নীলাদ্রিকে সে অনুরোধ জানাল।

—'এখুনি? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? মানে আমার যে একটা ক্লাস আছে।'

টেলিফোনের তারে আবার হাসির ঝঙ্কার ভেসে এল।

—'আচ্ছা পুরুষমানুষ তো আপনি। একটি মেয়ে খুব দরকারে পড়ে আপনাকে ডাকছে, আর কলেজের ক্লাস নেওয়াই বড় হল আপনার কাছে!'

নীলাদ্রি একটু লজ্জিত হয়ে বলল,—'না-না, ঠিক সে কথা নয়। আচ্ছা দেখছি, যদি ম্যানেজ করে যেতে পারি।'

—'যদি নয়, কাইন্ডলি এখুনি একবার যান। মিসেস রায়ের বাড়িতে তো টেলিফোন নেই। নাহলে, হয়তো উনি নিজেই আপনাকে ফোন করতেন।' একটু থেমে সে ফের বলল,—'আমি এই মাত্রর আসছি ও বাড়ি থেকে। আপনি না গেলে উনি হয়তো ভাববেন টেলিফোন করতে আমি ভুলে গেছি।'

নীলাদ্রি বলল,—'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কষ্ট করে আপনি টেলিফোন করেছেন।'

—'তাতে কী হয়েছে? এ কি খুব শক্ত কাজ? কিন্তু আপনি না গেলে আমি ভীষণ দুঃখ পাব। মনে করব আমার কথার আপনি গুরুত্ব দিলেন না।'

কথায় ভদ্রমহিলা ঠিক ফেনার মত উচ্ছল। ওর চপল, রিন-রিনে কণ্ঠস্বর নীলাদ্রির ভালো লাগল, টেলিফোনের মুখটা প্রায় ঠোঁটের কাছে এনে সে গলা নামিয়ে বলল,—'আপনি মন খারাপ করবেন না। আমি সেখানে যাচ্ছি।'

—'যাচ্ছেন? আঃ—বাঁচালেন। মিসেস রায় তাহলে আর আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

নীলাদ্রি কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় করে বলল,—'আপনার নামটা কিন্তু এখনও আমাকে বলেননি।'

জলতরঙ্গের টুং-টাং বাজনার মত মিষ্টি, ঝিরঝিরে হাসি রিসিভারে শুনতে পেল নীলাদ্রি। পুনরায় নারীকণ্ঠ,—কিন্তু এবার পরিহাসতরল। টেলিফোনে সে বলল,—'কী হবে একটি মেয়ের নাম শুনে? আপনার ধ্যান-জ্ঞান জপমন্ত্র,—সে তো অন্য একটি নাম। তার কথাই বরং ভাবুন।'

—'কী যে বলেন আপনি।' নীলাদ্রি মৃদু প্রতিবাদ করতে চাইল।

—'আমি ঠিকই বলছি নীলাদ্রিবাবু। নাটকের পিছনে আরো একটা নাটক হচ্ছে। অনেকে না জানলেও আমি তার সংবাদ রাখি। সে নাটকও জমে উঠেছে। নেপথ্য-নায়ক, নেপথ্য-নায়িকা সবাই খুব ব্যস্ত এখন। একটা ক্লাইম্যাক্সও হবে। নীলাদ্রিবাবু একটা কথা শুনবেন আমার?'

—'কী কথা বলুন না।'

—'আপনি একটু সাবধান থাকবেন। জানেন তো, জীবন বড় বিচিত্র। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।'

—'তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি? এই হেঁয়ালি করার কি অর্থ?' নীলাদ্রি একটু বিরক্ত হল।

সে বলল,—'আপনি দেখছি রেগে যাচ্ছেন। কিছু মনে করবেন না আমার কথায়, প্লিজ।'

নীলাদ্রি শান্ত হল। কিন্তু তার বিস্ময় কাটল না। ভদ্রমহিলা কী বলতে চায় তাকে? সম্ভবত পরিচয় দিতেও আপত্তি তার। চুলোয় যাক গে। ওর নাম-ধাম নীপার কাছে জেনে নেওয়া সহজ হবে। মিছিমিছি জোর করে লাভ নেই।

নীলাদ্রি একটু হেসে বলল,—'আপনি দেখছি অনেক খোঁজ-খবর রাখেন। যাই হোক, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ এখন হল না। যদি কখনও হয় এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে নীলাদ্রি ঘর থেকে বেরোল। দশটা বাজতে সামান্য দেরি। ক্লাসরুম আর করিডরে এখন বাজার-হাটের দশা। হইচই, চেঁচামেচি। চটুল একটা গানের সুর নীলাদ্রির কানে ভেসে এল। নিশ্চয় কোনো উঠতি রোমিওর কাজ। গানের কলি ভেঁজে একটি মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

নীলাদ্রি আর দেরি করল না। কাউকে কিছু বলতে গেলেই এখন নানা কৈফিয়ত দাও। তার চেয়ে চুপি-চুপি কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের পরিচয়। পরে একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেই চলবে। প্রফেসর নেই বলে অমন কত ক্লাস কলেজে ফাঁকা যাচ্ছে।

সাইকেল রিকশাটা একটু দূরে ছেড়ে দিল নীলাদ্রি। এবার সে পায়ে হেঁটে এগোল। পথে লোকজন বেশি। কোর্ট-কাছারি, স্কুল-কলেজের সময়। দিনের বেলায় সে কোনোদিন এ বাড়িতে আসেনি। নীলাদ্রি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে হাঁটছিল। তার কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কিংবা পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা হতে পারে। তখন কুশল-বিনিময়, এদিকে সে কোথায় যাবে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের বেড়া ডিঙোতে তার প্রাণান্ত হবে।

খানিক দূর থেকেই নীলাদ্রি দেখতে পেল। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তার বাঁয়ে একটা গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছে। ডাক্তার রায়ের নিজস্ব গাড়ি নেই,—নীলাদ্রি তা জানে। তাহলে গাড়িটা কার? তার নিজের মনেই প্রশ্নটা উঠল। হবে কোনো লোকের। কাজকর্মে এদিকেই কোথায় এসেছে। গাড়িটা রেখে নিশ্চয় কোথাও গিয়ে থাকবে। নীলাদ্রির মনে হল মোটরগাড়িটা সে আগেও দেখেছে। সে ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক চিন্তা করেও মরা অতীতের মস্ত ফ্রেমের মধ্যে গাড়িটাকে কোথাও খুঁজে পেল না।

দরজাটা বন্ধ, বাইরের ঘরে সম্ভবত কেউ নেই। নীলাদ্রি খুব সন্তর্পণে রোয়াকের উপর উঠে এল। সে ভাবছিল হঠাৎ নীপা তাকে ডেকে পাঠাল কেন? অসময়ে নীপার এই আহ্বান কেমন বিচিত্র, অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে। ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি তার। টেলিফোনে সেই অচেনা ভদ্রমহিলা একটা মোক্ষম রসিকতা করলেন না তো—

নীলাদ্রি একটু ইতস্তত করছিল। বাড়ির মধ্যে কে রয়েছে তার জানা নেই। দরজায় টোকা দেবে কিনা ভাবল সে। কী খেয়াল হতে নীলাদ্রি দু'পা এগিয়ে গেল। এসে দাঁড়াল শোবার ঘরের জানালার কাছে। মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে সে উঁকি দিয়ে দেখল। আর সেই মুহূর্তে আচমকা একটা শক্ খাওয়ার মত তার দেহের সমস্ত রক্ত-কণিকা নেচে উঠতে চাইল। জানালার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখল নীলাদ্রি। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নীপা দাঁড়িয়ে আছে। অলস-নায়িকার মত ভঙ্গি। তার একটা পা মেঝের উপর। অন্য পা'টি বাঁকাভাবে দেওয়ালে ভর করে আছে। হাত দুটি ভাঁজ করে বুকের উপর ছড়ানো। নীপার ঠিক সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে, তাকেও চেনে নীলাদ্রি। লোকটা খুব কাছ ঘেঁষে ফিস-ফিস করে কথা বলছে। নীলাদ্রি তাকিয়ে দেখল কেমন অনায়াসে নীপার একটা হাত সে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। নীপা কোনো বাধা দিল না, মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। তারপর মৃদুভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

নীলাদ্রির মনে হল যথেষ্ট হয়েছে। চুরি করে প্রেমলীলা দর্শনের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তার মাথাটা সীসের মত ভারী ঠেকল। কানের দুটো পাশ এখন গরম, বুকের মধ্যে ক্ষতের জ্বালা। নীলাদ্রি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল। নিজেকে সে বার বার ধিক্কার দিল। নীপা তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হতে পারে, এ যেন ধারণারও অতীত ছিল। নিজের উপর প্রচণ্ড একটা দুঃখবোধ হল তার। অন্তরে একটা শূন্যতার সৃষ্টি। আশ্চর্য! কি বোকা সে। এতদিন অযথা সময় নষ্ট করেছে।

খুব দ্রুতগতিতে হাঁটছিল নীলাদ্রি। রাস্তার পাশে সেই মোটরগাড়িটা তখনও রয়েছে। এতক্ষণে তার মনে পড়ল। গাড়িটার মালিককে সে একটু আগেই দেখেছে। দেবরাজ মিত্র,—নাটকের সুদর্শন নায়ক। টেলিফোনে একটু আগে শোনা কথাটা ফের মনে পড়ল তার। নাটকের পিছনে আরো একটা নাটক হচ্ছে। কে জানে নেপথ্যে কতদিন ধরে নায়ক-নায়িকা এই নাটকেরও মহলা দিচ্ছে।

পাশ দিয়ে একটা রিকশা যাচ্ছিল। খালি রিকশা। হাত বাড়িয়ে নীলাদ্রি সেটা থামাল। সে ভাবল দুপুরেই কলকাতা যাবে। পলাশপুর বিশ্রী পানসে লাগছে তার কাছে। একটা ভগ্ন পরিত্যক্ত রাজপুরীর মত সে নিঃসঙ্গ। অলক্ষ্যে দেবরাজ কখন তাকে নিদারুণ বজ্র দিয়ে আঘাত করেছে।

কালো একখণ্ড মেঘ এসে সূর্যকে আড়াল করল। নীলাদ্রি মাথা তুলে দেখল। রৌদ্রহীন, ছায়াময়

পৃথিবী। শক্ত পাথরের মূর্তির মত আসনে বসে রইল নীলাদ্রি। তার কপালের পাশে রগ দুটো তখনও দপদপ করছিল।

গুন গুন করে গান করছিল দেবরাজ। একটু আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন। একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে দেবরাজ পরম সুখে চোখ বুজল।

ঘরের ভিতর থেকে অবিনাশ বলল,—'ব্যাপার কি হে সুরপতি? প্রাণপাখি আজ হঠাৎ গান গেয়ে উঠল কেন?'

—'তার মানে?' দেবরাজ হেসে উঠল, 'এক কলি গান গাইতে শুনে তোমার অমনি জল্পনা শুরু হয়ে গেল।'

অবিনাশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে বুশ-শার্ট। কোথাও বেরোবার জন্য সে তৈরি।

দেবরাজ ওর দিকে তাকিয়ে বলল,—'কী হল, কোথায় চললে আবার?'

চোখ নাচিয়ে অবিনাশ বলল,—'ঘনশ্যাম পিকচার্সের অফিসটা একবার তদারক করে আসি। নইলে হুট করে মেয়েটাকে তুলব কোথায়? বদ্রীদাসবাবুকেও কথাটা বলা দরকার। না হলে সব ভেস্তে যেতে পারে।'

ইঙ্গিতটা দেবরাজ বুঝল। ভ্রূ কুঁচকে সে বলল,—'ফিরবে কখন?'

—'কাল সন্ধেয়। পরশু সকালেও হতে পারে।'

দেবরাজ ইশারা করে ওকে কাছে ডাকল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় কিছু বলল। অবিনাশের মুখখানা পালিশ-করা সোনার গয়নার মত উজ্জ্বল দেখাল। ছুরির ফলার মত ধারালো চাউনি। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—'মাইরি। তবে তো কেল্লা ফতে।'

দেবরাজ হান হাতের তর্জনী তুলে ঠোঁটের কাছে রাখল। বলল,—'চুপ করো অবিনাশ। আর একটি কথাও নয়। এই সবে সকাল। এখনও অনেক দেরি।'

অবিনাশ বন্ধুর থুতনিটা স্পর্শ করে অদ্ভুত হাসল। বলল,—'আহা! কালাচাঁদ, তোমারই জয়জয়কার।'

চেয়ার ছেড়ে একবার ঘরে গেল দেবরাজ। চেকটা আগেই লিখে রেখেছিল। সেটা অবিনাশের হাতে তুলে দিয়ে বলল,—'তোমার সেই টাকাটা। কলকাতা যাচ্ছ, ভাঙিয়ে নিও। দেখো, যা বন্দোবস্ত করার তা যেন ঠিক থাকে।'

সযত্নে চেকটা পকেটে রাখল অবিনাশ। বলল—'তুমি বেকার চিন্তা করো না দেখি। কাজের ভার যখন আমায় দিয়েছ, তখন চিন্তাটাও আমার থাক।'

ঘন্টাখানেক পরে অবিনাশ শিমুলপুর স্টেশনে এল। লোকাল ট্রেনটা সবে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে। কামরাগুলো এখনও ফাঁকা। অল্প কিছু যাত্রী গাড়িতে উঠে বসেছে। ইচ্ছে করলে যে কোনো একটা কামরায় অবিনাশও উঠে পড়তে পারে। কিন্তু সে তা করল না। ট্রেনটার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল। সমস্ত কামরা দেখে অবিনাশ রীতিমত নিরাশ হল। সুন্দরী তো দূরের কথা, সুশ্রী দেখতে এমন কাউকেও তার চোখে পড়ল না। অবিনাশের এই বদভ্যাস। সুন্দরী সহযাত্রিনী না পেলে রেলভ্রমণই বিস্বাদ লাগে।

টালিগঞ্জে ঘনশ্যাম পিকচার্সের অফিস।

দোতলার উপর সওয়া শ বর্গফুটের একখানা ঘর। ফিল্ম কোম্পানির অফিস বটে,...কিন্তু হতশ্রী, অচল অবস্থা। রঙচটা দেওয়াল, সিলিঙে ঝুল,...আসবাবপত্র মলিন। জানালা দরজার পর্দাগুলি

পর্যন্ত ময়লা, জীর্ণ। দেখলেই বোঝা যায় সেগুলি বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে অবিনাশ বলল,—'খবর কি বদ্রীদাস?'

কালো হোঁৎকা-মতন একটা লোক মুখ তুলে তাকাল। লোকটার চোখে বিস্ময় এবং বিমর্ষভাব, —দুই-ই। সে বলল,—'সংবাদ ভালো নয় হে। পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির। এবার দরজায় তালা লটকে দিয়ে সরে পড়ব ভাবছি।'

—'পাগল হয়েছ।' অবিনাশ ওকে উৎসাহিত করতে চাইল। 'সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। সরো দেখি,—একটা টেলিফোন করতে দাও।'

লোকটা ম্লান হাসল। টেবিলের উপর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত প্রসারিত করে সে বলল,—'কাল দুপুরে টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিয়ে গেছে।'

—'তাই নাকি?' অবিনাশ চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল। তাহলে তো কঠিন অবস্থা।' মুখটা গম্ভীর করে সে কি ভাবতে লাগল।

বদ্রীদাস বলল,—'কী সব ব্যবস্থা করে এসেছ বলছিলে।'

—'হুম্।' অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। 'এদিকে সেদিকে ঘুরে ঘরখানা সে ভালো করে জরিপ করল। খানিক পরে স্বগতোক্তির মত মন্তব্য করল,—আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে বদ্রীদাস।'

—'তার মানে?'

অবিনাশ রহস্য করে হাসল। 'শাঁসালো এক পার্টনার পেয়ে গেছি। ছোকরা রূপে কন্দর্প, ধনে কুবের। অগাধ টাকার মালিক। ফালতু বেচারি এক বন-কি-চিড়িয়ার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।'

বদ্রীদাস বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে হাসল। বলল,—'তা এই চিড়িয়াটি কোথায়?'

—'কোথায় আবার? চিড়িয়া যেখানে থাকে। বন-কি-চিড়িয়া তো বনে থাকে না বদ্রীদাস। সে থাকে গেরস্থ বাড়ির ঘরে। মেয়েটা এক ডাক্তারের বউ। কি চেহারা মাইরি! ঠিক যেন অপ্সরার বাচ্চা। আরে ওকেই তো আমাদের বইয়ের হিরোইন করব।'

—'তাই নাকি?' বদ্রীদাস একটু ঝুঁকে বসল। 'আচ্ছা বোড়ের চাল দিয়েছ কিন্তু। এক ঢিলে দুই পাখি পড়বে।'

অবিনাশ বলল,—'ফালতু কথা এখন থাক। কাজের কথায় এস দেখি। তোমাকে শ দুই টাকা কাল দিয়ে যাব। ঘরখানার ভোল পালটে ফেলতে হবে। একেবারে ঝকঝকে, তকতকে—টিপ-টপ অফিস দেখতে চাই।'

বদ্রীদাস বলল,—'তুমি ফের আসছ কবে?'

—'খুব শিগ্‌গির। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে। কিন্তু তার আগে ঘরের ছিরিছাঁদ যেন বদলে গেছে দেখি।'

বদ্রীদাস নীরবে তাকিয়ে রইল।

ভ্রূ কুঁচকে কিছু ভাবল অবিনাশ। হেসে বলল,—'তুমি হলে এই কোম্পানির সিনিয়ার পার্টনার। কথাটা মনে রেখো বদ্রীদাস। জামা-কাপড়গুলোয় একটু মাঞ্জা দিয়ে নিও।'

অবিনাশ চোখ মটকে ফের রহস্য করল।

সোমবার দুপুরে অম্বর বাড়িতে খেতে এল না। স্নান-টান সেরে নীপা শুয়েছিল। কখন বারোটার আগেই তার খাওয়া-দাওয়া শেষ। সে ভেবেছিল এক চটকা গড়িয়ে দুটো নাগাদ একবার কলেজ ঘুরে আসবে। লাইব্রেরির দু-তিনখানা বই তার কাছে। সেগুলি ফেরত দেওয়া প্রয়োজন। নীলাদ্রির সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। অন্তত ঘন্টাখানেকের জন্যও দুজনের মুখোমুখি হওয়া দরকার। নীপা নিজের কথাই ভাবছিল। তার ভাগ্যটাই এমনি। সে ভুল করে কিংবা অন্যে তাকে ভুল

বোঝে। সকাল থেকে অম্বরের সঙ্গে একটা কথাও তার হয়নি। রাগ করে অম্বর খেতেও এল না। নীপা ভাবছিল এবার তার একটা সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। তার ভাগ্যের গাড়িখানা তাকে এক চৌমাথার মোড়ে এনে হাজির করে দিয়েছে। কোন পথে সে যাবে, এবার তাকে স্থির করে নিতে হয়। আর গড়িমসি চলে না। এক পথে স্বামী, ঘর-সংসার, শান্ত নিরুপদ্রব জীবন। অন্য পথে নীলাদ্রির প্রেম-ভালোবাসার হাতছানি। ঘর-সংসার ভেঙে তার সঙ্গে দিল্লি পালানো। নয়তো অবিনাশ সমাদ্দারের ডাকে সাড়া দিতে হয়। দেবরাজ আর অবিনাশ তাকে সিনেমার হিরোইন করবে। রুপোলি পর্দায় তার ছবি। ঝলমলে জীবন। আনন্দ, হাসি, কলরব। একটা বই হিট করলেই তাকে নিয়ে হইচই শুরু হবে। কতজনের মুখে মুখে তার নাম। দেবরাজ আরো কত কথা বলেছে তাকে।...

আর চতুর্থ পথটা? সেকথা ভাবতেই নীপার মুখটা শুকিয়ে এল। সে পথে যাওয়া শক্ত, কিন্তু একবার যেতে পারলে আর চিন্তা-ভাবনার কারণ নেই। গতকাল শেষ রাতে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুয়ে নীপা সেই পথের কথাই ভেবেছে। ডাক্তারের বউ,—বিষ-টিসের ব্যাপারটা সে বোঝে। আত্মহত্যার সহজ উপায়ও তার জানা। হাতে বিষ তুলে নিয়েছে কল্পনা করতেই নীপা শিউরে উঠল। মনে হল একরাশ কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে তার সমস্ত শরীরের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে ওরা তাকে কামড়ে ধরবে। তার সমস্ত দেহে বিশ্রী জ্বলুনি। নীপা ভাবল সে চিৎকার করে লোক ডাকে। পিঁপড়েগুলো কিছুতেই যে তার শরীর থেকে নামতে চাইছে না।

হঠাৎ চোখ তুলে নীপা দেখল দরজার বাইরে দুঃখহরণ তাকে ডাকছে।

কখন দু চোখের পাতায় ঘুম নেমে এসেছে তার। নীপা বুঝতেও পারেনি। মাথা তুলে জানালার ফাঁক দিয়ে নীপা দেখল। রাস্তার ওপারে ঘোড়ানিমের গাছের মাথায় একচিলতে মরা রোদ্দুর। ঘরের উঠোনে এখন অপরাহ্ণের ঘন ছায়া।

দুঃখহরণ বলল,—'হাসপাতাল থেকে লোক এসেছে দিদিমণি। বাবু কি খবর পাঠিয়েছেন—'

সে বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসল। 'কই লোক? কোথায় সে? নীপা ব্যস্ত হয়ে বলল।

—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডেকে আনব ঘরের ভিতর?'

—'দরকার নেই। চলো আমি যাচ্ছি—'

কাপড়টা গুছিয়ে পরতে অল্প একটু সময় লাগল। নীপা এসে দাঁড়াল বাইরের ঘরে।

হাসপাতালের লোকটি বলল,—'ডাক্তারবাবু আজ দুপুরের ট্রেনে রতনপুর গেলেন। আমাকে বললেন খবরটা বাড়িতে দিতে।'

—'হঠাৎ রতনপুর?' নীপা অবাক হয়েছে মনে হল।

—'কি জরুরি দরকার আছে। আজ রাত্তিরে ফিরতে পারবেন না। সে কথাই আপনাকে বলতে এলাম।' কথা শেষ করেই সে আবার রাস্তায় নামল।

লোকটা চলে গেলে নীপা অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। জরুরি দরকার, না ছাই। ওসব ঢঙ নীপার জানা আছে। আসলে অম্বর তাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। তাদের সম্পর্কটা সে নিজেই ঘোরালো করে তুলেছে। নইলে জেনেশুনে বউকে কেউ এমন লাগাম ছেড়ে দেয়। কী চায় অম্বর? বিবাহ-বিচ্ছেদ? ছাড়াছাড়ি? তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটা ইতি হোক—।

নীপার মনে পড়ল দিনটা সোমবার। বিকেলে অনিমেষবাবুর কাছে তার পড়তে যাওয়ার কথা। ঠোঁট উল্টিয়ে নীপা নিজের মনেই একটা ভেংচি কাটল। কী হবে পড়তে গিয়ে? কার কাছে সে পড়ছে? কেন পড়ছে? ভবিষ্যতে আর পড়বে কিনা এ সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু সামনে অন্য সমস্যা। সর্বাগ্রে তারই ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন।

দুঃখহরণকে নীপা ডাকল। বলল,—'তুই টাউন ক্লাবের ঘরটা চিনিস?'

—'কেলাবের ঘর? যেখানে থিয়াটার-গান-বাজনা হয় দিদিমণি?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেখানে একবার যেতে পারবি?'

—'খুব পারব। কী করতে হবেক বলুন না—'

—'সেখানে নীলাদ্রিবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন। তাকে একখানা চিঠি দিয়ে আসবি—'

—'আপনার চিঠি?'

—'হ্যাঁরে। আজ আর যাব না রিহার্সালে। কথাটা জানাব ওদের, নইলে সবাই আবার বসে থাকবে।' অকারণেই নীপা খানিকটা কৈফিয়ত দিল।

খামে বন্ধ করবার আগে চিঠিখানা আর একবার সে পড়ল। সম্বোধনহীন ছোট চিঠি।

...'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। বাড়িতে আমি একা। উনি বাইরে,—রাত্তিরে ফিরবেন না। সাড়ে নটার সময় এসো—নীপা।' খামের উপর গোটা গোটা অক্ষরে নাম লেখা,—শ্রীনীলাদ্রি সেন।

সাত

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় দরজায় টোকা পড়ল,—ঠক্ ঠক্। শব্দ শুনেই নীপা উৎকর্ণ হল। নীলাদ্রি—নিশ্চয় নীলাদ্রি এসেছে।

বিছানার উপর এতক্ষণ সে গড়াচ্ছিল। কাছারির পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজবার পর থেকেই নীপা চঞ্চল। কতক্ষণে নীলাদ্রি আসবে। খানিক আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও আকাশে কালো মেঘ। বাতাসটা ভেজা। পথঘাট ফাঁকা। রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। এমনিতেই এদিকে মানুষজন কম হাঁটে। বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই। তখন পথ জনহীন, আঁধারে বিলীন।

শুয়ে শুয়ে সে এতক্ষণ নীলাদ্রিব কথাই ভাবছিল। মুখের উপর অবশ্য একটা পত্রিকা খোলা ছিল। কিন্তু একটা পাতাও নীপা উল্টে দেখেনি। দেখবে কেমন করে? তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটা চাপা উত্তেজনা। নীপা ভাবছিল নীলাদ্রি এলে সে কি বলবে? ইচ্ছে করলে ওর মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিতে পারে। পরিষ্কার বলা চলে,—নীলাদ্রি, মাই ডিয়ার। এতদিন তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন ছিল। পলাশপুরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে উঠত। মনে মনে তোমার প্রতি আমি ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করেছি। একে তুমি প্রেম, ভালোবাসা যা খুশি বলতে পার। কিন্তু আজ সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে বন্ধু। এখন তোমার সঙ্গ সাহচর্য ভালোবাসা কিছুই আমার আবশ্যক নেই। তোমাকে আর আমি চাইনে। নীলাদ্রি, আমার সামনে এখন সৌভাগ্যের দিন। আমাকে যদি ভালবেসে থাকো, আমার সাফল্যে তোমার সুখী হওয়া উচিত। তুমি শুনলে খুশি হবে আমি সিনেমায় চান্স পাচ্ছি। চিত্রতারকার ঝলমলে, হাসি-কলকল, গতিময় জীবনের সঙ্গে তুমি কেমন করে তাল দেবে? সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো—গুড বাই। হে বন্ধু বিদায়।

কিন্তু এত সব কথা মনে মনে ভাবা চলে। মুখের উপর বলা যায় না। শুরুতেই এই সব কথা বললে নীলাদ্রি রেগে টঙ হয়ে উঠবে। এতদিন একভাবে কাটানোর পর, মুখের উপরে প্রত্যাখ্যান শুনলে কার না ধৈর্যচ্যুতি হয়। মনে মনে তাই সে ঠিক করেছে। কথাগুলো একসঙ্গে নয়। ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে শোনাবে। এবং শেষের কথাটি সবশেষে বলবে। নীলাদ্রি

নাটকের ডিরেক্টর হতে পারে। কিন্তু নীপাও কিছু কম যায় না। সে রমণী এবং সুন্দরী। সর্বোপরি চতুরা, নিপুণা অভিনেত্রী। নীলাদ্রি এলেই তাকে সমাদর করে সে-ঘরে বসাবে। নানাভাবে তাকে তুষ্ট করবে। মুখের হাসি, চোখের ইঙ্গিত, ওষ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গি, নানা ছলাকলা সবকিছু দিয়ে নীলাদ্রিকে সে মাকড়সার জালে বন্দী পতঙ্গের মত শক্তিহীন, নির্বিষ করে তুলবে।

দরজায় আবার টোকা পড়ল।

নীপা এবার ব্যস্ত হয়ে বিছানা থেকে নামল। নীলাদ্রি ভারি ছটফটে—একটু ভীতুও। বাড়ির দরজার কাছে এসে এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে চায় না। অন্তঃপুরে না প্রবেশ করা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। সর্বদাই আশঙ্কা, কেউ যদি তার উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। তাহলেই সর্বনাশ হবে। আর সে কারণেই, এ-বাড়িতে নীলাদ্রির আনাগোনা খুবই কম। নীপা কতদিন পরিহাস করে বলেছে, 'আচ্ছা ভীতু মানুষ তো। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করবার শখ আছে। অথচ অপবাদ আর সর্বনাশের ভয় ষোলো আনা।'

নীলাদ্রি হেসে উত্তর দিয়েছে। 'শুধু ছাত্রী হলে এত ভয়ের ছিল না। কিন্তু এ যে পরস্ত্রী। জানাজানি হলে কেলেঙ্কারির একশেষ। মুশকিল তো সেখানেই—'

দরজা খুলবার আগে নীপা বলল,—'দাঁড়ান না মাস্টারমশায়। এখনই খুলছি। এত ব্যস্ত হলে কি চলে?' তার কণ্ঠে পরিহাসের সুর।

কিন্তু ওদিক থেকে কোনো সাড়া এল না। নীপা ভ্রূ-কুঁচকে কি ভাবল। তারপর ছিটকিনি নামিয়ে কপাট ধরে টানল। দরজা খুলতেই প্রায় ভূত দেখার মত চমকে উঠল নীপা। চৌকাঠের ওপারে সিঁড়ির উপর অম্বর দাঁড়িয়ে। তার দুটি চোখ একদৃষ্টে শুধু নীপাকেই জরিপ করছে। মুখের রঙ-বদল, ভীত-ত্রস্ত অপরাধীর মত ভঙ্গি, সচকিত বিহ্বলভাব, কিছুই সম্ভবত ওর দৃষ্টি এড়ায়নি।

বাঁকা হেসে অম্বর বলল,—'হঠাৎ ফিরে এসে তোমার খুব অসুবিধে করলাম, কি বলো?'

চট করে নীপার মুখে কোনো উত্তর জোগাল না। আমতা আমতা করে সে বলল,—'অসুবিধে মানে? আমার আবার অসুবিধে কীসের?'

—'তাই নাকি?' অম্বর এবার ব্যঙ্গ করল। চৌকাঠ পেরিয়ে সে ঘরে পা দিল। বলল,—'দরজা খুলে নিশ্চয় আমাকে আশা করনি। যেরকম চমকে উঠলে দেখলাম। তা, যার আশায় বসেছিলে তিনি কে?'

নীপার বুকের ভিতরটা কামারশালার হাপরের মত ওঠানামা করছিল। মনের ভিতর একটা অশান্ত ঝড়। রতনপুর থেকে অত রাতে যে অম্বর ফিরতে পারে এ কথা সে একবারও ভেবে দেখেনি। কি বিশ্রী কাণ্ড হল। হয়ত আর একটু পরেই নীলাদ্রি আসবে। তাহলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়। তারপরের কথা নীপা আর ভাবতেও পারে না।

ঝড়ের মুখেও মাঝি যেমন শক্ত হাতে নৌকোর হাল ধরে, নীপাও তেমনি চেষ্টা করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল,—'কার আশায় আবার বসে থাকব? কি সব আজেবাজে বলছ—?'

অম্বর কটমট করে তার দিকে তাকাল। 'ন্যাকামি করো না। তোমার ছলচাতুরি সব আমি বুঝি। স্বামী ঘরে নেই বলে কাকে নেমন্তন্ন করেছিলে? দরজা খোলার সময় কি বলছিলে মনে নেই?' কণ্ঠস্বর বিকৃত করে অম্বর নীপার কথাই পুনরাবৃত্তি করল,—'দাঁড়ান না মাস্টারমশাই। দরজা খুলছি। এত ব্যস্ত হলে কি চলে?'

অকাট্য যুক্তি। কেমন করে খণ্ডন করবে নীপা ভেবে পেল না। তবু রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মত সে মরীয়া হয়ে উঠল। ভ্রূ-কুঁচকে মুখখানা শক্ত করে নীপা স্বামীর দিকে তাকাল। বলল, —'তুমি দেখছি ভীষণ সন্দেহবাতিক হয়েছ। আগে আমার কথাটা শোনো। তারপর তোমার যা খুশি ভেবো।' একনজরে অম্বরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সে ফের শুরু করল। 'আজ বিকেলে

মাস্টারমশায় বললেন তাঁর একটা বইয়ের খুব দরকার। ক'দিন ধরে বইটা আমার কাছেই পড়ে আছে। আমি ভাবলাম দুঃখহরণকে দিয়ে বইটা পাঠিয়ে দেব। পরে মনে হল দুখু তো ওর বাড়ি চেনে না। তাই শুনে উনিই আমাকে বললেন, রাত্তিরে সিনেমা দেখে এ-পথ দিয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হবে। বইটা তখন পেলেও চলবে। বিশ্বাস না হয় মাস্টারমশায়কে গিয়ে এখনই জিজ্ঞেস করে এসো।' কথা শেষ করে নীপা আর দাঁড়াল না। দুম দুম করে পা ফেলে শোবার ঘরে এসে ঢুকল।

পিছু পিছু অম্বরও এল। আড়চোখে স্বামীর মুখের উপর নীপা একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। মুখ দেখে ঠিক বোঝা যায় না। তবু মনে হল, কথায় কাজ হয়েছে। ঝড়ের দাপাদাপি এখন অনেক কম। মানুষটা আগের চেয়ে শান্ত।

—'দুঃখহরণ কোথায়?' গায়ের জামা খুলে রেখে অম্বর প্রশ্ন করল।

মুখ নিচু করে এক মুহূর্ত নীপা কি ভাবল। কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে সে বলল,—'কী করব বলো? দুপুর থেকে খালি বলছে সেকেন্ড শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। ওকে বললাম কতবার। আমি একলা বাড়িতে থাকব? তুই বরং অন্যদিন যাস। কিন্তু ভারি বেয়াড়া আর জেদি। সেই যে বলল যাবে, তা সে যাবেই।'

মুচকি হেসে অম্বর মন্তব্য করল। 'তাহলে ব্যবস্থা পাকা করেছিলে? রাত্তিরে স্বামী বাড়ি ফিরবে না, চাকরটাকে সেকেন্ড শোয়ে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীমতী নীপা একলা ঘরে রইলেন।' শক্ত করে দাঁত চিপে ঠোঁট দুটি বন্ধ করল অম্বর। স্ত্রীর চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। শিকারি মার্জারের মত এক-পা, দু-পা করে এগিয়ে আবার থামল। বলল,—'যার আসবার কথা ছিল সে তোমার পড়ার মাস্টারমশায় নয়।'

থতমত ভঙ্গিতে নীপা শুধু বলল,—'কে তবে? তুমি কাকে সন্দেহ করো? স্পষ্ট করে বলো দিকি।'

আরো এক-পা এগিয়ে স্ত্রীর ঠিক সামনে দাঁড়াল অম্বর। একেবারে মুখোমুখি। শক্ত দুটো হাত থাবার মত নীপার কাঁধের উপর রাখল। বউকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে বলল,—'চুপ করো। চোরের মায়ের মত বড় গলা করে চেঁচিও না। যার আসবার কথা ছিল তিনিও তোমার গুরুমশায়। তোমার নাট্যগুরু।' একটু থেমে সে ব্যঙ্গ করে যোগ করল,—'তা ভালোই তালিম পেয়েছ মনে হচ্ছে। বেশ অভিনয় করছ কিন্তু। আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে নীপা।'

স্বামীর হাতের আঙুলগুলো তার কাঁধের নরম মাংসের উপর সজোরে চেপে বসেছে। ব্যথা পেলেও অম্বরের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। শুধু মুখে বলল, 'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার সন্দেহ ভীষণ। কেউ তোমাকে বোঝাতে পারবে না।'

—'আর বুঝিয়ে কাজ নেই।' অম্বর ক্রূর হেসে বলল।—'অন্য স্বামী হলে এমনি নষ্টচরিত্রের মেয়েমানুষকে কী করত জানো?'

নীপা পর্যুদস্ত, বিপন্ন, আহত। বিফল অভিনেত্রীর মত সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

অম্বর কণ্ঠস্বর একখাদ নামিয়ে বলল,—'সে তোমাকে গলা টিপে খুন করত।'

ভয় পেয়ে নীপা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমিও কি তাই চাও নাকি? রাত্তিরবেলায় সন্দেহের ভূত তোমায় ভর করেছে। এখন দেখছি তুমি সব পারো। ছেড়ে দাও বলছি আমাকে। নইলে কিন্তু আমি চিৎকার করে লোকজন জড়ো করব।'

বউয়ের কাঁধের উপর থেকে হাত নামাল অম্বর। মুখ কুঁচকে একটা ঘৃণার ভঙ্গিতে বলল, —'তোমার অঙ্গ স্পর্শ করতেও আমার ইচ্ছে হয় না। একটা কথা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই। আমাদের আর একসঙ্গে বসবাস করার কোনো মানে হয় না। তোমার পথ এবার তুমি নিজেই

দেখে নাও। সিনেমা থিয়েটার যা খুশি করে বেড়াও। আমাদের সম্পর্কের ইতি হোক।'

সমস্ত রাত্রি মেঝের উপর আঁচল বিছিয়ে নীপা শুয়ে রইল। ঠাণ্ডা মেঝে। শক্ত সিমেন্ট তার নরম দেহে একখণ্ড বরফের মত ঠেকল। পালঙ্কের উপর অম্বর আয়েস করে ঘুমোচ্ছে। মানুষটা একবার তাকে কাছে ডাকল না। ঠাণ্ডা মেঝেয় শুতে নিষেধ করেনি। বিছানায় উঠতে বলেনি। দুঃখে, অভিমানে, নীপার চোখ ফেটে জল এল। অম্বর তাকে জঘন্য ভাষায় আজ অপমান করেছে। আর কোনো মেয়ে হলে হয়তো একবস্ত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। সকালেই কেচ্ছা মেশানো একটা রসালো কাহিনি শহরে চাউর হত।

ভয়ে, আশঙ্কায় নীপার চোখে ঘুম এল না। হঠাৎ নীলাদ্রি যদি দরজায় এসে টোকা দেয়। অম্বর তাহলে খ্যাপা কুকুরের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শক্ত দুই হাতে তার গলা টিপে ধরবে। কাকুতি-মিনতি, ছটফট করলেও নীপাকে সে রেহাই দেবে না। ছেনাল বউকে খুন করে সে বরং জেলে যাবে। আর নীলাদ্রি? তাকে বিশ্বাস নেই। অসম্ভব নয়, সাড়ে নটা রাত্তিরে নীপার কাছে আসতে তার সাহস হয়নি। আর একটু নিশুতি হলেই লোকজন ঘুমিয়ে পড়বে। নীলাদ্রির পক্ষে তখন নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে বের হওয়া অনেক বেশি নিরাপদ।

কিন্তু ঈশ্বর তার মুখ রাখলেন। নীলাদ্রি আসেনি। শেষরাত্তিরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। ঠাণ্ডা জলে ভেজা বাতাস। কখন এক সময় নীপার চোখে ঘুম নেমে এল। যখন চোখ খুলল, তখন আর অন্ধকার নেই। সমস্ত ঘরে আলোর বন্যা। অনেক বেলা হয়েছে। দুঃখহরণ কাজ করছে আপনমনে। খোঁজ নিয়ে নীপা জানল চা-টা খেয়ে অম্বর হাসপাতাল গেছে। তাকে কিছু বলে যায়নি।

মঙ্গলবারও নীপা আর কলেজে গেল না।

চান-টান সেরে সে একবার যাবে বলে ঠিক করল। কিন্তু ভাত খেয়ে উঠবার পরই আর কলেজে যাবার ইচ্ছে রইল না। গত রাত্তিরে ভালো করে ঘুম হয়নি। ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়েছিল বলে সমস্ত শরীরে একটা টাটানি ব্যথা। খানিক আগে আয়নায় নিজের চোখমুখ দেখে নীপা প্রায় চমকে উঠেছিল। এক রাত্তিরেই কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তার। ঠোঁট শুকনো। রাতে ঘুম হয়নি বলে চোখ দুটো ফোলা এবং ঈষৎ লাল। সমস্ত দুপুর টানা ঘুম দিতে পারলে বিকেলের দিকে চোখমুখের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হত।

বিছানার উপর নীপা ভেঙে পড়ল। ভাত খাওয়ার পর থেকেই তার খুব ঘুম পাচ্ছে। চোখ দুটো জড়িয়ে এল। এরপর কী করবে নীপা তাই চিন্তা করছিল। অম্বর তাকে সাফ জবাব দিয়েছে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হোক। নীপাকে তার প্রয়োজন নেই। এই সংসারে সে এখন অবাঞ্ছিত, অনাবশ্যক মেয়ে। চলার পথ তাকে নিজেই দেখে নিতে হবে। অম্বরের ঘরের এক কোণে উচ্ছিষ্ট, আবর্জনা বা জঞ্জালের মত সে পড়ে থাকতে পারবে না।

আজ সকালেই নীপা কলকাতা যাবে ভেবেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলেই কাকার আসবার কথা। যে লোকটা বাড়ি কিনতে চায়, সঙ্গে সেও হয়তো আসবে। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা চুকলেই নীপা খানিকটা জোর পায়। তার হাতে থোক কিছু টাকা আসে। আর টাকাই হল রসদ। যত বয়স বাড়ছে, নীপার তাই উপলব্ধি হচ্ছে।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা মরতে আর বাকি নেই। গাছের মগডালে রোদ উঠেছে। পাখপাখালির কলরব ঘরে বসেও শোনা যায়। অপরাহ্নের ছায়াভরা মাঠে ছোট ছেলেমেয়ের দল কখন ছুটোপাটি করে খেলতে নেমেছে।

সামনে দুঃখহরণ দাঁড়িয়ে। সম্ভবত বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে তাকে ডাকাডাকি করছিল। নীপা উঠে বসতেই একগাল হেসে সে নিবেদন করল,—ইস্। কী বেদম ঘুমাচ্ছিলেন। আমি ডেকে

ডেকে হয়রান।'

চোখ মুছতে মুছতে নীপা বলল,—'বাবু এসেছিলেন খেতে?'

—'হুই? এলেন বৈকি। জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুলেন। খেয়ে দেয়ে ওই চেয়ারটায় বসে জিরালেন কতক্ষণ। আবার বেরিয়ে গেলেন হাসপাতালে।'

নীপা একটু অবাক হল। অম্বর বাড়িতে এল, আবার বেরিয়ে গেল। আর সে জানতেই পারল না। তার ইচ্ছে হল দুঃখহরণকে জিজ্ঞেস করে। সে তাকে ঘুম থেকে ওঠায়নি কেন? কথাটা তার মুখে এল। কিন্তু সাহস করে নীপা বলতে পারল না। দুঃখহরণ যদি তার মুখের উপর বলে দেয়। বাবু তাকে নিষেধ করেছিলেন। দিদিমণিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার প্রয়োজন নেই। তাহলে তার সম্মানটা থাকে কোথায়? স্বামীই যখন তাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। তখন মিছিমিছি চাকর-বাকরের সামনে নিজেকে সস্তা করে লাভ কী?

দুঃখহরণ এবার আসল কথাটা বলল,—'দিদিমণি, সেই বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েছেন। তেনাকে বসিয়ে রেখেছি বাইরের ঘরে।'

—'কোন বাবু রে?' নীপা বিস্ময় প্রকাশ করল। 'কী রকম দেখতে বল তো? হাসপাতালের কোনো লোক-টোক নাকি?'

'না, না।' দুঃখহরণ প্রায় প্রতিবাদ করল। একটু গলা নামিয়ে বলল,—'কাল সকালে যে বাবু এসেছিলেন। সেই যে সোন্দর মত দেখতে। কুঁকড়া কুঁকড়া চুল দিদিমণি।' কথা শেষ করে দুঃখহরণ একটু হাসল।

নীপা বুঝতে পারল। দেবরাজ এসেছে। এক মুহূর্ত সে চিন্তা করল। বিছানা থেকে নেমে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে দাঁড়াল। দর্পণে তার প্রতিবিম্ব দেখে নীপা মুখ কোঁচকাল। সত্যিই খুব ঘুমিয়েছে সে। চোখ ফোলা, মুখটা কেমন ভারী দেখাচ্ছে। ঘুমিয়ে উঠে ঠোঁট দুটো পর্যন্ত পুরু হয়েছে তার। এমনি রাক্ষুসীর বেশে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। নীপা এখন বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে। মুখ হাত ধোবে। গায়ে জল ঢালবে। আয়নার সামনে বসে কেশচর্চা করবে। মুখ পরিষ্কার করে কপালে টিপ আঁকবে, ঠোঁটে স্টিক বোলাবে। জামা-কাপড় বদলে তার সজ্জা সম্পূর্ণ হতে সন্ধে কাবার। দেবরাজ কি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করবে? উঁহু সে হয় না। ইতিমধ্যে যদি অম্বর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে তাহলে আর কথাই নেই। একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হবে।

নীপা বলল,—'বাবুকে তুই বলে আয়, দিদিমণির শরীর খুব খারাপ। আজ আর দেখা করবেন না। আপনি বরং পরে আসবেন।'

মাথা হেলিয়ে দুঃখহরণ চলে গেল। নীপা ফের বিছানায় গড়াল। একটু পরেই দবজাটা সশব্দে বন্ধ হল। দেবরাজ চলে গেল ভেবে নীপা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শুধু অম্বরের কথা ভেবে নয়, অনেকটা ইচ্ছে করেই আজ সে দেবরাজকে এড়িয়ে গেল। পুরুষজাতের দুর্বলতা তার জানা। মেয়ে দেখলেই চঞ্চল। সুন্দরীর সান্নিধ্যে এলে অনেকেরই প্রায় পাগল-দশা। কিন্তু দেবরাজ একটু ভিন্ন, একটু অন্য ধাঁচের। তার চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ কম। কিন্তু অন্তরে তা দুর্বার, বর্ষার ঢল-নামা পাহাড়ি নদীর মত বেগবতী। ফলে নারীকে ধীরে ধীরে জয় করবার ইচ্ছে ওর কম। ও চায় গ্রাস করতে। একদিনে, অকস্মাৎ। দেবরাজের চোখের দুই মণির মধ্যে সেই সর্বগ্রাসী কামনা। গতকালই নীপা তা টের পেয়েছে।

একলা ঘরে দেবরাজের মুখোমুখি হতে নীপার আজ সাহসে কুলোয়নি। তার ঘুমভাঙা চেহারা, আলগা বেশবাস, এলোচুল, শিথিল ভঙ্গি একটা ঘুমন্ত পশুকে খোঁচা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরে অবশ্য দুঃখহরণ ছিল। কিন্তু চাতুরি করে ওকে সরাতে কতক্ষণ? ছল করে দেবরাজ ওকে সিগারেট

কিনতে পাঠাবে। কাছাকাছি কোনো দোকানে যা মিলবে না। প্রথমদিন নীলাদ্রি তাকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে তুলেছিল। লতা-পাতা আঁকা পর্দা-ঢাকা কেবিনের মধ্যে সে তার হাত ধরল। নীপা জানে, দেবরাজের অনেক বেশি দাবি। প্রথমদিনেই সে আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মত অনেকদূর অগ্রসর হতে চায়। তার আগ্রাসী দাবি মেটানো নীপার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুঃখহরণ এসে আবার তার সামনে দাঁড়াল। হাতে একটা স্লিপ কাগজ।

—'বাবু এটা দিতে বললেন আপনাকে।' কাগজটা সে নীপাকে এগিয়ে দিল।

ছোট্ট স্লিপে ছ লাইন লেখা—

একটা খবর দিতে এসেছিলাম। নীলাদ্রিবাবু হঠাৎ কাল কলকাতা গিয়েছেন। কবে ফিরবেন বলে যাননি। সুতরাং রিহার্সাল এখন বন্ধ—

দেবরাজ।

চিঠি পড়েই নীপা একটু হাসল। কেমন কাটা কাটা ভাষা। বাবুর রাগ আর অভিমান দুই-ই চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। দেবরাজ মেয়েদের মত সেন্টিমেন্টাল নাকি? ভ্রূ কুঁচকে নীপা কী যেন ভাবতে লাগল।

ফের এক দুর্ভাবনা। নতুন করে এইমাত্র তা গজিয়ে উঠল। গতকাল নীলাদ্রি কলকাতা গিয়েছে? মাত্র রবিবারই তো সেখান থেকে ফিরল। হঠাৎ আবার কলকাতা দৌড়বার কী প্রয়োজন ঘটল? ব্যাপারটা কিছুতেই তার বোধগম্য হল না।

আর একটা প্রশ্নও তার মনের নিভৃত কোণে কাঁটার খোঁচার মত বিঁধল। নীলাদ্রিকে লেখা সেই চিঠিখানা কাকে দিয়ে এল দুঃখহরণ? যা হাঁদা গঙ্গারাম ছেলে। কার হাতে চিঠিখানা তুলে দিল কে জানে। নীলাদ্রি যদি কলকাতা চলে গিয়ে থাকে, তাহলে চিঠিখানা কেমন করে তার হস্তগত হবে?

গালে হাত দিয়ে নীপা সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল।

রাত আটটা নাগাদ কাকা এলেন।

নীপা তখন একটা বইয়ে মুখ দিয়ে বসে। টেবিলের উপর ধূমায়িত এক কাপ চা। অন্যমনস্কের মত নীপা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল। আজ তার পরনে আকাশি নীল রঙের একটা তাঁতের শাড়ি। গায়ে স্লিভলেস ব্রাউজ নয়। হাত-ওলা জামা,—কনুয়ের একটু উপর পর্যন্ত ঝুল। প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢাকা। কাকা আসবেন বলেই নীপার এই ভিন্ন ধরনের পরিমিত সাজ। সিল্কের কাপড় তার গায়ের উপর যেন চেপে বসে। পিঠের অর্ধেক-ঢাকা। খাটো জামাগুলো পরে কাকার সামনে বসা যায় না। কেমন অস্বস্তি লাগে।

দরজা খুলেই নীপা ছোট্ট মেয়ের মত কলকল করে উঠল।

—'উঃ। এত দেরি হল তোমার আসতে। আমি কখন থেকে বসে আছি। আচ্ছা মানুষ বাবা!'

কাকা একটু হাসলেন। নীপার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন,—পাগলি মেয়ে, কী করব বল? যা দিনকাল,—ট্রেনই একঘন্টা লেট। নইলে তো তোর কাছে কখন পৌঁছে যেতাম।'

কাকার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নীপা কী যেন খোঁজ করল। পরক্ষণেই সে অবাক হয়ে বলল,—তোমার সুটকেস-টুটকেস কিছুই এবার আনোনি কাকা?'

—'এনেছি রে।' কাকা রহস্য করে হাসলেন। 'সেগুলো রেখে এলাম হোটেলে।'

'হোটেলে?' নীপা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'হোটেলে কেন উঠতে গেলে? কী ব্যাপার বলো তো তোমার? ও বুঝি কিছু লিখেছিল?'

কাকা হো হো করে হাসলেন। 'তুই দেখছি জামাইকে খুব অবিশ্বাস করিস। তোকে না জানিয়ে

ও কি আমায় কিছু লিখতে পারে? বিশেষ করে সম্পর্কটা যখন তোরই মাধ্যমে।'

ন্যায্য কথা। নীপা বেশ লজ্জিত হল। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এখন মস্ত ফাটল। কাকা কি তাই টের পেয়েছেন? তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠল।

তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলল,—'তাহলে বলো, কেন হোটেলে উঠতে গেলে?'

—'কেন আবার?' কাকা যেন ওকেই প্রশ্ন করলেন। একটু থেমে ফের বললেন,—'আরে, সেই চন্দ্রবদনবাবু যে এসেছেন আমার সঙ্গে। বেচারি হোটেলে একা থাকতে চায় না। কাজেই আমাকেও থাকতে হচ্ছে।'

—'চন্দ্রবদনবাবু মানে? যিনি আমার বাড়ি কিনতে চান?'

—'ঠিক ধরেছিস। ওকেও নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। তোদের সঙ্গে সামনাসামনি কথাবার্তা হোক। তাতে দু পক্ষেরই সুবিধে।'

একটু চিন্তা করে নীপা বলল,—'আমরা আবার কী কথাবার্তা বলব কাকা? তুমি যা ঠিক করে দেবে, তাই হবে। বাড়ি বিক্রির আমরা কতটুকু বুঝি?'

—'সে হয় না মা।' কাকা মুখ গম্ভীর করে বললেন। 'এ হল সম্পত্তি হস্তান্তর। তোমার পৈতৃক বিষয়। বিক্রি করবার আগে দরদাম ঠিক করে নাও, পরে এই নিয়ে যেন কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ না হয়।'

—'কী যে বলো তুমি।' নীপা হাল্কা সুরে বলল।

—'ঠিকই বলছি রে।' কাকা সহাস্যে ওর মুখের দিকে তাকালেন। জামাইকে কাল সকালে একটু থাকতে বলিস। চন্দ্রবদনকে নিয়ে আমি আসব। এই ধর আটটা নাগাদ,—কথাবার্তা তখনই শুরু করা যাবে।'

—'বেশ, তাই হবে কাকা।' নীপা ফস করে বলে ফেলল।

কুচোকাচা আরো দু-চারটে কথা সেরে কাকা উঠলেন। বিদায় জানাতে নীপা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। কাকা বললেন,—'জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হল না। আমার নাম করে বলিস ওকে। তোর এখানে উঠলাম না বলে বাবাজীবন আবার না রাগ করে বসে।'

—'সে আমি বুঝিয়ে বলব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।' নীপা আশ্বাস দিয়ে বলল, ছায়ার মত ওর কাছ ঘেঁষে কাকা হঠাৎ বললেন,—'একটা কথা তোকে আগেই বলে রাখি। চন্দ্রবদনের সাদা টাকার একটু টান আছে। অবশ্য বাড়ির দাম দেবার ক্ষমতা রাখে। শুধু হাজার পনেরো টাকা একটু হেরফের করে নিতে হবে।'

সাদা কালোর মহিমা ভাইঝির মাথায় তেমন ঢুকল না দেখে কাকা হেসে বললেন,—'যা, এই নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। কাল সকালে জামাইকে বললেই সে বুঝবে।' নীপাকে একটু আদর করে কাকা এবার পথে নামলেন।

রাত এগারোটার মত। মফঃস্বল শহরে এখনই নিশুতি রাত। সাড়াশব্দ কম। অনেকেই গাঢ় ঘুমে অচেতন। যারা এখনও ঘুমোয়নি তাদের কেউ বা শয্যা আশ্রয় করে ছেলেবেলাকার ঘুমপাড়ানি গানের সুর মনে করবার চেষ্টা করছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিশুতি পৃথিবী। আকাশের বোবা নক্ষত্রের দল শুধু অতন্দ্র প্রহরী। গাছগাছালির ফাঁকে জোনাকির আলো চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে কুকুরের নৈশ চিৎকার, কিংবা একটা শান্টিং ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ ধ্বনি, কাঁপা কাঁপা হুইসিল কানে আসছে।

হোটেলের ঘরে দুজনে কথা বলছিল।

ঘরের মধ্যে ছায়া ছায়া রাত। কাছাকাছি কোনো কামরা থেকে একটা টাইমপিসের টিকটিক শব্দ আসছে।

—'আমার ভাইঝির বাড়িটা তোমার খুব পছন্দ হয়েছে চন্দ্রবদন, তাই না?'

—'হোয়েছে বৈকি। নইলে আপনার সঙ্গে কি এতদূর আসি মোশায়।'

—'বাড়িটা আমার হলে তোমার কাছে কত দাম পেতাম চন্দ্রবদন?'

—'তা কম-সে-কম ষাট কি সত্তর হাজার তো পেতেনই। কিন্তু ফালতু এ কথা কেনো বলছেন? বাড়িটা তো আপনার নয় নরেশবাবু।'

আশ্চর্য! অপরপক্ষের কাছ থেকে আর কোনো উত্তর এল না।

অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না। শুধু সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি চোখে পড়ে।

একটা চক্রান্তের প্রতীকের মত অগ্নিবিন্দুটি অন্ধকারে জ্বলতে লাগল।

আট

রাত ন'টার পর অম্বর বাড়ি ফিরল।

দুঃখহরণ রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। শোবার ঘরে খাটের উপর বসে নীপা একটা চিঠি লিখছিল। কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পত্র নয়। সাদামাটা চিঠি। ইশারা, ইঙ্গিতের একটি আঁচড়ও নেই। তবু পত্র মুসাবিদা করতে বসে নীপা দু-তিনবার হোঁচট খেল। কাটাকুটি করল, লেটার-প্যাডের কাগজ নিয়ে ফের কালি-কলম আর মন একসূত্রে বাঁধল।

চিঠি লিখতে শুরু করার আগে অনেক কথাই নীপা চিন্তা করল। তার ব্যাপারটা অনিমেষ দত্তের কাছে স্পষ্ট করা ভালো। সে কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে, লেখাপড়া ছাড়ছে। ঘর-সংসার নদীতে ঘট বিসর্জনের মত ভাসিয়ে দিয়ে পলাশপুর থেকে চলে যাবে। তবু যার কাছে সে এতদিন পড়ল, তাকেই কিছু জানাবে না? নীপার মন কিছুতেই সায় দিল না। কেন সে এমনিভাবে যাবে? নিঃশব্দে, সংগোপনে, কাউকে কিছু বলবে না জানিয়ে চোরের মত পালাবে কেন?

প্রফেসর দত্তের সঙ্গে রবিবার সন্ধের পর তার দেখা হয়নি। সোমবার সে কলেজ কামাই করেছে। বিকেলে অনিমেষ দত্তের বাড়িতে তার পড়তে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানেও সে যায়নি। আজ মঙ্গলবার। আজও সে কলেজের পথে হাঁটল না। পর পর দু'দিন তাকে অনুপস্থিত দেখে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় তার সম্বন্ধে কালচার করতে শুরু করেছে।

চিঠি লেখা শেষ করে নীপা সেটি খামের মধ্যে ভরল। লেফাফার উপর ইংরাজিতে গোটা গোটা অক্ষরে প্রফেসর দত্তের নাম-ঠিকানা লিখল। চিঠি-ভর্তি খামটাকে এবার সে সযত্নে তুলে রাখল। প্রথমে তার টেবিলে, পরে একটা বই খুলে খামটাকে রেখে বই বন্ধ করল। চিঠিটাকে টেবিলে রাখা ঠিক নয়। এখন অম্বরের যা মন,—কখন কি ভেবে বসে। সকালবেলায় দুঃখহরণকে দিয়ে পাঠালেই চলবে। প্রফেসর দত্তের প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো অভ্যেস। মর্নিং-ওয়াক সেরে বাড়ি ফিরতে হয়তো একটু দেরি হবে। কাজেই সাতসকালে দুঃখহরণকে পাঠাবার কোনো মানে হয় না। বরং বিলম্বে কাজ হবে।

অবশ্য একটা শূন্যস্থান রয়ে যাচ্ছে। সেটি পূরণ করতে না পারলে তার এই প্ল্যান-ফন্দি অচল হয়ে রইবে। প্রফেসর দত্তের বাড়িটা দুঃখহরণ চেনে কি না সে জানে না। তবে চিনতে না পাবার মত কোনো কারণ নেই। সোজা, নাক-বরাবর পথ। ঠিকমত নির্দেশ দিলে হাবা-কালাও গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

দরজায় টোকা শুনেই নীপা উঠে দাঁড়াল। শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরটা কিছু দূরে। মাঝখানে এক ফালি উঠোন। দরজায় টোকা পড়ার শব্দ নিশ্চয় দুঃখহরণের কানে যায়নি। সুতরাং নীপা গিয়ে দরজা খুলল। সে যা আন্দাজ করেছিল তাই। এতক্ষণে অম্বর ফিরল। হাসপাতালে আজ ওর নাইট ডিউটি। সুতরাং সেখানে ও ছিল না। কোথায় এতক্ষণ আড্ডা দিছিল কে জানে।

ঘরে পা দিয়ে অম্বর তার দিকে একবার তাকাল। ঠিক তাকাল বলা চলে না। এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটি কথাও না বলে গটগট করে ভিতরে ঢুকল। খুব ব্যস্তভাব। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবার আগে কেউ কেউ যেমন তাড়াহুড়ো করে, তেমনি চঞ্চল ছটফটে ভঙ্গি।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুঃখহরণ, আমাকে তাড়াতাড়ি খেতে দে। এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে।' কথা শেষ হলে অম্বর গিয়ে বাথরুমে ঢুকল। চৌবাচ্চায় মগ ডুবিয়ে জল ভরল। চোখমুখ ধুতে লাগল।

বারান্দায় একটা খামের আড়ালে দাঁড়িয়ে নীপা সব লক্ষ্য করল। রাগে তার হাত-পা জ্বলছিল। ক্ষোভে-দুঃখে চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম। অম্বর যেন তাকে ইচ্ছে করে অপমান করছে। স্বামীর গালমন্দ, ধমক-ধামক, অন্যায় বকুনি,— মেয়েমানুষের সব সহ্য হয়। কিন্তু অবহেলা আর ঔদাসীন্য সয় না। ছুরির একটা তীক্ষ্ণ ফলার মত বুকের মধ্যে বেঁধে। নীপার ইচ্ছে হল, স্বামীর মুখোমুখি হয়। স্পষ্ট একটা কৈফিয়ত চায়। এমনি করে চাকর-বাকরের সামনে তাকে অপমান না করলেই কি নয়? বিশেষ করে স্বামীর ঘর-সংসার ছেড়ে তার দূরে চলে যাওয়াই যখন পাকাপোক্ত, এবং ঠিক। অল্প দু-একটা দিন স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত?

তবু স্বামীকে সে ঘাঁটাতে চাইল না। অম্বরকে সে ভালো করে চেনে। তার চোখের দুই ভুরুর দিকে তাকালেই নীপা অনেক কিছু টের পায়। বঙ্কিম দুই ভুরু কখন মুহূর্তে গলা-ফোলান মোরগের মত তেজি হয়ে ওঠে। নীপা ঠিক আঁচ করতে পারে। স্বামীর মনের আকাশের এখন অন্য চেহারা। ঈশান কোণে ঝড়ের মেঘ। যে-কোনো সময় লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হতে পারে। অম্বর এমনিতে ঠাণ্ডা। ভালোমানুষ,—আত্মচিন্তায় সর্বদা অস্থির। কিন্তু একবার মাথায় রাগ চাপলেই আর রক্ষে নেই। তখন সে মরিয়া—শিং-ওঁচানো শিবের বাহনের মত ভয়ঙ্কর।

হাতমুখ ধুয়ে অম্বর এসে খাবার টেবিলে বসল। দুঃখহরণ জলের গ্লাস নিয়ে এল, ভাতের থালা এনে সামনে রাখল। অম্বর দেরি করল না। মুখ নামিয়ে খেতে শুরু করল।

দুঃখহরণ রান্নাঘরে ফিরে গেছে দেখে নীপা সামনে এসে দাঁড়াল। তার উপায় নেই। নইলে উপযাচিকার মত কেউ এমন করে সামনে আসে? লজ্জায় নীপা প্রায় মরে যাচ্ছিল। কি বিশ্রী, অসহনীয় অবস্থা। শিমুলপুর ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এ-লজ্জার হাত থেকে তার রেহাই নেই।

ঘাড় তুলে অম্বর তাকে দেখল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। নীপা আশা করছিল, অম্বর কিছু বলবে। অন্তত তার সাজগোজ, বেশবাস দেখে সে কোনো মন্তব্য করবে। সাজে-পোশাকে নীপার আজ ভিন্নমত, অন্য রুচি। শ্বশুর-ভাসুর ঘরে এলে বউ-মেয়েরা যেমন সলজ্জা হয়ে ওঠে, মাথায় ঘোমটা দেয়, কাপড় টেনেটুনে শরীরের অংশ-বিশেষ ঢাকে, আজ হঠাৎ নীপাও তেমনি সাদাসিধে, আটপৌরে। বেশবাসে খুবই শালীন। পর্দা-ঢাকা ঘরের মত সুরুচিপূর্ণ এবং সুন্দর।

কিন্তু অম্বর চুপচাপ। নৈশ আহার সমাধা করতে সে যেন খুবই ব্যস্ত। দুটো কথা বলার ফুরসত পর্যন্ত নেই তার। টেবিলের সামনে সুন্দরী স্ত্রীর উপস্থিতি অনায়াসে অগ্রাহ্য করছে।

গম্ভীর মুখ করে নীপা বলল,—'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল আমার।'

থালা থেকে মুখ না তুলেই অম্বর জবাব দিল,—'কী কথা? বলে ফেলো—'

নীপা আহত হল। কী রকম মানুষ! বউয়ের সঙ্গে এ কী ধরনের ব্যবহার? গায়ে পড়ে কথা

বলতে গিয়ে তাকে আরো না কত অপমান কুড়োতে হবে। তাই ভূমিকা না করে সে আসল কথায় এল।

—'একটু আগে কাকাবাবু এসেছিলেন।' নীপা ধীরে ধীরে বলল।

—'কাকাবাবু?' অম্বর এবার ভাতের থালা থেকে মুখ তুলল। অবাক হয়ে বলল,—'কাকাবাবু মানে—'

নীপার মুখটা মরা মাছের মত শক্ত দেখাল। ইচ্ছে হল স্বামীকে প্রশ্ন করে। তার সম্পর্কের আত্মীয়-বন্ধুদের এখনই কি চিনতে অসুবিধে হচ্ছে? তবু তো নীপা শিমুলপুর ছেড়ে যায়নি। এখনও স্বামীর ঘরে।

কিন্তু এসব কথা বলা মানেই বাক-বিতণ্ডা। উল্টে অম্বরই তাকে আঘাত করবে। মিছিমিছি কথা কাটাকাটি। তাই নীপা আর ও-পথ মাড়াল না।

একটু পরিহাসের সুরে সে বলল,—'কাকা তো আমার একটিই। সেকথা তুমিও ভালো করে জানো। আর তিনি কেন এসেছিলেন তাও তোমার অজানা নয়।'

অম্বর তাড়াতাড়ি বলল,—'সে-কথা হচ্ছে না। আমি বলছিলাম, তিনি গেলেন কোথায়? এসেই কি আবার কলকাতা ফিরে গেলেন?'

নীপা একটু হাসল। বলল,—'কলকাতা ফিরে যাবেন কেন? তিনি এই শহরেই আছেন। তবে এবার আর এ-বাড়িতে ওঠেননি।'

অম্বর বিস্ময় প্রকাশ করল। 'তার মানে? কোথায় উঠেছেন তাহলে?'

—'একটা হোটেলে।' নীপা অন্য দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল। ছোট্ট একটা খোঁচা দেবার লাভ না সামলাতে পেরে সে ফের বলল,—'এ-বাড়িতে উঠবার মত জোর কোথায়? তাই হোটেলে উঠেছেন।'

অম্বর কোনো জবাব দিল না। মুখ নিচু করে সে আহারে মন দিল।

নীপা বলল,—'কাল সকালেই তিনি আসবেন বলে গেছেন। সঙ্গে একজন ভদ্রলোকও থাকবেন। তোমার কি একটু সময় হবে কথা বলবার?'

—'কাল সকালে মানে, কখন?'

—'এই আটটা নাগাদ—'

—'ভদ্রলোকটি কে আবার?' অম্বরকে সন্দিগ্ধ মনে হল।

ঠোঁট কামড়ে নীপা কি ভাবল। বলল,—'বাড়িটা উনিই কিনতে চান। কথাবার্তা পাকা করবেন বলে কলকাতা থেকে এসেছেন।'

—'তা আমাকে কেন দরকার?' অম্বর মুখ উঁচু করে কথা কইল। 'তোমার বাড়ি, তুমি নিজেই বিক্রি করবে। কথাবার্তা, দরদাম তোমার কাকাবাবুর সামনেই হতে-পারে। খামোকা আমাকে কেন জড়াচ্ছ?'

নীপা বুঝতে পারল অম্বর দূরে সরে থাকতে চাইছে। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সে মাথা গলাতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তার দোটানা অবস্থা। সাত তাড়াতাড়ি কাকার কাছে এ-সব কথা বলা যায় না। স্বামীর সঙ্গে তার খিটিমিটি, নিত্য বিরোধ। মনে মনে দুজনের আকাশ-জমিন ফারাক। তাই ঘর-বর সে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এমন কথা আত্মীয়জনের কাছে ঠিক ঘোষণা করা যায় না। ধীরে ধীরে সবাই জানবে। সংসারে তাই হয়, গলা বাড়িয়ে কেউ বড় মুখ করে বলে না। তাছাড়া একটা অসুবিধেও রয়েছে। এখনই কাকার কাছে তার সংকল্পের কথা বলা নিজের স্বার্থেই উচিত হবে না।

নীপা বলল,—'তোমার সঙ্গে কথা বলবেন বলেই ভদ্রলোক এতদূর এসেছেন। আর এখন

তুমি বেঁকে বসলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটু বিসদৃশ দেখায় না? ভদ্রলোক অন্য কিছু ভাবতে পারেন। কাকাই বা কী মনে করবেন। এখনও তাকে কিছু বলিনি।'

অম্বরের কপালে দু-একটি কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। —'সমস্যাই বটে।' সে একটু হেসে মন্তব্য করল।

নীপা বলল,—'ইচ্ছে না হয় বেশি কথাবার্তার মধ্যে যেও না। একটু হুঁ—না করে চালিয়ে নিও। দরদাম সব কাকাই ঠিক করেছেন। আমাদের মতামত পরে জানালেই হবে।'

চোখ তুলে অম্বর বলো,—'তোমার মত অভিনয় করতে বলছো?' সে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

নীপা জোর করে হাসল। তার ঠোঁটের ডগায় একটা শক্ত কথা এসেছিল। হাসি দিয়ে নীপা সেটিকে কোনোমতে চাপল। —'একে যদি তোমার অভিনয় বলে মনে হয়, তাহলে তাই করবে। স্ত্রীর সপক্ষে দুটো কথা বলাকে বড়জোর ওকালতি বলতে পার, অভিনয় কেউ বলবে না।'

অম্বরের খাওয়া শেষ হয়েছিল। টেবিল থেকে উঠে সে বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গেল। শ্রাবণ মাস হলেও আজ পরিষ্কার রাত্রি। ধোয়ামোছা আকাশের বুকে অতীত যুগের কোনো দক্ষ পটুয়ার হাতের কাজের মত একরাশ উজ্জ্বল ঝিকিমিকি তারা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীপা আকাশটাকে লক্ষ্য করছিল। এখন মেঘ নেই। মাথার উপর তারা ঝিলমিল শ্লেট রঙের আকাশ। বিস্তীর্ণ দুধসাদা ছায়াপথ। আবার মেঘ এসে ঢাকলেই অন্য রূপ। বুক-কাঁপানো মেঘের ডাক, তরবারির তীক্ষ্ণ ফলার মত ভয়-দেখানো বিদ্যুৎ।

অম্বর ডিউটিতে বেরিয়ে গেলে নীপার চোখ ছলছলিয়ে এল। দুঃখহরণ তাকে খেতে ডাকল। কিন্তু ভাতের থালার সামনে গিয়ে বসতে তার রুচি হল না। মনের ভিতর একটা শ্লথ অবসাদ মাকড়সার জাল বিছানোর মত তার চেতনার স্নায়ুগুলিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল। নীপা ভাবছিল এই বাড়িতে বড়জোর আর একটা দিন সে থাকবে। হয়তো আরো এক রাত্তির মেয়াদ। তার বেশি নয়। যে-কোনো ছলছুতো করে সে কাকার সঙ্গেই যেতে পারে। কেউ টের পাবে না।...আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ছেদ পড়বে তা কি সে এর আগে ভাবতে পেরেছিল?

হঠাৎ একটা মধুর স্বপ্নের মত তার বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ল। বাসরঘরে মেয়েরা কারণে-অকারণে খিলখিল করে হাসছিল। এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল। তার এক অল্পবয়সি মাসি কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল,—'তোর বিয়ের রাতটা বড্ড ছোট নীপা।'

মাসির কথার অর্থ তার বোধগম্য হয়নি। সে অবাক হয়ে তাকাতেই মাসি ওর গাল টিপে দিয়ে বলল,—'ন্যাকা মেয়ে। কিছু বোঝ না। শেষ রাত্তিরে বিয়ের লগ্ন। একঘন্টা মোটে বাসর। তা বিয়ের রাত্তিরকে ছোট বলব না? এক রত্তি বাসর হলে মন ভরে?' আজ সে-কথা মনে হতেই নীপা ম্লান হাসল। শুধু বিয়ের রাতটাই নয়, তার বিবাহিত জীবনটাও খুব ছোট্ট। মেশিন বিগড়ে হঠাৎ বন্ধ হওয়া ছায়াছবির শো'য়ের মত অসম্পূর্ণ।

বিয়ের কথা মনে করতেই তার মায়ের কথাও মনে হল। মা তখন বেঁচে। ছোটবেলায়, সে খুব সুন্দর দেখতে ছিল। একমাথা বব-ছাঁট চুল। ফুটফুটে গোলগাল বেবি,—ঠোঁটদুটো গোলাপি লাল। ঠিক একটা বড় সাইজের ডল পুতুল। আদর করে মা বলতেন,—'ও আমার গোলাপরানী।' তাকে দেহের সঙ্গে চেপে ধরে কত আদর করতেন। বুক ভরে নিশ্বাস নিতেন। ঠিক যেন একটা গোলাপ ফুলের গন্ধ শুঁকতেন।

গোলাপরানী কথাটা মনে হতেই তার হাসি পেল। তার সঙ্গে গোলাপ ফুলের তুলনা? সে গোলাপই বটে। কার কাছে কথাটা শুনেছিল, নীপার তা মনে নেই। হয়ত নীলাদ্রি, কিংবা অন্য

কেউ হবে। লন্ডনের বাজারে গোলাপ ফুল বিক্রি হয়। বেশ তাজা, বড় সাইজের ফুল। এক শিলিং দাম। ফুলের কি সৌরভ আর বাহার। কিন্তু সবাই জানে, এক শিলিং-এর ফুলের আয়ু মাঝ-রাত্তিরেই কাবার।

ঠিক আটটা নয়। তার একটু পরেই কাকা এলেন। সঙ্গে সেই অবাঙালি ভদ্রলোক।

বাইরের ঘরে বসে অম্বর খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। এই মাত্র আরো এক কাপ চা সে শেষ করল। কাগজ পড়া হলেই দাড়ি কামাবে। তারপর বাথরুমে ঢুকবে। স্নানটান সেরে টানা ঘুম। ফের নাইট-ডিউটি। দিনের বেলায় ভালো করে না ঘুমুলে শরীরের ম্যাজম্যাজানি কাটবে না।

কাকাকে দেখেই অম্বর উঠে দাঁড়াল। 'আসুন, আসুন। কাল সন্ধেবেলায় এসেছিলেন শুনলাম।' একটু থেমে ফের বলল,—'মিছিমিছি হোটেলে উঠতে গেলেন কেন?'

একগাল হেসে কাকা বললেন,—'তুমি দুঃখ পেয়েছ জানি। কিন্তু কী করব বলো বাবাজি। এই চন্দ্রবদনবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না। হোটেলে উনি একা থাকতে নারাজ। আমি বললাম, তাই সই। একযাত্রায় পৃথক ফল কেন আর—।'

নিজে আসন গ্রহণ করেই কাকা তাঁর সঙ্গীকে বললেন,—'বসো হে চন্দ্রবদনবাবু।' তারপর গলার স্বর এক খাদ তুলে নীপার উদ্দেশে বললেন,—'তাড়াতাড়ি চলে আয় মা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজের কথাবার্তাগুলো আগে ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে যাক।'

কাকা আসবার আগে নীপা তৈরি হয়ে বসেছিল। অম্বর কেমন করে কথা-টথা বলে, তাই নিয়ে তার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর তার মুখ রেখেছেন। স্বামীর কথাবার্তায় আন্তরিকতার এতটুকু অভাব নেই। পরিচ্ছন্ন মিষ্টি ব্যবহার। অন্তরে আগুন জ্বললেও সে-আগুনের উত্তাপ বাইরে ছড়ায়নি। মনে মনে অম্বরকে সে তারিফ করল। তাদের জোড়াতালি দেওয়া সম্পর্কটা কাকার পক্ষেও আঁচ করা কঠিন।

দুঃখহরণকে বলা ছিল। নীপা ঘরে ঢুকবার আগে জলখাবার আর চায়ের কাপ যেন অতিথিদের সামনে সাজিয়ে দেয়।

কাকার ডায়াবেটিস আছে। তিনি মিষ্টি ছোঁবেন না। তার জন্য চারখানা ফুলকো লুচি, একটু বেগুনভাজা, প্লেটের একপাশে সামান্য নুন। শর্করাবিহীন এক কাপ চা। অন্য লোকটির জন্য নীপা ডিসে করে মিষ্টি সাজিয়ে পাঠাল।

খাবার দেখে কাকা সহাস্যে বললেন,—'দেখেছ চন্দ্রবদনবাবু, ভাইঝির আমার কেমন সব কথা মনে থাকে। আমার অসুখের কথা পর্যন্ত বেটি ভোলেনি।'

চন্দ্রবদন কোনো উত্তর দিল না। শুধু একটুকু হাসল। অম্বর বলল,—'ভালো কথা, আপনার শরীর এখন কেমন? ব্লাড-সুগার আর করিয়েছিলেন নাকি?'

—'নিশ্চয়। এই তো সেদিন এক প্রস্থ ব্লাড-সুগার ইত্যাদি সব হল। তা আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো আছি।' কাকা তার দেহের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন।

—'পার্সেন্টেজ কত এখন?' অম্বর প্রশ্ন করলো।

—'এক'শ আশি মিলিগ্রাম। কাকা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। 'আগে তো তিনশো মিলিগ্রাম পর্যন্ত উঠেছিল। কম ইনজেকশন কি নিতে হল বাবাজি।'

অম্বর হাসল। 'তা ইনজেকশন না নিয়ে উপায় কী বলুন? তিনশো মিলিগ্রাম পার হানড্রেড সি-সি। রীতিমত অ্যালার্মিং কেস।'

কাকা হেসে বললেন,—'বুঝলে বাবাজি, ও ইনজেকশনগুলো আমার কাছে এখন ডাল-ভাত।

শেষের দিকে তো নিজেই ছুঁচ ফুটিয়েছি,—ডাক্তার-বদ্যির ভরসায় আর থাকিনি। তা এই ফাঁকে ইনজেকশন দেবার বিদ্যেটাও রপ্ত হয়ে গেল আমার।'

—'তাই নাকি?' অম্বর কৌতুক করে বলল,—'তাহলে আপনি তো এখন হাফ-ডাক্তার।'

অম্বরের কথা শেষ হতেই নীপা ঘরে ঢুকল। একটু আগেই সে স্নান করেছে। ভেজা চুল পিঠের উপর ছড়ানো। কপালে ছোট একটি টিপ। মুখে পাউডারের পাফটা এক-আধবার বুলিয়েছে বোঝা যায়। চোখের কোণে অল্প একটু কাজলের রেখা। পরনে জংলি ফুল-টুল আঁকা ছাপা শাড়ি। গায়ে গোল-গলা প্রমাণ সাইজের জামা। পেট-কাটা নয়—পিঠের শেষপর্যন্ত নেমে আসা ব্লাউজ।

তার দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন,—'আয় মা, আয়। বুঝলেন চন্দ্রবদনবাবু, এই হল আমার ভাইঝি নীপা। এরই বাড়ি আপনি কিনবেন।'

লোকটাকে দেখেই নীপা চমকে উঠল। ভয়ে এবং বিস্ময়ে তার মুখখানা অদ্ভুত দেখাল। মনে মনে নীপা বলছিল,—ধরণি, দ্বিধা হও। কাব মুখ দেখে আজ সে উঠেছিল কে জানে? নইলে বাড়ি কিনবার জন্য এদেশে আর লোক পাওয়া গেল না। বেছে বেছে কাকা এই লোকটাকেই তার সামনে এনে হাজির করলেন।

চন্দ্রবদন অবাক হয়ে দেখছিল। এই মেয়েটাই নরেশবাবুর ভাতিজি? তার সামনে উপবিষ্ট ছোকরা মতন লোকটাই ওর হাজব্যান্ড? চন্দ্রবদনের কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি মিলিয়ে যেতে বেশ একটু সময় লাগল।

অম্বরের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই নীপা বুঝতে পারল। গণ্ডগোলটা স্বামীর চোখে ধরা পড়েছে। লোকটার সঙ্গে আচমকা দেখা হতেই নীপা খুব অবাক হয়েছিল। তার হাসি হাসি মুখে প্রথমে বিস্ময় এবং পরে ভয় ধরা পড়ল। শেষদিকে তার মুখখানা রীতিমত শুকনো দেখাল। নীপার নিজেরই তা মনে হয়েছে।

অমন ত্রস্ত বিহ্বল মুখ দেখে কাকা কি ভাবলেন কে জানে। শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় এখানে এসে বস।'

কাকার কথায় নীপা যেন মুক্ত বায়ুর স্পর্শ গেল। এতক্ষণ তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতি। কী করবে নীপা ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ পা পিছলে গেলেও কোনোমতে সে সামলে নিয়েছে। কাকা আদেশ করতেই নীপা আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বাধ্য মেয়ের মত টুপ করে তাঁর পাশে বসে পড়ল।

জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন,—'বুঝলে বাবাজি, বাড়ির দরদাম নিয়ে চন্দ্রবদনবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। উনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম দিতে রাজি। এখন তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে বিবেচনা করে দেখ। এই টাকা পেলে সম্পত্তি বিক্রি করতে পার কিনা—'

অম্বর হেসে বলল,—'বাড়িটা ঠিক আমাদের দুজনের নয়। এটা আপনার ভাইঝিরই। দামের কথা ওকে বলেছেন?'

কাকা একটু হাসলেন। বাবাজীবন ভীষণ চতুর। বিয়ের সময় বাড়িটা যে যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়নি, সেই কথাটা জামাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল।

কাকা বললেন,—'আইনত বাড়িটা অবশ্য নীপারই। কিন্তু আইনের কথা থাক। টাইটেল নীপার হলেও তুমি তার স্বামী। স্ত্রীর সম্পত্তি যদি বিক্রি হয় তাতে স্বামীর মতামতের একটা মূল্য আছে বৈকি।'

অম্বর এই নিয়ে তর্ক করল না। মৃদু হেসে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

এতক্ষণ নীপা চুপচাপ ছিল। কোনো কথা বলেনি। কিন্তু এবার সে মুখ খুলল। কাকার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'কাল সন্ধেয় তুমি যেন আরো কিছু বলছিলে।'

—'আর কী বলছিলাম? ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে।' কাকা প্রসন্ন দৃষ্টিতে অম্বরের দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন। 'এ কথাটাও তোমাকে বলা দরকার বাবাজি। চন্দ্রবদনবাবুর একটা ছোট্ট আর্জি আছে। ব্যাবসাদার মানুষ, টাকাকড়ি সব ব্যাবসাতেই খাটছে। এতগুলো সাদা টাকা বের করে দিলে কারবারের খুব ক্ষতি হবে। তাই উনি বলছিলেন, যদি হাজার-পনেরো টাকা তোমরা একটু হেরফের করে নাও। মানে, বাড়িতে ওঁর কিছু গোপন টাকা আছে। বাকি টাকাটা অবশ্যই উনি চেকে পেমেন্ট করবেন।'

অম্বর মুচকি হাসল। 'বুঝতে পেরেছি। দশ হাজার টাকা ব্ল্যাক-মানি দিতে চান, এই তো?' একটু থেকে সে ফের বলল,—'তা ঠিক আছে। আমরা একবার ভেবে দেখি। আপত্তির তেমন কোনো কারণ নেই। সাদা হোক আর কালো হোক, যে বিক্রি করবে, তার টাকা পেলেই হল।' কথা শেষ করে সে স্ত্রীর দিকে তির্যক ভঙ্গিতে তাকাল।

চন্দ্রবদন এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। অম্বরের মুখের দিকে শুধু ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল,—'একঠো বাত্ শুনুন বাবুজি। নরেশবাবু হামার বহুৎ জান-পয়ান আদমি। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। ব্যাঙ্ককা রুপেয়া আউর ঘরকা রুপেয়া এক হি চীজ্। আপনার কুছু তকলিফ্ হোবে না। লেকিন হামার বহুৎ উপ্কার হোবে।'

কাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'ঠিক আছে। তোমরা তাহলে একটু চিন্তা করে দেখ। সন্ধের দিকে আমি একবার ঘুরে যাব। চলি তাহলে এখন—।'

প্রথমে চন্দ্রবদন এবং তার পিছু পিছু কাকাও দরজা পেরিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। দুজনে রওনা হতেই নীপাও মুখ ফেরাল।

বাইরের ঘরে অম্বর নেই। কখন এক ফাঁকে উঠে গেছে। নিশ্চয় দাড়ি কামাতে ব্যস্ত, কিংবা বাথরুমে ঢুকেছে। শোবার ঘরে ঢুকে নীপা প্রায় আঁতকে উঠল। বিছানার উপর অম্বর টান-টান হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার খালি গা, হাতে চকচকে খোলা ক্ষুর। ক্ষুরের ধারালো দিকটা গালের উপর নয়,—গলার উপর চেপে ধরে অম্বর কী যেন চিন্তা করছে।

ভয়ে, আতঙ্কে নীপার চোখদুটো ছোট হয়ে এল। চিৎকার করে সে বলল,—'ওগো, এ তুমি কী করছ!'

নয়

স্ত্রীর ছটফটে, ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কানে যেতেই অম্বর উঠে বসল। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। নীপার মুখের উপর একবার চোখ বুলোল। একটা আঙুলের সাহায্যে ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করে বলল,—'কি, ভয় পেলে নাকি?'

এমন কথার স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না। নীপা অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখল। স্বামীর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। ক্ষুরটা খোলা,—এখনও বন্ধ করেনি। জানালার ফাঁক দিয়ে সকালের সোনা রোদ বিছানার উপর এসে পড়েছে। রৌদ্রকিরণে ধারালো ক্ষুরটা মারাত্মক ঝকঝকে, চকচকে দেখাচ্ছে।

স্বামীর কথার জবাব না দিলে তার প্রশ্নটাই মেনে নিতে হয়। একটু হেসে নীপা তাই উত্তর দিল,—'বারে, ভয় পাব কেন? আমি খুব চমকে উঠেছিলাম। তোমার কাণ্ড দেখে কেউ অবাক না হয়ে পারে? ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করবার আর জায়গা পেলে না? তাই নিজের গলার উপরেই ক্ষুরটা চেপে ধরেছ।'

'—হ্যাঁ' অম্বর গম্ভীর মুখ করে বলল। 'ক্ষুরটা নতুন। নিজের গলায় ঠিক পরীক্ষা করা গেল

না।' স্ত্রীর মুখের উপর চোখ রেখে সে ফের বলল,—'পরে অন্য কোথাও চেষ্টা করা যেতে পারে।'

অম্বরের কথা শুনে নীপার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ভূমিকম্পের মত অল্পক্ষণ কেঁপে উঠল। বাসি গোলাপের মত মুখটা শুকনো দেখাল। প্রায় জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলল,—'এখনই তো দাড়ি কামাবে। আজ না হয় নতুন ক্ষুরটাই ব্যবহার করলে। তাহলেই তো তোমার সমস্যা মিটে যায়।'

অম্বর কোনো কথা বলল না।

ক্ষুরটা ভাঁজ করে সে তুলে রাখল। নীপা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছিল। অম্বর তাকে ডেকে বলল,—'যেও না নীপা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

নীপা থমকে দাঁড়াল। স্বামীর কণ্ঠস্বরে অনুরাগের ছিটেফোঁটাও নেই। কেমন একটা হুমকির ভাব। কড়া ঝাঁঝালো গন্ধ। ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত সে চিন্তা করল। অম্বর তাকে কী বলতে চায়?

স্বামীর দিকে তাকিয়ে নীপা ফিক করে হাসল। সুন্দর একটি ভঙ্গি করে সে দাঁড়াল। ভ্রূ-নাচিয়ে বলল,—'কী কথা বলবে আবার?'

অম্বর দু'পা ফেলে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল। নীপার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই স্থিরদৃষ্টিতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সে তাকিয়ে রইল।

—'অমন করে কী দেখছ?' নীপা একটা অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করে বলল। 'আমার কাজ আছে। কি কথা বলবে তাড়াতাড়ি বল।'

স্ত্রীর মুখের দিকে তেমনি একনাগাড়ে তাকিয়ে সে বলল,—'লোকটা কে?'

নীপার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। এতক্ষণ বিছানায় চুপচাপ শুয়ে গলার উপর ধারালো ক্ষুরটা ফেলে, এই কথাটাই তাহলে সে চিন্তা করছিল? নীপা জানত অম্বর তাকে প্রশ্নটা করবে। এখনই, কিংবা অন্য কোনো সময়। স্বামীর গোমড়া মুখ, চকচকে ধারালো ক্ষুরের পেছনে জিজ্ঞাসার চিহ্নটিকে অনেক আগেই সে দেখতে পেয়েছে। মনে মনে তাই সে তৈরি হয়েছিল।

প্রশ্ন শুনেই ঘাড় বেঁকিয়ে নীপা উত্তর দিল। 'কোন লোকটা? তুমি কার কথা বলছ?'

—'ন্যাকামি রাখো।' অম্বর মুখ ভেংচাল। 'কোন লোকটা তাও তোমায় বলে দিতে হবে?'

—'বারে! বলে না দিলে আমি বুঝব কেমন করে? তুমি কার কথা জিজ্ঞেস করছ?'

—'খুব সেয়ানা হয়েছ দেখছি।' অম্বর ব্যঙ্গ করল। স্ত্রীর মুখের উপর চোখ রেখে সে ফের বলল,—'একটু আগেই তো সে এসেছিল। তোমার মুখ দেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঢেলে বাড়ি কিনতে রাজি।'

—'কি আজেবাজে কথা বলছো।' নীপা প্রতিবাদ জানাল। 'তোমার মুখে দেখি কিছুই আটকায় না।'

—'আমার কথার উত্তর দাও। ও লোকটা কে?'

—'তুমি কী বলতে চাও? ও কে তা আমি কেমন করে জানব?' একটু থেমে সে ফের বলল, —'ভদ্রলোকের নাম চন্দ্রবদনবাবু। কলকাতায় থাকেন। বাড়ি কিনবেন। তাই কথাবার্তা বলতে পলাশপুরে এসেছেন। এই পর্যন্ত আমি জানি, হয়তো তুমিও জান। এর বেশি আমরা কেউ জানি না। তোমার কৌতূহল থাকে, তুমি কাকার কাছে চলে যাও। এর বেশি তাঁর জানা থাকতে পারে।'

অম্বর বাঁ হাতের করতলে ডান হাতের পাকানো মুঠিটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বার-দুই-তিন ঠুকল। ধীরে ধীরে তার চোখদুটি ঈষৎ ছোট হয়ে এল। মুখখানা শক্ত করে সে বলল,—'তুমি বলতে চাও, লোকটাকে এর আগে তুমি চিনতে না? ওর সঙ্গে তোমার পূর্ব-পরিচয় ছিল না?'

নীপা সরাসরি অগ্রাহ্য করল। 'কোনোদিন না। ওর পরিচয় আমি কেমন করে জানব?'

অম্বর উত্তেজিত হয়ে বলল,—'মিথ্যে কথা। তুমি ওকে চেনো। তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল। নইলে—' এক মুহূর্তের জন্য সে থামল। স্ত্রীর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল। তারপর সহসা পিছন ফিরে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে অম্বর বলতে লাগল,—'পুকুরের শান্ত জলে কখনও ঢিল ছুঁড়েছ নীপা? নিশ্চয় দেখেছ, ঢিলটা পড়লেই কেমন ছলাৎ করে একটা শব্দ হয়। তারপর ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য সেগুলো মিলিয়ে যায়। তখন পুকুরের জল আবার শান্ত দেখায়।' কথা শেষ করেই অম্বর এদিকে ফিরল। পুনরায় স্ত্রীর মুখোমুখি হল।

নীপা বলল,—'তুমি কী বলতে চাও? লোকটার সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয় ছিল? ওকে আমি চিনতাম?' শেষদিকে তার কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনাল।

—'নিশ্চয়।' অম্বর অনুত্তেজিত গলায় উত্তর দিল। 'লোকটাকে বোধহয় তুমি এখানে ঠিক আশা করোনি। তাই তোমার চোখমুখ, হাবভাবের পরিবর্তন এত সহজে আমার চোখে ধরা পড়ল। একটু আগে তোমায় বলিনি নীপা? পুকুরের শান্ত জলে ঢিল পড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়! তোমার মুখেও দুশ্চিন্তার ছোট ছোট তরঙ্গ আমি লক্ষ্য করেছি। অতর্কিতে লোকটাকে এখানে দেখেই তুমি বেশ চমকে উঠেছিলে।'

নীপা কিন্তু হার স্বীকার করল না। ব্যঙ্গ করে সে বলল,—'বাঃ! তুমি দেখছি আজকাল থট্ রিডিং করতে শিখে গেছ। মুখ দেখে যখন মনের ভাষা বলতে পারো, তখন তুমি একজন জাদুকর ছাড়া আর কী?'

অম্বর বিরক্ত হল। 'বাজে কথা রাখো। লোকটা কে তা বলতে তুমি তাহলে রাজি নও?'

—'যতটুকু জানি, তা বলেছি। এর বেশি আমার জানা নেই।' নীপা স্পষ্ট জবাব দিল।

—'ঠিক আছে।' অম্বর একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করে বলল। 'ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ছিল, তা আমি খুঁজে বের করবই। এই আমার প্রতিজ্ঞা।' কয়েক সেকেন্ড পরে অনেকটা আপনমনে সে ফের বলল,—'লোকটাকে দেখে তোমার মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল কেন? এর পেছনে নিশ্চয় কোনো গূঢ় রহস্য আছে।'

একটুও না দমে নীপা পাল্টা জবাব দিল,—'সন্দেহ-বাতিক মন হলে অমন ছায়াটায়া দেখার ভ্রম হয়। হঠাৎ উটকো লোককে ঘরে দেখলে বাড়ির মেয়েরা কি হেসে গড়িয়ে পড়বে? না, তুমি কি তা আশা করেছিলে?'

স্ত্রীর কথার কোনো উত্তর দেওয়া অম্বর প্রয়োজন মনে করল না। গ্রীষ্ম দিনের নির্জন মধ্যাহ্নের মত একটা আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা এবং একাকীত্ব সে মনে মনে অনুভব করল। আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে সে কাঁধের উপর রাখল। দ্রুতপায়ে অম্বর গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

বাথরুমের দরজা বন্ধ হতেই নীপা শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। দুই করতলের সাহায্যে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সমস্ত পৃথিবী যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি তার বিপক্ষে। নইলে দুনিয়ার এত মানুষ থাকতে এই লোকটাই কেন তার বাড়ি কিনতে আগ্রহী হবে? বুদ্ধি করে নীপা যদি একবার কাকার বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা করত। তাহলে কখনও লোকটাকে এ-বাড়ির দরজায় সে আমন্ত্রণ জানাত না। কাকাকে স্পষ্ট বলত। অত কম দামে সে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি নয়। ছোট্ট এক-কথায় সমস্ত ব্যাপারটা সুন্দর কেঁচে যেত।

কিন্তু এখন তার জালে-বন্দী মাছের অবস্থা। তাকে দেখে চাঁদবদনও খুব অবাক হয়েছে। ইতিমধ্যে তার কাকার কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা কি সে সবিস্তারে ব্যক্ত করেনি? আর অম্বরও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার পাত্র নয়। আজই সে চাঁদবদনের সঙ্গে দেখা করবে। এবং ছলে

কিংবা কৌশলে স্ত্রীর গোপন দুর্বলতাটুকু জানবার জন্য সে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

আর একজনের কথাও নীপার মনে হল। দিনটা বুধবার। রাত একটু বাড়লে তারও আসবার কথা। নীপা সে-কথা ভোলেনি। কিন্তু তার হাতে টাকা কই? দু' হাজার টাকা। যা সে দাবি করেছে। কেমন করে, কী উপায়ে সে ওই লোকটার মুখ বন্ধ করবে?

পরদিন সকালের কথা ভাবতেই নীপার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে এল। লোকটা তাকে রেহাই দেবে না। টাকা না পেলেই সে অম্বরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। অনেক রং চড়ানো একটি কেলেঙ্কারির কাহিনি সবিস্তারে তার স্বামীকে শোনাবে।

হঠাৎ চকচকে, ধারালো ক্ষুরটার কথা মনে হতেই নীপার চোখদুটো ভয়ে বন্ধ হয়ে এল।

অনিমেষ দত্ত পলাশপুরে ছিলেন না। মঙ্গলবার সকালেই তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। সোমবার দিন ঘুম থেকে উঠে তিনি আর প্রাতঃভ্রমণে বের হননি। সকাল থেকেই তাঁর দেহ-মন ভালো ছিল না। মস্তিষ্কের কোথাও একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হয়েছে। সমস্ত দেহে তাই অস্বাচ্ছন্দ্য। পাকানো তারের মত একটা সর্পিল পথে মনটা কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জানেন, প্রফেসর দত্তের মাঝে মাঝে রক্তচাপের আধিক্য হয়। তখন দু'-পাঁচ দিন ভদ্রলোক কলেজ কামাই করেন। কলকাতা যান, ডাক্তার-বদ্যির সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন। কয়েকদিন চিন্তাবিহীন পরিপূর্ণ বিশ্রাম, ওষুধপত্র ইত্যাদি চলে। রক্তচাপ একটু কমলেই ভদ্রলোক আবার স্বাভাবিক হন। নিয়মিত কলেজ যাতায়াত শুরু করেন।

অনিমেষ দত্ত ভেবেছিলেন, সোমবার দুপুরের ট্রেন ধরেই কলকাতা যাবেন। মন-মর্জি জং-ধরা লোহার মত অচল। যত তাড়াতাড়ি কলকাতা রওনা হতে পারেন, ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল। খুব শীঘ্র কোনো ব্যবস্থা না হলে তাঁর মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। দেহযন্ত্র বিকল হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

সোমবার দিন তিনি আর কলকাতা যেতে পারেননি। বিকেলের দিকে তাঁর ছাত্রী নীপা রায়ের পড়তে আসবার কথা। সপ্তাহে মাত্র দুটি দিন সে পড়তে আসে। তিনি কলকাতা চলে গেলে নীপাকে মিছিমিছি ফিরে যেতে হবে। প্রফেসর দত্ত তা চান না। চুক্তি অনুযায়ী সোম এবং শুক্রবার তাঁর পড়ানোর কথা। নেহাৎ অসমর্থ না হলে এই দুটো দিন তিনি গরহাজির থাকতে রাজি নন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামল। আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটে উঠল। অনিমেষ দত্ত ছাত্রীর প্রতীক্ষায় দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। কিন্তু অধ্যাপকের কাছে নীপা রায় পড়তে এল না। পলাশপুরের ঘরে ঘরে গৃহস্থবধূরা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। অনিমেষ দত্ত খুব অবাক হলেন। হঠাৎ নীপা কেন কামাই করল, এর কার্যকারণ নির্ণয় করতে তিনি বহু সময় ব্যয় করলেন। রাত বেশি হলে তাঁর মস্তিষ্কের উত্তেজনাও বাড়ল। ঘাড়ের কাছে একটা দপদপে বেদনা। মাথাটা খুব ভারী মনে হল। রাত্রে বেশ কয়েকবার জেগে উঠলেন,—কিছুতেই সুনিদ্রা হল না।

বুধবার দিন প্রথম ট্রেনেই অনিমেষ দত্ত পলাশপুরে ফিরে এলেন। সকাল ন'টা নাগাদ ট্রেনটা এসে শিমুলপুরে পৌঁছাল। স্টেশনের চৌহদ্দি থেকে বেরোতেই একটা পলাশপুরগামী বাস তাঁর চোখে পড়ল। স্ট্যান্ড ছেড়ে বাসটা সদ্য এগিয়েছে। নানা বুকনি আউড়ে আর হাত-পা ছুড়ে কন্ডাক্টরটা যাত্রী সংগ্রহের শেষ চেষ্টা করছে। তাঁকে দেখে বাসটা প্রায় থামল। কিন্তু প্রফেসর দত্ত ইশারা করে ড্রাইভারকে এগিয়ে যেতে বললেন। গতকাল কলকাতায় তাঁকে ছোটখাটো একটি দুর্ঘটনায় পড়তে হয়েছিল। সময় খারাপ হলে বিপদ-আপদ ছায়ার মত মানুষকে অনুসরণ করে। দুঃসময় এমনি জিনিস। তিনি এক ভেবে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলেন। পথে দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হল।

ট্রেনে আসবার সময় দু-একজন সহযাত্রীর কৌতূহল মেটাতে তাঁকে এই বৃত্তান্তও বলতে হয়েছে।

সামান্য ঘটনা। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কলার খোসার পা স্লিপ করে তিনি সজোরে পড়ে যাচ্ছিলেন। ডান হাতের উপর ভর করে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়েছেন অবশ্য। কিন্তু আচমকা সমস্ত দেহের ভার পড়ায় ডান হাতটি জখম। ফলে তখনই চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হল। যথারীতি এক্স-রে; রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মত ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে তিনি পলাশপুরের যাত্রী। অন্তত দিন সাতেক পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে ডাক্তার উপদেশ দিয়েছেন। এক হপ্তা পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বাসে নয়, ট্যাক্সি করে অনিমেষ দত্ত পলাশপুরে পৌছলেন। তখন ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে নটার মত। তাঁর ভৃত্য রামহরিকে নির্দেশ দেওয়া ছিল। বুধবার সকালেই তিনি ফিরবেন। সে যেন সকালে এসেই ঘরদোরে ঝাঁটপাট দেয়। রাঁধাবাড়ার আয়োজন করে।

মনিবের ব্যান্ডেজ বাঁধা ঝোলানো হাত দেখে রামহরি প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—কী হল গো বাবু? হাতটা ভেঙেছে নাকি?'

অনিমেষ দত্ত গম্ভীর মুখে বললেন,—'হ্যাঁরে, এই এক গেরো হল। এখন ক'দিন ভোগাবে কে জানে?'

নিজের ঘরে এসে ট্রেনের জামাকাপড় তিনি বদলে ফেললেন। ডান হাতটা অকেজো। অনভ্যাস বলেই অসুবিধে হল সবচেয়ে বেশি। দু' মিনিটের কাজ দশ মিনিটে সমাধা হল।

হঠাৎ রামহরি ঘরে ঢুকে বলল,—'একটা লোক সকালে আপনার খোঁজে এসেছিল।'

—'কে লোক? কী বলছিল?' অনিমেষ ব্যগ্র হয়ে তাকালেন।

—'ওই যে দিদিমণি পড়তে আসেন,—ছোকরা তাঁর বাড়িতেই কাজ করে। একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।'

—'চিঠি? কই চিঠি?'

মনিবের ব্যস্ততা দেখে রামহরি এক দৌড়ে চিঠিখানা নিয়ে এল। খাম ছিঁড়ে পত্রখানা বের করতে যা একটু দেরি হল। অনিমেষ দত্ত অবাক হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর ছাত্রী নীপা রায় চিঠিখানা লিখেছে। কালো কালো অক্ষরগুলির উপর দিয়ে চপলমতি বালকের মত তিনি প্রায় দৌড়ে গেলেন। শিরোনামায় মঙ্গলবারের তারিখ। নীপা লিখেছে—

মাস্টারমশায়,

গতকাল আপনার কাছে পড়তে যাইনি। যাইনি লিখলাম এই অর্থে যে অনুপস্থিতি আমার ইচ্ছাকৃত। আপনার কাছে পড়াশুনো করা আর হল না। এর কারণ সম্ভবত আপনি জানতে চাইবেন। কিন্তু মাস্টারমশায়, ছাত্রী হয়ে আপনাকে তা জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য চিঠিতে না লিখলেও সে কারণ নিশ্চয়ই আপনার অজানা থাকবে না।

আপনার কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু আজ সেই প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর জানা দুই আমার কাছে নিরর্থক। সুতরাং সে কৌতূহল আর প্রকাশ করলাম না।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

ইতি—
নীপা রায়

চিঠি পড়া শেষ করে অনিমেষ দত্ত অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। মাস গেলে নীপার কাছ থেকে তিনি দেড়শো টাকা করে পেতেন। সদ্য খোয়ানো মোটা টাকার টুইশানির জন্য হোক, কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক অনিমেষের দুটি চোখে একটা অস্থির উত্তেজনা চকমকি ঠোকা

আগুনের ফুলকির মত মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছিল। ছাত্রীর পত্রখানি আর তিনি খামে ভরলেন না। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে চিঠিখানা ধরে কটা অপ্রয়োজনীয় কাগজের মত সেটিকে দলা পাকিয়ে ফেললেন। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর শান্ত চরণে তিনি রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন।

উনুন খালি, গনগনে কয়লার আঁচ। রামহরি এক কোণে বসে কুটনো কুটছিল। অনিমেষ দত্ত উনুনের উপর একটু ঝুঁকে দলা পাকানো কাগজটিকে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করলেন। উনুনের আঁচে তাঁর ফর্সা মুখখানা বেশ রক্তাভ দেখাচ্ছিল। চিঠিখানা পুড়ে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরের ট্রেনেই অবিনাশ শিমুলপুরে নামল। তার ইচ্ছে ছিল ফার্স্ট লোকালটা ধরে। কিন্তু মনের বাসনা আর ট্রেনের সময়কে সাঁড়াশির দুই দাঁড়ার মত এক করা অবিনাশের পক্ষে কঠিন হল। ফার্স্ট লোকাল ধরতে হলে, তাকে সেই কাক-ডাকা ভোরে উঠতে হত। অথচ ভোরের আলোর সঙ্গে অবিনাশের চিরকালের বৈরিতা। ফলে যা হয় তাই। তার ঘুম ভাঙল দেরিতে, তখন আর ট্রেনের সময় নেই।

স্টেশনের বাইরে এসে অবিনাশ আর বাসের জন্য অপেক্ষা করল না। ব্যাগে অতগুলি কড়কড়ে টাকা। মনমেজাজ এখন গ্যাস বেলুনের মত হাল্কা। এদিকে গরমও বেশ। এরই মধ্যে অবিনাশ ঘামতে শুরু করেছে। টাউন বাস ডাকপিওনের মত দশ বাড়ির দরজা ঘুরে যাবে। মিছিমিছি বাসে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

ট্যাক্সি থেকে নামার মুখেই অবিনাশের চোখে পড়ল। দেবরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৈতি হনহন করে পুবমুখে চলেছে। ওর হাবভাব আর ব্যস্ততা দেখে মনে হবে যে জরুরি কাজের নির্ঘাৎ কোনো তাড়া আছে। অবিনাশ চটপট ভাড়া চুকিয়ে চৈতির পিছু নিল। মেয়েটার মুখ দেখেই ব্যাপারটা সে আন্দাজ করেছে। একটু আগেই চৈতি দেবরাজের কাছে গিয়েছিল এবং সম্ভবত সেখানে সে আমল পায়নি। হয়ত দেবরাজ ওকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। অসম্ভব নয়, প্রত্যাখ্যাত প্রেমের জ্বালায় সে এখন জ্ঞানশূন্য, দিশাহারা।

চৈতি বেশি দূর যেতে পারেনি। হাজার হলেও, মেয়েমানুষ। কত জোরে আর হাঁটবে? অবিনাশ ওকে মিনিট কয়েকের মধ্যে ধরে ফেলল।

—'চৈতি দেবী, দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে কথা আছে।' সে ক্লান্তভাবে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল।

চৈতি ঘুরে দাঁড়াল। অন্যদিক হলে অবিনাশকে দেখে নিশ্চয় সে হাসত। খুব অবাক হয়েছে এমনি একটা ভাব করে বলত,—'ওমা! আপনি বুঝি?' শেষকালে একটু টেনে টেনে যোগ করত, —'আমি ভাবলাম, কে আমায় ডাকছে।'

আজ কিন্তু চৈতির মুখে এক চিলতে হাসির রেখাও দেখা গেল না। কাঠের পুতুলের মত শক্ত, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শুধু বলল,—'কী কথা আছে, বলুন।'

অবিনাশ ফ্যাসাদে পড়ল। সে যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই হয়েছে। মেয়ে এখন রাগে ফুঁসছে। বেফাঁস একটি কথা বললেই আর রক্ষা নেই। উচ্চিংড়ের মত তিড়বিড় করে লাফিয়ে উঠবে। বেলুনের গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার মত ওর রাগ-রোষ কিছুটা নির্গত হলেই মেয়েটা স্বাভাবিক হয়।

অবিনাশ হেসে বলল,—'দেবরাজের সঙ্গে দেখা হল আপনার?'

ভ্রূ কুঁচকে চৈতি ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কামড়ে ধরে সে ভাবছিল। খানিক পরেই তার মুখ থেকে কথা বেরোল,—'দেখা হল বৈকি, তবে কথা হল না।'

—'তার মানে?' দেখা হল বলছেন অথচ—' অবিনাশ ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করল না।

মনের ঝাঁঝ আর উত্তাপ চেপে রাখতে না পেরে চৈতি বলল,—'কথা হবে কেমন করে বলুন? তিনি এখন ভাবে বিভোর। হেলান চেয়ারে বসে শ্রীমতীর মুখপদ্ম ধ্যান করছেন।'

অবিনাশ খুশি হল। কিন্তু আনন্দ বা হর্ষ প্রকাশ করল না। বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল,—'কী বলছেন আপনি? শ্রীমতী আবার কে? দেবরাজ কার ধ্যান করছিল?'

—'আহা!' চৈতি চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'সব জেনেশুনে আপনি এমন ন্যাকা সাজতে পারেন!' একটু থেমে সে যোগ করল,—'বন্ধুর মাথাটি যে রাক্ষুসী চিবিয়ে খাচ্ছে, সেদিকে আপনার দৃষ্টি নেই।'

অবিনাশ হি-হি করে হাসল। 'ইস! আপনি দেখছি ভীষণ রেগে গেছেন।'

—'রেগেছি তো আপনার কী?' চৈতি চোখ পাকিয়ে জবাব দিল। 'আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন, চৈতি চাকলাদার কিছু ফেলনা মেয়ে নয়। তারও একটা মর্যাদা আছে। বাড়িতে লোক এলে ভদ্র ব্যবহার করা শিষ্টাচার। যারা করে না, তারা ভদ্রলোক নয়,—ছোটলোক।'

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলল,—'মাই গড্! এসব কথা কী বলছেন আপনি? দেবরাজ আপনাকে অপমান করতে পারল?'

চৈতির চোখে জ্বালা। সে বাঁকা হেসে বলল,—'পারল বৈকি। কিন্তু পিছনে বসে যিনি কলকাঠি নাড়ছেন, তার বাড়া ভাতে আমি ছাই দেব। আপনি দেখে নেবেন অবিনাশবাবু—'

কথা শেষ হতে চৈতি আর দাঁড়াল না। আগের মতই হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। পিছনে থেকে অবিনাশ চেঁচিয়ে বলল,—'শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

কিন্তু চৈতি এবার আর ফিরে তাকাল না।

ঘুরে ঢুকে অবিনাশ অবাক হয়ে তাকাল। চৈতি যা বলেছে, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। হেলান চেয়ারে বসে দেবরাজ গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। আধবোজা চোখ, বিমর্ষ, মুখ।

অবিনাশ সহাস্যে বলল,—'ব্যাপার কী সুরপতি? দুশ্চিন্তা কীসের? রাক্ষসেরা কি ফের অমরাবতী আক্রমণ করবে?'

দেবরাজ চোখ মেলে তাকাল। 'মস্করা রাখো। এলে কখন?'

—'এই তো আসছি। কিন্তু কৃষ্ণকলিকে খামোকা অপমান করলে কেন?'

দেবরাজ ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'তুমি কেমন করে জানলে? ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে বুঝি?'

মুখ দেখে অবিনাশ বুঝতে পারল। প্রসঙ্গটা টেনে এনে সে মহা ভুল করেছে। চৈতিরানীর কথা শুনতে দেবরাজ আগ্রহী নয়। সুতরাং ও পথ মাড়ালে কন্টকে পা পড়বে।

—'তোমার খবর কী বলো?' অবিনাশ প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল।

—'খবর ভালো নয়। কাল শুধু শুধু অপমানিত হলাম।'

—'সে কী?' অবিনাশ সত্যিকার বিস্ময় প্রকাশ করল।

দেবরাজ বিরস মুখে বলল,—'কাল বিকেলে একটা খবর দেব বলে মিসেস রায়ের ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে দেখাই করল না। চাকর দিয়ে বলে পাঠাল,—শরীর খারাপ। এখন দেখা হবে না।'

বন্ধুর মন-মরা, নিরুৎসাহ ভাবের কারণ এতক্ষণে অবিনাশের হৃদয়ঙ্গম হল। সে হেসে বলল,—'আরে ধ্যেৎ। এই নিয়ে তুমি আকাশ-পাতাল চিন্তা করছো। মেয়েদের মত মানেই জোয়ার-ভাঁটার নদী। কখনও তুমি আকাশের চাঁদ বন্ধু, কখনও মাটির ঢেলা। কাল তোমার সঙ্গে কথা বলেনি, আবার আজই হয়তো তোমাকে ডেকে পাঠাবে। এই নিয়ে মন খারাপ করলে চলে?'

বুধবার দিন দুটো নাগাদ নীলাদ্রি কলেজে এল। সকালের এক্সপ্রেসটায় সে ফিরেছে। তিনটের সময় তার একটা ক্লাস। কিন্তু শুধু ক্লাস নেবার জন্য ভরদুপুরে সে কলেজে আসেনি। তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। আড়ালে নীপার সঙ্গে সে দু-চার মিনিটের জন্য কথা বলতে চায়। ছুটি হবার মুখে অধ্যাপকদের কমন রুমটা প্রায় ফাঁকাই থাকে।

কলেজে আসবার পরই নীলাদ্রির উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। কমনরুমের বুড়ো বেয়ারা হলধর নীপাকে ভালো করে চেনে। খোঁজ নিয়ে সে জানাল দিদিমণি তিনদিন ধরে কলেজ কামাই করছেন। নীলাদ্রি রীতিমত আশ্চর্য হল। তিনদিন নীপা কলেজে আসেনি? কি এমন অনিবার্য কারণ? হঠাৎ কোনো অসুখ-বিসুখ, হল নাকি ওর?

তার গলা শুনে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বেয়ারা বিষ্টুচরণ এসে হাজির। নীলাদ্রি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। কী বলবে বিষ্টুচরণ? ফের কোনো ভূতুড়ে কল এল নাকি?

টেলিফোন নয়,—চিঠি। বিষ্টুচরণ তার হাতে দিয়ে বলল,—'কালই এসেছে স্যর। আপনি ছিলেন না, তাই দিতে পারিনি।'

নীলাদ্রি তাকিয়ে দেখল, খামের উপর টাইপ করে লেখা তার নাম এবং ঠিকানা। কৌতূহলি মন নিয়ে সে তাড়াতাড়ি খামখানা খুলল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। খামের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো চিঠি। সেটিও টাইপ করা,—কালির একটি আঁচড়ও তার মধ্যে নেই। এবং হয়তো সে কারণেই পত্রলেখকের নাম পর্যন্ত সেখানে অনুপস্থিত।

চিঠিতে লেখা—

ডিরেক্টর সাহেব,

খবরটা হয়তো আপনার জানা নেই। থিয়েটারের নায়িকা যে এবার ফিল্মের হিরোইন হতে চলল। কিন্তু এই নায়িকা-হরণ পালায় আপনার কি শুধু মৃত সৈনিকের ভূমিকা? যে নায়িকা আপনার প্রেমকে এমনিভাবে পায়ে দলে অপমান করে গেল, তার যোগ্য শাস্তি কী? এর উত্তর একটিমাত্র কথায় দেওয়া যায়। তার হল আপনার নাটকের নাম,—নায়িকা-সংহার। কথাটা ভেবে দেখবেন।

সন্ধের পর অবিনাশ ফিরতেই দেবরাজ ওকে জড়িয়ে ধরল।

—'আরে ছাড়ো, ছাড়ো। আমি অবিনাশ, তুমি পাগল হলে নাকি?'

দেবরাজ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কথা বলল।

অবিনাশ প্রায় চমকে উঠল। 'বল কী? এতদূর তো আমিও ভাবতে পারিনি। দেখি কাগজখানা—'

বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে দেবরাজ কাগজটা নিয়ে এল। পড়া শেষ করে অবিনাশ হেসে বলল, —'বলেছিলাম না? এ হল জোয়ার-ভাঁটার খেলা। নদীতে এখন ভরা-কটাল, বুঝলে?'

—'আমার কিন্তু ভয় করছে মাইরি। সাড়ে নটার পর যাব। শেষে একটা কেলেংকারি না হয়। ও যদি হঠাৎ বিগড়ে বসে,'—

এবার অবিনাশ হাসল না। দুর্গা প্রতিমার অসুরের মত তার চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড় দেখাল। গম্ভীর মুখে সে বলল,—'তোমার ভয় নেই। আমি বাইরে প্রহরী থাকব। বিগড়ে বসলে আমাদেরও যন্তর বের করতে হবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।'

রাত নটার পরই হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামল। হু-হু পুরো হাওয়া। কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা গতি। রিম-ঝিম শ্রাবণের ধারা বর্ষণ। বৃষ্টি যখন ধরল, তখন ঘড়িতে এগারোটা বাজে। জল থামলেও ঘন সন্নিবদ্ধ পাতার ফাঁক দিয়ে গাছের উপর জমা বৃষ্টিকণা অনেক রাত পর্যন্ত টুপটাপ ঝরছিল।

অত ভোরে মানুষটাকে দেখে পলাশপুর থানার ও-সি সুব্রত সরকার খুব অবাক হল। উস্কোখুস্কো চুল, চোখ দুটো প্রায় লাল। ফ্যাকাশে মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি,—বিশ্রী রাত-জাগা চেহারা।

—'খবর কি ডাক্তার রায়? এত ভোরে হঠাৎ?—বাড়িতে আর ঢিল পড়েছে নাকি?'

দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে-ওঠা রোগীর মত করুণ মুখ করে অম্বর বলল,—'আমার স্ত্রী নীপা রায় আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশের একবার যাওয়া দরকার।'

দশ

সুব্রত এতক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েস করে কথা বলছিল। আচমকা সংবাদটা তার উপর ঠিক বেতের মত আছড়ে পড়ল। মুহূর্তে সে সোজা হয়ে বসল।

—'কী বললেন ডাক্তার রায়? আপনার স্ত্রী মানে নীপা দেবী আত্মহত্যা করেছেন?' কথা বলতে গিয়ে টেবিলের উপর সুব্রত অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল।

অম্বরকে ধু-ধু মরুভূমির মত উদাস মনে হল। জলহীন আঁখি প্রায় স্থির। শুকনো ঠোঁট, ...করুণ, বিষণ্ণ ভঙ্গি।

ধীরে ধীরে সে জবাব দিল,—'আমার মনে হয় নীপা আত্মহত্যা করেছে। আপনারা একবার চলুন।'

ভোরের আলো এখন বেশ পরিষ্কার। এরই মধ্যে একবার পাখিদের অর্থহীন কলরবও শোনা গেল। আকাশে মেঘ ঘুরছে বলে দিনটা মলিন। নইলে পৃথিবীকে এই সময় আরো বেশি সুন্দর দেখায়। ঠিক কনে-চন্দন পরা নতুন বউয়ের সলজ্জ মুখখানির মত অপরূপ।

সুব্রত মাথা নিচু করে ব্যাপারটা চিন্তা করছিল। মাত্র কদিন আগেই ডাক্তার রায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। রাতদুপুরে বাড়িতে কারা ঢিল ফেলছে। এই সংবাদটা জানাতেই তিনি সেদিন থানায় এসে হাজির। মুখে কিছু না বললেও সুব্রত তখন মনে মনে একটু হেসেছিল। সুন্দরী বউ হলে এই এক জ্বালা। মিসেস রায়ের সঙ্গে তার কোনোদিন আলাপ ছিল না। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে সে বহুবার দেখেছে। শ্রীমতী রায় সুন্দরী তো বটেই। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষক তার নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠব। লম্বা গলা, সরু কোমর। দেহের সর্বত্র মেদের সুষম প্রসার। সাধারণ বাঙালি ঘরের পক্ষে একটু বেশি রূপসী। রাতদুপুরে ঢিল পড়ছে শুনে সুব্রত খুব একটা চিন্তিত হয়নি। শহরে দুষ্টুলোক অনেক,—সুন্দরী মেয়ের পিছু নেবার মত বদ-বুদ্ধি লোকেরও অভাব নেই। গভীর নিশীথে বাড়ির মধ্যে তারাই কেউ ঢিল ছুড়ছে। হয়তো কিছুদিন ধরে এমনি ঢিল পড়বে। তারপর একদা ঢিল নিক্ষেপকারীর উৎসাহে ভাঁটা এলেই ঢিল পড়াও বন্ধ হবে। এসব ক্ষেত্রে হইচই না করাই ভালো। বরং চুপচাপ থাকলেই অভীষ্ট লাভ শীঘ্র হয়।

কিন্তু মিসেস রায় আত্মহত্যা করেছেন শুনে সুব্রতের মনে চিন্তা বাড়ল। বাড়িতে ঢিল পড়ার সঙ্গে এই আত্মহত্যার কোনো .যোগসূত্র নেই তো? গাছগাছালি ঢাকা ঘন বনের ভিতর ঘুমন্ত জন্তু-জানোয়ার হঠাৎ উঠে বসলে যেমন আশপাশের ঘাস-টাস, ঝোপঝাপ নড়ে ওঠে, সুব্রতর মনের ভিতর ঢিল-পড়ার ভাবনা তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিন-চার বছর আগে পলাশপুরে এমনি একটা ঘটনা হয়। নতুন বাজারের একটা বাড়িতে ঢিল পড়ত। প্রায় প্রতি রাতেই। কোন দিক থেকে যে ঢিল আসত কেউ বুঝতে পারেনি, মাসখানেকের মধ্যেই সেই বাড়ির বড় মেয়েটি হঠাৎ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। আশ্চর্য ব্যাপার, তারপর থেকে সে বাড়িতে আর ঢিল পড়েনি।

এফ আই আরটা লিখতে শুরু করে সুব্রত বলল,—'আপনাকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার

মুখে আসছে না ডাক্তার রায়। গভীর শোকে কি সান্ত্বনাই বা আমি দিতে পারি? ভোরবেলায় আপনাকে যখন প্রথম দেখি, তখনই অবশ্য আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এমন একটা মর্মান্তিক সংবাদ আপনার মুখ থেকে শুনতে হবে বলে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

অম্বর কোনো কথা বলল না। আগের মতই তার অন্যমনস্ক ভাব। মলিন, নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে সে একদিকে তাকিয়ে রইল।

টেবিলের উপর পেন্সিলের ভোঁতা দিকটা ঠুকতে ঠুকতে সুব্রত বলল,—'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি ডাক্তার রায়। কিন্তু পুলিশের কাজে অপ্রিয় কর্তব্য আমাদের হামেশাই করতে হয়। এই মুহূর্তে আপনাকে কোনো প্রশ্ন করতে আমার মন চায় না। কিন্তু উপায় নেই, —নইলে,' কথা শেষ না করেই একটু বিব্রত মুখে সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকাল।

অম্বর এবার কথা বলল। 'না, না। আপনি যা প্রশ্ন করতে চান, তা অবশ্যই করবেন।' জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে সে বলল,—'সরকারি কাজকর্ম নিয়মেই হবে মিঃ সরকার। মনের ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় কী আসে যায়?

এক মুহূর্ত সুব্রত কিছু ভাবল। ফস করে তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরুল,—'মিসেস রায় কি বিষ-টিস খেয়েছেন?'

অম্বর মাথা নাড়ল। 'নীপা বিষ খায়নি বলেই আমার ধারণা।'

—'তাহলে?'

—'ওর মাথার কাছে স্লিপিং পিলের একটা শিশি আমি দেখতে পেয়েছি। মাত্র একটা পিল আর শিশিতে পড়ে আছে। আমার মনে হয়, বাকি সব কটা বড়িই ও খেয়েছিল। হেভি ডোজে হিপনটিক গিললে যা হয় ঠিক তাই ঘটেছে।'

বাঁ হাতের করতল দিয়ে কপালটা ঢেকে অম্বর একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে যোগ করল, —'ওর ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না মিঃ সরকার। কোনোদিন না।'

—'স্লিপিং পিলের শিশিটা কি আপনার বাড়িতেই ছিল?'

—'ঠিক এই শিশিটাই বাড়িতে ছিল কি না আমি বলতে পারব না। তবে মাঝে-মধ্যে নীপাকে আমি ঘুমের বড়ি খেতে দেখেছি। দু-একবার স্লিপিং পিল ব্যবহার করতে আমি ওকে বারণও করি। কিন্তু ও আমার কথা শুনত না।'

সুব্রত একটু হাসল। 'আর বলেন কেন? স্বামীদের সকলের প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা। শরীর-স্বাস্থ্যের ব্যাপারে হাজব্যান্ডের নির্দেশ শুনতে গিন্নিরা একেবারে নারাজ।'

অম্বর চুপ করে রইল।

কথাবার্তা একটু লঘু হয়ে আসছিল। কিন্তু অম্বর যোগ না দেওয়ায়, তা আর জমল না।

অগত্যা লেখা শেষ করে সুব্রত উঠল। বলল,—'চলুন এবার। আপনার বাড়িতে গিয়ে তদন্ত শুরু করি।'

অম্বর একটু থেমে থেমে বলল,—'তদন্ত করবেন, মানে?'

—'তদন্ত করতে হবে বৈকি।' সুব্রত মাথার উপর টুপিটা বসিয়ে জবাব দিল। 'একটা আন-ন্যাচারাল ডেথ কেস। সর্বপ্রথমে মৃতদেহটা দেখা দরকার। আত্মহত্যা করবার হেতু কী, তাও জানবার চেষ্টা করতে হবে। মনের দুঃখ কত গভীর হলে মানুষ আত্মঘাতী হয়, তা নিশ্চয়ই বোঝেন?' একটু থেমে সে ফের বলল,—'চলুন ডেড্ বডির কাছেই আগে যাওয়া দরকার। এসব ক্ষেত্রে বালিশের নীচে কিংবা শাড়ির আঁচলের গেরোয় জবানবন্দী গোছের একটা চিঠি পাওয়া সম্ভব।'

সুব্রত আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, অম্বর কী যেন চিন্তা করছে। মুখখানা আগের মতই শুকনো

বলে ভাবান্তর বোঝা গেল না।

পথের উপর জল জমেছে। গাছের ডালে, পাতার গায়ে টলটলে জলের ফোঁটা। ঝমঝমে বৃষ্টির জলে ভিজে পাখিগুলো চুপসে এতটুকু। থানার পিছনের সরকার পুকুরটা জলে জলে টইটম্বুর। ঘাই দিয়ে একটা বড় মাছ ফের কোথায় মুখ লুকোল।

আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা চলছে। হয়তো আবার বর্ষণ শুরু হবে। রাত্তিরে কম বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তবু বরুণদেবের ক্ষমা নেই। কোন মুহূর্তে জল ঢালবেন, তা কেউ বলতে পারে না।

যেতে যেতে সুব্রত বলল,—'আচ্ছা ডাক্তার রায়, নীপা দেবী আত্মহত্যা করতে পারেন বলে আপনার সন্দেহ হয়েছিল? ঘুমের বড়িগুলো উনি কখন খেলেন বলে আপনার মনে হয়?'

অম্বর গম্ভীর মুখে উত্তর দিল,—'আজ্ঞে না। তেমন সন্দেহ আমার হয়নি। আর স্লিপিং পিলগুলো নিশ্চয় শোবার আগে খেয়েছে। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না।'

—'তার মানে?' সুব্রত অবাক হল। 'গত রাতে আপনি বাড়িতে ছিলেন না?'

—'ব্যাপারটা আমি খুলে বলি।' অম্বর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করল। সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে গেল,—'মঙ্গলবার থেকে আমার নাইট-ডিউটি চলছে। দুজন ডাক্তার ছুটি নিয়ে গা-ঢাকা নিয়েছেন। কাজেই নাইট-ডিউটি আর এড়ানো গেল না। এই বয়সে সমস্ত রাত হাসপাতালে জেগে কাটানো বেশ কষ্টকর মনে হয়। ওরই ফাঁকে অবশ্য একটু গড়িয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু তাকে ঠিক নিদ্রাসুখ বলা যায় না। সমস্ত রাত হাসপাতালে কাটিয়ে ভোরবেলায় আমি বাড়ি ফিরি।' কথা শেষ করে অম্বর হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল।

সুব্রত বলল,—'তারপর? আজ ভোরবেলায় যথারীতি আপনি বাড়ি ফিরে এলেন, তাই না?'

অম্বর তাড়াতাড়ি বলল,—'ঠিক বলেছেন। কালকের মত আজও ভোরবেলায় আমি বাড়ি ফিরে আসি। তখনও ঠিক ভোর হয়নি। আকাশের এমনি গোমড়া কালো মুখ। পাতলা একটা অন্ধকার পৃথিবীর উপর ভাসছে। আমাদের পাড়াটা নিস্তব্ধ, চুপচাপ কোনো সাড়াশব্দ নেই।' কথা বলতে বলতে অম্বব আবার থামল।

—'বলে যান ডাক্তার রায়। বাড়ি ফিরে আপনি কী দেখলেন?'

অম্বর আবার শুরু করল,—'আমার বাসাটা আপনি দেখেছেন কি না জানি না। রাস্তার ধারেই দুটো দরজা আছে। একটা সদর এবং অন্যটাকে খিড়কি বলা যায়। রাত্তিরে বেরোতে হলে খিড়কির দরজায় আমি তালা লাগিয়ে যাই। শেষ রাতে কিংবা ভোরবেলায় যখন ফিরি তখন ডাকাডাকি করে বাড়ির লোকেদের আর ঘুম ভাঙাতে হয় না। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে ভিতরে ঢুকতে পারি।'

—'আজ ভোরে আপনি কী দেখলেন? দরজার তালাটা ভাঙা?'

অম্বর মাথা নাড়ল। ধীরে ধীরে সে বলল,—'আজ্ঞে না। তালা অটুট। দরজা খুলে আমি ভিতরে ঢুকলাম। কিন্তু শোবার ঘরের কাছে এসেই আমার মনটা কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। দরজাটা হাট করে খোলা। রাস্তার ধারেই একটা বড় জানালা। তার পাল্লা দুটোর একটা পুরো খোলা, অন্যটা আধ-ভেজানো। সমস্ত ঘর জলে ভিজে গেছে। ঝড়ের দাপটে জামাকাপড়, বিছানার চাদর-টাদর সব একাকার, মেঝেতে পড়ে লুটোচ্ছে।'

ঢোঁক গিয়ে অম্বর বলল,—'ব্যস্ত হয়ে আমি ওর নাম ধরে তিন-চারবার ডাকলাম। আচ্ছা ঘুম তো—ঘরের এই অবস্থা। আর ও এমনি বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি ভাবলাম আমার ডাক শুনে ও ধড়মড় করে উঠে বসবে। তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে, নীপা বেঁচে নেই। ও আর কোনো দিন সাড়া দেবে না।' গভীর বেদনায় অম্বর অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল।

সুব্রত সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল,—'যা ঘটেছে তা নিয়তি ডাক্তার রায়। অনিবার্য বলেই

সেটা রোধ করা যায়নি। নইলে আপনারই বা এই সময় নাইট-ডিউটি পড়বে কেন?' একটু থেমে সে যোগ করল,—'কিন্তু আপনার কথা বোধ হয় এখনও শেষ হয়নি ডাক্তার রায়।'

—'কথা আর কী বাকি রইল?' অম্বর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলছিল, 'ওর সাড়া না পেয়ে আমি চাকরটার খোঁজ করলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড মশায়। দুঃখহরণকে আমি কোথাও পেলাম না। তখন আমি রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছি। আমার মনের অবস্থা ঠিক মুখে বলার মত নয়। চাকরটাকে না পেয়ে আমি শোবার ঘরে ফিরে এলাম। নীপার গায়ে হাত দিয়ে ওকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। ঘরদোরের এই অবস্থা,—নীপা এমন অচৈতন্যের মত ঘুমোয় কেমন করে? তাছাড়া দুঃখহরণই বা গেল কোথায়?'

হঠাৎ অম্বরের কণ্ঠস্বর কেমন স্যাঁতসেঁতে এবং ভারী হয়ে এল। ধীরে ধীরে সে বলল,—'ওর গায়ে হাত দিয়ে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। আমার সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হল। আমি ডাক্তার। দেহে প্রাণ এবং প্রাণহীন দেহের তফাতটুকু বুঝতে আমার দেরি হল না। ভালো করে পরীক্ষা করে আমি নিঃসন্দেহ হলাম,—মাই ওয়াইফ হ্যাজ এক্‌সপায়ার্ড।'

অনেকক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলল না। পথের উপর সর্বত্রই প্রায় জল। হাঁটলেই ছপ ছপ শব্দ। যেখানে জল কম, পথ সেখানে কর্দমাক্ত। দ্রুত গেলে পা পিছলে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে হাঁটতে একটু অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সুব্রতর আর পা উঠছিল না। পুলিশে কাজ করলেও ওর মনটা কিঞ্চিৎ নরম এবং স্পর্শকাতর। আজও আকাশে চাঁদ উঠলে সুব্রত থানার মাঠে দাঁড়িয়ে রুপোলি চাঁদ দেখে। বড় দারোগার চেয়ারে বসে এখনও ঠিক অন্ধ, বধির এবং পাষাণহৃদয় হতে পারেনি। নীপা রায়ের প্রাণহীন দেহটা তাকে চোখ মেলে দেখতে হবে। কথাটা ভাবতেই তার মনটা কেমন স্থবির, জড় হয়ে আসছিল। যেতে যেতে সুব্রতর মনে হল, এতদিন বাগানে সে একটা প্রস্ফুটিত তাজা গোলাপ দেখে এসেছে। পুষ্পের রূপে-গন্ধে কত মধুমক্ষিকার ভিড়,—চারপাশের বাতাস সৌরভে আমোদিত হল। আজ হঠাৎ সেই ফুলটা কেউ বাগান থেকে ছিঁড়ে ধুলোয় ফেলে দিয়েছে। অমন তাজা ফুলের এই করুণ মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভেবে সুব্রত কেমন অবসাদ বোধ করল।

চাবি ঘুরিয়ে অম্বর তালা খুলল। সুব্রতর সঙ্গে একজন কনস্টেবলও এসেছে। তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে অম্বরের পিছু পিছু সে ভিতরে ঢুকল। বাড়িখানা ভালোই। রাস্তার ধারে বড় বড় দু'খানা ঘর। একটা শোবার, অন্যটা বসার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ও দিকটায় বাথরুম, কলতলা,—মাঝারি সাইজের প্রায় বর্গাকার একখণ্ড উঠোন। একপাশে ছোট্ট রান্নাঘর, স্টোররুম। দু'জন মানুষের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করবার পক্ষে অপর্যাপ্ত ঠাঁই।

বারান্দার উপর টবে ফুলের গাছ। দেওয়ালে চৌকো মাপের একটা আয়না। লাগোয়া স্ট্যান্ডের উপর ব্রাশ, পেস্ট, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, গালে মাখবার ক্রিম। উঁকি দিয়ে বসবার ঘরের ভিতর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সুব্রত। সোফা, কৌচ। কাচের আলমারিতে বই। একপাশের দেওয়ালে সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার—ঠিক উল্টোদিকে ফ্রেমে বাঁধানো আশ্চর্য সুন্দর একটি নিসর্গচিত্র।

শোবার ঘরে পা দিয়ে সুব্রত থমকে দাঁড়াল। ডাক্তার মিথ্যে বলেনি। ঝড়ে-বাদলে ঘরের তছনছ অবস্থা। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। আলনার জামাকাপড় মেঝেতে পড়ে লুটোচ্ছে। বিছানার চাদরটা কুঁচকে গুটিয়ে গেছে। মেঝেতে জলের দাগ। জানালার পাল্লা দুটোর একটা হাট করে খোলা,—অন্যটা আধভেজানো।

বিছানার উপর নীপা রায় যেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কে বলবে ওর দেহে প্রাণের চিহ্ন নেই? হঠাৎ দেখলে মনে হবে মেয়েটা ভীষণ ঘুমোয়। এখন গাঢ়নিদ্রায় অচেতনমাত্র।

ঘরে ঢুকেই অম্বর দুই করতলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। সুব্রত বলল,—'শক্ত হোন ডাক্তার

রায়। এত তাড়াতাড়ি কি ভেঙে পড়লে চলে?'

অম্বর মুখ না তুলেই কথা বলল,—'নীপা যে হঠাৎ আত্মহত্যা করবে, আমি ভাবতেও পারিনি মিঃ সরকার। ওর অনেক স্বপ্ন ছিল। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমি এর কোনো হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।'

বালিশের পাশেই স্লিপিং পিলের শিশিটা। হাত বাড়িয়ে সুব্রত সেটি তুলে নিল। একটি মাত্র বড়ি আর অবশিষ্ট আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুব্রত সেটি পর্যবেক্ষণ করল। মোট কটা বড়ি ছিল তা শিশির গায়েই লেখা রয়েছে। অবশ্য নীপা রায় কটা স্লিপিং পিল খেয়েছে, তা বলা শক্ত। শিশিটা দেখে আনকোরা নতুন বলেই মনে হয়। তা বলে গতকাল রাতেই যে ওটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে, এমন কথা হলপ্ করে বলা যায় না।

স্লিপিং পিলের শিশিটা যথাস্থানে রেখে দিল সুব্রত। বলল,—'ডাক্তার রায়, আমাকে একটু সাহায্য করবেন কি?'

অম্বর উঠে দাঁড়াল।

—'একটু খোঁজ করে দেখুন না। বালিশের নীচে কিংবা শাড়ির আঁচলের গেরোয় কোনো লেখা-টেখা থাকতে পারে।'

সুব্রত নিজের ছোট টেবিলটার উপর ঝুঁকে কিছু খুঁজতে লাগল। সে জানে, পৃথিবীর মায়া কাটানো বড় কঠিন কাজ। মরবার সময় মানুষের চোখে জল আসে। মাটি, মানুষ, ফুল-পাখি, আকাশ-বাতাস, সবুজ গাছগাছালি, সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে ভেবে তার কান্না পায়।

যে সুইসাইড করে তার মনের আকাশে অনেক বেদনার রঙ। ক্ষোভ এবং তিক্ততার কালি। আত্মহননের ঠিক আগের মুহূর্তেও পৃথিবী তাকে টানে। মায়ের মত পিছু ডাকে। বার বার নিষেধ করে। এবং সেই মুহূর্তে একটা বোবা দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসে। আত্মহত্যার কৈফিয়ত হিসাবে পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশ্যে তখন সে কিছু লিখে যায়। নিঃশব্দে, কোনো বক্তব্য না রেখে কেউ সুইসাইড করল, এমন ঘটনা বিরল দৃষ্টান্ত।

তল্লাসি করে দুজনেই ব্যর্থকাম। একটা টুকরো কাগজ পর্যন্ত কোথাও নেই। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুব্রত নিজে হতাশ ভঙ্গি করল। বলল,—'খুব অবাক হচ্ছি ডাক্তার রায়। একটা ছোট জবানবন্দী পাব ভেবেছিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। কিংবা আমি স্বেচ্ছায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। দস্তখত করা এমনি গোছের একটা চিরকুট পেলে পুলিশের কাজ অনেক সহজ হত।'

অম্বর কোনো কথা বলল না। সুব্রতর মুখের দিকে সে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

সুব্রত খোলাখুলি বলল,—'ডেড-বডিটা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাতে চাই।'

—'পোস্টমর্টেমে পাঠাবেন?' অম্বর মৃদু আপত্তি করল, 'সুইসাইড ব'লেই তো মনে হচ্ছে। মিছিমিছি ওরা দেহটা কাটা-ছেঁড়া করবে।' সে করুণ মুখে তাকাল।

সুব্রতর একটু মায়া হল। মানুষের সেন্টিমেন্ট সে বোঝে। মরে গেছে বলেই কি স্ত্রীর দেহে স্বামীর কোনো অধিকার নেই? বউয়ের মৃতদেহটা লাশঘরে পাঠাতে কার মন চায়? তাই একটু হেসে সে বলল,—'উপায় নেই ডাক্তার রায়। নীপা দেবী আত্মহত্যা করেছেন বলেই মনে হয়। একটা জবানবন্দী পাওয়া গেলে আপনি যা বলছেন, তাই করা যেত। কোনো অসুবিধে হত না। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য পন্থা নেই।'

অম্বর বলল,—'আমার স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের একটা খবর দিতে হয়। শেষবারের মত তাদের মেয়েকে ওরা হয়তো দেখতে চাইবেন।'

—'নিশ্চয় খবর দেবেন।' সুব্রত সমর্থন করল। 'কিন্তু খবর কোথায় পাঠাবেন? কলকাতায় নিশ্চয়?'

—'ঠিক বলতে পারছি না। কলকাতা পর্যন্ত হয়তো যেতে হবে না। নীপার কাকা, মানে আমার খুড়শ্বশুরমশায় পরশুদিন রাত্রে পলাশপুরে এসেছেন। আজ সকালেই তাঁর কলকাতায় ফিরে যাবার কথা। হয়তো এখনও হোটেল থেকে বেরোননি।'

—'হোটেলে উঠেছেন বুঝি?' সুব্রত প্রশ্ন করল।

—'অন্যান্যবারে আমার বাসাতেই উঠেছেন। এবারেই ওঁর সঙ্গে একজন অবাঙালি ভদ্রলোকও এসেছিলেন। তাকে কম্পানি দেবার জন্যই কাকাবাবুকে হোটেলে উঠতে হয়েছে শুনলাম।'

সুব্রতর কপালে দু-তিনটি রেখা পড়ল।

—'হঠাৎ সেই অবাঙালি ভদ্রলোক কেন পলাশপুরে এলেন? আপনার সঙ্গে কোনো দরকার ছিল বুঝি?'

—'আমার সঙ্গে ঠিক দরকার ছিল না। তবে ওঁরা দুজনেই এসেছিলেন একটা সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে কথা বলতে।'

—'সম্পত্তি? কার সম্পত্তি?' সুব্রত বিস্ময় প্রকাশ করে তাকাল।

—'সম্পত্তি মানে কলকাতার একখানা বাড়ি। শ্বশুরমশায় মারা যাবার পর নীপাই মালিক হয়েছিল। বাড়িটা এখন ভাড়াটেদের দখলে। কোনোকালে আমাদের ভোগে আসবে বলে মনে হয়নি। তাই বাড়িটা নীপা বেচতে চেয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার দিকে একটু জায়গা কিনে রাখতে পারলে, পরে বাড়ি করা যেতে পারে। ওর মনে এই বাসনা ছিল।'

সুব্রত একটু চিন্তা করে বলল,—'সেই অবাঙালি ভদ্রলোক সম্ভবত বাড়ির খদ্দের, তাই না?'

—'আপনি ঠিকই ধরেছেন। দরদাম, কথাবার্তা সব পাকা। কথা ছিল দু-এক দিনের মধ্যেই নীপা কলকাতা যাবে। এবং সেখানেই বাড়ি-বিক্রির দলিলে সই-সাবুদ করবে।'

সুব্রত হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল,—'আপনি যান ডাক্তার রায়। কাজটা খুবই বিশ্রী, কিন্তু উপায় নেই। খারাপ খবরটা খুড়শ্বশুরমশায়কে দিয়ে আসুন। সেই অবাঙালি ভদ্রলোককেও এবেলা কলকাতা যেতে নিষেধ করবেন। আমাদের একটু প্রয়োজন হতে পারে।'

বাইরে এসে সুব্রত দেখল, পথে অল্প লোক চলাচল শুরু হয়েছে। আকাশে তেমনি মেঘ। সকাল রোদ্দুরের মুখ দেখার কোনো আশা নেই। বাড়ির সামনে পুলিশ-প্রহরী দেখে অনেকেই কৌতূহলি হয়ে পড়েছে। কেউ বা যেতে যেতে সিপাইটির সঙ্গে কিছু বাক্য-বিনিময় করল।

রাস্তায় নেমে সুব্রত একটা সিগারেট ধরাল। অপেক্ষমান কনস্টেবলের কাছে গিয়ে তাকে দু-একটি নির্দেশ দিল। কাছেই একটা বাড়িতে টেলিফোন আছে। ভদ্রলোক কারবারি মানুষ এবং সুব্রতের পরিচিত। টেলিফোন করবার উদ্দেশ্যে সুব্রত সেদিকে এগোল।

বৈঠকখানাতেই টেলিফোন এবং বাড়ির কর্তা চেয়ারে বসে আগের দিনের খবরের কাগজটার উপর চোখ বুলোচ্ছিলেন। সুব্রত গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি একটু আড়ষ্টভঙ্গিতে বললেন,—'কী খবর বড়বাবু? এ পাড়ায় হঠাৎ অসময়ে—'

ভদ্রলোক একটু ভয় পেয়েছেন দেখে সুব্রত মনে মনে হাসল। ব্যাবসাদার লোক,—মনের আকাশে মেঘের বড় বেশি আনাগোনা। কখন কোন মেঘ যে ছায়া ফেলে যায় বলা কঠিন।

সুব্রত গম্ভীর মুখে বলল,—'আপনার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করব?'

—'বিলক্ষণ। এর জন্য আবার পারমিশন নিতে হয় নাকি? আপনি বসুন বড়বাবু। আমি একটু চায়ের কথা বলে আসি।'

সমাদর লাভ করে সুব্রত খুশি হল। হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের হাতলটা তুলে সে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হল।

—'হ্যালো!' অপরপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—'আমি সি আই ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সুব্রত ধীরে ধীরে বলল।

—'আমি রাজীব বলছি।'

—'কে রাজীবদা? আমি সুব্রত।'

টেলিফোনের তারে কথা ভেসে এল,—'কী ব্যাপার সুব্রত? তোমার কণ্ঠস্বর এমন মন্থর কেন? মনে হচ্ছে খুব চিন্তা-ভাবনায় আছো।'

—'আর বলেন কেন?' সুব্রত একটু হাসল, 'আপনি এখনিই একবার ডাক্তার অম্বর রায়ের বাড়িতে আসতে পারবেন?'

—'তুমি বললে নিশ্চয় পারব। কিন্তু ব্যাপার কী সুব্রত?'

—'সাংঘাতিক ব্যাপার। মিসেস রায় গতকাল রাত্রে আত্মহত্যা করেছেন বলেই মনে হয়। অথচ আমি একটা খটকায় পড়েছি রাজীবদা। সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গা খুঁজে হয়রান। এই আত্মহত্যার ব্যাপারে তাঁর কোনো লেখাটেখা মানে কোনো জবানবন্দী চোখে পড়ল না।'

—'স্ট্রেঞ্জ!' কয়েক সেকেন্ড পরেই টেলিফোনে আবার কথা ভেসে এল,—'কিন্তু মিসেস রায় যে আত্মহত্যা করেছেন তার প্রমাণ কী পেলে?'

—'প্রমাণ মানে ওঁর বালিশের কাছে একটা স্লিপিং পিলের শিশি পাওয়া গেছে। শিশিটা প্রায় খালি,—একটা মাত্র বড়ি আর পড়ে আছে। এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, উনি বেশি ডোজে হিপনটিক ব্যবহার করেছেন।'

বেশ কিছুক্ষণ টেলিফোনের তারে কোনো কথা ভেসে এল না। প্রায় মিনিট-খানেক। তারপরই আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। —'তুমি ওখানে অপেক্ষা করো সুব্রত। আমি মিনিট দশেকের মধ্যেই আসছি।'

দশ মিনিটের একটু আগেই রাজীবের জিপ এসে থামল। সুব্রত দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল। জিপ থেকে নেমেই রাজীব প্রশ্ন করল,—'ডাক্তার রায় কোথায়?'

—'ভিতরে।' সুব্রত ইঙ্গিতে উত্তর দিল। বলল,—'এই মাত্র অজন্তা লজ থেকে ফিরলেন। ওখানে ভদ্রলোকের খুড়শ্বশুর রয়েছেন। খবরটা তাকে জানাতে গিয়েছিলেন।'

রাজীব ভ্রূ কুঞ্চিত করল। —'খুড়শ্বশুর মানে মিসেস রায়ের কাকা? তা খবর শুনে তিনি দৌড়ে এলেন না?'

—'আসবেন কী করে? ভাইঝির মৃত্যু-সংবাদ শুনেই তিনি অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছেন। উনি আবার ডায়েবেটিসের রুগি,—হার্টের অবস্থাও নাকি ভালো নয়।'

রাজীবকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

ভিতরে ঢুকবার আগে সে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করল,—'ডেডবডি দেখে কী মনে হল তোমার? কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন চোখে পড়ল?'

—'কোনো চিহ্ন নেই রাজীবদা। স্বাভাবিক মুখ। আপনি দেখলে অবাক হবেন। মনে হবে মিসেস রায় অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।'

ঘরের ভিতরে অম্বর হেঁটমুখে বসে। সুব্রতর সঙ্গে একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখে সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজীব সমস্ত ঘরখানা ভালো করে দেখল। মৃতার শুয়ে থাকার ভঙ্গি স্বাভাবিক, প্রশান্ত মুখের ভাব, শাড়ি-জামার গায়ে কিংবা বিছানার চাদরে রক্তের দাগ-টাগ চোখে পড়ল

না। মাথায় বালিশের পাশেই স্লিপিং পিলের প্রায় শূন্য শিশিটা আত্মহত্যার সাক্ষ্যপ্রমাণের নিদর্শন হিসাবে হাজির।

হঠাৎ রাজীবের চোখে দুটি মৃতদেহের একটি অংশের উপর স্থির হল। পায়ের গোড়ালির কাছে শাড়িটা একটু উঠে গেছে বলে ধবধবে ফর্সা পায়ের কিছুটা অংশ চোখে পড়ে। রাজীব তাকিয়ে দেখল। বাম পায়ের গোড়ালির একটু উপরেই কালচে রঙের গোল মতন দাগ। রক্ত জমে ওঠার ফলেই নিশ্চয় দাগটা সৃষ্টি হয়েছে।

সুব্রতকে ইশারা করল রাজীব। ফিসফিস করে বলল,—'এটা দেখে রাখো।'

এগারো

মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করার কাজ শেষ।

বিছানার কাছ থেকে রাজীব সরে এল। সুব্রত বলল,—'রাজীবদার সঙ্গে আপনার আলাপ নেই ডাক্তার রায়, তাই না?'

অম্বর মাথা নাড়ল। বলল,—'আলাপ-পরিচয় হবার মত সুযোগ তো এর আগে হয়নি।'

রাজীব একটু হাসল। 'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি ডাক্তার রায়। মিসেস রায় মানে নীপা দেবীকেও চিনতাম। অবশ্য আলাপ-পরিচয় ছিল না।'

অম্বর নিরুত্তর।

পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে সুব্রত বলল,—'ইনি মিঃ রাজীব সান্যাল, এখানকার সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর।'

অম্বর নমস্কার করল। রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'নীপা আত্মহত্যা করেছে বলেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু আপনাদের মনে কি কোনো সন্দেহ রয়েছে?'

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে রাজীব বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়ে অম্বরের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে বলল,—'আপনার চলবে না কি?' পরে সুব্রতের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে মন্তব্য করল,—'চিরটাকাল গুড-বয় রয়ে গেলে সুব্রত। এত বয়স হল, এখনও ধূমপান করতে শিখলে না।'

অম্বর দুই আঙুলের কৌশলে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটে চেপে রাখল। লাইটারটা জ্বালিয়ে রাজীব সিগারেটের মুখে অগ্নিসংযোগ করতে সাহায্য করল। সফল হবার পর সে বলল, —'পুলিশের ব্যাপার কি জানেন ডাক্তার রায়? ঘরপোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। সাক্ষ্যপ্রমাণ যথাযথ না পেলে পুলিশের পক্ষে উল্টোটাই মনে করা স্বাভাবিক। অনেক সময় নরহত্যার ঘটনাকে আত্মহত্যার মত করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের নথিপত্রে এমন কেস অনেক,—ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলবে।'

অম্বর সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে বলল,—'তা অবশ্য ঠিক, তবে এক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণ তো সামনেই উপস্থিত। বালিশের ঠিক পাশেই স্লিপিং পিলের প্রায় শূন্য শিশিটা না দেখতে পেলে সন্দেহের কারণ ছিল। আর একটা কথাও ভেবে দেখতে হবে। আত্মহত্যার ঘটনা না হলে নিশ্চয় শরীরে আঘাতের চিহ্ন-টিহ্ন, বিছানা বালিশে রক্তের দাগ ইত্যাদি চোখে পড়ত। তা যখন নেই, তখন সুইসাইড ছাড়া এটা আর কী হতে পারে?'

রাজীবের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল।

'আপনার কথার যুক্তি আছে ডাক্তার রায়। আমি তা স্বীকার করি।' রাজীব ধীরে ধীরে বলল।

'কিন্তু চর্মচক্ষে একনজরে দেখেই তো সবসময় আসল-নকলের বিচার করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে যা সুইসাইড বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা হোমিসাইডও হতে পারে। সুতরাং তদন্তের সময় একটু তলিয়ে দেখা দরকার।'

অম্বর কোনো মন্তব্য করল না দেখে রাজীব ঈষৎ হাসল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। বলল,—'আপনি যা মনে করছেন শেষপর্যন্ত হয়তো তাই দাঁড়াবে। হিপনটিক্ খাওয়ার ফলেই যদি মৃত্যু ঘটে থাকে, তাহলে ডাক্তারি পরীক্ষায় নিশ্চয় অন্য কিছু পাওয়া যাবে না, এ বিষয়ে আপনার কি মত ডাক্তার রায়?'

সুব্রত এতক্ষণ চুপ করে ছিল। ডাক্তারি পরীক্ষার কথা শুনে সে তাড়াতাড়ি বলল,—'কথাটা আমি ওঁকে আগেই বলেছি রাজীবদা। ডেড-বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাতে হবে। কিন্তু ডাক্তার রায় একটু খুঁতখুঁত করছেন। অবশ্য ওর সেন্টিমেন্ট আমি বুঝি, কিন্তু এক্ষেত্রে মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠানো ভিন্ন আর কী উপায় হতে পারে?' .

অম্বর একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। পুলিশের এই টিকটিকি লোকটার ধরনধারণ তার ভালো লাগেনি। মানুষটার লম্বা চওড়া গড়ন, মাথাটা প্রকাণ্ড, কাতলা মাছের মত হাঁ-মুখ, শিকারি বাজের মত তীক্ষ্ণ চাউনি। আড়চোখে সদাসর্বদাই লোকটা তার মুখের উপর দৃষ্টির অদৃশ্য সুতো বুলোচ্ছে। নইলে ঘন ঘন অমন করে ও এদিকে তাকাবে কেন? আর একটা কথাও অম্বর ভাবছিল। লোকটা তাকে দিয়ে কথা বলাতে চায়। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্নের গেরোটি মাছকে টোপ গেলানোর মত কৌশলে তার মুখের সামনে নাচাচ্ছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অম্বরকে কথা বলতে হল। সুব্রতের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'পোস্টমর্টেমে আমার ঠিক আপত্তি নেই মিঃ সরকার। নীপা আত্মহত্যা করে থাকলে অটোপসি করে কিন্তু কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই ভাবছিলাম মিছিমিছি ময়নাতদন্তের জন্য ওর মৃতদেহটা কাটাকুটি করে কী লাভ?'

রাজীব বাধা দিয়ে বলল,—'তবু এক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম করতেই হবে ডাক্তার রায়। আপনার মনের অবস্থা আমি অনুমান করতে পারছি। এ ব্যাপারে আপত্তি করাও খুব স্বাভাবিক, তবু আমি অনুরোধ করব। আপনি রাজি হোন। আপনার স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদেরও বুঝিয়ে বলবেন, পোস্টমর্টেম হয়ে গেলে পুলিশের সন্দেহটুকুও মিটে যায়। আর পুলিশেরই বা কী দোষ বলুন? যে আত্মহত্যা করল তার একটা খোলসা করে লেখা জবানবন্দীও পাওয়া গেল না।'

অম্বর কোনো মন্তব্য করল না।

সুব্রত বলল,—'তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। ডেড-বডি পুলিশ-মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করি রাজীবদা।'

—'হ্যাঁ তাই করো। রিপোর্টটা পাওয়া গেলেই তখুনি আমার কাছে এসো।' সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রাজীব একটু চিন্তা করল। অম্বরের দিকে তাকিয়ে বলল,—'ডাক্তার রায়, একবার আমার ওখানে আসুন না। এই ঘন্টাখানেকের মধ্যে। এখন ঘরে বসে কি করবেন আর? শুধু মন খারাপ হবে আর চিন্তা বাড়বে।'

—'বেশ তো, আপনার ওখানে আমি যাচ্ছি।' অম্বর রাজি হয়ে বলল। 'ঘন্টাখানেকের মধ্যে নিশ্চয় পৌছাবো।' কথা শেষ করে সিগারেটে সে একটা টান দিল।

বাইরে এসে রাজীব দেখল রীতিমত একটা জটলা চলছে। আত্মহত্যার খবরটা বোধহয় আর চাপা নেই। এখনও বেলা হয়নি। মেঘলা আকাশ বলে সূর্যিমামার মুখ আড়াল। রোদ্দুর আর উঁকি দেয়নি। আকাশের চেহারা ভয়ঙ্কর না হলেও বেশ থমথমে ভাব। এখুনি না নামলেও দুপুর

গড়ানোর আগেই একপশলা জোর বৃষ্টি হবে বলে মনে হয়। ভাগ্যিস, আকাশের এই চেহারা। ঝলমলে দিন হলে আর রক্ষে ছিল না। শহরে এতক্ষণ ঢি-ঢি পড়ে যেত। সরকারি ডাক্তারের সুন্দরী স্ত্রী শ্রীমতী নীপা রায় আত্মহত্যা করেছেন। কাঁঠালের ম-ম করা গন্ধের মত খবরটা এতক্ষণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত।

সুব্রতকে দেখে ওদের গুঞ্জন হঠাৎ বাড়ল। খুব সম্ভব তাকে ওরা চেনে। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে একজন ওকে প্রশ্ন করল,—'যা শুনছি, তা সত্যি নাকি দারোগাবাবু?'

বুদ্ধিমানের মত সুব্রত বলল,—'যা শুনছেন, তা সত্যি হলেও খুব দুঃখের। সুতরাং ও নিয়ে আপনারা আর জটলা করবেন না। যে যার কাজে যান।'

দু-একজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে এদিক-ওদিক গেল। ভিড় কিছুটা পাতলা হয়ে এল বটে, কিন্তু পুরোপুরি সরল না। নতুন মুখ এসে আবার ভিড়ে মিশল, ফলে জটলা প্রায় আগের মতই রইল।

রাজীব জিপে উঠে সুব্রতকে কাছে ডাকল। বলল,—'ডেড-বডিটা তাড়াতাড়ি মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। টেলিফোনে পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছি। যা ব্যবস্থা করবার সেই করবে। আর হ্যাঁ—' রাজীব কথা শেষ না করে সুব্রতের কাঁধে হাত রাখল।

নিশ্চয় কোনো কনফিডেন্সিয়াল টক্। নইলে রাজীবদা এমন ঘনিষ্ঠভাবে কাঁধে হাত রেখে বাক্যালাপ করে না। সুব্রত নিজের মনে ভাবল।

রাজীব বলল,—'মিসেস রায়ের বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে যা তোমাকে লক্ষ্য করতে বলেছি, সেটুকু আর কারো কাছে ব্যক্ত করো না।'

সুব্রত জিভ কামড়ে শপথ করল। 'পাগল হয়েছেন আপনি। তদন্তের সময় মুখ খুলতে আছে কখনও?'

—'কথাটা মনে থাকে যেন।' রাজীব ওর কাঁধের উপর থেকে হাত তুলে নিল। 'ভুল করে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে যেন ও নিয়ে আলোচনা শুরু কোরো না।'

সুব্রত অল্প একটু হেসে পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিল।

এক ঘন্টার কিছু পরেই অম্বর এসে পৌঁছল।

অভ্যর্থনা করে রাজীব বলল,—'আসুন। আসুন। দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম, আপনি বুঝি আর এলেনই না।'

চেয়ারে বসবার আগে অম্বর ঘরটা নিরীক্ষণ করছিল। দেখলেই বোঝা যায়, এটা অফিস ঘর। রাজীবের পিছনেই দেওয়ালের গায়ে একটা ম্যাপ টাঙানো রয়েছে। জেলার ম্যাপ। ও পাশে একটা ক্রাইমের চার্ট। পাশের একটা শেলফে অপরাধ বিষয়ক নানা ধরনের বই। টেবিলের উপর দু-তিনটে ফাইল, এর মধ্যে একটা খোলা। অম্বর ঘরে ঢুকবার আগে সম্ভবত সে এই ফাইলটাই দেখছিল।

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে রাজীব বলল,—'আর একটা ধরিয়ে নিন ডাক্তার রায়। সকাল থেকে যা মেঘলা আকাশ আর ঠাণ্ডাভাব। একটু ধূমপান না করলে শরীরটা চাঙা হবে না।'

অম্বর দ্বিরুক্তি না করে সিগারেট ধরাল।

টেবিলের উপর ঝুঁকে বসল রাজীব। ঘড়িতে এখন সাতটা বাজে। ডেড-বডি নিশ্চয় এতক্ষণ পুলিশ-মর্গে পাঠানো হয়েছে। দশটা এগারোটার মধ্যেই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল রাজীব। সম্ভবত শরীরটাকে সে চাঙা করতে চাইল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—'কিছুদিন ধরে আপনার বাড়িতে নাকি ঢিল পড়ছিল ডাক্তার রায়?'

অম্বর হেসে উত্তর দিল,—'হ্যাঁ ভারি অদ্ভুত কাণ্ড। মাস তিনেক হল এই উপদ্রব চলছে। আমি মিলিয়ে দেখেছি মাসের ঠিক দশ বারো তারিখ নাগাদ ঢিল পড়া শুরু হয়।'

—'প্রতিদিন রাত্রেই কি ঢিল পড়ত?'

—'না, না।' অম্বর মাথা নাড়ল। 'প্রথম মাসে ঢিল পড়েছিল মাত্র একদিন। গভীর নিশীথে হঠাৎ পর পর তিনটে ঢিল এসে উঠোনে পড়ল। আলো জ্বালিয়ে আমি দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম কোনো দুষ্টু লোকের কাজ। রাত দুপুরে গেরস্থের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে একটু মজা করতে চায়। কিন্তু সে রাত্তিরে কেন, সে মাসেই আর ঢিল পড়ল না। ঢিল পড়ল ফের পরের মাসে। ওই দশ-বারো তারিখ নাগাদ। পর পর দুদিন রাতে উঠোনে ঢিল পড়ার শব্দ হল। প্রতিবারেই তিনটি ঢিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তারপর থেকেই ঢিল পড়া আবার বন্ধ হয়ে গেল।'

রাজীব প্রশ্ন করল,—'ঢিল পড়ার ব্যাপারটা আপনি তখন থানায় জানিয়ে এলেন, তাই না?'

অম্বর একটু হাসল। —'ঠিক তখনই যাইনি। আমি গেলাম তার পরের মাসে। তৃতীয় মাসে পর পর তিন রাত্রে উঠোনে ঢিল পড়ল। সেই একই ব্যাপার। তিনটে ঢিল। বেশিও নয়, কমও নয়। উঠোনের উপর সজোরে আছড়ে পড়ে টুকরো হয়ে গেছে। আপনার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই মি: সান্যাল। পর পর পর তিন রাত্তির এই কাণ্ড। ঢিল পড়ার উপদ্রব বাড়তে দেখে আমি নিজেও একটু ভয় পেলাম। ব্যাপারটা খুব ভালো লাগেনি আমার। বাড়িতে আমরা দুটি লোক। চাকরটা চলে গেলে আমার স্ত্রীকে একাই থাকতে হয়। শহরে আমার স্ত্রীর সৌন্দর্যের যথেষ্ট খ্যাতি। ঘরে আর কতক্ষণ ও থাকত? কলেজে একনাগাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস করতে হয়। হপ্তায় দু'দিন প্রফেসরের বাড়িতে কোচিং নেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাছাড়া থিয়েটার-নাটকের উপর নীপার খুব ঝোঁক ছিল। কলেজের সোশ্যালে ওকে মেন পার্ট নিতে হয়েছে। এবার টাউন ক্লাবের নাটকে নীপা হিরোইনের রোলে মহলা দিচ্ছিল।'

রাজীব বলল,—'আমি জানি ডাক্তার রায়। শুধু কলেজে নয়, সমস্ত শহরে মিসেস রায় ভীষণ পপুলার ছিলেন। আপনাকে হয়তো অনেকে চিনবে না। কিন্তু নীপা রায়ের নাম শোনেনি এমন ছেলেমেয়ে এই শহরে নেই।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব ফের বলল,—'তাহলে আপনার বাড়িতে শেষ ঢিল পড়েছিল এই মাসের দশ-বারো তারিখ নাগাদ।'

বাধা দিয়ে অম্বর বলল,—'আন্দাজের প্রয়োজন নেই মিঃ সান্যাল। বার তারিখ সঠিক আপনাকে বলতে পারব। গত সপ্তাহে পর পর তিন দিন আমার বাড়িতে ঢিল পড়েছে। সোম মঙ্গল আর বুধবার। তিন দিনই গভীর রাতে, মানে বারোটা-একটা নাগাদ এই কাণ্ড ঘটে। বেস্পতিবারে থানায় গিয়ে ও. সি.-কে আমি জানিয়ে এলাম। উনি আমাকে বছর তিন-চার আগেকার একটা ঘটনা বললেন। নতুন বাজারের একটা বাড়িতে নাকি এমনি ঢিল পড়ত। কিছুতেই ঢিল পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। হঠাৎ সে-বাড়ির একটি মেয়ে আত্মহত্যা করল। এবং তারপরই ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে যায়।'

রাজীব বিরসমুখে বলল,—'সুব্রত ব্যাপারটা ঠিক জানে না। মাত্র এক বছর হল, ও এখানে এসেছে। দ্যাট গার্ল ওয়াজ ইন লভ উইথ অ্যান ইয়ংম্যান। তলে তলে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছিল। মানে, মেয়েটি সুইসাইড করতে বাধ্য হয়। বাড়ির লোকেরা সমস্ত ব্যাপারটা এইভাবে রটিয়ে দেয়। এখন দেখছি তারা বেশ কিছুটা সাক্‌সেসফুল।' একটু থেমে রাজীব আবার শুরু করল,—'কিন্তু সেকথা থাক। আপনার বাড়িতে তাহলে গত বুধবারেই শেষ ঢিল পড়ে?'

—'শেষ কিনা জানি না। কিন্তু বুধবার নয়,—কাল রাত্তিরেও বাড়িতে একবার ঢিল পড়েছিল।'

—'কাল রাত্তিরে? আপনি কী করে জানলেন? আপনার তো কাল নাইট-ডিউটি ছিল।' রাজীবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অম্বরের মুখের উপর স্থির হল।

একটু ইতস্তত করে অম্বর বলল—'গতকাল সন্ধের খানিকটা পরেই বাড়ির উঠানে সজোরে একটা ঢিল পড়ে। রান্নার লোকটা তখন উঠানের একধারে বসেছিল। ঢিল পড়তেই সে ভীষণ চেঁচামেচি করে ওঠে। খবর পেয়ে পাড়ার দু-একটি ছেলেও নাকি এসেছিল। কিন্তু এদিক-ওদিক খোঁজা-খুঁজিই সার। কারো সন্ধান মেলেনি। ব্যাপারটা বোধহয় রহস্যই রয়ে গেল।'

—'আই সী।' রাজীব চিন্তিতমুখে তাকাল। 'তাহলে কাল সন্ধের পর আপনার বাড়িতে একবার ঢিল পড়েছিল? এবং তখন আপনি গৃহে অনুপস্থিত—'

অম্বরের মুখটা এবার শুকনো মনে হল। সে বলল,—'বাজারে কিছু সওদা করবার প্রয়োজন ছিল। তাই বিকেলের দিকে আমি একটু বেরিয়েছিলাম।'

—'আপনার স্ত্রী তখন বাড়িতে ছিলেন?'

—'হ্যাঁ। বাইরের ঘরে বসে নীপা ওর কাকার সঙ্গে কথা বলছিল।'

—'মিসেস রায়ের কাকা পলাশপুরে এসেছেন বলে জানি। কিন্তু কেন? নিশ্চয় বিশেষ প্রয়োজনে এসেছেন?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'আপনাকে কথাটা বলা হয়নি?' অম্বর ধীরে ধীরে বলল। 'কলকাতায় আমার স্ত্রীর নামে একখানা বাড়ি আছে। অনেক ভাড়াটের বাস। ওটা বেচে দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার দিকে একটু জায়গা কিনবার ইচ্ছে আমাদের। নীপা ওর কাকাকে বলেছিল, ভালো একজন খদ্দের দেখে দিতে। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর পলাশপুরে আসা। সঙ্গে একজন ভদ্রলোকও এসেছেন। তিনি অবাঙালি, —চন্দ্রবদন না কি যেন নাম। বাড়িটা উনিই কিনবেন।'

রাজীব একটু চিন্তা করে বলল,—'আচ্ছা, আপনার সেই গৃহভৃত্যটির কী নাম বলুন তো? সেও নাকি নিখোঁজ?'

—'সত্যি, ব্যাপারটা আমার নিজের কাজেই খুব রহস্যময় ঠেকছে। ভোরবেলায় বাড়িতে ফিরে দুঃখহরণকে আমি কোথাও দেখতে পেলাম না। রাতারাতি মানুষটা যেন কর্পূরের মত উবে গেল।'

রাজীব অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল,—'আপনার নিখোঁজ ভৃত্যটিকে আগে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর আমাদের অন্য কাজ।'

অম্বর বলল,—'দুঃখহরণ কোথায় যে গেল, আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু একটা কথা মিঃ সান্যাল, ছেলেটা গবেট মুখ্যু। এ ব্যাপারে ওকে সন্দেহ করা বৃথা।'

রাজীবের মুখে চাপা হাসি দেখা দিল। —'একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন ডাক্তার রায়। গতকাল সন্ধ্যে রাতে বাড়িতে ঢিল পড়ল। তারপরই আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন এবং সেই রাত থেকে বাড়ির চাকরটিও নিখোঁজ হল। ঘটনাগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেখলে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না?'

অম্বর কোনো কথা বলল না।

সিগারেটটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। লম্বা একটা টান দিয়ে সেটি সম্পূর্ণ পোড়াল রাজীব। নাক মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বের করে ফের কথা বলবার জন্য সে প্রস্তুত হল।

অম্বরের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলল,—'আপনাকে আর গোটা দুই প্রশ্ন করব ডাক্তার রায়।'

—'বেশ তো, করুন।'

—'ধরুন, নীপা দেবী সুইসাইড করেছেন, এই কথাটা আমরা মেনে নিলাম। তাহলে প্রশ্ন উঠবে কেন উনি আত্মহত্যা করলেন। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

তিরটা এই দিকেই আসবে, অম্বর তা আন্দাজ করেছিল। তবু উত্তর দিতে গিয়ে তার জিভটা কেমন জড়িয়ে এল। বিশ্রী অস্বস্তিকর অবস্থা। পুলিশের সামনে কিছু বলাও বিপদ। আবার মুখ না খুলেও সম্ভবত উপায় নেই। কথার প্যাঁচে লোকটা তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। এখন

পিছন ফিরবারও পথ বন্ধ।

কোনোমতে অম্বর জবাব দিল,—'কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কথাটা আমার মনে আগেই এসেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ সান্যাল, নীপা হঠাৎ কেন আত্মহত্যা করল, তা আমিও ভেবে পাচ্ছি না।'

রাজীব মনে মনে হাসল। ফের একটা সিগারেট ধরারাবে কিনা সে ভাবছিল। মাথার চুলে একবার আলতোভাবে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে সে বলল,—'আচ্ছা ডাক্তার রায়, নীপা দেবীকে দু-এক দিনের মধ্যে কি চিন্তিত মনে হয়েছিল? চোখেমুখে দুশ্চিন্তা, বিমর্ষ-ভাব কিংবা উৎকণ্ঠার ছায়া দেখেছিলেন?'

অম্বর মাথা নাড়ল। —'ওকে বিমর্ষ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে আমার মনে হয়নি। তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। ব্যাপারটা দেখে আমার কেমন খটকা লাগল। কিন্তু নীপাকে প্রশ্ন করে আমি কোনো উত্তর পাইনি। কথাটা সে একরকম হেসে উড়িয়ে দেয়।'

সিগারেটের প্যাকেটটা সরিয়ে রেখে রাজীব মনোযোগী শ্রোতার মত সোজা হয়ে বসল।

অম্বর বলল,—'বাড়ি বিক্রির কথাবার্তা বলতে কাল সকালে নীপার কাকা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেই ভদ্রলোকও। নীপা তখন অন্য ঘরে কিছু করছিল। বাইরের ঘরে আমি তাদের বসালাম।

রাজীব প্রশ্ন করল,—'সেই অবাঙালি ভদ্রলোকের কী নাম যেন বললেন,—চন্দ্রবদনবাবু তাই না?'

—'হ্যাঁ, ভদ্রলোককে গুজরাতি বলে মনে হল। ব্যাপারটা কী জানেন? নীপা ঘরে ঢুকেই চন্দ্রবদনবাবুকে দেখে চমকে উঠল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, চন্দ্রবদনবাবুও অবাক হয়ে নীপার দিকে তাকিয়ে আছেন। পরে কথাটা আমি নীপাকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ও সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ সান্যাল? ওদের পূর্বে পরিচয় হয়েছিল।'

—'হুম্।' রাজীব চিন্তিত মুখে বলল। তার কপালে দু-তিনটে রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। 'ঠিক আছে ডাক্তার রায়। আপনাকে এখন আর বিরক্ত করব না। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পেলে বরং আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

অম্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজীব ওকে ফের সিগারেট দিতে চাইল, কিন্তু অম্বর আপত্তি করল। 'নো, থ্যাঙ্কস।' সে সবিনয়ে জানাল।

অম্বর চলে যাবার মিনিট দশেক পরেই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

অন্য প্রান্ত থেকে সুব্রতের গলা ভেসে এল,—'রাজীবদা আছেন?'

—'হ্যাঁ সুব্রত, আমি কথা বলছি।'

—'একটা খবর আছে রাজীবদা। ডাক্তার রায়ের বাড়ির সেই ভৃত্যটিকে পাওয়া গেছে। একটু আগেই সে মনিবের বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল, আমাদের কনস্টেবল তাকে ধরে থানায় পাঠিয়ে দেয়।' টেলিফোনে সুব্রত বলল।

—'ওকে তুমি এখানে পাঠাও। দেরি কোরো না কিন্তু।' টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে রাজীব ফের চিন্তা শুরু করল।

থানায় একজন সিপাই দুঃখহরণকে নিয়ে এল।

রাজীব ওর মুখের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। গবেট মুখ্যুই বটে। জন্তুর মত ড্যাব্‌ডেবে চাউনি। দৃষ্টিতে বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও নেই। গায়ের রং কালো, মাঝারি স্বাস্থ্য, পলাশ ঝোপের মত একমাথা চুল। কামানো দাড়ি-গোঁফ। বছর ষোলো-সতেরো বয়স হবে ছোকরার।

—'কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলি রে?' রাজীব শ্যেন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

ছোকরা খুব ভয় পেয়েছে বলে মনে হল। তার ঠোঁট দুটো থর-থর করে কাঁপছিল, মুখখানা

শুকিয়ে আমসী। ভয়ে ভাবনায় চোখ দুটো রীতিমত বড়, মোরগের ঝুঁটির মত লাল।

—'সব কথা খুলে বলো। তোকে এখুনি ছেড়ে দেবো।' রাজীব ওকে অভয় দিল।

ভরসা পেয়ে ছোকরা মুখ খুলল। 'আজ্ঞে কাল রাত্তিরে গান শুনতে গেছলাম।'

গান অর্থাৎ যাত্রা গান। গ্রাম অঞ্চলের লোকে তাই বলে।

—'যাত্রা শুনতে গিয়েছিলি? কোথায় রে?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'আজ্ঞে চন্দনডাঙ্গায়। কলকাতার দলের গান। অত বিষ্টি-বাদল তাও লোক হয়েছিল।'

—'সেখানে তো টিকিট কিনে ঢুকতে হয় রে? তুই টাকা পেলি কোথায়? দিদিমণি দিয়েছিল?'

—'আজ্ঞে, না।' ছোকরা থতমত করল।

—'তবে টিকিট কিনলি কেমন করে?'

দুঃখহরণ ঢোক গিলে বলল,—'টিকিট কিনি নাই। এক বাবু আমাকে যাত্রা শুনবার লেগে টিকিট দিলেক। সেই টিকিটখানা লিয়ে গেছলাম।'

—'বাবু? কোন বাবু রে? তাকে চিনিস তুই?'

—'হই, চিনব নাই কেনে? বাবু তো বাড়িতে তিন-চারবার এসেছে।' একটু ইতস্তত করে সে ফের বলল,—'সিনেমায় দিদিমণিকে নামাবার লেগে বাবু কতবার আসা-যাওয়া করল। আমি সব শুনিছি।' ছোকরা একগাল হাসল।

—'টিকিটখানা তোকে কোথায় দিল?' রাজীব জানতে চাইল।

ছোকরা বলল,—'রান্না সেরে একটা ম্যাচিস্ আনতে বাজারে গেছলাম। তা বাবু তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে বলল, চন্দনডাঙ্গায় ভালো গান হচ্ছে। কলকাতায় দল, মহাশক্তি পালা। তুই শুনতে যাবি?'

'আমি বললাম, তা কেনে যাব নাই? বাবু তখন আমাকে টিকিটখানা দিলেক। বলল,—রাত নটার আগেই চলে যাস। নইলে ঢুকতে দিবেক নাই।'

—'যাত্রা ভাঙল কখন? তারপর কোথায় ছিলি?'

—'আজ্ঞে যা বাদলা কাল রাত্তিরে? গান জুড়ল আপনার সেই রাত একটার সময়। যখন ভাঙল, তখন শেষ রাত্তির। কী মেঘ আকাশে। আমি আর ফিরলাম নাই ঘরে। একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চির উপর শুয়ে এক চটকা ঘুম দিলাম। সকাল হলে পর ঘরকে আসছি।'

রাজীব মৃদু হাসল। 'ঠিক আছে, তুই এখন যা। দরকার হলে আবার ডেকে পাঠাব।'

পরদিন খুব ভোরে রাজীবের জিপ এসে দাঁড়াল। কাল সমস্তদিন মেঘলা গেছে। দুপুরের দিকে এক পশলা ভারী বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু আকাশ আজ পরিষ্কার। চোখ জুড়ানো, ফটফটে নীল। একটু পরেই সূর্যি উঠবে। বৃষ্টি ধোয়া নীল আকাশে ঝলমলে রোদ হেসে বেড়াবে।

জিপের শব্দ শুনেই অম্বর বেরিয়ে এল। কাল সমস্ত দিন একভাবে গেছে। শরীরের ধকল। মনের এবং স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ। তবু অম্বরকে কিছুই করতে হয়নি। খবর পেয়ে সমস্ত শহরটাই প্রায় ভেঙে পড়েছিল। কলেজের প্রফেসর, এবং ছেলে-মেয়ের দল। টাউন ক্লাবের সভ্য-সভ্যা। চেনা-অচেনা কত মুখ। সকলেই দুঃখিত, ব্যথিত। অম্বরকে সমবেদনা জানাতে এসেছে।

মর্গ থেকে ওরাই মৃতদেহ আনল। ভালো খাট কিনে নিয়ে এল। কত ফুল, তাজা রজনীগন্ধা। পুষ্প-সাজে সাজিয়ে শেষ যাত্রার আয়োজন তারাই সম্পূর্ণ করল। মৃত্যু মানেই এক গভীর শূন্যতা। এবং সেই শূন্যতা থেকেই মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়।

অম্বরের চাউনিতে আজ সেই শূন্যতাই ফুটে উঠল। রাজীবের দিকে তাকিয়ে সে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল,—'আসুন মিঃ সান্যাল।'

ঘরে ঢুকে রাজীব চেয়ারে বসল। 'কাল রাত্তিরে আর আসিনি ডাক্তার রায়। ভাবলাম আপনি

খুবই ক্লান্ত। —শুধু শুধু ডিসটার্ব করা হবে।'

অম্বর অন্যমনস্কের মত বলল,—'হ্যাঁ। কাল শ্মশান থেকে যখন ফিরলাম, তখন আটটা রাত। আমি আপনাকে বলেছিলাম মিঃ সান্যাল। নীপা আত্মহত্যা করেছে। পোস্টমর্টেম করে তো কিছুই পাওয়া যায়নি। শুধু শুধু আপনারা—'

রাজীব একদৃষ্টে অম্বরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলল,—'নীপা দেবী আত্মহত্যা করেননি ডাক্তার রায়।'

অম্বর প্রায় চমকে উঠল। 'কী বলছেন আপনি মিঃ সান্যাল? নীপা স্লিপিং পিল খেয়ে মরেনি?'

রাজীব মাথা নাড়ল। 'কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। পোস্টমর্টেমে কিছু পাওয়া গেল না দেখে আমি কলকাতায় ভিসেরা পাঠাবার ব্যবস্থা করি। ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য।'

—'তারপর? ওরা রিপোর্ট দিয়েছে?'

রাজীব ধীরে ধীরে বলল,—'কাল রাত্তিরেই রিপোর্ট নিয়ে লোক ফিরেছে। একটু থেমে সে ফের শুরু করল,—

—'আমি ডাক্তার নই মিঃ রায়,—একটা লে-ম্যান। কিন্তু আপনি ডাক্তার। এ সমস্ত নিয়ে আমার চেয়ে ভালো বুঝবেন। স্লিপিং পিল খেয়ে মৃত্যু হলে রক্তে কী পাওয়া উচিত ছিল ডাক্তার রায়? নিশ্চয় বারবিচ্যুরেট শ্রেণির কিছু? কিন্তু পরীক্ষা করে তারা বারবিচ্যুরেট পায়নি।'

—তবে? তারা কী পেল পরীক্ষা করে?' অম্বর প্রায় চিৎকার করল।

বিচারকের মত অনুত্তেজিত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে রাজীব ঘোষণা করল,—'মরফিন,—মরফিন হাইড্রোক্লোরো।'

বারো

অম্বরের মুখ দিয়ে চট করে কোনো কথা বেরোল না। সংবাদটা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, প্রায় অভাবনীয়। রাজীব তাকিয়ে দেখল। ডাক্তারের মুখখানাই যেন পাল্টে গেছে। বিস্ময়ে চোখ দুটো বড়-বড়। ভয়ে, ভাবনায় মুখটা ছোট্ট এতটুকু। ঠোঁট দুটো অল্প-অল্প নড়ছে। চোখের পাতা কাঁপছে। মুখের রঙ প্রায় ফ্যাকাশে, ছাই-বর্ণ হতে বাকি নেই। দেখলেই বোঝা যায় ডাক্তার ভয় পেয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে অম্বর কথা বলল,—'মরফিন! আপনি কী বলছেন ইন্সপেক্টর?' তার কণ্ঠস্বর কাঁপা-কাঁপা শোনাল।

রাজীবের দৃষ্টি সার্চলাইটের আলোর মত অম্বরের মুখের উপর ঘোরাফেরা করছিল। এবার অন্য দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'ফরেনসিক ল্যাবরেটরি থেকে সেই রিপোর্টই দিয়েছে। অবশ্য ডেড-বডি পরীক্ষা করে আমার মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল ডাক্তার রায়। কথাটা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম।'

—'কী কথা বলুন তো মিঃ সান্যাল?' অম্বর তাড়াতাড়ি বলল, তাকে খুব চিন্তিত এবং চঞ্চল দেখাল।

ওর ছটফটানি দেখে রাজীব মনে মনে হাসল। লোকটা ফেঁসেছে। সে বলল,—'ব্যস্ত হবেন না ডাক্তার রায়। সমস্ত কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করব বলেই আমি এসেছি। ডেড-বডি দেখে আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। মিসেস রায়ের বাঁ পায়ের গোড়ালির একটু উপরে আমি একটা দাগ লক্ষ্য করি।'

—'দাগ?' অম্বর প্রশ্ন করল।

রাজীব বলল,—হ্যাঁ। শরীরে ছুঁচ ফুটিয়ে দেবার ফলে চামড়ার নীচে রক্ত জমে একটু কালচে দেখায়। মিসেস রায়ের বাঁ পায়ের গোড়ালির কিছুটা উপরে আমি তেমনি একটি দাগ লক্ষ্য করি। ব্যাপারটা তখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। এখন ফরেনসিক ল্যাবরেটরির রিপোর্টটা পেয়ে সন্দেহের নিরসন হল।'

অম্বরের মুখটা এবার করুণ দেখাল। ব্যাকুলভাবে সে বলল,—'প্লিজ ইন্সপেক্টর। আপনি আর একটু খুলে বলুন। ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি কী মনে করছেন?'

রাজীব ঈষৎ হাসল। ধীরে ধীরে সে বলল,—'আমি অনেক কিছু মনে করছি ডাক্তার রায়। অনেকগুলি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। সব কথা আপনাকে এখনই খুলে বলতে চাই না। তবে আমি আগে যা বলেছি, ব্যাপারটা ঠিক তাই। নীপা দেবী আত্মহত্যা করেননি। তাকে খুন করা হয়েছে।'

—'নীপা খুন হয়েছে?' অম্বর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।—কী বলছেন আপনি?' সে ফের বলল।

—'ঠিকই বলছি ডাক্তার রায়।' রাজীব জোরের সঙ্গে কথা কইল। 'ব্যাপারটা এখন আর ধোঁয়াটে নেই। কাচের মত স্বচ্ছ, দিবালোকের মত পরিষ্কার। যে খুন করল তার বুদ্ধির তারিফ না করে সত্যি উপায় নেই।'

অম্বর বিড়বিড় করে বলল,—'খুন? নীপা খুন হল?'

রাজীব বলল,—'পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে একটু পাশের দিকে নীল রঙের একটা রক্তবাহী শিরা অনেকেরই চোখ পড়ে। সবাই ওর নাম জানে না। কিন্তু আপনি নিশ্চয় ওর পরিচয় জানেন ডাক্তার রায়?'

অম্বর মুখ না তুলেই বলল,—'জানি। ওটা সাফেনাস ভেন। ডাক্তাররা অনেক সময় সাফেনাস ভেনে ইনজেকশন পুশ করেন।'

—'আপনি ঠিক বলেছেন।' রাজীব ওকে সমর্থন করল। 'এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারই ঘটেছে। মিসেস রায়কে মরফিন ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে ডাক্তার রায়। ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন এবং সম্ভবত সাফেনাস ভেনেই তা পুশ করা হয়েছিল।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল—'বেশ হেভি ডোজে মরফিন দেওয়া হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। নইলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত মৃত্যু হত না।'

—'মরফিন ইনজেকশন দিয়ে নীপাকে খুন করা হয়েছে?' অম্বর স্বগতোক্তির মত কথা বলছিল। —'কিন্তু কেন? কে খুন করল?'

ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রাজীব বলল,—'ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি আপনাকে করতে চাই ডাক্তার রায়। নীপা দেবীকে কে খুন করল? কেন খুন করল?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে সে অম্বরের দিকে এগিয়ে ধরল। কিন্তু অম্বর মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। বলল,—'এখন থাক। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে না।'

রাজীব আর জোর করল না। প্যাকেট খুলে নিজে একটা সিগারেট নিল। লাইটার বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল।

অম্বর বলল,—'আপনার প্রশ্নের জবাব আমি কেমন করে দেব মিঃ সান্যাল? নীপা কেন খুন হল? কে ওকে খুন করল, এর কোনো কূলকিনারাই আমি করে উঠতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে।'

রাজীব ফস করে বলল,—'আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ডাক্তার রায়?'

—'সন্দেহ?' অম্বর অল্পক্ষণ চিন্তা করল। সম্ভবত কথাটা সে ভাবছিল। তার কপালে দু-তিনটে কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। মাথার চুলে একবার আলতোভাবে হাত বুলিয়ে নিয়ে অম্বর বলল, —'আমার কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

একটু হেসে রাজীব সিগারেটে ছোট্ট টান দিল। তার নাক-মুখ দিয়ে কিছু ধোঁয়া বেরোল। ভ্রূ কুঁচকে রাজীব বলল,—'সন্দেহ করবার মত কাউকে না পেলেই কিন্তু মুশকিল। লোকে তখন আপনাকেই সন্দেহ করবে ডাক্তার রায়।'

—'আমাকে?' অম্বর একটা অসহায় ভঙ্গি করল। খুব ভয় পেলে মুখের চেহারা যেমন বদলে যায়, তেমনি শুকনো মুখে অম্বর কথা বলল। তার গলার স্বর বেশ নরম এবং ভিজে মনে হল। অম্বর বলল,—'লোকে কেন আমাকে সন্দেহ করবে ইন্সপেক্টর?'

রাজীব ফের হাসল।—'এর উত্তর তো অত্যন্ত সহজ ডাক্তার রায়। আপনার স্ত্রীকে মরফিন ইনজেকশন দেওয়া হয়,—ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন, এবং পরে মাথার বালিশের ঠিক পাশেই ঘুমের ওষুধের একটা শিশি রেখে খুনী সরে পড়ে। চক্রান্তটি চমৎকার। খুনের সমস্ত পরিকল্পনাটাই নিখুঁত, সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরে ঢুকে একনজরে তাকালেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নীপা দেবী ঘুমের বড়ি খেয়ে সুইসাইড করেছেন। বেশি মাত্রায় স্লিপিং পিল খেলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত,—ঘুম আর ভাঙে না। কিন্তু পরে জানা গেল এটা হোমিসাইড,—সুইসাইডের কেস নয়। মিসেস রায়কে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে খুন করা হয়েছে।'

অম্বর যুক্তি তুলতে চাইল। 'কিন্তু এর মধ্যে আমাকে কেন জড়ানো হবে? খুনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?' আমি তো সমস্ত রাত হাসপাতালে ডিউটি দিয়েছি।'

—'ইয়েস ডাক্তার রায়। রাত্রে আপনি ছিলেন না। হাসপাতালে ডিউটি দিতে গিয়েছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি জোরালো বক্তব্য এবং নিশ্চয়ই তা আপনার সপক্ষে যাবে। পুলিশ যদি আপনাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করে, তাহলে এই অনুপস্থিতির জন্যই হয়তো আপনি বেকসুর খালাস পাবেন। মানে, ইট উইল বি এ কার্স্ট আয়রন অ্যালিবাই ফর দি ডিফেন্স।'

অম্বর নির্বোধের মত তাকাল। করুণ মুখ করে সে বলল,—'পুলিশ কি আমাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করতে চায়?'

রাজীবের দৃষ্টি শাণিত, তীক্ষ্ণ হল। মুখ গম্ভীর দেখাল। 'ইচ্ছে করলে আপনাকে অবশ্য এখনই অ্যারেস্ট করা যায়। মরফিন ইনজেকশন দিয়ে নীপা দেবীকে খুন করা হল। যে খুন করল সে নিশ্চয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপারটা বোঝে। ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দিতে পারে। আপনি মেডিক্যালম্যান। এটা বোঝেন তো, মিসেস রায়কে খুন করতে কমপক্ষে আট-দশটা মরফিনের অ্যামপিউল ব্যবহার করতে হয়েছে। এতগুলি ইনজেকশন জোগাড় করা সাধারণ লোকের কম্মো নয়। আপনি নিজে চিকিৎসক এবং যিনি খুন হয়েছেন তিনি আপনার সহধর্মিণী। সুতরাং এই কেসে আপনাকে একজন সাসপেক্ট মনে করে অ্যারেস্ট করতে বাধা কোথায়?'

অম্বরের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই রাজীব চুপ করল। ডাক্তার বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখ। আশা-ভরসাহীন ছলছলে দৃষ্টি। তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের মত লোকটা কুঁকড়ে জড়সড়। কিন্তু ওকে চাঙ্গা করা প্রয়োজন। নইলে কে হবে তার পথ-প্রদর্শক? খবরাখবর কার মুখ থেকে সংগ্রহ হবে?

সিগারেটটা পুড়ে ছাই। রাজীব সেটি ফেলে দিয়ে এক গাল হাসল। অম্বরের দিকে তাকিয়ে বলল,—'কিন্তু ডাক্তার রায়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অ্যারেস্ট করা দূরে থাক, পুলিশ আপনাকে এখনই খুনি আসামি বলে ভাবতেও চায় না। আপনার কাছ থেকে আমরা হেল্‌প্ চাই ডাক্তার রায়। পুলিশের সঙ্গে আপনি সহযোগিতা করুন।'

—'হেল্প্? সহযোগিতা? আপনি কী বলতে চাইছেন ইন্সপেক্টর? আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' অম্বর বোকার মত তাকিয়ে রইল।

রাজীব আবার হাসল। বন্ধুর মত অমায়িক হেসে সে বলল,—'সহযোগিতা মানে আপনাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না। পুলিশ আপনার কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানতে চায় ডাক্তার রায়। আপনি যদি মন খুলে কথা বলেন, তাহলে আমি এখনই শুরু করতে পারি।'

ডুবন্ত মানুষ যেমন সামনে একটা কিছু ধরবার পেলেই দু'হাত বাড়িয়ে দেয়, অম্বর ঠিক তাই করল। উটপাখির মত গলাটা রাজীবের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল,—'কি বিশেষ কথা জানতে চান বলুন? আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি।'

রাজীব মনে মনে হাসল। তার কথার প্যাঁচে কাজ হয়েছে দেখে সে খুশি হল। চেয়ারে ভালো করে হেলান দিয়ে রাজীব বসল। সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ফের ধূমপান শুরু করল।

—'কিছু মনে করবেন না ডাক্তার রায়। আমি হয়তো একটু অনধিকার চর্চা করছি।' রাজীব বেশ ভনিতা করেই শুরু করল। সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে সে পুনরায় বলল,—'অথচ অন্য কোনো উপায় নেই। খুব আবশ্যক না হলে একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় এই প্রসঙ্গ আমি কখনও তুলতাম না।' অম্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে রাজীব ধীরে-ধীরে বলল,—'আমার প্রশ্নটা নীপা দেবীর সম্বন্ধে। আপনাদের দাম্পত্যজীবন এবং অন্যান্য বিষয়েও আমার কিছু জানবার আছে।'

—'বেশ তো। কী জানতে চান বলুন?' অম্বর প্রায় পরীক্ষার্থীর মত কথা বলল।

—'আপনাদের বিবাহ কত দিন আগে হয়েছিল?'

মানসাঙ্কের উত্তর দেওয়ার মত দ্রুত হিসেব করে নিয়ে অম্বর বলল,—'সাত বৎসর আগে আমাদের বিয়ে হয়। তখন আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি।'

—'বিয়ের পর থেকে মিসেস রায় আপনার সঙ্গেই ঘুরছেন তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। অবশ্য বিয়ের প্রথম দিকে ও একটু ঘন-ঘন বাপের বাড়ি যেত। একবার গেলে দশ-পনেরো দিন কিম্বা মাসখানেকও বাপের বাড়িতে থেকে এসেছে। তারপর আমার শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেলেন। সেও আমার বিয়ের বছর দু-এর মধ্যেই। ব্যস, বাপের বাড়ি যাওয়া ওর এক রকম বন্ধ হল। মাঝে অবশ্য কলকাতায় যেত। কাকার বাড়িতে দু-এক রাত্তির কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

—'আচ্ছা, এখানে তো আপনি বছরখানেক হল এসেছেন?'

—'ঠিক এক বৎসর নয়, তার একটু বেশিই হবে। আমি হাসপাতালে জয়েন করি লাস্ট এপ্রিলে।'

—'এর আগে কোথায় ছিলেন?'

—'সোনাডাঙা থানা হেলথ্ সেন্টারে। প্রায় ছ-বছর ছিলাম। ওখান থেকেই পলাশপুরে ট্রান্সফার হই।'

—'আচ্ছা ডাক্তার রায়, বিয়ের পর থেকে এই সাত বছরে আপনাদের কোনো ইস্যু হয়নি?' রাজীব প্রশ্ন করল।

অম্বর ম্লান হাসল। দু-এক সেকেন্ড পরে সে বলল,—'আমাদের বিবাহিত জীবনে ওটাই প্রথম ট্র্যাজেডি মিঃ সান্যাল। নীপা দেখতে সুন্দরী ছিল বলে মেয়েরা ওকে নাকি হিংসে করত। একটা কথা ওরা জানত না। বাইরে থেকে আমার স্ত্রীর সুঠাম শরীর এবং দেহের সম্পূর্ণতাই সকলের চোখে পড়ত। কিন্তু ওর ভিতরটা ছিল ঠিক বিপরীত। ছোট্ট মেয়ের মত অপরিণত, অসম্পূর্ণ। এবং এই কারণেই ওর পক্ষে মা হওয়া কোনোদিন সম্ভব হত না ইন্সপেক্টর।'

রাজীব দুঃখ প্রকাশ করল। বলল,—'নীপা দেবী একথা জানতেন ডাক্তার রায়?'

—'হ্যাঁ, সে জানত। কলকাতায় স্পেশ্যালিস্ট দেখিয়েছিলাম। তাঁরই অভিমত আপনাকে বললাম। নীপার কাছেও গোপন করিনি।'

—'এই নিয়ে মিসেসের মনে কোনো খেদ ছিল না ডাক্তার রায়?'

—'নিশ্চয় ছিল।' অম্বর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল—'কিন্তু মনে খেদ থাকলেও নীপা তা কখনও প্রকাশ করেনি। ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে ছিল মিঃ সান্যাল। কারো কাছে নিজের দীনতা প্রকাশ করতে চাইত না। এমন কি আমার কাছেও সংকোচ বোধ করত।'

—'তাহলে সন্তান না হওয়ার জন্য আপনাদের দাম্পত্যজীবনে কোনোদিন অশান্তির ঝড় ওঠেনি?'

—'না।' অম্বর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল। বলল,—'আমি নিজে ডাক্তার। এমন কেস জানি। দেহের ভিতরে যদি কোনো খুঁত থেকে যায়, তার জন্য মানুষ দায়ী নয়। অনভিপ্রেত হলেও তা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়াই শিক্ষিত মনের পরিচয়।'

—'এ কথা ঠিক।' রাজীব মন্তব্য করল। একটু চিন্তা করে সে বলল,—'নীপা দেবীর থিয়েটার-নাটকের উপর খুব ঝোঁক ছিল, তাই না ডাক্তার রায়?'

—'হ্যাঁ। আমি শুনেছি বিয়ের আগে একটা অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবে ও মাঝে-মাঝে যেত। নিশ্চয় ক্লাবের মেম্বারও হয়েছিল।'

—'বিয়ের পরে তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল?'

—'আমি ঠিক জানি না।'

—'পলাশপুরে এসেই উনি থিয়েটার-নাটক নিয়ে মেতে উঠলেন, তাই না?'

—'দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি। পলাশপুরে এসে নীপা কলেজে ভর্তি হতে চাইল। বিয়ের আগে ও প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় পাশ করেছিল, ডিগ্রি কোর্সে আর ভর্তি হয়নি। স্ত্রীকে কলেজে ভর্তি করতে আমার খুব আগ্রহ ছিল না। কিন্তু নীপা এমন জিদ ধরল যে, আমি রাজি না হয়ে পারিনি। অনিচ্ছুক হলেও অবচেতন মনে আমি এমনি একটা কিছু চেয়েছিলাম। ছেলেপুলে না হওয়ার জন্য নীপার অন্তরে একটা শূন্যতা ছিল। ও যদি লেখাপড়া করে শূন্যতার কিছু অংশ পূর্ণ করতে চায় তাতে আমি বাধা দেবো কেন? আমার সঙ্গে গিয়েই নীপা একদিন কলেজে ভর্তি হল। ইতিহাসে অনার্স নিল। পড়াশুনোর সুবিধে হবে ভেবে একজন প্রফেসরের কাছে সপ্তাহে দুদিন টুইশানি পড়বারও ব্যবস্থা করে দিলাম।'

কথার মধ্যেই রাজীব বলল,—'কিন্তু অনার্সের ছাত্রী হয়েও থিয়েটার-নাটকের উপর ওর ঝোঁক বেড়ে গেল কেন?'

—'তার কারণও আপনাকে বলছি। অভিনয়ে নীপার বরাবরই আগ্রহ। আমি যখন গ্রামের দিকে ছিলাম, তখন ছোট ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে-পড়িয়ে ও বেশ সুন্দর ফাংশন করত। কলেজে ঢুকেই নীপার খ্যাতি হল। ওদের থিয়েটার হয়। ছেলেমেয়েরা মিলে অভিনয় করে। বইটার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু নীপার অভিনয় দেখে সবাই খুব প্রশংসা করল। মাস কয়েক পরে কলেজে ফের থিয়েটার হল এবং সেবারেও নীপা একাই আসর মাত করল। অভিনয়ে কেউ ওর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনি।'

রাজীব ঈষৎ হাসল। সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে বলল,—'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। তারপরই বোধহয় উনি টাউন ক্লাবের থিয়েটারে পার্ট নিলেন?'

—'ঠিক বলেছেন। কলেজে ওর অভিনয় দেখে অনেকেই প্রশংসা করে। তাই টাউন ক্লাবের নাটকে চট করে ওর ডাক পড়ল।'

সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে অম্বর বুঝতে পারল, মানুষটা গভীরভাবে কিছু ভাবছে। অনেকক্ষণ পরে রাজীব কথা বলল, 'আচ্ছা ডাক্তার রায়, মিসেসকে টাউন ক্লাবের নাটকে নামতে দিতে আপনি আপত্তি করেননি?'

'আপত্তি? মানে,—' অম্বর ঢেকে গিলল। ভ্রূ কুঁচকে রাজীব বলল,—'গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও আমার কাছে তা লুকোবেন না ডাক্তার রায়, তাতে আপনারই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।'

—'না, না। লুকোব কেন?' অম্বর তাড়াতাড়ি বলল, কিন্তু তবু তার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা এবং সংশয় প্রকাশ পেল।

রাজীব বলল,—'আমি জানি ডাক্তার রায়, টাউন ক্লাবের নাটকে নীপা দেবীকে অভিনয় করবার অনুমতি আপনি দিতে চাননি। আপনার সম্পূর্ণ অমতেই মিসেস এ কাজ করেছিলেন।'

অম্বরকে খুব বিস্মিত মনে হল। মুখ তুলে সে বলল,—'একথা আপনি কেমন করে জানলেন?'

রাজীব একটুও চঞ্চল হল না। অম্বরের চোখের দিকে সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'আমি আরো একটা ব্যাপার জানি ডাক্তার রায়।' একটু থেমে সে যোগ করল,—'নীপা দেবী ফিল্মে নামতে চেয়েছিলেন। এবং স্ত্রীকে সিনেমায় নামতে দিতে আপনি রাজি হননি। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে মন কষাকষিও চলছিল।'

অম্বর প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'সিনেমায় নামার কথা আপনাকে কে বলল মিঃ সান্যাল? এ নিশ্চয় সেই অবিনাশ সমাদ্দারের কাজ। বজ্জাতটা ছিনে-জোঁকের মত কদিন আমার পিছনে লেগেছিল। খালি বলত, প্রতিভাকে তার বিকাশের পথ করে দিন। নইলে শিল্পীর অপমৃত্যু হবে। শেষ পর্যন্ত ওর কথাই ফলল ইন্সপেক্টর। লোকটা পাজি,—এক নম্বরের শয়তান।'

বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে রাজীব বলল—'অবিনাশ থাকে কোথায় জানেন?'

অম্বরকে খুব উত্তেজিত মনে হল। 'কোথায় আবার থাকবে? সিনেমা-থিয়েটার করে বেড়ায়। ওদের কি চালচুলোর ঠিক আছে? এখানে শুনেছি দেবরাজ মিত্তিরের বাড়িতে থাকত। দুজনে একেবারে হরিহর আত্মা।'

—'দেবরাজ মিত্রও কি আপনার বাড়িতে আসত?' রাজীব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

মুখ নামিয়ে অম্বর বলল,—'এসেছে দু-একবার।'

—'একটা কথা বলব ডাক্তার রায়।' রাজীব রহস্য করে তাকাল। 'সুন্দরী স্ত্রী হলে স্বামী বেচারার এক জ্বালা। মনে সোয়াস্তি নেই,—নানা রকম সন্দেহের আনাগোনা। আমার প্রশ্নটাও তাই। নীপা দেবীর হাবে-ভাবে, ব্যবহারে আপনার মনে কখনও সন্দেহ দানা বেঁধেছিল?'

অম্বর নিরুত্তর।

রাজীব বলল,—'চুপ করে থাকবেন না ডাক্তার রায়। পরিকল্পনা করে, ফন্দি এঁটে হত্যা করলে খুনিকে ধরা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই কেসে খুনি যথেষ্ট চতুর। রীতিমত বুদ্ধিমান বলেই আমার বিশ্বাস। তার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় এঁটে উঠতে হলে, আমাদেরও কৌশল চাই। ফন্দি তৈরি করতে হবে। কাজেই আপনি আর সঙ্কোচ করবেন না। পরিষ্কার করে সব কথা বলুন।'

রাজীবের কথায় মন্ত্রের মত কাজ হল। অম্বর মাথা নিচু করে ছিল। এবার সোজা হয়ে বসল। 'আমি সব কথা বলব ইন্সপেক্টর। কিছুই গোপন করব না।' সে ঘাড় সোজা করে তাকাল। এদিকে-ওদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অম্বর গলা নামিয়ে বলল, 'আমি স্বীকার করছি ইন্সপেক্টর, নীপাকে আমি সন্দেহ করতাম। পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ওর মাখামাখি, ঘনিষ্ঠতা আমার বুকে ক্ষতের যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। দিনে-দিনে আমার সন্দেহ বাড়ছিল। সত্যি বলছি, এমনিভাবে চললে, হয়তো একদিন ওকে আমি গলা টিপে মারতাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ সান্যাল, নীপাকে আমি খুন করিনি। ওকে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে আমি মারিনি।'

রাজীব আশ্চর্য হল। ডাক্তার পাগল হল নাকি? উত্তেজনার ঝোঁকে ওর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। মনে যা আসছে তাই বলছে। নইলে বউকে খুন করবার ইচ্ছে হয়েছিল, এমন কথা কেউ পুলিশকে বলে?

—'কার সঙ্গে মিসেস রায়ের সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারেন?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয় পারি। সে ছোকরা এই কলেজেরই প্রফেসর। নাম নীলাদ্রি সেন। থিয়েটারের সেই নাকি ডিরেক্টর। নীপাকে নায়িকার রোলে ওই নামিয়েছে।'

—'আই সী।' রাজীব সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, 'আর দেবরাজ মিত্র? তার সঙ্গেও তো নীপা দেবীর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল?'

—'নিশ্চয় ছিল, দেবরাজই তো এই বইয়ের হিরো—'

—'তাই নাকি?' রাজীব একটু হাসল, 'তাহলে হিরো-হিরোইন আর ডিরেক্টর। আপাতত তিনজনকে পাওয়া যাচ্ছে, আর একজন নীপা দেবীকে ফিল্মে নামাতে চেয়েছিল।' রাজীব ঠিক অঙ্ক কষবার মত হিসেব করল।

বাঁ হাতের করতলের সাহায্যে কপালটা চেপে ধরে রাজীব ফের বলল,—'আচ্ছা, মিসেস রায় কার কাছে পড়তেন?'

—'হিস্ট্রির প্রফেসর অনিমেষ দত্তের কাছে। সেও একটি চীজ্। অদ্ভুত ধরনের লোক মশায়। এখানে কোনোদিন টুইশনি করেনি। অনেকে গিয়েছে, অনিমেষ দত্ত পড়াতে রাজি হয়নি। অথচ আমরা একটু চেপে ধরতেই লোকটা একবার নীপার মুখের দিকে তাকাল। আর তারপরই পড়াতে রাজি হল।'

একটু হেসে রাজীব উঠে দাঁড়াল। 'এখন চলি ডাক্তার রায়, বিকেলের দিকে আমি একবার আসতে পারি। আপনি কি তখন থাকবেন?'

—'নিশ্চয় থাকব।' অম্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কিন্তু আবার আসবেন কেন?' তার কণ্ঠস্বর স্যাঁতস্যাঁতে, ঠাণ্ডা মনে হল।

রাজীব কথা বলল না। ওর ভীত, নার্ভাস মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ইতস্তত করে অম্বর কথাটা বলল,—'পুলিশ কি আমাকেই খুনি বলে সন্দেহ করছে?'

রাজীব ফের হাসল। লোকটা ভীষণ দুর্বলচিত্ত আর তেমনি ছটফটে। সে বলল,—'সন্দেহ করা খুব সহজ কাজ। পুলিশ তা ভাবলেও আপনার কি আসে যায়?' একটু থেমে আবার বলল রাজীব, —সন্দেহ করা সহজ হলেও অভিযোগ প্রমাণ করা খুব কঠিন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মতই দুরূহ কাজ। সুতরাং মিথ্যে চঞ্চল হবেন না।'

অফিসে ফিরে রাজীব দেখল চাঁদবদনকে নিয়ে সুব্রত অপেক্ষা করছে। কাল রাত্তিরেই ওকে নির্দেশ দেওয়া ছিল। সুব্রত ঠিক ডিউটি করেছে।

লোকটার মাথার চুল বিপর্যস্ত ধানক্ষেতের মত উস্কোখুস্কো। শুকনো আমসি মুখ। ভীত, সন্ত্রস্ত চাউনি। দেখলে মনে হয় মানুষটা পুলিশের হেফাজতে নেই। ওকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই রাজীব বলল,—'নীপা দেবীকে আপনি চিনতেন?'

—'নীপা দেবী মানে নরেশবাবুর ভাতিজি হুজুর?'

—'হ্যাঁ, ওকে আপনি আগে চিনতেন?'

—'চিনতাম মানে কি—' লোকটা আমতা আমতা করল।

—'মানে-টানে রেখে আসল কথা বলুন।' রাজীব ধমক দিল।

—'বলছি হুজুর।' লোকটা সভয়ে তাকাল, 'নরেশবাবুর ভাতিজিকে হামি একবার দেখেছিলাম।'

—'কোথায়?'

—'ট্রেনের ডিব্বায়,—মানে কি গাড়ির কামরায়।'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

চাঁদবদন বলল,—'জামশেদপুরসে কলকাতা ফিরছি হুজুর। শিমুলপুরে গাড়ি খালি,—সব কোই উতরে গেল। হামি একেলা রইলাম। আউর ওহি স্টেশনমে নরেশবাবুর ভাতিজি কামরামে উঠল। উস কি সাথ এক ছোকরা। হাম শোচলাম কি, দোনো হাজব্যান্ড ঔর ওয়াইফ হোবে। গাড়ি ছুটল। ও লোগ বাত্‌চিত শুরু করল। লেড়কি কা কিতনা মিঠি-মিঠি বুলি। প্যার কা বাত্‌ বাবুজি। হামি বাংলা জানি, সমঝতে পারি। লেকিন বাত্‌চিত শুনে আমি তো তাজ্জব হুজুর। মালুম হোল কি ও লোগ্‌ হাজব্যান্ড-ওয়াইফ নেহি হ্যায়। দোনো স্রেফ লাভার হ্যায় হুজুর।'

উৎসাহ দিয়ে রাজীব বলল,—'তারপর?'

—'উস্‌ কি বাদ? সেই কথাই তো বলছি হুজুর। আধা ঘন্টা বাদ হামি একবার বাথরুমে ঘুসলাম। দরওয়াজা বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনমে কি হল হুজুর। দরওয়াজা খোড়া খুলে হামি দেখলাম—'

—'কি দেখলেন?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'বহুৎ শরম্‌ কি বাত হুজুর।' লোকটা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সলজ্জভাবে তাকাল।

—'বলে ফেলুন চটপট। দেরি করছেন কেন?'—রাজীব ধমক দিল।

এক গাল হেসে চাঁদবদন বলল,—'দেখলাম কি ও ছোকরা নরেশবাবুর ভাতিজিকে কিস্‌ করছে হুজুর।'

তেরো

রাজীব চোরাদৃষ্টিতে দেখল সুব্রত মুখ টিপে হাসছে। চাঁদবদনেরও বিগলিত অবস্থা। এমন একটা রসালো সংবাদ পরিবেশন করতে পেরে সে আহ্লাদে আটখানা। ব্যাপারটা মজাদার সন্দেহ নেই। ঘটনায় রহস্য আছে। কিন্তু সে রহস্য গোপন প্রেমের। তার স্বাদটুকু মধুর। গন্ধটি মনমাতানো এবং উত্তেজক। দুজনেই তারিয়ে-তারিয়ে রসটুকু উপভোগ করছে।

এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার। ঘরের মধ্যে চাঁদবদনকে দেখে মিসেস রায় তাই চমকে উঠেছিলেন! লোকটা তাঁকে একজন পরপুরুষের সঙ্গে ট্রেনে উঠতে দেখেছে। কামরাতে চতুর্থ ব্যক্তি ছিল না। সমস্ত পথ দুজনের মুখোমুখি ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, ঠাট্টা-তামাশা কিছুই লোকটার দৃষ্টি এড়ায়নি। দুজনের সম্পর্কটা বুঝতে ওর বাকি নেই। লোকটা অবাঙালি। হয়ত বাংলা ভাষা ভালো বোঝে না। কিন্তু তাতে কী? প্রেমের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে মুখের ভাষা জানতে হয় না। চোখের ভাষা বুঝলেই যথেষ্ট।

রাজীব একদৃষ্টিতে চাঁদবদনকে লক্ষ্য করল। মুখখানা চাঁদপানাই বটে। গালে, কপালে, নাকের উপর এবং অনেক স্থানেই বসন্তের ক্ষতের স্থায়ী চিহ্ন। অনায়াসে ওগুলিকে ছবিতে দেখা চন্দ্রপৃষ্ঠের নানা গহ্বর হিসাবে কল্পনা করা যায়। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিম্বা তার চেয়ে কিছু কমও হতে পারে। মাথার চুল পাতলা। এবং ছোট করে ছাঁটা। কপাল প্রশস্ত নয়। মুখ শুকনো, —নিংড়ে রস বের করে নেওয়া এটা পান্তুয়ার মত। কিন্তু চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল। বুদ্ধির যথেষ্ট ছাপ আছে। গম্ভীর মুখ করে রাজীব বলল,—'নরেশবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?'

—'পাঁচ-ছ বছর হোবে', চাঁদবদন জবাব দিল।

—'ট্রেনের কামরায় যে ছোকরাকে দেখেছিলেন তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

—'জরুর হুজুর। কেনো পারব না?'

—'ছোকরাকে দেখতে কেমন? গায়ের রঙ ফর্সা? খুব সুন্দর?' রাজীব প্রশ্ন করল।

—'না হুজুর। ফর্সা নয়, কালাই আছে। লেকিন দেখতে খারাপ নয়। আচ্ছাই হ্যায়।'

—'লোকটা লম্বা না বেঁটে? চোখে চশমা ছিল?'

—'লম্বা নয়, থোড়া খাটোই আছে। হাঁ, আঁখেমে চশমা তো ছিল।' চাঁদবদন একটু চিন্তা করে বলল।

—'হুম্', রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। ইশারা করে সুব্রতকে কাছে ডাকল। তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বলল,—'পলাশপুর কলেজের বাংলার প্রফেসর নীলাদ্রি সেনকে চেন?'

সুব্রত একটুও না ভেবে জবাব দিল,—'কার কথা বলছেন? নীলাদ্রি সেন? তাঁকে বিলক্ষণ চিনি। পলাশপুরে তিনি তো ফেমাস ব্যক্তি?'

—'লোকটা ফর্সা না কালো?'

—'গায়ের রঙ কালোই। কিন্তু দেখতে সুন্দর। ছোট দুটি বড় বড়। কোঁকড়া, কোঁকড়া চুল। বেশ প্লিজিং পার্সোন্যালিটি।'

—'বুঝলাম।' রাজীব একটু হেসে বলল, 'কেষ্টঠাকুর মার্কা চেহারা, নিশ্চয় কিছুটা বেঁটে? চোখে চশমাও আছে?'

সুব্রত স্বীকার করল। নীলাদ্রি সেন দৈর্ঘ্যে একটু খাটো। চোখে চশমাও আছে। খয়েরি রঙের ফ্রেম, ডাঁটিগুলি মোটা।

রাজীব ফের চাঁদবদনকে নিয়ে পড়ল।

—'ট্রেনের কামরায় যা দেখেছিলেন, সেকথা কারো কাছে গল্প করেছেন?'

—'কারো কাছে মানে—'চাঁদবদন কথা শেষ না করেই থামল।

—'কার কাছে গল্প করেছিলেন বলুন। খবরটা আমার জানা দরকার।'

—'সারাদিন কারো কাছে গল্প করলাম না হুজুর। লেকিন সন্ধ্যার পর নরেশবাবুকে সব কথা বলে ফেললাম। না বলে পারলাম না।'

রাজীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল,—'না বলে থাকতে পারলেন না কেন? নরেশবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

—'আজ্ঞে না হুজুর।' চাঁদবদন ভয়ে ভয়ে বলল।

—'তাহলে?'

—'পরশু দিন সন্ধের পরেই ডাগদারবাবু হামার কাছে এসেছিল।'

—ডাক্তারবাবু মানে? মিঃ অম্বর রায়?'

—'জী, হাঁ। ও পুছল কি নীপা দেবীকে হামি চিনি কিনা। ওর সাথে হামার আগে মোলাকাত হয়েছে কি না জানতে চাইল।'

—'আপনি কী বললেন?'

—'কুছু জানালাম না।' চাঁদবদন একটু হেসে বলল,—'হামি বললাম নীপা দেবীকে চিনব কেমন করে? কভি দেখাই নেহি।'

—'ডাক্তার আপনার কথা বিশ্বাস করল?'

—'বিলকুল নেহি হুজুর। হামাকে বলল কি, আপ ঝুটা বাত বলছেন। নীপাকে আপ জরুর

চিনতেন। লেকিন সাচ বাত্‌ বলছেন না।'

রাজীব প্রশ্ন করল,—'সত্যি কথাটা ডাক্তারের কাছে চেপে গেলেন কেন?'

—'বলছি হুজুর।' চাঁদবদন একবার সুব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল।

সাহস জুগিয়ে রাজীব বলল,—'ওর সামনে সঙ্কোচ করবার কোনো কারণ নেই। আপনি নির্ভয়ে বলে যান।'

চাঁদবদন বলল,—'সাচ্‌ বাত বলব কেমন করে হুজুর? হামাকে নীপা দেবী যে মানা করে গেল।'

—'বলেন কী?' রাজীব সোজা হয়ে বসল। 'মিসেস রায় আপনার কাছে এসেছিলেন?'

—'এসেছিলেন বৈকি। তখন বেলা চারটা হোবে। নরেশবাবু বাথরুমে, হোটেলের একটা চাকর এসে বলল,—একঠো জেনানা আপক সাথ ভেট করতে চায়। হামি নীচে গিয়ে দেখলাম নরেশবাবুর ভাতিজি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।'

—'তারপর?'

—'বহুৎ রিকোয়েস্ট করে উনি বলল কি ডাগ্‌দার এলে এসব কথা তাকে যেন না বলি।'

—'হুম্‌।' রাজীব একমুহূর্ত চিন্তা করল। পরে বলল,—'তাহলে নরেশবাবুর কাছে এ গল্প করলেন কেন?'

—'সাচ্‌ বলছি হুজুর। এ গল্প আমি করতাম না। কিন্তু নরেশবাবু যখন ওর ভাতিজির ঘর থেকে ফিরছিল তখন ডাগ্‌দার সাবকে হোটেল থেকে বেরোতে দেখল। ও এসেই হামাকে পুছল কি, অম্বর কেনো এসেছিল? আমি ঝুট বলতে পারলাম না। সব কথা ওকে বলতে হল হুজুর।'

রাজীব এবার প্রসঙ্গান্তরে গেল।

—'বাড়ি বিক্রির কথা নরেশবাবুই আপনাকে বলেছিলেন?'

—'হাঁ হুজুর। হামাকে বললেন কি যে ওর ভাতিজির একঠো মকান আছে। তিনতলা বাড়ি, —অনেক ঘর আছে। লেকিন দাম বেশি হোবে না। হামি যদি কিনতে যাই তো উনি সব বেবোস্তা করে দেবেন। তখন হামি বললাম কি সুবিস্তামে হোনে সে কেনো কিনব না? জরুর কিনব।'

—'নরেশবাবু কত দাম চেয়েছিলেন?'

—'পঞ্চাশ হাজার রুপেয়া। দাম ঠিকই আছে। কিনলে হামার পোষাবে।'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে বলল,—'ব্যাপার কি মশায়? কলকাতার উপর তিনতলা বাড়ির দাম মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা? বাড়িটা কোথায়?'

—'হুজুর, গোলদিঘির কাছে।'

—'অ্যাঁ! গোলদিঘির কাছে তিনতলা বাড়ি। বলছেন অনেক ঘর। আর তার দাম মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা।' মাথা নেড়ে রাজীব বলল,—'উঁহু, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক ঠেকছে আমার। এমন জলের দরে বাড়ি বিকোয় না।'

—'সন্দেহকা কই বাত নেহি হুজুর। এ তো খালি বাড়ি নেই। খরিদ করব, কিন্তু দখল পাব না। সব ঘরে ভাড়াটে আছে। বাড়ি খালি করতে কম-সে-কম বিশ-পঁচিশ হাজার রুপেয়া খতম হোবে।' কথা শেষ করে চাঁদবদন রাজীবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু রাজীবের কোনো ভাবান্তর হল না। তার মুখ দেখেই মনে হল কথাটা সে আদৌ বিশ্বাস করেনি। ধমক দিয়ে রাজীব বলল,—'বাজে কথা রাখুন। গোলমেলে সম্পত্তি হলে লোকে দাঁও বুঝে কম দামে বিষয় কেনে। কিন্তু কলকাতার উপর তিনতলা বাড়ির এমন জলের দর ইদানীং কালে শুনিনি। দাম শুনে মনে হয় আপনি ঠকিয়ে নাবালক কিম্বা বিধবার সম্পত্তি কিনছেন।'

পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে রাজীব ধূমপানে উদ্যোগী হল। লাইটারের আগুনে

সিগারেটের মুখাগ্নি করল। পরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—'চাঁদবদনবাবু, আপনাকে একটা কথা এখনও বলিনি। নরেশবাবুর ভাতিজি মানে যার বাড়ি আপনি কিনতে চেয়েছিলেন তিনি আর বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করেছেন বলে শুনেছেন তো?'

—'হাঁ হুজুর।' চাঁদবদন ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল। বলল,—'শুনে দিলমে বহুৎ দুখ্ হল হামার। কিতনা খুবসুরত জেননা। না জানে মনমে কি দুখ্ ছিল। লেকিন সবকো বহুৎ দুখ্ দিয়ে গেল। উসকি চাচা নরেশবাবু তো একদম চুপ হয়ে গিয়েছে। কাল থেকে একঠো বাত্ ভি বলেনি।'

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে রাজীব বলল,—'কথাটা কিন্তু ঠিক নয় চাঁদবদনবাবু। নীপা দেবী আত্মহত্যা করেননি। তিনি খুন হয়েছেন। তাঁকে ইনজেকশন দিয়ে মারা হয়েছে।'

চাঁদবদন চমকে উঠল। সে খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। গোল গোল চোখ করে বলল,—'কি বললেন হুজুর? নরেশবাবুর ভাতিজি খুন হয়েছে? সুঁই দিয়ে খতম করেছে ওকে?'

—'হ্যাঁ।' রাজীব স্পষ্ট জবাব দিল। 'এখন বলুন জলের দরে বাড়িটা পাবেন বলে নরেশবাবুকে কত টাকা দালালি কবুল করেছিলেন।'

—'দালালি? কী বলছেন হুজুর?—' চাঁদবদন আমতা-আমতা করল।

—'ঠিকই বলছি।' রাজীব ফের ধমক দিল, 'ভালো চান তো সব কথা স্বীকার করুন চাঁদবদনবাবু। নইলে আপনার কপালে দুঃখ আছে। বাড়ি কিনবার জন্য আপনারা দুজনে কলকাতা থেকে পলাশপুরে এলেন আর তারপরই মিসেস রায় খুন হলেন। এবং যে রাতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটল, সেই রাতে আপনারা দুজনেই পলাশপুরে ছিলেন।'

—'হামি থাকতে চাইনি হুজুর। বিকালের ট্রেনে যাব বলেছিলাম। কিন্তু নরেশবাবু মানা করল।'

—'মানা করল কেন?'

চাঁদবদন খুব ভয় পেয়ে বলল,—'থোড়া পানি—'

সুব্রতর নির্দেশে একজন সেপাই এসে এক গ্লাস জল রেখে গেল। চোঁ-চোঁ করে খানিকটা জল গিলে চাঁদবদন বলল.—'আমি সব বলছি হুজুর। পরশু সকালবেলায় বাড়ির দরদাম নিয়ে বাতচিত হল। নরেশবাবু বলল কি, চাঁদবদন পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম দিবে। বাত্চিত হল, কিন্তু কুচ্ছু ফাইনাল হল না। ডাগদারবাবু বলল কি, ওরা পিছে জানাবে। কথা হল, সন্ধেবেলা নরেশবাবু যাবে ওর ভাতিজির কাছে। ওই দামে বাড়ি বেচবে কি না জেনে আসবে।'

—'তা, নরেশবাবু কখন ওর ভাইঝির কাছে গেলেন?'

—'বিকেলবেলায় হুজুর। তখন সন্ধা হতে দেরি আছে—'

—'ফিরে এসে তিনি কী বললেন?'

—'ভালো কথা বলল। ওরা বাড়ি বেচবে। পঞ্চাশ হাজার টাকাতেই রাজি। হামাকে বলল কি, চাঁদবদনজি তোমার টাইম ভালো যাচ্ছে। সামনের সামনের হপ্তায় দলিল-টলিল তৈয়ার করতে হোবে। হামি বললাম, এসব ভগবান কি কিরপয়া। কিন্তু—'

—'কিন্তু কী আবার?' রাজীব ওকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল।

চাঁদবদন ইতস্তত করে উত্তর দিল,—'রাত্তিরবেলায় নরেশবাবু তো উল্টা কথা বাতাল।'

—'কী রকম?' রাজীব কৌতূহলী হল।

চাঁদবদন গলা নামিয়ে বলল,—'আট বাজনে কো বাদ নরেশবাবু ঔর একদফা বাহার গেলেন। যখন ফিরলেন, তখন রাত দশটা হয়েছে। ওতো পানি হুজুর। রিকশা করে ফিরলেন তো কী হোবে? একদম ভিজে কাদা—'

রাজীব আগ্রহসহকারে বলল,—'তারপর? নরেশবাবু কী বললেন?'

চাঁদবদনকে চিন্তিত দেখাল। সে বলল,—'নরেশবাবু রাত্তিরে কুচ্ছু খেল না হুজুর। বলল কি

তবিয়ৎ আচ্ছা নেই। হামাকে বলল,—'চাঁদবদনবাবু, হামার ভাতিজি এখন বাড়ি বেচবে না বলেছে। লেকিন হামি তো সমঝতে পারল না। দো-তিন ঘনটাকা অন্দর মতলব্ ক্যায়সে বদলে গেল।'

রাজীব বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তার প্রশস্ত কপালে ছোট-বড় কয়েকটি রেখা দেখা দিল। ভ্রূ কুঁচকে রাজীব প্রশ্ন করল,—'চাঁদবদনবাবু, আপনি আমার আসল কথাটার কিন্তু এখনও জবাব দেননি।'

—'আসল কথা', চাঁদবদন বিস্ময় প্রকাশ করল, 'হামি তো সব কুছ বললাম।'

—'উহুঁ।' রাজীব বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করল। 'সস্তায় বাড়ি কিনতে যাচ্ছিলেন। কত টাকা দালালি দেবার কথা ছিল, তা তো কই ভাঙলেন না।'

চাঁদবদন ব্যাপারটা বুঝল। ইন্সপেক্টর ভোলবার নয়। তার মনের মধ্যে দ্বিধা আর সংশয় খাঁচায় পাখির মত এদিক-ওদিক নাচানাচি করছিল। সুব্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে সে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। পরে বলল,—'আপ ঠিক হি মালুম করিয়েছেন হুজুর। নরেশবাবু হামসে বিশ হাজার রুপেয়া মাগিয়েছিল। হামি বললাম কি দশ হাজার রুপেয়া দেব। লেকিন ও ছোড়নেকা আদমি নেহি হুজুর। কাম হোনে কা বাদ ঔর এক-দো হাজার জরুর মাঙত।'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিতেই সেটির আয়ু ফুরোল। শেষ টুকরো অংশটি অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে সুব্রতের দিকে তাকল রাজীব। চোখ নাচিয়ে রহস্য করে হাসল। সুব্রত বুঝতে পারল চাঁদবদনের সঙ্গে রাজীবদার কথাবার্তা শেষ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। এগিয়ে গিয়ে সে বলল,—'ঠিক আছে চন্দ্রবদনবাবু। আপনি এখন আসুন। আর আপনাকে প্রয়োজন নেই।'

মুখ তুলে রাজীব এবার কথা কইল। 'কোথায় ফিবে যাবেন এখন? হোটেলেই তো?'

—'ঔর কাঁহা যাব হুজুর? লেকিন আজ কলকাতা যেতে চাই। না গেলে বহুৎ লোকসান হোবে।'

অনুমতি দানের ভঙ্গিতে রাজীব বলল,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কলকাতা যাবেন বৈকি। আজ দুপুরের ট্রেনেই চলে যান। কিন্তু তার আগে নরেশবাবুর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার। উনি এখন হোটেলেই আছেন তো?'

—'মালুম হচ্ছে কি হোটেলেই থাকবেন।' চাঁদবদন একটু ভেবে বলল।

হাত তুলে সে নমস্কার করল। প্রথমে রাজীবকে, পরে সুব্রতকেও। তারপর ধীরে-ধীরে ঘব থেকে বেরোল।

চাঁদবদন চলে যেতেই রাজীব ফের একটা সিগারেট ধরাল। সুব্রতের দিকে তাকিয়ে বলল, —'একটু চা খাওয়া যাক সুব্রত। লোকটার সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করে মগজের যন্ত্রপাতি বিগড়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।'

মিনিট দুই-তিন পরেই চা এল। ধূমায়িত পেয়ালা। চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে এক ঢোকে গরম চা গিলল রাজীব। বলল,—'কেসটা কী রকম মনে হচ্ছে সুব্রত?'

—'কি জানি রাজীবদা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কেসটা খুব জটিল। ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

—'খুড়ো আর জামাই। এদের দুজনের মধ্যে কাকে খুনি বলে মনে হয় তোমার?'

—'বলা মুশকিল রাজীবদা। গোড়া থেকেই ডাক্তারকে খুনি বলে সন্দেহ হয়েছে আমার। লোকটা শয়তান। ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে সুন্দরী বউকে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। ওকে আপনি অ্যারেস্ট করলেন না দেখে আমি তো অবাক। কিন্তু এখন দেখছি শুধু জামাই নন, —বাঘের খেলা দেখাতে খুড়োও কিছু কম যান না। তিনিও একজন ওস্তাদ ব্যক্তি,—রিংমাস্টার। ওর গতিবিধিও তো রীতিমত সন্দেহজনক।'

রাজীব আর একটু চা খেল। বলল,—'গতিবিধি সন্দেহজনক তো বটেই। সমস্ত ব্যাপারটা

বিশ্লেষণ করে দেখো সুব্রত। খদ্দের জুটিয়ে দেবার নামে ভাইঝির বাড়িটা বিক্রি করে লোকটা কিছু কামাবে ভেবেছিল। চেয়েছিল বিশ হাজার, কিন্তু খরিদ্দার লোকটা দশ হাজারের বেশি দিতে রাজি হয়নি। বাড়ির বিক্রির সব ঠিকঠাক। সামনের সপ্তাহে দলিল তৈরি হবার কথা ছিল। হঠাৎ রাত দশটার সময় কোথা থেকে জলে ভিজে নরেশবাবু হোটেলে ফিরল। আর তারপরই চাঁদবদনকে বলল, তার ভাইঝির মত পাল্টেছে। সে এখন বাড়ি বেচবে না।'

সুব্রত তাড়াতাড়ি বলল,—'ওকেই কি তাহলে অ্যারেস্ট করবেন রাজীবদা?'

—'খেপেছ?' রাজীব চোখ পাকিয়ে বলল,—'অ্যারেস্ট করে কী হবে? তাছাড়া ভাইঝির শরীরে ওই যে ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়েছে তার প্রমাণ কোথায়?'

সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব মুনি-ঋষির মতই ধ্যানস্থ হল। চুপ করে কী ভাবল। অনেকক্ষণ পরে তেমনি চোখ বুজেই সে কথা বলল, 'বাঘ শিকারের গল্প পড়েছ তো সুব্রত? মাচার উপর উঠে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করাই হল শিকারির পরীক্ষা। অন্ধকার রাত। মাথার উপর তারাজ্বলা আকাশ। কত জন্তু-জানোয়ার আসে, যায়। কিন্তু শিকারির কি উতলা হলে চলে? একটা বড় হরিণ কিম্বা দাঁতাল শুয়োরকে দেখে যদি গুলি চালিয়ে বস, তাহলেই শিকারের দফা গয়া। মাচার উপর জেগে বসে রাত কাবার করাই সার হবে। বাঘের দেখা মিলবে না।'

সুব্রত একটু হেসে বলল,—'তাহলে কী করবেন?'

ওর কথা শুনেই রাজীব সোজা হয়ে বসল। কাপের বাকি চাটুকু ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। এক ঢোকে তা নিঃশেষ করে রাজীব উঠে দাঁড়াল। 'চল, একবার খুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।' সে হেসে বলল। বাঁ দিকের হোয়াট নট থেকে একটা চটি ফাইল তুলে নিয়ে রাজীব ধীরে-ধীরে এগোল।

বেলা প্রায় এগারোটার মত হবে। মাথা তুলে রাজীব দেখল সূর্য বেশ উপরে। দেহের ছায়া এখন হ্রস্ব হয়ে আসছে। আবার বেলা পড়লে, ছায়া দীর্ঘতর হবে। চারপাশে সবুজের বন। বর্ষার জল পেয়ে গাছ-গাছালি অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে উঠেছে। এপাশে-ওপাশে কাল-কাসুন্দে, আরো কত আগাছার জঙ্গল।

জিপে উঠে রাজীব বলল,—'একটা কথা মনে রেখ সুব্রত। যিনি খুন হয়েছেন, তিনি শুধু রূপসী নন। অভিনয়পটিয়সীও। টাউন.ক্লাবের নাটকের ফেমাস হিরোইন। এই পলাশপুর শহরেই তাঁর একাধিক প্রেমিক এবং স্তাবক আছে। সুতরাং আমাদের আরো অনেক গভীরে যেতে হবে। একটু হেসে সে মন্তব্য করল,—'রহস্যের অতল তলে।'

রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা। লম্বাও অনেকখানি। পরনে পাতলুন। গায়ে একটা ঢিলে-ঢালা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। লোকটার ডান হাতখানা ভেঙেছে মনে হয়। কাঁধের সঙ্গে একটা কাপড় বেঁধে হাতখানা তাই ঝুলিয়ে রেখেছে।

এক খাদ গলা নামিয়ে সুব্রত বলল,—'একে চেনেন রাজীবদা?'

বিদ্যুৎগতিতে রাজীবের দৃষ্টি গিয়ে লোকটার উপর পড়ল। বলল,—'চিনতে তো পারছি না সুব্রত। ও কে?'

—'কলেজের প্রফেসর। এর কাছেই মিসেস রায় টুইশানি পড়তেন।'

—'হুম্।' রাজীব ভ্রূ কুঁচকে বলল,—'এর নামই অনিমেষ দত্ত। কিন্তু ওর হাত ভাঙল কখন?'

চৌদ্দো

গালে হাত রেখে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন নরেশবাবু। চাঁদবদনকেও কলকাতা যাবার জন্য খুবই ব্যস্ত মনে হল। সুটকেসের ডালাটা খুলে সে টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখছিল। জামাকাপড়গুলি আগেই কখন পাট করেছে। এখন শুধু ভরতে বাকি।

দরজার সামনে রাজীবকে দেখেই নরেশবাবু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। সুব্রত পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে পুলিশের সাজপোশাক। ধরাচুড়া বা থানার ও-সি'র ইউনিফর্ম।

ওদের দেখতে পেয়ে চাঁদবদন সাদর অভ্যর্থনা করল। 'আইয়ে ইন্সপেকটর সাব, আইয়ে হুজুর। হামি তো হোটেলে ফিরেই নরেশবাবুকে সব কুছ বাতালাম, তব ভি উনকা ঠিক বিশোয়াস হয না।' কথা শেষ করে সে একটু বিপন্ন ভঙ্গিতে তাকাল।

ঘরের এদিকে ওদিকে দুখানা চেয়ার ছড়ানো। সুটকেশ ফেলে রেখে চাঁদবদন চেয়ার দুটো তুলে আনল। বলল,—'কুরসি পর বসুন হুজুর।'

রাজীব চেয়ারে বসে বলল,—'চাঁদবদনবাবু, আপনি একটু বাইরে থেকে আসুন। নরেশবাবুর সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলব।'

সম্ভবত চাঁদবদনও তা আন্দাজ করেছিল। তার মত নবেশবাবুকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এবং তখন ঘরের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি কেউই চাইবে না।

চাঁদবদন তাই বলল,—'হামি এখনই যাচ্ছি হুজুর। কথা শেষ কবে সে আর একটুও দেরি করল না। দ্রুতহাতে সুটকেসেব ডালা বন্ধ করল। জুতোটা পাযে গলিয়ে চাঁদবদন বেরিয়ে গেল। যাবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেও ভুলল না।

সুব্রত নরেশবাবুকে দেখছিল। ভদ্রলোকের বযস পঞ্চাশেব কাছাকাছি হবে, কিংবা দু-পাঁচ বছর কমও হতে পাবে। স্বাস্থ্য ভালো নয়। মাথার চুল কম। গায়ের রঙ পরিষ্কার। ভাইঝির সঙ্গে মুখের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

রাজীব বলল,—'সব কথা নিশ্চয় শুনেছেন?'

নরেশবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। এতক্ষণ শূন্যদৃষ্টি মেলে জানালার বাইরে তাকিয়েছিলেন। এবার মুখ নামিয়ে ঘরের মেঝের দিকে চাইলেন। কেউ দেখলে ভাববে নরেশবাবুর মনে এখন চিন্তার ধোঁয়াটে আকাশ। পোষা জন্তু-জানোয়ারকে আদর করার মত ভঙ্গিতে সেই ভাবনাটিকে তিনি সযত্নে নাড়াচাড়া করছেন।

মিনিটখানেক পরে তিনি বললেন,—'ইন্সপেকটরবাবু, চাঁদবদন যা বলল, তা সত্যি? নীপা আত্মহত্যা করেনি?' একটা কঠিন এবং দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে জেনেও মানুষ যেমন দুর্বল অসহায় মুখে চিকিৎসককে প্রশ্ন করে, নরেশবাবুর কথাগুলিও তেমনি শোনাল।

রাজীব ঈষৎ হাসল। বলল,—'সত্যি বৈকি। দিবালোকের মত সত্যি।' একটু হেসে সে ফের বলল,—'আপনার ভাইঝি আত্মহত্যা করেনি। পরশুদিন রাত্রে তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে হেভি ডোজে মরফিন ইনজেকশন পুশ্ করা হয়েছিল। এবং তার ফলেই মিসেস রায়ের মৃত্যু ঘটে।'

কথাটা শোনার পরই নরেশবাবুর মুখখানা শক্ত হয়ে এল। একটা কটু ভাষা জিভের ডগায় আসার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মুখটা যেমন কঠিন হয়ে আসে, নরেশবাবুকে তেমনি দেখাল।

ঘৃণায় মুখ কুঁচকে তিনি বললেন,—'জামাইটা এমন শয়তান। মন কষাকষি হয়েছিল জানি। দুজনের বিচ্ছেদও হত। কিন্তু তাই বলে মেয়েটাকে ছুঁচ ফুটিয়ে মারল!'

রাজীব একটু এগিয়ে বসল। 'আপনার তাহলে ডাক্তার রায়কেই খুনি বলে সন্দেহ হয়?'

—'অবাক করলেন মশায়।' নরেশবাবু বাঁকা হেসে বললেন,—'এমন কেসে আবার সন্দেহ কীসের? এই খুন আর কার পক্ষে করা সম্ভব বলুন? জোর করে মেয়েটাকে ইনজেকশন দিয়ে মেরেছে। হয়তো শরীর-টরীর ভালো ছিল না। সেই কথা জামাইকে কখন বলে থাকবে। রাত্তিরে নিশ্চয় ও একবার এসেছিল। তারপর স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে শয়তানই ওকে ইনজেকশন দিতে চাইল। ডাক্তার স্বামী,—ইনজেকশন দেবো বললে অসুস্থ স্ত্রীর পক্ষে আপত্তি করা অসম্ভব।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নরেশবাবু ফের বললেন,—'মেয়েটা বেচারি। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে এই ইনজেকশন নেওয়াই ওর কাল হবে।'

রাজীব খুশি হয়ে বলল,—'আপনি যা ভাবছেন রহস্যের কিনারা সম্ভবত ওই পথেই হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে নরেশবাবু। স্ত্রীকে হেভি ডোজে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে উনি মেরে ফেলতে চাইলেন কেন? ফর হোয়াট? তাহলে ধরে নিতে হয় যে মিসেস রায় বেঁচে থেকে ওর পথের কাঁটা হয়েছিলেন।'

—'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি।' নরেশবাবু মাথার চুলে একবার দ্রুত হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন। 'আপনি মোটিভের প্রশ্ন তুলেছেন। অম্বর কেন ওকে খুন করল? নিজের বউকে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করবার ওর কি প্রয়োজন হয়েছিল? কিন্তু এর উত্তর তো এক কথায় হয় না ইন্সপেক্টরবাবু।'

—'আমি জানি।' রাজীব হেসে বলল। এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব হয় না। আর সেজন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলাম। সবচেয়ে বেশি কথা তো এখানেই শুনতে পাবো আশা করছি।'

—'তার মানে? সবচেয়ে বেশি কথা আমার কাছে কেন?'

রাজীব আগের মতই হাসল। বলল,—'আমাদের পুঁথিপত্রে কী লিখেছে জানেন? যে খুন হল, হত্যার রহস্য তার জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মেয়ে-পুরুষ আলাদা বাছবিচার করার প্রয়োজন নেই। সর্বপ্রথমে মৃতের জীবনটা ভালো করে জানবার চেষ্টা করতে হবে। যত বিস্তৃতভাবে জানা যায়, তদন্তের পক্ষে ততই ভালো। আসলে কি জানেন? ঠাণ্ডা মাথায় খুন মানেই হল একটি আদ্যোপান্ত পরিকল্পনা। প্রথমে বীজের সৃষ্টি...তারপর বীজ থেকে চারাগাছ এবং সবশেষে পূর্ণ বিষবৃক্ষ। আর তখনই ক্লাইম্যাক্স। অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড ঘটে। যে খুন হল, আপনি তার কাকা। ছোটবেলা থেকে ওকে দেখছেন। ভাইঝির জীবনের কথা আপনার চেয়ে কে বেশি বলবে?'

নরেশবাবু একটু চিন্তা করে প্রসন্ন হলেন। 'তা অবশ্য ঠিক। আপনি যা জানতে চান, আমি যতদূর পারি বলব। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হল নীপার বিয়ে হয়েছে। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগও কম। কাজেই ওদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি আমি বলতে পারব না। অবশ্য—'

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'অবশ্য বলে থামলেন কেন? যা মনে এসেছে তা বলে ফেলাই ভালো। কথার মধ্যে অমন হোঁচট খেলে কিন্তু সবটুকু জানা হবে না।'

নরেশবাবু একবার রাজীবের মুখের দিকে তাকালেন। গলা নামিয়ে বললেন,—'একটা ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি ইন্সপেক্টরবাবু। নীপা আর অম্বরের দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। বেঁচে থাকলে গতকালই ভাইঝি আমার সঙ্গে কলকাতা যেত। খুব সম্ভব আর কোনোদিনই স্বামীর ঘরে ফিরত না।'

—'বলেন কি?' স্ত্রী-পুরুষের এই গোপন কাহিনি শুনে সে গ্রাম্যলোকের মতই কৌতূহল প্রকাশ করল। উৎসাহে রাজীব একটা সিগারেট ধরাল। নরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,—'আপনার চলবে নাকি?'

—'আমি বিড়ি-সিগারেট খাইনে।' নরেশবাবু আলগোছে কথাটা বললেন।

'সরি।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজীব ভক্তজনের মত নরেশবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

একটু হেসে বলল,—'তারপর কী যেন বলছিলেন আপনি?'

—'বলছি মশায়।' নরেশবাবু বার দুই কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শুরু করলেন,—'আমি আর চাঁদবদন কেন পলাশপুরে এসেছিলাম তা নিশ্চয় শুনেছেন?'

ঘাড় কাত করে রাজীব বলল,—'কিছু কিছু শুনেছি।'

—'আমার ভাইঝির বাড়িটা চাঁদবদন কিনতে রাজি। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দরদাম, কথাবার্তা বলার জন্য ওকে এখানে নিয়ে আসি। পরশুদিন বিকেলে আমি নীপার কাছে আর একবার যাই। কথা ছিল স্বামী-স্ত্রী মিলে মুক্তি করে সন্ধেবেলায় আমাদের জানাবে। পঞ্চাশ হাজার টাকায় ওরা চাঁদবদনকে বাড়ি বেচবে কি না, তাই বলবে।'

রাজীব বলল,—'আপনি যখন পৌঁছলেন, ওঁরা দুজনেই তখন বাড়িতে ছিলেন তো?'

—'হ্যাঁ, তা ছিল। দুজনকেই বাড়িতে পেলাম। কিন্তু আমি যাবার পরই অম্বর ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। আমাকে বলে গেল পরে সে দেখা করবে।'

—'যা জানতে গিয়েছিলেন, ভাইঝির সঙ্গে সে বিষয়ে কথা হল নিশ্চয়?'

—'হল বৈকি। নীপা আমাকে বলল, বাড়ি বিক্রি করতে তারা রাজি। দরদাম যা ঠিক হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট। কেবল একটি কথা। ওরা বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারবে না। সামনের সপ্তাহে দলিল রেজেস্ট্রি হলে সব থেকে ভালো হয়।'

—'শুনে আপনি নিশ্চয় খুশি হলেন?' রাজীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

নরেশবাবু হেসে বললেন,—'তা একটু খুশি হলাম। সাফল্যে কে না আনন্দ পায় বলুন? কিন্তু ব্যাপারটা আমার কেমন ঠেকল মশায়। ওদের এত তাড়াহুড়ো কীসের? জামাইয়ের হঠাৎ কি মোটা টাকার প্রয়োজন হল?'

মুখে আমি বললাম,—'দেরি করবার কোনো দরকার হবে না। চাঁদবদন টাকা নিয়ে তৈরি। তোরা যেদিন বলবি, সেইদিনই রেজেস্ট্রি হতে পারে।'

রাজীব কোনো মন্তব্য না করে কথা শুনছিল।

নরেশবাবু ফের বললেন,—'আমার কথা শেষ হতেই নীপা বলল, কালই সে কলকাতা যাবে। আট-দশ দিন সেখানেই থাকবে। কিংবা তার বেশিও হতে পারে। কলকাতায় তার কিছু কাজ আছে। আমি শুধোলাম, জামাইও সঙ্গে যাবে নাকি? ও হেসে বলল,—না, না। ডাক্তারের ছুটি কোথায়? এখন লোক নেই বলে নাইট-ডিউটি দিতে হচ্ছে। কলকাতা যাব বললে রুগিরা তেড়ে আসবে না? নীপার কথা শুনে আমার মনে একটা খটকা লাগল মশায়। জামাইকে একলা ফেলে আট-দশ দিনের জন্য মেয়ে কেন কলকাতা যাচ্ছে? আবার বলল, তার চেয়ে বেশিদিনও কলকাতায় থাকতে হতে পারে। যাই হোক, ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামালাম না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। ওরাই ভালো বুঝবে। কিন্তু তারপরই নীপা আমাকে একটা কথা বলল মশায়।'

—'কী কথা বলুন তো?' রাজীব উটের মত গলা বাড়িয়ে দিল।

—'নীপা বলল,—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে কাকা। সে সব কথা কলকাতায় গিয়ে হবে। শুনলে তুমি হয়তো রাগই করবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগে জানিয়ে রাখি। আমার আর ফেরার পথ নেই। আমি চমকে উঠে বললাম,—ব্যাপার কী বল দিকি তোর? নরেশবাবু একমুহূর্ত থামলেন। শুকনো ঠোঁটের উপর জিভটা একবার আলতোভাবে বুলিয়ে নিয়ে ফের শুরু করলেন,—ভাইঝি কিছু ভাঙল না মশায়। ওর মুখে আমি একটা বিষণ্ণ হাসি দেখলাম। কিন্তু সেও অল্পক্ষণের জন্য। হঠাৎ মেয়ের মুখখানা আবার উজ্জ্বল হল। আমাকে বলল,—কাকা, কলকাতায় গিয়ে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব দেখবে। খবরটা শুনে তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়বে। আমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নাম করে বলল,—ওদের, কিন্তু এখন কিছু

বোলো না। তাহলে আমাকে বিরক্ত করে মারবে। নীপার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। মেয়েদের সঙ্গে তাল রাখা দায়। ওদের কল্পনার আকাশটা খুব বড়—চিত্র-বিচিত্র। নানা রঙের খেলা। মেঘের প্রাসাদকে ওরা রাজপ্রাসাদ ভেবে আনন্দ পায় মশায়—'

রাজীব বলল,—'কিন্তু উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্কে একটা চরম বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছিল, এমন কথা কি করে ভাবলেন?'

বাধা দিয়ে নরেশবাবু বললেন,—'একটু ধৈর্য ধরুন ইন্সপেকট্‌রবাবু। এতক্ষণ তো ভাইঝির কথাই শোনালাম। এবার জামাইয়ের বক্তব্যটা আপনার সামনে রাখি। দুটো যোগ করে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শুধু চিড় খায়নি। একটা মস্ত ফাটল তৈরি হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, নীপা কলকাতা চলে যাবার পরই ওদের সম্পর্কের ইতি হত।'

রাজীব একটু অবাক হয়ে বলল,—'আপনার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের ফের দেখা হল কখন?'

নরেশবাবু বললেন,—'খানিক পরেই দেখা হল জামাইয়ের সঙ্গে। নীপার বাড়ি থেকে আর একটু আগে উঠতে পারলে ওকে হোটেলেই পেতাম। কিন্তু হঠাৎ বাড়ির উঠোনে একটা ঢিল এসে পড়ল। তাই নিয়ে হৈ-চৈ, চেঁচামেচি। আগেও নাকি দু-তিনবার ঢিল পড়েছে। এই নিয়ে দেরি হল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি হোটেলের দিকে রওনা হলাম। কাছাকাছি আসতেই দেখি বাবাজীবন অজন্তা হোটেলের দরজা থেকে বেরিয়ে পথে নামছেন। আমি খুব অবাক হলাম মশায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অম্বর হোটেলে এল কেন? ও কি আমাকেই খুঁজছিল? কিন্তু আমি তো ওর বাড়িতেই বসে। তাহলে? একটু এগিয়ে ওকে কথাটা শুধোলাম। শুনে অম্বর বলল, সে চাঁদবদনের কাছে এসেছিল। ওর সঙ্গেই তার প্রয়োজন ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম জামাইয়ের মুখখানা বেশ গম্ভীর। চোখ কুঁচকে ছোট। ভুরু দুটো অনেক কাছাকাছি। হঠাৎ কোনো ব্যাপারে ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সামনে দিয়ে একটা রিকশ যাচ্ছিল। অম্বর সেটাতে উঠে পড়ল। আমাকে বলল,—'আজ রাত্তিরে আপনি কি একবার আসতে পারবেন? আমি বললাম, কেন পারব না? কখন যাব বলো? ও একটু ভেবে নিয়ে বলল,—রাত আটটার পর। কিন্তু বাড়িতে নয়। হাসপাতালে যেন আমি তার সঙ্গে দেখা করি।'

সুব্রত তন্ময় হয়ে কথা শুনছিল। সে হঠাৎ বলল,—'তারপর?'

নরেশবাবু সুব্রতের দিকে এক পলক তাকালেন শুধু। বললেন—'হোটেলে ফিরে চাঁদবদনকে আমি চেপে ধরলাম। অম্বর কী দরকারে তার কাছে এসেছিল? বার দুই-তিন গুঁই-গাঁই করে চাঁদবদন আমার কাছে মুখ খুলল। শুনে আমি অবাক হলাম মশায়। লোকটা এত চাপা। সমস্ত দিন ধরে এই ব্যাপারটা পেটের মধ্যে হজম করে রেখেছে? আমার কাছে ভাঙেনি।'

রাজীব হেসে বলল,—'ও ব্যাপারটা আমরাও শুনেছি। চাঁদবদনবাবু অবশ্য বলতে চাননি। কিন্তু ভয়-টয় দেখিয়ে আমরা ওকে বলতে বাধ্য করি।'

নরেশবাবুকে হঠাৎ কেমন নিষ্প্রভ দেখাল। বিদ্যুৎ সরবরাহের গণ্ডগোলের ফলে মাঝে মধ্যে বাতিগুলো যেমন টিমটিমে অনুজ্জ্বল হয়, তেমনি। একটা শুকনো ঢোক গিলে তিনি বললেন, —'ও, কথাটা আপনারা শুনেছেন তাহলে?'

—'হ্যাঁ।' রাজীব একটু হাসল। 'কিন্তু আপনি হাসপাতালে গেলেন কখন?'

—'রাত আটটার সময়।' নরেশবাবু সহজভাবে বললেন,—'আমি যেতেই অম্বর একটা ঘরে নিয়ে গেল। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে আমাকে সে বসতে বলল। ওর হাবভাব, রকমসকম আমার ভালো লাগেনি মশায়। আমি কেবলি ভাবছি, ও কী বলতে চায়? এত গোপনীয়তা বা কেন? মিনিটখানেক পরে অম্বর বলল, নীপা আপনার সঙ্গে কলকাতা যেতে চায়। এ কথা শুনেছেন তো? আমি মাথা হেলিয়ে বললাম, সন্ধের সময় আমাকে বলছিল বটে। আট-দশ দিন গিয়ে

থাকবে। তার বেশিও হতে পারে। আমার উত্তর শুনে জামাই ব্যঙ্গ হয়ে হাসল। বলল,—আট-দশ দিন নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি। আট-দশ বছর বললেও কম করে বলা হবে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম—ব্যাপার কী অম্বর? এমন হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন? আমার কথা শুনে ও গম্ভীর হল। বলল,—হ্যাঁ। আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করে লাভ নেই। কথাটা আপনাকে স্পষ্টই জানাচ্ছি। আপনার ভাইঝির মিছিমিছি বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? তার মন ঘর-সংসারে নেই,—আছে সিনেমা-থিয়েটারে। এখানকার ক্লাবের নাটকের সে হিরোইন। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে মাখামাখি, দহরম-মহরম। এখন থিয়েটার ছেড়ে সিনেমার দিকে ঝুঁকেছে। রুপালি পর্দায় ঠাঁই পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা। সেই গরবে আপনার ভাইঝির আর মাটিতে পা পড়ছে না। আমি অবাক হয়ে বললাম,—তুমি কী বলছ অম্বর? নীপা বিপথে গেলে তুমিই তো তাকে পথ দেখাবে। স্ত্রীকে শুধরে নেওয়াই তো স্বামীর কাজ। তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো।'

রাজীব বলল,—'এইসব কথা আলোচনার সময় ডাক্তার রায়কে নিশ্চয় খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল?'

—'বিলক্ষণ। কথা বলবার সময় অম্বর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল। আমার বক্তব্য শুনে বড় বড় চোখ করে অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বলল,—ওসব কথা ছেড়ে দিন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্ষান্ত করার মত দিন-কাল আর নেই। এখন সবাই স্বাধীন,—যে যার পথে চলবে। একটু থেমে সে ফের বলল,—একটা কথা আপনাকে বলতে আমার সংকোচ হয়। নীপার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঘরের বউ হলে কী হবে? আপনার ভাইঝির পুরুষ-বন্ধু অনেক। দু-একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশ গভীর। লোকের চোখে দৃষ্টিকটু এবং আপত্তিকর। আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না মশায়। একটু আগেই চাঁদবদনের কাছে যা শুনেছি, জামাইয়ের মুখে তারই প্রতিধ্বনি। সুতরাং চুপ করে থাকাই শ্রেয় ভাবলাম।'

কখন সিগারেটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রাজীব খেয়াল করেনি। দগ্ধ অংশটুকু জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে সে বলল,—'বাকিটুকু শেষ করুন নরেশবাবু।'

—'আর বাকি কিছু নেই।' নরেশবাবু নড়েচড়ে বসলেন।—'আমি বুঝতে পারলাম ইন্সপেকটরবাবু, তলে তলে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। যে জমির উপর ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচেটা ফোঁপরা। সন্দেহের ইঁদুর মাটি কুরে কুরে মস্ত সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। আমি আর দেরি না করে উঠে পড়লাম। একবার ভাবলাম, নীপার কাছে যাই। ওকে বোঝালে যদি কোনো ফল হয়। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোবার মিনিট কয়েক পরই জোর বৃষ্টি নামল। বড় বড় ফোঁটা। একটা বাড়ির ঝুল-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে কোনোমতে রক্ষে। রাত দশটা নাগাদ জল একটু কমলে পর একটা রিকশ করে হোটেলে ফিরি।'

হাতের আঙুলগুলি জড়ো করে নিবিষ্ট মনে রাজীব কিছু চিন্তা করল। পরে চিরুনির দাঁড়া বুলোনর মত মাথার চুলে বাঁ হাতের আঙুলগুলি রাখল। মুখ তুলে রাজীব বলল,—'নরেশবাবু, আপনার কথা তো শেষ হল। এবার আমার কটা প্রশ্নের উত্তর দিন।'

—'বিলক্ষণ। বলুন কী প্রশ্ন আছে?'

হাতের আঙুলগুলি চুলের মধ্যে দিয়ে ঘাড়ের কাছে নেমে এল। রাজীব প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, আপনার ভাইঝির সিনেমা-থিয়েটারে বরাবরই খুব ঝোঁক ছিল তাই না? বিয়ের আগেও তো অভিনয়-টভিনয় করেছেন?'

নরেশবাবু একটু ভেবে বললেন,—'বিয়ের আগে ও কলকাতায় বছর দুই মোটে ছিল। আমার দাদা তখন বেঁচে। তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন। ছেলেমেয়েরা খুব ভয় করত বাপকে। সিনেমা-টিনেমা যাওয়ার রেওয়াজ কম ছিল। বাড়ি থেকে মেয়েদের হুট-হাট বেরোনো উনি পছন্দ

করতেন না। তবে কথাটা আমিও শুনেছি। কলকাতায় নীপা একটা অ্যামেচার নাট্যগোষ্ঠিতে যাতায়াত করত। কলেজে যাবার অছিলায় সেখানে গিয়ে জুটত। অবশ্য এত সব কথা কেউ জানত না। একদিন একটা উড়ো চিঠি এল বাড়িতে। তাতেই সব কথা লেখা ছিল। মেয়েকে না সামলে নিলে ওর বিপদ হতে পারে। আমার মনে আছে নীপাকে আমরা খুব ধমকে ছিলাম। চিঠির কথা দাদাকে আর কেউ ভয়ে জানায়নি।'

রাজীবকে কৌতূহলি মনে হল। সে বলল,—'নরেশবাবু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা, কলকাতায় থাকতে আপনার ভাইঝির কোনো লভ-অ্যাফেয়ার হয়েছিল বলে জানেন?'

—'লভ-অ্যাফেয়ার মানে প্রেম-ট্রেম তো?' নরেশবাবু ভ্রূ কুঁচকে রইলেন। 'বলতে পারব না মশায়। যদি হয়েও থাকে, তা আমাদের কারো জানা নেই। কলকাতার সঙ্গে মফস্বলের তো ঐ তফাত। দরজার বাইরে পা দিলেই তুমি অচেনা মানুষ। কোথায় কি করে বেড়াচ্ছ, কে জানছে? তবে একটা ব্যাপার জানি। আপনাকে বলতে পারি।' সুব্রতের দিকে তাকিয়ে নরেশবাবু হঠাৎ চিন্তিত হলেন।

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল,—'থামলেন কেন? ওর সামনে আপনি সব কথা বলতে পারেন।'

সুব্রতের মুখের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে নরেশবাবু বললেন,—'ব্যাপারটা কিন্তু আমরা এতদিন চেপে রেখেছিলাম। কাউকে জানাইনি,—বলিনি। এমন কি অম্বরকেও না।' গলার স্বর একটু নামিয়ে তিনি ফের বললেন,—'দাদা তখন কলকাতায় ছিলেন না। নর্থ বেঙ্গলে গোকুলনগর বলে একটা জায়গায় বদলি হয়েছিলেন। নীপার বয়স তখন পনেরো-ষোলোর বেশি নয়। কিন্তু ছোট থেকেই ওর বাড়ন্ত গড়ন। এখনকার চেয়ে তখন ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখাত। কিন্তু বলব কি মশায়, হঠাৎ দুম করে মেয়ে একদিন বাড়ি থেকে নিখোঁজ হল। গোকুলনগর ছোট জায়গা। খবরটা ঠিক ঢেঁড়রা পেটানোর মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শহরে আর কারো জানতে বাকি রইল না যে সারডেপুটিবাবুর মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। পুরো তিন দিন মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে নীপা মাইল ছয়-সাত দূরের একটা রেল-স্টেশনে ধরা পড়ল। তিন দিন দাদা ঘর থেকে বেরোননি। ওকে যেদিন পাওয়া গেল, সেদিনই রাত্রে দাদা গোকুলনগর ছেড়ে চলে এলেন। আর কোনোদিন যাননি।'

রাজীব শুধোল,—'কিন্তু আপনার ভাইঝি বাড়ি থেকে পালাল কেন?'

—'কেন আবার? লভ অ্যাফেয়ার মশায়,—লভ।'

নরেশবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন,—'তলে তলে ভাইঝি যে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেই ছোকরার সঙ্গে ঘর বাঁধবে বলেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।'

রাজীব হেসে বলল,—'তাই বলুন। কিন্তু ছেলেটাকে আপনি চিনতেন? ওর নাম জানেন?'

—'ওকে চিনতাম বৈকি।' নরেশবাবু অনায়াসে বললেন। 'ছোকরা কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। দাদার বাড়িতে মাঝে মাঝে এসেছে। ওর নাম বীরেন। জাতে ময়রা। গোকুলনগরে ওর বাপ পীতাম্বর মোদকের একটা মিষ্টির দোকান ছিল।' একটু থেমে নরেশবাবু ফের বললেন,—'কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার মশায়। মাস চারেক আগে ওর সঙ্গে আমার কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে দেখা হয়েছিল। বীরেন আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। কুশল জিজ্ঞাসা করল। দাদা মারা গেছেন শুনে খুব দুঃখ করল। এখন নীপা কোথায় আছে তাও জানতে চাইল।'

—'আপনি সব কথা নিশ্চয় বললেন?'

—'তা বলেছি।' নরেশবাবু একটু ইতস্তত করে জানালেন। 'তবে ছেলেটা এখন পালটে গেছে

মশায়। আগের সে চেহারা, বাবুগিরি কোনোটাই নেই। শুনলাম কলকাতায় হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে—'

—'বীরেন মোদক কোথায় থাকে জানেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলেছিল বটে। গোলদিঘির পিছনে নিত্যহরি কবিরাজ লেনের একটা মেসে থাকে। প্রবাসী মেস নাম।' নরেশবাবু একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে হাসলেন।

শ্রাবণের শ্রান্ত দুপুর। ক্লান্ত সুরে কোথায় ঘুঘুপাখি ডাকছে। চনমনে রোদ্দুর চারপাশে। সূর্য এখন মাথার উপরে। ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে।

জিপের শব্দ শুনেই অম্বর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। অনুমান করেই তার মনে চিন্তার মেঘ জমেছিল। এখন আরোহীদের দেখে মুখটা শুকনো, দৃষ্টি সংকুচিত হল।

রাজীব বলল,—'আপনাকে আবার একটু ডিসটার্ব করলাম ডাক্তার রায়। যদি অনুমতি দেন তো মিসেস রায়ের জিনিসপত্রগুলি আমরা একটু দেখতে পারি।'

—'জিনিসপত্র দেখবেন মানে, বাড়িটা সার্চ করবেন তো?'

—'ঠিক সার্চ নয়। এমনি একটু দেখবো আর কি।' রাজীব হেসে ব্যাপারটা সহজ করতে চাইল। 'কী খবর বলুন? এইমাত্র আপনার খুড়শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসছি। তিনি আবার জামাইকেই সন্দেহ করছেন।'

—'সন্দেহ করছেন আমাকে? কিন্তু কেন?'

—'কেন আবার? আপনি ডাক্তার—বেশি মরফিন দিলে ঘুম আর ভাঙে না একথা বোঝেন। ইনজেকশন দিতে পারেন।'

অম্বর ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। বলল,—'ইন্সপেকটরবাবু একটা কথা বলতে পারি?'

—'স্বচ্ছন্দে—'

—'সন্দেহ কিন্তু আমিও করতে জানি। ইনজেকশন দিতে আমার খুড়শ্বশুরও পারেন। পরশুদিন সকালেই উনি তা বলেছেন। চাঁদবদনবাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন। তাছাড়া,—' অম্বর এক সেকেন্ড থামল। পরে একটা কঠিন ধাঁধা বলার মত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল,—'নীপার অবর্তমানে কলকাতার বাড়িটা কে পাবে বলতে পারেন?'

—'কেন, আপনি?'

অম্বর মাথা নাড়ল। —'উহুঁ, হল না মিঃ সান্যাল। আমি যতদূর জানি ও সম্পত্তিটা এখন উনিই পাবেন। মারা যাবার আগে শ্বশুরমশায় একখানা উইল করে গিয়েছিলেন। সেখানা অ্যাটর্নির ঘরে আছে বলে শুনেছি।—'

পাঁচ মিনিটেই তল্লাসির কাজ শেষ। রাজীব যখন জিপে উঠল তখন তার হাতে একখানা ডায়েরি গোছের বই, একটা লেটার প্যাড। টুকিটাকি কয়েকটা কাগজ।

সুব্রত হেসে বলল,—'অত যত্ন করে ওগুলো কী নিয়ে চললেন রাজীবদা?'

ডায়েরি বইটা দেখিয়ে রাজীব বলল,— 'এতে কী আছে জানো সুব্রত?'

—'কী? গুপ্তধনের নকশা, না কোনো রহস্যলিপি?'

—'তার চেয়েও ইনটারেস্টিং।' চোখ মটকে রাজীব বলল। 'চিত্রতারকার গোপন কাহিনি।'

পনেরো

দরজা খুলে নীলাদ্রি অবাক হল।

অজানা, অচেনা কাউকে হঠাৎ দোরগোড়ায় দেখলে লোকে যেমন বিস্মিত হয়, চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়, নীলাদ্রিও ঠিক তাই করল। আগন্তুক সম্পূর্ণ অপরিচিত,—অজ্ঞাতকুলশীল। আগে কোনোদিন লোকটিকে দেখেছে বলে তার মনে হল না।

'—আপনি? কোথা থেকে আসছেন?' নীলাদ্রি সরাসরি প্রশ্ন করল।

আগন্তুক একটু হাসল। তার পরনে সাদা শার্ট, খাকি ফুলপ্যান্ট। পায়ে চকচকে শু-জুতো। চোখে সানগ্লাস। চশমার কাজের রঙ কচি কিশলয়ের মত সবুজ।

লোকটি স্পষ্ট বলল—'আমি থানা থেকে আসছি।' মুহূর্তে নীলাদ্রির চোখে বিস্ময় কেটে গিয়ে ভয় দেখা দিল। ঈষৎ কাঁপা কাঁপা গলায় সে শুধোল,—'থানা থেকে আসছেন?'

—'হ্যাঁ', চোখের উপর থেকে চশমাটা নামিয়ে আগন্তুক বলল, 'আমি সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর রাজীব সান্যাল। একটু ভিতরে গিয়ে বসতে পারি?'

—'ও, হ্যাঁ। আসুন, আসুন।' নীলাদ্রি এবার অভ্যর্থনা করল।

দরজা পেরিয়ে দু'পা এগোলেই বাঁদিকে একখানা ঘর। সম্ভবত এটাই নীলাদ্রির ড্রইং রুম। বাইরের লোকজন এলে এখানেই বসে-টসে। ঘরের মধ্যে খান দুই-তিন বেতের চেয়ার। একটা টেবিলও রয়েছে। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে মাঝারি সাইজের কাচের আলমারি। তার মাথার উপরে একটা টাইমপিস। আলমারির তিনটে তাক, দুটো তাকে আলতোভাবে সাজানো অনেক বই, উপরের তাকটায় বই নেই। দু-চারটে পুতুল। একটা ওষুধের শিশি, টুকিটাকি আরো কটা জিনিস রয়েছে।

নীলাদ্রি সেন ব্যাচেলর। ছোট একখানা বাসা ভাড়া করে থাকে। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কলকাতায় তার বাবার একটা ছোট গাড়ি আছে। নীলাদ্রির মা বেঁচে নেই। বছর পাঁচেক আগে তিনি মারা যান। তারা তিন ভাই। বড় হিমাদ্রি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল। সেখান থেকে কানাডায় চলে যায়। আজ দশ বারো বছর হল দেশছাড়া। আর কোনোদিন ঘরে ফিরে আসবে বলে কেউ মনে করে না। নীলাদ্রি মেজ, ছোট শেষাদ্রি এম-এ পড়ছে। সামনের বছর পরীক্ষা দেবে। আজ বছর চারেক হল নীলাদ্রি পলাশপুরে এসেছে। এর আগে অন্য একটা কলেজে ছিল। সেটা জেলাশহর নয়, মহকুমাও নয়। আরো মফঃস্বল। ট্রেন থেকে নেমে ফের বাসে যেতে হয়। প্রায় পঁচিশ মাইল রাস্তা। পলাশপুরে নীলাদ্রির ঘর-গেরস্থালি দেখাশোনা করার ভার একজন গৃহভৃত্যের উপর। লোকটা বুড়ো এবং সে এখানকার নয়, খাস কলকাতা থেকে আমদানী। নাটক-থিয়েটারে মত্ত ছেলের সেবা-পরিচর্যা করার জন্য বাপই সঙ্গে দিয়েছে।

প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে এর বেশি খবর সংগ্রহ করা যায়নি। তবু কলেজ থেকে বেরোবার সময় রাজীবের মনটা খুশি-খুশি ছিল। আপাতত এইটুকু যথেষ্ট। অধ্যক্ষ তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বাড়ির ঠিকানা বলেছেন। পথের নির্দেশ বাতলে দিয়েছেন। মায় নীলাদ্রির চেহারার একটা ছোট্ট বর্ণনা পর্যন্ত। দরজা খুলতেই ওকে চিনতে রাজীবের কষ্ট হয়নি।

চেয়ারে বসে রাজীব বলল,—'নীলাদ্রিবাবু একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছিলাম। জানলাম, কদিন হল আপনি কলেজে যাচ্ছেন না। মাঝে হঠাৎ কলকাতায় গিয়েছিলেন।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল,—'আপনাকে খুব চিন্তিত লাগছে নীলাদ্রিবাবু। এমন বিমর্ষ কেন?'

নীলাদ্রি মুখের ভোল বদলাবার দ্রুত চেষ্টা করে বলল,—'চিন্তিত হব কেন? ও কিছু নয়।'

ভদ্রতাসূচক সে একটু হাসল। --'বলুন, আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?'

রাজীব মনে মনে হাসল। লোকটা অভিনেতা, তাতে সন্দেহ নেই। এক মুহূর্তেই কেমন হাসিমুখ করে ফেলল। কে বলবে একটু আগেই মেঘে ঢাকা সূর্যের মত ওর মুখটা কালো হয়েছিল?

—'দেখুন নীলাদ্রিবাবু। শুরুতেই একটা কথা আপনাকে বলে নিই।' রাজীব ভনিতা করল। 'খুব জটিল একটা কেস আমার হাতে এসেছে। এবং সেই কেসে আপনিও জড়িত। পুলিশের কাছে কিছু তথ্যও আছে। তবে আপনাকে বিপদে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ঈষৎ হেসে রাজীব বলল,—'আপনার কাছ থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে চাই। আশা করি আপনি পরিষ্কার উত্তর দেবেন।'

লোকটার ভাষা কেমন চাঁচাছোলা। একটা জুজু দেখানোর হুমকি আছে। আহত অনুভব করলেও নীলাদ্রি তাই নিয়ে প্রতিবাদ জানাল না। 'কী বিষয়ে জানতে চান বলুন?' সে ঠাণ্ডা গলায় কথা কইল।

রাজীব বলল—'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম নীলাদ্রিবাবু। আসলে আমার প্রশ্নগুলো খুব ব্যক্তিগত। হয়ত আপনার কানে একটু মন্দই শোনাবে। কিন্তু এর উত্তর জানা পুলিশের খুব প্রয়োজন।' একটু থেমে সে যোগ করল,—'যদি এড়িয়ে যান, কিংবা উল্টো-পাল্টা উত্তর দেন, তাহলে কিন্তু আপনারই ক্ষতি হবে।'

সিগারেটের প্যাকেট বের করে রাজীব ধূমপান করতে উদ্যোগী হল। নীলাদ্রিকেও অফার করল। কিন্তু সে বলল,—'সরি, আমি খাই না।'

রাজীব একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফের চেয়ারে গা ঢেলে দিল বলল,—'নীলাদ্রিবাবু, আপনি নীপা রায়কে নিশ্চয় চিনতেন?'

প্রশ্নটি ছোট। কিন্তু গভীর অর্থবহ। বেশ তীক্ষ্ণ। নীলাদ্রি তা বুঝতে পারল। তবু অনাবশ্যক দ্রুততার সঙ্গে সে জবাব দিল,—'হ্যাঁ, নিশ্চয়। চিনতাম বৈকি।'

রাজীব হেসে বলল,—'শুধু চিনতেন?'

—'তার মানে?' নীলাদ্রি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, 'কী বলতে চান আপনি?'

—'নীলাদ্রিবাবু', রাজীব ফের হাসল। —'আমি যা বলতে চাই তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। মিসেস রায়ের সঙ্গে আপনার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। একথা আমরা জেনেছি।'

তবু নীলাদ্রি তেজ দেখাল। —'আলাপ-পরিচয় থাকা মানেই ঘনিষ্ঠতা নয়। মিসেস রায় আমাদের কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ভালো অভিনয় করতেন, টাউন ক্লাবের নাটকে তাই আমরা ওকে হিরোইনের রোলে নামতে অনুরোধ করি।'

রাজীব মুচকি হাসল।—'ব্যস! এই পর্যন্তই? আর কিছু বলবেন না?'

নীলাদ্রি বিরক্তমুখে তাকাল,—'আবার কী বলব? আর কী বলার আছে মশায়?'

—'আছে বৈকি।' রাজীব বাঁ-চোখটা ছোট করল। বলল,—'নীলাদ্রিবাবু, কোনো এক শনিবারের কথা বলব আপনাকে?'

—'শনিবারের কথা?'

—'হ্যাঁ, আপনি আর মিসেস রায় শিমুলপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠলেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী দুজনে। কামরায় একজন মাত্র লোক ছিল। চতুর্থ ব্যক্তি কেউ ছিল না। সেই লোকটির সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে ট্রেনের কামরায় আপনি একটি কাণ্ড করলেন। বিবাহিতা ভদ্রমহিলার শ্লীলতাহানির পক্ষে তা যথেষ্ট।' কথা শেষ করে রাজীব ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসল। পরে নীলাদ্রির মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলল,—'এর থেকেই বুঝতে পারবেন পুলিশ আপনার গতিবিধির উপর কতখানি নজর রেখেছে।'

নীলাদ্রির বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। গোপনীয় কোনো কাজে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে মুখের চেহারা যেমন শুকনো, কালিবর্ণ হয়ে ওঠে, নীলাদ্রিকে তেমনি দেখাল। আশ্চর্যের কথা। ট্রেনের কামরার ব্যাপারটা পুলিশ জানল কেমন করে?

অনেকক্ষণ পরে নীলাদ্রি বলল,—'তাহলে আর মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছেন কেন? পুলিশ তো সবই জানে দেখছি।'

রাজীবের মুখে বিজয়ীর গর্ব ফুটে উঠল। —'জানলেও পুলিশ সেটা মিলিয়ে দেখতে চায় নীলাদ্রিবাবু। আর সে জন্যই আপনাকে প্রশ্ন করা। অবশ্য আপনি যদি সহযোগিতা করেন, তাহলেই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।'

নীলাদ্রিকে অবসন্ন দেখাল। মনটা এখন আর লঘু নয়, আগের মত হাওয়ায় ভাসছে না। একটা চুপসানো, বায়ুশূন্য খেলনা—বেলুনের মত ভারী। ক্লান্তভঙ্গিতে সে বলল,—'আমি স্বীকার করছি মিঃ সান্যাল। নীপার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওর বিয়ের আগেই আমাদের প্রথম পরিচয়, এবং তখনই আমি ওকে ভালোবাসতাম। পলাশপুরে নীপাকে দেখে আমার ভালোবাসা পুরানো ব্যাধির মতই বেড়ে উঠল। আবার আমি গভীরভাবে ওর প্রেমে পড়লাম। কিন্তু ভালোবাসলেও নীপা শেষ পর্যন্ত আমার প্রেমের মর্যাদা রাখেনি।'

রাজীব একটু চিন্তা করে বলল,—'সোমবার দিন আপনি কলেজে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন। প্রথম ক্লাসটাও নেননি। এবং সেদিনই কলকাতা চলে যান। তেমন কোনো কারণ ঘটেছিল নিশ্চয়?'

—'আমি সব কথা আপনাকে বলব মিঃ সান্যাল, কিছুই গোপন করব না।' নীলাদ্রি তার গালে, গলায়, চোখের উপর বাঁ-হাতের করতল বুলিয়ে স্বচ্ছন্দ হতে চাইল।

বলল,—'সোমবার দিন কলেজে গিয়েই আমি একটা টেলিফোন পেলাম।'

—'টেলিফোন?'

—'হ্যাঁ।' নীলাদ্রি চিন্তিত মুখে তাকাল। 'টেলিফোন ধরেই আমি খুব অবাক হলাম। কারণ নারীকণ্ঠ। মেয়েটিকে আমি চিনি না, জানি না। সেও তার পরিচয় ভাঙল না। কিন্তু তার কথা শুনে মনে হল, আমাকে সে ভালো করে চেনে। এমন কি নীপার সঙ্গে আমার গোপন সম্পর্কের কথাও সে জানে।'

—'তারপর?' রাজীব সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল।

—'মেয়েটি বলল, নীপা আমাকে স্মরণ করেছে। এখনই, এই মুহূর্তে আমার যাওয়া দরকার। না গেলে নীপা চটবে। হয়ত মেয়েটিকেও ভুল বুঝবে। তবু আমার মনে খটকা লেগেছিল মিঃ সান্যাল। কিন্তু প্রেম একটা অদ্ভুত, বিচিত্র জিনিস জানবেন। অন্ধ মোহের কাছে যুক্তি-বিচার জড় পাথর হয়ে যায়। নীপার আহ্বান উপেক্ষা করার মত আমার শক্তি ছিল না। সেই মুহূর্তেই কলেজ থেকে আমি বেরিয়ে পড়লাম।'

কথা শেষ করে নীলাদ্রি চোখ বুজল। সম্ভবত সে পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করছিল। কয়েক সেকেন্ড পরেই সে ফের তাকাল। বলল,—'মিঃ সান্যাল, সেদিন দৌড়ে নীপার ওখানে না গেলেই বোধ হয় ভালো করতাম। গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তারপর আমার আর মাথার ঠিক রইল না।'

—'কী দেখলেন বলুন?' রাজীব সহাস্যে তাকাল।

—'আপনি দেবরাজ মিত্রকে চেনেন? টাউনক্লাবের নাটকের হিরো? সদর দরজা বন্ধ দেখে আমি রাস্তার ধারের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম মিঃ সান্যাল। দেখলাম নীপা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রয়েছে। আর দেবরাজ ওর খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। নীপার বাঁ হাতের আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে দেবরাজ ফিসফিস করে কথা বলছে।' নীলাদ্রি হঠাৎ নির্বাক হয়ে গেল। কয়েক

সেকেন্ড পরে সে আবার বলল,—'এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পর আমি আর এক সেকেন্ডও দাঁড়ালাম না। মাথাটা কেমন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছিল। একটা চলতি রিকশ পেয়ে উঠে বসলাম। বাড়িতে এসে ফোলিও ব্যাগে দু'একটা জিনিস ভরতে যা দেরি হল। যাবার সময় চাকরটাকে বললাম, —কলকাতা যাচ্ছি। ফিরতে দু'চার দিন দেরি হবে। কেউ এলে বলিস।'

এবার রাজীবকে চিন্তিত দেখাল। হাতের কাছে অ্যাশ-ট্রে নেই। আলগোছে সিগারেটের মুখের ছাইটুকু সে টেবিলের এককোণে ঝেড়ে রাখল। বলল,—'আচ্ছা, তারপর সেই মেয়েটি আপনার সঙ্গে ফের যোগাযোগ করেছিল নাকি? আর কোনো টেলিফোন পেয়েছিলেন?'

—'না, আর টেলিফোন পাইনি। একটা চিঠি পেয়েছিলাম।'

—'চিঠি?'

—'হ্যাঁ, বুধবার দিন বেলা তিনটে নাগাদ আমি একবার কলেজে যাই। তখন বেয়ারা আমাকে চিঠিটা দিল।'

—'চিঠিখানা আছে আপনার কাছে?'

—'হ্যাঁ।' নীলাদ্রি ঘাড় কাত করল। চট করে উঠে আলমারির মাথার উপর থেকে সে চিঠিখানা নিয়ে এল।

হাত বাড়িয়ে রাজীব সেটি নিল। খুব দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে পত্রখানি সে পকেটে ভরল। বলল,—'এখানা আমার কাছে থাক। কিন্তু আমি আর একখানা চিঠি খুঁজছি নীলাদ্রিবাবু। আপনি আর কোনো চিঠি পাননি?'

—'না তো।' নীলাদ্রি সরলভাবে বলল।

—ঠিক বলছেন তো?' রাজীব সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। পরক্ষণেই স্বগতোক্তির মত সে বলল, —'বাট হোয়্যার ইজ দ্যাট মিসিং লেটার?'

চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগে রাজীব বলল,—'নীলাদ্রিবাবু মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ। আচ্ছা বুধবার দিন সন্ধের পর আপনি কোথায় ছিলেন?'

—'কেন বলুন তো? বাড়িতেই ছিলাম। মন-মর্জি আর দেহ দুটোই অচল হয়ে পড়ল, তাই রিহার্সালে যেতেও ইচ্ছে হয়নি।'

—'হুম।' রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। একটু পরে সে বলল,—'আচ্ছা, আপনার বাবার নাম শ্রীঅমিয়মাধব সেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'তার পেশা ডাক্তারি। পশার ভালো। —আমহার্স্ট স্ট্রিটের উপর চেম্বার। নিজের গাড়ি আছে।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' নীলাদ্রি একটু ভয় পেয়ে বলল। 'কিন্তু আমি ভাবছি—'

রাজীব হেসে বলল,—'কী ভাবছেন নীলাদ্রিবাবু?'

নীলাদ্রি ঢোক গিলে বলল,—'ভাবছিলাম আপনি এতসব কথা জানলেন কেমন করে? আর আমাকেই বা এতক্ষণ ধরে নানা প্রশ্ন করছেন কেন?'

—'কেন প্রশ্ন করলাম আপনি আন্দাজ করুন না—'

নীলাদ্রি মুখ নীচু করে বলল,—'নীপা সুইসাইড করেছে বলেই কি এত কথার প্রয়োজন হল?'

—'ঠিক তা নয়।' রাজীব ফের সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। 'আচ্ছা মিসেস রায় কেন আত্মহত্যা করলেন বলতে পারেন? আপনার কি মনে হয়?'

—কি জানি? নীলাদ্রি হতাশভঙ্গি করল। 'নীপা ফিল্মস্টার হতে চেয়েছিল মিঃ সান্যাল। হঠাৎ আত্মহত্যা করল কেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

—'ভাবলেও এর উত্তর মিলবে না। কারণ নীপা দেবী আত্মহত্যা করেননি।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীলাদ্রির মুখের উপর চোখ রেখে রাজীব বলল,—'মিসেস রায় খুন হয়েছেন এবং সেই খুনিকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

সংবাদটা বজ্রপাতের মত নিদারুণ। হতবাক নীলাদ্রিকে ফের কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে রাজীব ঘর থেকে বেরোল।

খুনের সংবাদ শুনে অবিনাশ সমাদ্দার রীতিমত হইচই শুরু করল। রাজীব একা নয়, তার পিছনে সুব্রত দাঁড়িয়ে। ঘরে পুলিশ দেখেই অবিনাশের চক্ষু ছানাবড়া হবার জোগাড়। নীপা খুন হয়েছে শুনে সে কলরব শুরু করে দিল।

ধমক দিয়ে রাজীব বলল,—'ফালতু চেঁচামেচি করে একটা সিন ক্রিয়েট করবেন না। আমি যা জানতে চাই তার জবাব দিন।'

অবিনাশ কিন্তু থামল না। সে আগের মতই চেঁচিয়ে বলল,—'ওরে বাবা। কি সাংঘাতিক খবর। মিসেস রায় খুন হয়েছেন? শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ইন্সপেক্টরবাবু। এই সেদিনও যে আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললেন। কে এই সর্বনাশটি করল স্যর?'

রাজীব ফের ধমকাল। 'এত ছটফট করছেন কেন বলুন তো? চুপ করে বসুন না। সর্বনাশটি কে করল তাই তো আমি জানতে চাই।'

ধমকে এবার কাজ হল। অবিনাশ শান্ত হয়ে বসল। দেবরাজ একটু দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে রাজীব বলল,—'দুজনে মিলে মেয়েটার পিছনে এমন ছিনেজোঁকের মত লেগেছিলেন কেন? কী মতলব ছিল আপনাদের?'

অবিনাশ দাঁত বের করে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—'কী যে বলেন স্যর। আমরা কেন ওনার পেছনে লাগতে যাব?'

—'বাজে কথা রাখুন।' রাজীব গম্ভীর মুখে বলল। 'বুধবার রাত্তিরে নীপা রায়ের বাড়িতে কখন গিয়েছিলেন?'

অবিনাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'নীপাদেবীর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম? কেন স্যর?'

—'সেই কথাটাই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।' রাজীব মুখ বিকৃত করল। একটা চোখ ঈষৎ ছোট করে সে ফের বলল,—'বাড়ির চাকরটাকে যাত্রা শোনার লোভ দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দেবার অন্য কী মানে হয় বলুন?'

সুব্রত তাকিয়ে দেখল অবিনাশের চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ছে। বেশ বোঝা যায়, সে বেজায় নার্ভাস হয়েছে। নিজেকে আর চেপে রাখতে পারছে না।

টিপ্পনী কাটার মত সুব্রত বলল,—'এদের বরং থানায় নিয়ে চলুন রাজীবদা। তাহলেই সব কথা বের হবে।'

থানার নাম শুনেই অবিনাশ বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। বলল,—'বিশ্বাস করুন স্যর। আমার কোনো দোষ নেই। ওই দেবরাজই যত নষ্টের গোড়া। কাল সন্ধেবেলায় ও আমাকে একটা পত্র দেখাল।'

—'পত্র?' রাজীব ভ্রূ কোঁচকাল।

—'পত্র মানে ইয়ে তেমন কিছু নয়। স্রেফ একটা চিঠি। মিসেস রায় ওকে রাত নটার সময় যেতে লিখেছিলেন।' অবিনাশ ফিক করে একটু হাসল।

—'দেখি চিঠিখানা।' রাজীব প্রায় আদেশ করল।

দেবরাজ দেরি করল না। চিঠিটা তার জামার পকেটেই ছিল। হাত ঢুকিয়ে বের করতে সময়

লাগল না।

রাজীব এক রকম ছোঁ মেরেই সেটা ওর হাত থেকে তুলে নিল। প্রথমে সে খামটা দেখল। তারপর চিঠিখানা পড়ল। বিড়-বিড় করে নিজের মনে বলল,—'আই সি, দ্যাট মিসিং লেটার।'

চিঠিখানা বেমালুম পকেটস্থ করে সে দেবরাজের দিকে তাকাল। —'এটা নিশ্চয় কেউ আপনার হাতে দিয়ে যায়নি?'

—'আজ্ঞে না। নীচে ডাকবাক্সে চিঠিখানা পড়েছিল। নিশ্চয় পিওন ফেলে দিয়ে গেছে।'

—'উহু।' রাজীব একটু হাসল। —'ভালো করো লক্ষ্য করেননি। নইলে দেখতেন খামের উপর পোস্টঅফিসের শিলমোহর নেই। একটা পুরানো ডাকটিকিট কেবল সাঁটা রয়েছে।'

দেবরাজ ইতস্তত করে মুখ খুলল। —'একটা কথা বলব স্যর?'

—'নির্ভয়ে।' রাজীব অভয় দিল।

—'দোষ আমার মানছি। কিন্তু অবিনাশ আমাকে গাছের উপর তুলে দিয়ে এখন মই কেড়ে নিতে চাইছে।'

—'এর মানে?' রাজীব তার বিরাট হাঁ-মুখটা একবার খুলেই ফের বন্ধ করল।

দেবরাজ বলল,—'অবিনাশ আমাকে বরাবর বলেছে, নীপাদেবীকে একবার সিনেমা লাইনে নিয়ে ফেলতে পারলেই হল। ব্যস্ আর দেখতে হবে না। পুরানো দিন-টিনগুলো ফুসমন্তরে ভুলে যাবেন। স্বামী-সংসার সব পূর্বজন্মের কথা বলে মনে হবে। মিসেস রায়কে দিতে হবে বলে ও আমার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়েছে স্যর।'

'আড়াই হাজার টাকা?' রাজীব চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'এত টাকা নীপা দেবী আপনার কাছ থেকে চেয়েছিলেন নাকি?'

—'চেয়েছিলেন বৈকি। সত্যি বলছি স্যর,—ঈশ্বরের দিব্যি।' অবিনাশ মুখটা করুণ করল। —'তবে আড়াই হাজার নয়,—দু'হাজার টাকা। ওর নাকি বিশেষ দরকার ছিল। ফিল্মের নায়িকা হতে উনি রাজি ছিলেন স্যর। দু'হাজার টাকা আগাম দিতে বলেছিলেন।'

—'হুম।' রাজীবের মুখের উপর চিন্তার ছায়া ঘনাল। সে বলল,—'টাকাটা কি দিয়েছিলেন ওঁকে?'

অবিনাশ নিরুত্তর।

রাজীব হেসে বলল,—'থাক আর উত্তর চাইনে। টাকাটা দেননি শুনলে আপনার বন্ধু আবার ফেরত চেয়ে বসবে।'

অবিনাশ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,—'দেবরাজ এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। কিন্তু আপনি বলুন। আমি কি কোনো বাজে কথা বলেছি? স্টুডিওর ফ্লোরে এক-আধবার তো গিয়েছেন স্যর? ঐ আলোর ছটা চোখে লাগলে ঘর-গেরস্থালির টিমটিমে বিজলিবাতির কথা কোনো মেয়ের মনে থাকে?'

রাজীব কিন্তু হাসল না। বর্ষার মেঘ-থমকানো সন্ধ্যার মতই তার মুখটা গোমড়া হয়ে রইল। বিরক্ত মুখে সে বলল,—'বাজে কথা রাখুন। এখন আসল কথার জবাব দিন দিকি।' চোখ ঘুরিয়ে রাজীব বলল,—'বুধবার দিন ওখানে কখন গেলেন? কত রাত্তির?'

দেবরাজ আর অবিনাশ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—'কথা চেপে গেলেই বিপদ আছে অবিনাশবাবু।' রাজীব দুজনকেই সতর্ক করল।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি শুরু করে দিল। 'বলছি স্যর। নিশ্চয় সব কথা বলব। আপনার কাছে লুকোলে চলবে কেন? সাড়ে নটার আগেই আমরা দুজনে বেরোবার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। কিন্তু নটার পরই কি রকম বৃষ্টি নামল জানেন তো? রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা জল। মাঝে

মিনিট পাঁচেকের জন্য একটু কমেছিল। আমি বললাম,—দেবরাজ এত রাত্তিরে না যাওয়াই ভালো। বেকায়দায় পড়লে পাড়ার ছেলেদের হাতে ধোলাই খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু ও নাছোড়বান্দা, —রাতদুপুর হলেও যাবে।'

—'তারপর?'

অবিনাশ ঠিক নাটকের সংলাপ বলছিল। 'আমরা যখন বাড়ির কাছে এলাম, তখন রাত্তির প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। জল থামল বটে, কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে তেমনি মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। দু-চার পা এগোতেই রাস্তার উপর আমরা একটা সাদা মতন বস্তুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বিদ্যুতের আলো পড়তেই সেটা স্পষ্ট হল। একটা লোক স্যর। সেও জলে প্রায় আধভেজা। গায়ে-মুখে চাদর মুড়ি দিয়ে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যুতের আলোয় সে আমাদের দেখল। আর পরমুহূর্তেই একরকম দৌড়ে পালাল।' অবিনাশ বার দুই কেশে গলা পরিষ্কার করল। বলল,—'লোকটা ছুটে পালাতেই আমার কেমন ভয় করল স্যর। চারপাশে গা ছম-ছম করা ঘন অন্ধকার। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই মাত্তর যে একটু দৌড়ে অদৃশ্য হল, সে মানুষ তো? দেবরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, সেও ভয় পেয়েছে। আমরা আর এক মুহূর্তও দেরি করলাম না। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ফিরলাম।'

ঘটনাটা রাজীব ঠিক বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াল। যাবার আগে বলল,—'অবিনাশবাবু, আপনার কলকাতার ঠিকানাটা বলুন তো?'

—'কলকাতার ঠিকানা?' অবিনাশ আমতা আমতা করল। 'কেন স্যর? ওটা আবার কেন জানতে চাইছেন?' রাজীব ব্যঙ্গ করল, 'কেন মশায়? ঠিকানা দিতে অমন ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ঘরের মধ্যে বোমা-টোমা আছে নাকি?'

অবিনাশ বোকার মত হাসল। 'কী যে বলেন।' এবং তারপর সে সুড়সুড় করে তার ডেরার সন্ধান দিল।

থানায় ফিরে রাজীব দেখল, চৈতি চাকলাদার তার অপেক্ষায় বসে। সে একা আসেনি, সঙ্গে একজন যুবকও এসেছে।

সুব্রত ফিস-ফিস করে বলল,—'মেয়েটার সন্ধান কোথায় পেলেন রাজীবদা?'

'কোথায় আবার?' রাজীব একটু হেসে বলল, 'চিত্রতারকার গোপন কথায় ওর নাম খুঁজে পেয়েছি।'

নিরিবিলি একটা ঘরে বসে রাজীব চৈতিকে ডেকে পাঠাল। একটু পরেই চৈতি ঘরে এল। সে একাই,—তার সঙ্গীটি বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল।

একনজরে রাজীব ওকে দেখল। রঙ কালো, কিন্তু দেখতে শুনতে মন্দ নয়। চেহারায় একটা চটক আছে। বেশ স্মার্ট বলেই মনে হল।

রাজীব সোজাসুজি বলল,—'সোমবার দিন নীলাদ্রিবাবুকে কলেজে টেলিফোন করেছিলেন কেন?'

সে ভেবেছিল অভিযোগ শুনেই চৈতি চমকে উঠবে। কিন্তু মেয়েটি তাকে অবাক করল। একটু হেসে সে বলল,—'ওমা, আপনি জানলেন কেমন করে?'

—'পুলিশের লোক অনেক খবর জানে।'

চৈতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল,—'নীপাদি আত্মহত্যা করে সকলকে দুঃখ দিয়েছেন। আমাকেও। আজ আমার কোন রাগ-রোষই নেই। কিন্তু তখন আমি নীপাদির নামে রেগে টঙ্। যেমন করে হোক, ওকে জব্দ করতে চেয়েছি।'

রাজীব হেসে বলল,—'নীলাদ্রিবাবুকে লেখা চিঠিখানা তাহলে আপনিই হাতিয়েছিলেন? ফের সেটা বুধবার দিন বিকেলে দেবরাজের বাড়ির ডাকবাক্সে গলিয়ে দেন।'

চৈতি কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে হাসল।

রাজীব বলল,—'আপনার সঙ্গে কে এসেছে?'

—'হরিপ্রকাশ, —ও ডাক্তার,—এখানেই হাউস-সার্জন আছে।'

—'ডাক্তার?' রাজীবের মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে উঠল। মুখখানা একটু বাড়িয়ে সে বলল, —'ওর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?'

চৈতি লজ্জা পেল। সে মুখ নামিয়ে হাসল। বলল,—'ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে।'

—'বিয়ের ঠিক হয়েছে?' রাজীব এবার সোজা হয়ে বসল। 'কেন, দেবরাজ? তাকে নিয়েই তো নীপা দেবীর সঙ্গে আপনার খচাখচি হয়?'

চৈতি স্পষ্ট বলল,—'দেবরাজকে বিয়ে করা বোকামি। ও হল রাজপুত্তুর। আমার মত কালো মেয়েকে বিয়ে করলে ওর মন ভরবে কেন? সারা জীবন পস্তাবে।' ঠাট্টা করে সে ফের বলল, —'ওর জন্য রাজকন্যা আসবে। কুঁচবরণ রাজকন্যা।'

রাজীব কয়েক সেকেন্ড ভাবল। সে শুধোল, —'চৈতি দেবী, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব?'

চৈতি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

রাজীব হেসে প্রশ্ন করল,—'হরিপ্রকাশ আপনাকে খুব ভালোবাসে, তাই না?'

এমন কথার জবাব দিতে কোনো মেয়ে পারে না। বিশেষ করে একজন পুরুষমানুষের কাছে। চৈতি আরক্তমুখে বসে রইল।

রাজীব ফের বলল,—'আচ্ছা, আপনার জন্য ও সব কিছু করতে পারে? সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে, তাই না?'

এবার চৈতি মুখ তুলে তাকাল। 'তা পারে। কিন্তু ওর বিপদ হবে জানলে তেমন কাজে ওকে কখনও পাঠাতে পারি না। এমন কি আমার জন্যেও না,—তেমন মেয়েই নই আমি।'

ওর উত্তর শুনেই রাজীব খুশি। একটা দিক থেকে সে নিশ্চিন্ত এখন। সে দিকটা পরিষ্কার, আলোময়।

ষোলো

রাত আটটার সময় দরজার টোকা পড়ল।

প্রথমে খুব মৃদুভাবে, পরে সামান্য একটু জোরে। বেশ বোঝা গেল যে লোকটা দরজায় টোকা দিচ্ছে, সে অপরিচিত। এবং কপাটে জোরে ঘা দিতেও কুণ্ঠিত।

এদিকটা নির্জন। গাছপালা, ঝোপঝাপ বেশি, এবং সেই সঙ্গে অন্ধকারও। জানালার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রখচিত সীমাহীন আকাশটার একটি ছোট্ট অংশ চোখে পড়ে।

অনিমেষ দত্ত ভিতরের ঘরে ছিলেন। দরজায় টোকা পড়ার শব্দ প্রথমে তার কানে পৌঁছয়নি। তার কম্বাইন্ড হ্যান্ড লোকটি সন্ধের পরেই চলে যায়। ফের সকালে আসে। অনিমেষ দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে সন্দিগ্ধ, দৃষ্টিতে লোকটিকে দেখলেন। তার পরনে একটি ছিটের ফুলপ্যান্ট, গায়ে কমদামি শার্ট। পায়ে কাবুলি স্যান্ডেল। ব্যাকব্রাশ করা মাথার চুল। হাতে কোলাব্যাঙের পেটের

মত ফোলা একটা চামড়ার ব্যাগ। জিনিসপত্রে ঠাসা।

—'আপনি?' অনিমেষ লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন।

—'আমি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং কোম্পানির লোক স্যর। কিস্তিতে দামি বই কিনবার একটা স্কিম্ আমাদের কোম্পানি চালু করেছে। আপনি যদি কাইন্ডলি একটু দেখতেন।'

অনিমেষ বুঝতে পারলেন লোকটি ক্যানভাসার এবং ওকে এড়ানো কঠিন। বই কিনতে আগ্রহ নেই বললেও সে তাকে রেহাই দেবে না। অনিচ্ছুক লোককে বাকচাতুর্যে মুগ্ধ করে মাল গছানোই তো ক্যানভাসারের কৃতিত্ব। এবং এই লোকটিও নিশ্চয় ওর লাইনে গুণসম্পন্ন। একবার বই কিনবার ইচ্ছে নেই বললে লোকটি তার মন ফেরাতে এখনই লম্বা বক্তৃতা জুড়বে।

আর সত্যি সে তাই করল।

অনিমেষকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটি বলল,—'আমাদের স্টকে স্যর বড় বড় সব অথরের বই আছে। সমস্ত ফরেন পাবলিকেশন। ইতিহাসের বই তো আছেই, আরো নানা সাবজেক্ট। আপনার যেমন পছন্দ, যা রুচি হবে। আবার খরিদ্দারের সুবিধের জন্য কোম্পানি ইজি ইন্স্টল্মেন্টের ব্যবস্থা করছে। দুশো টাকার বই কিনলে একটা বুক কেস ফ্রি পাবেন। অথচ দশ-বিশ টাকার মত মাসে কিস্তি।'

তবু অনিমেষ বললেন,—'এত রাত্তিরে আপনি?'

—'রাত্তির একটু হয়ে গেল স্যর।' সে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। 'চান খাওয়া সেরে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরেছি। তা গাড়ি লেট্—শিমুলপুরে এল বেলা আড়াইটের সময়। কলেজে যখন পৌঁছালাম, তখন ঘড়িতে চারটে বাজে। ওখানে কাজ সেরে আরো দু-তিনজনের বাড়ি গেছি। সবশেষে আপনার দোরগোড়ায় হাজির হয়েছি।' কথা শেষ করে লোকটি সলজ্জভাবে হাসল।

সন্ধেবেলাটা একা ঘরে বসে অনিমেষের ভারী ঠেকছিল। লোকটি কলকাতা থেকে আসছে। এখানকার কেউ নয়। বইয়ের ক্যানভাসার। ওর সঙ্গে কিছুটা সময় গল্পগুজব করলে মনটা হাল্কা হয়। আপাতত ব্যাগের মধ্যে রাখা বই-টই কিংবা লিফলেট জাতীয় কিছু থাকলে তা নেড়ে-চেড়ে তিনি দেখতে পারেন। তারপর ওকে কলেজে দেখা করতে বললেই হবে। তখন নিজের জন্য না হোক, কলেজের জন্য কিছু বই তিনি অবশ্য কিনবেন।

অনিমেষ ওকে বাইরের ঘরে এসে বসালেন। ঢুকতেই ডান দিকে বেশ বড় সাইজের একটা টেবিল। তার উপর কিছু খাতাপত্র, লেখার প্যাড, বই-টই ছড়ানো। দুখানা ভালো চেয়ার টেবিলের দুই দিকে রয়েছে। এ ছাড়াও ঘরের মধ্যে আর একটি বসবার আসন আগন্তুকের চোখে পড়ল। সেটি ইজিচেয়ার,—ঘরের এক কোণে ঠাঁই পেয়েছে।

কাচের আলমারিতে রকমারি কেতাব। শুধু ইতিহাসের বই নয়, নাটক-নভেল থেকে শুরু করে সাধারণ জ্ঞানের বই পর্যন্ত রয়েছে। আগন্তুক ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আলমারির উপর চোখ বুলিয়ে নিল। পরে মৃদু হেসে বলল,—আপনার সংগ্রহ তো বেশ ভালোই। বই কিনবার ঝোঁক আছে দেখছি। তাহলে আপনার কাছ থেকে আমিও একটা মোটা অর্ডার পাবো স্যর।'

—'না মশায়, না।' অনিমেষ তাড়াতাড়ি বললেন। 'অত বই নিজের কেনা নয়। ওর বেশির ভাগই আমার এক বন্ধুর।'

—'আপনার বন্ধুর?'

অনিমেষ মুখভাব বদলাল। ফস করে কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। নইলে এ কথাটা ওকে না বললেই চলত। লোকটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—'হ্যাঁ, অবশ্য বন্ধুর হলেও বইগুলো সে আমাকেই দিয়ে গেছে। এখন ওগুলো আমারই সম্পত্তি।' প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে অনিমেষ

ফের বললেন, 'কই আপনার কাছে কি বই-টই আর কাগজপত্র আছে দেখি?'

লোকটা তার পেট-বোঝাই চামড়ার ব্যাগ থেকে খানতিন-চার বই আর কাগজপত্র বের করল। একখানা বই হাতে তুলে সে অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে ধরল। অনিমেষ গায়ে একটা সুতির চাদর ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন। বইটা নেবার জন্য বাঁ হাতটা বের করবার চেষ্টা করতেই, চাদরটা তার গা থেকে খসে পড়ল। লোকটা অনিমেষের দিকে একবার তাকিয়েই সবিস্ময়ে বলল,—'একি স্যর, আপনার হাত ভাঙল কেমন করে?'

—'আর বলেন কেন?' অনিমেষ একবার ভাঙা হাতের দিতে সস্নেহে তাকালেন। ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা। অবশ্য প্লাস্টার করতে হয়নি। কিন্তু শক্ত বোর্ড দিয়ে হাতটাকে বেশ কায়দা করে বাঁধা হয়েছে। গলায় এক টুকরো কাপড় বেঁধে ভাঙা হাতটা তারই উপর ভর করে আছে। বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো।

—'তেমন গণ্ডগোল তো কিছু হয়নি স্যর?' লোকটি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল। আবার বলল, —'এখন অল্পের উপর দিয়ে গেলেই রক্ষে।'

—'ঠিক অল্পের উপর দিয়ে নয়।' অনিমেষ আগন্তুকের মুখের দিকে তাকালেন। 'এটা কোলস্ ফ্র্যাকচার বলেই সন্দেহ হচ্ছে। এক্স-রে করতে হল, দেখা যাক আর কদিন ভোগায়।'

—'আহা।' লোকটা জিভের সাহায্যে একটা শব্দ করে সহানুভূতি প্রকাশ করল। ফের বলল, —'তাহলে তো আপনার খুবই অসুবিধে। লেখা-টেখার কাজও বন্ধ। হ্যাঁ, কি ফ্র্যাকচার বললেন যেন?' সে একটু লজ্জিতভাবে প্রশ্ন করল। কথাটা একবার শুনেও ধরতে পারেনি। সেই অক্ষমতার জন্যই তার লজ্জা।

—'কোলস্ ফ্র্যাকচার।' অনিমেষ স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন। হেসে বললেন,—'হাতের কব্জি ভেঙে গেলে তাই বলে।'

—'কি জানি স্যর। আমরা মুখ্যু মানুষ। অত ডাক্তার-বদ্যির ব্যাপার-স্যাপার বুঝিনে। শুধু এইটুকু বুঝি যে ডান হাত ভাঙলেই গরিবের কপাল ভাঙল। আসলে ডান হাতই তো আমাদের ভরসা। সেই তো অন্ন জোগাচ্ছে স্যর।' একটা ভালো কথা বলতে পেরে সে পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসল।

অনিমেষ বাঁ হাত বাড়িয়ে বইটা নিলেন। বইয়ের পাতায় চোখ দেবার আগে শুধু মন্তব্য করলেন, 'তা বটে।'

লোকটি আপনমনে কি চিন্তা করল। ফের অনিমেষের দিকে তাকাল।

—'এখানে আপনি কতদিন আছেন স্যর?' সে প্রশ্ন করল।

—'এখানে?' অনিমেষ বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই বললেন।

—'তা বছর আষ্টেক হবে।'

—'এর আগে কোথায় ছিলেন?'

বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে অনিমেষ তাকালেন। দৃষ্টি প্রসন্ন নয়, বিরক্ত ভঙ্গি। ভ্রূ কুঁচকে তিনি বললেন—'সে খোঁজে আপনার কী দরকার?'

মুহূর্তে লোকটা যেন মিইয়ে গেল। —'না, কোনো দরকার নেই। মানে এমনিই—'। এতক্ষণ সে বার বার ভাঙা হাতটার দিকে তাকাচ্ছিল। এবার ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

বইগুলি দেখা শেষ করে অনিমেষ বললেন,—'এ তো খুব সাধারণ বই। কলেজ লাইব্রেরিতে সবগুলোই পাওয়া যাবে। যাই হোক কোম্পানির ক্যাটালগ আর লিফলেটগুলো আপনি রেখে যান। বরং দিন দশেক পরে একদিন কলেজে আসুন। দেখি যদি কিছু বইয়ের অর্ডার তখন আপনাকে দিতে পারি।'

লোকটি তবু বলল,—'দেখবেন স্যর, আমি অনেক আশা নিয়ে যাচ্ছি। অর্ডারপত্র না জোগাড়

করতে পারলে আমার চাকরি থাকবে না। গরিব মানুষ,—চাকরি গেলে না খেয়ে মরব।'

অনিমেষ কোনো কথা বললেন না। শুধু একটু হাসলেন। লোকটি তার চামড়ার ব্যাগে বইগুলি ভরল। তারপর অনিমেষকে একটা নমস্কার ঠুকে ঘর থেকে বেরোল।

বাইরে ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার। শ্লেট রঙের আকাশের বুকে গ্রহ-তারার উজ্জ্বল আসর। দুধ সাদা বিস্তীর্ণ ছায়াপথ, প্রায় অন্তহীন। ...ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের চারপাশে জোনাকিদের মেলা।

অনিমেষ দত্তের ঘর থেকে বেরিয়ে লোকটি কিন্তু তার গন্তব্যস্থলে গেল না। নির্জীবের মত পা ফেলে সে অল্প একটু পথ হাঁটল। তবে সেটা নেহাৎই ভান। কারণ কিছুদূর এগিয়ে সে আবার পিছন ফিরল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফের অনিমেষের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল, লোকটি মাথা নিচু করে সেদিকে এগোল। আত্মগোপনের ভঙ্গিতে ঘরের জানালার ঠিক নীচে এসে বসল। মিনিট দুই তিন পরে লোকটি আবার মাথা তুলল। গৃহস্বামী এখন কী করছে, তাই দেখবার জন্য সে চোরের মত সতর্কভাবে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকাল। মিনিট পাঁচ-সাত একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে লোকটি নিজের মনে একটু হাসল। তারপর শত্রুসৈন্য যেমন করে বুকে হেঁটে এগোয়, অনেকটা তেমনি কৌশলে কিছুটা দূরে যাবার চেষ্টা করল। খানিকটা গিয়ে সে আবার মানুষের মত দুই পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লম্বা লম্বা পা ফেলে জমাট কালো অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হল।

পরদিন সকাল নটার সময় রাজীবকে শিমুলপুর স্টেশনে দেখা গেল। তার বেশবাস সাদাসিধে, সামান্যই। কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ একটু কৌশল আর কারিকুরি আছে। যারা রাজীবকে ভালো করে জানে, তাদের পক্ষেও ওকে একনজরে চেনা কঠিন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধের উপর চাদর। পায়ে চটিজুতো। রাজীব গোঁফ কামায়। কিন্তু তার নাসিকার ঠিক নীচে ঘনকৃষ্ণ গোঁফটি আজ বিচিত্র এবং রীতিমত দর্শনীয়। যে কেউ দেখলে ভাববে দীর্ঘদিনের পরিচর্যার পর লোকটি এমন সুদৃশ্য গোঁফের অধিকারী হতে পেরেছে।

রাজীবকে খুব চিন্তিত মনে হল। একটা বুক সমান উঁচু ট্রি-গার্ডের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে কাউকে লক্ষ্য করছিল। আসলে পলাশপুর থেকেই রাজীব লোকটার পিছু নিয়েছে। বাসে ও উঠল সামনের দরজা দিয়ে,—কাছাকাছি একটা সিটে বসল। আর রাজীব খানিকটা দূরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাসটা মেয়ে-পুরুষে সম্পূর্ণ বোঝাই হলে সে পিছনের দরজা দিয়ে উঠে এককোণে দাঁড়াল।

ট্রেন এসে ঢুকতেই লোকটি আর দেরি করল না। তার হাতে মাঝারি সাইজের একটা চামড়ার ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। সামনেই দ্বিতীয় শ্রেণির একটি কামরা দেখে সে উঠে পড়ল। ঠিক পাশেই আবার থার্ডক্লাস বগি। রাজীব প্রায় নিঃশব্দে সেই কামরাটিতে উঠল। দরজার ঠিক সামনেই একটা সিট ছিল। রাজীব সর্বাগ্রে খালি আসনটি দখল করে নিশ্চিন্তমনে সিগারেট ধরাল।

হাওড়া স্টেশনে নেমেই রাজীব প্রমাদ গুনল। প্ল্যাটফর্মে বেজায় ভিড়। এরপর লোকটিকে ফলো করা প্রায় অসম্ভব। স্টেশন থেকে বেরিয়েও যদি একটা ট্যাক্সি নেয়, তাহলেই এত পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে। রাজীব কখন ট্যাক্সি পাবে তার ঠিক কী? আর পেলেও কোথায় রাস্তার ক্রশিং-এ রাজীবের গাড়িটা হয়তো সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর সেই ফাঁকে ওর ট্যাক্সিটা ডাইনে-বাঁয়ে কোন পথে যে ঢুকে পড়বে, তার অন্ধিসন্ধি বের করা দুরূহ এবং অসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু রাজীবের কপাল ভালো। লোকটি ট্যাক্সি নিল না। বালীগঞ্জগামী একটা বাসে উঠল। রাজীবের সুবিধে হল। লোকটি একটু ভিতর দিকে যেতেই সেও বাসের হাতল ধরে পিছনের দরজার ফুটবোর্ডে পা দিল। এখানে দাঁড়িয়ে ওর গতিবিধির উপর নজর রাখা সহজ। নইলে

কখন এ বাস থেকে টুপ করে খসে পড়বে, রাজীব তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না।

শিয়ালদার মোড়ে এসে লোকটি বাস থেকে নামল। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার আগেই রাজীব ওর পিছু নিল। কিছুদূর গিয়ে লোকটি একবার পিছন ফিরে তাকাল। রাজীব সতর্কতার সঙ্গে একটি ফলের দোকানের উপর তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল। যাতে ওর মনে সন্দেহের ছায়াপাত না হয়। আড়চোখে লোকটির মুখের উপর চোখ বুলিয়ে সে আবার ফলের দাম শুরু করল। না, ওকে বেশ চিন্তিতই মনে হল। রাজীবের উপস্থিতি বোধ হয় টের পায়নি।

আরো কিছুদূর হেঁটে ডানদিকে ডাকঘর। লোকটা কোনো দিকে না তাকিয়ে পোস্টঅফিসের মধ্যে ঢুকল। বড় ডাকঘর। ভিতরে অনেক লোকজন। আসা যাওয়া লেগেই আছে। লোকটি মনিঅর্ডার কাউন্টার থেকে একটি ফর্ম নিয়ে একপাশে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে কলম বের করে, তাতে নাম-ঠিকানা এবং টাকার অঙ্ক লিখে ফেলল।

এই ফাঁকে রাজীব পিছন দিকের দরজা দিয়ে পোস্ট-অফিসের ভিতরে ঢুকল। একেবারে কোণের দিকে গাল-তোবড়ানো এক বুড়োর কাছে গিয়ে সে ফিস-ফিস করে কিছু বলল। লোকটি কাজ করছিল। রাজীবের কথা শুনে সে কলম ফেলে ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর চশমার ফাঁক দিয়ে চোর-দৃষ্টিতে মনিঅর্ডার কাউন্টারের দিকেও তাকাল। রাজীব এবং বুড়ো দুজনেই লক্ষ্য করল, আগন্তুক পকেট থেকে টাকা বের করে ডাকঘরের কেরানির হাতে দিচ্ছে। মনিঅর্ডার হলে পর লোকটি হাত বাড়িয়ে রসিদখানা নিল। চোখ বুলিয়ে একবার সেটি পরীক্ষা করল। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে ডাকঘর থেকে বেরোল।

রাজীব আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। গলা নামিয়ে বুড়ো লোকটির সঙ্গে দু-একটি কথা সেরেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। এখনই একে চোখের আড়াল হতে দিলে চলবে না। আরো কিছুক্ষণ লোকটিকে সে অনুসরণ করবে। ও কোথায় যায়, কি করে, সমস্ত কিছু তার বিশদভাবে জানা দরকার।

লোকটি কিন্তু বেশি দূর গেল না। পাশেই সরু একটা গলির ভিতর সে ঢুকল। তিন-চারটে নম্বরের পরেই একটা মান্ধাতার আমলের পুরানো বাড়ি। তিনতলা গৃহ। রঙ্চটা নোনা ধরা দেওয়াল। ঢুকবার মুখেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহার অন্ধকার। লোকটি কয়লা-খনির শ্রমিকের মত সহজ স্বচ্ছন্দ পায়ে সেই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল।

পিছু-পিছু রাজীবও বাড়ির মধ্যে ঢুকল। চেহারা দেখেই সে আন্দাজ করেছিল, এটা ভাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু বাইরেটা যতখানি হতাশাব্যঞ্জক, ভিতরটা ঠিক তা নয়। লোকজন আছে। সিঁড়ি বেয়ে মেয়েরা উপরে উঠছে। কেউ বা নামছে। ছোট ছেলেমেয়েরা একতলায় উঠোনে কলরব করে খেলা শুরু করেছে। একটা বাচ্চাছেলে পা পিছলে পড়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

লোকটি কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল। দোতলায় পাশাপাশি তিন-চারখানা ঘর। বাঁদিকের কোণের ঘরটার সে তালা খুলল। নীচে দাঁড়িয়ে রাজীব লক্ষ্য করল, লোকটি ঘরে ঢুকেই দরজাটা ফের বন্ধ করে দিল।

এখন ও দৃষ্টির আড়াল। অগত্যা রাজীব বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় নামল। উল্টোদিকে কয়েক পা গেলেই একটা সিগারেটের দোকান। সময় কাটাতে সে ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। সিগারেট কিনে দড়ির আগুনে রাজীব সেটি ধরাল। তারপর আয়েস করে বার দুই-তিন সিগারেটে টান দিয়ে ব্যাপারটা আগাগোড়া চিন্তা করবার চেষ্টা করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটি দরজার মুখের ঘুপচি অন্ধকার অতিক্রম করে আলোয় এসে দাঁড়াল। রাজীব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল ওর হাতে পুরানো চামড়ার ব্যাগটি আর নেই। নিশ্চয় দোতলার ঘরে ওটি রেখে এসেছে। সে খানিকটা এগিয়ে যেতেই রাজীব পুনরায় ওর পিছু নিল। চালচলন

দেখে মনে হল লোকটির এখন আর কাজের তাড়া নেই। সে বন-জঙ্গলের বৃহৎ প্রাণীর মত হেলতে-দুলতে ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে। সময়টা দুপুর। বারোটা কখন বেজেছে। সূর্য মাথার উপর ছিল। এবার হেলতে শুরু করেছে। গলিপথে লোকজন কম। সুতরাং রাজীব খানিকটা দূর থেকে ওকে অনুসরণ করে চলল। গলিটা বেশ বড়। একটা অতিকায় পাহাড়ি সাপের মত এঁকে-বেঁকে ছড়িয়ে আছে। মিনিট পাঁচেক পরে গলিটা বড় রাস্তায় এসে শেষ হল। লোকটি রাজপথে নেমে ডানদিক ধরে কিছুক্ষণ হাঁটল। ফের অন্য একটা গলির মধ্যে ঢুকল। রাজীব ঢিমেতালে হাঁটছিল বলে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল। এখন জোরে পা চালিয়ে ওর সঙ্গ ধরবার চেষ্টা করল। নইলে কখন কোন বাড়ির দরজায় ও পা বাড়িয়ে বসবে, রাজীব হাজার কৌশলেও তা বের করতে পারবে না।

গলিতে ঢুকেই রাজীব একটু থমকে দাঁড়াল। নিত্যহরি কবিরাজ লেন। চেনা গলি। নামটা কদিন আগেই সে শুনেছে। রাজীব ইচ্ছে করেই আবার একটু পিছিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। এবার তার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। লোকটি হঠাৎ যদি পিছন ফিরে তাকায়, তাহলে রাজীবকে দেখেই তার সন্দেহ হবে। সে বুঝতে পারবে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সুতরাং ব্যবধান একটু বেশি হওয়াই ভালো।

মিনিট দুই-তিন পরে লোকটি একটা পুরাতন দোতলাবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। রাজীব যা ভেবেছিল তাই। ওকে এখন বেশ সতর্ক বলেই মনে হচ্ছে। প্রথমে সে সামনের দিকটা ভালো করে দেখল। তারপর উল্টোদিকে মুখ করে একবার পিছন দিকেও তাকাল। হয়তো রাজীবকে সে দেখতে পেত। কিন্তু গোয়েন্দার কপাল ভালো। রাজীব অনেকখানি তফাতে হাঁটছিল। তার সামনেই একজন লম্বা মতন ভদ্রলোক গলিপথ ধরে যাচ্ছিলেন। নিজের মুখটি কৌশলে সে অগ্রবর্তী মানুষটির আড়ালে গোপন করল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই রাজীব বড় বড় পা ফেলে সেখানে এল। দরজা খোলাই ছিল। এবং সে হয়তো ভিতরে ঢুকত। কিন্তু হঠাৎ কি যেন লক্ষ্য করে রাজীব থমকে দাঁড়াল। দরজার মাথার উপরেই বাড়ির নম্বর সাঁটা—চৌদ্দো নম্বর। তার একটু নিচেই সবুজ রঙ দিয়ে লেখা—প্রবাসী মেস। নামটার দিকে নজর পড়তেই ওর মুখখানি আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাল।

রাজীব আর দেরি করল না। লোকটির গতিবিধি তার জানা হয়েছে। মাথা চুলকে সে একটু ভাবল। তারপর আগের মতই লম্বা পা ফেলে বড় রাস্তার দিকে এগোল।

পোস্টঅফিসের সেই বুড়ো রাজীবকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল,—'এই যে মশায়, আপনি এসে গেছেন। দেরি দেখে আমি সাত-পাঁচ ভাবছি। কোথায় আবার ফেঁসে গেলেন। আমাদের আবার সব প্যাক করে পাঠাবার আয়োজন করতে হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাজীব লজ্জিতভাবে হাসল। সত্যি তার দেরি হয়েছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই সে ফিরবে বলেছিল। কিন্তু এখন প্রায় এক ঘন্টা হতে চলল। আরো দেরি হলে পোস্টঅফিসের কাজকর্মের নিশ্চয় খুব অসুবিধে হত।

মনিঅর্ডার ফর্মটা হাতে নিয়ে রাজীব খুব অবাক হল। এর মধ্যেও একটা রহস্যের গন্ধ। মিনিট দুই-তিন চিন্তা করেও বিষয়টির কোনো কূল-কিনারা সে করতে পারল না। এটা কার লেখা? তবে কি পোস্টঅফিসের লোকেই কোনো ভুল করল? কিন্তু সেই সবুজ কালি। হস্তাক্ষরও তার চেনা। রাজীব পকেট থেকে ছোট ডায়েরি বইটা বের করে, দরকারি অংশগুলি নোট করল। লেখা হলে মনিঅর্ডার ফর্মখানা সে বুড়োর হাতে ফেরত দিল। রাজীব যখন পোস্টঅফিস থেকে ফের বেরোল তখন তার মুখখানা যৎপরোনাস্তি গম্ভীর, কপালে চিন্তার ছোট-বড় রেখা। তাকে দেখেই

মনে হবে, গভীরভাবে সে অন্য কিছু ভাবছে। অথচ চেষ্টা করেও জট ছাড়াতে পারছে না।

তিনতলা বাড়িটায় ঢুকবার সময় রাজীব কোনো দিকে তাকাল না। পায়রার খোপের মত প্রতি ঘরেই ভাড়াটের বাস। বড় বাড়ি। কত লোক থাকে তার ঠিক নেই। চেনা-অচেনা মানুষজনের আনাগোনা লেগেই আছে। আসা-যাওয়া নিয়ে কেউ অত মাথা ঘামায় না। আসলে কে কার খোঁজ রাখছে?

দোতলায় উঠেই রাজীব বাঁদিকের কোণের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। পকেটে হাত চালিয়ে ছোট-বড় দুটি চাবির মত বস্তু সে সযত্নে বের করল। সাধারণ টেপা-তালা। দরজা খুলতে রাজীবের মিনিটখানেকও সময় লাগল না। ছোট কাঠিটা দিয়ে ঠিক জায়গায় বার দুই চাপ দেবার চেষ্টা করতেই খুট করে তালা খুলল।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই রাজীব দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। ছোট ঘর,—বেশ স্বল্প আয়তন। মেঝের উপর একটা চৌকি পাতবার পর আর সামান্য জায়গাই পড়ে আছে। ঘুরতে ফিরতে গেলে গা ঠেকবে। ঘরের মধ্যে চেয়ার টেবিলের বালাই নেই। খাটের উপর খুব সাধারণ একটা বিছানা গোটানো রয়েছে। পাশেই তাকের উপর খান দুই-তিন বই। একটা গায়েমাখা সাবান, তেলের শিশি এবং টুকিটাকি আরো কটা জিনিস সে দেখতে পেল।

বিছানাটা একটু সরাতেই চামড়ার ব্যাগটার হদিশ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুলে পরীক্ষা করবার জন্য রাজীব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওর ব্যস্ততা দেখে মনে হয়, যেন ব্যাগের মধ্যে হিরে-জহরত লুকোনো আছে। এবং সত্যিই রাজীবের চোখ দুটো হঠাৎ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাল। মুখখানা চাপাহাসিতে ভরে উঠল। মনে হল সোনাদানা, কিম্বা হিরে-জহরত নয়, ব্যাগের মধ্যে তার চেয়েও দামি কোনো বস্তু সে আবিষ্কার করেছে।

অন্য কেউ হলে ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠত। উত্তেজনায় এবং আনন্দে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াত। কিন্তু রাজীব অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল। ব্যাগটি সযত্নে বন্ধ করে সে ওটাকে বগলদাবা করল। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দে পা ফেলে ঘর থেকে বেরোল। দরজায় তালা লাগিয়ে আগের মতই কোনো দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

রাজীব যখন অ্যাটর্নির অফিস থেকে ছাড়া পেল, তখন বেলা আর বাকি নেই। বাড়ির আনাচে-কানাচে, ইডেনের সবুজ মাঠে এবং পথের বুকে অপরাহ্ণের ঘন ছায়া। গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হাইকোর্টের বাড়ির চূড়োয় এখনও একফালি মরা রোদ্দুর। ...

সৌভাগ্য নিশ্চয়। রাস্তায় পা দিয়েই রাজীব একটা খালি ট্যাক্সি পেল। হাত দেখাতেই সেটা থামল। গাড়িতে উঠে রাজীব শুধু বলল,—'হাওড়া স্টেশন।' তারপর গদিতে হেলান দিয়ে সমস্ত বিষয়টি সে মনের মধ্যে ফের নাড়াচাড়া শুরু করল। ব্যাপারটা এত গোলমেলে এবং জটপাকানো যে ঘটনার কার্যকারণ করতে রাজীবও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। রহস্যের কায়া তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে এসে ফের পিছলে পালিয়ে যেতে চাইছে।

মুখ তুলে রাজীব তাকাল। স্টেশন আর দূরে নয়। আবছা অন্ধকারে হাওড়ার পুলটা ভ্রূকুটির মত বাঁকা বলে মনে হয়।

রাজীব যখন পলাশপুরে এল, তখন ঘড়িতে প্রায় দশটা। অত রাত্তিরে সুব্রত তার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজীবের সাজগোজ দেখে সে সহাস্যে বলল,—'কী ব্যাপার রাজীবদা? এমন নটবর বেশে কোথায় গিয়েছিলেন?'

নকল গোঁফটা আস্তে আস্তে টেনে তুলল রাজীব। বলল,—'গিয়েছিলাম অনেক দূর হে। সে কথা পরে বলব। কিন্তু তোমার খবর কী?'

—'ভালো খবর নয়। মিসেস রায় আত্মহত্যা করেননি, মরফিন ইনজেকশন দিয়ে তাকে কেউ খুন করেছে। এই সংবাদ এখন শহরে চাউর। সর্বত্রই আলোচনা হচ্ছে। লোকে নীপাদেবীর স্বামীকেই সন্দেহ করে। পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না, তাই জানতে চায়।'

—'হুম!' রাজীব মাথার চুলে হাত বুলোতে শুরু করল। বলল,—'শিগগিরই আমরা খুনিকে গ্রেপ্তার করব সুব্রত। ও নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না।'

সুব্রত উৎসাহে কিছুটা এগিয়ে বসল। মুখ উজ্জ্বল করে সে বলল,—'খুনি কে তা আপনি জানতে পেরেছেন রাজীবদা?'

—'শুধু নামটাই জানতে পেরেছি।' চিন্তিত মুখ করে রাজীব বলল। 'তবে এখনও অনেক কিছু জানবার বাকি।'

—'লোকটা কে রাজীবদা?' সুব্রত তাড়াতাড়ি বলল। 'নামটা আমাকে বলুন না।'

রাজীব ঈষৎ হাসল। নাম বললেও তুমি তাকে চিনতে পারবে না সুব্রত। কারণ সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও তার মুখে আলো পড়েনি।'

তবু সুব্রত অনুনয় করল,—'সে কে রাজীবদা? কী নাম, আমাকে বলবেন না?'

বাজীব রহস্য করে হাসল। 'তার নাম সুরেশ্বর,—সুরেশ্বর নন্দী।'

সতেরো

সুব্রত চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বলল,—'সুরেশ্বর নন্দী? সে আবার কে রাজীবদা? মালটিকে কোথায় পেলেন?'

রাজীব বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করল, 'কোথায় পাবো আবার? ওকে মালভূমিতে খুঁজে পেয়েছি সুব্রত। তবে মালই বটে। বর্ণচোরা আম, কিন্তু উঁহু'—ডানহাতের তর্জনি ঠোঁটের উপর ঠেকিয়ে রাজীব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। বলল,—'আর একটি কথাও না। তুমি শুধু নামটি জানতে চেয়েছিলে। তার বেশি নয়। সময় হলে বাকিটুকু তোমায় বলা হবে।'

সুব্রত একবার রাজীবের মুখের দিকে তাকাল। মানুষটা এখন মৌনীবাবা। ওর মনের কথাগুলি ল্যাপল্যান্ডের জমাট বরফ হয়ে গেছে। কৌতূহল প্রকাশ করলে ছাই হবে। শত অনুনয়-বিনয়েও ও মানুষ গলবে না। ওকে মুখ খোলানো অসম্ভব।

অগত্যা সুব্রত বলল,—'তাহলে এখন কী কর্তব্য বলুন?'

রাজীব এবার হেসে ফেলল। 'কিছু কর্তব্য আছে বৈকি। প্রথমত, সুরেশ্বর নন্দীর নামটা কারোর কাছে ফাঁস করবে না। এমন কী তোমার গৃহিণীর কাছেও নয়। দ্বিতীয়ত, পরশুদিন সন্ধেবেলায় তোমার বাড়িতে একটা চা-চক্রের আয়োজন করবে। এবং সেই আসরে সবাইকে নিমন্ত্রণ করো। বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে বলো তাঁরা যেন অবশ্য আসেন।'

—'হঠাৎ চায়ের আসর কেন রাজীবদা?'

—'প্রয়োজন আছে সুব্রত। ঐ চায়ের আসরেই আমি সুরেশ্বর নন্দীকে নিয়ে আসব। কিন্তু একথাও তুমি কাউকে বলবে না। যাঁদের ডাকছ, তাঁদের কারো কাছে কথাটা ভাঙবে না।'

সুব্রত পরিহাস করে বলল,—'এমন কি আমার স্ত্রীর কাছেও নয়, এই তো?'

—'ঠিক তাই। আভাসে ইঙ্গিতেও যদি কেউ জানতে পারে, তাহলে কিন্তু সমস্ত প্ল্যান কেঁচে যাবে। সুরেশ্বর নন্দীকে আমি আর চায়ের আসরে হাজির করতে পারব না।'

সুব্রত একটু চিন্তা করে বলল,—'কিন্তু চায়ের আসরে কাদের নেমন্তন্ন করব? আপনি একটা তালিকা করে দিন বরং।'

—'লিস্টি করার প্রয়োজন হবে না। মোটামুটি নামগুলো তোমাকে বলে দিচ্ছি।' রাজীব ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল। —'মিসেস রায়ের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁদের সকলকে বলতে হবে। নীপা দেবীর স্বামী ডাক্তার রায় হবেন প্রধান অতিথি, তারপর খুড়োমশায়কে নিশ্চয় ধরতে হবে। এরপর নাটকের ডিরেক্টর আর হিরো এঁদের দুজনকেই চাই। মাস্টারমশায় অনিমেষ দত্ত এবং ফিল্মি দুনিয়ার মস্তান অবিনাশ সমাদ্দারকেও না বললে চলে না। এ ছাড়া চৈতি দেবী ও তাঁর হবু বর হরিপ্রকাশকেও নেমন্তন্ন করবে। আর চাঁদবদনকেও বাদ দেওয়া যাবে না। এরপর তোমার ইচ্ছেমত ছুটকো-ছাটকা আরো কয়েকজনকে বলতে পারো। তবে এক ভদ্রলোককে আমার নাম করে বলে এসো। তিনি পলাশপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সুনির্মল মুখার্জি। উনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন।

সুব্রত মাথার চুলে হাত রেখে বলল,—'দাঁড়ান রাজীবদা। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার। আপনি তো এক কাঁড়ি লোকের নাম করে গেলেন। কিন্তু এঁদের অনেকেই যে এখন পলাশপুরে নেই।'

—'কে নেই আবার?' রাজীব হেসে প্রশ্ন করল।

—'নেই বৈকি, প্রথমে ধরুন চাঁদবদনজি। ভদ্রলোক গতকাল আপনার কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়েই দুপুরের ট্রেনে কেটে পড়েছেন! তারপর খুড়োমশায়। শুনলাম আজ তিনিও কলকাতা পাড়ি দিয়েছেন। নীলাদ্রিবাবু আর অবিনাশ সমাদ্দারেরও যাবার কথা ছিল। তাঁরা আছেন কিনা কে জানে। অবিনাশের কলকাতার ঠিকানাটাও আমি জানি না।'

—'সে আমি দেবো, তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে সুব্রত।' রাজীব অনুরোধ কিম্বা আদেশ করল ঠিক বোঝা গেল না। ফের বলল,—'যাঁরা কলকাতা চলে গেছেন, তাঁদের একবার ফিরিয়ে আনতে হবে। যেভাবে পারো, নইলে কিন্তু অসুবিধে আছে।'

সুব্রত মাথা চুলকে বলল,—'সে না হয় করা যাবে রাজীবদা, কিন্তু অনিমেষ দত্ত? শুনেছি নেমন্তন্ন করতে গেলে তেড়ে মারতে আসে। ভীষণ অসামাজিক আর ঘরকুনো। পলাশপুরে কারো সঙ্গে মেলামেশা পর্যন্ত করেন না। উনি কি আসবেন? আর এখন নেমন্তন্ন এড়াবার সুন্দর অজুহাত রয়েছে। গেলেই ভাঙাহাত দেখিয়ে দেবেন।'

রাজীব ভ্রূ কুঁচকে বলল,—'দ্যাখো না একবার ওঁর বাড়িতে গিয়ে। হয়তো আসতেও পারেন।' একটু ভেবে সে ফের বলল,—'প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আসবেন, এটা ওঁকে শুনিয়ে দাও। তাহলে নিশ্চয় নরম হবেন, এবং আসতে রাজি হতেও পারেন।'

—'কি জানি', সুব্রত হতাশ ভঙ্গি করল। বলল,—'একবার দেখি চেষ্টা করে। না আসতে চাইলে বরং একবার হাতজোড় করব। তার বেশি কিছু পারব না।'

বিরাট মুখব্যাদান করে রাজীব হাই তুলল। চোখ বন্ধ করে সে বলল,—'আজ খুব ঘুম পেয়েছে সুব্রত। যা বললাম, তাই করো। কাল তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। পরশুও সারাদিন আমাকে পাচ্ছো না। আমি একেবারে তোমার চায়ের আসরে হাজির হবো। ঠিক সাড়ে সাতটার সময়।'

—'আপনি নিশ্চয়ই একা আসছেন না? সুব্রতের চোখে রহস্য প্রকাশ পেল,—'সেই সুরেশ্বর নন্দীকেও চায়ের আসরে হাজির করবেন তো?'

—'অবশ্যই। সে কথা তোমাকে আর বলতে হবে না।'

কথা শেষ করে রাজীব চোখ দুটি ফের বন্ধ করল। কয়েক সেকেন্ড পরে তেমনি চোখ বুজেই সে বলল,—'আচ্ছা, গুডনাইট সুব্রত। শ্যাল মিট ইউ এগেন।'

পুলিশের নাম শুনেই বীরেন মোদক ভড়কে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,—'আসুন স্যর। ঘরের ভিতরে বসবেন চলুন। এতক্ষণ মিছিমিছি আমাকে ছলনা করলেন।'

রাজীব মুচকি হাসল, একটু আগেই লোকটার কি মেজাজ আর তেরিয়া ভঙ্গি। নিচের তলায় দাঁড়িয়ে রাজীব ওর নাম ধরে শুধু বার দুই-তিন ডেকেছিল। এবং পরে তাকে উপর থেকে নেমে আসতে বলল। আর তাই শুনেই বাবু রেগে টং। উপর থেকে ঠিক নেমে এল না। মারমুখি পল্টনের মত তড়বড় করে তেড়ে এল।

বেলা বারোটার মত। মেসবাড়িটা এখন ফাঁকা। যে যার রুজিরোজগারের ধান্দায় বেরিয়েছে। দোতলায় প্রায় কেউ নেই। নিচের তলায় চাকর-বাকরেরা কাজকর্ম সারছে। মাঝে মাঝে হাঁড়ি-কড়া নাড়ার শব্দ কানে এলেই তা বোঝা যায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজীব একটা চেয়ারে বসল। বলল,—'বীরেনবাবু আমার হাতে সময় বেশি নেই। আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করব শুধু। দয়া করে রেখে ঢেকে বলবেন না। ছলনা করলে কিন্তু ভুগতে হবে।'

বীরেন হাতজোড় করে তাড়াতাড়ি বলল,—'অমন করে ভয় দেখাবেন না স্যর। আমি কোনো কথা গোপন করব না। একটা প্রশ্ন করে দেখুন,—আমি কেমন বাপের সুপুত্তুরের মত জবাব দিই।'

গম্ভীর গলায় রাজীব শুধোল,—'পলাশপুরের সরকারি ডাক্তার অম্বর রায়ের স্ত্রী নীপা রায়কে চেনেন?'

বীরেনের মুখটা শুকনো দেখাল। আমতা আমতা করে সে বলল,—'ইয়ে চিনতাম বৈকি স্যর। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই। আমি শুনেছি নীপা আত্মহত্যা করেছে।'

—'ওর বিয়ের আগেই তো আপনাদের পরিচয় ছিল। এবং একবার উনি আপনার হাতছানিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন, তাই না?'

বীরেন সলজ্জভাবে বলল,—'আপনি দেখছি সবই জানেন স্যর। কথাটা সত্যি। গোকুলনগরে থাকতে আমাদের ভালোবাসা হয়। তখন দুজনেই ছেলেমানুষ। সংসারের তাপ-উত্তাপ টের পাইনি। ভাবতাম, সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি প্রেমের মত রঙিন,—শুধু ছন্দে-গন্ধে ভরা। হঠাৎ একদিন কি দুর্মতি হয়েছিল। আমি ওকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বললাম। আপনি ঠিকই বলেছেন স্যর। আমার হাতছানিতেই ও ঘর ছাড়ল। তিন-দিন, তিন-রাত্তির আমরা একসঙ্গে কাটালাম। আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই। এই তিনদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিলাম। কিন্তু একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা এক জিনিস আর চব্বিশ ঘণ্টা তাকে নিয়ে কাটানো এবং তার বোঝা বওয়া ভিন্ন ব্যাপার। মিথ্যে বলব না, তেরাত্তিরেই নীপা আমার কাছে একটা ভারী পাথর হয়ে উঠল। ওকে নিয়ে কি করি, কোথায় রাখি,—এই হল আমার দুশ্চিন্তা। শেষে ভাবলাম দুজনে কলকাতা চলে যাই। সেখানে মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই জুটবে। যা হোক কিছু ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ইস্টিশানের ওয়েটিং রুমে নীপা ধরা পড়ল। আমি তখন দোকানে খাবার কিনতে গিয়েছিলাম। দুর থেকে লক্ষ্য করলাম পুলিশ নীপাকে জেরা করছে। আমি এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইনি। তখনই ইস্টিশান থেকে কেটে পড়লাম। ওকে ফেলে পালিয়ে গেলাম। তিন মাস গোকুলনগর যাইনি।'

রাজীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ওকে দেখল। বলল,—'কালীনগরের ডাকবাংলোতে দুজনে যে ফটো তুলিয়েছিলেন, সেটা কোথায়?'

আশ্চর্য! বীরেন কিন্তু একটুও দমল না। প্রশ্ন শুনে সে বরং হি-হি করে হাসল। বলল, —'আমাদের নাড়ি-নক্ষত্র সব দেখছি আপনার জানা স্যর। কিন্তু সে ফটো এখন কোথায় পাবো?'

ম্লান হেসে বীরেন ফের কথা কইল। 'আসলে ফটোই ওঠেনি। ছবি তোলা হলে ফটোগ্রাফার বলেছিল দিন সাতেক পরে ওর দোকান থেকে ছবির ডেলিভারি নিতে হবে। তা সাত দিন পরে কেমন করে সেখানে যাবো? পুরো তিন মাস আমি গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। বেশ কিছুদিন পরে একবার গিয়েছিলাম কালীনগরে। ছবিটা নেবো মনে করে। কিন্তু ফটোগ্রাফার বলল, নেগেটিভ ভালো হয়নি বলে সে আর ওটা ডেভেলপ করেনি। আমাকে টাকা ফিরিয়ে দিল।'

—'তাহলে বীরেনবাবু, আপনি মিছিমিছি মেয়েটাকে এতদিন ভয় দেখিয়েছেন?'

—'ঠিক মিছিমিছি নয় স্যর।' বীরেন স্পষ্ট বলল। 'ওছাড়া আমার উপায় ছিল না। এদিকে দুর্দশা সচক্ষে দেখছেন তো? একজন পার্মানেন্ট বেকার বলতে পারেন। এখনও মেসের দেনা সব শোধ করতে পারিনি। দুবেলা আহারের সময় এরা সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বন্ধুদের কাছে কতবার হাত পেতে টাকা নিয়েছি। তাও দেওয়া হয়নি। তার জন্যও দিন-রাত্তিরে অনেক বক্রোক্তি হজম করি। অবশেষে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। নীপার কাছ থেকে মোটা কিছু হাতিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম।'

—'নীপা রায়ের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা আপনি পেয়েছিলেন?'

বীরেন মাথা নাড়ল। —'আজ্ঞে না স্যর। পাবো কেমন করে? বুধবার দিন রাত্তিরে অমন জল-বৃষ্টি। অনেক চেষ্টা করেছিলাম। এমন কি দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়েছি। কিন্তু কে সাড়া দেবে বলুন? তখন কি ছাই জানি ঘরের মধ্যে নীপা আত্মহত্যা করে মরে পড়ে আছে।' দুঃখ করে সে ফের বলল,—'বিশ্বাস করুন। ও আত্মহত্যা করবে, এ আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি ভয় দেখিয়েছিলাম বলেই কি লজ্জা ঢাকতে নীপা শেষে আত্মঘাতী হল?'

রাজীব শুধোল,—'কী ভয় দেখিয়েছিলেন? দু'হাজার টাকা না পেলে ওর স্বামীকে সব কথা জানিয়ে দেবেন, এই তো?'

বীরেন উত্তর দিল না। অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে বসে রইল।

অবস্থাটা রাজীব অনুমান করল। লোকটার অন্তরে এখন অনুশোচনার আগুন। যা করেছে তার জন্য অনুতপ্ত। এবং মনে মনে নিজেকেই দোষী ভেবে বসে আছে।

—'বীরেনবাবু, একটা কথা আপনাকে বলা দরকার।' রাজীব ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিসেস রায় কিন্তু আত্মহত্যা করেননি। বুধবার রাত্তিরে তিনি খুন হন। হেভি ডোজে মরফিন ইনজেকশন দিয়ে কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।'

খবরটা শুনে বীরেন কিন্তু উত্তেজিত হল না। বরং বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে সে বলল,—'নীপা আত্মহত্যা করেনি? সে খুন হয়েছে স্যর?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু তাই নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ নেই বীরেনবাবু। পুলিশের কর্তব্য দোষীর শাস্তি বিধান করা। খুনিকে শুধু খুঁজে পেলেই তো হবে না। সাক্ষ্যপ্রমাণ-সমেত তাকে ধরা চাই।'

বীরেন কোনো কথা বলল না। নিজের মনে সে কিছু ভাবতে শুরু করল।

রাজীব বলল—'আচ্ছা, মিসেস রায় যে পলাশপুরে আছেন এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?'

—'ওর কাকা নরেশবাবুর কাছ থেকে—'

—'কতদিন আগে?'

একটু চিন্তা করে বীরেন বলল,—'প্রায় মাস চারেক আগে।'

—'এর মধ্যে নীপা দেবীর সঙ্গে আপনার কবার দেখা হয়েছে?'

মনে মনে একটা আলগা হিসেব করে বীরেন বলল,—'তিন-চার বার হবে। তার বেশি নয়।'

—'নরেশবাবুর সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ উনি দু-তিনবার আমার মেসে এসেছেন।'

রাজীব খুব অবাক হয়ে বলল,—'মেসে এসেছেন? কেন? কোনো দরকার ছিল?'

বীরেন মাথা নাড়ল। 'দরকার কিছু ছিল না, উনি এমনি আসতেন। আমার খোঁজ-খবর নিতেন। বলতেন, নীপার স্বামী বেশ বড় চাকুরে। পলাশপুরে গিয়ে নীপাকে ধরলে আমার একটা হিল্লে হতে পারে।'

রাজীব কোনো মন্তব্য করল না। শুধু মুচকি হাসল। কিছুক্ষণ পরে সে শুধোল,—'মিসেস রায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়, একথা নরেশবাবু জানতেন?'

—'আজ্ঞে না, আমি কোনোদিন বলিনি।'

—'নীপা দেবীর সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছিল?'

বীরেন একটু ভেবে বলল,—'গত রবিবারে। সন্ধেবেলায় নদীর ধারে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

—'হুম', রাজীব গম্ভীর হল। বলল,—'দেখা হবার পর মিসেস রায়ের কাছে আপনি দু'হাজার টাকা দাবি করলেন, তাই না?'

বীরেন কোনো উত্তর দিল না। মাথা হেলিয়ে কথাটা সে স্বীকার করল।

—'তখন আর কোনো কথা হয়েছিল? মিসেস রায় কিছু জানতে চেয়েছিলেন?'

বীরেনকে এবার কেমন ভীতু-ভীতু মনে হল। শুকনো মুখে সে বলল,—'একটা কথা আপনাকে বলতে পারি স্যর। শুনলে আপনি কিন্তু চমকে যাবেন। তবে কথাটা গোপন রাখতে হবে।'

—'কী কথা?' রাজীব গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল। দু'পা এগিয়ে বীরেন ওর কাছে এসে দাঁড়াল। রাজীবের কানের কাছে মুখ নামিয়ে সে ফিস-ফিস করে অনেকক্ষণ কথা বলল।

সব শুনে রাজীব প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'অ্যাঁ, বলেন কি বীরেনবাবু? এও সত্যি? আপনি ঠিক জানেন?'

—'সত্যি বৈকি স্যর। দিন-রাত্রির মত সত্যি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন—এর একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।'

ভ্রূ কুঁচকে রাজীব কয়েক সেকেন্ড ভাবল।

বীরেন বলল,—'আরো কথা আছে স্যর।' তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে সে ফিসফিস করে আবার কী বলল।

কথা শোনার পরই রাজীবের মুখভাব বদলাল। এখন তাকে বেশ সজাগ, সতর্ক মনে হল।

—'কখন যেতে বলেছে আপনাকে?' রাজীব জানতে চাইল।

—'আগামীকাল। সন্ধের পর টাকাটা দেবে।'

রাজীব একটু হেসে বলল,—'ভাগ্যিস কথাটা বললেন। নইলে এই যাওয়াই আপনার শেষযাত্রা হত। আর টাকা নিয়ে ফিরতে হত না। বরং অন্য জগতে নীপা দেবীর সঙ্গে ফের মিলিত হতে পারতেন।'

—'কী বলছেন স্যর?' বীরেন ভয় পেয়ে বলল, 'তাহলে কি যেতে নিষেধ করছেন?'

—'না, নিষেধ করছি না।' রাজীব গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি ঠিক সময়েই যাবেন। যাওয়ার প্রয়োজন আছে।' একটু থেমে সে যোগ করল, 'ভয় নেই। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

*

পরদিন সন্ধের একটু আগেই রাজীব পলাশপুরে নামল। গতকাল দুপুরের মধ্যকলকাতায় সে চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে নীলাদ্রির বাবার চেম্বারে একবার যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে ইউনির্ভাসিটিতে। ফের ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ডাক্তারের কাছে এবং সবশেষে একজন

হ্যান্ড-রাইটিং এক্সপার্টের সঙ্গেও রাজীব দেখা করল। বিকেলের দিকে হাওড়া স্টেশনে এসে সে ট্রেনে চাপল। তবে পলাশপুর যাবার জন্য নয়। রাত আটটা নাগাদ প্রায় একশো মাইল দূরের একটা স্টেশনে এসে রাজীব নামল। মাথার উপর পেন্সিলের সিসের মত রঙের রহস্যময় আকাশ। একরাশ ফোটা ফুলের মত দেদীপ্যমান নক্ষত্ররাজি। ইস্টিশান থেকে মাইলখানেক হাঁটলেই একটা ছোট গ্রাম,—নাম বল্লভপুর। অপরিচিত রাজীবকে গ্রামে ঢুকতে দেখে তিন-চারটে কুকুর সমস্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

দূর থেকে রাজীবকে আসতে দেখেই সুব্রত চঞ্চল হল। রাজীব ঘরে ঢুকতেই সে তাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস করে বলল,—'কী ব্যাপার রাজীবদা? আপনি একা যে? সুরেশ্বর নন্দী কোথায়? তাকে অ্যারেস্ট করব বলে আমি যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।'

ঘরের মধ্যে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মুখের উপর রাজীব একবার দ্রুত চোখ বুলোল। সুব্রতের দিকে একটু হেলে সে গলা নামিয়ে বলল,—'আমিও তোমাকে সেই প্রশ্নটাই করব ভাবছিলাম। সুরেশ্বর নন্দী কোথায়? সে তো এখনও এসে পৌঁছয়নি।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল,—'তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, সুরেশ্বর এখানে আসবে। আসতে তাকে হবেই।'

আঠারো

হঠাৎ রাজীবের মনে হল, সে এসে পৌঁছবার পরই একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই দু-একজন মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছিল বটে। এখন অনেকেই তাকে আড়চোখে লক্ষ্য করছে। ফের মুখ নামিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বেশ বোঝা যায়, ওরা এমন একটা বিষয়ের আলোচনা করছে, যার সঙ্গে রাজীবও জড়িত। সকলেই বেশ চঞ্চল এবং কৌতূহলি। হঠাৎ পুলিশের বড় দারোগার বাড়িতে এই চায়ের আসরের হেতু কী? নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। আগন্তুকদের মুখে এই প্রশ্নই আঁকা। উত্তর জানবার জন্য সকলেই আগ্রহী।

ইতিমধ্যে অতিথি-অভ্যাগতদের কাছে চায়ের কাপ এসে হাজির। জল-খাবারের ছোট ডিস প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হল। অনেকেই চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। কেউ বা ডিস থেকে একটা শিঙাড়া তুলে নিয়ে তাতে ছোট্ট কামড় বসাল।

ঘরের দরজায় কার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। কেউ আসছে বুঝতে পেরেও রাজীব চায়ের কাপ থেকে মুখ সরাল না। লোকটি ঘরে পা দিতেই সুব্রত কনুয়ের কাছে একটা মৃদু চিমটি কেটে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। তবু রাজীব খুব চঞ্চল হল না। আগন্তুককে চোরাদৃষ্টিতে সে আগেই দেখেছিল। এখন মুখ তুলে চাইল। সহাস্যে বলল,—'আসুন নরেশবাবু। দেরি দেখে ভাবলাম আপনি বুঝি আর এলেনেই না।'

কিন্তু নরেশবাবু একা নন। তার সঙ্গে চাঁদবদনও হাজির। কিউয়ের পাশে ইউয়ের মত লোকটি নরেশবাবুর গায়ে প্রায় সেঁটে রয়েছে।

চাঁদবদনই কথা বলল,—'নরেশবাবু আসতে দিককত করছিল হুজুর। বলে কি, ভাতিজি মরে গেল, ফিন পলাশপুরে কার পাশে যাব? কি ফ্যয়দা হোবে? হামি বললম্ কি ইন্সপেক্টরবাবু যখন বলিয়েছেন উর একদফা চলুন। ব্যস এই শেষবার। জরুর কোই আচ্ছা খবর মিলবে। নেহি তো ফালতু ফালতু ইন্সপেক্টরবাবু কভি ডাকতেন না।'

রাজীব চায়ের কাপে আর একবার চুমুক দিয়ে বলল,—'চাঁদবদনজি ঠিকই ধরেছেন মিছিমিছি

আপনাদের হয়রানি করবার জন্য এতদূর টেনে আনিনি। আমার কাছে খবর আছে। খুব চাঞ্চল্যকর সংবাদ। এই খবর দেবো বলেই আপনাদের সকলকে এখানে সমবেত করেছি। চায়ের আসরের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই! এখানে যাঁরা উপস্থিত, তাঁরা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন। এবং সেজন্যই আজকের আসরে কেবল তাঁরাই নিমন্ত্রিত।'

ইতিমধ্যে সুব্রত সুইচ অফ করে একটা আলো নিভিয়ে দিয়েছে। এখন ঘরের মধ্যে কম পাওয়ারের বাতিটা জ্বলছে। ফলে কোণের দিকে বেশ অন্ধকার। অন্যত্র আবছা আলো। কেমন রহস্যময় পরিবেশ। অতিথিদের চোখ-মুখ ঠিক পরিষ্কার বোঝা যায় না,—অথচ চেনা যায়।

রাজীব তাকিয়ে দেখল, সমস্ত ঘরটা মন্ত্রবশ ভূজঙ্গের মত শান্ত। একটা ছুঁচ পড়লেও টের পাওয়া যায়। ফিসফাস গুঞ্জন আর নেই। সকলেই কিছু একটা শুনবার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। কেউ কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। চোখের পাতাও স্থির। ঠিক পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল।

চায়ের কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে রাজীব বলল,—'শহরসুদ্ধ সব লোকেই এখন জানে শ্রীমতী রায় আত্মহত্যা করেননি। বুধবার রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন। এবং যে লোকটি তাকে হত্যা করে, সে রীতিমত চতুর এবং বুদ্ধিমান। কারণ খুনের কৌশলটি অভিনব তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও নিখুঁত এবং চমকপ্রদ হল এই হত্যাকাণ্ডকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা। সমস্ত ব্যাপারটা এমন সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, যে খুনি নিঃসঙ্কোচে আমাদের চার পাশেই ঘোরাফেরা করল, অথচ তাকে সন্দেহ করবার মত কোনো কার্য-কারণ জনসাধারণ বা পুলিশ খুঁজে পায়নি।'

পিছন থেকে কে একজন শুধোল,—'শ্রীমতী রায়ের হত্যাকারীকে আপনি খুঁজে পেয়েছেন ইন্সপেকটরবাবু?'

রাজীব একটু হেসে বলল,—নিশ্চয়। অবশ্য হত্যাকারীকে খুঁজে পেলেও খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্যটা সহজে জানা যায়নি। আজ সকালে তাও পরিষ্কার হল। সুতরাং খুনিকে এখন সর্বসমক্ষে হাজির করতে বাধা নেই।'

সকলেই একদৃষ্টিতে রাজীবের দিকে তাকিয়ে আছে। কে এই জঘন্য অপরাধের নায়ক, তার পরিচয় জানবার জন্য প্রত্যেকেই উদগ্রীব। পিছনের সারিতে একজন উশখুশ করল। বোধহয় তার কৌতূহলই বেশি। হত্যাকারীর নাম জানবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে রাজীব ফের শুরু করল,—'সমস্ত ব্যাপারটা একবার কেঁচেগণ্ডুষ করা যাক। বুধবার রাত্রে নীপা দেবী বাড়িতে একা ছিলেন। এবং সেই রাতে ডাক্তার রায়ের হাসপাতালে নাইট-ডিউটি ছিল। রাত আটটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। চাকর দুঃখহরণও রাত নটার সময় যাত্রা শোনার জন্য চলে গিয়েছিল। সুতরাং বুধবার রাত্রে নীপা দেবী ছাড়া আর কেউ বাড়িতে ছিল না। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিন রাত্রে ভীষণ জলঝড় হয়েছিল। হত্যাকারী রাত নটার পর কোনো একসময় বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এবং হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীমতী রায়ের দেহে হেভি ডোজের মরফিন ইনজেকশন পুশ করে। নীপা দেবী নিস্তেজ ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে, সে তাকে বিছানার উপর ঠিক ঘুমোবার ভঙ্গিতে শুইয়ে দেয়। পরে একটি প্রায় শূন্য স্লিপিং পিলের শিশি বালিশের পাশে রেখে সরে পড়ে। যাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মিসেস রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।' একটু থেমে রাজীব আবার কথা বলল,—'এর থেকেই অনুমান করা যায় যে হত্যাকাণ্ডটি সুপরিকল্পিত। খুনি ঠিক সাধারণ লোক নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপারটা সে মোটামুটি বোঝে। ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দিতে জানে। এবং অন্তত আট-দশটি মরফিনের অ্যামপিউল সে পূর্বেই সংগ্রহ করেছিল। তারপর সুযোগ বুঝে ইনজেকশন দেবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢোকে। শুধু তাই নয়, মিসেস রায়কে জোর করে

ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকলে, লোকটি নিশ্চয় ক্লোরোফর্ম কিংবা ঐ জাতীয় কিছু ব্যবহার করে তাকে বাগে আনবার চেষ্টা করেছিল। এবং নীপা দেবী বাধা দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলার পর সহজেই তার পায়ের গোড়ালির কাছে সাফেনাস ভেনে মরফিন ইনজেকশন পুশ করে দেয়। ফলে শেষ রাতের দিকে শ্রীমতী রায়ের মৃত্যু ঘটে।'

কেউ কোনো প্রশ্ন করল না দেখে রাজীব নিজেই বলল,—'অবশ্য এমনও ভাবা চলে যে, মিসেস রায় স্বেচ্ছায় ইনজেকশন নিতে রাজি হয়েছিলেন। দেহের প্রয়োজন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে কত ইনজেকশনই তো আমরা নিয়ে থাকি। এবং এমনি কোনো অছিলায় তাকে প্রতারণা করে মরফিন দেওয়া হয়েছিল। পরে ব্যাপারটা নিছক একটা সুইসাইডের ঘটনা বলে চালানোর অপচেষ্টা হয়েছে।'

প্রিন্সিপ্যাল সুনির্মলবাবু মন্তব্য করলেন, 'শহরের লোকের মনে কিন্তু সেই ধারণাই বদ্ধমূল ইন্সপেক্টরবাবু।'

রাজীব পরিষ্কার বলল,—'তাদের অনুমান অবশ্যই ভ্রান্ত। তবে ব্যাপারটা আমি খোলসা করে বলছি। এই রকম ভাবনা-চিন্তার অর্থই হল, নীপা দেবীর স্বামী ডাক্তার অম্বর রায়কে খুনি মনে করা। অম্বর রায় চিকিৎসক এবং মরফিনের অ্যামপিউল সংগ্রহ করে ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দেবার কৌশলও তার জানা। এ ছাড়া শহরের কেউ কেউ জানে যে রায়-দম্পতির মধ্যে বনিবনা ছিল না। নারী হলেও নীপা দেবীর মন ছিল বহির্মুখী। স্বামী আর ঘরকন্নার মধ্যে তিনি নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেননি। শহরের নানা অনুষ্ঠানে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কলেজের নানা ফাংশনে মিসেস রায়ই সব। টাউন ক্লাবের থিয়েটারে তিনি হিরোইন। তলে তলে মস্ত একটা কাণ্ড করতে মিসেস রায় এগোচ্ছিলেন। খবরটা নিশ্চয় সকলে জানেন না। এবং সকলের পক্ষে এ খবর জানাও সম্ভব নয়। নীপা দেবী সিনেমায় নামতে রাজি হয়েছিলেন। অবিনাশবাবুর প্রস্তাব তিনি প্রায় দুহাতে লুফে নেন। বলাবাহুল্য এ সমস্ত ব্যাপারেই ডাক্তার রায়ের সায় ছিল না। তিনি আপত্তি করেছেন। সাধ্যমত বাধা দিয়েছেন। কিন্তু বউকে রুখতে পারেননি। ফলে দুজনের সম্পর্কের গভীর অবনতি ঘটেছিল। এছাড়াও একটা ব্যাপার আছে। প্রফেসর নীলাদ্রি সেনের সঙ্গে নীপা দেবীর পূর্ব-পরিচয় ছিল। বিয়ের আগের ভাব-ভালোবাসা বলতে যা বোঝায়, দুজনের মধ্যে ঠিক তাই ঘটেছিল। পলাশপুরে দেখা হলে পর, পুরনো প্রেমে ফের বসন্তের হাওয়া এসে লাগল। এ সমস্তই আমাকে তদন্ত করে জানতে হয়েছে। যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকেই টুকরো টুকরোভাবে নানা তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। তবে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি মিসেস রায়ের লেখা একটা ডায়েরি বই থেকে। এটা না পেলে আমার খড়-গাদায় ছুঁচ খোঁজার অবস্থা হত। এবং খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্য টেনে বের করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত।'

রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে রাজীব পুনরায় শুরু করল,—'আমি জানি ডাক্তার রায় বউকে বিশ্বাস করতেন না। স্বামীর সন্দেহের কথা স্ত্রীও জানতেন। নীপা দেবী তাই ঠিক করেছিলেন, তিনি ঘর ছাড়বেন। তবে কারো সঙ্গে নয়। স্বেচ্ছায়, এবং একাই। নীলাদ্রি সেনকে তিনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করবেন। তার সামনে হাজার বাতির উজ্জ্বল ইশারা। ফিল্মস্টারের ঝলমলে জীবনের ধারেকাছেও, মফঃস্বল কলেজের একজন অধ্যাপক রীতিমত বেমানান এবং অকিঞ্চিৎকর।'

অম্বর একপাশে চুপ করে বসেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে, সে তা ভাবেনি। লোকটা আরো কী বলে শোনার জন্য অম্বর সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইল।

দুঃখ করে রাজীব বলল,—'কিন্তু মিসেস রায়ের একটি ইচ্ছেও পূর্ণ হয়নি। নিয়তি তখন ঝড়ের বেগে তাকে গ্রাস করবার জন্য এগোচ্ছে। সিনেমার হাতছানি, রুপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ, মেঘের

প্রাসাদের মত সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। এমন কি নীলাদ্রি সেনের সঙ্গে শেষ কথাও তার বলা হল না। বেস্পতিবার দিন কাকার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরোলো ডাক্তার-স্বামীর ঘরে আর কোনো দিন হয়ত ফিরতেন না। কিন্তু নিয়তি তার মনের ইচ্ছা-বাসনার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বুধবার রাত্তিরেই নীপাদেবী আততায়ীর হাতে খুন হলেন।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে রাজীব বলল,—'আমি জানি এমন একটা কেসে ডাক্তার রায়কে খুনি বলে সন্দেহ করা খুব স্বাভাবিক। প্রথম দিকে আমার মনও সেদিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতেই আমার সন্দেহ কাটল। একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন। অম্বর রায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক, —মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তিনি যদি ঠাণ্ডা মাথায় তাকে খুন করতে চাইতেন, তাহলে কখনও চিকিৎসা-বিদ্যার আশ্রয় নিতেন না। একজন ভদ্রমহিলাকে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করে তার বালিশের পাশে ঘুমের বড়ির শিশি রেখে গেলেই পুলিশ সেটা সুইসাইড বলে গণ্য করে না। আনন্যাচারাল ডেথ কেসে পোস্টমর্টেম অবশ্যম্ভাবী। এবং ঘুমের ওষুধই যে মৃত্যুর কারণ, সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া দরকার। তার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে ভিসেরা পাঠানো হবে। কেমিক্যাল এগজামিনেশনে মরফিন পাওয়া গেলে পুলিশ ভদ্রমহিলার ডাক্তার স্বামীকেই সন্দেহ করবে। এবং ডাক্তার রায় কি এতই মূর্খ যে এইভাবে স্ত্রীকে খুন করে তিনি প্রায় স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে বসবেন? আমার তা মনে হয় না। ডাক্তার রায়ের খুনের মতলব থাকলে তিনি স্ত্রীকে অন্য উপায়ে পৃথিবী থেকে সরাতেন। খুব সাধারণ মানুষ যা করে। মাথায় মোক্ষম আঘাত, কিংবা গলা টিপে হত্যা। পরে পুলিশ এসে দেখত, মৃতার অলংকার-টলংকার সব নিখোঁজ। লোকে ভাবত,—'ইট ওয়াজ এ মার্ডার ফর গেইনস।'

'কিন্তু প্রশ্ন হল, তাহলে খুনি কে?' রাজীব ঘরের কোণের দিকে একবার তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল'—'তবে কি অধ্যাপক নীলাদ্রি সেনই অপরাধী? তিনি নীপা দেবীর পূর্ব-প্রণয়ী। পলাশপুরে এসে ফের তাদের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেম হয়। ডায়েরিতে নীপা দেবী লিখেছেন, নীলাদ্রিবাবু তাকে বহুদূরে কোথাও নিয়ে যেতে চান। এবং আমি জানি দেবরাজের সঙ্গে মিসেস রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হন। নীপা দেবীকে ফিল্মে নামার ইচ্ছাও সম্ভবত তাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তবে কি ইনজেকশন সিরিঞ্জ নীলাদ্রি সেনই হাতে তুলে নেন? তদন্তে জানা গেছে নীলাদ্রির বাবা ডাক্তার। বাপের নাম ভাঙিয়ে আট-দশটা মরফিনের অ্যামপিউল জোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, নীলাদ্রিবাবু কি ইনজেকশন দিতে জানেন? আমি এ বিষয়ে তদন্ত করেছি। নীলাদ্রি সেন তার বাবার মেজ ছেলে। বাপের ইচ্ছে ছিল, এই ছেলেটিকে ডাক্তারি পড়ান। কিন্তু ডাক্তারি পড়া দূরে থাক, স্কুলের গণ্ডি পেরোবার পর ছেলে সায়েন্স পড়তেই রাজি হল না। বাপের সঙ্গে একরকম ঝগড়া-বিবাদ করেই সে আর্টসে গিয়ে ভর্তি হল। ডাক্তার সেন আমার কাছে সুখ-দুঃখের অনেক কথা বলেছেন। অন্য ছেলেরা মাঝে-মধ্যে তার চেম্বারে এসেছে। দেহের নানা রোগ-অসুখ নিয়ে বাপের সঙ্গে কথা বলেছে। চিকিৎসা-পদ্ধতি লক্ষ্য করেছে। কিন্তু নীলাদ্রি ব্যতিক্রম। ছোটবেলায় এক ফোঁটা রক্ত পড়তে দেখলে সে তিড়বিড় করে লাফাত। কলেরার ইনজেকশন নিতে হবে শুনলে বাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাত। বাপের চেম্বারে বসে অসুস্থ মানুষের দেহে ইনজেকশনের ছুঁচ ফোটানো সে কি স্বচক্ষে দেখতে পারে?' একটু হেসে রাজীব বলল,—'এমন একটা ইতিহাস শোনার পর, নীলাদ্রিবাবুকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ হাতে আমি ঠিক ভাবতে পারলাম না।'

সামনের সারিতে চৈতি বসেছিল। সাজে-গোজে আজও সে পটের বিবি। মাজা-ঘষা মুখ, মাথার পিছনে প্রায় মৌচাকের মত সুদৃশ্য এক খোঁপা। ম্যাচ করা শাড়ি আর ব্লাউজ। রাজীব লক্ষ্য

করল, খানিকটা দূরে বসে অবিনাশ কেবলি ওর মুখের উপর চোখ বুলোচ্ছে। চৈতির ঠিক পিছনেই তার হবু-বর হরিপ্রকাশ বসে। সে মাথা ঘোরালেই অবিনাশ মুখ নামিয়ে নিচ্ছে।

রাজীব ওকে লক্ষ্য করে বলল,—'চৈতি দেবী, সন্দেহ কিন্তু আমি আপনাকেও করেছিলাম। দেবরাজের সঙ্গে মিসেস রায়ের ঘনিষ্ঠতায় আপনিও কম ঈর্ষান্বিত হননি। এবং নানাভাবে মিসেস রায়কে জব্দ করবার জন্য চেষ্টা করেছেন। নীলাদ্রিবাবুকে অযথা টেলিফোন। বেনামীতে তাকে চিঠি দিয়ে উত্তেজিত করবার চেষ্টা। তারপর দেবরাজের ডাকবাক্সে মিসেস রায়ের লেখা চিঠিখানা রেখে এসে সবচেয়ে অন্যায় করেছেন। মেয়েদের ঈর্ষা এমনিই হয়। কিন্তু তবু আমি বলব, আপনি বুদ্ধিমতী চৈতি দেবী। কারণ দেবরাজ আর অবিনাশ কেউই বুঝতে পারেনি যে চিঠিখানার মধ্যে আপনার একটা মস্ত প্যাঁচ রয়েছে। বুধবার রাত্তিরে ওরা দুজনেই তাই বোকার মত দৌড়েছিল। জল-ঝড় না হলে নিশ্চয় একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি হত। আমি বিশ্বাস করি প্রেমের টানে দৌড়বার সময় কেউ থলিতে করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ আর মরফিনের অ্যামপিউল নিয়ে যায় না। কাজেই ওরাও সন্দেহমুক্ত। খুনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই।'

সুব্রত লক্ষ্য করল চৈতি মাথা হেঁট করে বসে। আর অবিনাশ দাঁত বের করে হাসছে। দেবরাজের মুখখানা খুব চকচকে দেখাচ্ছে—ঠিক টাঁকশাল থেকে সদ্য বেরোনো সিকি-আধুলির মত উজ্জ্বল।

সুনির্মলবাবু বেশ চিন্তিত মুখে বললেন—'তাহলে মিঃ সান্যাল? নীপা দেবীর হত্যাকারী কে? আমরা তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি তো প্রায় সকলের কথাই বলে গেলেন। শুধু নরেশবাবু আর চাঁদবদনজি বাকি।'

চাঁদবদন তখনই প্রতিবাদ করে বলল,—'আরে সিয়ারাম, সিয়ারাম। হামার নাম কেনো উঠবে, আমি কি সুঁই দিতে পারি?'

রাজীব কথা বলল না। শুধু অপাঙ্গে দেখল। খুড়োর মুখখানা প্রায় ছাইবর্ণ। তার প্রসঙ্গ উঠতেই ভদ্রলোক শুধু ঘাবড়ে যাননি। বেশ ভয় পেয়েছেন বলেই মনে হল।

কৌতুক করে রাজীব বলল,—'কিন্তু, নরেশবাবু, আপনি কি বলবেন? আপনি তো ইনজেকশন দিতে শিখেছেন শুনলাম।'

—'হ্যাঁ, তা শিখেছি।' খুড়ো চটে উঠে বললেন। 'তাই বলে ভাইঝিকে আমি ইনজেকশন দিয়ে মারব? এ সব কি আজে-বাজে কথা বলছেন?'

রাজীব হেসে বলল,—'খুন করতে না চাইলেও ভাইঝির সর্বনাশ ঘটাতে আপনি চেয়েছেন নরেশবাবু। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে? বুধবার দিন সন্ধ্যার পর চাঁদবদনজিকে আপনি বলেছিলেন যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেই ওরা বাড়ি বেচতে রাজি। কিন্তু রাত দশটার পর জল-ঝড়ের মধ্যে হোটেলে ফিরে আপনি উল্টো কথা বললেন। বাড়ি বিক্রি করতে আপনার ভাইঝি রাজি নয়। অথচ আপনি আমাকে বলেছেন যে, সেদিন সন্ধের পর নীপা দেবীর সঙ্গে আপনার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়নি।'

নরেশবাবু কোনো জবাব দিলেন না।

চাঁদবদন বলল,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি ঠিক ধরিয়েছেন হুজুর। এ কথার কুছু মতলব তো হামি সমঝাতে পারিনি।'

—'পারবেন কেমন করে?' রাজীব গম্ভীর মুখ করে বলল, 'এর উত্তর জানতে হলে নীপা দেবীর বাবার উইলের শর্তগুলি আগে জানতে হবে।'

—'উইলের শর্ত?' অম্বর এতক্ষণ পরে কথা বলল।

—'হ্যাঁ, উইলের কথা আপনি কিছুটা জানেন ডাক্তার রায়। কিন্তু সবটা নয়। উইলে লেখা আছে যে আপনার শ্বশুরমশায়ের অবর্তমানে তার বিবাহিতা কন্যাই কলকাতার গৃহ-সম্পত্তির মালিক

হবেন। কিন্তু শ্রীমতী রায় যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তবে তাঁর স্বামী এই সম্পত্তির অধিকারী হবেন না। সে ক্ষেত্রে এই গৃহের উপর নরেশবাবুর স্বত্ব সাব্যস্ত হবে।'

অম্বর বলল,—'ঠিক তাই। সে কথা তো আমিও আপনাকে বলেছি ইন্সপেক্টরবাবু।'

—'বলেছেন ঠিকই। কিন্তু উইলে আরো একটা কথা লেখা আছে ডাক্তার রায়। সেটাই সাংঘাতিক। উইলে বলা হয়েছে, যদি নীপা দেবী স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ছেড়ে চলে যান, এবং স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কের ইতি হয়, তাহলেও তিনি এই গৃহ-সম্পত্তির অধিকার হারাবেন। এবং তেমন ঘটলে তাঁর গর্ভজাত পুত্র-কন্যাই এই সম্পত্তির স্বত্ব লাভ করবেন। এবং সন্তান জাত না হয়ে থাকলে এই সম্পত্তি নিঃশর্তভাবে নরেশবাবুর ভোগদখলের অধিকারভুক্ত হবে।'

অম্বর খুব অবাক হল। 'আশ্চর্য। উইলের এই কথাটা তো আমি জানতাম না।'

রাজীব হেসে বলল,—'আপনি জানতেন না সত্যি, কিন্তু নরেশবাবু জানতেন। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে ভাইঝির ঠিক বনিবনা হয়নি, এ কথাটাও বোধহয় তাঁর জানা ছিল। মাস চারেক আগে বীরেন মোদকের সঙ্গে দেখা হতেই নরেশবাবু তাই একটা সুবর্ণ-সুযোগ পেয়ে গেলেন।'

অম্বর ফের বলল,—'বীরেন মোদক? সে আবার কে?'

—'ওকেও আপনি চিনবেন না ডাক্তার রায়। বিয়ের আগে নীপা দেবী একটি কাণ্ড করেছিলেন। নর্থ বেঙ্গলে গোকুলনগরে তখন ওরা থাকতেন। বীরেন মোদকের সেখানেই বাড়ি। মিসেস রায়ের তখন বয়স কম। বীরেনের সঙ্গে তার ভালোবাসা হয়েছিল। এবং দুজনে একবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। পুরো তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর এক ইস্টিশানের ওয়েটিং রুমে নীপা দেবী ধরা পড়লেন। এবং সেদিনই রাত্রে মেয়েকে নিয়ে তার বাবা কলকাতায় চলে আসেন। তারপরই আপনার সঙ্গে নীপা দেবীর বিয়ে হয়েছিল।'

—'কি আশ্চর্য!' অম্বর শুকনো মুখে বলল,—'এসব কিছুই তো আমি জানতে পারিনি।'

রাজীব হেসে বলল,—'নরেশবাবু বীরেন মোদককে তার ভাইঝির ঠিকানা দিয়েছিলেন। তার মনে একটা গভীর দুরভিসন্ধি ছিল। ভালোবাসার লোককে এতদিন পরে দেখল নীপার মন ফের টলতে পারে। আর জামাই যদি বীরেনের পরিচয় জেনে ফেলে, তাহলে একটা কেলেঙ্কারি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বীরেন মোদক ঘুঘু-লোক। ও পথেই সে হাঁটল না। মিসেস রায়কে সে ব্ল্যাক-মেইল করা শুরু করল। প্রেম-ভালোবাসা বীরেন কি ধুয়ে খাবে? তার টাকা চাই,—তিন-চার মাসে মিসেস রায়ের কাছ থেকে সে অনেক টাকা আদায় করেছিল। শেষকালে তার দাবি উঠেছিল—দু-হাজার টাকা। না পেলে সমস্ত কথা সে ফাঁস করে দেবে। তিন-চার মাস ধরে বীরেনই বাড়িতে ঢিল ফেলত। এই ছিল তার সংকেত। ঢিল পড়লেই পরদিন নদীর ধারে গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে হত। নচেৎ সেদিনও ঢিল পড়বে। একদিন, দু-দিন...তিনদিন, যত দিন না সে টাকা পাচ্ছে।'

অবিনাশকে অধৈর্য মনে হল। সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল,—'কিন্তু স্যর, হত্যাকারী তাহলে কে? এই বীরেন মোদকই কি মিসেস রায়কে খুন করেছিল? কিন্তু কেন?'

রাজীব ওর দিকে তাকিয়ে বলল,—'একটু ধৈর্য ধরুন অবিনাশবাবু। খুনির নাম এখনই জানবেন। শুধু নাম নয়, তাকে সশরীরে এই আসরেই দেখতে পাবেন।'

কয়েক সেকেন্ড পরে রাজীব বলল,—'বীরেন মোদক কেন খুন করতে যাবে? ব্ল্যাক-মেইলর কি খুন করে? সে কেবল ভয় দেখায়। নীপা দেবীর হত্যাকারী অন্য লোক। তার নাম সুরেশ্বর, —সুরেশ্বর নন্দী।'

—'সুরেশ্বর নন্দী? সে আবার কে?' দু-তিনজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

—'একটু পরেই তো তাকে স্বচক্ষে দেখবেন। এই ফাঁকে বরং তার পরিচয়টা দিয়ে রাখি।'

রাজীব অনেকটা বক্তৃতা দেবার মত ভঙ্গিতে শুরু করল—'সুরেশ্বরের বাড়ি বল্লভপুর গ্রামে। এখান থেকে বেশ দূর। রেলপথে প্রায় দুশো মাইল হবে। প্রথম জীবনে খুব মেধাবী ছাত্র ছিল সুরেশ্বর। ইংরেজিতে ভালো দখল ছিল। স্কুলে পড়ার সময় বাংলাতে প্রবন্ধ লিখে সে একশো টাকার প্রাইজ পেয়েছিল। ফাইন্যাল পরীক্ষায় দুটো লেটার পেয়ে সুরেশ্বর পাস করল। সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য স্কলারশিপটা হাতছাড়া হয়ে গেল। রেজাল্ট দেখে হেডমাস্টার বললেন,—সুরেশ্বর, তুমি আর্টসে ভালো করবে। অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ো।

কিন্তু সুরেশ্বরের বাবা বেঁকে বসলেন। তার মতে বি-এ পড়া মানেই সময় আর অর্থের অপচয়। সুরেশ্বর বরং মেডিক্যাল লাইনে যাক। সে ভালো ছেলে। টকাটক পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসবে। তাই ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। বড় ডাক্তার হতে পারলে সংসারের দুঃখকষ্ট ঘুচবে। বাপের ইচ্ছামত সুরেশ্বর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল। প্রি-মেডিক্যাল পরীক্ষাতে আটকাল না। কিন্তু ফার্স্ট এম. বি. বি. এস. পরীক্ষাতে সুরেশ্বর শুধু হোঁচট খেল না। একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল। তিনটে বিষয়ে ফেল। একটাতে রীতিমত কম নম্বর।

তবু ব্যাপারটা খুব অপ্রত্যাশিত নয়। ফেল করবে বলে সুরেশ্বর প্রায় নিশ্চিত ছিল। গত দু-বছরে ডাক্তারির বই সে পড়ল কখন? চামড়ায় ঢাকা এই দেহের শিরা-উপশিরা, মেদ-মজ্জায়-অস্থির গোপন রহস্যের মধ্যে সে রসের সন্ধান পায়নি। সুরেশ্বর আনন্দ পেল নাটক-নভেল আর ইতিহাসের বই ঘেঁটে। গত দুবছর সে এই রসের আস্বাদন পেতেই ব্যস্ত ছিল। সুতরাং ডাক্তারির বই খুলে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে তার সময় কোথায়?

ফেল করার পর সুরেশ্বরের চৈতন্য হল। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে তার বাবা গত হয়েছেন। সংসারে গার্জেন বলতে গেলে সে নিজেই। সুরেশ্বরের বোধহয় তার হেড-মাস্টারের কথা মনে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—'তুমি আর্টসে ভালো করবে।'

কাউকে কিছু না জানিয়ে সুরেশ্বর মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়ল। তার মেসের রুম-মেট ভদ্রলোক বয়সে দু-তিন বছরের বড়। এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে সে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিষয় বস্তুর উপর রিসার্চ করছিল। সব কথা শুনে সেও সুরেশ্বরকে বি. এ. পড়ার পরামর্শ দিল। অনার্সের বইটই তার সব আছে। এতদিন তো সুরেশ্বর সেই বই-পত্তর নিয়েই ছিল। আর শুধু বই নয়। সুরেশ্বর যদি ফের বি. এ. পড়ে তাহলে ভালো নোটের জন্য তাকে চিন্তা করতে হবে না। তাও সে দিতে পারবে।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর পড়া যায় না। খরচ-খরচা, নানা সমস্যা আছে। বাবা বেঁচে নেই। মেসের খরচ কে জোগায়? কলেজে ভর্তি হওয়া অসম্ভব। সুরেশ্বর ভাবল যে প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। তারপর বছর দুই সে মেসে ছিল। মাঝে মধ্যে গ্রামে যেত। আর প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ এক অ্যাকসিডেন্টে ওর সেই রুম মেট-মারা গেল। তার দিন সাতেক পরেই সুরেশ্বর মেস থেকে নিখোঁজ হল। এখন সে কী করে, তার গ্রামের লোকেও সঠিক জানে না। বছরখানেক হল, সে তার মাকে নিয়মিতভাবে মাসের প্রথমে টাকা পাঠাচ্ছে। সুরেশ্বরের সমাচার প্রায় কেউই রাখে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল। সকলে তাকিয়ে দেখল চার-পাঁচজন সেপাই একটি লোককে প্রায় পিছমোড়া করে বেঁধে এনেছে। সবার পিছু আর একজন লোকও ঘরের মধ্যে ঢুকে ভীরু শশকের মত এককোণে চুপ করে দাঁড়াল।

প্রথমে নীলাদ্রিই চেঁচিয়ে উঠল, 'একি! প্রফেসর অনিমেষ দত্তকে এমনি করে বেঁধে আনবার অর্থ কী?'

হেড-কনস্টেবল রাজীবকে একটা লোহার ডাণ্ডা দেখিয়ে বলল,—'এটা ওর হাতে ছিল স্যর।' পরে অন্য লোকটির দিকে তাকিয়ে সে ফের বলল,—'ঠিক সময়ে না গিয়ে পৌঁছলে ওকে নিশ্চয় মেরে ফেলত।'

লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে রাজীব বলল,—'কি সুরেশ্বরবাবু? বীরেন মোদককে কোথায় আঘাত করবেন ভেবেছিলেন? অন দি নেপ অফ দি নেক?' পরে ব্যঙ্গ করে সে বলল,—'ডাক্তারি তো ভালোই শিখেছেন মনে হয়।'

প্রিন্সিপ্যাল মুখার্জি এগিয়ে এলেন। 'এসব কী বলছেন ইন্সপেক্টরবাবু? ইনি প্রফেসর দত্ত—ইতিহাসের ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। আমি স্বচক্ষে ওর সার্টিফিকেট দেখেছি।'

—'ঠিকই দেখেছেন।' রাজীব স্বীকার করল। 'তবে এ লোকটা নকল অনিমেষ দত্ত। তার মতই ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। সোনায় বাঁধানো দাঁত। ছদ্মবেশটা প্রায় নিখুঁত করে এনেছিল। আসল মানুষটা বহুদিন আগে স্ট্রিট-অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। ভদ্রলোক ওর রুম-মেট ছিল। বন্ধুর মৃত্যুর পর সুরেশ্বর তার সার্টিফিকেটগুলি এবং কিছু বই হাতিয়ে নেয়। কিছুদিন পরে সে নাম ভাঁড়িয়ে নর্থ বেঙ্গলে যায়। গোকুলনগরে নতুন কলেজ হচ্ছিল। সুরেশ্বর সেখানে চাকরি পেল। এবং তখন সে এমন ঘরকুনো, অমিশুকে প্রকৃতির ছিল না। কিন্তু ওর কপাল মন্দ। গোকুলনগরে বছরখানেক কাটাবার পরই সুরেশ্বর ধরা পড়ে গেল। নতুন এক প্রফেসর এসে তাকে দেখে অবাক। অনিমেষ দত্তকে সে একবার কলকাতায় দেখেছিল। এ মানুষ কখনও সে নয়। লোকটা জাল। ব্যাপারটা কানাঘুষো হতেই সুরেশ্বর গোকুলনগর ছেড়ে পালাল। আর কোনোদিন সেখানে যায়নি।'

দেবরাজ বলল,—'কিন্তু মিসেস রায়কে সুরেশ্বর নন্দী খুন করল কেন?'

—'হ্যাঁ, খুনের মোটিভের কথা এবার বলছি। পলাশপুরে এসে সুরেশ্বর প্রায় নিশ্চিত হয়েছিল। এতগুলি বছর কাটল। কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। তার বিদ্যে-বুদ্ধিতে কোনো ফাঁক ধরা পড়েনি। অনিমেষ দত্তের তৈরি নোট এবং নিজের জ্ঞানের থলি উজাড় করে ভারতের ইতিহাস সে ভালোই পড়িয়েছে। হঠাৎ কোনো প্রশ্নে পাছে ধরা পড়ে যায়, সেই ভয়ে টুইশানি পর্যন্ত নেয়নি। শুধু মিসেস রায়ের বেলায় কেন জানি না সে পড়াতে রাজি হয়েছিল। সুরেশ্বর ভেবেছিল পলাশপুরে তার পাকাপোক্ত আসন। কেউ তাকে হঠাতে পারবে না। এতদিন পরে অনিমেষ দত্তকে আর কে চিনবে? কিন্তু অকস্মাৎ বিধি বাম হলেন। রবিবার সন্ধের পর নীপা দেবী আর বীরেন নদীর ধার থেকে ফিরছিল। তখন অতর্কিতে সুরেশ্বরের সঙ্গে তাদের দেখা হল। এরপর তার আসল পরিচয় যে ফাঁস হয়ে পড়বে, সুরেশ্বর তা বুঝতে পেরেছিল। গোকুলনগরে বীরেন মোদক তার ছাত্র ছিল এবং ব্যাপারটা সে জানত। এই কথা ভেবেই সুরেশ্বর কলকাতায় গিয়ে উঠল। এবং হয়ত সে আর পলাশপুরে ফিরত না। কিন্তু এতদিনের একটা পাকা চাকরি খুইয়ে পালিয়ে যেতে তার মন চায়নি। তাই বীরেনের সঙ্গে মঙ্গলবার দিন সে কলকাতায় দেখা করল। পুরাতন ছাত্রের মেসটা সে চিনত। কলকাতায় বীরেনের সঙ্গে তার এক-আধবার দেখাও হয়েছে। ফের সে অধ্যাপনা করছে, একথা অবশ্যই তাকে বলেনি। বীরেন বলল, নীপাকে সব কথা সে বলেছে ঠিকই। কিন্তু মেয়েটা তার কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনি। ব্যাপারটা হয়তো এখনও জানাজানি হয়নি। তাই শুনে সুরেশ্বর আবার আশায় বুক বাঁধল। দুদিন ধরে কলকাতায় বসে সে তখন এই প্ল্যানটা এঁটেছিল। ব্যাপারটা যদি এখনও না ফাঁস হয়ে থাকে, তাহলে সে এই উপায় বেছে নেবে। প্রথমে নীপাকে হেভি ডোজে মরফিন দিয়ে খুন করবে। এবং কেসটা এমনভাবে সাজাবে, যাতে প্রথমেই সেটা আত্মহত্যা বলে মনে হয়। পরে ডাক্তারি-পরীক্ষায় মরফিন ধরা পড়বে। এবং তখন লোকে ডাক্তার-স্বামীকেই হত্যাকারী বলে ধরে নেবে। এবং তারপর বীরেনও তার শিকার হবে।'

সুব্রতের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলল,—'বিলম্বে কাজ নেই, তুমি ওকে অ্যারেস্ট করো। তবে ভয় নেই, হাতের কবজি ওর ঠিকই আছে। কোলস্ ফ্র্যাকচার মিথ্যে,—সব ভড়কি। কনস্টেবলকে হাতকড়ি লাগতে বলো।'

সুরেশ্বরের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রাজীব। বলল,—'আমাকে চিনতে পারছেন তো মিঃ নন্দী? আমিই সেই বইয়ের ক্যানভাসার। আপনার ডান-হাতের কবজি ভেঙেছে বললেন। অথচ বুড়ো আঙুলের ডগায় সবুজ কালির দাগ। অর্থাৎ একটু আগেই একলা ঘরে আপনি লেখার কাজ করছিলেন। তখনই আমার সন্দেহ হল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফের আপনার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, আমার সন্দেহই সত্যি। কোলস্ ফ্র্যাকচার হলে কেউ কি আঙুলে কলম ধরতে পারে? তারপর পোস্ট অফিসে ফের আপনাকে লিখতে দেখলাম। এবং তখনই আপনার আসল পরিচয়টাও আমার জানা হল।'

হঠাৎ সুব্রত বলল,—'কিন্তু রাজীবদা, উনি যে মরফিনের অ্যামপিউল সিরিঞ্জে ভরে ইনজেকশন দিয়েছেন, তার প্রমাণ কোথায়?'

—'প্রমাণ আছে বৈকি। অনেক কষ্টে এগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে। সন্ধের পর ক্যানভাসারকে হঠাৎ ঘরে দেখে সুরেশ্বর চমকে উঠেছিল। অপরাধীর মন এমনিই হয়। ঘরের মধ্যে ইঁদুর নড়লেও সে ভয় পায়। আমি আন্দাজ করেছিলাম, পরদিনই সুরেশ্বর তার কোটর ছেড়ে বেরোবে। এবং তখন আমি ওকে অনুসরণ করলাম। কলকাতার সাত নম্বর পরান সাহা লেনে সুরেশ্বরের একখানা ঘর ভাড়া নেওয়া আছে। সেখানেই একটা চামড়ার ব্যাগে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, মরফিনের ভাঙা অ্যামপিউল সব খুঁজে পেয়েছি। ওগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি ফিংগার প্রিন্ট ব্যুরোতে।' একটু থেমে রাজীব ফের বলল—'ব্যাগের মধ্যে একটা প্রেসক্রিপশনও পাওয়া গেছে। কোনো এক ডাক্তারের লেটার প্যাডের উপর সুরেশ্বর লিখেছে। মরফিনের প্রেসক্রিপশন, তিন-চারটে দোকানের ক্যাশ-মেমোও ব্যাগের মধ্যে রয়েছে। আমার মনে হয় এতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।'

অম্বর প্রশ্ন করল—'কিন্তু মিঃ সান্যাল, বুধবার দিন রাত্তিরে ঘরের একটা দরজার তালা ছিল। অন্য দরজাটাও ভিতর থেকে বন্ধ, খুনি তাহলে ঢুকল কেমন করে?'

—'সে কথাও আমি ভেবেছি ডাক্তার রায়।' রাজীব চিন্তা করে বলল, 'আপনার নিশ্চয় মনে আছে শোবার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। আমার ধারণা বাড়ির পিছন দিকের নিচু পাঁচিল টপকে সুরেশ্বর ঘরে ঢুকেছিল এবং অতর্কিত আক্রমণে ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু ব্যবহার করে মিসেস রায়কে আয়ত্তে আনে। সারারাত দরজা জানালা খোলা ছিল বলে, ক্লোরোফর্মের গন্ধ আমরা পরদিন টের পাইনি।'

একটু আগেই আসামিকে নিয়ে সুব্রত থানায় গেছে। অতিথিরাও বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। ঘর থেকে রাজীব একাই বেরোল। অনেকক্ষণ ধূমপান করা হয়নি। মাঠে নেমেই সে একটা সিগারেট ধরাল। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে তার মনে হল খানিকটা দূরে নরেশবাবু একাই হেঁটে চলেছেন। ক্লান্ত, বিষণ্ণ ভঙ্গি। সঙ্গে চাঁদবদনও নেই। সম্ভবত নরেশবাবুকে ফেলে সে আগেই চম্পট দিয়েছে। ওর সঙ্গ ধরবার জন্য রাজীব বড় বড় পা ফেলে এগোল। কাছে গিয়ে বলল,—'নরেশবাবু আপনি আমার উপর খুব রাগ করেছেন, তাই না।'

—'রাগ করব কেন?' নরেশবাবু যেন কষ্ট করে বললেন।

—'রাগ করাই স্বাভাবিক। আপনার সম্বন্ধে এতগুলো কথা বললাম।' রাজীব ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে জানাল।

অন্ধকারে নরেশবাবুর মুখটা ঠিক দেখা গেল না। তিনি বললেন—'আপনার কথা তো সত্যি ইন্সপেক্টরবাবু। সম্পত্তির লোভ বড় সাংঘাতিক বস্তু। তার জন্যই আমি চেয়েছিলাম নীপার সঙ্গে অম্বরের বিবাহ-বিচ্ছেদ হোক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মেয়েটা খুন হোক, এ আমি চাইনি। কোনোদিন প্রার্থনা করিনি।'

—'আমি তা জানি।' রাজীব সান্ত্বনার সুরে বলল,—'আপনি মিছিমিছি নিজেকে এত অপরাধী মনে করছেন নরেশবাবু। এই আলোর মুখটাই তো আমাদের সব পরিচয় নয়। মনের ভিতরে গাঢ় অন্ধকারে আর একটা মুখও লুকিয়ে আছে। সেটি অন্ধকারের মুখ। ভাগ্যি ভালো, সেই মুখটা আমরা দেখতে পাইনে। নইলে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কি আমরাই কথা বলতে পারতাম? অন্ধকারের মুখটাকে টেনে বের করেছি বলেই সুরেশ্বর আজ অপরাধী। আর আপনার এই বিষম লজ্জা।

নরেশবাবু করুণ মুখ করে বললেন,—'ও সম্পত্তি আমি নেবো না। আমার আর প্রবৃত্তি নেই বাড়িটা বিক্রি করে সেই টাকা নীপার নামে কোনো ভালো কাজে দান করে দেব।'

কথা শেষ হতে দুজনেই ফের হাঁটতে লাগল।

রাস্তায় পৌঁছে রাজীব থমকে দাঁড়াল। নরেশবাবু বললেন,—'আমি তাহলে চলি ইন্সপেক্টরবাবু।'

হাত তুলে নমস্কার করল রাজীব। বলল,—'হ্যাঁ, গুড বাই। পরে আবার দেখা হবে।'

অন্ধকারে দীর্ঘাকৃতি মানুষটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের কাছে সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি শুধু জ্বলছিল।